হিন্দুসমাজ-বিজ্ঞান।

[A comparative Study of the Hindu Social System]

বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ—

হেমচন্দ্র বসুমল্লিক বৃত্তিধারী

অধ্যাপক

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম্, এ প্রণীত।

বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ হইতে

শ্রীরাজেন্দ্রলাল সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

[মূল্য ৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।]

বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষাপরিষদের পৃষ্ঠপোষক

হেমচন্দ্র বসুমল্লিক বৃত্তির

প্রতিষ্ঠাতা

স্বনামধন্য

৺স্বর্গীয় সুবোধচন্দ্র মল্লিক

মহোদয়ের

পুণ্যস্মৃতিতে

দীন

এই গ্রন্থখানি

শ্রদ্ধায়

উৎসর্গ করিলাম।

নিবেদন

স্বনামধন্য স্বর্গীয় সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিক মহাশয় তাঁহার পিতার ও খুল্লতাতের স্মৃতিরক্ষার্থে প্রবোধচন্দ্র বসুমল্লিক বৃত্তি ও হেমচন্দ্র বসুমল্লিক বৃত্তি নামে দুইটি অধ্যাপকীয় বৃত্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদে (The National Council of Educationএ) বহু অর্থ দান করেন। জাতীয় শিক্ষাপরিষদের কর্ত্তৃপক্ষের অনুগ্রহে প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে (পাঁচ বৎসরের জন্য) হেমচন্দ্র বসু-মল্লিক বৃত্তির অধ্যাপক পদে আমি নিযুক্ত হই। হিন্দুসমাজ-বিজ্ঞান নামে এই যে গ্রন্থখানি রচনা করিবার সুযোগ আমি ইহাতে পাইয়াছিলাম, এত দিনে তাহা প্রকাশিত হইল। এই সুযোগ যে তাঁহারা আমাকে দিয়াছেন, ইহার জন্য জাতীয় শিক্ষপারিষদের কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে আমি চিরঋণী থাকিব।

আধুনিক যুগ-সভ্যতার নায়ক ইয়োরোপীয় সমাজের সঙ্গে তুলনায় হিন্দুসমাজের স্থান কোথায় হয়, ইহাই প্রধানতঃ এই গ্রন্থখানির প্রতিপাদ্য বিষয়। যে ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে মোটের উপর তিনটি ভাগে ইহাকে বিভাগ করা যায়।

(১) মানবসমাজের সাধারণ ধর্ম্ম কি।

(২) ফরাসী বিপ্লবের পর ফরাসী র‍্যাসনালিষ্ট নীতির প্রভাবে নব্য ইয়োরোপীয় সভ্যতা ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে মানবজীবনের কি আদর্শ স্থাপনা করিয়াছে এবং তাহার ফলাফলই বা এখন কি দেখা যাইতেছে।

(৩) ভারতীয় সভ্যতার ধর্ম্ম কি, কি আদর্শে কোন লক্ষ্যের দিকে মানব-জীবনকে তাহা পরিচালিত করিতে চাহিয়াছে, এবং তাহার ফলে ও দেশের বিশিষ্ট অবস্থায় হিন্দুসমাজ নামে পরিচিত ভারতীয় জনমণ্ডলীর ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবন কি প্রকৃতিতে গড়িয়া উঠিয়াছে।

ইহা হইতেই ইয়োরোপীয় সমাজের তুলনায় হিন্দুসমাজের স্থান কোথায় হয়, বুঝা যাইতে পারে।

একখানি গ্রন্থের পরিসরের মধ্যে এই সব আলোচনার বিস্তৃত স্থান হওয়া সম্ভব নহে। শেষ অংশের আলোচনা তাই সাধারণ ভাবে যথাসম্ভব সংক্ষেপেই করিতে হইয়াছে।

সনাতন ও সার্ব্বভৌমিক যে ধর্ম্ম হিন্দুজীবনের আশ্রয়, ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে সেই ধর্ম্মে হিন্দু জীবন কি বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে, বিধাতার কৃপায় সুযোগ যদি পাই, আর একখানি গ্রন্থে তাহার সম্বন্ধে যথাসাধ্য বিস্তৃত আর একটি আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

এরূপ বৃহৎ পুস্তকে প্রত্যেক প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়গুলির একটি বিস্তারিত সূচী দিলে ভাল হইত। এবার পারিলাম না। দ্বিতীয় সংস্করণে চেষ্টা করিব।

যে সব প্রমাণে যেরূপ সব যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হইয়াছে এবং যে বিষয়ে যেরূপ সব সিদ্ধান্তে তাহা হইতে আমি উপনীত হইতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহার সম্বন্ধে পণ্ডিতব অভিমত আমি প্রার্থনা করিতেছি।

এই সব বিষয়ে বহু ভ্রান্তি আমার হইতে পারে, সুধী সমালোচকবর্গের যুক্তির আলোকে তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব।

বিষয় অতি গুরু ও জটিল। ইহার একটা আলোচনা হয়, সর্ব্বতোভাবেই ইহা বাঞ্ছনীয়। এইরূপ আলোচনার প্রবর্ত্তনই আমার লক্ষ্য। শেষ কোনও অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, এরূপ অভিমান আমার নাই।

অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে মুদ্রাঙ্কণ ত্রুটি কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। শুদ্ধিপত্র একটা দিলাম না। ভরসা করি, পাঠকবর্গের বিশেষ অসুবিধা তাহাতে হইবে না।

বহু গ্রন্থ হইতে বহু বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তাহার মধ্যেও কিছু ভুল-চুক দুই এক স্থলে থাকিতে পারে। কেহ দয়া করিয়া তাহা দেখাইয়া দিলে সুখী হইব।

বিনীত—গ্রন্থকার।

সূচী পত্র

[৭]

র‍্যাসনালিজম্ ও ডিমক্র্যাসী

[৮]

র‍্যাসনালিজম্ ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজম্

[৯]

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া

[র‍্যাসনালিষ্ট নীতির ক্রিয়া ইয়োরোপীয় সামাজিক জীবনকে কি ভাবে কি অবস্থায় পরিণত করিয়াছে, তাহার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার ফলই বা কোন্ দিকে ইয়োরোপকে পরিচালিত করিতেছে, এবং ধনিক ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কিরূপ সামাজিক সংঘর্ষ তাহাতে দেখা দিয়াছে, তাহার মোট বিবরণ।]

[১০]

প্রতিক্রিয়া—রীতি ও গতি

পরিচ্ছেদ বিভাগ

[১১]

র‍্যাসনালিজম্ ও ধর্ম্মনীতি

(৫৮৬—৬৭১)

[১২]

হিন্দুসমাজ ও তাহার বিশিষ্টতা

(৬৭২—৮৪১)

পরিচ্ছেদ বিভাগ

পরিশিষ্ট

(৮৪৩—৮৫০)

হিন্দুসমাজ-বিজ্ঞান

অবতরণিকা

আমি কি বলিতে চাই ? প্রথমেই এই একটি প্রশ্ন অনেকেরই মনে উঠিবে। কি বলিতে চাই, দয়া করিয়া বা ধৈর্য্য ধরিয়া যাঁহারা এই দীন গ্রন্থে নিবদ্ধ প্রবন্ধগুলি পড়িবেন, ক্রমে ভরসা করি তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। আগে তার কিছু আভাস দেওয়া সম্ভব হইলেও একটা চুম্বক দেওয়া বড় সহজ নয়, আর তার এমন প্রয়োজনও কিছু নাই। তবে যাহা বলিতে চাই, কেন কি উদ্দেশ্য কি ভাবে তাহা বলিতে চেষ্টা করিব, আর কিরূপ তথ্য বা প্রমাণ আমার বক্তব্য বিষয়ের ভিত্তি, সে সম্বন্ধে একটু ভূমিকা প্রথম করা যাইতে পারে।

অনেকেই আমরা এই শ্লোক জানি এবং আবৃত্তিও করিয়া থাকি—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

অতি প্রাচীন এক জাতির বংশধর, প্রাচীন এক সভ্যতার উত্তরাধিকারী আমরা। কিন্তু এযুগে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় অজ্ঞানতিমিরান্ধ আমাদের চক্ষুরুন্মিলিত করিতেছেন প্রায় সকল দিকেই পাশ্চাত্য গুরুবর্গ। পাশ্চাত্য কাব্যবিজ্ঞানদর্শনাদি যাহা আমাদের শিখিতে হয়, তাহার গুরুগিরি অবশ্য তাঁহারাই করিবেন। যদিও আমাদের কাব্যবিজ্ঞানদর্শনাদি যাহা শিখেন, তার জন্য আমাদের গুরুগিরির উপর নির্ভর তাঁহারা করেন না। পণ্ডিতদের যে সাহায্য তাঁহারা নেন, সেটা কতকটা মজুরীর মত, গুরুগিরির নয়। কতকটা শিক্ষার্থীর অভিধান বা Reference বইএর মতই এই সব পণ্ডিতদের তাঁহারা ব্যবহার

দেয়, তাহা তাঁহারা এ দেশের পণ্ডিতবর্গের নিকটে চান না, নেনও না। সে দৃষ্টি তাঁহাদের নিজেদের সংস্কারের বা অধিকৃত বিদ্যার। ইহা কেবল তাঁহাদের স্বজাতীয় বিদ্যাভিমানের নয়, অসাধারণ পৌরুষেরও পরিচয় সন্দেহ নাই।

পাশ্চাত্য বিদ্যার গুরুগিরিতে তাঁহাদেরই অধিকার আছে, সে বিদ্যা অর্জ্জনে তাঁহাদের গুরুগিরি স্বীকার করিতে আমরা পারি। আর করাটাই বোধ হয় সঙ্গত। সে ক্ষেত্রে অজ্ঞানতিমিরান্ধ আমাদের চক্ষু উপযুক্ত জ্ঞানাঞ্জনশলাকায় তাঁহারাই উন্মিলিত করিতে পারেন ভাল। কিন্তু এ যুগে আমাদের বড় দুর্ভাগ্য হইতেছে এই যে আমাদের বিদ্যার দিকে, অজ্ঞানতিমিরান্ধ আমাদের চক্ষুরুন্মিলনের জ্ঞানাঞ্জনশলাকাটিও তাঁহাদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে, তাঁহাদের হাতেই পরিচালিত হইতেছে। আমাদের বিদ্যার, আমাদের সভ্যতার, তাৎপর্য্য আমরা সেই দৃষ্টিতে ততটুকুই দেখি, যে দৃষ্টি যতটুকু তাঁহাদেরই হাতের সেই জ্ঞানাঞ্জনশলাকায় ফুটিতে পারে।

এক সময় ছিল, যখন প্রথম পাশ্চাত্য বিদ্যার আলোক পাইয়া আমরা মনে করিতাম, শ্রেষ্ঠ বিদ্যা যাহা কিছু, পাশ্চাত্যমণ্ডলে পাশ্চাত্য সুধীবর্গের অতুলনীয় প্রতিভায় জগতে তাহার বিকাশ হইয়াছে,—মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ যাহা কিছু, পাশ্চাত্য সভ্যতাতেই তাহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ এই কথাই বলিতেন। আমরা তাঁহাদিগের পুঁথি পড়িয়া এই ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি করিতাম। ক্রমে পাশ্চাত্য মনীষী কেহ কেহ প্রাচীন ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হইলেন, আগ্রহে তার আলোচনা আরম্ভ করিলেন।

ভারতভারতীর ললাটনেত্রজ্যোতিঃ—(কেবল ভারতভারতীর কেন, বিশ্বভারতীর ললাটনেত্র জ্যোতিঃ বলিলেও কেহ বোধহয় আপত্তি করিতে পারিবেন না)—ভারতের বেদ। এই বেদও তাঁহারা অধ্যয়ন করিলেন,—করিয়া বিস্মিত হইলেন, মুগ্ধ হইলেন। অনেক [illegible] হিসাবগণনা করিয়া দেখিলেন,—বুঝিলেন, আর্য্যজাতির—

এমন কি মানবজাতিরই—প্রাচীনতম সাহিত্য যাহা পাওয়া যায়, তাহা ভারতের এই বেদ বা বেদের মন্ত্র-সংহিতা। (এই মন্ত্র সংহিতা-কেই মাত্র তাঁহারা বেদ বলিয়া গণ্য করেন। ব্রাহ্মণ আরণ্যক প্রভৃতিকে বেদ বলেন না। যদিও এদেশের পণ্ডিতবর্গ সবই এক বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা বা ভাগ বলিয়া মনে করেন)।

বেদ মানবজাতির প্রাচীনতম সাহিত্য। কিন্তু সেই প্রাচীন যুগের মানব যাঁহাদের মুখে বেদবাণী উচ্চারিত হইয়াছিল, পাশ্চাত্য এইসব পণ্ডিতগণের মতে উচ্চ সভ্যতার ও পরিপক্ক জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী হইতে পারেন না; যেহেতু তাঁহারা প্রাচীন—অতি প্রাচীন। একে প্রাচীন, তাহাতে আবার বেদের বহু স্তোত্রে চাষের কথা আছে, ভূমি সুজলা সুফলা হয় তার জন্য দেবতাদের নিকট অনেক প্রার্থনা আছে। সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত হইল, বৈদিক স্তোত্রকারগণের যে সমাজ তাহা সভ্যতার আদিম বা চাষের স্তরে মাত্র উঠিয়াছিল। * তাঁহারা মন্তব্য করিলেন, বৈদিক মন্ত্র সব "চাষার গান"। বেদে চাষের কথা আছে, আবার নগরের কথা, দুর্গের কথা, যুদ্ধের কথা, স্বর্ণাদি ধাতুর বহুবিধ অলঙ্কার ও অন্যান্য দ্রব্যাদির কথাও আছে। বৈদিক সমাজের

* পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের মধ্যে একটি মত আছে এই যে আদিম অবস্থাতে সকল মানব একেবারে 'বুনো' ছিল, বনের পশু ধরিয়া কাঁচা বা পোড়াইয়া খাইত, পর্ব্বত গুহায় বা বৃক্ষের কোটরে বাস করিত। ক্রমে তাহারা শান্ত পশু পালিতে শিখিল, পশুর দল নিয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত, কারণ পশুর খাদ্য ঘাস এক অঞ্চলে দীর্ঘকাল মিলে না। যেখানে যখন যাইত, তাঁবু পাড়িয়া থাকিত। আবার ঘাস ফুরাইলে অন্যত্র যাইত। বুনো অবস্থা হইতে মানবের উন্নতি এই কেবল আরম্ভ হইল। তারপর তাহারা পশুখাদ্য ঘাস এবং মানবখাদ্য ফল-শস্যাদিও জন্মাইতে শিখিল। তখন তাহারা চাষা হইল, গ্রাম পত্তন করিয়া স্থায়ীভাবে এক স্থানেই বাস আরম্ভ করিল। ইহাই হইল সমাজের এবং সভ্যতার সূত্রপাত, এবং এই চাষের স্তর বা Agricultural stageই মানবজাতির সভ্যতার প্রথম স্তম্ভ বা stage.

বর্ণনায় তাঁহারাই এই সব বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।—কিন্তু তবু বলিলেন, বৈদিক মন্ত্র সব চাষার গান। এই যে একটা খেয়াল প্রথমে তাঁহাদের মাথায় ঢুকিয়াছিল, অনেকেই তাহা ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

কিন্তু 'চাষা' হইলেও তারা বড় খাসা চাষাই ছিল, নহিলে অমন সব গান কেমন করিয়া গায়িল ? আদিম মানব— সভ্যতার মাত্র চাষের স্তরে উঠিয়াছে—বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও মহিমা, প্রাকৃতিক ব্যাপার সমূহের আশ্চর্য্য বিকাশ, আশ্চর্য্য শক্তি, মানবকে কত আনন্দ তারা দান করে, মানবের কত হিত কত অহিতও সংঘটন করিতে পারে, এই সব দেখিয়া তাহাদের সরলচিত্ত যে ভাবে অভিভূত হয়, যে সব উচ্ছ্বাসে তাহাদের প্রাণ ভরিয়া উঠে, যে সব আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, বৈদিক স্তোত্রসমূহে অতি সুন্দর চিত্তগ্রাহীরূপে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তাই এই ভাবে এই বৈদিক মন্ত্রসমূহের খুব তারিফ তাঁহারা করিলেন। আর বলিলেন, প্রাকৃতিক শক্তি সমূহকে বৈদিক যুগের আদিম চাষীরা প্রথমে দেবতা বলিয়া স্তবস্তুতি করিত,—পরবর্ত্তী স্তোত্রকারগণ ক্রমে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই প্রাকৃতিক দেবতারা মূল এক বিশ্বশক্তির বা বিশ্বদেবতারই বিচিত্র সৃষ্টি ব্যাপারে বিচিত্র বিকাশ মাত্র! কিছু পরে করিলেও এই তত্ত্ব অনুভব করা যে কত বড় উচ্চ ধীশক্তির লক্ষণ, কেবল আদিম চাষী মানবের পক্ষে সম্ভব নয়, এবং অন্যান্য আদিম চাষীরাও কেহ করিতে পারে নাই, এই সত্যটা তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ তেমন করিল না। এই পর্য্যন্ত বলিলেন,পরবর্ত্তী মন্ত্ররচনার যুগে তাঁহারা আরও কিছু উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা মানবসভ্যতার অভিব্যক্তির অতি উন্নত অবস্থা নহে। যাহা হউক, বেদবেদাঙ্গ দর্শন রামায়ণ মহাভারত ও বিজ্ঞান ইত্যাদি যতই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল, ততই বেশী তাঁহারা ভারতের প্রাচীন বিদ্যার মহিমায় মুগ্ধ হইতে লাগিলেন, না হইয়া পারিলেন না। নিজেরা মুগ্ধ হইলেন, নূতন নূতন ক্ষেত্রে নূতন নূতন জ্ঞানলাভ করিলেন,

আবার জগতের সভ্যসমাজে ভারতীয় বিদ্যার ও ভারতীয় সভ্যতার মহিমাও প্রচার করিলেন। ভারতসন্তান আমরাও ভারতীয় বিদ্যা তখন প্রায় বিস্মৃত হইয়াছিলাম, আমাদের মনোযোগও সে দিকে আকৃষ্ট তাঁহারা করিয়াছেন। এ জন্য তাঁহাদের নিকট আমরা অতি কৃতজ্ঞ।

এ কৃতজ্ঞতা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে, তাঁহারা যে দৃষ্টিতে ভারতীয় বিদ্যা ও ভারতীয় সভ্যতার আলোচনা করিয়াছেন,—সে দৃষ্টি তাঁহাদের, আমাদের নয়, আমাদের হওয়া উচিত নয়। সেই দৃষ্টিতেই যদি আমরা সন্তুষ্ট থাকি, বলিব আমরা অতি দীন, অত্যধিক হীন। তবে সন্তুষ্ট আমরা আছি। বড় দুর্ভাগ্য আমাদের, আধুনিক শিক্ষাভিমানী আমরা প্রায় পূরাপূরি তাঁহাদের গুরুগিরির অধীন হইয়াছি,—তাঁহাদের দেওয়া দৃষ্টিতে আমাদের বিদ্যার, আমাদের সভ্যতার বিচার আমরা করি। যে দিকটার যতটুকু, যে ভাবে ভাল তাঁহারা বলেন, সেই দিকটার ততটুকু, সেই ভাবেই মাত্র ভাল আমরা দেখি। আমাদের প্রাচীন আচার্য্যগণকে গুরু বলিয়া আমরা মানি না,—তাঁহাদের দৃষ্টিতে কিছু দেখিতে চাই না। সে দৃষ্টি যে দৃষ্টির মত একটা দৃষ্টি হইতেই পারে, এই কথাটাই আমরা স্বীকার করি না।

ভারতীয় আচার্য্যগণের পন্থা অনুসরণ করিয়া ভারতীয় বিদ্যার ও সভ্যতার আলোচনা যে ভারতসন্তান কেহই করেন না, একথা আমি বলি না। কিন্তু ইঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। আধুনিক শিক্ষিত ভারতবাসী বলিলে যাঁহাদের বুঝায়, তাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষার শিষ্য। এ শিক্ষার মধ্যে ভারতীয় বিদ্যা ও সভ্যতার ইতিহাসের স্থান খুব বেশী নয়। এইটুকুও যাঁহারা অধ্যয়ন ও আলোচনা করেন, পাশ্চাত্য আচার্য্যবর্গের গুরুত্বের অধীন হইয়াই প্রায় করেন। তাই ভারতসন্তানের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে ভারতীয় বিদ্যার ও সভ্যতার আলোচনা ও বিচারের দৃষ্টান্ত বড় কম দেখিতে পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্য গুরুর শিষ্যত্বের প্রভাব পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু শিথিল হইলেও

এখনও বড় কম নাই। ধরুন, বেদ বেদাঙ্গ, দর্শন, কাব্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি যে সব বিদ্যা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে দৃষ্টিতে যে পরিমাণে ও গুণে উচ্চাঙ্গ বিদ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমরাও সে গুলিকে সেই দৃষ্টিতেই সেই পরিমাণে ও গুণে মাত্র উচ্চাঙ্গ বিদ্যা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। তার অতিরিক্ত কোনও তত্ত্ব ইহার মধ্যে আছে কি না, ভাবি না। কিন্তু পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ এতদিন ইঁহারা অতি নিকৃষ্ট বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছেন। বৈদিক ও বৌদ্ধ যুগের পরে ভারতীয় ধর্ম্মসাধনার পদ্ধতিতে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মতের প্রভাব প্রধানভাবে আসিয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য ধর্ম্মমত ও তাহার পদ্ধতির সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের পৌরাণিক ও তান্ত্রিক রূপ একেবারেই খাপ খায় না। বরং, যেরূপ ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মের পদ্ধতি তাঁহারা নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন, তাহার সঙ্গেই ইহার মিল দেখা যায় বেশী। তাই তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন, হিন্দুবুদ্ধির অতিবিকার তখন ঘটিয়াছিল,—পুরাণ এবং তার চেয়ে আরও বেশী তন্ত্র সেই বিকৃতবুদ্ধির ফল!

এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য আচার্য্যগণের শ্রেষ্ঠ শিষ্য স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কয়েকটি মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। তাঁহার প্রতিভা অসাধারণ ছিল, অধ্যবসায় অতুলনীয় ছিল, —গভীর আন্তরিক সশ্রদ্ধ একটা মমত্ববোধও দেশের উপরে ছিল; কিন্তু ভারতীয় বিদ্যার ও সভ্যতার ইতিহাসের অনুশীলনে তিনি একেবারে পাশ্চাত্য আচার্য্যগণের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া চলিয়াছেন। এইদিকে তাঁহার দৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য গুরুগণের জ্ঞানাঞ্জনশলাকায় উন্মিলিত হইয়াছিল। তাই এই মন্তব্য তাঁহার লেখনী হইতে প্রসূত হইয়াছে, নতুবা হইত না।

পৌরাণিক কাহিনী ও অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে তিনি এই বলিতেছেন—

"Such are the myths believed, and such are the religious rites practised by the descendants of those who sang the hymns of the Vedas, and started the deep and earnest enquiries of the Upanishads."

তন্ত্র সম্বন্ধে মন্তব্য এইরূপ—

* * * The works known as the Tantras—creations of the last period of Hindu degeneracy under a foreign rule—give us elaborate accounts of dark, cruel and obscene practice for the acquisition of supernatural powers. And, by an audacious myth, these strange products of "the mind diseased" were ascribed to the diety Siva himself! * * * * * * To the historian the Tantra literature represents, not a special phase of Hindu thought, but a diseased form of the human mind which is possible only when the national life has departed, when all political consciousness has vanished, and the lamp of knowledge is extinct."

উদ্ধৃত বচনগুলি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ History of Civilisation in Ancient India হইতে উদ্ধৃত। (২য় খণ্ড, ৭ম অধ্যায়, ২১২ পৃষ্ঠা।)

আমরাও এতদিন এই মতই পোষণ করিতেছিলাম। আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠানাদি প্রধানতঃ তান্ত্রিক। তাই হিন্দুধর্ম্মটাই একটা অদ্ভুত কুসংস্কারপূর্ণ ব্যাপার,—শ্রদ্ধায় অনুষ্ঠানাদি পালন করিবার ত কথাই নাই, একটু শ্রদ্ধায় ইহার দিকে দৃষ্টি করিবার কি ইহার আলোচনা করিবারই প্রয়োজন যে কিছু থাকিতে পারে, তাহাও আমরা বড় মনে করি নাই। যে সব গৃহে এই সব অনুষ্ঠান সম্পন্ন কিছু হয়, তাহাও অজ্ঞ পুরোহিত ও অজ্ঞতরা প্রাচীনা নারীদেরই কতকগুলা বর্ব্বর আচার আর অনর্থক অপব্যয় মাত্র, যাহা সহিয়া বহিয়া নিতে হইবে, বুদ্ধিমান কাহারও অনুষ্ঠেয় নহে, এইরূপ আমরা ভাবিতাম।

সম্প্রতি মহামনীষী জাষ্টিস সারজন উড্‌রফ্‌ সাহেব তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তন্ত্রের তত্ত্ব সমূহের আলোচনা ও বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন, এই তত্ত্ব বৈদিক তত্ত্বের একটা বিশেষ দিক্‌মাত্র, তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট

নহে, এবং তান্ত্রিক অনুষ্ঠানসমূহও এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার একটা উৎকৃষ্ট সাধনা-প্রণালী। এখন আমরাও ভাবিতেছি, তাইত! তন্ত্র-শাস্ত্রটাও তবে এমন একটা উৎকৃষ্ট জিনিশ বটে! শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি, আশা করা যায়, তন্ত্রের দিকে এখন কিছু আকৃষ্ট হইবে এবং তন্ত্রমতপ্রধান বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের সাধনাপদ্ধতিও হয়ত কিছু শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে ইঁহারা দেখিবেন। তবে সে দৃষ্টি উড্‌রফ্ সাহেবের দৃষ্টিরই অনুসরণ করিবে। করুক, তাহাতেও ক্ষতি নাই। মহাত্মা উড্‌রফ্ সাহেব বিদেশী হইলেও তাঁহার কয়েকখানি গ্রন্থ পড়িয়া যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, তান্ত্রিক তত্ত্বের আলোচনা তিনি যেন ভারতীয় গুরুলব্ধ ভারতসন্তানের দৃষ্টিতেই করিয়াছেন। মনে হয়, তান্ত্রিক কোনও সিদ্ধগুরুর অতিশ্রদ্ধাবান্ শিষ্য সাধক তিনি।

পাশ্চাত্য বিদ্যা ও সভ্যতাই অধুনা এই পৃথিবীতে প্রভুত্ব করিতেছে। মানব জীবনের বহুক্ষেত্রে পাশ্চাত্য আদর্শ ই শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া, কেবল এদেশে নয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পরিগণিত। ব্যষ্টি কি সমষ্টিভাবে আধুনিক ইউরোপীয় ব্যক্তিবর্গের কর্ম্মশক্তিও অতুলনীয়। পৃথিবীময় ইহাদের অশেষ কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়াছে। রাজ্যশাসন, রাজ্যবিস্তার, ব্যবসায়বাণিজ্য, বিদ্যার ও অন্যান্য বহু তথ্যের অনুসন্ধান, ধর্ম্মপ্রচার, লোকসেবা প্রভৃতি বহু কর্ম্মে শক্তিমান্ ইয়োরোপীয়গণ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এখন বসতি ও বিচরণ করেন। ইয়োরোপীয় ধর্ম্মনীতি, সমাজ-নীতি, রাষ্ট্রনীতি ও লোকাচার প্রভৃতি বাস্তবিক কি প্রকৃতির, ইহার স্বাভাবিক পরিণতি ও ক্রিয়ার ফলে ইয়োরোপের আভ্যন্তরিক অবস্থা বাস্তবিক কি দাঁড়াইয়াছে, তাহা কাহারও বড় জ্ঞানগোচরে আসে না। অন্যান্য দেশের লোকেরা সাধারণতঃ যে সব ইয়োরোপীয়ের সংস্পর্শে আসেন, ইঁহাদের অমিত ও অশেষবিধ শক্তির মহিমা, জীবনের বাহ্যিক আড়ম্বর প্রভৃতি এতই তাঁহাদের মুগ্ধ করিয়া ফেলে যে ইয়োরোপীয় জীবননীতির আদর্শের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে কাহারও বড় সন্দেহ থাকে না। মনে হয়, অসাধারণ এই শক্তিমত্তা এই সব আদর্শেরই অবশ্যম্ভাবী ফল।

তারপর, কেবল এই প্রত্যক্ষ মহিমার নয়, ইয়োরোপীয় বিদ্যাও নানা ভাবে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহাদের সাহিত্য ও বিজ্ঞান সর্ব্বত্রই অধীত ও আলোচিত হয়। মানবজাতির বিদ্যার হিসাবে ইয়োরোপীয় সাহিত্যবিজ্ঞানের স্থানও অতি উচ্চে। সকল দেশেই লোকের চিন্তার ধারা বহু পরিমাণে ইয়োরোপায় চিন্তার ধারাকে অনুসরণ করিতেছে। মানবজাতির বুদ্ধির উপরেও ইয়োরোপীয় বিদ্যা ও সভ্যতার প্রভাব বড় কম হইয়া দাঁড়ায় নাই। মানবজাতির বুদ্ধির উপরে এই অধিকার প্রতিষ্ঠা—(এই cultural subjection of other peoples of the world) বর্ত্তমান ইয়োরোপায় সভ্যতার বিজয়গৌরবের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আমাদের ত কথাই নাই। কেবল ইয়োরোপীয় রাজশক্তির শক্তির শাসিত আমরা নই,—স্বধর্ম্মানুগত সকল শিক্ষা দীক্ষা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সম্পূর্ণরূপে ইয়োরোপীয় শিক্ষারই শিষ্যত্বের অধীনতায় আমাদের আসিতে হইয়াছে। এ অবস্থায় আমাদের বুদ্ধি ও বিদ্যা যে একেবারে ইয়োরোপীয় বুদ্ধি ও বিদ্যার অধীন হইয়া পড়িবে, একথা বলাই বাহুল্য।

ইয়োরোপীয় পণ্ডিতবর্গ সকল দেশেরই ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, সভ্যতা ও বিদ্যার আলোচনা করিয়া থাকেন। নিজেদের ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি ও বিদ্যাকে তাঁহারা মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত পরিণতি বলিয়াই মনে করেন। বিভিন্ন দেশের ও জাতির উন্নতি যে অনেকটা বিভিন্ন দিকে হইয়াছে,—জ্ঞানে ও ধর্ম্মে, বিদ্যায় ও চরিত্রের আদর্শে যে বিভিন্ন জাতির এক একটা বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে,—ইয়োরোপ যাহা জানে না, বিশ্বরহস্যের যে সত্য ধরিতে পারে নাই, ভারত, চীন, মিশর, আরব কি ব্যাবিলন কি ইরাণ তাহা জানিত, সেই সত্য ধরিয়াছিল,—আবার ইহারা যাহা জানিত না, যে সত্য ধরিতে পারে নাই, ইয়োরোপ তাহা জানে, সে সত্য ধরিয়াছে,—সকলের বিদ্যা ও সকলের সভ্যতা হইতেই যে অপর সকলে বহু নূতন নূতন সত্যের দৃষ্টি, নূতন নূতন জ্ঞান লাভ করিতে পারে,—একথাটা বহু ইয়োরোপীয় পণ্ডিত বড় স্বীকার করিতে চান না। আত্মপ্রতিষ্ঠার গৌরবের

মোহ তাঁহাদের এমনই অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে তাঁহারা মনে করেন, মানবের সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মানবজীবনের সর্ব্বোচ্চ নীতির আদর্শ ইয়োরোপীয় বুদ্ধির সম্মুখেই উন্মুক্ত হইয়াছে, এই জ্ঞান ও আদর্শ অনুসারে একমাত্র ইয়োরোপই চলিতে পারিয়াছে, আর কেহ কোথাও পারে নাই। তাই অন্যান্য দেশের সভ্যতার আলোচনা যখনই তাঁহারা করেন, তাঁহাদের দৃষ্টি থাকে আপনাদের সভ্যতার আদর্শের দিকে এবং তাহারই মাপকাটিতে সেই সব দেশের সভ্যতার মূল্য নিরূপণ তাঁহারা করেন। ইয়োরোপীয় বিদ্যার বহুল প্রচারে ও তাহার প্রভাবে যে সব জাতির বুদ্ধি যে পরিমাণে ইয়োরোপীয় বুদ্ধির অধীন হইয়াছে, অথবা তার দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে, সেই পরিমাণে সেই সব জাতির পণ্ডিতবর্গও আপনাদের সভ্যতার মূল্য নিরূপণ সেই মাপকাটিতেই করিয়া থাকেন। ইংরেজ-শাসিত ও ইংরেজী শিক্ষার শিষ্য আধুনিক ভারতবাসী আমরা অন্যান্য সকল জাতি অপেক্ষা অনেক বহু পরিমাণে এই দাসত্বের প্রভাবে আসিয়া পড়িয়াছি। তাই তাঁহাদের গুরুগিরির অধীন হইয়া তাঁহাদের দৃষ্টিতেই যে কেবল আমরা আমাদের সভ্যতার ও বিদ্যার বিচার করি তা নয়, তাঁহাদের সভ্যতার মাপকাটি ধরিয়া আমাদের সভ্যতার মূল্যনিরূপণও সর্ব্বদা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আমরা করিয়া থাকি।

সর্ব্বদাই আমরা খুঁজি, ভারতীয় ধর্ম্মনীতি, আচার নিয়ম, জীবনযাত্রার রীতি ও প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে কিসের কতখানি ইয়োরোপীয় আদর্শের সঙ্গে মিলে। যার যতটায় এই মিল দেখি, ততটাই তার প্রশংসা আমরা করি। আধুনিক ইয়োরোপীয় পণ্ডিত কেহ যাহা বলিতেছেন, ভারতীয় প্রাচীন কোনও ঋষি বা পণ্ডিতের উক্তিতে সেই কথাটারই ধ্বনি যদি পাই, আহ্লাদে আমরা নাচিয়া উঠি,—মনে করি, বাঃ! সেই পুরাণ ভারতের লোক গুলার মাথায়ও এত বুদ্ধি ছিল। একেবারে ইয়োরোপীয় বড় বড়

পণ্ডিতদের মতই সত্য বুঝিবার শক্তি তাঁহাদের জন্মিয়াছিল! কিন্তু প্রাচীন সেই ভারতীয় ঋষি ও পণ্ডিতদের বুদ্ধি যে ইঁহাদের বুদ্ধির উপরেও উঠিতে পারে, তাঁহাদের দৃষ্টি যে ইঁহাদের দৃষ্টি অপেক্ষাও অনেক অনাবিল হইতে পারে, এই কথাটা আমাদের মনে আইসেই না। তাঁহাদের সমান বা কাছাকাছি কোনও জ্ঞানের পরিচয় পাইলেও আমরা যেন কৃতকৃতার্থ হইয়া যাই। গৌরব করিয়া সকলকে তাহা দেখাই, বড় মুখ করিয়া বলি, দেখ, দেখ! প্রাচীন ভারতও কত সভ্য ছিল,—ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের কথার মত কথা ভারতীয় পণ্ডিতদের মুখেও ব্যক্ত হইয়াছিল!

ইয়োরোপীয় পণ্ডিতরা বলেন নাই এমন অনেক কথা ভারতীয় পণ্ডিতরা অবশ্য বলিয়াছেন। কিন্তু সে সব কথার তাৎপর্য্য অনেক সময় আমরা বুঝিতে পারি না। সব যেন কিম্ভূত কিমাকার আজব কল্পনা বলিয়া মনে হয়। এই সব বিষয়ে তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি যাহা দেখিয়াছে, চিন্তার ধারা যে পথে গিয়াছে, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের অন্তর্দ্দৃষ্টি যে তাহা দেখিতে পায় নাই, চিন্তার ধারা সে দিকে প্রবাহিত হয় নাই, এত বড় কথাটা কল্পনা করিতেও আমরা ভয় পাই। মনে করি, এ সব কথা বাল-সভ্যতার অস্পষ্ট আলোকে লীলায়িত ছায়া-বাজি মাত্র,—অবিকসিত বা অপরিণত মানববুদ্ধির স্বপ্ন-খেয়াল বই আর কিছু নয়।

তাই, যখন আমরা প্রমাণ করিতে যাই ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার আদর্শ কত উন্নত ছিল, যখন তার গৌরব প্রতিষ্ঠা করিতে আমরা প্রয়াস পাই, অতি আগ্রহে ইহাই প্রায় দেখাইতে চাই, ভারতের কোন্ তত্ত্ব, কোন্ পদ্ধতি, কোন্ নীতি, কোন্ আচার, কোন প্রতিষ্ঠান, কোন্ বিধি-ব্যবস্থা ইয়োরোপের আদর্শের অনুরূপ ছিল। যেন তার সঙ্গে খাপ না খাইলে, এক নীতি সূত্রে গাঁথা না হইলে, ভারতের কিছু সভ্যতার আমলে আসিতেই পারে না। যাহার মধ্যে মিল তেমন পাই না, তার একটা কৈফিয়ৎ খুঁজি। যাহা বিপরীত, তাহা একরূপ অপাংক্তেয়

বলিয়াই ত্যাগ করি। জোর করিয়া ইহা কখনও বলি না, বলিতে সাহসই বড় পাই না, ভারতের এই এই আদর্শ ইয়োরোপীয় আদর্শ হইতে ভিন্ন জাতীয় এবং ভিন্ন জাতীয় হইলেও তাহা কম উন্নত নয়, বরং অনেক স্থলে উন্নততর।

দুই একটি দৃষ্টান্ত ইহার উল্লেখ করা যাইতে পারে।—

ইয়োরোপ ধর্ম্মমতে খৃষ্টান এবং খৃষ্টানধর্ম্ম মূলতঃ প্রাচীন য়িহুদি ধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত। য়িহুদি ধর্ম্ম-গুরুদের প্রধান একটি মত ও উপদেশ এই, যে জগতের সর্ব্বময় কর্ত্তারূপে একজন মাত্র ঈশ্বর আছেন, মানবের উপাস্যও মাত্র তিনি। একাধিক দেবতায় বিশ্বাস মোহের ভ্রান্তি, এবং তাঁহাদের পূজায় সেই ঈশ্বরের অবমাননা হয়। সুতরাং ইহা মহাপাপ। যাহারা করে, কঠোর হস্তে ক্রুদ্ধ সেই ঈশ্বর তাহাদের শাসন করেন। বহু দেবে বিশ্বাসী যে সব জাতি য়িহুদিদের সন্নিকটে তখন বাস করিত, সাধারণতঃ মূর্ত্তি গড়িয়াই তাহারা তাহাদের দেবদেবী সমূহের পূজা করিত। তাই এইরূপ কোনও মূর্ত্তির উপাসনা কঠোর ব্যবস্থায় য়িহুদি ধর্ম্মগ্রন্থে নিষিদ্ধ হয়। এই সব মূর্ত্তি হইল মানুষের হাতে গড়া প্রাণহীন পুত্তলিকা (idol) মাত্র। সুতরাং ক্রমে এইরূপ মূর্ত্তিপূজাসম্বলিত ধর্ম্ম-প্রণালীমাত্রই পৌত্তলিকতা (Idolatry) নামে নিন্দনীয় হইয়া উঠিল।

পৌত্তলিকরা আবার বহু দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে ও তাহাদের পূজা করে, এই জন্য এই সব ধর্ম্মের আর একটি সাধারণ নাম হইল, Polytheism বা বহুদেববাদ। ওদিকে জগতের কর্ত্তা মানবের উপাস্য ঈশ্বর মাত্র একজন, এই তত্ত্বে অধিষ্ঠিত যে ধর্ম্মমত তাহার নাম হইল —Monotheism বা 'একেশ্বর বাদ'।

যিশুখৃষ্ট য়িহুদিকুলে অবতীর্ণ হন এবং তিনি যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহাকে য়িহুদি ধর্ম্মের একটা নূতন সংস্করণ বলিয়া ধরিয়া নেওয়াও যাইতে পারে, কারণ তত্ত্বতঃ দুই ধর্ম্মে বড় ঘনিষ্ঠ একটা সংযোগ আছে। পরবর্ত্তী কালে অন্যান্য অঞ্চলবাসী অন্যান্য জাতিসমূহের অধিকৃত জ্ঞান

ও তত্ত্ব বিদ্যার প্রভাবে খৃষ্টধর্ম্ম অনেক পরিমাণে রূপান্তরিত হইলেও য়িহুদি ধর্ম্মের সঙ্গে ইহার মূল যে নাড়ীর টান, তাহা একেবারে বিচ্ছিন্ন হইল না, হইতে পারেও না।—য়িহুদি ধর্ম্মের সেই একেশ্বরবাদের এবং প্রতিমাপূজাবর্জ্জনের নীতি খৃষ্টীয় ধর্ম্মেরও একটি মূলনীতি বলিয়া পরিগৃহীত হইল। যদিও আরও পরবর্ত্তী যুগে রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রণালীতে খৃষ্টজননী মেরীর, ঈশ্বরের অনুচর বহু Angel বা দেবপুরুষের, অন্যান্য অনেক সাধুব মূর্ত্তির এবং পাপী মানবের ত্রাণের জন্য যিশুখৃষ্টের আত্মত্যাগের প্রতীকস্বরূপ ক্রুস চিহ্নের পূজার প্রথা প্রচারিত হইয়াছিল, তবু একেশ্বরবাদের তত্ত্বই ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব বলিয়া সকলে স্বীকার করিতেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ইয়োরোপব্যাপী প্রবল ধর্ম্মসংস্কারের আন্দোলনের ফলে যে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মসমূহের উদ্ভব হয়, তাহাতে এই যে পৌত্তলিক-পঙ্কিলতা খৃষ্ট ধর্ম্মের গায়ে লাগিয়াছিল, তাহা কড়া হাতে মাজিয়া ঘসিয়া সাফ করিয়া ফেলা হয়।—সুতরাং আধুনিক পাশ্চাত্য ধর্ম্মসাহিত্যে একেবারে নিখুঁৎ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার পৌত্তলিকতা-বর্জ্জিত Monotheism বা একেশ্বরবাদের জয়জয়কারই ধ্বনিত হইতেছে। পাশ্চাত্য ধীশক্তি ও বিদ্যা এখন অতি উচ্চ বিকাশ লাভ করিয়াছে। প্রাচীন বাইবেলের এবং আদিম খৃষ্টীয় যে একেশ্বরবাদের তত্ত্ব, তাহার তুলনায় আধুনিক একেশ্বর বাদের তত্ত্বের আদর্শও অনেক উচ্চতর স্তরে উঠিয়াছে, যাহা অশ্রদ্ধেয় বলিয়া এক কথায় কেহ উড়াইয়া দিতে পারেন না।—এই একেশ্বর বাদ বা Monotheismই এক মাত্র সত্য ধর্ম্মমত, ধর্ম্ম যদি মানিতে হয় ইহাই তাহার ভিত্তি, উন্নতবুদ্ধি মানব কেহ অন্য কোনওরূপ বিশ্বাস পোষণ করিতে পারেন না, ইহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া পাশ্চাত্য বিদ্যা গ্রহণ করিয়াছে। Polytheism এবং Idolatry (বহুদেবে বিশ্বাস ও প্রতিমা পূজা) মাত্রই ভ্রান্ত মত, কুসংস্কার, সত্যালোক-বর্জ্জিত অথবা তাহা হইতে ভ্রষ্ট অনুন্নত বা অবনত জাতি সমূহের মধ্যেই মাত্র যাহার প্রভাব দেখা যায়, এই কথা সর্ব্বদাই পাশ্চাত্য সাহিত্যে আলোচিত হয়। কিন্তু

সকলের উপরে এক মহেশ্বরকে মানিলে, তাঁহার অনন্ত বিভূতিস্বরূপ, তাহা হইতে প্রকাশিত বা তাঁহারই সৃষ্ট তাঁহার সহায়ক স্বরূপ, অথবা তাঁহারই বিভিন্ন ভাবের বা শক্তির রূপক স্বরূপ, বহু দেবদেবীকে মানিলে, কেন তাহা ভুল হইবে, কেন তাহা এমন দোষের হইবে, একথা কেহ বুঝাইয়া দিতে পারেন কি ?

তারপর মূর্ত্তির কথা। এক সেই মহেশ্বরের বিভূতি স্বরূপ এই সব দেবদেবীর জ্যোতির্ম্ময় কোনও রূপ নাই, সিদ্ধযোগী কেহ এই সব রূপ দেখেন নাই, যে সব মূর্ত্তির পূজা হয় তাহা যে ইহাদের দৃষ্ট সেই সব রূপই স্থূল আকারে প্রকাশ করিবার চেষ্টা নয়, তাহাই বা কে বলিতে পারে ? অতটা বিশ্বাস কেহ নাই করুন, এই সব মূর্ত্তি যদি বিভিন্ন ঈশ্বরবিভূতির বা ভাবের মাত্র রূপককল্পনাও হয়, ভক্তিতে ও শ্রদ্ধায় তাহা অবলম্বনে সেই সেই বিভূতির মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে পূজা করিলেই বা দোষ কি ?—যাঁহারা না করিতে চান, না করিতে পারেন। কিন্তু কেহ যদি করে, করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করে, তবে আপত্তি কি থাকিতে পারে ? বস্তুতঃ কোনও যুক্তির দ্বারা ইহার ভুল বা দোষ দেখান যায় না। যাঁহারা মূর্ত্তি অবলম্বনে বহুদেবপূজক, তাঁহারা যে ব্যক্তি কি জাতি হিসাবে অমূর্ত্ত-একেশ্বরবাদী ব্যক্তি বা জাতি অপেক্ষা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে ও চরিত্রবলে হীন, ইহারও প্রমাণ কেহ দেখাইতে পারিবেন না। প্রাচীন সেই য়িহুদি জাতির বাইবেলে লেখা আছে, ঈশ্বর তাঁহার প্রিয় পয়গম্বর মুসাকে (Prophet Mosesকে) বলিতেছেন, 'তোমাদের একমাত্র উপাস্য ঈশ্বর আমি, অন্য কোনও দেবদেবীর পূজা করিও না, কোনও মূর্ত্তি গড়িয়া ভজনা করিওনা, করিলে আমি ক্রুদ্ধ হইব।' এই বচন ব্যতীত বাস্তবিক বুদ্ধির কোনও যুক্তি ইহার বিরুদ্ধে আনা যায় না। এই বচনই খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে আসিয়া সমগ্র খৃষ্টান ইয়োরোপের বুদ্ধিকে এমনই আশ্চর্য্য প্রভাবে অভিভূত করিয়াছে, যে ইহার বাহিরে, ইহা হইতে বিভিন্ন অন্য কোনও মতের মধ্যে সত্য কিছু, শিব কিছু, সুন্দর কিছু থাকিতে পারে, ইহা তাঁহারা অনুভবই করিতে পারেন না।

এই অনুভূতির এবং অনুভূতির প্রেরণায় সঙ্কীর্ণ এই য়িহুদীয় গণ্ডীর বাহিরে সত্য শিব ও সুন্দরের নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের দৃষ্টান্ত সাধারণ ইয়োরোপীয় সাহিত্যে বাস্তবিক অতি বিরল'। আজ slave mentality বা গোলামী বুদ্ধি—এই কথাটার বহুল প্রচার এদেশে হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে ইয়োরোপের বুদ্ধিকে (mentalityকে) গোলামী বুদ্ধি (slave mentality) বলিলে অত্যুক্তি কিছুই হইবে না।—পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী আমরা করিতেছি আবার সেই গোলামীরও গোলামী!

অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশে বহুদেবে বিশ্বাস ও তাঁহাদের উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। বেদে আছে; পুরাণে ও তন্ত্রে এই মতই নূতন নূতন বিচিত্র পরিণতি লাভ করিয়াছে। অথচ সেই বেদে, পুরাণে ও তন্ত্রে 'একামেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্মবাদ সকল রকম আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ও সাধনার মূল ভিত্তি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই 'একামেবাদ্বিতীয়ং' ব্রহ্মে যে বিশ্বাস, তার সঙ্গে বহু দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাসের কোনও বিরোধ নাই। কারণ এই সকল দেবতারা এক সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের বিচিত্র, সগুণ বিভূতি মাত্র—এক এক কল্পের সৃষ্টি-ব্যাপারে যাঁহারা ব্রহ্মের ইচ্ছায় আবির্ভূত হন, আবার কল্পান্তে প্রলয়কালে তাঁহাতে বিলীন হইয়া যান।

'একোঽহং বহুস্যাম্!'

শ্রুতি বলেন, সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মের ইচ্ছা এই উক্তিতেই ব্যক্ত হইয়াছিল——

'একোঽহং বহুস্যাম্—এক আমি বহু হইব!'

এক তিনি বহু হইয়াই জগৎসংসারে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। এই জগৎসংসার যতদিন আছে, এক যেমন সত্য, বহুও তেমনই সত্য। এই বহু যাঁহারা, তাঁহারাও মূলে এক তিনি, তাঁহারই সত্তায় সত্তাবান্। জলে আর জল-তরঙ্গে, সূর্য্যে আর সূর্য্যে-বিম্বে যেমন মূলতঃ একত্ব

রহিয়াছে, ব্রহ্মে ও ব্রহ্মহইতে আবির্ভূত দেবতায় সেই একত্বই রহিয়াছে। যখন তিনি কেবলই তিনি, তখন তিনি অব্যক্ত, জ্ঞানাতীত। আবার ব্যক্ত যখন হন, বহুরূপেই এই অভিব্যক্তি তাঁহার হয়। মূল এই একত্বের সত্তা অনুভব করিলেও বহু নামে বহু রূপে ঋষিরা তাঁহার কথা বলিয়াছেন ——

"একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।"

অর্থাৎ সৎ বা নিত্যবস্তু সেই এক — বহুরূপে তাঁহাকে বলা হয়। ব্রহ্মতত্ত্বই বেদের জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদের প্রতিপাদ্য। অথচ উপনিষদের সেই ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ঋষিরাও যাগযজ্ঞাদিতে ইন্দ্রাদি দেবতার আরাধনা করিতেছেন দেখা যায়। করিতেছেন, কারণ তাঁহারা জানিতেন, এই সব দেবগণ ব্রহ্মসত্তা হইতে পৃথক কেহ নন,—বিভিন্ন ভাবে,বিভিন্ন গুণে নামে ও রূপে, প্রলয়কালীন অবক্ত ব্রহ্মের সৃষ্টিতে ব্যক্তাবস্থা মাত্র। ইহাতেই যে তিনি সমগ্রতায় প্রকাশিত হইয়াছেন, আপনাকে একেবারে নিঃশেষ করিয়া এই সব দেবতার রূপ ধরিয়াছেন, তা নয়। ইহাদের মধ্যে তিনি আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছেন,—আবার ইঁহাদের উপরে, ইঁহাদের বাহিরে, আরও অনেক বড় এক অব্যক্ত তিনি রহিয়াছেন, যাঁহার কিছু সন্ধান সিদ্ধযোগিরা যদি পাইয়া থাকেন,— সাধারণতঃ 'অবাঙ্‌মনসোগোচর' বলিয়াই তিনি বর্ণিত।

যাহা হউক, যাগযজ্ঞাদির আকারে প্রাচীন বৈদিক যে দেবার্চ্চন পদ্ধতি দেখা যায়, তাহাতে সেই সব দেবতাদের কোনও প্রকার মূর্ত্তি বা প্রতিমা গড়া হইত,তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। পুরাণে এই সব দেবতাদের মূর্ত্তি বা রূপের কথা, এবং মূর্ত্তরূপ ধরিয়া তাঁহাদের বহু লীলার কাহিনীও আছে।—কেবল এই সব দেবতাদের নয়, শিব বিষ্ণু দুর্গা কালী প্রভৃতি নামে মহেশ্বর বা মহেশ্বরী স্বয়ং সেই ভগবান্ সগুণ পরব্রহ্মেরও নানা ভাবে নানা রূপ মূর্ত্তির কল্পনা ও লীলার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। তন্ত্রে আবার বিশেষ ভাবে বহু মন্ত্রাদির অবলম্বনে এই সব মূর্ত্তির পূজা

পদ্ধতি বর্ণিত আছে। পুরাণে ও তন্ত্রেই খাঁটি পৌত্তলিকতা বা Idolatryর অবতারণা হইয়াছে।

সুতরাং বৈদিক উপাসনা-পদ্ধতি না হউক, ধর্ম্মমত কতকটা সম্মানের আসন পাইলেও, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মত ও পদ্ধতি একেবারেই ইঁহাদের কাছে অপাংক্তেয় হইয়াছে। হিন্দুসভ্যতার অধঃপতনের যুগে ব্যাধিগ্রস্ত বিকৃত হিন্দুমস্তিষ্কের অশ্রাব্য প্রলাপ বলিয়াই ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যার এই পরিণতিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করেন। ইঁহাদের মতানুবর্ত্তী স্বর্গীয় মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের যে উক্তি পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা ইঁহাদের উক্তিরই পুনরুক্তি মাত্র।

বৈদিক তত্ত্ববিদ্যা বা ধর্ম্মমতকে যে তাঁহারা অবজ্ঞা করেন নাই, তাহার কারণ Monotheism বা একেশ্বরবাদ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার সঙ্গে ইহার একটা সাদৃশ্য তাঁহারা দেখিয়াছেন। বিভিন্ন দেবতার নামে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের উপাসনার কথা থাকিলেও, বৈদিক স্তোত্রকারগণের বুদ্ধি ইহাদের উপরে সত্য এক ঈশ্বরের অস্তিত্বকেও ধরিতে পারিয়াছিল—এইরূপ প্রমাণ নাকি ইঁহারা পাইয়াছেন। The religion of the Rigveda travels from Nature up to Nature's God * সংক্ষেপে এই কথায় স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় অতিগৌরবে বৈদিক ধর্ম্মপদ্ধতির একটা ব্যাখ্যা দিয়াছেন। অর্থাৎ বৈদিক ঋষিরা প্রথমে সূর্য্যাগ্নিবায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে দেবতাবোধে উপাসনা করিতেন। ক্রমে বুদ্ধির আরও পরিণতির সঙ্গে সমগ্র প্রকৃতির অধিদেবতা এক ঈশ্বর যিনি, তাঁহার কথাও

---

* "We now see the force of the remark that the religion of the Rigveda travels up from Nature up to Nature's God. The worshipper appreciates the glorious phenomena of nature and rises from these phenomena to grasp the mysteries of creation and its great Creator." (Civilisation in Ancient India—১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৯৭ পৃষ্ঠা)

বুঝিতে পারেন। ইহা monotheism বা একেশ্বরবাদ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? এই পুস্তকের এই অধ্যায়ে ৭৫ পৃষ্ঠায় তাঁহার আর একটি উক্তি এই—The landmark between Nature-worship and Monotheism has been passed and the great Rishis of the Rigveda have passed from Nature up to Nature's God। অর্থাৎ একেবারে আদিম অবস্থায় Polytheistic বা বহুদেববাদের খুঁৎ কিছু থাকিলেও, শেষে আসল Monotheism বা একেশ্বরবাদে তাঁহারা পৌঁছিয়াছিলেন। সুতরাং প্রাচীন সেই স্তোত্রকারগণের জয়জয়কার করিতে হইবে যে ভারতে সেই যুগেও এত দূর উপরে তাঁহারা উঠিতে পারিয়াছিলেন।

কিন্তু এই Monotheism বা একেশ্বরবাদ বলিতে অধ্যাত্ম বিভার যে ভাবটা বুঝায়,বৈদিক ঋষিদের ব্রহ্মতত্ত্বের সঙ্গে তার যে মূলতঃ একটা প্রভেদ আছে, এই কথাটা অনেক সময় আমরা মনে করি না।

Mono এক এবং *Theos* ঈশ্বর—গ্রীক এই দুইটি কথা হইতে Monotheism কথাটির ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। ইহার অর্থ, একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাসমূলক ধর্ম্ম। প্রাচীনকালের প্রায় সকল জাতির ইতিবৃত্তেই দেখা যায়, তাহারা বহু দেবদেবীর পূজা করিত, ইহাদের সব ধর্ম্মের এক সাধারণ নাম দেওয়া হয় Polytheism বা বহুদেববাদ। কারণ Mono বলিতে যেমন এক বুঝায়, Poly বলিতে তেমনই বহু বুঝায়। বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস না করিয়া সত্য বলিয়া একমাত্র ঈশ্বরকে যাঁহারা মানেন এবং তাঁহারই উপাসনা করেন, তাঁহাদের ধর্ম্মকে ঐ Polythiesm বা বহুদেববাদমূলক ধর্ম্ম হইতে বিশিষ্ট করিবার জন্যই Monotheism বা 'একেশ্বরবাদ' নামটি ব্যবহার করা হয়। সুতরাং এই দুইটি নাম পরস্পর বিরোধী ভাবের দ্যোতক। একটির সঙ্গে আর একটির সামঞ্জস্য রাখা চলে না। এই একেশ্বরবাদের মতে ঈশ্বর যে কেবল একজন মাত্র তা নয়, সেই একজন আবার এই বিশ্বজগৎ হইতে স্বতন্ত্র পৃথক্

একজন, এবং এই বিশ্বজগতের অতীত কোনও জ্যোতির্ম্ময় লোকে বাস করেন। তাঁহার বাহিরে সম্ভবতঃ তাহা হইতে পৃথক্ অতি বৃহৎ এক একাকার অন্ধকার জড়াণুসমুদ্র (chaos) ছিল।—তাহা হইতেই এই বিশ্বজগৎকে (cosmosকে) তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন, অবশ্য তাঁহার ইচ্ছার প্রেরণায়। এবং গড়িয়া তুলিয়া তাহার উপরে তিনি প্রভুত্ব করিতেছেন। তত্ত্ববিদ্যায় ইহাকে সাধারণতঃ Creation Theory বলে এবং এই মতে স্রষ্টা ঈশ্বর সৃষ্ট এই জগৎ হইতে পৃথক্ সত্ত্ববান্ কেহ। অবশ্য একেশ্বরবাদে স্রষ্টা ঈশ্বরকে সৃষ্ট এই জগৎ হইতে পৃথক বলিয়া ধরিয়া নিতেই হইবে, এমন কোনও কথা নাই। তবে যে ভাবে ও যে প্রসঙ্গে একেশ্বরবাদ-তত্ত্ব সাধারণতঃ ব্যখ্যাত ও আলোচিত হয়, তাহাতে এইরূপ একটা বিশিষ্ট অর্থই ইহার দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

'Creation' কথাটাকে সাধারণতঃ আমরা 'সৃষ্টি' এই কথার দ্বারা অনূদিত করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের তত্ত্ববিদ্যায় সৃষ্টি বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা ঠিক এইরূপ creation নয়। পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে আর একটি কথাও ব্যবহৃত হয়। সেটি হইতেছে Emanation বা অভিব্যক্তি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে এই বিশ্বজগৎ বাহিরের পৃথক্ কোনও উপাদান হইতে ঈশ্বর গড়েন নাই, তাঁহারই মধ্যে তাহা হইতেই অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত হইয়াছে। আপনাকেই তিনি এই জগৎরূপে অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত করিয়াছেন,—সুতরাং এই জগৎসত্ত্ব ঈশ্বরসত্ত্ব হইতে অভিন্ন বস্তু। যাহা কিছু দেখা যায় বা যাইতে পারে, সমগ্রতায় সব তাঁহারই রূপ। তাই বিশ্বরূপ, জগন্মূর্ত্তি এই সব নামেও তিনি অভিহিত হইয়াছেন। কেবল বাহিরের রূপ নয়, রূপের অন্তর্গত যে প্রাণ, যে শক্তি, যাহা এই রূপকে ধরিয়া রাখিয়াছে, যাহাতে এই রূপ আশ্রিত হইয়া আছে, তাহাও তিনি। তাই তিনি বিশ্বপ্রাণ, জগদাশ্রয়, জগদাধার। আবার এই বিশ্বজগতের অধিপতি প্রভুও তিনি, তাই তিনি বিশ্বেশ্বর, জগদীশ্বর।

'সৃষ্টি' বলিতে আমাদের দেশের তত্ত্ববিদ্যায় জগৎরূপে ঈশ্বরসত্ত্বের এই প্রকাশ বা অভিব্যক্তিকেই বুঝায়। স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্ট জগতের সম্বন্ধও এই সম্বন্ধ।

"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি যয়া সর্ব্বমিদং ততম্।"

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যের কেবল এই একটি চরণে এই তত্ত্বের সকল কথা অতি পরিস্ফুট ভাবেই উক্ত হইয়াছে। এসম্বন্ধে অধিক আলোচনাও নিষ্প্রয়োজন। ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যার কিছু আলোচনাও যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারা এই সত্যটা উপলব্ধি করিবেন। এই বিশ্বজগতের নির্বিশেষ মূল কারণকে এদেশের তত্ত্ববিদ্‌গণ ক্লীবলিঙ্গাত্মক 'ব্রহ্ম' এই নামে ব্যক্ত করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। 'অবাঙ্‌মনসোগোচর' নির্বিশেষ সেই নির্গুণ ব্রহ্ম 'তৎ' বা 'তাহা'—'সঃ' বা 'তিনি' নন। এই 'তৎ' বা 'তাহা' আছেন, তাই ইহার সঙ্গে 'সৎ' এই শব্দটিও যুক্ত হইয়া 'ওঁ তৎ সৎ' এই ব্রহ্মসূত্র হইয়াছে। এই ব্রহ্ম 'একম' ও 'অদ্বিতীয়ম্'। এখানেও ক্লীবলিঙ্গ, পুংলিঙ্গাত্মক 'একঃ' এবং 'অদ্বিতীয়ঃ' শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। নির্গুণ ও নির্বিশেষ বলিয়াই পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গের পরিবর্ত্তে ক্লীবলিঙ্গের এই নাম ব্রহ্মবিদ্‌গণ ব্যবহার করিয়াছেন। 'ঈশ্বর' শব্দ এরূপ প্রসঙ্গে কখনও দেখা যায় না। কারণ ঈশ্বর বলিলেই তাহার মধ্যে 'প্রভুত্বে'র 'অভিমান' আসিয়া পড়ে। নির্গুণ এই ব্রহ্ম সিসৃক্ষায় যখন 'সগুণ' হইলেন, তখনই তিনি হইলেন 'ঈশ্বর'। পুংলিঙ্গাত্মক সঃ, একঃ, এই সব শব্দের ব্যবহার তাঁহার বর্ণনায় তখনই দেখা যায়। তখনই—

'একোঽহং বহুস্যাম্'—'এক আমি বহু হইব!'

—এই বাণী শ্রুত হয়।—

বস্তুতঃ আদি সেই একের যে বহুত্বে বহুভাবে বহুরূপে প্রকাশ, তাহাই হইল অভিব্যক্তি বা Emanation, আমাদের দেশের তত্ত্ব-বিদ্যায় যাহাকে 'সৃষ্টি' বলে। একের এই যে বহু হওয়া, তাহা বহু দেবতা

রূপেও অবির্ভাব বটে। কেনই বা না হইবে? এই জগদ্ব্যাপারের উচ্চতর ও বৃহত্তর কর্ম্ম সমূহ এক সেই মহেশ্বর বিধাতার ইচ্ছায় ও বিধানে ইঁহারই করিতেছেন, অথবা তিনিই এই সব রূপ ধরিয়া করিতেছেন। সূক্ষ্ম যুক্তি তর্কের দ্বারা এই সত্য প্রতিপন্ন করিতে আমি যাইব না। কারণ ভারতীয় আর্য্য ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা আমার এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। প্রসঙ্গক্রমে মাত্র এই কথাটা তুলিতে হইল। ঠিক এইভাবে এই তত্ত্বটা সকলে বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, কিছু আসে যায় না। এক তিনি এক রূপেই সব করিতেছেন, ইহা যদি কেহ বিশ্বাস করিতে চান তাই করুন। আমার বক্তব্য এই, যে যাঁহারা এই মত গ্রহণ করিয়াছেন, সত্য বলিয়া এই মতানুসারে যাঁহারা চলেন, অপর মতাবলম্বী কেহ তাঁহাদের ভ্রান্ত বলিয়া নিন্দা করিতে পারেন না। মহাপাপ তাঁহারা করিতেছেন, একথা ত কোনও মতে কোনও যুক্তি দ্বারাই বলা চলে না।

মোট কথা, ভারতীয় আর্য্যধর্ম্মের মূল যে ব্রহ্মবাদ, তাহার সঙ্গে বহুদেবতায় বিশ্বাস, এবং এই সব দেবগণের সাকার উপাসনা প্রভৃতি যে অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহার কোনও বিরোধ নাই। এককে মানিয়া এই বহুকেও মানা যায়। Monotheism বা একেশ্বরবাদ বলিলে যেরূপ ধর্ম্মমতকে বুঝায়,ভারতীয় আর্য্য ধর্ম্ম সেরূপ Monotheism বা একেশ্বরবাদ নহে। ইহারা Polytheism বলিতে যাহা বোঝেন, ভারতীয় আর্য্যধর্ম্ম তাহাও নহে,—অথবা Polytheismএর তত্ত্বই পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ ঠিক ধরিতে পারেন নাই। Pantheism নামেও একরূপ ধর্ম্মমতকে তাঁহারা বিশিষ্ট করিয়াছেন। সবই ঈশ্বর, ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নাই—ইহাই Pantheism কথার তাৎপর্য্য। তাই এদেশের ভাষায় 'বিশ্বব্রহ্মবাদ' এই নামে বোধ হয় Pantheism কথাটা প্রকাশ করা যাইতে পারে। ইহারা Pantheism কথার যেরূপ ব্যাখ্যা করেন, ভারতীয় আর্য্যধর্ম্ম ঠিক সেরূপ না হইতে পারে। তবে মোটের উপর এই কথাটির দ্বারা এই ধর্ম্মমতকে বিশিষ্ট করা যাইতে পারে। এই

Pantheism বা বিশ্বব্রহ্মবাদের সঙ্গে Polytheism বা বহুদেববাদ বেশ মিল রাখিয়া চলিতে পারে এবং চলিতেছেও বটে। Polytheism বলিয়া যে সব প্রাচীন ধর্ম্মের বহুনিন্দা পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ করিয়াছেন, সে সব ধর্ম্মও এইরূপ Pantheismএর সঙ্গেই মিলান, তাহারই অঙ্গায়, একথাও যে না বলা যাইতে পারে তাহা নয়।

আমাদের ধর্ম্মে এই দুইটি ভাব এমনই ভাবে পরস্পরের সঙ্গে অনুস্যূত, যে অতি অজ্ঞ গ্রাম্য নরনারীরাও সর্ব্বদা বলিয়া থাকে, কালী, দুর্গা, শিব, নারায়ণ, ব্রহ্মা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মনসা, শীতলা — ও সব তাঁরা এক, কেবল নামে নামে আলাদা। বহু দেবদেবীর পূজাপরায়ণ হইয়াও, 'পরমেশ্বর' 'বিধাতা' 'ভগবান্,' এই নামগুলি সকলেই সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকে। বহুর সঙ্গে একের এই যে সমতা বা সামঞ্জস্য, এই সত্যের অনুভূতি ব্যতীত ইহা হইতে পারে না।

'পৌত্তলিকতা' বা 'পুতুলপূজা' এই যে নাম আমাদের সাধন-পদ্ধতিকে দেওয়া হয়, ইহাতে আমাদের যথেষ্ট আপত্তির কারণ আছে। কিন্তু আমরা বহু দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি এবং সাকার ভাবে বা মূর্ত্তি গড়িয়া তাঁহাদের উপাসনা করি, এই কথা বলিলে আপত্তির ত কোনও কারণ নাই-ই,—উচ্চমুখ করিয়াই বরং বলিতে পারি, হাঁ, আমরা তাই-ই করি বটে। কেন করিব না? তোমরা যাকে Monotheism বা 'একেশ্বরবাদ' বল যে ব্যাখ্যা তাহার দেও, তাহা অপেক্ষা আমাদের এই ধর্ম্ম হীন নহে। তোমাদের নিন্দা আমরা করি না। তোমরা যদি এই বিশ্বাসই ভাল বোঝ, বেশ তাই তোমাদের থাক্। আমাদের এই বিশ্বাসই আমরা ভাল বুঝিয়াছি, ইহাই আমাদের ভাল লাগে, কেন আমাদের এই ভালতে নির্ব্বিরোধে থাকিতে দেও না? তোমরা বাহ্যিক স্তবস্তুতি, গীতি ও প্রার্থনার সাহায্যে অমূর্ত্ত এক ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া পরিতৃপ্ত হও, বেশ তাই হও। আমরা তা ছাড়া ধ্যানে ধারণায় মন্ত্রে ও বিবিধ মানস ও বাহ্য স্থূল উপচার দানে আমাদের দেবতার উপাসনা করি এবং তাহাতেই পরিতৃপ্ত হই, জীবন ধন্য

হইল অনুভব করি। কেন হইব না? কেন করিব না? আমাদের এই উপাসনা পদ্ধতি তোমাদের ঐ উপাসনা পদ্ধতি হইতে নিকৃষ্ট কিছু? আধ্যাত্মিক চরিত্রের উৎকর্ষে ঐ উপাসনা পদ্ধতির ফলে তোমরা আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা কিছু দেখাইতে পারিয়াছ? যদি পারিয়া থাক, আমাদের পদ্ধতি নিকৃষ্ট যদি হয়, বেশ, প্রমাণ ও যুক্তি দিয়া দেখাও, বুঝাও, শির নত করিয়া মানিয়া নিব। কিন্তু তাহা ত পার না। কেবল, তোমাদের অমূর্ত্ত একেশ্বরবাদই একমাত্র সত্যধর্ম্ম, উন্নত মানবের উপযুক্ত ধর্ম্ম, তোমাদের ঐ উপাসনা পদ্ধতিই একমাত্র উত্তমপদ্ধতি, ইহা একেবারে একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়াই ধরিয়া নিয়াছ, আর তার সঙ্গে যাহা মিলেনা, তাহাকেই ভ্রান্তি, কুসংস্কার, ধর্ম্মের জঞ্জাল বলিয়া নিন্দা করিতেছ। হাঁ, অনুষ্ঠানবহুল উপাসনা পদ্ধতি যাঁহারা অনুসরণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক স্থলে দেখা যায়, উপাসনার আসল প্রাণ অপেক্ষা বাহ্য অনুষ্ঠানই বড় হইয়া উঠে। একদিকে ইহা যেমন সত্য, অপর দিকে ইহাও তেমনই সত্য, নিয়মবাঁধা অনুষ্ঠান যেমন মানুষকে তাহার সাধনার পথে স্থির রাখিতে পারে, অনুষ্ঠানের অভাব তেমন পারে না। আর ইহা পদ্ধতিরও দোষ নয়। দোষ সেই সব মানুষের, যাহারা সেই পদ্ধতির উপযুক্ত ব্যবহারে অনুষ্ঠানকে সাধনায় সার্থক করিয়া তুলিতে পারে না। তারপর অনুষ্ঠানকে বাস্তবিক একেবারে কোনও পদ্ধতিই বর্জ্জন করে নাই। কোনও না কোনও রকম অনুষ্ঠান সকল উপাসনাপদ্ধতিতেই আছে। কোথাও বেশী, কোথাও কম—কোথাও এক রকম, কোথাও অন্য রকম। মুসলমানের রোজা নেমাজ আছে, বলি আছে। প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানেরও গির্জ্জায় সাপ্তাহিক ভজনা, ধর্ম্মবিহিত সামাজিক অনুষ্ঠানাদি, একটা বাঁধা নিয়মে হয়। আমাদের দেশের ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী যাঁহারা তাঁহাদের উপাসনাদিরও একটা অনুষ্ঠান পদ্ধতি আছে, যাহা অনেকটা প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টীয় উপাসনাপদ্ধতির অনুরূপ। যাহা হউক, অনুষ্ঠান পদ্ধতি যেখানে যেরূপই হউক, উপাসনার আসল যে প্রাণপরায়ণতা, অতি অল্প

লোকের মধ্যেই তাহা দেখা যায়। অধিকাংশ লোকই অনুষ্ঠান মাত্রটুকু সম্পন্ন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। বরং যে পদ্ধতিতে আনুষ্ঠানিক অঙ্গ যত কম, উপাসনার দিকে আকর্ষণই সেখানে লোকের তত ক্ষীণ, তত শিথিল। ধর্ম্মে নিষ্ঠাও যেন তেমন দৃঢ় একটা আশ্রয়ের ভিত্তি না পাইয়া এবং পুষ্টিকর রসের অভাবে ঊষর ক্ষেত্রে শস্যের ন্যায় শুষ্ক ও মৃতবৎ হইয়া উঠে।

'একমেবাদ্বিতীয়ম্'কে মানিয়া ব্রহ্মবাদী হইয়াও হিন্দু বহুদেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে,—সাকারভাবে ইহাদের উপাসনা করে, মূর্ত্তি গড়িয়াও পূজা করে।* অতি উচ্চতম ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ সাধক ব্যতীত সাধারণ হিন্দুর উপাসনাপদ্ধতিও অনুষ্ঠানবহুল। কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দুর ধর্ম্ম অন্য কোন ধর্ম্ম হইতে নিকৃষ্ট নহে, তার উপাসনা পদ্ধতিও অন্য কোন পদ্ধতি হইতে হীনতর নহে। কোনও প্রমাণে ও যুক্তির বিচারে ইহা কেহ দেখাইতে পারিবেন না। বিচারে বরং ইহার উৎকর্ষই প্রমাণিত হইবে। তাহা নাই হউক, অন্ততঃ আমার ধর্ম্মমত ও সাধনপদ্ধতি এইরূপ, বড়মুখে হিন্দু একথা স্বীকার করিতে পারেন, তাহাতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইবার কোনও কারণ নাই।

কিন্তু লজ্জিত ও কুণ্ঠিত আমরা হই। পাশ্চাত্য শিক্ষা দাক্ষার প্রভাব চিত্তকে আমাদের এমনই বশ করিয়া ফেলিয়াছে যে

* সাকার উপাসনা ও মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা এই দুইটি কথার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। বৈদিক সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ সসীম ও সাকার। বৈদিক যাগযজ্ঞাদিতে এই ভাবেই তাঁহাদের উপাসনা হয়। মানবাকার কোনও মূর্ত্তির কল্পনা বা মৃৎপ্রস্তরাদির দ্বারা তাহা গড়িয়া নিবার কোনও প্রথা তখন ছিল বলিয়া মনে হয় না। পুরাণে ও তন্ত্রে স্পষ্ট ইঁহাদের মূর্ত্তির কল্পনা হইয়াছে, এবং তখনকার পদ্ধতিতেই এই সব মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করার প্রথাও দেখা যায়। গড়া মূর্ত্তির পূজা একরূপ সাকার উপাসনাই বটে, কিন্তু এইরূপ মূর্ত্তি ব্যতীতও সাকার উপাসনা হইতে পারে।

Monotheism বা 'একেশ্বরবাদকে'ই আমরা ধর্মতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ পরিণতি বলিয়া মনে করি এবং সর্ব্বদা ইহাই প্রমাণ করিতে ব্যগ্র হই যে হিন্দু ধর্ম্মেরও মূলে এই Monotheism বা একেশ্বরবাদের কথাই রহিয়াছে। যতটা তাহা পারি, গৌরব অনুভব করি। যেখানে না পারি, একটি কৈফিয়ৎ তার খুঁজি। কখনও বলি, বহু দেবতায় বিশ্বাস ও সাকার উপাসনা প্রভৃতি অজ্ঞান কতক আদিম অপরিণত অবস্থায়, কতক বা উন্নতির পক্ষে অবক্ষয় পতনের যুগে, আমাদের ধর্ম্মের মধ্যে আসিয়া জুটিয়াছে। কখনও বলি, ওসব হইতেছে আসল উচ্চতম একেশ্বরবাদে উঠিবার পথে নিম্নতম সোপান মাত্র। আবার কখনও বা নানারকম ব্যাখ্যা দিয়া বুঝাইতে প্রয়াস পাই, ওসব আসলে একেশ্বরতত্ত্বেরই কথা, তাঁহারই ভজনা,—কেবল সহজ করিবার জন্য রূপকচ্ছলে নানা নামের ও মূর্ত্তির কল্পনা হইয়াছে, এবং সহজে সাধারণ লোকে যাহাতে ধরিতে পারে, তাহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাহারই জন্য এইরূপ সব পূজা অর্চ্চনার বিধি করা হইয়াছে। ছেলে ভুলাইতে যেমন খেলনা মোদক প্রভৃতির প্রয়োজন হয়, এসবও সেইরকম আর কি।

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পনা"—এই একটি কথা অনেকেই ইহারা আপনাদের কৈফিয়তের প্রসঙ্গে ব্যবহার করিয়া থাকেন। সাধকের হিতের জন্য অর্থাৎ সাধক যাহাতে সহজে ধরিতে পারেন, সাধনার পথে অগ্রসর হইতে পারেন, তাই ব্রহ্মের নানা রকম রূপের কল্পনা করা হইয়াছে, এই ব্যাখা ইহার করা হয়। এস্থলে এই 'কল্পনা' কথাটাকে ইংরেজি imagination বা fancy কথাটার মত, যাহা বাস্তবিক নাই মনে মনে তাই গড়িয়া নেওয়া, যাহাতে যাহা নাই তাহাতে তাহা আরোপ করা, এই অর্থেই গ্রহণ করা হইয়াছে। আর এই কল্পনা করিয়াছেন, সাধকদের হিতার্থী গুরু বা শিক্ষক যাঁহারা। কিন্তু কল্পনা এই কথাটার আরও অনেক উচ্চতর একটা অর্থ আছে। সেটি হইতেছে চিন্তার বা মনের সংকল্প দ্বারা বাস্তব কিছুর সৃষ্টি করা—ইংরেজিতে thought-image দ্বারা যাহাকে বলে। ঐ শ্লোকের

'ব্রহ্মণঃ' কথাটার কর্তৃবাচ্যে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে। সুতরাং রূপকল্পনার কর্ত্তা স্বয়ং ব্রহ্ম। অর্থাৎ তিনিই তাঁহার কল্পনা দ্বারা আপনাকে রূপে রূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। যে রূপে যে সাধক হিতলাভ করিবেন, সেইরূপেই তিনি তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়াছেন। এই বিশ্বজগৎ তাঁহার সিসৃক্ষামূলক কল্পনা বা সংকল্প হইতে প্রসূত। সিসৃক্ষু হইয়া তিনি কল্পনা করিলেন, 'একোঽহং বহুস্যাম্ প্রজায়েয়,' অমনই বহুবিধ শক্তিতে আশ্রিত ও পরিচালিত অশেষ বৈচিত্র্যময় এই বিশ্বের অভিব্যক্তি আরম্ভ হইল, যাহার ক্রিয়া সেই সৃষ্টের আদি হইতে আজও পর্য্যন্ত চলিতেছে, আরও বহু বহু যুগ ধরিয়া চলিবে। 'Let there be light and there was light'—বাইবেলের প্রারম্ভে সৃষ্টির আদিতে এই যে ভগবদ্‌বাণীর কথা আছে, তাহা বড় একটি সত্য। আমাদের শব্দ-ব্রহ্মের তত্ত্বও ইহার মধ্যে রহিয়াছে। সকল প্রাচীন দেশের ঋষিরাই এই সত্য উপলব্ধি করিয়া নানা ভাবে তাহাব বর্ণনা করিয়াছেন। সাধকবর্গের হিতার্থে ব্রহ্মের এই রূপ-কল্পনার কথা তন্ত্রশাস্ত্রে আছে, এবং তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মের তাৎপর্য্য যাহা তাহাতে ইহার এই ব্যাখ্যাই ঠিক ব্যাখ্যা বলিতে হইবে। তখনও এমন দিন দেশে আইসে নাই, যে তান্ত্রিকধর্ম্মের উপদেষ্টা গুরুরা এইরূপ একটা কৈফিয়ৎ ধরিয়া বুঝাইতে চাহিবেন, কেন তাঁহারা এমন একটা কল্পনা করিয়া Monotheism বা একেশ্বর-বাদের উচ্চ আদর্শ হইতে এতখানি নামিয়া আসিয়াছেন।

কেবল মৌখিক আলোচনায় নয়, বাস্তব আচরণেও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের এইরূপ মানসিক দাসত্বের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকে এমন আছেন, মনে মনে উপাস্য দেবদেবীগণকে ভক্তি বা ভয় করেন, এই পদ্ধতি অনুসারে পূজা অর্চ্চনাও করেন বা করান। কিন্তু শিক্ষিত ও পরিমার্জ্জিত সমাজের বন্ধুরা পাছে তাহা জানিতে পারেন, কিছু দেখিয়া ফেলেন, তার জন্য সতর্কভাবে ঢাকিয়া চাপিয়াও চলেন। কালীবাড়ী, শিবমন্দির ও শীতলা বাড়ী পথে পড়িলে প্রণাম করেন,

কিন্তু চোরের মত এদিক ওদিক একবার চাহিয়াও দেখেন, পাছে ধরা পড়েন, কেহ দেখিয়া ফেলে। অনেক শিক্ষিত (?) ব্রাহ্মণ দেখিয়াছি টিকি রাখেন, কিন্তু সে ছোট একটুখানি এবং সুসভ্য (?) সমাজে যাইবার সময় সাবধানে আঁচড়াইয়া তাহা চুলের মধ্যে মিশাইয়া দেন। এমনও অনেকে আছেন যাঁহারা নিজ নিজ কুলের ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত হন, ঘরে সন্ধ্যা আহ্নিক জপতপও কিছু করেন,—কিন্তু কেহ জিজ্ঞাসা করিলে লজ্জিত হন এবং 'হাঁ, তা করা যায় একটু—ও সব কিছু নয়—। তবে কিনা,'—ইত্যাদি নানা কথায় কৈফিয়ৎ দিয়া যেন ত্রুটিস্খালনের চেষ্টা করেন। সাহস করিয়া নির্ভীকভাবে গৌরবে মুখ তুলিয়া এমন কথা আধুনিক শিক্ষিত সমাজের খুব কম লোকই বলিয়া থাকেন, বলিতে পারেন, হাঁ, ইহাই আমার ধর্ম্ম,—আমার দেশের, আমার সমাজের, আমার কুলের ধর্ম্ম। আমরা ব্রহ্মবাদী, কিন্তু সেই ব্রহ্মই নানা রূপে ও নামে বিশ্বসৃষ্টিতে আপনাকে প্রকাশ করিয়া আমাদের উপাস্য হইয়াছেন। তাঁহারই শক্তি নানা ভাবে নানারূপ ধরিয়া নানা লীলা এই বিশ্বে প্রকট করিয়াছেন, এবং তাঁহাদেরই মূর্ত্তি গড়িয়া আমরা পূজা করি। এই সব দেবতাদের তত্ত্ব বুঝিতে, চিত্তে তাঁহাদের রহস্য ধরিতে, তাঁহাদের নিকট পৌঁছিতে এবং পরিণামে—এই এক জন্মে না হউক, বহুজন্মের সাধনায় আধ্যাত্মিক উৎকর্ষলাভের ফলে—তাঁহাদেরই মধ্য দিয়া মূল সেই এক ব্রহ্মে গিয়া উপনীত হইতে, আমাদের এই উপাসনাপদ্ধতি অতি শ্রেষ্ঠ একটা পদ্ধতি। যুগে যুগে আমাদের সভ্যতার পরিণতির সঙ্গে, আমাদের চিন্তার ও ধর্ম্মজীবনের নূতন নূতন বিকাশের সঙ্গে, আমাদের তত্ত্ববিদ্যা ও সাধন প্রণালীও নূতন নূতন পরিণতি লাভ করিয়াছে, নূতন নূতন শাখা প্রশাখায় তার বিকাশ ঘটিয়াছে।

তবে হাওয়া এখন ফিরিতেছে বলিয়া মনে হয়। হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্বের স্বরূপ এবং সেই স্বরূপের মাহাত্ম্য যে কি, তার দিকে আধুনিক শিক্ষা-প্রাপ্ত হিন্দু সন্তান এবং বহু পাশ্চাত্য তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরও শ্রদ্ধার দৃষ্টি

আকৃষ্ট হইতেছে। ইয়োরোপে এবং বিশেষভাবে আমেরিকায় হিন্দুর বেদান্ত, সাংখ্য ও যোগদর্শনের তত্ত্বসকল বহুল ভাবে প্রচারিত হইতেছে, এবং অনেক চিন্তাশীল পাশ্চাত্য সুধী ইহার মহিমায় মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়া ইহার আলোচনায় মনোনিবেশ করিতেছেন। হিন্দুসাধকের সিদ্ধিই যে আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের গূঢ়রহস্য ভেদ করিয়াছে, তার উচ্চতম সত্যে গিয়া পৌঁছিয়াছে, এবং বহু কারণে অধুনা যতই তাহা আগাছাকুগাছায় ভরিয়া উঠুক, ভারতের হিন্দুসন্তান এখনও যে সেইসব সিদ্ধগুরুদের উপদিষ্ট সাধনপথেরই পথিক, এই সত্য ভারতবাসী ও বিদেশী সকলেই একদিন স্বীকার করিবেন, এবং সে দিন যে অতিদূরে তাহাও মনে হয় না। এই দিন যত নিকটে আসিবে, যত এই সশ্রদ্ধজ্ঞানের আলোকরশ্মি এই পথে আসিয়া পড়িবে, এই সব অগাছা কুগাছার জঙ্গল ততই দূর হইবে এবং পথের সত্য, শিব ও সুন্দরের মহিমা ও মাধুরী যে কি, সকলে দেখিবে। হাঁ, দেখিবে! যাহারা দেখিবে, বাহির হইতে, দূর হইতে দেখিয়া কেবল দর্শক বা সমালোচকের ন্যায় ইহার গুণের কথা বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে না, জীবনের শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া অনুভব করিবে। কেবল হিন্দু-সন্তান নয়, প্রতীচ্যে কি প্রাচ্যে বাহিরের আরও বহু মানবসন্তান, পার্থিবভোগসর্ব্বস্ব, নিয়ত সেই ভোগ্য আহরণে লোলুপ, বর্ত্তমান জগৎ যে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার নির্ম্মম সংগ্রামে, দারুণ অশান্তির পাপে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, ধ্বংসের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, তাহা হইতে নিষ্কৃতির উপায় বলিয়া এই পথই আগ্রহে ধরিতে চাহিবে।

প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুসভ্যতার বড় আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে, হিন্দুসমাজের অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তির প্রকৃতি ও পরিণতিও পাশ্চাত্যসমাজের অভিব্যক্তির প্রকৃতি ও পরিণতি হইতে পৃথক রকম। পাশ্চাত্য সমাজ যে আদর্শ ধরিয়া যে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহাকেই স্বভাবতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিবেন। হিন্দুসমাজের আদর্শ ও লক্ষ্য তাহা হইতে

পৃথক্ কেবল নয়, বিপরীত বলিয়াই মনে হইবে। হিন্দুর সমাজ-জীবনের এই পরিণতিকে তাই তাঁহারা ক্রমিক অধোগতি বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন এবং তাঁহাদের মতে ইহাই হিন্দুসভ্যতার অবনতির এবং হিন্দুশক্তির পতনের নিদান। তাঁহাদের শিষ্যত্বের বুদ্ধিতে আমরাও তাই বলি।

অথচ ইহাও আমরা দেখিতে পাইতেছি, হিন্দুসমাজ নামে বিশাল এক মানবসমষ্টি অশেষ বৈচিত্র ও বৈষম্য বুকে ধরিয়া, যুগে যুগে বহু পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া মূল এক প্রকৃতির কতকগুলি লক্ষণসহ আজও পর্য্যন্ত ভারতে জীবিত রহিয়াছে। ইহার অশেষ ত্রুটি দেখান হইয়াছে ও হইতেছে। বহু আঘাত ইহার অঙ্গে পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। আভ্যন্তরিক ও বহিরাগত বহু বিরোধী শক্তি ইহাকে বিধ্বস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। কিন্তু হিন্দুসমাজ কল্পকল্পান্তজীবী বিরাট্ এক অক্ষয়বটের ন্যায় চারিদিকে তার শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া, ভারত-ভূমির অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত তার অনন্ত অসংখ্য মূল দৃঢ় প্রোথিত করিয়া, অটলভাবে দাঁড়াইয়া আছে! প্রতিকূল প্রভাবের প্রবাহ তার অঙ্গে কখনও আসিয়া আঘাত করে নাই, একথা বলি না। কিন্তু ইহাকে অভিভূত, বিধ্বস্ত বা বিনষ্ট কিছুতেই করিতে পারে নাই। যাহা ঠেলিয়া ফেলা সম্ভব নয়,তাহা সে আপনার মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে, আপনার অঙ্গভুক্ত করিয়া নিয়াছে। অঙ্গের রূপ ইহাতে মধ্যে মধ্যে কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। রূপের সঙ্গে স্বভাবের গুণও কিছু এদিক ওদিক হইয়াছে, কিন্তু মোটের উপর সে তার আপন বিশিষ্ট অস্তিত্ব, বিশিষ্ট রূপ, বিশিষ্ট জীবন, রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

বর্ত্তমান যুগেও বড় প্রবল কতকগুলি প্রতিকূল প্রভাব ইহার উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। এই সব প্রভাবও একেবারে সে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারিতেছে না। ইহাতেও তাহার রূপে ও গুণে পরি-বর্ত্তন একটা হইতেছে ও হইবে। কিন্তু হিন্দুসমাজ তার বিশিষ্টতা হারাইয়া মানব মহাসমুদ্রে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তার বিশিষ্ট

জীবনের কোনও লক্ষণ আর খুঁজিয়া কোথাও কেহ পাইবে না, এরূপ সম্ভাবনা কিছু দেখা যাইতেছে না।

ইহা প্রবল জীবনের লক্ষণ,—অতি গভীর, অতি ব্যাপক একটা জীবনী শক্তির পরিচয়। দুদিনের নয়, দুই চারি শতাব্দীর নয়, সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া বহু যুগযুগান্তরের অশেষ রকম প্রতিকূলতার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া অতি প্রবল এই সুদীর্ঘ জীবনের অপূর্ব্ব এই সর্ব্বংসহ শক্তির পরিচয় ঐতিহাসিকগণ পাইয়াছেন, আমারাও তেমন দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখলে পাইব।

কোন্ ধর্ম্মে এই সমাজ আশ্রিত, কি নীতির অনুসরণে কোন্ লক্ষ্যের অভিমুখে ইহার জীবন পরিচালিত হইতেছে, কোথা হইতে কালোপযোগী পরিণতির শক্তি সে পাইতেছে, ইহার এই অমরপ্রায় জীবনের মূল উৎস কোথায়, এসব আমাদের বড় একটি আলোচ্য বিষয়। কেবল তাই নয়, অন্যান্য সমাজের তুলনায় বিশ্বমানবের সমাজ-ধর্ম্মে ইহার স্থান কি, মানবের কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় কতদূর ইহার জীবন সার্থক হইয়াছে, তাহাও আমাদের বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন। প্রত্যেক জাতিই তার নিজের বিশিষ্টতার কথা গৌরবে আলোচনা করিয়া থাকে, এই বিশিষ্টতা তাহাদের ব্যক্তিগত জীবনকে কি বিশেষ ধর্ম্মে গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করে। কিন্তু অধুনা শিক্ষিতসম্প্রদায়ভুক্ত ভারতবাসী হিন্দু আমরাই সেটা বড় করি না, বরং বিদেশী না বুঝিয়া যত কিছু নিন্দা ইহার করিয়াছে, যত ধিক্কার ইহাকে দিয়াছে, তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া নিতেছি, তাহারই প্রতিধ্বনি করিতেছি। বস্তুতঃ বাহিরে ও ভিতরে আমাদের এই সমাজ যত নিন্দিত, যত ধিক্কৃত, এরূপ বোধ হয় পৃথিবীর আর কোনও মানব-সমাজ কখনও হয় নাই। অথচ এই সমাজের আশ্রয়েই আমরা জীবন যাপন করিতেছি,—অন্যান্য সমাজের মানব অপেক্ষা বেশী দুঃখে আছি, তাও বলিতে পারি না। দুঃখ পাইলে ইহার মধ্যে থাকিতাম না, ভাঙ্গিয়া বাহির হইতাম। শাস্ত্র বা লোকাচারের সাধ্য ছিল না,

আমাদের এই দুঃখের বন্ধনে চিরকাল বাঁধিয়া রাখিতে পারে। কারণ, এই শাসনের পুলিশ নাই, সিপাহী নাই, জেলখানা নাই, ফাঁসি কাঠ নাই। এ সব বাহ্যিক স্থূল অস্ত্রে সমাজ কাহাকেও শাসন করে না। পুরুষপরম্পরাগত যে সব সংস্কার এবং বাল্যাবধি তদনুযায়ী যে গতানুগতিকতার অভ্যাসের বশে লোক সমাজবিধি ও লোকাচার মানিয়া চলে, তাহা যেখানে বড় কঠোর ও বড় দুঃখের হয়, তাহার লঙ্ঘন ও বর্জ্জন বিশেষ দুঃসাধ্য নহে। আমাদের মধ্যেও সর্ব্বদা এরূপ ঘটিতেছে। পরিবর্ত্তিত অবস্থার সঙ্গে সমাজ আপনাকে পূর্ব্বেও যেমন বেশ মানাইয়া চলিয়াছে, এখনও চলিতেছে। কিন্তু মানাইয়া বনাইয়া যতই চলুক, সমাজ তার মূল প্রকৃতিতে, বিশিষ্ট ধর্ম্মে, স্থির আছে। কারণ তাহা প্রকৃত পক্ষে অধিকাংশ লোকের কল্যাণের পরিপন্থী হইতেছে না। আমাদেরই ঘরের আশ্রয়ে আমরা আছি, সুখে ও মঙ্গলেই আছি, অথচ আবার পরের কথার সুর ধরিয়া তার নিন্দা করিতেছি, তাকে ধিক্কার দিতেছি। তাহা না করিয়া একবার কি আমাদের নিজের চোকে ভাল করিয়া দেখা উচিত নয়, আমাদের এ ঘর বাস্তবিকই মানুষের বাসের অযোগ্য কি না?

কিন্তু তাহা আমরা বড় করিতে চাইনা। পাশ্চাত্য সমাজজীবন যে আকার ধরিয়া অধুনা যে পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহাকেই মানব-সমাজের শ্রেষ্ঠ আকার, শ্রেষ্ঠ পরিণতি বলিয়া আমরা মনে করি, এবং তার মাপকাটিতেই হিন্দুর সমাজজীবনের মূল্য নিরূপণ করিতে গিয়া সর্ব্বদাই খুঁজি, পাশ্চাত্য মানবের সমষ্টিজীবনের অনুরূপ সমষ্টি-জীবন ভারতীয় হিন্দুর মধ্যে কোথাও কখনও গড়িয়া উঠিয়াছিল কি না। যদি কোথাও তার অতি ক্ষীণ সাদৃশ্যও দেখি, গৌরব করিয়া কত রকমেই না তার বর্ণনা করি! কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত যে অতি বিরল এবং সাধারণ হিন্দুসমাজ যে এই আদর্শে এইরূপ কোনও পরিণতি লাভ করে নাই, ইহা আমরা দেখি, স্বীকার করিতে বাধ্য হই। শেষ এই সিদ্ধান্ত আমাদের হয়, হিন্দু নামধারী গোষ্ঠী সমূহ ঠিক পথ

ধরিয়া জাতীয় অভ্যুদয়ের অনুকূল পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই, বরং তাহার প্রতিকূল পথেই চলিয়াছে, এবং তাই হিন্দুর পতন হইয়াছে। হিন্দুকে বর্ত্তমান জগতে যদি মাথা তুলিয়া আবার দাঁড়াইতে চায়, এই সমাজকে তার ভাঙ্গিয়া পাশ্চাত্য এক একটি জাতির মত করিয়া ফের গড়িয়া নিতে হইবে।

এখানেও আমাদের বুদ্ধিপাশ্চাত্য বুদ্ধির গোলামী করিতেছে। ধর্ম্মপদ্ধতির আলোচনা প্রসঙ্গে যে সব কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সমাজপদ্ধতির সম্বন্ধেও সেই সব কথাই আবার বলিতে হয়। পাশ্চাত্য জাতি সমূহ যে নীতির আদর্শে যে আকার ধরিয়া উঠিয়াছে, হিন্দুসমাজ সেই আদর্শে সে আকার ধরিয়া পরিণতি লাভ করে নাই, এবং করে নাই বলিয়াই তার এই আদর্শ, এই আকার, এই পরিণতি যে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের আদর্শ, আকার ও পরিণতি অপেক্ষা হীনতর, হিন্দুর কল্যাণ সাধন কম করিয়াছে, তাহা নয়। কিন্তু ইহার এই পার্থক্যই যে হিন্দুসমাজের বৈশিষ্ট; হিন্দু সমাজজীবনের মাঙ্গল্য যে এই বৈশিষ্টের উপরেই নির্ভর করিতেছে, তার দিকে আমাদের দৃষ্টি যায় না, মুখ তুলিয়া মুক্তকণ্ঠে আমরা তাহা স্বীকারও করিতে চাই না।

কথা কয়টি আর একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রত্যেক মানবের যেমন এক একটা ব্যষ্টিজীবন (individual life) আছে, তেমনই এইরূপ বহু ব্যষ্টির মিলনে মানবের এক একটা সমষ্টিজীবনও আছে। * পৃথিবীর সকল ব্যস্ত মানব

* ব্যষ্টি ও সমষ্টি এই দুইটি কথা সর্ব্বদাই আমাদিগকে ব্যবহার করিতে হইবে। ইংরেজিতে যাহাকে individuality ও community বলে, তাহাই আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টি।—ইহার বিশেষণ ব্যস্ত ও সমস্ত। ব্যস্ত কথাটার ভিন্ন একটা অর্থ বাঙ্গলা ভাষায় প্রচলিত হইয়াছে—যথা ব্যগ্র, অধীর। 'ব্যস্তসমস্ত' বলিলে অতি ব্যগ্র বা তাড়াতাড়ি একটা ভাব বুঝায়। কিন্তু সংস্কৃতে ইহার মূল ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাহা, তাহাতে 'ব্যস্ত সমস্ত' বলিলে প্রত্যেকে পৃথক্ ভাবে এবং সকলে একত্র

(individual men) মিলিয়া একটি মাত্র সমষ্টি কোনও যুগে এই পৃথিবীতে হয় নাই। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে নানা রকম মানব-সমষ্টিই এ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। স্বভাবে মোটামুটি একটা সমতা আছে, শিক্ষা দীক্ষা ও আচার নিয়ম অনেকটা এক রকম, মূল একগোষ্ঠী বা একই রকম একাধিক গোষ্ঠী হইতে সম্ভূত, একই বিধ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী, এক দেশবাসী—এইরূপ কোনও এক বা একাধিক ভাবে যাহাদের মধ্যে নিবিড়ভাবের একটা মিল আছে, সেইরূপ বহু ব্যষ্টি লইয়াই সাধারণতঃ এক একটি সমষ্টি হয়।

পাশ্চাত্য জগতে অধুনা এই সমষ্টি এক একটি ষ্টেট্ (State) বা রাষ্ট্রশক্তির আশ্রিত এক একটি নেশন (Nation) নামে বিশিষ্ট এক আকার ধরিয়া উঠিয়াছে। 'জাতি' এই নামে নেশন (Nation) কথাটি আমাদের ভাষায় আমরা প্রকাশ করিয়া থাকি। 'জন্ম' বা 'জাত হওয়া' এই অর্থে ল্যাটিন ভাষায় Natus কথাটি হইতে Nation শব্দের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। ব্যুৎপত্তির হিসাবে ইহার অর্থ হয়, মূল এক শোণিত অর্থাৎ বংশ, কুল বা গোত্র হইতে যাহাদের উদ্ভব হইয়াছে। আমাদের 'জাতি' কথাটার মৌলিক অর্থও ইহা। এইরূপ মূল এক শোনিত হইতে দৈহিকরূপে, চিত্তের সংস্কারে, ধীশক্তির অধিকারে, মোটের উপর এক একটি বিশিষ্ট প্রকৃতি লইয়া বিভিন্ন প্রকার মানব যাহারা এ পৃথিবীতে জন্মিয়াছে, ইংরেজিতে 'রেস্' (Race) এই নামই তাহাদের সম্বন্ধে সাধারণতঃ এখন ব্যবহৃত হয়—যেমন আর্য্য, তুরাণ, মঙ্গোলীয়, নিগ্রো, আদিম আমেরিক, মালয় প্রভৃতি 'রেস্'।—ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে আবার বহু শাখা প্রশাখা আছে। এই সব শাখা প্রশাখার মধ্যেও অনেক স্থলে আবার এত পার্থক্য আছে, যে এক একটিকে অনেক পরিমাণে

হইয়া (jointly and severally) ইহাই বুঝাইবে। ব্যষ্টি ও সমষ্টির ন্যায় তাহাদের বিশেষণ 'ব্যস্ত' ও 'সমস্ত' কথাও এই অর্থে অনেক স্থলে ব্যবহার আমাকে করিতে হইবে। কেহ ভুল না বুঝেন, তাই সামান্য এই একটু টিপ্পনী করিলাম।

ভিন্ন এক একটি 'রেস্' (Race) এর মত মনে হইবে, এবং 'রেস্' (Race) কথাটি অনেক সময় এই সব শাখাপ্রশাখাগুলিকে বুঝাইতেও ব্যবহৃত হয়।—নেশন (Nation), রেস (Race) ও আমাদের 'জাতি,' কয়টি নামেরই মৌলিক অর্থ এক। কিন্তু মৌলিক অর্থ যাহাই হউক, নেশন কথাটার ভিন্ন একটা অর্থ এখন দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এক রাষ্ট্রশক্তির আশ্রয়ে সমান রাষ্ট্রীয় স্বার্থে যাহারা মিলিয়াছে, নেশন বলিতে এখন তাহাদেরই বুঝায়। এই নেশনরূপ মানবসমষ্টির প্রধান মূল-করণ বা factor হইতেছে ষ্টেট (State)। State বা রাষ্ট্র এক না হইলে কোনও মানব-সমষ্টিকে নেশন বলা যায় না। জর্ম্মাণ্ রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎপণ্ডিত ব্লুণ্টস্‌লি (Bluntschli) সাহেব সত্যই বলিয়াছেন, No State, no Nation * অর্থাৎ এক ষ্টেট্ না হইলে কোনও নেশন হইতে পারে না। নেশন ব্যতীত ষ্টেট্ হইতে পারে, যেমন বিদেশীর শাসনে বা স্বতন্ত্র রাজশাসনে (Absolute Monarchyতে) অনেক স্থলে হয়। কিন্তু ষ্টেট্ছাড়া নেশন হয় না। অর্থাৎ নেশন বলিলেই বুঝিতে হইবে এমন এক সমষ্টি যাহা এক ষ্টেট্ বা রাষ্ট্রের শক্তিতে আশ্রিত, যাহার ব্যষ্টি সমূহ এক রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মের বন্ধনে পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধে বদ্ধ, এবং এই ধর্ম্মে এই সম্বন্ধই তাহাদের সমষ্টি জীবনের প্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। †

* 'The Theory of the State, Bluntschli, English Translation, 3rd Edition, p. 91.

† *'জাতি' নামে আমরা 'নেশন' কথাটাকে আমাদের ভাষায় প্রকাশ করি।* কিন্তু ইহাতে অনেক গোল হয়। ইংরেজি race বা type কথাটারই প্রকৃত অর্থ জাতি এবং এই অর্থে জাতি কথাটার বহুল ব্যবহারও আমাদের সাহিত্যে আছে। আবার আমাদের সমাজবিভাগে বর্ণগত যে বিভিন্ন শ্রেণী বা সম্প্রদায় আছে, তাহাকেও আমরা জাতি বলি। বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মানুগত সম্প্রদায়কেও অনেক সময় জাতি বলা হয়, যেমন মুসলমান জাতি, শিখ জাতি ইত্যাদি।

এখন এই ধর্ম্মে সমধর্ম্মী, এই সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বদ্ধ কাহারা হইতে পারে? আরও কতকগুলি মূল-করণ বা factor আছে, যাহার সমবায় না ঘটিলে, কেবল এক দেশের অধিবাসী বা একই রাষ্ট্রশক্তির শাসিত বলিয়া নানা রকম মানুষ মিলিয়া এক একটা নেশন হয় না।—ইহার মধ্যে সকলের বড় factor বা মূল-করণ হইতেছে, 'সমজাতীয়তা'—(racial unity বা equality)। পৃথিবীর সকল জাতি বা রেস্ (race) দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতিতে অভিব্যক্তির সমান স্তরে (on the same or similar stage of evolution) পৌঁছে নাই। বহু বৈষম্য বিভিন্ন রেসের (race এর) মধ্যে, এমন কি একই race এর বিভিন্ন শাখা প্রশাখার মধ্যে দেখা যায়। এই বৈষম্য অনেক স্থলে এত অধিক, যে বহুকাল এক দেশে বাস করিয়া, এমন কি একই ধর্ম্মপদ্ধতির অনুবর্ত্তী হইয়াও, এমনভাবে তাহারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়া যাইতে পারে না, যাহাতে সমষ্টি-জীবন তাহাদের মোটের উপর একই স্তরে উঠিয়া একই পথে চলিতে পারে। এরূপ মিলনের

একই নামের যদি এইরূপ বহুবিধ দ্যোতনা হয় এবং তাহা আবার একই সময়ে একই আলোচনায় প্রসঙ্গে ব্যবহার করিতে হয়, তবে যেমন তাহা শুনিতে কটু হয়, তেমনই আবার তার অর্থ বুঝিতেও গোল বাধে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অর্থসূচক বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন নাম হইলেই ভাল হয়। নেশন কথাটার ঠিক যাহা বুঝায়, তাহাতে 'রাষ্ট্রসংহতি বা সংঘাত' অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মের সম্বন্ধে নিবিড়সংযোগে গঠিত মানবসমষ্টি, কিম্বা 'রাষ্ট্রসমাজ' অর্থাৎ সমরাষ্ট্রতার ধর্ম্ম যে সমাজকে প্রধান ভাবে ধরিয়া রাখিয়াছে, এইরূপ একটা নাম হইলেই ভাল হয়। কিন্তু নেশন, ন্যাশনালিটী, ন্যাশনাল লাইফ, ন্যাশনালিজম (Nation, Nationality, National Life, Nationalism প্রভৃতি কথা বুঝাইতে 'জাতি,' 'জাতীয়তা,' 'জাতীয় জীবন,' 'জাতীয় ধর্ম্ম' প্রভৃতি কথাগুলির এমনই বহুল প্রচলন অধুনা আমাদের ভাষায় হইতেছে, যে অন্য কোনও নাম গৃহীত হওয়া বড় সম্ভব নয়। তবে স্পষ্টতার খাতিরে অনেক সময় এই সব ইংরেজি নাম অথবা 'রাষ্ট্র' শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন নানা নাম আমাকে অনেক স্থলে ব্যবহার করিতে হইবে।

পক্ষে, ইহা অবশ্য অত্যাবশ্যক নয় যে সকলকে একই শোণিত-জাত একই রেসের বা জাতির লোক হইতেই হইবে। তবে রেসীয় প্রকৃতিতে (racial nature এ) এমন একটা সমতা নিতান্ত আবশ্যক যাহাতে পরস্পরের নিকটসংসর্গে বা শোণিতমিশ্রনে একের স্বভাবের গুণ, আচার' নিয়ম, মনঃশক্তি, বিদ্যা ও সভ্যতা (culture & civilisation) অন্যে গ্রহণ করিতে পারে।

তারপর ধর্ম্মের ও ভাষার কথা। একই ধর্ম্মপদ্ধতির অনুবর্ত্তন অতি বিষম দুই 'জাতি' বা রেস (race) কে সমান করিতে পারে না বটে, তবে বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মপদ্ধতি লোকের মতিগতিতে, চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে এবং আচার নিয়মে এমনই একটা বৈষম্য ঘটায়, যাহাতে বিভিন্ন রেসের (race এর) ত কথাই নাই, এক রেসকেও জীবন-যাত্রায় সমান পথে মিলাইয়া রাখিতে পারে না। ভাষার বৈষম্যও এইরূপ মিলনের পক্ষে বড় একটি অন্তরায়। সাধারণ কথার প্রাকৃত ভাষা বিভিন্ন হইলেও সকলের সমান বিদ্যা ও সাহিত্য একটা থাকা চাই-ই, এবং তার জন্য এই সব প্রাকৃত কথার ভাষার উপরে সকলের সমান একটা 'সংস্কৃত' (refined বা literary) ভাষাও চাই। নহিলে সমান সভ্যতায় ও সমান সামাজিক ধর্ম্মে লোকে মিলিতে পারে না।

এইরূপে জাতীয় বা রেসীয় (racial) প্রকৃতির সমতা, ধর্ম্মের সমতা, ভাষার সমতা, একইবিধ মনঃশক্তি ও বিদ্যার অধিকারে এবং শিক্ষা দীক্ষার প্রভাবে চিন্তার ও চরিত্রের আদর্শের সমতা, আচার নিয়মের সমতা, যখন এক দেশের অধিবাসীবৃন্দকে জীবনের সমান অথচ অপর সকলের হইতে বিশিষ্ট একটা পথে আনিয়া মিলিত করে এবং পুরুষ-পরম্পরাক্রমে সেই পথেই তাহাদের জীবন পরিচালিত হইতে থাকে, তখনই তাহাদের আমরা এক একটি সমষ্টি (Group বা Community) বলিতে পারি। এইরূপ এক একটি সমষ্টিই এক রাষ্ট্রশক্তির আশ্রয়ে সমান এক রাষ্ট্রধর্ম্মে সম্মিলিত হইতে পারে। যখন হয়, তখনই সেই সমষ্টি নেশন (Nation) নামের যোগ্য। আর যদি তা না হয়,

তাহা হইলে এইরূপ এক একটি সমষ্টিকে 'সমাজ' নাম দেওয়া যাইতে পারে এবং তাহাই আমরা দিয়া থাকি। তারপর, এইরূপ সমাজ যদি অতি বৃহৎ ও ব্যাপক হয়, আর তার বিভিন্ন অংশ যদি বিভিন্ন রাষ্ট্র-শক্তির শাসনে পুরুষপরম্পরায় বাস করে, তবে পৃথক্ পৃথক্ রাষ্ট্র-ধর্ম্মের প্রভাবে একই সমাজের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন নেশেনের অভ্যুদয় হয় এবং অন্যান্য বহু বিষয়ে সমতা থাকিলেও রাষ্ট্রধর্ম্মের বৈষম্য-হেতু প্রবল একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধের ভাবও তাহাদের মধ্যে ঘটে,—যেমন নাকি বর্ত্তমান ইয়োরোপে ঘটিয়াছে।

'সমান' 'তুল্য' বা 'সহিত' এই অর্থে 'সম্' উপসর্গের সঙ্গে যুক্ত গমনার্থক 'অজ্' ধাতু হইতে 'সমাজ' শব্দটির ব্যুৎপত্তি হইয়াছে,—অর্থাৎ পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়া সমান পথে যাহারা গমন করে বা জীবনযাত্রা যাহাদের পরিচালিত হয়, তাহারাই এক সমাজ। যাহা হউক, সমাজ বলিতে সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝি এবং যাহার একটা মোটামুটি ব্যাখ্যাও উপরে দেওয়া হইল, জার্ম্মাণ-রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ব্লুন্টসলি (Bluntschli) সাহেবের মতে ইংরেজি ভাষায় তাহার নাম হইতেছে people এবং এই people নামের এইরূপ একটা সংজ্ঞা তিনি দিয়াছেন, যথা—

"It is a union of masses of men of different occupations and social strata in a hereditary society of common spirit, feeling and race, bound together, especially by language and customs, in a common civilasation which gives them a sense of unity and distinction from all foreigners, quite apart from the bond of the State," (The Theory of the State, English Translation, 3rd Edition, page, 90)। ইহার বঙ্গানুবাদ নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা মোটের উপর একই কথা।

এই পুস্তকের অন্য এক স্থানে (৮৯ পৃষ্ঠায়) তাঁহার অপর একটি উক্তি এই,—"The essense of a People lies in its civilisation (*cultur*) : its inner cohesion and its separation from foreign peoples spring mainly from development in civilisation, and express themselves chiefly in influencing its conditions. It can be understood from a psychological point of view ; its essence is to be seen in the common spirit and common character which inspires it. It may be called an Organism in so far as its character has received a visible expression in the physique of the race and in language and manners."

[অনুবাদ।—কোনও একটি সমাজের মূল আশ্রয়ই হইতেছে তাহার সভ্যতা (Civilisation)। তাহার আপনাতে যে মিলন এবং বাহিরের সঙ্গে যে পার্থক্য,তাহা এই সভ্যতা কি বিশিষ্ট প্রকৃতি ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহারই উপরে নির্ভর করে। যাহাতে এই মিলন এবং যাহাতে এই পার্থক্য, সমাজের অবস্থাতেই তাহা প্রকাশ পায়, কারণ এই অবস্থা তাহাদেরই প্রভাবজাত। এই সভ্যতার প্রভাবে একই ভাবের অনুপ্রেরণায় একই প্রকৃতি ধরিয়া এক হইয়া যাহারা মিলিয়াছে, তাহাদের লইয়াই এক একটি সমাজ। দৈহিক ধর্ম্মের বিশিষ্টতায়, ভাষায় ও আচার নিয়মে এক বিশিষ্ট স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, এমন এক শরীরী বস্তু বা Organism বলিয়াই এই People বা সমাজকে ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে।]

সাধারণতঃ ইংরেজি 'Society' কথাটাই সমাজের স্থানে আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু 'People' কথাটার এই যে সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা ব্লুণ্টস্‌লি (Bluntschli) সাহেব দিয়াছেন, 'Society' বলিতে কোন জনসমূহের মধ্যে সেরূপ একটা নিবিড় সংযোগ বুঝায় না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিত রুসো (Rousseau)র সময় হইতে ফরাসী দেশের পণ্ডিতবর্গ সোসাইটী (Society) কথাটাকেই ষ্টেট্ (State) এর রূপ বা বহিরাকারের অর্থেই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, এবং নেশন (Nation), পিপ্‌ল্ (People) ও সোসাইটী (Society) এই তিনটি কথার মধ্যে কোনও রূপ পার্থক্য তাঁহারা ধরেন না। ইহাতে রাষ্ট্রশক্তির প্রভুত্ব সমাজজীবনের অন্যান্য অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে এবং তাহাতে অনেক অসুবিধাও ঘটে। ব্লুণ্টস্‌লি (Bluntschli) সাহেব বলেন, জর্ম্মাণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ এই সব বিভিন্ন নামের ও নামধেয় বস্তুর মধ্যে প্রকৃত যে পার্থক্য রহিয়াছে, পরিস্ফুট ভাবে তাহা দেখাইয়াছেন। তাহার ফলে ষ্টেট্ (State) তাহার স্বধর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে পারিতেছে এবং সোসাইটী (Society) বা সাধারণ জনগণও তাহার অন্যায় প্রভুত্ব হইতে রক্ষা পাইতেছে। সোসাইটী ও নেশন এই নাম দুইটির বিশিষ্ট অর্থ সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি উক্তি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"The Nation is necessarily a connected whole, while Society a casual association of a number of individuals. The Nation as embodied in the State is an Organism with head and members; Society is an unorganised mass of individuals. The Nation has a legal personality, Society has no collective personality, but only consists of a mass of private persons. The Nation is endowed with unity of will and power to make its will actual in the State. Society has no collective will and no political power of its own............It has only a public opinion, and exercises an indirect influence on the Organs of the

State according to the views, interests and demands of many or all of its members."

(The Theory of the State, English Transtation, 3rd Edition, p 109)

[অনুবাদ।—'নেশন' বিভিন্ন অঙ্গের নিবিড় সংযোগে এক দেহে পরিণত সম্পূর্ণ একটি বস্তু, সোসাইটী বহু ব্যক্তির একটা সাধারণ সম্মিলন মাত্র, যাহা বিশেষ বিশেষ অবস্থার গতিকে বিশেষ বিশেষ ভাবে ঘটিতে পারে, স্থায়ী কোনও ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা যাহার নাই। পরিচালক মস্তক এবং পরিচালিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি লইয়া ষ্টেট্ বা রাষ্ট্রশক্তির বলে সংহত হইয়া শরীরী জীবের ন্যায় এক আকার ধরিয়া উঠিয়াছে, নেশন এমনই এক বস্তু,—কিন্তু সোসাইটীর এমন সর্ব্বাঙ্গসংহত কোনও আকার নাই। বহু বিভিন্ন পদার্থের যেমন একটা স্তূপ হয়, সোসাইটী তেমনই বহু লোকের একটা শিথিলভাবের যোগমাত্র। নেশনের একটা সমবেত ইচ্ছা আছে, এবং ষ্টেট্ রূপ যন্ত্রের অবলম্বনে সেই ইচ্ছা সে কার্য্যে পরিণত করিতে পারে। কিন্তু সোসাইটীর এমন কোনও সমবেত ইচ্ছা নাই এবং সমবেত ভাবে কর্ম্ম করিবার মত নিয়মিত কোনও শক্তিও নাই। *ভাল মন্দ কি, সে সম্বন্ধে সোসাইটী* একটা মত মাত্র প্রকাশ করিতে পারে এবং তাহাতে পরোক্ষ ভাবে যেটুকু প্রভাব ষ্টেটের উপরে আসিতে পারে, তাহার বেশী সোসাইটী রূপে মিলিত জনগণের সাক্ষাৎ ভাবে কার্য্যকরী আর কোনও শক্তিই নাই।]

নেশন এবং সোসাইটী এই দুইটি বস্তুর মধ্যে যে পার্থক্য ব্লুন্টস্‌লি (Bluntschli) সাহেব দেখাইয়াছেন, তাহা হইতে পিপ্‌ল্ (People) এবং সোসাইটীর মধ্যে পার্থক্যটাও বুঝা যাইবে। কারণ পিপ্‌ল্ (Pepople) বলিতে যে ভাবে সংহত মানবসমষ্টিকে বুঝায়, তাহাই রাষ্ট্রধর্ম্মের বন্ধনে অন্য আর এক ভাবে দৃঢ়সম্বদ্ধ হইয়া এক একটি 'নেশন' হয়। ইংরেজি সাহিত্যে 'সোসাইটী' কথাটা সাধারণতঃ এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়,' পিপ্‌ল্ অর্থে নয়। সমাজ কথাটাও

এই অর্থে অনেক সময় আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু বিশিষ্ট যে অর্থে এই 'সমাজ' কথাটি এই প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হইতেছে, এই আলোচনার বিষয় যে 'সমাজ', তাহা ঠিক সোসাইটী নয়, পিপ্‌ল্ (People)। কিন্তু ইংরেজি এই পিপ্‌ল্ (People) কথাটাও যে এইরূপ একটি নির্দ্দিষ্ট অর্থে সচরাচর ব্যবহৃত হয়, তা নয়। আর একটি কথা আছে, Social Organism। সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতবর্গ ব্যস্ত মানব (Man as an individual) হইতে বিশিষ্ট করিয়া মানবসমষ্টিকে বুঝাইতে এই Social Organism নামটিই সাধরণতঃ এখন ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পরস্পরের উপর একান্তভাবে নির্ভর করে, একটিকে ছাড়িয়া অপর কোনও একটির অস্তিত্বের সার্থকতা কিছু থাকে না, এমন বহু ও বিবিধ অঙ্গের সংঘাতে বা নিবিড়সংযোগে মোট এক আকার ধরিয়া নৈসর্গিক ধর্ম্মে যার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়াছে, এবং এই নৈসর্গিক ধর্ম্মেই যার একটা ক্রমিক পরিণাম আছে, সেইরূপ বস্তুকে Organism বলে। 'শরীর' কিম্বা 'শরীরী' বা 'শরীরধর্ম্মী বস্তু' এইরূপ একটা নামে বোধ হয় Organism কথাটিকে আমাদের ভাষায় আমরা প্রকাশ করিতে পারি। প্রত্যেক Organism বা শরীরী বস্তুর যেমন দেহ আছে, তেমনই প্রাণ আছে। বাহিরের একটা স্থূল আকার যেমন আছে, আবার সেই আকারকে ধরিয়া রাখিয়াছে, তার ক্রিয়া চালাইতেছে, তার নিয়মিত বিকাশ ও পরিণাম ঘটাইতেছে, আভ্যন্তরিক এমন একটা জীবনী শক্তিও রহিয়াছে। এই দুইএর অবিচ্ছেদ্য মিলনেই Organism হইয়াছে। বিচ্ছেদ ঘটিলে Organism রূপে আর তার অস্তিত্ব থাকে না, মৃত জড় বস্তুতে পরিণত হয়। Organsim বা শরীরী বস্তুর বিভিন্ন অঙ্গের গুণকর্ম্মাদি ভিন্ন ভিন্ন রকম হইলেও, সকলের সমবেত ক্রিয়াতে মোট শরীরেরই জীবনযাত্রার ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইতেছে। এবং তাকে ছাড়িয়া পৃথক ভাবে কোনও অঙ্গের ক্রিয়ার কোনও সার্থকতা নাই। ক্রিয়াই চলিতে পারে না, কারণ মোট শরীরের প্রাণেই অঙ্গের

প্রাণী। কোনও এক অঙ্গকে বাদ দিয়া শরীর বরং চলিতে পারে, কিন্তু শরীর ছাড়া হইয়া কোন অঙ্গ পৃথক ভাবে চলিতে পারে না। এই সব লক্ষণ আছে বলিয়াই ঔদ্ভিজ্য ও জৈব বস্তু মাত্রকেই Organism বলা হয়। এবং এরূপ লক্ষণ যদি আর কিছুতে দেখা যায়, তাহাকেও Organism বলা যাইতে পারে। ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক মানবশরীর যে এক একটি Organism, একথা না বলিলেও চলে। ইহারা সব Individual Organism বা ব্যষ্টি-শরীর। আবার নৈসর্গিক বহু কারণের সমবায়ে নিবিড় ভাবে associated বা সংযুক্ত বহু ব্যষ্টির যে এক একটি group বা সমষ্টি হয়, তাহার মধ্যেও এই সব লক্ষণ আছে বলিয়া তাহার নাম করা হয় Social Organism বা মানবের সমষ্টি-শরীর। কোন মানবসমাজের মধ্যে বাস্তবিক এই সব লক্ষণ আছে কিনা, থাকিলেও তার বিশিষ্ট প্রকৃতি কিরূপ, এবং তাহাতে এক একটি সমাজকে এইরূপ Organism বলা যায় কিনা এবং পণ্ডিতরা কেন বলিয়াছেন, এই সব কথার আলোচনা পরে যথাস্থানে করিব। আপাততঃ এই সত্যটুকু সকলেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে ব্লণ্টস্‌লি যাহাকে পিপ্‌ল্ (People) বলিয়াছেন তাহা প্রকৃত পক্ষে Social Organism বা মানবের সমষ্টি-শরীর। পিপ্‌ল্ অপেক্ষা এই নামই অনেক ভাল নাম এবং এই অর্থে আমাদের সমাজও Social Organism, এবং হিন্দুসমাজ কথাটিকে ইংরেজিতে প্রকাশ করিতে হইলে তাহাকে Hindu Social Organismই আমাদের বলিতে হইবে।

প্রাচীন সেই গ্রীক সভ্যতার সময় হইতেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ষ্টেট্ (State) কেই এই Social Organism বা সমষ্টি-মানবের এক মাত্র ধারক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। ধারক শক্তি কেবল নয়, খুত সমাজরূপ যে সমষ্টির আকার, তাহাও অনেক সময়ে ষ্টেট্ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। আর একটি কথাও ইহারা ব্যবহার করিয়া থাকেন, Body politic, অর্থাৎ সমান রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মে ও অধিকারে মিলিত জনসমষ্টি।

এই সবটি যেন এক আকারে এক দেহে পরিণত একটি বস্তু হইয়াছে, তাই দেহব্যঞ্জক Body কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে। [illegible] গঠিত গণ-শরীর—ইহাই বোধ হয় ইহার ঠিক বঙ্গানুবাদ এবং এই হিসাবে এক একটি Body politic এক একটি Organism। এই Body politic আর State একরূপ অভিন্ন বস্তু, সুতরাং ষ্টেট্‌ও ইঁহাদের মতে Organism। পিপ্‌ল্‌ (People) এবং নেশন (Nation) দুইটি কথার মধ্যে ব্লুন্টস্‌লি (Bluntschli) সাহেব যে অমন একটা পার্থক্যের রেখা টানিয়াছেন, তিনিও ষ্টেট্‌কে একটা Organic বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। *

ষ্টেট্ (State)কেই যদি এইরূপ Organism বলিয়া আমরা গ্রহণ করি এবং ষ্টেট্ ও বডী-পলিটিক (Body politic) যদি অভিন্ন বস্তুই হয়, তবে এই দুইটি কথার সঙ্গে 'নেশন' কথাটির পার্থক্যের রেখা যে কোথায় টানা যায়, তাহা নির্ণয় বড় সহজ হইবে না। যদি পার্থক্য কিছু ধরা যায়, তাহা বোধ হয় এইরূপ হইবে,—যথা, ষ্টেট্ বলিলে এই

---

* "In calling the State an organism we are not thinking of the activities by which plants and animals seek, consume and assimilate nourishment, and reproduce their species. We are thinking rather of the following characteristics of natural organisms.

(a) Every organism is a union of soul and body, i.e. of material elements and vital forces.

(b) Although an organism is and remains a whole, yet in its parts it has members, which are animated by special motives and capacities, in order to satisfy in various ways the varying needs of the whole itself.

(c) The organism develops itself from within outwards, and has an external growth.

In all three respects the organic nature of the State is evident. [The Theory of the State, Bluntschli, English Translation, 3rd Edition. p. 19.]

Organism এর অন্তর্ভুক্ত মানবমণ্ডলী অপেক্ষা তাহাদের অধ্যুষিত দেশ, দেশে প্রতিষ্ঠিত শাসনশক্তি ও শাসকসঙ্ঘের দিকেই আমাদের দৃষ্টি প্রধান ভাবে আকৃষ্ট হয়। Body politic বলিলে, রাষ্ট্রীয় শক্তি পরিচালনার ও তাহার অধিকার ভোগের একটা ছাপ এই মানবমণ্ডলীর উপরে পড়িয়া বিশিষ্ট যে প্রকৃতি ইহাকে দিয়াছে, সর্ব্বোপরি সেই কথাটাই মনে পড়ে। আর 'নেশন' বলিলে ইহার উপরে তাহারা যে এক সমাজ, সমরাষ্ট্রতা ছাড়া সভ্যতাও (Civilisation) যে তাহাদের মিলনের বড় একটা ভিত্তি, সে কথাটাও আমাদের মনে পড়িবে।

কিন্তু একটি কথা এখানে আমাদের ভাবিতে হইবে। যে সব অবস্থার সমবায়কে সভ্যতা বা Civilisation বলা হয়, State ব্যতীত কেবল তাহাই এক একটি সমাজকে ধরিয়া রাখিতে পারে কি না, অর্থাৎ নেশন রূপে পরিণত না হইয়াও কেবল তার সভ্যতার আশ্রয়েই কোন সমাজ বা Social Organismএর বাস্তব কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্ভব কি না। ষ্টেট্ ব্যতীত সমান সভ্যতায় সমধর্ম্মী সমাজরূপে (ব্লুণ্টস্‌লি সাহেবের মতে 'পিপ্‌ল'রূপে) এক এক দেশের বা মহাদেশের অধিবাসীবৃন্দকে কল্পনা করা যায় বটে, কিন্তু বাস্তব জীবনেও এই কল্পনা সত্য হয় কিনা,—অথবা প্রত্যেক সমাজ বা Social Organismকে ষ্টেটের আকার অথবা ষ্টেটের আশ্রয়ে 'নেশনের' আকার ধরিতেই হইবে, অন্যথা তাহার কোনও অস্তিত্বই থাকিতে পারে না।

প্রাচীন গ্রীক্ সভ্যতার যুগে ষ্টেট্ ব্যতীত অন্য কোনও আকারে বা অন্য কোনও রূপ ধর্ম্মের কি শক্তির আশ্রয়ে ধৃত কোনও সমাজ ছিল না। এইরূপ কোনও সমাজের সম্ভাবনাই তখনকার কেহ কল্পনা করিয়াছিলেন বলিয়াও মনে হয় না। কেবল তাই নয়, ষ্টেট্‌কেই তাঁহারা মানব ধর্ম্মের একমাত্র আশ্রয় ও নিয়ন্ত্রী শক্তি বলিয়াই মনে করিয়াছেন, ষ্টেট্ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে কোনও মানবের কোনও ধর্ম্ম কি কোনও অধিকার আছে, ইহাও স্বীকার করিতেন না।

রোমকেরা ষ্টেটের এরূপ সর্ব্বাঙ্গীন প্রভুত্ব না মানিলেও এবং ব্যক্তিভাবে বা পরিবার (family) ভাবে কোনও কোনও বিষয়ে মানুষের কতকটা স্বাধীনতা স্বীকার করিলেও, ষ্টেট্ ছাড়া আর কোনও ভাবে, কোনও আকারে মানবের সমষ্টিস্বরূপ তাঁহাদের মধ্যেও বিকাশ লাভ করে নাই। গ্রীক ও রোমক উভয় জাতির সমষ্টিজীবনই প্রায় সমান ভাবে ষ্টেট্‌কে ধরিয়াই অভিব্যক্ত হইয়াছিল। রোমকসাম্রাজ্যের পতনের পর মধ্যযুগে যখন নব্য ইয়োরোপের অভ্যুদয় আরম্ভ হয়, তখন রোমক চার্চ্চ (The Roman Catholic Church) বা 'রোমক ধর্ম্ম মহামণ্ডল' সমগ্র ইয়োরোপের খৃষ্টান মণ্ডলীর উপরে এমন এক ধর্ম্ম-শাসন প্রতিষ্ঠা করেন, যাহা কোনও ষ্টেটের অঙ্গীভূত বা অধীন ছিল না। এই খৃষ্টান মণ্ডলীর রাষ্ট্রীয় শাসনের জন্য একরূপ ষ্টেটের প্রয়োজনও রোমক চার্চ্চ স্বীকার করিতেন এবং তার জন্য The Holy Roman Empire (রোমক রাষ্ট্র-মহামণ্ডল বা ধর্ম্মরাজ্য) নামে ইয়োরোপব্যাপী এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠারও চেষ্টা হয়। কিন্তু রোমক চার্চ্চ বা ধর্ম্মমহামণ্ডল এই Empire বা রাষ্ট্র মহামণ্ডলের অধীনতা কখনও স্বীকার করেন নাই, বরং তাহাকেই আপনার প্রভুত্বের অধীন করিয়া রাখিতে চাহিয়াছেন। তারপর এই 'রাষ্ট্রমহামণ্ডল' নামেই মাত্র সমগ্র ইয়োরোপীয় খৃষ্টানমণ্ডলীয় রাষ্ট্রীয় প্রভু ছিল, কার্য্যতঃ ইহার কোনও কর্ত্তৃত্ব জর্ম্মাণীর বাহিরে অন্য কোনও দেশে স্বীকৃত হয় নাই। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া রোমক চার্চ্চের এমন একটা অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অপ্রতিহত প্রভুত্ব ইয়োরোপের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকে, যে বিভিন্ন দেশের রাজারা পর্য্যন্ত তাহার নিকটে শির নত করিয়া চলিতেন। তখনকার উচ্চাঙ্গের বিদ্যা যাহা কিছু তাহাও রোমক চার্চ্চের যাজকমণ্ডলীর আয়ত্ত ছিল। এবং এই বিদ্যার ভাষাও ছিল রোমক (লাটিন) ভাষা, রোমক চার্চ্চের ধর্ম্মসাহিত্যের ভাষা। এক ধর্ম্ম, এক ধর্ম্মশাসনপদ্ধতি, এক বিদ্যা, একই শিক্ষা দীক্ষা এবং সর্ব্বতোভাবে তাহা আবার সব দৃঢ়সঙ্ঘবদ্ধ এক সম্প্রদায়ভুক্ত যাজকমণ্ডলীর কর্ত্তৃত্বে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত।—ফলে

বিভিন্ন দেশের অধিবাসী এবং বিভিন্ন রাজার প্রজা হইলেও ইয়োরোপীয় জনগণের মধ্যে সমান চিন্তায়, সমান চরিত্রের আদর্শে এবং আচার নিয়মে সমান এক সভ্যতার (Civilisation) এর বিকাশ ঘটে, এবং এমন এক সমাজজীবন তাহার প্রভাবে গড়িয়া উঠে, যাহা কোনও রাষ্ট্রশাসনের উপরে নির্ভর করিত না। রোমকচার্চ্চের ধর্ম্মই ছিল সর্ব্ববিধ কর্ম্মক্ষেত্রে মানবজীবনের একমাত্র নীতির ভিত্তি। রাজারা যে রাজ্যশাসন করিতেন, সে অধিকারের ভিত্তিও ছিল এই ধর্ম্মে। ষ্টেট্ বলিয়া যাহা কিছু তখন ছিল, এই ধর্ম্মের প্রভুত্ব মানিয়া চলিত, এই ধর্ম্মের বা ধর্ম্মে আশ্রিত সমাজ-জীবনের উপরে কোনও প্রভুত্ব করিতে পারিত না। জাতীয় বা 'রেসীয়' (racial) প্রকৃতিতে ইয়োরোপের অধিবাসীবর্গের মধ্যে এমন কোন বৈষম্য ছিল না, যাহা এই সমান ধর্ম্মশাসনে ও সমান সভ্যতার বিকাশে তাহাদের এরূপ সম-সমাজিকতায় মিলনের পক্ষে বড় বাধা হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

তারপর, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ইয়োরোপে এক মহা পরিবর্ত্তনের সাড়া পড়িয়া গেল; ইয়োরোপীয় সভ্যতার গতি পুরাতন পথ ছাড়িয়া নূতন পথে নূতন এক লক্ষ্যের দিকে ছুটিল। এক যুগান্তর আসিয়া উপস্থিত হইল। মধ্যযুগের অবসান এবং আধুনিক যুগের অভ্যাগম বলিয়াই ঐতিহাসিকগণ এই যুগান্তরকে স্বীকার করিয়া নিয়াছেন। কি সব কারণে ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে এই যুগান্তরের সূচনা হয়, এবং ইয়োরোপীয় সভ্যতার জীবনে কি সব নূতন লক্ষণ ইহাতে দেখা দেয়, তার বিস্তৃত আলোচনা করিবার অবসর এস্থলে নাই, অনাবশ্যকও বটে। তবে ইয়োরোপীয় সমাজের উপরে ইহার কি প্রভাব আসিয়া পড়ে এবং কি পরিবর্ত্তন তাহার প্রকৃতিতে ঘটে, তার সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি কথা বলিতে হইবে।

মধ্যযুগে রোমকচার্চ যে সর্ব্বময় একটা প্রভুত্ব ইয়োরোপীয় সমাজের উপর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, এবং প্রধানতঃ যে প্রভুত্বই

ইয়োরোপীয় সমাজকে তার বিশিষ্ট আকারে গড়িয়া তুলিতেছিল, ধরিয়া রাখিয়াছিল, সেই প্রভুত্বশক্তির পতনকেই এই যুগান্তরের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা বলা যাইতে পারে। এবং এই প্রভুত্বের বিরুদ্ধে অতি প্রবল ও ব্যাপক একটা বিদ্রোহের আকারেই এই যুগান্তরের সূচনা হয়। এই বিদ্রোহ ইয়োরোপের ইতিহাসে 'রিফর্ম্মেশন' (The Reformation) বা 'ধর্ম্ম সংস্কার' নামে পরিচিত। বিদ্রোহের ফলে প্রত্যেক দেশেরই বহুলোক রোমক চার্চ্চের প্রভুত্বকে অস্বীকার করিয়া তাহার শাসনগণ্ডীর বাহিরে আসিয়া পড়িল। কোনও কোনও দেশের রাষ্ট্রাধিপতিরাও রোমক চার্চ্চকে ত্যাগ করিয়া আপনাদের প্রভুত্বের অধীন পৃথক পৃথক চার্চ্চ বা ধর্ম্মমণ্ডল প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই চার্চ্চগুলি সাধারণতঃ প্রটেষ্ট্যাণ্ট (Protestant) চার্চ্চ নামে পরিচিত হয়। কারণ রোমক চার্চ্চের ভ্রান্ত পদ্ধতির প্রটেষ্ট (protest) অর্থাৎ তাহার বিরুদ্ধ-মত প্রকাশ করিয়া পৃথক ভাবে আপনাদের প্রতিষ্ঠা ইহারা করে। এতদিন এক রোমক চার্চ্চই ছিল সব ষ্টেটের উপরে কর্ত্তা। এখন এই সব ষ্টেটই হইল যার যার পৃথক্ চার্চ্চের কর্ত্তা। এ অবস্থায় ষ্টেট-নিরপেক্ষ হইয়া কোনও চার্চ্চের ধর্ম্ম যে সমাজের ধারকশক্তি হইয়া থাকিতে পারে না, একথা বলাই বাহুল্য। যে সব দেশে রাষ্ট্রাধিপতিরা রোমক চার্চ্চকেই মানিয়া চলিতেন, সেখানেও বহু প্রজা পৃথক্ ধর্ম্মমত অবলম্বন করিয়াছিল। দুই ধর্ম্মমতে বিষম বিরোধও চলিত। রাজশক্তি বিরুদ্ধ ধর্ম্মমতকে নিষ্ঠুর পীড়নে দমন করিতেই সর্ব্বদা প্রয়াস পাইতেন। এ অবস্থায় এ সব দেশেও রোমকচার্চ্চ সমাজের ধারক শক্তি হইয়া আর থাকিতে পারিল না। এক চার্চ্চের স্থলে এইরূপ বহু চার্চ্চের উদ্ভব হওয়ায় সমগ্র ইয়োরোপীয় সমাজের মধ্যে একটা সংহতি রাখিবার মত শক্তিও আর ধর্ম্মনীতির রহিল না।

* মধ্যযুগে ইয়োরোপীয় বিদ্যাও সর্ব্বতোভাবে রোমক চার্চ্চের ধর্ম্ম-নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া চলিত। ইহার গণ্ডীর বাহিরে আর কোনও দিকে নিরপেক্ষ প্রতিভার নূতন কোনও আলোকে কোনও নূতন তত্ব, নূতন

নীতির অনুসন্ধান কোথাও বড় হইত না। কেহ করিতে প্রয়াসী হইলেও কঠোর দণ্ডে রোমক চার্চ্চ তাঁহাকে শাসন করিতেন। কিন্তু খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে এমন কতকগুলি নূতন অবস্থা আসিয়া পড়ে, যাহাতে প্রাচীন গ্রীক ও রোমক বিদ্যার বহুল প্রচার ইয়োরোপে আরম্ভ হয়। এই বিদ্যা অন্ধভাবে পুরুষপরম্পরাগত বিশিষ্ট কোনও ধর্ম্মনীতির নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া বড় চলিত না।' মানবের নিরপেক্ষ বুদ্ধির প্রতিভাই ছিল ইহার প্রধান উৎস।

এই বিদ্যার প্রভাবে ইয়োরোপের বুদ্ধি ও চিন্তাও রোমক চার্চ্চের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাধা অতিক্রম করিয়া আশ্চর্য্য এক প্রসার লাভ করে, এবং বহু নূতন নূতন পথে নূতন নূতন জ্ঞানের সংগ্রহে ও অনুসন্ধানে যারপরনাই আগ্রহশীল হইয়া উঠে। যে যুগান্তর এই সময়ে ইয়োরোপে ঘটে, বুদ্ধির ও চিন্তার এই বন্ধনমুক্তি তাহার প্রধান একটি কারণ। যাহা হউক, অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে গ্রীক ও রোমক আমলের রাষ্ট্রনীতিবিদ্যাও ইয়োরোপে প্রচারিত হয়, এবং রাষ্ট্র ও সমাজ সম্বন্ধে কেবল রোমক চার্চ্চের মতকে অনুসরণ না করিয়া, ইয়োরোপের বুদ্ধি অনেক পরিমাণে গ্রীক ও রোমক মতের অনুবর্ত্তী হইয়া পড়ে।

এই সময়ে আবার আরও অনেক কারণে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের রাজাদের শক্তিও বড় বাড়িয়া উঠে, এবং এমনই স্বপ্রতিষ্ঠ ভাবে তাঁহারা শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন যে প্রজামণ্ডলী প্রধানতঃ তাহারই বশ হইয়া পড়িল এবং এই রাজশক্তিই তাহাদের মধ্যে সংহতির প্রধান আশ্রয় হইয়া উঠিল। রোমক চার্চ্চের আর সেদিন নাই। অন্যবিধ চার্চ্চ যে দেশে যাহা আছে, তাহাও আবার রাজশক্তির অধীন।

রোমক চার্চ্চের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ইয়োরোপের চিন্তা-প্রবাহ তাহার নূতন পথে অবাধগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে Rationalism নামে নূতন এক ধারা ইহার মধ্যে আসিয়া

নূতন এক প্রকৃতি ইহাকে দিল, আরও নূতন এক পথে ইহাকে পরিচালিত করিতে থাকিল। নিজের Reason বা বুদ্ধিই মানুষের জীবনের একমাত্র পথপ্রদর্শক, কোনও ধর্ম্মের কি পরম্পরাগত কোনও রীতি-নীতির এমন কোনও অধিকার নাই, যে নির্দ্দিষ্ট কোনও পথে তাহাকে পরিচালিত করিবে, যদি নিজের বুদ্ধিতে সে তাহা ভাল বলিয়া না গ্রহণ করে। অন্যান্য বিষয়ে যেমন, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও সে তেমনই স্বাধীন, নিজের বুদ্ধিতে যে মত সে ভাল মনে করিবে, তাই গ্রহণ করিবে, তদনুসারেই চলিবে। সর্ব্বোপরি মানুষের নিরপেক্ষ Reason বা Rationalityই তাহার জীবনের নিয়ন্তৃ, তাই এই মতবাদ Rationalism নামে পরিচিত হয়। কেবল রোমক চার্চ্চের নয়, যে কোনও প্রকার চার্চ্চের প্রভুত্বেরও কোনও অধিকার এই মতবাদ অস্বীকার করে। রিফর্ম্মেশন বা ধর্ম্মসংস্কারের যুগে রোমক চার্চ্চকে ধর্ম্মের authority বা প্রামাণিক শক্তি বলিয়া না মানিলেও, খৃষ্টীয় মূলধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলকে ধর্ম্মের authority বা প্রামাণিক শক্তি বলিয়া ইয়োরোপের বুদ্ধি মানিয়া চলিয়াছে, এবং বাইবেলের প্রমাণের উপরেই প্রটেষ্টাণ্ট চার্চ্চ-সমূহের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কেবল তাই নয়, কোনও না কোনও চার্চ্চের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ অঙ্গাঙ্গীভাবের একটা সম্বন্ধ ছাড়া, একেবারে ধর্ম্মনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র কোনও ষ্টেটের কল্পনাও কেহ করেন নাই। কিন্তু Rationalism কোনও চার্চ্চের এটুকু অধিকারও স্বীকার করে না, ষ্টেট্‌কে একেবারে ধর্ম্মনিরপেক্ষ কেবল রাষ্ট্রীয়শক্তির আধারে পরিণত করিতে চায়।

ষ্টেট্ হইতেছে ষ্টেট্, চার্চ্চ হইতেছে চার্চ্চ। একের কর্ম্মক্ষেত্র, অপরের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে পৃথক্ এবং পৃথক্ করিয়া রাখাই ভাল। মানুষ যখন তার ধর্ম্মের কথা ভাবিবে, ধর্ম্মানুষ্ঠান কিছু করিবে,—তখন যে চার্চ্চ তার ভাল লাগে তার সঙ্গে গিয়া জুটুক, তার পদ্ধতি অনুসারে চলুক, যদি কোনও চার্চ্চের সঙ্গে এরূপ একটা সম্বন্ধ রাখিয়া চলা তার প্রয়োজনই হয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় জীবন

স্বতন্ত্র আলাদা। যে ধর্ম্মমতের লোকই যে হউক, এক দেশের অধিবাসী হইলে একই ষ্টেটকে ধরিয়া এই রাষ্ট্রীয় জীবনে তাকে চলিতে হইবে। সুতরাং ধর্ম্মমতে মানুষের স্বাধীনতাকে মানিতে হইলে, কোনও এক চার্চ্চের সঙ্গে ষ্টেটের এইরূপ ঘনিষ্ঠ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ থাকিতে পারে না।

কথাটার যুক্তিসঙ্গতি অস্বীকার করা যায় না। বিভিন্ন ধর্ম্মমতের লোক যদি এক দেশের অধিবাসী এবং এক রাষ্ট্রের বা ষ্টেটের প্রজা হয়, তবে কোনও বিশিষ্ট ধর্ম্মপদ্ধতির সঙ্গে এরূপ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে মিলিয়া কোনও ষ্টেট্ চলিতে পারে না। চলিলেও, যারা ভিন্নধর্ম্ম-মতাবলম্বী ষ্টেট্ তাহাদের আপন ষ্টেট্ হয় না, অধীন প্রজার ন্যায় এই ষ্টেটের শাসন তারা মানিয়া চলিতে বাধ্য হয় মাত্র। অন্যথা এই মিলনের কোনও সার্থকতা থাকে না। নামতঃ একটা মিলনমাত্র থাকিতে পারে, রাষ্ট্রীয় কোনও উৎসব চার্চ্চের বিধি অনুসারে সম্পন্ন তাহাতে হইতে পারে,—কিন্তু কোনও কর্ম্মে চার্চ্চের কোনও প্রভাব চলে না। ষ্টেটের অঙ্গে বাহ্যিক একটা ভূষার আড়ম্বরের মতই চার্চ্চ থাকিয়া যায়। থাকায়, ষ্টেটের শোভা কিছু বাড়ে, ত্যাগ করিলেও কাজের ক্ষতি কিছু হয় না। বরং একটা ভার কমিয়া যায়, কাজের গতি আরও সহজ হয়। বলা বাহুল্য, ইয়োরোপে ষ্টেটের সঙ্গে যে সব চার্চ্চ রহিয়া গেল, সে গুলির অবস্থা এইরূপই হইল।

কিন্তু ষ্টেট্ ধর্ম্মনিরপেক্ষ হইলেও সমাজকেও যে ধর্ম্মনিরপেক্ষ হইয়া একেবারে সেই ষ্টেটের উপরেই আপন অস্তিত্বের জন্য নির্ভর করিতেই হইবে, এমন কোনও কথা নাই। করিতে হয় না, যদি ধর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে এমন প্রাণ, এমন শক্তি থাকে, যাহা রাষ্ট্রনিরপেক্ষ হইয়াও সমাজকে আপন বিশিষ্ট স্বরূপে ধরিয়া রাখিতে পারে। কিন্তু ইয়োরোপীয় কোনও চার্চ্চের এরূপ প্রাণ, এরূপ শক্তি, তখন ছিল না। কি করিয়া থাকিবে? আপন স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া চার্চ্চগুলি যে ষ্টেটের অধীন—তার যন্ত্ররূপে পরিণত হইল। বলিতে হইবে, 'ধর্ম্ম' ইতার স্বধর্ম্ম-

হইতে ভ্রষ্ট হইল,—অতিপার্থিব (super-material বা spiritual) যে বস্তু, তাহা পার্থিব (material বা temporal) শক্তির বশীভূত হইয়া পড়িল। তারপর আবার মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা পড়িল, যখন ষ্টেটের বহু প্রজা এই চার্চ্চের সঙ্গেও সম্বন্ধ ত্যাগ করিল, করিয়াও ষ্টেটের অঙ্গীয়, ষ্টেটের শক্তিধর ও সর্ব্বপ্রকার অধিকার-ভোগী প্রজা হইয়া রহিল। অবশ্য প্রথম প্রথম ষ্টেট তাহার চার্চ্চের বাহিরের কোনও প্রজাকে এইসব অধিকার ভোগে বঞ্চিত রাখিতে বহু প্রয়াস পাইয়াছে, নানারূপ পাড়নেও তাহাদের দমন করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু ক্রমে এই দমননীতি ষ্টেট পরিহার করে এবং সর্ব্বপ্রকার অধিকার এই সব প্রজাদের দান করে। প্রজার ধর্ম্ম সম্বন্ধে ষ্টেটের এই উদার-নীতির বা policy of tolerationএর অনেক সুখ্যাতি ঐতিহাসিকগণ করিয়াছেন। আমিও অখ্যাতি করিতেছি না। এঅবস্থায় ইহাই উত্তম নীতি। তবে চার্চ্চের স্বার্থের দিক দিয়া বিচার করিতে হইলে বলিতে হইবে, ষ্টেট-চার্চ্চগুলি ইহার ফলে একেবারে নির্ব্বিষ ভুজঙ্গ সর্পের ন্যায় হইয়া পড়িল। ইয়োরোপের চার্চ্চ যেরূপ সংঘবদ্ধ হইয়া যে ভাবে জনসমাজের উপরে তাহার শাসন চালাইতে চাহিয়াছিল, তাহার সম্ভাবনা কিছু রহিল না। ক্রমে ইয়োরোপের সব ষ্টেট যখন democratic বা গণতান্ত্রিক আকার ধারণ করিল, ষ্টেট-চার্চ্চগুলি আবার সেই democracy বা গণ-শাসনের অধীন হইয়া পড়িল। ধর্ম্মনীতি জনসমাজকে শাসন করিবার শক্তি আগেই একরূপ হারাইয়াছিল। এখন নিজেই একেবারে জনসমাজের শাসনাধীন হইয়া পড়িল। গুরু যদি শিষ্যের শাসনাধীন হয়, তবে গুরুতে গুরুর ধর্ম্ম কিছু থাকিতে পারে না। প্রভু যদি দাসের দাস হয়, প্রভুনামের গৌরব তার বিড়ম্বনা মাত্র। তবে চার্চ্চ যখন ষ্টেটেরই অধীন হইয়াছে, তখন ষ্টেটের এই পরিণতির সঙ্গে তাহার ভাগ্যেরও এই পরিণতি অবশ্যম্ভাবী।

ষ্টেট-চার্চ্চকে যাহারা মানিত না, তাহাদের মধ্যে অনেক 'স্বতন্ত্র'

বা independent চার্চ্চের উদ্ভব হয়। এগুলি স্বতন্ত্র এই হিসাবে যে ষ্টেট্ চার্চ্চের শাসন মানিত না, তাহা হইতে পৃথক্ ছিল,—কিন্তু নিজ নিজ মণ্ডলীর জনগণের উপরে স্বীয় ধর্ম্মের শক্তি এই স্বাতন্ত্র্যের আশ্রয় ছিল না। মণ্ডলীর জনগণের মতে democratic বা গণতান্ত্রিক শাসনের ধরণেই, এই সব চার্চ্চের কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। এই একটি সত্য বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন, যে ধর্ম্মে democray বা গণশাসন-পদ্ধতি চলে না। দুই এক হইয়া এক পথে মিলিয়া থাকিতে পারে না। ধর্ম্ম ঋষির বাণী, গুরুর আদেশ, শাস্ত্রের উপদেশ; ধর্ম্ম বিশ্বাসের বস্তু, শ্রদ্ধায় গ্রহণ করিবার বস্তু। Democracy তাহার ভোটে আইন করিতে পারে, আইন মানিতে লোককে পার্থিব বলে বাধ্য করিতে পারে; কিন্তু এরূপ বিশ্বাসের বস্তু, শ্রদ্ধার বস্তু কাহাকেও দান করিতে পারে না। ধর্ম্ম শাসন করে তার ব্রহ্মণ্য-শক্তির প্রভাবে। Democrayর ভোটেব আইনে এ শক্তি নাই।

একে বিভিন্ন চার্চ্চের আবির্ভাবে সমগ্র ইয়োরোপায় সমাজের মধ্যে সংহতি রাখিবার মত কোনও শক্তি আর ধর্ম্মনীতির ছিল না। বিভিন্ন দেশের এইসব বিভিন্ন চার্চ্চগুলির দশাও এইরূপ দাঁড়াইল। তারপর আবার Rationalismএর প্রভাবে লোকের মতিগতিও এইরূপ হইয়া উঠিল যে সহজে কেহ বড় কোনও চার্চ্চের আনুগত্য করিতে চাহিত না। সমগ্রতায় মানবজীবনের একমাত্র ধারক ও পরিচালক ছিল যে ধর্ম্ম, ধর্ম্মনামের সার্থকতাই যাহাতে, তাহার অধিকার জীবনের ক্ষুদ্র একটি অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইল। জীবনের অন্যান্য সব ক্ষেত্র হইল secularised বা ধর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত; এবং এই মুক্তিই কাম্য বলিয়া, Rationalismএর বড় একটা সুফল বলিয়া, সকলে গ্রহণ করিলেন। এ অবস্থায় সংহতির জন্য প্রত্যেক দেশের জনগণ যে ষ্টেটকেই একেবারে আঁকরিয়া ধরিবে, ষ্টেটের উপরেই একান্তভাবে নির্ভরশীল হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। ষ্টেট গুলিও আবার নানা কারণে বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। তারপর democracy বা

গণ-শাসননীতির প্রভাবে প্রত্যেক ষ্টেট্ তার প্রজাবর্গের এমন নিজস্ব বস্তু হইয়া উঠিল, তাহার শক্তি স্বার্থ ও মঙ্গলের সঙ্গে আপনাদের শক্তি স্বার্থ ও মঙ্গলের এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহারা অনুভব করিল, ক্রমে এই অনুভূতি হইতে ষ্টেটের প্রতি এমন শ্রদ্ধার আকর্ষণও তাহাদের চিত্তে আসিল, যে আপন হইতে ষ্টেটকে অনেক বড় বলিয়া লোকে দেখিতে শিখিল, তার মঙ্গলের জন্য হেলায় আপন আপন ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রমঙ্গলকে অনায়াসে বলি দিবার শক্তি তাহাদের জন্মিল। ইহাই Spirit of Nationalism, যাকে বাঙ্গলায় আমরা জাতীয়ত্ব-বোধ, দেশাত্ম-বোধ, কখনও বা জাতীয়ধর্ম্ম (National Religion নয়, Nationalism) বলিয়া থাকি। এই সব অবস্থার গতিকে, এই Spirit of Nationalism বা জাতীয়ত্ব বোধের প্রেরণায়, ইয়োরোপীয় সমাজ বিভিন্ন দেশের ষ্টেটের আশ্রয়ে বিভিন্ন নেশনে পরিণত হইয়াছে। রোমক চার্চ্চ এক খৃষ্টীয় ধর্ম্ম এবং একই খৃষ্টীয় ষ্টেট (The Holy Roman Empire)এর মিলিত শাসনে ইয়োরোপের অধিবাসীবৃন্দকে * এক খৃষ্টীয় সমাজের (Christian Social Organism এর) আকারে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু এ চেষ্টা তাহার সফল হয় নাই। খৃষ্টীয় ষ্টেট্ (The Holy Roman Empire) কোনও দিনই তেমন শক্তিশালী ছিল না। কিন্তু এই অভাব সত্ত্বেও আপনার একক শক্তিতেই রোমক চার্চ্চ তাহার শিষ্য ইয়োরোপকে এক 'ধর্ম্ম সমাজে' বাঁধিয়া

* এখানে ইয়োরোপ বলিতে বর্ত্তমান রুষিয়া ও গ্রীস্ অঞ্চল বাদে বাকী মধ্য ও পশ্চিম ইয়োরোপকে বুঝিতে হইবে। কারণ ইয়োরোপের এই পূর্ব্ব অঞ্চল পৃথক্ একটি ধর্ম্মশাসনমণ্ডলের অধীন ছিল, যাহা সাধারণতঃ 'গ্রীক চার্চ্চ' নামে পরিচিত। এই কারণে রুষ গ্রীক অঞ্চল বহুশতাব্দী অবধি নব্য ইয়োরোপের সভ্যতার গণ্ডীর বাহিরে ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইয়োরোপের সঙ্গে ইহার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সম্বন্ধ আরম্ভ হয় এবং ক্রমে তাহার ফলে ইয়োরোপীয় সভ্যতার গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়ে।

রাখিতেছিল। যদি এই শক্তিতে রোমক চার্চ্চ সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিত, তবে হয়ত ইয়োরোপীয় সমাজ এইরূপ এক স্বরূপেই তার পূর্ণ পরিণতি লাভ করিত। রাষ্ট্রনীতি ধর্ম্মনীতির উপরে উঠিত না, কেবল যার যার ষ্টেটের হইয়া, ষ্টেট্‌কে লইয়াই, পরস্পর দারুণ প্রতিদ্বন্দী এতগুলি নেশনের অভ্যুদয় ঘটিত না। যাহা হউক, রোমক চার্চ্চের এই চেষ্টা সফল না হউক, একেবারে বিফলও হয় নাই। সমগ্র ইয়োরোপে স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বায়ত্ত এমন একটি সমাজ (Social organism) হয় নাই বটে, যাহা ষ্টেট্-নিরপেক্ষ হইয়াও দাঁড়াইতে পারে,—তবে সমান সভ্যতায় ও বিদ্যায়, সমান চিন্তায় ও নীতির আদর্শে, ইয়োরোপীয় জনগণের মধ্যে এমন একটা যোগ আছে, এবং এমন একটা সম-সামাজিকতার ছাপ তাহাদের প্রকৃতিতে পড়িয়াছে, যাহাতে (ব্লুণ্টস্‌লি সাহেবের মতে) এক সোসাইটী Society তাহাদের বলা যাইতে পারে। তাই, এই যে বিভিন্ন নেশন ইয়োরোপে হইয়াছে, তাও সব মোটের উপর একই প্রকৃতির ষ্টেট্ ধরিয়া, একইবিধ শক্তিতে, একই আকার ধরিয়া উঠিয়াছে। ইহারও মূল্য বড় কম নয়। এই মূল্যবত্তা, এই সমান সভ্যতা ও সম-সামাজিকতার ছাপ ইয়োরোপ যে পাইয়াছে, পাইয়াছে রোমক চার্চ্চের কাছে, তাহারই এই চেষ্টার ফলে। রোমক চার্চ্চের নিকটে ইয়োরোপের এই কৃতজ্ঞতার ঋণ বড় কম নহে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এই ঋণ আধুনিক ইয়োরোপ (অন্ততঃ তার প্রটেষ্টাণ্ট অংশ) স্বীকার করিতে বড় চায় না। বরং রোমক চার্চ্চের পতনে এবং ধর্ম্মের প্রভুত্ব হইতে মুক্ত ষ্টেটের আশ্রয়ে নূতন এক রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রভাবে এই যে সব নেশনের অভ্যুদয় হইয়াছে, ইহাই ইয়োরোপের বর্ত্তমান উন্নতির বড় একটা কারণ বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। তারপর ক্রমে এই সব ষ্টেট যে Democracy বা গণশাসনের ভিত্তিকে আশ্রয় করিল, এক একটি নেশনের জনগণ যে সকলেই ষ্টেট্ শক্তির সমান অধিকারী হইল, ইহাকে এই উন্নতির চরম অভিব্যক্তি বলিয়াই সকলে স্বীকার করিয়া নিলেন।

ইয়োরোপ এখন অতি বড়, শক্তি তার অতুলনীয়। ইয়োরোপের এই ডিমক্রাটিক্ নেশন সমূহের দুর্দ্দম বিক্রমে সমস্ত পৃথিবীই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে, ইহার গৌরবদীপ্তির জ্বলন্ত ছটায় সকলের চক্ষুও ধাঁধিয়া গিয়াছে। অত্যুজ্জ্বল এই কিরণকিরীট-মণ্ডিত উচ্চশির তুলিয়া গর্ব্বিত কণ্ঠে ইয়োরোপও ঘোষণা করিতেছে, আমাতে এই যে সব ডিমক্রাটিক নেশনের অভ্যুদয় হইয়াছে, সমষ্টি স্বরূপে মানবের শ্রেষ্ঠ আকার ইহাই, সমষ্টিশক্তির উচ্চতম পরিণতি ইহাতেই ঘটিয়াছে, তাই আমরা পৃথিবীতে দুর্জ্জয় হইয়া উঠিয়াছি, অজেয় হইয়া থাকিব। মানবসভ্যতা জীবনের এই ক্ষেত্রে ইহা অপেক্ষা উন্নততর আদর্শে উপনীত হইতে পারে নাই,—উন্নততর আদর্শ আর কিছু হইতেও পারে না।

পৃথিবী ভরিয়া এই ধ্বনির প্রতিধ্বনি উঠিতেছে, সকলেই একবাক্যে বলিতেছে, হাঁ তাই বটে, তাই বটে! নতশিরে ইহাকেই সত্য বলিয়া সকলে গ্রহণ করিতেছে। সর্ব্বত্র সকলেরই চেষ্টা হইতেছে, 'গণ'কে এই ভাবে প্রবুদ্ধ করিয়া, এই গণশাসনের ভিত্তির উপরে ষ্টেট্ গড়িয়া নিয়া, এমনই এক একটা শক্তিমান্ নেশন হইয়া উঠিবে। এই নেশনে মানুষ সকলেই সমান, সকলেরই সমান অধিকার, ইহাই সকলের পক্ষে প্রধান আকর্ষণের বিষয় হইয়াছে। কিন্তু একটি কথা এইখানে আমাদের ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ডিমক্রাসীতে (democracyতে) প্রজাবর্গের সমান রাষ্ট্রীয় অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু সামাজিক বৈষম্য দূর হয় নাই। কারণ ষ্টেট্ আইন করিয়া সমান রাষ্ট্রীয় অধিকার সকলকে দান করিতে পারে, কিন্তু মানুষে মানুষে স্বাভাবিক যে সব বৈষম্য হেতু সামাজিক বৈষম্য ঘটে, তাহা তুলিয়া দিতে পারে না। নানাকারণে আবার আর্থিক অবস্থার বৈষম্য আধুনিক ইয়োরোপে এই সামাজিক বৈষম্যকে যারপরনাই কঠোর করিয়া তুলিয়াছে। রাষ্ট্রীয় অধিকারের সঙ্গে আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার এই যে অসামঞ্জস্য, তাহার সঙ্কট কি হইতে পারে, এতদিন ইয়োরোপে প্রকাশ পায় নাই, অধুনা পাইতেছে। আর্থিক ও সামাজিক অবস্থায়

যাহারা হীন হইয়া আছে, গণ বা demos বলিতে প্রধানতঃ তাহাদেরই বুঝায়। সংখ্যার হিসাবে জনবলে তাহারাই অনেক বড়। ডিমক্রাসীর নিয়মে জনে জনে সকলেরই সমান ভোট (vote)। এই ভোটের বল যদি সমবেত ভাবে প্রয়োগ করিতে পারে, উচ্চতর শ্রেণী সমূহকে দেশের বুক, সমাজের বুক হইতে তাহারা একেবারে মুছিয়া ফেলিতে পারে। ইঁহাদের বিরুদ্ধে প্রধানতঃ আর্থিক বৈষম্যজাত দারুণ একটা বিদ্বেষের উত্তেজনায় এইরূপ চেষ্টাই এখন প্রাকৃত * জন সাধারণের অর্থাৎ গণ বা demosএর মধ্যে ইয়োরোপ ভরিয়া দেখা দিয়াছে। কিন্তু উচ্চতর শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ কেবল যে অধিক সম্পদের অধিকারী বলিয়াই বড়, তা নয়। উন্নত সংস্কার, উন্নত বুদ্ধি, উন্নত বিদ্যা ও জ্ঞানের অধিকার, সকল কর্ম্মে অধিকতর শক্তি ও যোগ্যতা, এই সব গুণেও বড়। এই সব গুণের অধিকারী বলিয়াই ধনে ইঁহারা বড় হইয়াছেন, 'জনসমাজের 'নায়কত্ব,' ইঁহাদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। কোনও একটা জাতির সভ্যতা বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, তাহার প্রধান আশ্রয় ও শক্তিধর ইঁহারাই। সংখ্যায় অল্প হইলেও, জনবহুল গণ বা demosকে মঙ্গলের পথে ইঁহারাই পরিচালিত করেন, সমাজের স্থিতি ইঁহারাই রক্ষা করেন। উচ্চতর কোনও নীতির প্রভাবে এই কর্ম্মক্ষেত্রে যদি দৃঢ়প্রতিষ্ঠা ইঁহাদের না থাকে, প্রাকৃত জনসাধারণ যদি কেবল তাহাদের জন বলেই ইঁহাদের একেবারে চাপিয়া রাখিতে কি লোপ করিয়াই ফেলিতে পারে, সে বিপ্লবের ফলে জাতির অস্তিত্বই লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। এইরূপ অন্তর্ব্বিপ্লবের সূচনাই ইয়োরোপখণ্ডে দেখা দিয়াছে। এই সঙ্কট-সমস্যার যে কি সমাধান হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া কেহ কূল

---

* শিক্ষার সংস্কারে পরিমার্জ্জিত নয়, উন্নতবুদ্ধির অধিকারী ও উন্নত আচারের যোগ্য হয় নাই, সমাজের এরূপ নিম্নস্তরের জনগণের বিশেষণস্বরূপ সংস্কৃত সাহিত্যে 'প্রাকৃত' কথাটি ব্যবহৃত হয়। ইংরেজি lower বা নিম্নতর, এবং আমাদের ভাষায় 'ইতর' কথাটি অপেক্ষা এটি অনেক ভাল কথা। ইহারই প্রচলন বাঙ্গলা ভাষায় হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়।

পাইতেছেন না। ডিমক্রাসীতে ইহার কোনও প্রতিবিধানের পথ নাই, বরং এই সঙ্কট আরও ঘনাইয়া আনিতেছে। কারণ যে অধিকারের বলে গণ বা demos এই অনর্থ ঘটাইতে পারে, ডিমক্রাসীই সেই অধিকার তাহাদের দিয়াছে।

প্রত্যেক নেশনের আভ্যন্তরিক অবস্থা এই। আবার বাহিরে নেশনে নেশনেও ঘোর একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংগ্রাম চলিতেছে। প্রত্যেক নেশনেরই প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে, কেমন করিয়া অপর সকলকে চাপিয়া রাখিয়া, বিপর্য্যস্ত করিয়া, আপনি পার্থিব বলে বলবত্তম হইবে,—পৃথিবীর ধন, পারিলে, একাই লুটিয়া খাইবে। বিগত মহামার জর্ম্মাণ সমর ইহার ফলেই ঘটিয়াছিল। আরও বড় মহামার সমরের আগুন ইয়োরোপে যে কোনও সময়ে জ্বলিয়া উঠিতে পারে। যদি উঠে, পৃথিবী ভরিয়া সে জ্বালা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, কারণ পৃথিবী লইয়াই ইয়োরোপের এই কাড়াকাড়ি। সমগ্র এই পৃথিবীই হইয়াছে, ইয়োরোপীয় জাতিসমূহের স্বার্থের দাবাখেলার ছক্।

ষ্টেট্সর্ব্বস্ব ইয়োরোপীয় নেশনসমূহের এই যে উন্নতির গর্ব্ব—হাঁ, ভৌতিক শক্তিতে ইহা তাহাদের যারপরনাই শক্তিশালী করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু জগৎবাসী মানবজাতির সুখশান্তি ও মঙ্গল তাহাতে কিছুই বাড়ে নাই, বরং ঘোর অশান্তি ও অমঙ্গলের হেতুই হইয়াছে ; নিজেদের মধ্যেও সুখশান্তি ও মঙ্গল কিছু প্রতিষ্ঠা করে নাই। ঘরে বাহিরে কেবলই অতি বিকট একটা আসুরিক লোভেরই নির্ম্মম কাড়াকাড়ি চলিতেছে, যাহাতে নিজেরাই একেবারে ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবার মত হইয়াছে। মানবের মঙ্গল প্রতিষ্ঠা যদি মানবসমাজের উন্নতির প্রধান লক্ষণ হয়, তবে ইয়োরোপে এই উন্নতির মূল্য যে কি তাহা ভাবিবার কথা বটে।

কিন্তু ভাবি কই আমরা? ইয়োরোপের আসল মূর্ত্তি যে কি, নেশন সমূহের অন্তর্দ্দেহ যে কি নিদারুণ ব্যাধির বিষে জর্জ্জর হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বুঝি তেমন করিয়া আমরা এখনও দেখিতে পাই নাই।

অথবা ইয়োরোপের প্রভুত্ব এখনও আমাদের বুদ্ধিকে এমনই দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, যে দেখিয়াও এই সত্যকে সে ধরিয়া নিতে পারিতেছে না,—তাই আমরা মনে করি, ভারতের হিন্দুসমাজ যে একটি ভারতীয় ষ্টেটের আশ্রয়ে বড় একটি ভারতীয় নেশন হইয়া উঠে নাই, ইহা হিন্দু সভ্যতার অতি শোচনীয় একটি ত্রুটি, অতি হীন দৈন্যের লক্ষণ। কিন্তু বাস্তবিক ইহা এইরূপ ত্রুটি ও দৈন্যের লক্ষণ না হইয়া উচ্চতর কোনও সত্যের দর্শন ও তাহার অনুবর্ত্তনের ফলও যে হইতে পারে, এ কথাটা কখনও মনেও বড় আমাদের উঠে না।

তবে একটি কথা ইহার মধ্যে আছে। ষ্টেট্ হইলেই যে তাহাকে ইয়োরোপীয় সব ষ্টেটর মত একেবারে secular বা ধর্ম্মানরপেক্ষ অথবা ধর্ম্মের উপরেও বড় কর্ত্তা রূপ ষ্টেট্ই হইতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। একই ধর্ম্মানুবর্ত্তী কোনও সমাজ সেইধর্ম্মের বিধিরই কর্ত্তৃত্বাধীন কোনও ষ্টেটের শাসনেও একরূপ নেশনের প্রকৃতি ধারণ করিতে পারে। রোমক চার্চ্চ, রোমক রাষ্ট্রমহামণ্ডল বা ধর্ম্মরাজ্যের (The Holy Roman Empire) দ্বারা সমগ্র ইয়োরোপীয় খৃষ্টানমণ্ডলীকে এইরূপ এক ষ্টেটের শাসনাধীন করিতে চাহিয়াছিলেন। সুন্নী মুসলমান সমাজে খলিফার শাসনও এই প্রকৃতির শাসন। আফ্রিকা ও এসিয়া খণ্ডে প্রাচীন আরও অনেক জাতির মধ্যে এইরূপ শাসনপদ্ধতি ছিল। এইরূপ শাসনকে Theocracy অর্থাৎ 'ভাগবত' বা ভগবদ্বিহিত ধর্ম্মের শাসন এবং এইরূপ ষ্টেট্কেও Theocratic State বা ধর্ম্মরাজ্য বলে। কিন্তু এই থিওক্রাসীর সঙ্গে ডিমক্রাসী চলে না। কারণ থিওক্রাসী বা ধর্ম্মরাজ্যের এই যে ধর্ম্ম, ইহা ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট (Revealed) ধর্ম্ম। ইহার শাস্ত্র আছে, ঋষি আছে এবং শাস্ত্রীয় ধর্ম্মবিধির অভিভাবক স্বরূপ বিশিষ্ট এক যাজকসম্প্রদায়ও আছে। ইঁহাদের কর্ত্তৃত্বই ষ্টেটের উপরে প্রধান, এবং প্রজাবর্গকে তাহা মানিয়া চলিতে হইবে। ডিমক্রাসী বা গণতন্ত্র তাহা মানিতে পারে না; কারণ Demos বা গণই তাহাতে সর্ব্বোপরি কর্ত্তা। গণের মতের উপরে কোনও সম্প্রদায়বিশেষের মত

চলিতে পারে না। Sovereignty of the People বা 'গণে'র রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বই—গণতন্ত্র বা ডিমক্রাসীর মূলনীতি। তারপর এই ডিমক্রাসীর সঙ্গে Rationalismএরও বড় ঘনিষ্ঠ একটা যোগ আছে। Rationalismকেই ইহার ভিত্তি বলা যাইতে পারে। Rationalism এরূপ কোনও প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্ম কি ধর্ম্মের শাস্ত্রকে মানে না।

ফরাসীবিপ্লবের যুগই ইয়োরোপে আধুনিক ডিমক্রাসীর আবির্ভাবের যুগ। Vox populi, vox Dei, 'জনগণের বাণীই ভগবদ্‌বাণী,' এই একটি কথা তখন ইয়োরোপে উঠিয়াছিল এবং ইহাকেই ডিমক্রাসীর তত্ত্বরহস্য বলিয়া অনেকে গ্রহণ করেন। প্রত্যেক মানবের নিরপেক্ষ বুদ্ধিকেই যদি সত্যদর্শনের শ্রেষ্ঠ ও অনাবিল আলোক বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যাইত, আর জনগণের সমবেত এই বুদ্ধির আলোকে সমান এক সত্যই যদি সর্ব্বদা প্রতিভাত হইত, তবে তাহাদের বাণীকেই ভগবদ্‌বাণী বলিয়া শ্রদ্ধায় গ্রহণ করিতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু কোথাও কখনও এরূপ হয় কি? কোন্ যুগে হইয়াছে কি? এরূপ হওয়ার অর্থ প্রত্যেক লোকেরই ঋষি হওয়া। সাধারণ মানবপ্রকৃতি কখনও এরূপ উন্নত স্তরে উঠিবে কিনা জানি না। যদি উঠে, কোন্ যুগে যে উঠিবে তাহার দূর কল্পনাও বোধ হয় কেহ করিতে পারিবেন না। জনগণ, এখনও যাকে ইংরেজিতে 'মব' (mob) বলে, তাই। এই 'মব্' যে সাধারণতঃ কি ভাবে চলে, কিরূপ সহজে যে কোনও সাময়িক উত্তেজনার বশে না বলে এমন কথা নাই, না করিতে পারে এমন অত্যাহিত নাই, ইহা সকলেই প্রতিনিয়ত দেখিতেছেন। ইহাদের এইরূপ সব বাণীকে ভগবদ্‌বাণী, আর এই সব কর্ম্মকে ভাগবত কর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে, হিতাহিত বিবেচনা একটু আছে—এমন কে যে প্রস্তুত হইতে পারেন, জানি না। ইহাও সকলে জানেন, জনগণ কেন, দশজন শিক্ষিত মানুষও একমত হইয়া বড় কাজ করিতে পারে না। তাই অগত্যা সকল রকম ডিমক্রাটিক বা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে মেজরিটীর (Majorityর) বা অর্দ্ধাধিক সংখ্যক লোকের মতকেই মাইনরিটীকে

(Minorityকে) অর্থাৎ অবশিষ্ট ন্যূনার্দ্ধ সংখ্যক লোককে মানিয়া চলিতে হয়। স্বেচ্ছায় না মানিলে বলে বাধ্য করিয়া মানাইতে হয়। অন্যথা ডিমক্রাটিক কোনও প্রতিষ্ঠান চলে না। যেখানে এ বল নাই, প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া ভাগ ভাগ হইয়া পড়ে। তারপর এই মেজরিটীকে আপনাদের স্বপক্ষে রাখিতে এক এক দলের নায়কবর্গকে যে কত চাল চালিতে হয়, তাহাও এ বিষয়ে অভিজ্ঞ সকলেই জানেন। ডিমক্রাসীকে উত্তম পদ্ধতি বলিতে আর যত যুক্তিই দেখান যাউক, Vox Populi, vox Dei (জনগণের বাণীই ভগবদ্‌বাণী) এই যুক্তির কোনও মূল্য নাই।

মানবের কল্যাণে ভগবদ্‌বাণী অবশ্য মানবের মুখেই ব্যক্ত হইবে, কিন্তু সে মানব সব আপ্তঋষি, সিদ্ধযোগী, তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারে ও ভগবদ্-ভাবের অনুপ্রেরণায় যাঁহারা সত্যদর্শন করেন, জীবাত্মায় পরমাত্মায়, জীবে শিবে, ভেদবুদ্ধি যাঁহাদের লোপ পায়। যত জীব তত শিব, কথাটা সত্য। কিন্তু জীবকে আগে তার শিবত্বকে সত্য বলিয়া অনুভব করিতে হইবে, তবে ত ?

মহাচক্রী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ছত্র-তলে ভারতে একটি ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিবেন, এই উদ্দেশ্যে কুরুক্ষেত্রের সেই মহাযুদ্ধ ঘটাইয়া ভারতের রাজন্যবর্গকে ধ্বংস করান, এইরূপ একটি কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। বর্ত্তমান মহাভারত হইতে এরূপ কোনও প্রমাণ ঠিক পাওয়া যায় কিনা জানি না। তবে মহাভারতের সেই মহামার যুদ্ধের ফলে ভারতব্যাপী এরূপ কোনও ধর্ম্মরাজ্য যে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, ইহা না বলিলেও চলে। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ এমন একটা চেষ্টা করিলেন, আর তাহা সার্থক হইল না একথা শ্রদ্ধেয় বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। হাঁ, প্রাচীন বৈদিক ও পৌরাণিক যুগ হইতে ঐতিহাসিক যুগের শ্রীহর্ষের সময় পর্য্যন্ত অনেক শক্তিমান্ রাজা যে অন্যান্য রাজাদের পরাভূত করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী বা সার্ব্বভৌম সম্রাটের পদ লাভ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন,

একথা সত্য। কিন্তু কাহারও চেষ্টায় ভারতব্যাপী স্থায়ী কোনও ষ্টেট্ কখনও হয় নাই, অথবা সেইরূপ কোনও ষ্টেটের আশ্রয়ে ভারতের হিন্দুসমাজও নেশনের আকার ধরে নাই, ধরিবার মতও হয় নাই। রাজারা কেহ কেহ চক্রবর্ত্তী সম্রাট্ হইবার চেষ্টা করিয়াছেন, সে চেষ্টা কতক পরিমাণে কিছুকালের জন্য সফলও হইয়াছে। কিন্তু তারপরেই আবার ভারত বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই সব রাজ্যেও প্রজারা যে কোথাও কখনও নেশন হইয়া উঠিয়াছে বা উঠিবার মত হইয়াছে, এমন কিছু বুঝা যায় না।

রাজ্য ছিল, রাজা ছিল, রাজশাসন ছিল, শাসনপদ্ধতি কি নিয়মে চলিবে তার জন্য দণ্ডনীতি (Politics বা State-craft) নামে বড় একটা শাস্ত্রও ছিল। রাজারা যে একেবারে স্বতন্ত্র বা স্বেচ্ছাচারী (autocrat বা irresponsible despot) ছিলেন, তাও নয়। কোনও এক রাজবংশের ধারাবাহিক শাসনও সুদীর্ঘকাল অনেক রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু তবু ইয়োরোপে যেরূপ সব ষ্টেটের অভ্যুদয় হইয়াছে, ঠিক সেরূপ প্রকৃতির রাষ্ট্রসংহতি বা রাষ্ট্রসংঘ কখনও ভারতে দেখা দেয় নাই।—এইরূপ ষ্টেট্ বলিলেই বুঝিতে হইবে, তার রাষ্ট্রশক্তিই (Political power) তাহাতে সর্ব্বপ্রধান প্রভুশক্তি, রাষ্ট্রীয় প্রকৃতিই (Political character) প্রজাবর্গের জীবনের প্রধান লক্ষণ এবং সমরাষ্ট্রীয়তাই (common political life) তাহাদের সংহতির প্রধান ভিত্তি হইয়াছে। মানুষ সর্ব্বোপরি তার দেশের বা ষ্টেটের citizen বা প্রজা, তার পরে সে তার সমাজের সামাজিক, তার ধর্ম্মের শিষ্য। ঠিক এইরূপ আদর্শের প্রভাবেই অধুনা দেশভক্ত ভারতবাসী কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, 'I am an Indian first, and then a Hindu or a Mohammadan'। ষ্টেট্ এবং ন্যাশনালিটিকে, নিজের রাষ্ট্রীয়জীবনকে এবং তাহার সব দায়িত্ব কর্ত্তব্যকে, সর্ব্বাপেক্ষা বড় করিয়া দেখিলে এই কথাই বলিতে হয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয়ধর্ম্মের গুরুত্ব যত বড়ই হউক, তাহাই মানবজীবনের

একমাত্র প্রধান ধর্ম্ম হইয়া এদেশে কখনও উঠিতে পারে নাই। দণ্ডনীতির যতই মহিমা নীতিশাস্ত্রকারগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকুন, তাহাই মানবসমষ্টির সংহতির প্রধান আশ্রয় এদেশে কখনও হয় নাই।

থিওক্রাটিক (Theocratic) বা ধর্ম্মাশ্রিত ষ্টেটে ধর্ম্মকেই সংহতির মূল আশ্রয় বলিয়া ধরিলেও রাষ্ট্রীয়প্রকৃতিই তার মধ্যে প্রধান হইয়া দাঁড়ায়। ধর্ম্মের অভিভাবক স্বরূপ যাজকসম্প্রদায় ষ্টেটের শাসনশক্তির সহায় হইয়া, তাহাকে প্রবল করিয়া, আপনাদের শাসন তাহারই মধ্যদিয়া প্রজাবর্গের উপরে প্রয়োগ করেন। রাজদণ্ডই ধর্ম্মশাসনের প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠে। ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ প্রাচীন হিন্দুরাজ্যগুলিকে থিওক্রাটিক ষ্টেটের শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। হাঁ, দণ্ডনীতির ক্ষেত্রে ধর্ম্মনীতিরও বড় একটা প্রভাব ছিল। রাজশাসন ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধিকে লঙ্ঘন করিয়া যাইত না, এবং ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ই এই বিধির ব্যাখাতা ছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মনীতি তার প্রতিষ্ঠার জন্য, সমাজকে তার ধর্ম্মের পথে স্থিত রাখিবার জন্য, আধ্যাত্মিক জীবনে শ্রেয় লাভ মানবের কিসে হইবে তার জন্য, রাজশাসনের উপরে নির্ভর বড় করিত না।

মানবধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝায়, মানবজীবনে তাহারই নিরপেক্ষ ও স্বায়ত্ত অধিকার ছিল অনেক বড়, অনেক বেশী ব্যাপক। রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম ছিল, তার বিশিষ্ট একটি অঙ্গ মাত্র, তার পূর্ণাঙ্গ আকার নয়, প্রধান অঙ্গও নয়। তার যে প্রাণ, তাহাই ছিল রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মের প্রাণের আশ্রয়। রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম তাহাকে প্রাণ দিয়া রক্ষা করিত না। নিরপেক্ষ ও স্বায়ত্ত এই মানবধর্ম্মের প্রভাব এত বড় ছিল, এমন উচ্চতর ছিল, তাই রাষ্ট্রীয়শক্তির পতনের পরেও সাত আটশত বৎসর হিন্দুসমাজ এই ধর্ম্মের আশ্রয়ে আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছে। থিওক্রাটিক ষ্টেটে ধর্ম্ম এমনই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সম্বদ্ধ থাকে, এত বেশী তাহার উপরে নির্ভর করে, যে ষ্টেট্‌-শক্তির পতনে কেবল ধর্ম্ম

কোনও সমাজকে এত দীর্ঘকাল এমন ধরিয়া রাখিতে বড় পারে না। অন্য কোনও রূপ ষ্টেট্‌ত একেবারেই পারে না।

বিশিষ্ট একটা Creed ও Ritual—ধর্ম্মমত ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি—এবং তদনুসারে জনসমাজকে চালাইবার জন্য দৃঢ়সংঘবদ্ধ (organised) একটি যাজক সম্প্রদায়, এই দুইটি মূল-করণ বা factorএর সংযোগ ব্যতীত কোনও থিওক্রাটিক ষ্টেট্ গড়িয়া উঠে না। কিন্তু এরূপ কোনও বিশিষ্ট Creed বা Ritual হিন্দুধর্ম্মে নাই, যাহা সকলকেই মানিয়া চলিতে হইবে। হিন্দুর সমাজ যেমন বহুস্তরের বহুবিধ জাতির ও সম্প্রদায়ের অতি বিচিত্র একটা বৃহৎ সমবায়, হিন্দুর ধর্ম্মও তেমনই বহুস্তরের বহুবিধ মতের অতি বিচিত্র ও বৃহৎ একটা সমবায়। স্তরের ও প্রকৃতির বহু বৈষম্য সত্ত্বেও মূল নীতির আদর্শে ও পরিণামের লক্ষ্যে এমন কতক গুলি সমতা আছে, যাহাতে এই বিচিত্র সমবায় ঘটিয়াছে, এবং এক এই 'হিন্দু' নাম বিশাল এই মানবসমষ্টির ধর্ম্ম ও সমাজ উভয়ের বিশেষণেই প্রযুক্ত হইতে পারে, এবং হইয়াছেও বটে। এরূপ ধর্ম্মে এক-সংঘবদ্ধ কোনও যাজকসম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইতে পারে না। সমাজশাসনের জন্য এরূপ সংঘগঠনের প্রয়োজনও হিন্দুর ধর্ম্মগুরু ভারতের ব্রাহ্মণবর্গ কখনও অনুভব করেন নাই। যে বলে সমাজকে তাঁহারা ধর্ম্মপথে পরিচালিত করিতেন, তাহা এইরূপ সংঘগঠনের অপেক্ষাও রাখে না।

এই সব অবস্থার কথা বিবেচনা করিলে হিন্দুরাজ্যগুলিকে ঠিক থিওক্রাটিক ষ্টেট্‌ও বলা যায় না। তাই থিওক্রাটিক ষ্টেটের আশ্রয়েও যে বিশিষ্ট এক প্রকৃতির নেশন গড়িয়া উঠিতে পারে, সেরূপ নেশনও এদেশে হয় নাই।

তারপর নেশন বলিলেই বুঝিতে হইবে, তাহাদের আপনাদের মধ্যে আভ্যন্তরিক যেমন একটা রাষ্ট্রীয় স্বার্থের মিলন আছে, বাহিরের এইরূপ অন্যান্য নেশনের সঙ্গে তেমনই রাষ্ট্রীয় স্বার্থের বড় একটা বিরোধও আছে। রাষ্ট্রীয় স্বার্থে এই মিলনের ও বিরোধেরই স্বভাবই

নেশনের প্রধান স্বভাব হইয়া উঠে। আবার এই স্বার্থের সঙ্গে জীবনের অন্যান্য স্বার্থও এমনই ভাবে সংসৃষ্ট হইয়া পড়ে যে এই স্বার্থরক্ষাই তাহাদের সমষ্টিজীবনের প্রধান লক্ষ্য হয়। কারণ, এই স্বার্থ রক্ষিত না হইলে সমস্ত জীবনেই বড় একটা বিপর্য্যয় আসিয়া পড়ে। কিন্তু বিদ্যায়, আধ্যাত্মিক ধর্ম্মসাধনায় এবং সামাজিক অন্যান্য বহু সম্বন্ধে, ভারতীয় বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে এমনই একটা ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, যে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ তাহাকে অভিভূত করিয়া এত উপরে কখনও উঠিতে পারে নাই, যাহাতে এই মিলন ও বিরোধের ভাবই কোনও এক রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে প্রধান হইয়া দাঁড়াইবে এবং রাষ্ট্রীয়স্বার্থরক্ষার উপযোগী শক্তিসঞ্চয়ের দিকেও তাহারা অতি-মাত্রায় আগ্রহশীল হইবে। তাই political life ও nationality—রাষ্ট্রীয় জীবন ও রাষ্ট্র-জাতীয়তা—এদেশে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই। উঠিয়াছে, এদেশের বিশেষ অবস্থায় যাহা উঠিতে পারে—রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ, রাষ্ট্রাতীত, ধর্ম্মাশ্রিত সমাজজীবন। তাই, রাজায় রাজায় যদিও অনেক যুদ্ধ হইত, এক রাজা অন্য রাজার রাজ্য জয়ও করিতেন, কিন্তু এমন কিছু বিপ্লব তাহাতে দেশের মধ্যে উপস্থিত হইত না যাহাতে জন-সমাজের জীবনযাত্রার ধারা একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। স্থান বিশেষে আচারনিয়মের ও অবান্তর অন্যান্য অবস্থার যতই পার্থক্য থাক, মোটের উপর এক দেশ, এক ধর্ম্ম ও এক সমাজ, রাজাও সব মোটের উপর একই ধরণের রাজা,—বিজিত রাজ্যের শাসনেও ইঁহারা অতি উদার এক নীতি মানিয়া চলিতেন। সুতরাং যিনিই যখন সিংহাসন অধিকার করুন, প্রজাবর্গের বিশেষ কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি তাহাতে হইত না। যুদ্ধবিগ্রহেও শাস্ত্রবিহিত এমন সুনীতির পথে রাজারা চলিতেন যে অনর্থক কোনও নিষ্ঠুর উৎপাত যুদ্ধে নির্লিপ্ত সাধারণ জনগণের উপরে হইত না। *

* The Laws of war have always been honourable and humane among the Hindus. These rules have been

সার্ব্বভৌম রাজনীতি যে দেশে এইরূপ, সেখানে রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার এমন একটা প্রয়োজনও বিভিন্ন রাজ্যের প্রজাবর্গ অনুভব করে না। রাষ্ট্রীয় স্বার্থ তাহাদের এমনই একটা তুচ্ছ স্বার্থ হইয়া দাঁড়ায়, যে তার টানে কোনওরূপ রাষ্ট্রীয়সংহতিও তাহাদের মধ্যে গড়িয়া উঠে না। রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য যাহা কিছু আয়োজন আবশ্যক,

---

scrupulously observed from the ancient times to the days of modern Rajput warfare, and foreigners have noted peaceful villagers following their daily occupations and husbandmen ploughing their fields without concern, while hostile armies were contending within sight for the destinies of kingdoms and nations. [The History of Civilisation in Ancient India, R. C. Dutt, vol, II. P. 103]

বিজিত রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় বিজয়ী রাজারা কি নীতি মানিয়া চলিতেন, তার সম্বন্ধে মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায় হইতে কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

(ক) জিত্বা সম্পূজয়েদ্দেবান্ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব ধার্ম্মিকান্।
প্রদদ্যাৎ পরিহারাংশ্চ খ্যাপয়েদভয়ানিচ ॥ ২০০॥

অনুবাদ।—এইরূপে রাজা জয়লাভ করিয়া শত্রুরাজ্যস্থিত দেবতা ও ব্রাহ্মণ-দিগকে ভূমি ও সুবর্ণাদি বহুমূল্য দ্রব্যদান এবং অপর সমস্ত প্রজাবর্গকে অভয়দান করিবেন।

(খ) সর্ব্বেষান্তু বিদিত্বৈষাং সমাসেন চিকির্ষিতম্।
স্থাপয়েৎ তত্র তদ্বংশ্যং কুর্য্যাচ্চ সময়ক্রিয়াম্ ॥ ২০২।

অনুবাদ।—তৎপরে রাজা পরাভূত রাজপুরুষদিগের আচরণ ও অভিপ্রায় সবিশেষ অবগত হইয়া বিপক্ষবংশসম্ভূত একব্যক্তিকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া তাঁহাকে তৎকালোচিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ক উপদেশ দিবেন।

(গ) প্রমাণানি চ কুর্ব্বীত তেষাং ধর্ম্ম্যান্ যথোদিতান্।
রত্নৈশ্চ পূজয়েদেনং প্রধানপুরুষৈঃ সহঃ ॥ ২০৩।

অনুবাদ।—বিজিত রাজ্যবাসীদের দেশাচার ও গুরুপরম্পরাগত শাসন-প্রণালী নিজ দেশাচারবিরুদ্ধ হইলেও যদি ধর্ম্মসঙ্গত হয়, তবে তাহাই তথায় প্রচলিত রাখা আবশ্যক এবং রত্নাদি উৎকৃষ্ট দ্রব্যদান দ্বারা তত্রত্য অভিষিক্ত রাজা ও অমাত্যবর্গের পরিতোষ সাধন করা বিজয়ী রাজার কর্ত্তব্য।

অনুভব শাসকসম্প্রদায়ই করিতেন, কারণ তাঁহাদেরই স্বার্থ বিশেষ ভাবে এই স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সংস্পৃষ্ট ছিল। শাসিত প্রজা সাধারণের এমন একটা মাথা ব্যাথা তার জন্য হইত না, কারণ তাহাদের জীবন-যাত্রার স্বচ্ছন্দতা তার উপরে অতি কমই নির্ভর করিত।

ইয়োরোপে অধুনা প্রাকৃত জনসাধারণ বা শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পরম্পরাগত রাষ্ট্রপদ্ধতি ও সমাজপদ্ধতির বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার নেতৃবর্গও বহু প্রমাণ প্রয়োগে দেখাইতেছেন, বর্ত্তমান সব ষ্টেটের শাসনে, শাসকবর্গের (অর্থাৎ উচ্চতর ধনিক সম্প্রদায় সমূহের) স্বার্থ ই প্রধানতঃ রক্ষিত হইতেছে। সেই স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যেই ষ্টেট্গুলির শক্তি তাঁহারা এমন ভাবে বাড়াইয়াছেন ও বাড়াইতেছেন, এবং তথাকথিত ডিমক্রাসীর ছলে দরিদ্র জনসাধারণকে ভুলাইয়া, তাহাদের বলে আপনারা প্রবল হইয়া, তাহাদের স্বার্থ অবিরত বলি দিয়া আপনাদের স্বার্থকেই পুষ্ট করিয়া তুলিতেছেন। তাই সব ষ্টেট্কে ধ্বংস করিয়া, নেশনের ভেদ তুলিয়া দিয়া, সকল নেশনের দরিদ্র প্রজাবর্গের একটা সমবায়গঠনই এই আন্দোলনের লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে ইহাদের প্রতিনিধিবর্গের যে সম্মিলন হয়, তাহাও National বা জাতীয় নয়, International বা সার্ব্বভৌমিক নামে পরিচিত। ইঁহারা যে ভাবে চলিতেছেন, যেরূপ পথে তাঁহাদের লক্ষ্যসাধনের চেষ্টা করিতেছেন, তাহার সমর্থন করিতেছি না। এই লক্ষ্য এই পথে এইভাবে সিদ্ধ যদি হয়, ইয়োরোপের মঙ্গল হইবে না,—ইয়োরোপীয় সভ্যতা, ইয়োরোপের গৌরবের বস্তু যাহা কিছু, মঙ্গলের আশ্রয় যাহা কিছু, সব চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ধূলায় লুটাইবে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরে যথা স্থানে করিব। আধুনিক ন্যাশনালিটীর জন্মভূমি ও গৌরবনিকেতন ইয়োরোপেও ষ্টেট্ ও ন্যাশনালিটীর শক্তি ও স্বার্থের সঙ্গে সাধারণ প্রজাবর্গের বাস্তবিক সম্বন্ধ যে কিরূপ, মাত্র তাহারই একটু আভাস দিবার জন্য এই কথাটা এখানে তুলিলাম।

"হিন্দুস্থানে ন্যাশনালিটির আবির্ভাব হয় নাই," হিন্দুরাজ্যের প্রজা-সাধারণ রাষ্ট্রীয়জীবনে উন্নত ও শক্তিশালী হইয়া উঠে নাই, প্রধানতঃ তাই হিন্দু রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া পরাধীন হইয়া পড়িয়াছে, এবং এই পরাধীনতা হেতু বহুদিকে বহু অবনতিও হিন্দুর ঘটিয়াছে, এই কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন। এরূপ পরাধীনতা কোনও মতেই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না, এবং পরাধীনতা যে বহু বিষয়ে নানা রকম অবনতির কারণ হয়, এ কথাও সত্য। কিন্তু ইহাই যে হিন্দুভারতের পরাধীনতার নিদান, তাহা কি ঠিক বলা যায়? এইরূপ রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা সত্ত্বেও অন্ততঃ তিন চারি সহস্র বৎসর স্বাধীন সব হিন্দুরাজ্য এদেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বহু বিদেশী শত্রু তখনও ভারত আক্রমণ করিয়াছে, কোনও কোনও অংশ জয়ও করিয়াছে। কিন্তু হিন্দুরাজশক্তি তাহাতে পড়িয়া যায় নাই; হিন্দুভারত তার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাও হারায় নাই। বহু সহস্রবর্ষজীবী এই হিন্দুসমাজ মাত্র এই সাত আটশত বৎসর রাষ্ট্রীয় জীবনে পরাধীন হইয়াছে। তবু পরাধীন যে হইয়াছে, ইহা অতি দুঃখের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতের রাজনীতি ও হিন্দুর রাষ্ট্রীয়জীবনের এই অবস্থাকেই তার প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় কি না, তাহা বহু বিবেচনা ও বিচারের সাপেক্ষ। এইরূপ রাষ্ট্রীয় অবস্থায়ও বহু যুগ হিন্দু স্বাধীন ছিল,—আবার পৃথিবীর বহু জাতি উন্নত রাষ্ট্রীয় শক্তির অধিকার সত্ত্বেও প্রচণ্ড বিদেশীর আক্রমণে স্বাধীনতা হারাইয়াছে। প্রাচীন ইয়োরোপের ষ্টেট্‌সর্ব্বস্ব (আবার সে ষ্টেট্‌ও ছিল ডিমক্রাটিক)—গ্রীক ও রোমক জাতিও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হারায়। বর্ত্তমান ইয়োরোপের জাতিসমূহও যে চিরকাল তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিবে, এমন কথাও হলপ করিয়া কেহ বলিতে পারেন না। ইয়োরোপ নিজেও অতটা ভরসা করে না। করিলে, বাহিরে কি ভিতরে অন্য কোনও জাতির রাষ্ট্রীয় অভ্যুত্থানে প্রত্যেক ইয়োরোপীয় জাতি এতটা শঙ্কিত হইত না; এবং এই শক্তির বিরুদ্ধে

দেখা যাইত না। ইহা যে কেবল অনুমান নয়, সত্য,—বর্ত্তমান জগতের ইতিহাসাভিজ্ঞ সকলেই তাহা জানেন। প্রমাণ প্রয়োগে তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন কিছু নাই। হিন্দু তবু রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াও এত দীর্ঘকাল তার সমাজজীবন রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছে,- পারিতেছে, তার কারণ তার এই সমাজজীবন রাষ্ট্রাতীত ধর্ম্মে আশ্রিত। একেবারে রাষ্ট্র-নির্ভর কোন সমাজ তা পারে না। প্রাচীন এইরূপ বহু সমাজ পারে নাই। ইয়োরোপও পারিবে না, যদি রাষ্ট্রীয় শক্তি তার কখনও পড়িয়া যায়।

এই একটি কথা সর্ব্বদাই আমাদের মনে রাখিতে হইবে, যে বিভিন্ন দেশের মানবসমষ্টি সেই সব দেশের বিশেষ বিশেষ অবস্থার প্রভাবে এবং অন্যান্য বহু বিশেষ বিশেষ কারণে বিশিষ্ট এক এক স্বভাবে ও স্বরূপে গড়িয়া উঠে। এই সব অবস্থা ও কারণ কতক বা নৈসর্গিক, কতক বা প্রজ্ঞাবান্ ও অসাধারণ শক্তিমান্ নায়কবর্গের প্রবর্ত্তিত নীতির ও কর্ম্মের ফলপ্রসূত।—ইঁহারাও প্রধানতঃ নৈসর্গিক গতিরই সহায়তা করেন। এই গতি যাহাতে বিপথে গিয়া না পড়ে, তাহারই ব্যবস্থা করেন; গতিকে একেবারে ফিরাইয়া তার বিপরীত পথে পরিচালিত করিতে চেষ্টা বড় করেন না। সে চেষ্টা সফলও হয় না,—যদি কখনও কিছু হয়, সুফল প্রসব করে না। আর যাহাই কেন করুন না, বিশেষ বিশেষ অবস্থা ও কারণের সৃষ্টি মাত্র তাঁহারা করেন, যাহার প্রভাবেই সমষ্টি জীবন তার বিশিষ্ট পথে আপনা হইতে গড়িয়া উঠে। হাতে গড়া কোনও স্কীম্ (scheme) করিয়া, হাতে ধরিয়া তাহাকে কেহ গড়েন না, গড়িতে পারেনও না।

কেন, কিরূপে সব অবস্থার প্রভাবে ও কারণপরম্পরায় ইয়োরোপে রাষ্ট্রীয়জীবন-প্রধান সব নেশনের অভ্যুদয় হইয়াছে, এবং ভারতীয় হিন্দুর সমষ্টিজীবন কেন যে রাষ্ট্র-নির্ভর না হইয়া বরং রাষ্ট্রাতীত (superpolitical) এক ধর্ম্মে আশ্রিত তার এই বিশিষ্ট সমাজ-স্বরূপে পরিণতি লাভ করিয়াছে, মোটামুটি সে কথার আলোচনা

করিলাম। এক কথায়, ইয়েরোপে হইয়াছে ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় নেশন ; ভারতে হইয়াছে ধর্ম্মাশ্রিত রাষ্ট্রাতীত সমাজ।—যেখানে, যে অবস্থায় যেরূপ নায়কগণের পরিচালনায় যাহা হইতে পারে, তাহাই হইয়াছে। এটা কেন অমন হইল না, ওটা কেন এমন হইল না,—হইলে ভাল হইত, না হওয়া বড় দোষের হইয়াছে,—এটাকে ভাঙ্গিয়া অমন কর, ওটাকে ভাঙ্গিয়া এমন কর,—এ সব বিতর্ক, কল্পনাজল্পনা একেবারেই বৃথা। এক এক দেশের মানবের সমষ্টিজীবন যে আকার ধরিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আবার নূতন ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে মুখের কথায় কেহ পারে না। বড় কোনও বিপ্লবে যদি তাহা ভাঙ্গে,—সেই ভাঙ্গার ফলে যে সব নূতন অবস্থা আসিয়া পড়িবে, তাহারই প্রভাবে নৈসর্গিক নিয়মেই সমষ্টি আবার নূতন এক মূর্ত্তি ও প্রকৃতি ধরিয়া যত দিনে হউক গড়িয়া উঠিতে পারে। সে মূর্ত্তি ও সে প্রকৃতি যে কি হইবে, কতদিনে তাহা প্রকাশ পাইবে, আদবেই পাইবে কিনা, বিপ্লবের প্রবর্ত্তকগণও তাহা নির্ণয় করিতে পারেন না। বিপ্লব যখন ঘটিল, যা ছিল তাহা যখন ভাঙ্গিয়া পড়িল, সব তখন একেবারেই তাঁহাদের হাতছাড়া হইয়া যায়।

যাহা হউক, হিন্দু জনমণ্ডলী যে রাষ্ট্র-নির্ভর নেশন নয়, রাষ্ট্রাতীত ধর্ম্মে আশ্রিত সমাজ, ইহাই তাহার একমাত্র বিশিষ্টতা নয়। ইয়োরোপীয় সমষ্টি জীবনের প্রকৃতির সঙ্গে ইহার প্রধান পার্থক্য কোথায় এবং কেন এই পার্থক্য ঘটিয়াছে, সেই কথাটাই আগে ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য এই প্রসঙ্গের এত দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন হইল। যে ধর্ম্ম ইহার আশ্রয়, যে ধর্ম্মে ইহার প্রতিষ্ঠা, তাহা গুণকর্ম্মের বিভাগে মানবের মধ্যে চারিটি বর্ণ বিভাগ এবং বর্ণানুযায়ী অধিকারের বিভাগও নৈসর্গিক নীতির অনুযায়ী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। নিসর্গও ভগবৎ-প্রসূত বস্তু, তাই এই নীতি ভগবদ্‌বিহিত বলিয়াই এই ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের মুখে তাই ব্যক্ত হইয়াছে—

"চতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

ক্রমে এই বিভাগের সঙ্গে আরও বহু শাখা উপশাখা বিভাগ, বহু-স্তরের বহু প্রকৃতির সম্প্রদায় বিভাগ, আপনার অঙ্গে ধরিয়া, স্বীকার করিয়া নিয়া, এই সমাজ তার এই বিচিত্র পরিণতি লাভ করিয়াছে। একেবারে সর্ব্বপ্রধান না হউক, ইহাও হিন্দু সমাজের বড় একটি বিশিষ্টতা। বহিরাকারের এই দুইটি বিশিষ্টতা ব্যতীত অন্তর্প্রকৃতিতে এবং তাহা ধরিয়া জীবনের লক্ষ্যেও কতকগুলি বিশিষ্টতা হিন্দুসমাজের আছে, এবং এ সবও তাহার আশ্রয় এই ধর্ম্মেরই অঙ্গীয়। এই যে সব বিশিষ্ট লক্ষণ লইয়া হিন্দু সমাজের মোট স্বভাব ও স্বরূপ হইয়াছে, সব নিবিড় সংযোগে অঙ্গাঙ্গীভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ, ইংরেজি কথায় যাহাকে অর্গানিক (Organio) সম্বন্ধে সম্বন্ধ বলা যাইতে পারে। এইরূপ অর্গানিক বস্তু মাত্রই পরিণামশীল। অবস্থার পরিবর্ত্তনে তার পরিবর্ত্তন ঘটে; কিন্তু যখন এই পরিবর্ত্তন হয়, তার আপন ধর্ম্মে নৈসর্গিক নিয়মেই হয়, মানুষের হাতে কৃত্রিম উপায়ে কিছু ভাঙ্গিয়া গড়া তাহাতে চলে না। এভাবে মানুষ হয়ত ভাঙ্গিতে কিছু পারে, জোর করিয়া কি জোড়া-তালি দিয়া জীবন্ত কিছু গড়িয়া তোলা তার সাধ্যাতীত।

বর্ত্তমান যুগে ভারতীয় রাষ্ট্রপদ্ধতি কি আকার ধরিয়া উঠিবে, তার মধ্যে হিন্দু তার এই ধর্ম্মাশ্রিত সমাজজীবনের বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া কি স্থান গ্রহণ করিতে পারে,—অথবা এই সমাজজীবন তার একেবারে ভাঙ্গিয়া না পড়িলে কোনও স্থানই তাহার মধ্যে সে নিতে পারে না, ভারতে স্বায়ত্ত ও শক্তিশালী যুগোপযোগী কোনও রাষ্ট্রপদ্ধতি গড়িয়াই উঠিতে পারে না, সুতরাং এই সমাজজীবন তার ভাঙ্গিয়া গড়াই চাই,—এইরূপ নানা কথার আলোচনা দেশে এখন হইতেছে। এরূপ কোনও আলোচনার মধ্যে আমি যাইব না। এসব অতি কঠিন সমস্যার কথা সন্দেহ নাই। এই সমস্যার যথোচিত সমাধানের উপরে ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্য যে অতিমাত্রায় নির্ভর করিতেছে, ইহাও সত্য। কিন্তু যিনি যে ভাবেই এই সমস্যার সমাধান করিতে অগ্রসর হউন, আগে তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, হিন্দুর এই সমাজজীবনের

বাস্তব স্বরূপ কি'। যে ধর্ম্মে ইহা আশ্রিত, যে ধর্ম্ম এই সব লক্ষণে ইহাকে লক্ষিত করিয়াছে, এই স্বরূপে ইহাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে, যুগে যুগে যুগোপযোগী অবস্থার সঙ্গে ইহাকে মানাইয়া নিয়া অখণ্ড এক ধারায় ইহার গতিকে পরিচালিত করিতেছে, বহু অন্তর্বিপ্লব ও বহির্বিপ্লবের প্রচণ্ড বিক্ষোভে আমূলপ্রায় আলোড়িত হইয়াও আবার আপন স্বরূপে স্থিতি লাভ করিবার শক্তি যে ধর্ম্ম ইহাকে দিতেছে, তাঁহাকে বুঝিতে হইবে সেই ধর্ম্মের তত্ত্ব কি, মানব জীবনের নৈসর্গিক এবং সনাতন ও শাশ্বত মহাধর্ম্মের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ কি। ইয়োরোপের সমাজজীবন যে অবস্থায় সে সব নীতির অনুসরণে তার বর্ত্তমান স্বরূপে পরিণত হইয়াছে, তার সঙ্গে বিশেষভাবে তুলনা করিয়াও তাঁহাকে দেখিতে হইবে, এই মহাধর্ম্মের মঙ্গলাদর্শ ইয়োরোপের নেশনে ও ভারতের হিন্দু সমাজে—কোথায় কতদূর অনুসৃত হইয়াছে, তার মঙ্গলের পথে কোন্‌টি কতটা চলিতে পারিয়াছে। এই কথাগুলিই আগে আমাদের সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে। তখনই ঠিক ধরিতে পারিব, এমন কি আদর্শে, কোন্ পথে, কি সাধনায় সেই রাষ্ট্রীয় সিদ্ধি আমাদের লাভ হইবে, যাহাতে ভয়াবহ পরধর্ম্মের অন্ধ অনুকরণে বিনষ্ট না হইয়া, 'স্বধর্ম্মে'র' মঙ্গলে আমরা স্থিত থাকিতে পারি। তখনই এই মোহভ্রান্তি আমাদের দূর হইবে, যাহাতে কুধর্ম্ম বলিয়া 'স্বধর্ম্মকে' বর্জ্জন করতঃ 'পরধর্ম্মকে'ই পরমশ্রেয় বোধে মাথায় তুলিয়া নিতে আমরা প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছি।

কেবল রাষ্ট্রীয় সিদ্ধির জন্যই বা কেন? রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মই জীবনের একমাত্র বা পরম ধর্ম্ম নয়, রাষ্ট্রীয় সিদ্ধিও জীবনের একমাত্র বা পরমসিদ্ধি হইতে পারে না। এই মোহভ্রান্তি যখন দূর হইবে, স্বকীয় অনাবিল দৃষ্টি যখন আমরা ফিরিয়া পাইব, সেই দৃষ্টির সম্মুখে আমাদের স্বধর্ম্ম যখন তার গৌরবদীপ্তিমণ্ডিত মঙ্গলমূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিবে, তখন ইহাও আমরা দেখিতে পাইব, বহু পুরুষপরম্পরায় ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে সমগ্র জীবনকে আমাদের কি ভাবে তাহা ধরিয়া রাখিয়াছে, কোন্ পথে

কোন্ লক্ষ্যের অভিমুখে পরিচালিত করিতেছে। বুঝিতে পারিব, সহস্র সহস্র বৎসর কত মহাপুরুষগণের সাধনার ফলে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনে উচ্চ যে সভ্যতা এদেশে অভিব্যক্ত হইয়াছে, এবং তাহারই উত্তরাধিকার বলে এই যে ধর্ম্ম আমাদের স্বধর্ম্ম হইয়াছে,ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে এই যে বিশিষ্টতা আমাদের দান করিয়াছে, তাহা ছাড়িয়া অন্য পথে আমরা যাইতে পারি না। বুঝিতে পারিব, ইহারই এই বিশিষ্ট পথে মানবজীবনের পরম যে সিদ্ধি—যাহা কেবল রাষ্ট্রীয়সিদ্ধির অনেক উপরের বস্তু—রাষ্ট্রীয় সিদ্ধি যে সিদ্ধিলাভের একটি উপায় মাত্র—সেই সিদ্ধি আমাদের লাভ হইবে ; রাষ্ট্রীয়সিদ্ধিও সঙ্গে আপনা হইতেই আসিবে। যদি পারি, এই সিদ্ধির বলেই পৃথিবীর মানবমহা-মণ্ডলীর মধ্যে আমাদের যোগ্য যে স্থান তাহা আমরা গ্রহণ করিতে পারিব,—মানবের মঙ্গলে আমাদের যাহা দেয়, তাহা দিবার মত শক্তি ও অধিকার আমরা লাভ করিব।

পৃথিবীর মানব সভ্যতার মধ্যে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার স্থান যে উচ্চে একথা সকলেই এখন স্বীকার করেন। হিন্দুর সমাজপদ্ধতিও এই সভ্যতার বড় একটি অঙ্গ। ইহা যে হিন্দুসভ্যতার বড় একটি দীনতার বা অবনতির লক্ষণ নয়, এই সভ্যতারই অভিব্যক্তির সঙ্গে নৈসর্গিক নিয়মে ইহার এই অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে,—এবং যে স্বরূপ এই অভি-ব্যক্তির ফলে ইহা লাভ করিয়াছে, তাহার প্রকৃতি কি, ধর্ম্ম কি, বিশ্ব-মানবের মঙ্গলের পথ কোনও দিকে তাহা কিছু নির্দ্দেশ করিতেছে কিনা,—যে সব কঠিন সমস্যা ইয়োরোপীয় সমাজে অধুনা দেখা দিয়াছে, তার কোনও কল্যাণকর সমাধানের সূত্র ইহার এই ধর্ম্মের মধ্যে মিলিতে পারে কিনা,—ভারতের ও জগতের ইতিহাস এবং মানবের সমাজতত্ত্ব যাঁহারা আলোচনা করেন, এসবও তাহাদের বড় একটি অনুসন্ধানের বিষয়। 'স্বধর্ম্মে' আমাদের সিদ্ধিলাভ কিসে হইবে, কি হিত তাহাতে আমরা লাভ করিব, এসব কথা বাদ দিলেও, শুধু এই উদ্দেশ্যেও হিন্দু সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচনা, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান, উপেক্ষণীয় হইতে পারে

না। আর কেহ না ধরেন, অন্ততঃ ভারতবাসী হিন্দুসন্তান আমাদের ইহা অতি আগ্রহে ধরিবার বস্তু।

আমার শক্তি অল্প, বিদ্যা ও জ্ঞানের অধিকার যৎসামান্য; কিন্তু প্রাংশুলভ্য ফলের লোভে উদ্বাহু বামনের ন্যায় এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। সফল কতটুকু হইব, আদবে হইবই কিনা. জানি না। তবে আগ্রহ যখন হইয়াছে, একটু চেষ্টায় ক্ষতি কি? এইটুকু অন্ততঃ ভরসা করি, এই আলোচনায় বিফলকাম যতই হই, ভুল যাহাই করি, এই দিকে যোগ্যতর ব্যক্তির দৃষ্টি কিছু আকর্ষণ করিতে পারিব। তা যদি পারি, তাহাতেও আমার এ প্রয়াস কিয়ৎ পরিমাণে সার্থক হইবে।

মানবের ব্যষ্টি জীবন ও সমষ্টি জীবনের স্বরূপ কি, তাহাদের মধ্যে পরস্পর সাপেক্ষ সম্বন্ধ কি, এবং নৈসর্গিক কি মহাধর্ম্মে মানবের এই উভয়বিধ স্বরূপ এবং তাহাদের পরস্পরসাপেক্ষ সম্বন্ধ আশ্রিত, প্রথমে এই কথাগুলিই আমি বুঝিতে চেষ্টা করিব। তারপর দেখিতে হইবে, হিন্দুর সমাজধর্ম্ম এই মহাধর্ম্মের আদর্শ ধরিয়া তার পথে কতদুর কি ভাবে চলিতে পারিয়াছে, এবং হিন্দুর জীবন কি বিশিষ্ট প্রকৃতি ধরিয়া তার ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে, কোন দিকে কি মঙ্গলের ভাগী তাহাতে হইয়াছে। ইয়োরোপীয় সমাজজীবনের সঙ্গে তুলনা করিয়াই এই কথাগুলি আমাদের বুঝিয়া দেখিতে হইবে, নতুবা ঠিক বুঝিতে বোধহয় পারিব না। কারণ ইয়োরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে আচ্ছন্ন আমরা ইয়োরোপীয় বর্ত্তমান (ডিমক্রাটিক নেশন স্বরূপে অভিব্যক্ত) সমাজ-জীবনকেই মানবসমষ্টির শ্রেষ্ঠ পরিণতি বলিয়া বিনা বিচারে গ্রহণ করিয়া নিয়াছি।

যুগে যুগে হিন্দুসমাজের বহিরাকারগত অবস্থায় যতই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাক্, স্থানবিশেষে এই অবস্থায় যতই বৈচিত্র্য দেখা যাক্, মূল এক ধর্ম্মে, একই আদর্শের কতকগুলি মূলনীতিতে ইহার অন্তঃ-প্রকৃতির এমন একটা স্থিরতা ও সমতা আছে, যাহাতে মোটের উপর অখণ্ড এক ধারায় ইহার জীবনের গতি সেই প্রাচীনকাল

হইতে আজও পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। বিপ্লব বা বিপ্লবের চেষ্টা অনেক হইয়াছে, কিন্তু কিছুই এই ধারাকে বিচ্ছিন্ন কি বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিতে পারে নাই। আমার এই দীনগ্রন্থের বিষয় যে 'হিন্দুসমাজ-বিজ্ঞান,' তাহা এই ধর্ম্মের, এই সব নীতির—এই সব basic ও general laws এরই তত্ত্বানুসন্ধান এবং তাহাদের ফলাফলের বিচারমূলক আলোচনা। এ দেশের যে কোনও শাস্ত্র, যুগ বিশেষ বা স্থানবিশেষের যে কোনও ঐতিহাসিক তথ্য, যে কোনও প্রতিষ্ঠান ও আচারনিয়ম, বিভিন্ন দেশের ইতিবৃত্ত ও সমাজতত্ত্ববিং পণ্ডিত-গণের সিদ্ধান্ত প্রভৃতি যাহা কিছু এই অনুসন্ধানে ও বিচারে সহায়তা করিতে পারে, তাহারই সহায়তা আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। যদি প্রমাণ বলিতে হয়, তাহাই আমার এই আলোচনার প্রমাণ। কি ভাবে এইরূপ কোন্ প্রমাণের অবলম্বনে কোন্ কথার আলোচনা আমি করিব, কোন্ যুক্তির পথে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে প্রয়াস পাইব, দয়া করিয়া ও ধৈর্য্য ধরিয়া যদি কেহ এই গ্রন্থ পাঠ করেন, যথাস্থানে ও যথাপ্রসঙ্গে তাহার পরিচয় হয়ত পাইবেন। এ সম্বন্ধে ইহার অধিক কিছু এস্থলে বলিতে পারিতেছি না।

হিন্দুসমাজ বিজ্ঞান।

(১)

মানবজীবন—ব্যষ্টি ও সমষ্টি—

ব্যষ্টির পক্ষে স্বাধীনতা ও সাম্যের দাবী।

কোনও দেশেই মানব পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একা একা যার যেমন খুসী তেমন ভাবে থাকে না। সকলে মিলিয়া মিশিয়া একদল বা সমাজভুক্ত হইয়া বাস করে।—সন্ন্যাসী যে সংসার ও জনসমাজ ছাড়িয়া বিজনে গিয়া তপস্যা করেন, তাও দশজন যদি একই বিজনে তপস্যা করিতে যান, তাঁহাদেরও একটা দল সেখানে হইয়া উঠে। দলের কতকগুলি নিয়মও তাঁহারা বাঁধিয়া নেন; পরস্পরের সম্বন্ধে সকলে সেই নিয়ম মানিয়া চলেন। বিজন আর বিজন থাকে না; তপোবন বা আশ্রম হইয়া উঠে। যিনি এসব নিয়ম মানিতে ইচ্ছা করেন না, বা পারেন না, তাঁহাকে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া আরও দূর বিজনতর অঞ্চলে চলিয়া যাইতে হয়, কারণ দশজনের সঙ্গে মিলিয়া থাকিতে হইলে এসব নিয়ম না মানিয়া কেহ পারেনা। না মানিলে সন্ন্যাসীদের মধ্যেও নানারূপ অশান্তিকর সংঘর্ষ ঘটে। সন্ন্যাসীরই যখন দল হয়, সাধারণ সংসারী মানবের ত হইবেই। সংসার অর্থই এক একটি মানবদম্পতির সন্তানাদি সহ একত্র থাকা।—একটি সংসার বাড়িয়া, কিছু ফাঁকে ফাঁকে হইয়া দশটি সংসার হয়। আবার এই রকম আরও দশ বিশটি সংসারের সঙ্গে তাহারা নানারকম স্বার্থের ও বান্ধবতার সম্বন্ধে আইসে। দল ক্রমে বড় হইতে থাকে, সম্বন্ধের জটিলতাও বাড়ে, লক্ষ লক্ষ লোক শেষে এক সমাজভুক্ত হইয়া বৃহৎ এক একটি ভূভাগের অধিবাসী হইয়া পড়ে। সাংসারিক ও সামাজিক অশেষ রকম সহজ কি জটিল সম্বন্ধ পরস্পরের মধ্যে আসিয়া পড়ে, পরস্পরের বহু

সহায়তা বহু কর্ম্মে সকলে গ্রহণ করে। শক্তি, রুচি ও যোগ্যতার তারতম্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন লোকে করে, বিনিময়ে সকলেই তার ফলভোগী হয়। এমন কতকগুলি সমান স্বার্থ সকলের আসিয়া জোটে, যাহা কাহারও নহিলে নয়, অথচ একা একা কেহই সম্পাদন করিতে পারে না,—সকলে মিলিয়া করিতে হয়। সকলের ছেলেপিলেই লেখা পড়া শিখিবে, সকলে মিলিয়া পাঠশালা করিতে হয়। সকলেই পথে চলিবে, ঘাটে জল খাইবে, হাটবাজারে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বেচাকেনা করিবে, সুতরাং পথ ঘাট হাটবাজারের যথোচিত ব্যবস্থা সকলে মিলিয়া করিয়া নিতে হয়। কেহ কাহাকেও পীড়ন না করে, অবিরত কলহে ও মারামারি কাটাকাটিতে কাজকর্ম্মের ব্যাঘাত না হয়, সুখশান্তি উৎসন্ন না যায়,—প্রবল বিপক্ষ কেহ আসিয়া সব লুটিয়া পাটিয়া না নেয়, মঙ্গলকর কর্ম্মশৃঙ্খলা সকল বিধ্বস্ত না করিয়া ফেলে, এজন্য দণ্ডনীতি বা Government-এর *প্রতিষ্ঠারও আবশ্যকতা ঘটে। আবার কেবল দণ্ডনীতির প্রয়োগে,* কি অবিরত কড়াপাহারায়ও সকল লোককে সাধারণের হিতকর পথে বাধ্য করিয়া রাখা যায় না,—তাই ধর্ম্মনীতির প্রবর্ত্তনও প্রয়োজন, যাহাতে লোকের সংস্কার, চিত্ত ও চরিত্র সহজেই এই সব পথের অনুবর্ত্তী হইয়া চলে। এইরূপে পরস্পরের সঙ্গে বহু রকম সম্বন্ধে আসিয়া, পরস্পরের প্রতি অশেষবিধ কর্ত্তব্যের ও দায়িত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, বহুলোক এক এক দেশে সুখে সচ্ছন্দে থাকে। ইহাই হইল মানবের সমষ্টি বা সমাজ বা Community। আর পৃথক্ ভাবে এক একজন যে মানব, তার স্বরূপ এদেশের সাহিত্যে ব্যষ্টি নামে অভিহিত। ইহারই ইংরেজী কথা Individual। ব্যষ্টি ও সমষ্টি ইহার বিশেষণ 'ব্যস্ত' ও 'সমস্ত'—ইংরেজিতে Individual এবং Social বা Communal। *

ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক মানবের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। আবার

---

* অবতরণিকা, ৩২ পৃষ্ঠা, পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

বহু ব্যষ্টি যে পরস্পরের প্রতি নানারকমে নির্ভরশাল হইয়া, নানা রকম সম্বন্ধে পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়া একদেশে বাস করে, ইহাদের লইয়া সর্ব্বত্রই মানবের যে এক একটা সমষ্টি হয়, প্রত্যেক ব্যষ্টি আবার এইরূপ কোনও না কোনও একটা সমষ্টির বা সমাজের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ব্যষ্টির যেমন একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে,—সমষ্টিরও আছে। ব্যষ্টি সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং যে নিয়মে এই সমষ্টি হইয়াছে, যে নিয়মে চলিতেছে, ব্যষ্টিকে সেই নিয়মের অধীন হইয়াও চলিতে হইবে, নতুবা সমষ্টির মধ্যে তার কোনও স্থান থাকিতে পারে না। মোট এই কয়টি কথা এত সহজ সত্য, যে সকলেই তাহা বুঝিবেন, একবাক্যে স্বীকারও করিবেন। কিন্তু মোট এই সহজ সত্যগুলির আভ্যন্তরিক প্রকৃতি যদি আমরা পরীক্ষা করিতে যাই, তার তত্ত্ববিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হই, অনেক অতি কঠিন প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, যাহার সর্ব্ববাদিসম্মত মীমাংসা এপর্য্যন্ত কেহই করিতে পারেন নাই। কি নিয়মে কি ভাবে সব সমষ্টি হইয়াছে, সব সমষ্টি একই নিয়মে একই আদর্শে হইয়াছে কিনা, নিয়ম কে করিল, সমষ্টিকে কে গড়িল, অন্তর্ভুক্ত ব্যষ্টিসমূহের কর্তৃত্ব ইহাতে আছে কিনা, থাকিলে তাহা কিরূপ, ব্যষ্টির প্রকৃতি কি, ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে পরস্পরের সম্বন্ধ কি, সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টির স্থান কি, সমষ্টির সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি, ব্যষ্টির স্বতন্ত্র অধিকারের ক্ষেত্র কি কি ও তার পরিসর কত, সমষ্টির প্রভুত্ব কোন ক্ষেত্রে কত দূর যাইতে পারে, এই প্রভুত্ব কি ভাবে কিসের আশ্রয়ে পরিচালিত হয়, এ সব নিরূপণ কে করিবে, বিভিন্ন সমষ্টির মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে, বিভিন্ন সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত ব্যষ্টি-সমূহেরই বা পরস্পরের সম্বন্ধ কি হইবে,—এইরূপ বহু প্রশ্নই অনুসন্ধিৎসুর সম্মুখে উপস্থিত হইবে। এই সব প্রশ্ন যে কিরূপ দুরূহ ও জটিল, ইহার মীমাংসা কত কঠিন, একথা আর বেশী করিয়া না বলিলেও চলে। সকলে আপনা হইতেই বুঝিবেন।

পৃথিবীর মানব-জাতির মধ্যে বড় বড় কয়েকটি ধর্ম্মপদ্ধতি বা Religious system এর আবির্ভাব হইয়াছে, যথা হিন্দু,

ইরাণী, বৌদ্ধ, য়িহুদী, ইশাহী (খৃষ্টান), মুসলমান ইত্যাদি এবং নানা অবস্থার প্রভাবে নানাদিকে নানা রকম পরিণতিও ইহাদেব ঘটিয়াছে। বিশিষ্ট কতকগুলি মানবসমাজও এই সব বিভিন্ন ধর্ম্মপদ্ধতির প্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাদের সকলেরই একটা সমান তথ্য এই যে, কোনও ধর্ম্মপদ্ধতিকেই শিষ্যবর্গ সাধারণ মানববুদ্ধির নির্দ্ধারিত বস্তু বলিয়া মনে করেন না, ভগবৎ-প্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করেন। স্বয়ং ভগবান্ মানবরূপে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া, অথবা আপ্ত ঋষি বা পয়গম্বররূপ সিদ্ধ মহাপুরুষদের মধ্য দিয়া ধর্ম্মকে প্রকাশ করিয়াছেন,—ধর্ম্ম যে ভগবৎপ্রেরিত বস্তু, ইহার তাৎপর্য্য ইহাই। ভগবান্ প্রকাশ বা reveal করিয়াছেন, তাই এই সব ধর্ম্মকে ইংরেজীতে সাধারণতঃ এক বিশেষণ দেওয়া হয়—Revealed। সুতরাং এই সব ধর্ম্মের তত্ত্বকথা যে সব শাস্ত্রে আছে. সেই সব বেদ বা Scripturesও ভগবদ্বাণী।

ভগবান্ এক, সত্যও এক। সব ধর্ম্ম যদি ভগবৎপ্রেরিতই হয়, তবে বিভিন্নধর্ম্মের তত্ত্বাঙ্গে ও সাধনাঙ্গে অনেক স্থলে কেবল পার্থক্য নয়, বিরোধও লক্ষিত হয় কেন? সর্ব্বত্র ঠিক একইবিধ *ধর্ম্ম প্রকাশিত বা revealed হয়* নাই কেন? ইহার একটি উত্তর ঋষি উপনিষদে দিয়াছেন—

> "যং ভাবং দর্শয়েৎ যস্য তং ভাবং স তু পশ্যতি।
> তঞ্চাবতি স ভূত্বাসৌ তদ্‌গ্রহং সমুপৈতি তম্॥"

অর্থাৎ—গুরু যাঁহাকে যে ভাব পরমতত্ত্ব বলিয়া দেখান, তিনি সেই ভাবে ব্রহ্মস্বরূপকে দর্শন করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম সেই ভাবাপন্ন হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। সেই ভাবই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাঁহার চিত্ত পরিপূর্ণ করিয়া রাখে।

ব্রহ্ম অনন্তস্বরূপ, অনন্ত ভাবে মায়ামুগ্ধ মানব তাঁহাকে ধরিতে পারে না। তবে যে যে ভাবেই তাঁহাকে দেখে বা দেখিতে শিখে, সেই ভাবই তার পক্ষে সত্য, সেই ভাবেই সে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়।

অনন্তস্বরূপ তিনি, অনন্ত তাঁহার রূপ, অনন্ত তাহার ভাব, সান্তবুদ্ধি সাধারণ মানবের সাধ্য নাই অনন্তসত্তার পূর্ণস্বরূপে তাঁহাকে বুঝিতে বা ধরিতে পারে। যে দেশে যে জাতিতে যে যুগে যে ভাবে তিনি ধরা দিয়াছেন, লোকে সেই রূপে সেই ভাবে তাঁহাকে ধরিয়াছে ও বুঝিয়াছে। ধরা দিয়াছেনও তিনি দেশকালপাত্রের অবস্থানুযায়ী রূপে ও ভাবে, যোগ্য গুরুর দৃষ্টিতে। তাই দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, যুগে যুগে, ধর্ম্মমতের এত বৈচিত্র আমরা দেখিতে পাই। অনন্ত সত্যের এই বৈচিত্র্যময় প্রকাশই মানবের নিকট সব চেয়ে বড় সত্য।

গীতায়ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এক স্থানে বলিয়াছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।"

আবাব মহাভারতে দেখিতে পাই, রাক্ষসেব 'কঃ পন্থা' এই প্রশ্নেব উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন,—

"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ঃ বিভিন্নাঃ
নাসৌমুনির্যস্য মতং নভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥"

ইহার উপর আমা হেন ব্যক্তিব আব কোনও টিকাটিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন। একটি মাত্র কথা বলিতে চাই এই যে, অন্যান্য সম্বন্ধে যত পার্থক্য বা বিরোধই লক্ষিত হউক, 'মহাজনো যেন গতঃ'— সে পন্থা সাধুর উন্নত দৃষ্টিতে এক। আপাতদৃষ্টিতে বহু হইলেও, ভগবৎ-প্রাপ্তিব মূল পন্থা তাব প্রকৃতিতে একই। পথেব প্রবর্ত্তক তিনি। যে যেমন অধিকারী, পথ তাহাকে তিনি সেইরূপই দেখাইয়াছেন। সেই একই পথ অধিকারভেদেই 'যেন' ভিন্ন হইযাছে।

আরও একটি তথ্য ইহা হইতে আমরা ধরিতে পারি এই যে মানবত্বের মূলতঃ একটা সাম্যের মধ্যেও দেশকালপাত্রভেদে তার

বহিপ্রর্কৃতির প্রকাশে স্বাভাবিক একটা বৈষম্যও আছে, যদি এই কথাগুলিকে সত্য বলিয়া আমরা গ্রহণ করি।

এই সব revealed বা ভগবৎ প্রেরিত ধর্ম্মপদ্ধতি সর্ব্বত্রই শিষ্যবর্গের জীবনের আদর্শ, সাধনার লক্ষ্য, কর্ম্মের পথ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ব্যষ্টি ভাবে মানবে মানবে সম্বন্ধ কি. জীবনের কোন অবস্থায় কোন ক্ষেত্রে মানবের স্বাতন্ত্র্যের অধিকার কি, সমষ্টির মঙ্গলে কোন অবস্থায় কোন ক্ষেত্রে কিরূপ নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া সে চলিবে, তার নিজের মঙ্গলই বা কোন নীতি অনুসারে চলিলে সাধিত হইবে, ইত্যাদি অনেক বিষয়ই এই নির্দ্দেশের মধ্যে আসিয়াছে। উপরে যে সব প্রশ্নের কথা কিছু পূর্ব্বে তুলিয়াছি, তাহার মোট উত্তর এই সব নির্দ্দেশে পাওয়া যায়। এই সব নির্দ্দেশ প্রকাশিত হইয়াছে. ঋষিমুখে উচ্চারিত ভগবদ্‌বাক্যে, মহাজনবর্গের উপদেশে ও জীবনের দৃষ্টান্তে,—শিষ্যবর্গ ভক্তিতে তাহা গ্রহণ করিয়াছে, ভক্তের বুদ্ধিতে তাহার যুক্তিসঙ্গতিও বুঝিয়াছে। যদি কখনও কিছু না বুঝিয়াছে, না বুঝিয়াও তাহা মানিয়া চলিয়াছে,—সাধারণ শিষ্য যেমন সাধনায় গুরুর নির্দ্দেশ মানিয়া চলে, চলিয়া শেষে অনুভব করে, যাহা করিতেছি, ভালই করিতেছি,—বুদ্ধিতে কারণতত্ত্বের কুল পাই না পাই, গুরুর নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া মঙ্গলের ভাগী হইতেছি।

এইরূপ কোনও ধর্ম্ম যাহারা মানিয়া চলে, ধর্ম্মানুগত সমাজে তাহাদের স্থান শিষ্যের স্থান। শিষ্যত্বের ধর্ম্ম (essential attributeই) হইতেছে, এই ভক্তি ও শ্রদ্ধা—ইংরেজিতে এক কথায় যাকে বলে Faith। এই faith এ—ভক্তি ও শ্রদ্ধায়—লোকে যাহা গ্রহণ করে, বুদ্ধি বা intellect সর্ব্বদাই যে তাহা অযৌক্তিক ও অগ্রাহ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে, এমন কোনও কথা হইতে পারে না। আবার বুদ্ধিই মানবের সর্ব্বস্ব নয়, চিত্তবৃত্তিও (sentiments) তাহার প্রকৃতির বড় একটা দিক্। বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া মানব কোনও বস্তুর তত্ত্ব নির্ণয় করে ; কিন্তু তার কর্ত্তব্যের পথে তার ইচ্ছাকে বা কর্ম্মশক্তিকে প্রেরিত

করে তার চিত্তবৃত্তি বা sentiments। ভক্তি ও শ্রদ্ধা (faith) চিত্তবৃত্তির অতি প্রবল এক ভাব। তার পরে Reason কথাটাকে কেবল একটা intellectual faculty বা বুদ্ধিবৃত্তিরূপে না বুঝিয়া যদি মানবে ধী-শক্তির সর্ব্বোন্মুখ উচ্চতম প্রকাশ, মানবে মানবত্বের বিশেষত্ব যাহাতে সেই প্রজ্ঞার অর্থে গ্রহণ করি,—যে অর্থে Reason বা Rationality কথাটি ইয়োরোপেও অনেক পণ্ডিত ব্যবহার করিয়াছেন, তবে ভক্তি শ্রদ্ধা ও প্রেম (faith and love) প্রভৃতি উচ্চতম চিত্তবৃত্তিসমূহও Reason এর মধ্যে আসিয়া পড়ে। Intellect বা বুদ্ধি হইতে প্রসূত জ্ঞান ও বিচারশক্তি প্রভৃতি যেমন তার এক দিক্, এই সব চিত্তবৃত্তিও তার অপর একটি দিক্। ইহাই যখন কর্ম্মের প্রেরণারূপে আপনাকে প্রকাশ করে, 'ইচ্ছা' এই নামে কেহ কেহ ইহাকে বিশিষ্ট করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য (Psychologist) মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত-গণ knowing, feeling ও willing—মনের এই তিনটি দিকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের দেশেও তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মানবপ্রকৃতির এই তিনটি দিকের অনুকূল সাধনাকে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ এই তিনটি নাম দিয়াছেন। প্রজ্ঞার এই যে তুইটি দিকের কথা বলি-লাম,—তাহা ছাড়া আরও একটি দিক আছে, বোধি বা Intuition; বুদ্ধি সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা বিচার করে। যাহা অতীন্দ্রিয়, তাহার ইঙ্গিত এই বোধি বা Intuition আমাদের দেয়। ইংরেজিতে যাহাকে Conscience (বিবেক) * বলে, তাহা এই বোধিরই একটা বিশেষ দিকে প্রকাশ। Conscienceকে তাই intuitive moral

* ইংরেজি conscience কথাটিকে বাঙ্গলায় আজকাল সাধারণতঃ 'বিবেক' এই নামে অনুবাদ করা হয়। কিন্তু এদেশের তত্ত্ববিদ্যার পরিভাষায় 'বিবেক' কথাটির অর্থ হইতেছে, ব্রহ্ম হইতে এই জগৎসংসারের, পুরুষ হইতে প্রকৃতির ভেদজ্ঞান।—যাহা হউক, বুঝিবার সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে conscience অর্থেই 'বিবেক' কথাটি আমি ব্যবহার করিব।

sense অনেকে বলেন। এই বোধিই সিদ্ধযোগীদের মধ্যে অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিরূপে প্রকাশ পায়।

বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে চিত্তবৃত্তির ও বোধির বিরোধ অনেক সময় মানবের অন্তরে ঘটে। বুদ্ধি তার বিচারে বলিতেছে কাজটা সমীচীন নয়, কিন্তু প্রবল কোনও চিত্তবৃত্তি দুর্দ্দম আবেগে সেই দিকে তাকে প্রেরিত করিতেছে,—বোধিও ইঙ্গিত করিতেছে, কাজটা ভাল। এই প্রেরণার বশে, এই ইঙ্গিতে, মানুষ কাজটা করে, করিতে থাকে। ইহাতে যে তার অনিষ্ট কিছু ঘটে, তা নয়,—কল্যাণের পথেই বরং তাকে লইয়া যায়। বুদ্ধি প্রথমে তাকে এই কল্যাণ দেখাইতে পারে নাই। চিত্তবৃত্তি তার প্রেরণায়, বোধি তার ইঙ্গিতে, দেখাইয়াছে। ভক্তি শ্রদ্ধা (Faith) এবং বোধি (intuition) এই ভাবে অনেক সময় ধর্ম্মগুরুদের নির্দ্দিষ্ট পথে শিষ্যকে পরিচালিত করে। শিষ্য কখনও তার বুদ্ধির বিচারে তার যুক্তিসঙ্গতি বুঝে, কখন বুঝেও না,—পথে চলিয়া শেষে দেখিতে পায় ইহা কল্যাণের পথ।

'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'—মহাজনের নির্দ্দিষ্টপথও এই পথ। বুঝুক কি না বুঝুক, বোধিতে মাঙ্গল্য অনুভব করিয়া, ভক্তিশ্রদ্ধার প্রেরণায় এই পথের অনুসরণ করিয়া, বহু মানব সিদ্ধকাম হইয়াছে। ভালমন্দের প্রমাণ অনেক সময়—'ফলেন পরিচীয়তে'। ভক্তি-শ্রদ্ধা, শিষ্যত্বের ধর্ম্ম, বোধির ইঙ্গিত, মানুষকে কেবল ভুল পথেই লইয়া যায় না। বুদ্ধি যাহা ধরিতে পারে না, ভক্তিশ্রদ্ধায় তাহা আপনি আসিয়া ধরা দেয়। আবার বুদ্ধি যাহাদের সুপরিস্ফুট নয়, বোধি তমোঘোরে আচ্ছন্ন, একমাত্র শিষ্যত্বের ধর্ম্মই তাহাদের বহু পাপ হইতে রক্ষা করে, করিয়া সমাজস্থিতিকেও রক্ষা করে। মানবচরিত্রের সাধারণ অবস্থা যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, সকলেই একথা বলিবেন, পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের পক্ষে এই শিষ্যত্বের ধর্ম্মই, যেমন ব্যক্তিগত ভাবে তাহাদের নিজেদের মঙ্গলের পক্ষে, তেমন মোট সমাজের মঙ্গলের পক্ষেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

সমাজধারক সকল ধর্ম্মপদ্ধতিরই আবার একটা শাসনের দিক্‌ও আছে। সকলে যদি ভক্তিশ্রদ্ধায় আপনা হইতেই ধর্ম্মবিধি মানিয়া চলে, এরূপ শাসনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সকলে সর্ব্বদা সকল বিষয়ে তাহা করে না, সুতরাং ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয় ভাবেই মানবের মঙ্গলের জন্য এই শাসনের প্রয়োজন হয়। ভক্তি শ্রদ্ধার অভাবে, ভয়ের প্রেরণায় এই শাসন লোককে বিধির অনুগত রাখিবার চেষ্টা করে। চেষ্টা সফল হইলে আনুগত্য অনেকের পক্ষে অভ্যাস হইয়া দাঁড়ায়। এই অভ্যাস হইতে ভক্তি শ্রদ্ধাও অনেক স্থলে শেষে দেখা দেয়। এই ভয়, কখনও পরলোকে নরকের ভয়, কখনও ইহলোকে সমাজিক লাঞ্ছনা ও রাজ-দণ্ডের ভয়। ধর্ম্মপদ্ধতিকে সময়ে সময়ে সমাজরক্ষার জন্য দুষ্টের দমনে রাজদণ্ডের সহায়তাও নিতে হয়। এই শাসনের তত্ত্ব কি, সমষ্টির জীবনের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ কি, ব্যষ্টির উপরে ইহার অধিকার কতদূর, এই সব কথার বিস্তৃত আলোচনা পরে একস্থলে করিব। আপাততঃ এই শাসনের অস্তিত্ব ও তার একটা প্রয়োজন মাত্র স্বীকার করিয়া নিতেছি। যাহা হউক, এই শাসন অনেক সময় অযোগ্য লোকের হাতে পড়ে, কঠোরতা ন্যায়ের কি করুণার কোনও দাবীই গ্রাহ্য করে না, সহায়ক রাজদণ্ডও অতি অস্বাভাবিক নিষ্ঠুর পীড়নে পরিণত হয়। ব্যষ্টির ন্যায্য অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিয়া এই শাসন তাকে সকল দিকে একেবারে পঙ্গু করিয়া রাখিতে চায়। সমাজিক শাসন-পদ্ধতি বা Social Authority যাহাকে বলা যায়, তাহা অনেক সময়ে এইরূপে বিকৃত হয়। ইয়োরোপীয় ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট উভয় চার্চ্চের শাসনই রাজদণ্ডের সহায়তায় এইরূপ বিকৃত ও পীড়াদায়ক হইয়াছিল। এবং ইহাই প্রধান কারণ যে ইয়োরোপীয় Rationalism মানবের এই শিষ্যত্বের ধর্ম্মকে একেবারেই অস্বীকার করিয়া প্রত্যেক মানবকেই নিজ নিজ গুরুর পদে বসাইতে চায়।

হাঁ, প্রত্যেক মানবই তার নিজের গুরু। আমাদের যোগশাস্ত্র বলেন, মানবের স্থূল দেহের অভ্যন্তরে মেরুদণ্ডের মধ্যবর্ত্তী সূক্ষ্ম সুষুম্না নাড়ীর

সঙ্গে সূক্ষ্ম চক্রাকার ছয়টি পদ্ম আছে। সকলের উপরে ভ্রূযুগলের মধ্যে দ্বিদল আজ্ঞাপদ্ম। তার উপরে আবার শিরোদেশের অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম আর একটি সহস্রদল পদ্ম আছে,—তার মধ্যে গুরুরূপ দেবতা বাস করেন। গুরুর আজ্ঞা তার কেবল নিম্নস্থিত ভ্রূমধ্যস্থ পদ্মে বা চক্রে সংক্রামিত হয়। তাই তাহার নাম হইয়াছে আজ্ঞা চক্র বা পদ্ম। এই আজ্ঞাপদ্ম মনের স্থান। জপের সময়ে এই আজ্ঞাপদ্মেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া জপ করিতে হয়। নিজের গুরু নিজের মাথায়ই আছেন; তাঁর আজ্ঞা নিজের মনেই আসিয়া পৌঁছিতেছে। কিন্তু এই গুরুকে চিনিতে হইলে বিশেষ সাধনার প্রয়োজন; আর এই সাধনা আরম্ভ করিতে হইবে শিষ্য হইয়া, মানবরূপী পার্থিব কোনও যোগ্য গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়া, তাঁহার প্রদত্ত মন্ত্রে, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে। এই মন্ত্র, এই সাধনা প্রণালী, আবার-আদি সিদ্ধগুরুদের হইতে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। সাধনার ফলে নিজের মাথার গুরুকে যতদিন না শিষ্য ধরিতে পারিবে, গুরুর অধিকার ভোগী সে হইবে না, শিষ্যই থাকিবে।

যোগশাস্ত্র ঠিক যে ভাবে এই তত্ত্বের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সকলে শ্রদ্ধায় গ্রহণ করুন বা নাই করুন, বুদ্ধির আধার মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে মানবের গুরুর স্থান নির্দ্দেশ করিয়া শাস্ত্র এই তত্ত্বই বুঝাইতে-ছেন, যে মানবের Highest Reason বা প্রজ্ঞাই তার গুরু, সকল *কর্ম্মে তার পথপ্রদর্শক এবং ইহার অধিকারে কেহই বঞ্চিত নয়।*

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্‌।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্ত স্বভাববান্‌॥

এই শ্লোকটি প্রত্যেক তান্ত্রিক সাধককে প্রত্যহ রাত্রিপ্রভাতে তার উপাসনার পর স্মরণ ও উচ্চারণ করিতে হয়। তান্ত্রিক উপাসনায় জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে স্ত্রী পুরুষ, ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভৃতি সকলেরই সমান অধিকার। সুতরাং সকলেরই নিজের মাথায় তার গুরুকে, অথবা পরমাত্মার সঙ্গে

তার জীবাত্মার একত্বকে, উপলব্ধি করিবার চেষ্টায় এই শ্লোকটি স্মরণ ও উচ্চারণ করিতে হয়।

ব্যষ্টিভাবে মানবের মহিমা ও তার অধিকারের তত্ত্ব সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা বড় কোনও কথা আর কোনও দেশে কেহ বলিতে পারিয়াছেন এরূপ জানি না। এই মহিমা উপলব্ধি করিয়া যোগ্য অধিকার ভোগ করিবার যে পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তার প্রবেশদ্বারও কাহারও সম্মুখে রুদ্ধ নহে।* কিন্তু এই পথ তার শিষ্যত্বের পথ। শিষ্য হইয়া, শিষ্যধর্ম্মের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া, তবে সে গুরু হইবে,—সে যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিত্যমুক্তস্বভাববান্ তাহা সে উপলব্ধি করিবে। এই উপলব্ধি যখন হইবে, গুরুত্বে তার নিত্য মুক্তস্বভাবের অধিকার তখনই সে ভোগ করিবে।

যে শিষ্য সেই গুরু, আজ শিষ্য কাল গুরু। জীবনের এক অবস্থায় এক স্তরে শিষ্য, অন্য অবস্থায় অন্য স্তরে গুরু। শিষ্যত্ব হইতে গুরুত্বের স্তরে আরোহণের পথ সকলের পক্ষেই মুক্ত। শিষ্যত্বে ও গুরুত্বে এই যে একত্ব, কেবল সাধনার একটা স্তরপরম্পরায় মাত্র পার্থক্য, মানবের **Highest Reason** বা প্রজ্ঞার দৃষ্টি যাহা দেখিয়াছে, দেখিবে,—ইয়োরোপীয় **Rationalism** তাহা দেখিতে পায় নাই। তাই শিষ্যত্বকে অস্বীকার করিয়া মানবকে একেবারে তার গুরুত্বে বসাইতে চাহিয়াছে। ভক্তি শ্রদ্ধা ও গুরূপদিষ্ট ধর্ম্মে নিষ্ঠা প্রভৃতি শিষ্যত্বের যাহা কিছু প্রভাব সব হইতে একেবারে মুক্ত হইয়া মানবের বুদ্ধি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে

---

* এই স্থলে বৈদিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্মমতে সাধনায় মানবের অধিকার সম্বন্ধে বড় একটা পার্থক্য আমরা দেখিতে পাই। বৈদিক ধর্ম্মের উচ্চতম সাধনা, এমন কি কতকগুলি মন্ত্রোচ্চারণও স্ত্রী-শূদ্রাদির পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু তান্ত্রিক সাধনায় এরূপ কোনও অধিকারভেদ নাই। স্ত্রী-শূদ্র এমন কি 'পঞ্চম' বলিয়া যে অন্ত্যজ জাতিসমূহ সমাজের নিম্নতম স্তরে অবস্থিত, তান্ত্রিক সর্ব্বপ্রকার সাধনায় তাহাদেরও দ্বিজবর্ণত্রয়ের সঙ্গে সমান অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

কেবল তার নিজেরই নির্দ্দেশে চলিবে, ইহার একমাত্র সত্য নীতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

Rationalism in Europe নামক গ্রন্থের প্রণেতা Lecky সাহেব একস্থলে বলিয়াছেন,—বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় সভ্যতার একটি বিশিষ্ট প্রকৃতি হইতেছে, general seculatisation of the European intellect অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রের ও ধর্ম্মবিশ্বাসের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া পার্থিব জীবনের সকল দিকে ইয়োরোপায় বুদ্ধির অবাধ বিকাশ ও ক্রিয়া। মধ্যযুগে বিদ্যার আলোচনা ও বুদ্ধিশক্তির পরিচালনা যাহা কিছু হইত, চার্চ্চের অন্তর্ভুক্ত যাজক ও সন্ন্যাসীদের মধ্যেই তাহা নিবদ্ধ ছিল। সকল চিন্তায়, সকল বিদ্যার আলোচনায়, খৃষ্টীয় Theology বা ধর্ম্ম-শাস্ত্রের প্রমাণ মানিয়া তাঁহারা চলিতেন,—তাহাকে অস্বীকার করিয়া, তাহার নিরপেক্ষ হইয়া, স্বতন্ত্র ভাবে কোনও দিকে তাঁহাদের চিন্তা পরিচালিত হইত না। তাহা ছাড়া, এই ভৌতিকজগৎকে চার্চ্চ *একেবারেই শয়তানের অধিকৃত বলিয়া মনে করিতেন। ইহার কোনও* তত্ত্বের অনুসন্ধান, ধর্ম্মনিরপেক্ষ হইয়া পার্থিব জীবনের কোনও রূপ উন্নতির বা সুখসৌভাগ্য বৃদ্ধির অনুকুল কোনও রূপ বিদ্যার আলোচনা পর্য্যন্ত, কেহ করিলে, তাহার বুদ্ধি শয়তানের অধীন হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইত এবং রাজশক্তির সহায়তায় কঠোরদণ্ডে চার্চ্চ এ সব প্রয়াসকে দমন করিবার চেষ্টা করিতেন। মানুষের বুদ্ধির উপরে এরূপ কঠোর শাসন পৃথিবীর আর কোনও ধর্ম্মপদ্ধতি কোথাও করিয়াছে বলিয়া শোনা যায় না। ব্যষ্টির বুদ্ধি বা intellect মুক্ত ভাবে তার পথে কাজ করিবে, এবং জীবনের বহু ক্ষেত্র আছে যেখানে ইহার বড় একটা সার্থকতাও তার আছে। কোন পথে কি ভাবে কোন কর্ম্ম করিলে ব্যষ্টির নিজের মঙ্গল হইবে, সমাজেরও মঙ্গল হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করাই অবশ্য ধর্ম্মের অধিকার। কিন্তু ইহার পরিপন্থী না হয়, এমন কোনও দিকে মানবের intellectual ও aesthetic facultyর, বা জ্ঞানার্জ্জনী ও চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির, পরিস্ফুরণে

বাধা দিলে বলিতে হইবে, ব্যষ্টি-মানবের ন্যায্য অধিকারের সীমা ধর্ম্ম-শাসন লঙ্ঘন করিল। শিষ্য যে ধর্ম্ম মানিয়া চলে, সেও মানিলে তার মঙ্গল হইবে, এইটা বুঝিয়াই মানিয়া চলে। কেবল কড়া শাসনের ভয়ে মানিয়া চলিতে পারে না, বিশেষতঃ যদি উন্নতবুদ্ধির অধিকারী সে হয়। যে ভক্তি শ্রদ্ধা শিষ্যকে তার শিষ্যত্বে ধরিয়া রাখে, এ অবস্থায় সে ভক্তি শ্রদ্ধা শিষ্যের চিত্তে থাকিতে পারে না। কেহই ভক্তি শ্রদ্ধায় স্বেচ্ছায় ও সুখে ধর্ম্ম মানিবে না, সকলেই কেবল ভয়ে তার শাসনের সম্মুখে শির নত করিয়া থাকিবে, ইহা কোন ধর্ম্মের পক্ষেই গৌরবের কথা নহে। বহুদিন এরূপ শাসন চলিতেও পারে না।

Action ও Reactionএর—ক্রিয়ার ও প্রতিক্রিয়ার—জোর সমান, এই কথা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন। শাসন যেমন সকল দিকে মানবের বুদ্ধিকে একেবারে চাপিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল, বুদ্ধি তেমনই তার স্বাভাবিক বিদ্রোহে সকল দিকেই শাসনকে অস্বীকার করিতে চাহিল। শাসনের যে ন্যায্য সীমা, যাহা না মানিলে সমষ্টির সংহতিই থাকে না, ব্যষ্টি কি সমষ্টি কোনও স্বরূপেই মানবের মঙ্গল হয় না, তাহাও লঙ্ঘন করিয়া বুদ্ধি, চিন্তায় ও কর্ম্মে—জীবনের সকল ক্ষেত্রে—আপনার নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিল।

প্রথমে ব্যষ্টিবুদ্ধির এই প্রাধান্য রোমক চার্চ্চের বিরুদ্ধে আত্ম-প্রকাশ করে; খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলের প্রমাণকে অস্বীকার করে না। এই দাবী মাত্র করা হয় যে, বাইবেলের তত্ত্ব প্রত্যেক মানব তার নিজের বুদ্ধি ও বিবেক (reason and conscience) এর নির্দ্দেশে বুঝিয়া নিবে, চার্চ্চের প্রমাণ অন্ধবিশ্বাসে নতশিরে গ্রহণ করিবে না। ইহার ফলে বহু প্রটেষ্টাণ্ট চার্চ্চের আবির্ভাব হইল। এই কিন্তু এই সব প্রটেষ্টাণ্ট চার্চ্চও যখন রোমক চার্চ্চের মত কঠোর শাসনপ্রণালী অবলম্বন করিলেন, ক্রমে তখন কেবল খৃষ্টধর্ম্ম ও বাইবেলের নয়, এইরূপ যে কোনও revealed religion ও তার scripturesএর প্রমাণের

বিরুদ্ধেই মানবের বুদ্ধি ও বিবেক (reason and conscience) আপনার সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করিল। এক কথায় শিষ্যত্বের ধর্ম্মকে একেবারে বর্জ্জন করিয়া প্রত্যেক মানবকেই সর্ব্ববিষয়ে তার গুরুত্বের অধিকারে বসাইতে চাহিল।

Every man has the perfect liberty to act as he likes so long as he does not interfere with the equal liberty of others, ইংরেজীতে সাধারণতঃ এই কয়টি কথা দ্বারা এই নীতিকে প্রকাশ করা হয়। শেষের কয়টি কথা—অর্থাৎ 'so long as he does not interfere with the equal liberty of others'—ইহাই মাত্র ইহার reservation বা ব্যতিরেক, এই স্বাধীনতার ভোগে একের সঙ্গে অন্যের কোনও সংঘর্ষ না ঘটে কেবল তার জন্য। সামাজিক শাসন বা Social Authority এই অবস্থায় যাহা থাকিবে, তার function বা কর্ত্তব্য হইবে মাত্র এইটুকু, এবং ইহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আর যাহা কিছু আসিতে পারে তাই। ব্যষ্টির প্রাধান্য ও তার অধিকারই যে সমষ্টির উপরে ইহাতে মানিয়া নেওয়া হয়, একথা বলাই বাহুল্য। ব্যষ্টির এই প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা হেতুই এই মত, individualism বা 'ব্যষ্টি-প্রধান ধর্ম্ম' নামে পরিচিত হইয়া উঠে।

সকলেই সমান স্বাধীন; স্বাধীনতার এই সব অধিকার সকলেরই সমান। সুতরাং স্বাধীনতার সঙ্গে সাম্যের নীতি অবশ্যই আসিবে। একটিকে মানিলে আর একটিকে মানিতেই হইবে।

সকলেই স্বাধীনভাবে সমান অধিকার ভোগী হইয়া থাকিবে, তবে ইহাদের মিলনের একটা বন্ধন চাই। সে বন্ধন হইবে প্রেমের, মৈত্রীর বা ভ্রাতৃত্বের। সুতরাং স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী—Liberty, Equality ও Fraternity—মোট এই তিনটি কথাতে এই নীতির সূত্র ব্যক্ত করা হইল। এই সূত্রটিই হয়, ফরাসীবিপ্লবে জনসাধারণের war-cry, প্রাচীন সমাজপদ্ধতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের ডাক। Social Authority বা গবর্ণমেণ্ট যাহা প্রয়োজন, সমান ও স্বাধীন জনসাধা-

রণের মতেই অবশ্য তাহা স্থির হইবে, কারণ তাহাদের উপরে কোনও শাস্ত্রের, কোনও ব্যক্তির কি সম্প্রদায়ের কোনও প্রভুত্ব নাই, থাকিতে পারে না।

উচ্চনাদে ঘোষিত হইল, Vox populi Vox Dei—অর্থাৎ জনসাধারণের বাণীই ভগবদ্‌বাণী। ঋষিমুখে উচ্চারিত বেদবাণী ভগবদ্‌বাণী (Scriptures reveal the word of God) একথা অগ্রাহ্য ও অশ্রদ্ধেয় বলিয়া অবজ্ঞায় পরিত্যক্ত হইল।

স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী—কথা কয়টি অতি চিত্তগ্রাহীও বটে। তখনই যে সকলের চিত্তগ্রাহী হইয়াছিল, তা নয়,—আজও পর্য্যন্ত কথা কয়টি শুনিলে লোকের মনে হয়, ইহা অপেক্ষা সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের কথা আর কিছু হইতে পারে না।

এমন যে মনে হয়, ইহা একেবারে একটা মোহের ভ্রান্তি বলিয়াও উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তবে কথাগুলিকে জগতের বাস্তব অবস্থার সত্যের সঙ্গে মিলাইয়া তুল করিয়া দেখিতে হইবে। তখন বুঝিতে বুঝিতে পারিব, সত্য হইলেও, সুন্দর ও মঙ্গল হইলেও, কি ভাবে, কোন দিকে, কোন অবস্থায় ইহা সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল। ইহা একেবারে নিরপেক্ষ (absolute) সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল, না অন্যরূপ কোন বিশেষ অবস্থার বা নিয়মের সাপেক্ষ বা relative।

ভগবৎপ্রেমিক মহাপুরুষগণও প্রেমের ধর্ম্মে মানবে মানবে একরূপ ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধের কথা বলিয়া গিয়াছেন। ভগবান্ প্রেমময়, সকল মানব তাঁহার সন্তান। সকলেই সমান তাঁহার প্রেমের অধিকারী, ভাই ভাই, একই পিতার ঘরে প্রেমের এই জগতে বাস করিতেছে। ভাইএ ভাইএ আবার তফাৎ কি?—পিতার কাছে সন্তানে সন্তানে কি পার্থক্য থাকিতে পারে?

প্রেমের ধর্ম্মে মানবে মানবে এই ভ্রাতৃত্বের কথা যে মহাপুরুষগণ ঘোষণা করিয়াছেন,তার সঙ্গে Rationalistic মতের এই সাম্য ও মৈত্রীর নীতির একটা মিল দেখা যায়। এবং এই নীতি যে এত বেশী চিত্তগ্রাহী

হইয়াছে, এমনই সত্য সুন্দর ও মঙ্গল বলিয়া মনে হয়, এবং এত বড় প্রতিষ্ঠা যে বর্ত্তমান জগতে তার হইয়াছে, তাহার বড় একটা কারণও ভগবৎপ্রেমিক মহাপুরুষগণের উক্তির সঙ্গে ইহার এই মিল। কিন্তু সূক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারিব, উপর উপর ভাষার প্রকাশে এই মিল সত্ত্বেও মূল তত্ত্বে, দুইটি নীতিতে মিল ত নাই-ই, বরং বড় একটা পার্থক্যই আছে।

ভগবৎপ্রেমিক মহাপুরুষগণ বলিতেছেন, মানব সব আমরা এক প্রেমময় পিতা সেই ভগবানের সন্তান, ভাই ভাই। কিন্তু এক পিতার সন্তান, ভাই ভাই সকলেই কি সমান হইয়া থাকে ? ছোট এক একটি পরিবারেও রূপেগুণে, বিদ্যায় ও চরিত্রে, দৈহিক কি মানসিক শক্তিতে ও যোগ্যতায়, সমান দুইটি ভাই দেখা যায় না। আর বৃহৎ এই জগৎসংসারে অসংখ্য মানবের মধ্যে এ সমতা আসিবে কোথা হইতে ? ভাই হইলেই যে সমান হইতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। ভাই ভাই বড় আছে, ছোট আছে, সমর্থ আছে অসমর্থ আছে,—সুস্থ আছে, সবল আছে, রুগ্ন পঙ্গু দুর্ব্বল আছে,—আরও কত রকম রকম আছে। এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, সকলেই পিতৃস্নেহের সমান অধিকারী,—ভাইরাও পরস্পরকে ভাই বলিয়া জানিবে, প্রেমের সম্বন্ধে পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিবে। বড় যে ছোটকে স্নেহে লালন-পালন করিবে, প্রয়োজন মত শাসন তাড়নও করিবে,—আবার বড় হইয়া উঠিলে বড়র যোগ্য অধিকার তাকে ছাড়িয়া দিবে, সহযোগী বন্ধুর ন্যায় দেখিবে। সমর্থ যে অসমর্থকে যত্নে পালন করিবে,—সবল যে, সুস্থ যে, দুর্ব্বল রুগ্ন ও পঙ্গুকে স্নেহে সে রক্ষা করিবে। ভাইকে দেখিতে হইবে, অন্য কোনও ভাই দুঃখ না পায়, সকলেই সুখে সচ্ছন্দে থাকে। বাস্তবিক ভাইএ ভাইএ স্বাধীনতার লড়াই নাই, সাম্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই,—আছে প্রেম, আছে স্নেহ, আছে শ্রদ্ধা ভক্তি, আছে রক্তের টান, মমতার দরদ, সুখ সমান আনন্দ, দুঃখে সহানুভূতি ও সহায়তা। ভাই সর্ব্বদা ভাইএর সহযোগী;

প্রতিযোগী নয়। ভাই আপন সুখসৌভাগ্যে ভাইকে সঙ্গে নিয়া চলিতে চায়, তাকে পিছনে ঠেলিয়া আপনি এগিয়া যাইতে চায় না, নীচে তাকে চাপিয়া রাখিয়া নিজে উপরে উঠিতে চায় না। ভগবৎপ্রেমিক মহাপুরুষগণ প্রেমের ধর্ম্মে মানবে মানবে যে ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধের কথা বলিয়াছেন, ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই। এক বিশ্বপিতার সন্তান বলিয়া পিতার স্বরূপের ছায়া সকলের মধ্যেই আছে, পিতার দরদ সকলেরই উপরে সমান। ইহাই তাঁহাদের প্রচারিত সাম্যের তত্ত্ব; তার সীমাও এইখানে।

প্রচলিত একটা প্রবাদও আমাদের দেশে আছে, হাতের পাঁচটা আঙ্গুল সমান নহে, কিন্তু দরদ সমান; ব্যথার আঙ্গুলেই দরদ বেশী। অর্থাৎ সন্তান সকলেই, কিন্তু তাই বলিয়া সকল সন্তান এক মাপে একভাবে সমান নয়। তবে দরদে কোনও তফাৎ নাই, বরং কোনও সন্তান ক্ষীণ বা দুর্ব্বল হইলে দরদ তার জন্য বেশীই বোধ হয়। এই জগৎ-সংসারে পিতা আড়ালে আছেন, তাঁর এই দরদ তাঁরই ইচ্ছায়, তাঁরই ব্যবস্থায়, যোগ্য সমর্থ ও সবল ভাইদের মধ্য দিয়াই অযোগ্য অসমর্থ ও দুর্ব্বল ভাইদের প্রতি প্রকাশ পাইতেছে। সাধারণ সংসারে পিতৃভক্ত, ভ্রাতৃপ্রেমিক বড় ও সমর্থ ভাইরা ছোট ও অসমর্থ ভাইগুলিকে যত্নে রক্ষা করিয়া যোগ্য পুত্রের ধর্ম্ম, সমর্থ ভাইএর ধর্ম্ম পালন করেন। জগৎ-সংসারেও তেমনই যাঁহারা বড়, যাঁহারা সমর্থ,—দুর্ব্বল ও অসমর্থ মানবদের তেমনই যত্নে রক্ষা করিবেন, করিয়া ভগবদ্‌ভক্তের, মানবপ্রেমিকের ধর্ম্ম পালন করিবেন। ছোট যারা, অসমর্থ যারা, তাদেরও তেমনই পাল্টা কর্ত্তব্য আছে। ভক্তি ও শ্রদ্ধায় তাহারা বড়র অনুগত হইয়া তাহাদের মানিয়া চলিবে। সুতরাং সর্ব্ববিধ কর্ম্মে স্বাতন্ত্র্যের কি সমান অধিকারের দাবীও ইহার মধ্যে চলে না। কেবল মানবকে কেন, ভাগবৎ-প্রেমিক অনেক মহাপুরুষ সমস্ত জীবকে—আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমগ্র জগৎকে পর্য্যন্ত

প্রেমের এই পরিবারের মধ্যে আপন বলিয়া টানিয়া আনিয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে "বসুধৈব কুটুম্বকম্।"

নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর পক্ষে প্রত্যহ তর্পণের বিধি আছে।

প্রথমে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ও প্রজাপতির তর্পণ করিয়া এই মন্ত্রে বিশ্ব জীবের তৃপ্ত্যর্থে এক গণ্ডুষ জল দিতে হয়।—

"দেব যক্ষা স্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ।
বিদ্যাধরাঃ জলাধারা স্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্ দীয়তে সলিলং ময়া॥"

তার পর ঋষ্যাদির ও পিত্রাদির তর্পণ করিয়া অনুষ্ঠানের উপসংহার করিতে হয়—

'আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু—"

এই মন্ত্রে শেষ এক গণ্ডুষ দিয়া।

বৌদ্ধধর্ম্মে ও বৈষ্ণব ধর্ম্মে সকল জীবকেই প্রেম রক্ষা করিতে হইবে, সেবা করিতে হইবে, এই বিধি আছে। 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব এক বাক্যে এই কথা বলিয়া থাকেন।

শাক্ত-হিন্দু জীব বলি দিয়া থাকেন, কিন্তু বলির সময় সেই জীবকে তাঁহাদের শিবরূপ চিন্তা করিতে হয়, বলিকে পূজা করিয়া তবে উৎসর্গ করিতে হয়। আপনাকে এবং পূজার সমস্ত উপচারকে পূজ্য দেবতার সঙ্গে অভিন্ন মনে না করিয়া পূজা করিলে তান্ত্রিক পূজকের পূজা ব্যর্থ হয়।

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥"

এই বচনে তান্ত্রিক সাধকের পূজার তাৎপর্য্য বিবৃত হইয়াছে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ব্রহ্মোপসনার যে পদ্ধতি আছে, তাহাতে এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া প্রত্যেক উপচার দান করিতে হইবে, এই বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিবাক্যের প্রয়োগ তান্ত্রিক সাধনায় এই ভাবে হইয়াছে। শ্রুতি বলিতেছেন, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। আবার শ্রুতিই এই বাণী শুনিয়াছেন, 'একোঽহং বহুস্যাম্।' এই দুইটি সূত্রে মানবের সাম্য, আবার সাম্যের মধ্যেও অভিব্যক্তির বৈচিত্র্যে স্বাভাবিক বৈষম্য, দুইটি সত্যই ব্যক্ত হইয়াছে।

যাহাহউক. সমস্ত জীবকে অথবা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎকে আপনার প্রেমের পরিবারের মধ্যে আনুন আর না আনুন, সমস্ত মানবের সঙ্গে মানবের যে প্রেমের সম্বন্ধ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ভগবৎ-প্রেমিক মহাপুরুষগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন. তার সঙ্গে ইয়োরোপীয় Rationalistic মতপ্রসূত সাম্যনীতির একত্ব কি সামঞ্জস্য কিছু নাই। তাঁহাদের গোড়ার কথা প্রেম, আর সব সম্বন্ধ সেই প্রেমের বলে চলিবে। আর ইঁহাদের গোড়ার কথা স্বাধীনতা,—সকলেই সমান স্বাধীন সুতরাং সমান। মৈত্রীর কথা শেষে আসিয়াছে, স্বাধীন ও স্বাধীনতায় সমান সকলের মধ্যে একটা মঙ্গলকর সম্বন্ধ স্থাপনের উদ্দেশ্যে। স্বাধীন মানব সকলেই যে যে ভাবে যে দিকে পারে আপনার স্বার্থ অন্বেষণ করিবে, যথাশক্তি উন্নতিলাভের চেষ্টা করিবে, কোনও বাধা কেহ ইহাতে দিতে পারিবে না। কেবল Freedom of conscience নয়; fredom of labour, ও তার সঙ্গে freedom of contract ও competitionও প্রত্যেক মানবের অবাধ অধিকার বলিয়া ঘোষিত ও গৃহীত হয়। ফলে দুর্ব্বল একেবারে কোণ-ঠাসা হইয়া পড়িতেছে, প্রবল পৃথিবীর সুখসম্পদ সব দখল করিয়া ফেলিতেছে। সাম্য দূরে থাক, অতি ভয়ঙ্কর এক বৈষম্য সমগ্র ইয়ো-রোপ ভরিয়া দেখা দিয়াছে। দুর্ব্বল যতদিন পারিয়াছিল, কোণ-ঠাসা হইয়া প্রবলের পীড়ন সহিয়াছিল। এখন দল বাঁধিয়া প্রবলের বিরুদ্ধে ভীষণ সংগ্রামে অগ্রসর হইতেছে। মৈত্রী কোথায় গিয়াছে, বিকট এক সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষে ইয়োরোপীয় সমাজদেহ একেবারে জর্জ্জর হইয়া উঠিয়াছে। কেবল একদেশেরই প্রবলে দুর্ব্বলে, বড়তে

ছোটতে এই বিদ্বেষ যে সকল সম্বন্ধকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে তা নয়, বিভিন্ন দেশের ও জাতির মধ্যেও প্রবলে প্রবলে কে কত প্রবল হইবে, হইয়া জগতে যেথায় যে সম্পদ্ আছে তাহা কে কত কাড়িয়া নিবে, তাহা লইয়াও অবিরত এক সংঘর্ষ চলিতেছে। হায়! কোথায় সেই প্রেমাবতার যিশুখ্রীষ্ট, আর কোথায় তাঁহার সেই প্রেমের ধর্ম্ম! তাঁহারই শিষ্যেরা নিত্য তাঁহাকে বলি দিতেছেন। মহামতি টলষ্টয় সত্যই বলিয়াছেন—"Christ is being daily crucified by his disciples in Europe !"

মোট কথা, সমাজে সাম্য ও মৈত্রীর প্রতিষ্ঠায় ইয়োরোপীয় Rationalism এর চেষ্টা সার্থক হয় নাই। Individualism স্বাধীনতার সঙ্গে যে ভাবে যে রূপে সাম্যকে প্রচার করিয়াছে, তাহা যে সত্য নহে, মানব জীবনের বাস্তব অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই তাহা আমরা বুঝিতে পারিব। ক্রমে তাহা আমরা দেখিবার চেষ্টা করিব।

Individualism এর ক্রিয়া যে ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, যে fair field and no favour তাহাতে জীবনের সকল কর্ম্ম মানবের 'স্বধর্ম্ম' হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাও প্রেমের ধর্ম্ম, সত্যের ধর্ম্ম নহে। প্রেম বা মৈত্রী—তার সঙ্গে জোরে বাঁধিয়া দিলেও চলিতে পারে না, ভাঙ্গিয়া খসিয়া পড়ে। তাই একদিন যে নীতি এই জগতে মানব-জীবনকে একেবারে অমৃতময় করিয়া তুলিবে, সকলে এই ভরসা করিয়া ছিলেন, সেই নীতি হইতে এখন অতি তীব্র হলাহল উঠিয়াছে, সমগ্র মানবসমাজকেই ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে !

সত্যই অমৃত, সত্যেই অমৃত। সত্যকে অস্বীকার করিলে, সত্যভ্রষ্ট হইয়া চলিলে অমৃতেও বিষ উঠে।

জানি না কবে কোন নীলকণ্ঠ আবার এই বিষ পান করিয়া জগৎকে রক্ষা করিবেন।

মানবজীবনের সত্য—

তত্ত্ববিদ্যার কথা।

ইয়োরোপীয় Rationalism যে ভাবে যে দিক হইতে মানবের স্বাধীনতা সাম্য ও মৈত্রীর নীতি প্রচার করেন, তাহা সত্য নহে, এবং সত্য নহে বলিয়াই ইয়োরোপীয় সভ্যতার পরিণতি তাহার অনুসরণে যে দিকে যতদূর হইয়াছে, তাহাতে সামাজিকজীবনে অমৃতে বিষ উঠিয়াছে। পূর্ব্ব অধ্যায়ের উপসংহারে এই মন্তব্য করিয়াছি। এত বড় একটা বিষয় সম্বন্ধে কেবল এইরূপ একটা মন্তব্যই যথেষ্ট হইতে পারে না। প্রমাণে দেখাইতে হইবে, কেন এই নীতি সত্য নহে, এবং কেন, কেমন করিয়া, ইহা হইতে সামাজিক জীবনের সকল সম্বন্ধ বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, এবং এই বিষে এমন সব গুরুতর সামাজিক ব্যাধি দেখা দিয়াছে, যাহার উপযুক্ত প্রতিকার না হইলে ইয়োরোপীয় সমাজ তার এই উন্নত সভ্যতা-গৌরব সত্ত্বেও অচিরে একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে, এবং সেই ধ্বংসের লীলা সর্ব্বত্র এই পার্থিব জগৎ ভরিয়া প্রকট হইবে। কারণ, জগৎ অধুনা নানা রকমে নানা সম্বন্ধে ইয়োরোপীয় শক্তি ও সভ্যতার প্রভাবের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে।

তাহারই চেষ্টা এখন করিব। তবে কথাটা এত গুরু, আর এত জটিল, যে দুইচারি কথায় এই একটি মাত্র অধ্যায়ে তাহা হইবার নয়। কিছু সময় লাগিবে। কিন্তু লাগিলেও করিতে হইবে, কারণ আমি যে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছি তাহার মূল লক্ষ্যই হইতেছে, মানব জীবনের বিশেষ এক ক্ষেত্রে—অর্থাৎ তাহার সমাজধর্ম্মের আদর্শে, প্রধানতঃ ইয়োরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় হিন্দুসভ্যতার তুলনা এবং তুলনায় এই বিষয়ে মানবের ইতিহাসে দুই সভ্যতার স্থান

নিরূপণ। আদর্শ দুইটির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ব্যতীত এরূপ তুলনা সম্ভব হয় না,—তুলনায় কার স্থান কোথায় তাহাও ধরা যায় না।

Rationalistic School এর পণ্ডিতগণ যাহা বলেন, তার মোট কথা এই :—ব্যষ্টিভাবে অর্থাৎ Individually প্রত্যেক মানব স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। তাহার নিরপেক্ষ বুদ্ধি বা Reasonই সর্ব্বদা সকল কার্য্যে তাহার নিয়ন্তা। একমাত্র তাহারই নির্দ্দেশ অনুসারে যে দিকে যে ভাবে পারে, সে তার স্বার্থ সাধন ও উন্নতি লাভের চেষ্টা করিবে। ইহাই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। স্বাভাবিক মানুষ (Natural man)ই এই অবস্থার মানুষ। সকলেই এইরূপ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র Natural man। সকলেই সমান ভাবে যার যার বুদ্ধি মানিয়া চলিবে। সুতরাং কেহ কাহারও অধীন হইতে পারে না, সকলেই সমান স্বাধীন। ইহাদের মতে মানবের সাম্য বাস্তবিক এই সমান স্বাধীনতার সাম্য।—সমাজ যাহা মানবের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই সব স্বতন্ত্র Natural m n নিজেদের সুবিধা বুঝিয়া স্বেচ্ছায় গড়িয়া নিয়াছে। কিন্তু এই যে সব Natural man, কোথা হইতে কি ভাবে ইহারা আসিয়াছে, কোথায় কোন দিকে ইহাদের *জীবনের পরিণতি, এসব সম্বন্ধে ইহারা কিছু বলেন নাই। মানব আছে,* এই জীবনে কতকগুলি শক্তি ও প্রবৃত্তি লইয়া সে আছে, এবং তার পূর্ণ সার্থকতা তার চাই। বর্ত্তমানে ইহার বেশী মানবের ভূত ও ভবিষ্যৎ কিছুই ইঁহারা দেখেন নাই।

রুষো (Rousseau) প্রমুখ অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী পণ্ডিতবর্গের এই মত ক্রমে অনেক পরিমাণে নরম হইলেও, মোটামুটি উনবিংশ-শতাব্দীতে ব্যষ্টি ভাবে মানবের প্রধান্য, জীবনের পথ নির্ব্বাচনে সকলের সমান স্বেচ্ছানুবর্ত্তিতা,সামাজিক সম্বন্ধে সকলের সমান অধিকার প্রভৃতির নীতি ইয়োরোপে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ-ভাগ হইতে ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে মানব প্রকৃতির তত্ত্ব সম্বন্ধে আর একটি মতের আবির্ভাব হইয়াছে। এই মতবাদী পণ্ডিতগণ Scientific

school নামে সাধারণতঃ পরিচিত। Rationalistic schoolএর পণ্ডিতবর্গ মানবের প্রকৃতি ও ধর্ম্ম, ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ে যে সব কথা বলিয়াছেন, ইঁহারা সে সব কথা মূলতঃ অপ্রামাণিক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মানবসমাজের বাস্তব অবস্থাদি পরীক্ষা করিয়া, সাধারণ জীবতত্ত্বের কতকগুলি সনাতন নীতির সঙ্গে মানবের জীবননীতির সমতা দেখাইয়া, এমন কতকগুলি সিদ্ধান্তে ইঁহারা উপনীত হইয়াছেন, যাহার সম্মুখে বাস্তবিক Rationalistic নীতি দাঁড়াইতে পারে না। বিজ্ঞানের সীমা যত দূর, তার মধ্যে বরং তত্ত্ববিদ্যার সিদ্ধান্তের সঙ্গেই এই সব সিদ্ধান্তের একটা মিল দেখা যাইবে। কিন্তু ইয়োরোপের বাস্তব জীবনে Rationalistic নীতির মোহ ইহাতেও কাটিয়া যায় নাই,—সহজে যাইবে, তার কোনও লক্ষণও দেখা যাইতেছে না।

যাহা হউক, এই বিশ্বনীতির সঙ্গে মানবের জীবননীতির সম্বন্ধ কি এবং তাহাতে ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে মানবের স্বরূপ কি, এই সম্বন্ধে তার ধর্ম্ম কি এবং এই ধর্ম্মে মানবে মানবে স্বভাবিক সম্বন্ধ কিরূপ, তত্ত্ববিদ্যার ও তার সঙ্গে বিজ্ঞানের নির্দ্দেশ মত এই কথাগুলি আমরা এখন বুঝিতে চেষ্টা করিব।

এদেশের তত্ত্বদর্শী ঋষিরা বলেন, এই বিশ্ব তার সমগ্রতায় ভগবানের স্থূলভূতাত্মক রূপ বা মূর্ত্তি, তাই তিনি বিশ্বরূপ বা বিশ্বমূর্ত্তি। এই বিশ্বরূপ বা বিশ্বমূর্ত্তিতে তিনি বিরাট্—বিরাট্ পুরুষ। 'বিরাটে'র সঙ্গে এই 'পুরুষ' কথাটার যোগে ঋষিরা ইহাই বুঝাইতেছেন, এই বিশ্ব বা বিরাট্ সর্ব্বভূতের একটা impersonal সমষ্টি নহে, পরিপূর্ণ বা All-comprehensive Personality। ইঁহার স্বরূপ গীতায় বিশ্বরূপ স্তোত্রের প্রথম শ্লোকটিতেই এই ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে,—

"পশ্যামি দেবাংস্তব দেবদেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষ সঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্।"

ইঁহার এই দেহে যাহা কিছু আছে, অর্জ্জুন যাহা দেখিতেছেন, কি ভাবে তাহা আছে, কি ভাবে দেখা যায়? বসন ভূষণাদির ন্যায় অঙ্গে স্থিত বা ধৃত বাহিরের পৃথক্ পৃথক্ বস্তুরূপে কি? না, তা নয়,—অনন্ত বিরাট্ দেহের অংসখ্য অঙ্গরূপে। এই সব অঙ্গ লইয়াই বিরাটের পরিপূর্ণ দেহ। তাই তিনি বিশ্বরূপ। তিনি পুরুষ, প্রাণময়, তাঁহারই প্রাণ তাঁহার অঙ্গে অঙ্গে 'তত' বা পরিব্যাপ্ত। বিশ্বব্যাপ্ত যে প্রাণ, all-pervading যে life, তাহা তাঁহারই প্রাণ, তাঁহারই life। এই প্রাণেই তিনি প্রাণময় পুরুষ, Living Personality। অন্যভাবে এই Personalityই আবার মহামায়া বা মহাশক্তি, মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে যাঁহার সম্বন্ধে ঋষি বলিয়াছেন—

"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি যয়া সর্ব্বমিদং ততম্।"

ইংরেজি Universe অতি প্রচলিত একটি কথা। যেমন বিশ্ব, তেমনই এই Universe কথাটাও সর্ব্বদা আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহার অর্থ—the whole system of created things; all created things viewd as one whole. এই বিশ্বজগতের প্রকৃতিবোধক গ্রীক্ দার্শনিকদিগের আরও একটি কথাও সর্ব্বদা পাশ্চাত্য সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়—Cosmos, অর্থাৎ the world as an orderly and systematic whole.

Universe এবং Cosmos এই দুইটি কথা হইতে এই সত্যেরই দ্যোতনা হইতেছে, জগৎ বস্তু সমূহ—সর্ব্বভূত—পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন, অসম্বন্ধ, একল একল নহে, একটা সাকল্যের সম্বন্ধ পরস্পরের সঙ্গে আছে, অঙ্গাঙ্গী ভাবে সব লইয়া এই বিশ্ব; সকলের সঙ্ঘাতে বা নিবিড় সংযোগে এই বিশ্ব একটা Organic whole; একই সনাতন নিয়মের অনুবর্ত্তী একটা System; পরস্পর সম্বদ্ধ, পরস্পর সাপেক্ষ বহুবস্তুর একটা পূর্ণ সংহতি।

কিন্তু এই Organic whole, এই System, এই সংহতি কিসে ঘটিয়াছে, কে ঘটাইয়াছে, কিসে চলিতেছে, কে চালাইতছে?

ইহার উত্তর পাশ্চাত্য সাহিত্যে সর্ব্বদা ব্যবহৃত আর একটি কথায় পাওয়া যায়, এবং সেই কথাটি হইতেছে—Nature।

সাধারণতঃ সমগ্র ভূতসঙ্ঘ—all things as they are—এই অর্থেই Nature কথাটা ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া আর একটি গভীরতর অর্থ ইহার আছে—the power which creates and regulates the material world,—অর্থাৎ যে শক্তি এই ভৌতিক জগৎকে সৃষ্টি করিতেছে ও তাহার সমস্ত ক্রিয়া এক নিয়মে পরিচালিত করিতেছে।

কিন্তু এই Powerএর বা শক্তির স্বরূপ কি, প্রকৃতি কি, ধর্ম্ম কি? Material worldএর যে matter, তাহারই বা স্বরূপ কি? সাধারণতঃ আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের গোচর স্থূলভূত যাহা, তাহাকেই matter বলা হয়। কিন্তু পঞ্চেন্দ্রিয়ের অগোচর যদি কোনও সত্ত্ব থাকে, তাহা এই matterএর মধ্যে আসে কি না? অর্থাৎ যাহাকে supernatural নাম দেওয়া হয়, তাহা কি বাস্তবিকই supernatural বা Natureএর অতীত পৃথক্ কোনও সত্ত্ব, অথবা এক এই Nature-এরই উচ্চতর কোনও ভাব বা অবস্থা, যাহা আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের গোচরে আসিতেছে না, অথচ এই স্থূলভূত সমষ্টির অন্তরে রহিয়াছে? অর্থাৎ স্থূলভূতের অণুতে অণুতে ব্যাপ্ত, তাহাতে pervaded, permeated, অনুবিদ্ধ যে প্রাণ, যে life, যে spirit, তাহাও ভূতের বা matter-এরই একটা সূক্ষ্মতর প্রকাশ কিনা? এই প্রকাশে আবার নাকি তিনিই আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। তা যদি হয়, তবে কেবল natural ও supernaturalএ অর্থাৎ প্রাকৃতিক ও অতিপ্রাকৃতিক বস্তুতে নয়, সেই স্রষ্ট্রী বা নিয়ন্ত্রী শক্তিস্বরূপা Nature এবং এই সৃষ্ট বা নিয়ন্ত্রিত nature বা ভূতসংঘের মধ্যে সীমারেখা কোথায় টানা যায়?

অতীন্দ্রিয় কোনও সত্ত্বের প্রমাণ বিজ্ঞানের গ্রাহ্য নহে। ইন্দ্রিয়-গোচর যে ভূত বা সত্ত্ব, তাহারই ধর্ম্ম-বিশ্লেষণ বিজ্ঞানের অধিকারে।

সেই বিজ্ঞান তাঁহার অনুসন্ধানের ফলে এই সিদ্ধান্তে এখন উপনীত হইয়াছেন, যে force বা শক্তি matter বা ভূতের মধ্যে ক্রিয়া করে, তাহাতে ও সেই matterএ বা ভূতে, মূলে দ্বৈতভাব কিছু নাই, force বা শক্তিরই বিশেষ বিশেষ স্পন্দন বা আবর্ত্তন বিভিন্ন ভূত বা matter-রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এই শক্তি বা force এর স্বরূপ কি, ধর্ম্ম কি, তাহা বিজ্ঞান বলিতে পারেন না। বিজ্ঞান যাহা প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন ও করিতে পারেন, তার মধ্যে ইহা আইসে না।

দর্শন বা তত্ত্ববিদ্যা এই শক্তির স্বরূপকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই শক্তি 'কাহারও' শক্তি, এই শক্তির অভিমানী কেহ আছেন, এই শক্তি কেবল force নয়, Power। Force বলিলে কেবল শক্তিকেই বুঝায়, power বলিলে শক্তির সঙ্গে সঙ্গে তার একজন কর্ত্তা, সংকল্পয়িতা ও নিয়ন্তাকেও বুঝায়। এই powerএর কর্ত্তা যিনি, তিনি All-powerful Being—সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ।—ইনিই বেদান্তের সেই বিরাট্ পুরুষ,—বিশ্বরূপে যিনি আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন, বিশ্বরূপ মূর্ত্তি যিনি ধরিয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যেই তাঁহার সত্ত্বের পরিসমাপ্তি হয় নাই। এই বিশ্ব ব্যাপিয়া তিনি আছেন, আবার ইহার উপরেও আছেন—

"স ভূমিং সর্ব্বতোঽবৃত্বা অত্যতিষ্ঠেদ্দশাঙ্গুলম্।"

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেবী মাহাত্ম্য বর্ণনায় দেখিতে পাই—

"ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈব সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈব পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা॥—"

আবার পরবর্ত্তী শ্লোকেই স্তোত্রকার বলিতেছেন,—

"বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপাচ স্থিতিরূপাচ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগদস্য জগন্ময়ে॥"

সৃষ্টি করিতেছ তুমি, সৃষ্টিরূপাও তুমি। পালন করিতেছ তুমি, পালনে স্থিতির রূপ তোমারই রূপ। আবার অন্তে সংহার করিতেছ তুমি। সংহারের যে মূর্ত্তি, তাহাও তোমারই মূর্ত্তি।

কেবল প্রকাশিত প্রাণময় এই বিশ্বরূপে নয়, ইহার উপরেও এই প্রকাশের কর্ত্রীরূপে তিনি আছেন। বিশ্ব তাঁহার দেহ, ইহার দেহী তিনি।—দেহের লয় হয়। কিন্তু "দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।"

আবার দেহের লয় হয় দেহীতে,—'ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা'—অন্তে তুমিই সব ভক্ষণ কর।—যিনি ভক্ষণ করেন, ভক্ষণ করিয়াও অবশ্য তিনি থাকেন, নিজেকে নিজে খাইয়া কেহ শেষ করিয়া ফেলিতে পারে না।

এই ভাবই পাশ্চাত্যদর্শন Transcendant ও Immanent বিশ্বাতিগ ও বিশ্বানুগ এই দুইটি কথায় প্রকাশ করিয়াছেন।—বিশ্বরূপে যে ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহাই তাহার immanent বা বিশ্বানুগ অবস্থা। আবার তাহার উপরে যে 'দশ' আঙ্গুল বাড়িয়া তিনি আছেন, 'অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং'—তাহাই তাঁহার Transcendant বা বিশ্বাতিগ অবস্থা।

Nature মহেশ্বরের এই immanent ভাব, অর্থাৎ Universe বা Cosmos তাঁহার বহিপ্রকাশ। তাই Nature, personal ভাবে, বিশ্বজগতের শক্তিময়ী কর্ত্রীর নামরূপেও ব্যবহৃত হয়। আমাদের পুরাণে ও তন্ত্রে যে মহাদেবী মহাশক্তির বর্ণনা আছে, তিনি কেবল Immanent Nature নন, Transcendant বা বিশ্বাতিগ-ভাবে ব্রহ্মময়ী, চিন্ময়ী, মহাযোগিনী,—নামান্তরে স্বয়ং মহেশ্বরই তিনি। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র তাই বলিতেছেন,—ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, আর

"তস্যেচ্ছা মাত্রমালম্ব্য ত্বং মহাযোগিনী পরা।
করোসি পাসি হংস্যন্তে জগদেতচ্চরাচরম্॥"

মার্কণ্ডের চণ্ডীতেও স্তোত্রকারের মুখে তাই শুনিতে পাই,

"পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী।"

বিজ্ঞান বিশ্বানুগ বা বিশ্বাতিগ কোনও চিন্ময় বা চিন্ময়ীকে স্বীকার

করেন না, বিজ্ঞানের কাছে সে দাবীও কেহ করে না। তবে বিজ্ঞান যে force বা শক্তিকে স্বীকার করিতেছেন, তত্ত্ববিদ্যা তাহার স্বরূপকে এই চিন্ময় বা চিন্ময়ী নামে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। আজই কেবল বিজ্ঞানের এই অভাব পূরণের জন্য নয়, বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই তত্ত্ব-বিদ্যা ইহার সন্ধান পাইয়াছেন, এবং ইহার স্বরূপকে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কেবল ভারতের তত্ত্ববিদ্যা নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের তত্ত্ববিদ্যাও এ সম্বন্ধে এক কথাই বলিতেছেন। তত্ত্ববিদ্যা যাহা বলিতে-ছেন, বিজ্ঞানের বিরোধী তাহা নহে। বিজ্ঞান যে সীমা লঙ্ঘন করিতে পারে না, করিবার অধিকারও দাবী করে না, সেই সীমার বাহিরে তত্ত্ববিদ্যা তার অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির বলে বিজ্ঞানেরই স্বীকৃত সত্যের মূল স্বরূপকে বুঝাইতে চাহিয়াছে। সে সত্য এই—যে এই বিশ্ব, Universe, Cosmos, একই শক্তির বিচিত্র প্রকাশ,—Nature সেই শক্তি বা শক্তির নিয়ন্ত্রী। সকলেই এই সত্য মোটামুটি স্বীকার করিয়া নিয়াছেন। এই বিশ্ব-জগতে কোনও বস্তুই—কোনও ভূতই—এই বিশ্ব-সংহতি বা Cosmic বা Universal order হইতে পৃথক্ সত্ত্ব নহে, বিশ্ব-ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন পৃথক্ ধর্ম্মও কাহারও কিছু নাই। ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে মানবও এই বিশ্ব-সংহতির বা Cosmic order এর অঙ্গ-ভুক্ত,—তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র কোনও সত্ত্ব তাহার নাই, কোনও ধর্ম্মও তাহার থাকিতে পারে না।

এখন ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে এই বিশ্ব বা Cosmos এর সঙ্গে মানবজীবনের অভিব্যক্তির ধারা ও প্রকৃতি তত্ত্বদর্শিরা কিরূপ দেখিয়াছেন, তাহা বুঝিবার একটু চেষ্টা করিব। এই বিশ্বধর্ম্মের সঙ্গে মানব-ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি, তাহাও বোধহয় কতকটা ইহা হইতে আমরা ধরিতে পারিব।

ধ্যানযোগে প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে ভারতের ঋষি এই জগৎপ্রপঞ্চের অন্তর্নিহিত মূলতত্ত্ব দর্শন করিয়া উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

"একমেবাদ্বিতীয়ম্!"—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম!"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অধুনা পাশ্চাত্যবিজ্ঞানও বহু অনুসন্ধানের ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সমস্ত জগতের মুল যাহা, তাহা—'একমেবাদ্বিতীয়ম্।' এই 'একমেবাদ্বিতীয়ং'—যাহা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের হাতে ধরা পড়িয়াছে, তাহা একটা Force বা শক্তি। -কিন্তু যাকে আশ্রয় করিয়া এই শক্তি ক্রিয়া করে, এই শক্তির উৎস ও তাহার স্বরূপ যাহা, Science বা বিজ্ঞানের তাহা জ্ঞেয় নহে। Herbert Spencer প্রভৃতি দার্শনিকগণ তাহাকে Unknowable বা অজ্ঞেয় এই বিশেষণ দিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকগণ এই পর্য্যন্ত বলেন, বলিতে পারেন,—এই force বা শক্তি বিভিন্ন রূপ স্পন্দনে ও আবর্ত্তনে বিভিন্ন ভাবে ও রূপে ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্য দিয়া আমাদের অনুভূতির গোচরে আসে এবং মুল শক্তির এই বিভিন্নরূপ স্পন্দনেই স্থষ্টিতে জগৎবস্তুর বৈচিত্র প্রকাশ পায়।

এই force বা শক্তির আশ্রয় বা অবলম্বন যাহা, প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে তাহা জগতের ঋষিগণ দর্শন করিয়াছেন, এবং তাহাই ভারতীয় ঋষিদের মুখে উচ্চারিত—'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম'। এই শক্তিকে তাঁহারা মহামায়া এবং পরাপ্রকৃতি এই নামও দিয়াছেন। এই শক্তির অতীত নির্গুণ ও নিরুপাধি যে অবস্থা, তাহাতে ব্রহ্ম 'একম্'।—মায়াতে উপহিত, প্রকৃতিতে আবিষ্ট, শক্তিতে স্পন্দিত ও আবর্ত্তিত যে অবস্থা, তাহাতে নিগুণ, নিরুপাধি 'একম্' হইলেন সগুণ সোপাধি 'একঃ,'—তৎ হইলেন 'সঃ'।—তাঁহারই স্থষ্টি কল্পনা হইল, "একোঽহং বহুস্যাম্"—এক আমি বহু হইব। একের এই বহুত্বে প্রকাশই স্থষ্টি।

"একমেবাদ্বিতীয়ং," 'সর্ব্ব খল্বিদং ব্রহ্ম,' 'একোঽহং বহুস্যাম,'—এই তিনটি সংক্ষিপ্ত সূত্ররূপ শ্রুতিবাক্যে একদিকে অণোরণীয়ান্, অপর দিকে মহতোমহীয়ান্ অনন্ত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্থষ্টির বা অভিব্যক্তির সমস্ত তত্ত্ব ব্যক্ত হইয়াছে। সেই এক তিনিই বিচিত্র এই বিশ্বরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্থূলভূতাত্মক

এই বিশ্বজগৎকে তাই তাঁহার বিরাট্ রূপ বলিয়া ঋষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই বিরাট্-রূপে তিনি—

"সহস্রশির্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ।
সভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাহত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলং॥
পুরুষ এ বেদং সর্ব্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভব্যং।
উতামৃতত্বেশানো যদন্নে নাধিরোহতি॥"

(ঋগ্‌বেদ, পুরুষসূক্ত।)

অর্থাৎ—"এই বিরাটপুরুষের সহস্র শির, সহস্র অক্ষি, সহস্রপদ। তিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, তার বাহিরেও আছেন। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান যাহা কিছু, সবই সেই পুরুষ। মর্ত্ত্য ও অমর্ত্ত্য—সকলেরই অধীশ্বর তিনি।"

আবার—"সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরমুখো।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্যাতিষ্ঠতি॥"

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৩।৬)

সর্ব্বত্র তাঁহার পাণি-পাদ, সর্ব্বত্র অক্ষি শিরোমুখ, সর্ব্বত্র শ্রবণ, সমস্ত ব্যাপিয়া তিনি আছেন। সবই—'ব্রহ্মণঃ আয়তনবান্ নাম'—অর্থাৎ সবই তাঁহার আয়তন বা অবয়ব।

সমস্ত জগৎবস্তু তাঁহার স্থূলরূপের বিচিত্র অভিব্যক্তি,—আবার প্রত্যেক এই জগৎবস্তুর অন্তরে সূক্ষ্ম যে প্রাণ রহিয়াছে, সেই প্রাণেরও সমষ্টি ভাব তাঁহারই প্রাণ রূপ। এইরূপে ঋষিরা তাঁহার নাম দিয়াছেন 'হিরণ্যগর্ভ'।

স্থাবর ও জঙ্গম—inorganic ও organic—যত বস্তু আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যেকের বাহিরে একটা স্থূল রূপ আছে, আবার অন্তরে একটা সূক্ষ্ম প্রাণ আছে। আবার এই প্রাণেরও একটা সূক্ষ্মরূপ বা আকার আছে। প্রাণের একটা সূক্ষ্ম রূপ আছে, একথাটা সহজে আমরা বুঝি কি না বুঝি, স্বীকার করি কি না করি,—এই প্রাণ

যে আছে, বাহিরের স্থূল আকার যে সেই প্রাণের আশ্রয়েই ধৃত আছে, তার সমস্ত ক্রিয়া যে সেই প্রাণের শক্তিতেই চলিতেছে, একথাটা সকলেই আমরা বুঝিতে পারি,—স্বীকারও করিতে হয়। জঙ্গম সম্বন্ধে ত কথাই নাই, তবে স্থাবরের মধ্যে প্রাণ বলিয়া কিছুর অস্তিত্ব আমরা সহজে ধরিতে পারি না। কিন্তু প্রত্যেক স্থাবরের মধ্যেই যে কিছু একটা শক্তি আছে, সেই শক্তিই যে সেই স্থাবরকে তার বিশিষ্টরূপে ও প্রকৃতিতে ধরিয়া রাখিয়াছে, তার মধ্যে একটা ক্রিয়াও করিতেছে, ইহা সকলেই আমরা বুঝিতে পারি। তবে স্থাবরকে সাধারণতঃ আমরা প্রাণহীন মনে করিয়া 'জড়' এই নাম দিই, এবং এই শক্তিকেও জড়শক্তি বলি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশ্বব্যাপ্ত একই প্রাণশক্তির অভিব্যক্তির স্তর ভেদে জঙ্গমে ও স্থাবরে এই ভেদ হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান ইহা স্বীকার করিতেছেন,—বলিতেছেন, জড় ও চেতন রূপে দ্বিবিধ শক্তি নাই, জাগতিক সমস্ত স্থূলবস্তুই মূল এক শক্তিরই বিশেষ এক একটা প্রকাশ মাত্র।

সুবিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক Herbert Spencer এই শক্তিকে বলিয়াছেন, "An infinite and eternal energy from which all things proceed."

(Principles of sociology, p. 175.)

অন্যত্র—"The power manifested throughout the universe distinguished as material is the same power which in ourselves wells up in the form of consciosness."

(Principles of Sociology, III, p. 171.)

আবার—"The power which manifests itself in consciousness is but a differently constituted form of the power which manifests itself beyond consciousness. (Principles of Sociology, III, p. 170.)

দার্শনিকের বুদ্ধিতে Herbert Spencer যে তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন, লর্ডকেলভিন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের experimentএর বা পরীক্ষার ফল তাহারই সমর্থন এখন করিতেছে। এই সব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষকদের মধ্যে গৌরবে আমরা আমাদেরই শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের নাম করিতে পারি।

সূক্ষ্ম প্রাণ ও স্থূল দেহ লইয়া স্থাবর ও জঙ্গম—inorganic ও organic—প্রত্যেক বস্তুর পৃথক একটা অস্তিত্ব আছে। ইহাই এক একটি individual unit বা ব্যষ্টি। অনেকগুলি ব্যষ্টি লইয়া এক একটি সমষ্টি বা group হয়। আবার এইরূপ অনেকগুলি সমষ্টি বা group লইয়া বৃহত্তর এক একটি সমষ্টি বা group হয়। ইংরেজিতে এইরূপ ছোট ও বড় সমষ্টিকে species ও genus বলে। বড় সমষ্টি বা genus এর অন্তর্ভুক্ত, ছোট ছোট সমষ্টি বা species গুলিও genus রূপ সমষ্টির unit স্বরূপ, সুতরাং এস্থলে তাহাদিগকেও একরূপ ব্যষ্টি বলা যাইতে পারে। এইরূপ ব্যষ্টির যোগ হইতে সমষ্টি, সমষ্টিরূপ ব্যষ্টি বা species এর যোগে আরও বড় সমষ্টি বা genus, এই সব বড় বড় সমষ্টির সমবায়ে আরও বড় সমষ্টি, ক্রমে এইরূপ যোগের পর যোগে, সমবায়ের পর সমবায়ে বৃহত্তম যে সমষ্টি, তাহাই হইল বিশ্ব, স্থূলভূতরূপে বিরাট্, সূক্ষ্ম প্রাণরূপে হিরণ্যগর্ভ। অণোরণীয়ান্ হইতে মহতোমহীয়ান্ পর্য্যন্ত পর পর এইরূপ ব্যষ্টি ও সমষ্টির সংযোগ রহিয়াছে।

সূক্ষ্মপ্রাণ ও স্থূলভুত—ইহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন দুইটি পৃথক বস্তু নয়। জগৎকারণস্বরূপ মূল সেই একেরই অভিব্যক্তির দুইটি mode, বিধা বা ভাব মাত্র। একভাবে, একবিধায় যিনি হিরণ্যগর্ভ,—অন্যভাবে, অন্য বিধায় তিনিই বিরাট্। আবার এই অভিব্যক্তি হইয়াছে বহুরূপে, বহু ব্যষ্টিতে, বহু সমষ্টিতে, বহু সমষ্টির সমষ্টিতে, সব সমষ্টি লইয়া এক সেই হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটের পূর্ণরূপ প্রাণে ও দেহে। একের যে এই বহুত্বে পরিণতি, তাহাই হইল সৃষ্টি।

এই যে বহু, ইহা একই রকম বহু বস্তুর সমবায় নয়। অশেষ বৈচিত্র ইহার মধ্যে দেখা যায়। আকৃতিতে বৈচিত্র, প্রকৃতিতে বৈচিত্র, ক্রিয়ায় বৈচিত্র—Form, Character, Function—সবেই বৈচিত্র বা variety। বৈচিত্র অর্থই বৈষম্য। মূলে সব এক, সব লইয়া এক, কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বা ব্যষ্টি ভাবে সব এক নহে, অনেক,—সমান নহে, বিষম। এই সব অনেকের, বিষমের, অসংখ্য বিচিত্র ব্যষ্টির, অন্তরে অন্তরে অন্তর্প্রবিষ্ট হইয়া একসূত্রে ইহাদের সবকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, সমষ্টিরূপে ব্যষ্টির সংঘাত বা সংযোগ সাধন করিতেছেন যিনি, সংঘাতের বা সংযোগের কারণ যিনি, সূত্রাত্মা নামে ঋষিরা পরমাত্মার সেই বিশেষ ভাবকে বা কারণস্বরূপকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সূত্রাত্মাই অন্তরে থাকিয়া, অনেকের মধ্যে একত্ব, বৈষম্যের মধ্যে মূল সাম্য, আমাদের অনুভব করাইতেছেন। সহস্র পার্থক্য আছে, সে পার্থক্য দেখিতেছি, বুঝিতেছিও। তবু অনুভব করি, কেহ স্পষ্ট, কেহ অস্পষ্ট বা অর্দ্ধস্পষ্ট, যে ভাবেই হউক, অনুভব সকলেই আমরা করি, কোথায় গূঢ় কোন্ অন্তরে, অন্তরের অন্তরে, অন্তরতম কোন্ দেশে, এক তারে আমরা সব বাঁধা, কেহই কাহারও হইতে একেবারে ছাড়া নই, ছাড়া হইতে পারি না। সেই তারে যখন ঘা পড়ে, মধুর সুরে এই ধ্বনি বাজিয়া উঠে, সব আমি, আমি সব,—সবে আমি, আমাতে সব,—সবার ব্যথা, আমার ব্যথা,—আমার ব্যথাই সবার ব্যথা! এই তারই সূত্রাত্মার তার, এই তারই সেই সূত্রাত্মা। এই সূত্রাত্মাই প্রেমস্বরূপ, প্রেমেই ব্যষ্টিকে ব্যষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, ব্যষ্টির সংঘাতে সমষ্টি হইতেছে, সমষ্টির সংঘাতে বৃহত্তম পরম সমষ্টি হইতেছে,—তাহাই বাহিরে বিশ্বরূপ বিরাট্, অন্তরে বিশ্বপ্রাণ হিরণ্যগর্ভ। তারও অন্তরে বিশ্বপ্রেম সূত্রাত্মারূপে সকলকে বাঁধিয়া রাখিতেছেন। সর্ব্বভূতে প্রবেশ করিয়া সব ব্যাপিয়া আছেন, তাই সেই প্রেমময় মহেশ্বর বিষ্ণু। সকলকে আকর্ষণ করিয়া আপনাতে যুক্ত করিয়া রাখেন, তাই তিনি কৃষ্ণ। বিষ্ণুরূপে ও কৃষ্ণরূপে ভগবানের

পূজায় তাঁহার যোগপীঠ বা আসনের পূজা করিতে হয় এই মন্ত্রে—

"ভববতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্ম-সংযোগ যোগপীঠাত্মনে নমঃ।"

সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বমূর্ত্তি-সংযোগী বলিয়াই তিনি বিভু। সুতরাং সর্ব্বাত্মসংযোগ যোগপীঠের যে আত্মা বা essence, তাহাতেই তিনি আসীন।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীতে ভগবতী বিষ্ণুমায়ার স্তোত্রে এই যে শ্লোক আছে, ইহার তাৎপর্য্যও এই। দয়া প্রেমেরই এক বিধা। কেবল দয়া কেন, সেই স্তোত্রে দেবী বুদ্ধি, ক্ষুধা, নিদ্রা, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি, জাতি, লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, তুষ্টি প্রভৃতি ভাবরূপে, কেবল সর্ব্ব মানবে নয়, সর্ব্ব জীবে নয়, সর্ব্বভূতে সংস্থিতা বলিয়া বর্ণিতা হইয়াছেন।

শেষ শ্লোকে আছে,—

"চিতি রূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

চিতি—অর্থাৎ সকল ভাব যাহা হইতে প্রসূত হইয়াছে, সকল ভাবের জননী মূলাধারা যে শক্তি, সেই রূপেই তিনি নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া আছেন।

ইনিই শ্রুতির সেই সূত্রাত্মা, পুরাণে ব্যাপ্তিরূপিণী বিষ্ণুমায়া বা বৈষ্ণবী শক্তি নামে অভিহিতা হইয়াছেন। তাই স্তোত্র আর স্থলে বলিতেছেন,

"ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তি দেব্যৈ নমোনমঃ॥"

ভগবৎ প্রেমিক মহাপুরুষগণ সর্ব্বভূতে প্রেমময়ী করুণাময়ী মাতার বা প্রেমময় করুণাময় পিতার এই ব্যাপ্তির সন্ধান পাইয়াছেন,

তাই তাঁহারা প্রেমের বন্ধনে সম্বদ্ধ সর্ব্বজীবের, সর্ব্বভূতের ভ্রাতৃত্বের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের এই ধ্বনি সকল তামস আবরণ ভেদ করিয়া আমাদেরও অন্তরের অন্তরে সেই প্রেমের তারে গিয়া আঘাত করে। প্রতিধ্বনি তাহাতে বাজিয়া উঠে, "হাঁ, আমরা সব ভাই ভাই, প্রেমের বন্ধনে প্রাণে প্রাণে একসূত্রে বাঁধা। কেহ কাহারও ছাড়া নাই, ছাড়া হইয়া থাকিতে পারি না।'

কিন্তু প্রেমের সূত্রে বাঁধা, ভাই ভাই বলিয়া সব ভাই সমান হয় না, একবিধ হয় না। সব সমান নয়, একবিধ নয়, বলিয়াই এই প্রেম ছোটর দিকে বড়তে স্নেহরূপে, করুণারূপে, এবং বড়র দিকে ছোটতে ভক্তিরূপে, শ্রদ্ধারূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ভাই ভাইএর সম্বন্ধ প্রেমের সম্বন্ধ, পরস্পর ভক্তিশ্রদ্ধার ও স্নেহকরুণার সম্বন্ধ, সমযোগিতার সম্বন্ধ; পরস্পর প্রতিযোগী স্বতন্ত্র সব সমান সমানের সম্বন্ধ নয়। পূর্ব্ব অধ্যায়েই এই কথার আলোচনা কিছু করিতে চেষ্টা করিয়াছি।—যখনই এই পৃথিবীতে ছোটতে বড়তে ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়াছে, বৈষম্য তার স্বাভাবিক সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে, বড়র দম্ভে ছোট অবমানিত লাঞ্ছিত হইয়াছে, বড়র অন্যায়শক্তিতে ছোট পীড়িত হইয়াছে,—এই অবমাননায়, লাঞ্ছনায়, পীড়নে ধর্ম্মের গ্লানি ঘটিয়াছে, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছে,—তখনই ভগবানের প্রেমাবতার স্বরূপ এই সব মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইয়াছে।

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

এই শ্লোকে গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই সত্যই অর্জ্জুনের নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন।

মূলে সব এক, সমষ্টিতেও এক—অথচ সেই এক হইতে অভিব্যক্ত যে সব ব্যষ্টির সংঘাতে এই সমষ্টি হইয়াছে, তাহা এক নহে, সমান নহে,—অনেক, বিষম। অনেক এবং বিষম হইলেও পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত বা সংহত।

সমগ্র বিশ্বের এক সংহতির কথা এখন ধরিব না। যে সব বস্তু লইয়া এই সংহতি, সেই সব বস্তুর মধ্যে এই সত্যের কথা যথাসাধ্য বুঝিবার চেষ্টা করিব।

সাধারণতঃ organic ও inorganic—জঙ্গম ও স্থাবর—জীবিত ও জড়—এই দুই অবস্থায় সব বস্তু আমরা দেখিতে পাই। Inorganic, স্থাবর বা জড় যাহা—যেমন ধাতু পাথর মাটি জল প্রভৃতি বস্তু—একই বিধ বহু ক্ষুদ্রতর বস্তুর সংযোগে তাহাদের মূর্ত্তি হইয়াছে। খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেও ইহারা যেমন তেমনই থাকে। কেবল আকারে ছোট ও ভাঙ্গা হয়, প্রকৃতির বিশিষ্টতা কিছু ক্ষুণ্ণ হয় না।

ওদিকে যাহা organic—জঙ্গম বা জীবিত—পরিণত অবস্থায় তাহা বিষম বহুবস্তুর সংঘাতে গঠিত। এই সংঘাতের প্রকৃতি আবার এমন যে এই সব বস্তুর একটিকে অন্য হইতে পৃথক করিয়া ফেলিলে, তাহার বিশিষ্ট অস্তিত্ব আর থাকে না। Organic প্রকৃতি তাহার বিনষ্ট হয়, জীবিতের মৃত্যু হয়। যাহাদের লইয়া organism বা সংঘাত-স্বরূপ তার হইয়াছিল, সে সব পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ও বিনষ্ট হইয়া inorganic রূপ প্রাপ্ত হয়।

পরিণত অবস্থায় বলিলাম, কারণ organic অর্থাৎ জঙ্গম বা জীবিত বস্তুর অপরিণত আদিম এক অবস্থা আছে, যখন বহুত্বের বা বহু অঙ্গের বিকাশ তার মধ্যে দেখা যায় না, একাঙ্গ এক homogenous রূপে থাকে।—এইরূপ homogenous organismকে খণ্ড খণ্ড করিলে, প্রত্যেক খণ্ডও সেই homogenous আকারে থাকে—প্রত্যেকে বাড়িয়া সেই মূল আকারের আয়তন ও রূপ গ্রহণ করে। খণ্ড খণ্ড করিতেও সর্ব্বদা হয় না। আপনিই খণ্ড খণ্ড হইয়া সমান বহু বস্তুতে ইহারা পরিণত হয়। কিন্তু inorganic বস্তুকে যে ভাবে খণ্ড খণ্ড করা হয়, সেই ভাবেই থাকে। খণ্ডগুলির আকারের বা আয়তনের কোনও পরিবর্ত্তন হয় না।

ক্ষুদ্র একের মধ্য হইতে ক্রমে বহু অঙ্গের বিকাশ এবং এই বহু

অঙ্গের সংহতিতে ক্ষুদ্র সেই একের যে বৃহত্তর একে পরিণতি, homogeneityর heterogenous আকারে অভিব্যক্তি, ইহাই organic বা জীবিত বস্তুর evolution বা পরিণাম।

"কলাকাষ্ঠাদি রূপেণ পরিণামপ্রদায়িনী।"

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেবীর এক স্তোত্রে এই চরণটি আছে। কলা ও কাষ্ঠা কালের অতি ক্ষুদ্র দুই অংশ। কলাকাষ্ঠাদির মাপে কাল যেমন চলিতেছে, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বভূতের মধ্যে অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে একটা পরিবর্ত্তন হইতেছে। ইহাই ভূতের পরিণাম বা evolution। মহামায়া স্বয়ং কলাকাষ্ঠারূপে ভূতকে তার এই পরিণাম দান করিতেছেন,—তাই তিনি পরিণামপ্রদায়িনী। দুইটি সত্যের সন্ধান এই কথাটির মধ্যে আমরা পাইতেছি। একটি—অবিরত যে evolution এর ক্রিয়া সর্ব্বভূতের মধ্যে চলিতেছে তাহা। আর একটি—এই evolution ঘটাইতেছেন তিনি, যিনি এই বিশ্বজগতের—

"সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতা সনাতনী।"

সামান্য দুই একটি দৃষ্টান্ত হইতে, organic বস্তুর এই evolution কি প্রকারে ঘটে তাহা আমরা বুঝিতে পারিব।

বীজের মধ্যে থাকে অতি ক্ষুদ্র ঔদ্ভিদ কোষ বা vegitable cell। তার মধ্য হইতে অঙ্কুর যখন দেখা দেয়, তাহাতে দুই একটি বিভিন্ন অঙ্গের কিছু আভাস মাত্র পাওয়া যায়। একটু একটু করিয়া তাহাহইতে মূল কাণ্ড ও কয়েকটি পাতা লইয়া গাছের অতি ক্ষুদ্র একটি চারা বাহির হয়। ক্রমে দুই একটি ডালেরও নমুনা দেখা দেয়। শেষে চারাটি যেমন বড় হইতে থাকে, মাটীর নীচে তার শিকড়, শিকড়ের শিকড়, তারও কত শিকড় ভূমি হইতে রস আহরণের জন্য যেন শত সহস্র হস্ত বাড়াইয়া দেয়। কাণ্ডটি মোটা, শক্ত ও বড় হয়,—তাহাহইতে ডাল, ডালের ডাল, তার ডাল, তারও কত ডাল অগণ্য পত্র পল্লব লইয়া যেন তেমনই শত সহস্র হস্ত বাড়াইয়া দেয়, আকাশ ও বাতাস হইতে তাহার আহার্য্য সংগ্রহের জন্য। ক্রমে ফুল

দেখা দেয়, ফুল হইতে ফল হয়। একই সেই মূল বীজ, একই তার সেই কোষ বা cell,—একই সেই মাটী, জল, আলো, বাতাস ও আকাশ হইতে উপাদান ও শক্তি আহৃত হইতেছে, তাহা হইতে মূল কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা ও পত্রপুষ্প ফলে গাছটি পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু ইহাদের সকলেরই আকৃতি আলাদা, প্রকৃতি আলাদা, ক্রিয়া আলাদা; অথচ সকলে মিলিয়া গাছটি হইয়াছে, সকলেই সকলের উপরে নির্ভর করিতেছে, একক বাদ দিয়া অপরের কোনই সার্থকতা থাকে না। কোনওটার সার্থকতা বেশী, শক্তি বেশী, গাছের জীবন রক্ষাকল্পে ক্রিয়া বেশী, এইরূপ মনে হইবে। কিন্তু এই বেশীর কোনও অর্থ নাই। সে একা তার বেশী লইয়া থাকিতে পারে না, কাজও কিছু করিতে পারে না। এই বেশীটাই তার রাখিতে হইলে, বেশীর কাজ করিতে হইলে, ছোটর কম শক্তি, কম ক্রিয়ার উপরে তাকে নির্ভর করিতেই হইবে। নতুবা তার শক্তি ও ক্রিয়া দূরে যাক, অস্তিত্বই থাকে না।

একটি জীবকোষ বা animal cell হইতে ক্রমে এইরূপ বহু অঙ্গে প্রত্যঙ্গে পরিণত পূর্ণ এক একটি জীবদেহ গঠিত হয়। বাহিরে যে সব অঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়, তা'ছাড়া দেহাভ্যন্তরেও বহু অঙ্গ আছে,—সকলেরই আকারে, প্রকারে ও ক্রিয়ায় এক একটা বিশিষ্টতা আছে। সকলেই একই অন্ন হইতে পুষ্টি ও শক্তি সংগ্রহ করিতেছে, সকলেই তার বলে যার যার ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে। অথচ সকলেই সকলের উপরে নির্ভর করিতেছে, সকলেই সকলের ক্রিয়াকে সহায়তা করিতেছে, সকলেরই পরস্পর সাপেক্ষ সম্মিলিত ক্রিয়ায় মোট দেহের জীবনী ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইতেছে। এক একটি অঙ্গ তাহার বহু কোষের সংঘাতে গঠিত, প্রত্যেকটি কোষের নিজের একটা জীবনের ক্রিয়া আছে, আবার সকলে মিলিয়া মোট সেই অঙ্গের ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছে। এক একটি কোষের মধ্যেও নাকি বহু অনুকোষ, তার মধ্যে আরও অনুতর কোষ, এই ভাবে যার যার কাজ করিতেছে। আবার সকলে মিলিয়া তাহাদের সংঘাতে গঠিত বৃহত্তর কোষের ক্রিয়াও নির্ব্বাহ করিতেছে।

কোথায় যে এই অনুস্তের শেষ হইয়াছে. কেহই বলিতে পারেন না, অনুভব করাও যায় না, এক যোগীরা যদি ইহার তত্ত্ব কিছু বুঝিতে পারেন। .

এক একটি কোষ বা cell এক একটি individual unit বা ব্যষ্টি। আবার প্রত্যেক এই unit বা ব্যষ্টি বহু অনুকোষের সমষ্টি। এই সব কোষের সংঘাতে এক একটি যে অঙ্গ, তাহাও এক একটি ব্যষ্টি। আবার এই সব ব্যষ্টির সমষ্টি হইযাছে এক একটি পূর্ণ জীবদেহ। এই সব কোষ অতি সূক্ষ্ম সূত্রাকার একপ্রকার জীবিত বস্তু—protoplasm বা জীবপঙ্ক দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে সংহত হইযা আছে। ইহা সংহতির সূত্র,—সূত্রাত্মাই স্থূল এই রূপে তাঁহার বিশিষ্ট এই দশ্য করিতেছেন।

অনুকোষের সংহতিতে কোষ. কোষের সংহতিতে অঙ্গ, অঙ্গের সংহতিতে পূর্ণদেহ এক একটি পরিণত Organic বা জীবিত বস্তু হইয়াছে। কিন্তু এইখানেই সংহতির শেষ হয় নাই। ইহাদেরও এক একটা স্বাভাবিক সংহতি আছে, তাহাতে জীবসমূহেরও এক একটা সমষ্টি বা group হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও বহু পরীক্ষা ও গবেষণার ফলে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

Organic বস্তুতে বা জীবদেহে মোট দুই রকম কোষের সমষ্টি দেখা যায়। এক রকমে একই বিধ বহু কোষ পরস্পর সংহত হইয়া এক একটি organism বা জীবদেহ গঠিত করে। (উদ্ভিদকেও এখানে এক একটি জীবদেহের অন্তর্গত বলিয়াই ধরিয়া নিতেছি।) ইহা জীবদেহের আদিম একরূপ অপরিণত অবস্থা, আকারে ও প্রকারে ইহা সমভাবাপন্ন বা homogenous। ঔদ্ভিদ ও জৈব—vegitable ও animal—বহু এইরূপ organism এখনও দেখা যায়। আবার অন্য রকমে কোষ হইতে বহু কোষের উদ্ভবে—multiplication of cells হইতে—প্রথমে একটা homogenous organism দেখা দেয়। তারপর তার মধ্যে একটা বিভেদের ক্রিয়া বা process of differen

tiation আরম্ভ হয়। তাহাতে যেমন multiplication of cells চলিতে থাকে, তেমনই এই সব cells বা কোষ বিভিন্ন প্রকৃতি ধরিয়া বিভিন্নপ্রকারের সংঘাতে মূল বস্তুর বিভিন্ন অঙ্গের আকারে আপনাদের প্রকাশ করে। এই সব অঙ্গের আকৃতি, প্রকৃতি ও ক্রিয়া—form, character এবং function—সবই আলাদা আলাদা রকম হয়। এই যে হয়, তার মূল কারণ বা বীজ অবশ্য তার অন্তরে ছিল। নহিলে কোথা হইতে হয় বা হইতে পারে? বীজ থাকিলেই না তাহা হইতে ডালাপালা গজায়, খালি মাটি হইতে ত গজায় না। কোথাও এইরূপ বিচিত্র রূপের অভিব্যক্তি হয়, কোথাও তা হয় না। কোথাও ইহার বীজ আছে, কোথাও নাই। ইহারই বা কারণ কি? ভাবিবার কথা নয় কি?

বৈচিত্র বা heterogeneity এই সব organism বা জীবদেহের প্রধান লক্ষণ। Process of differentiation বা বিভেদ homogenous বস্তুকে heterogenous বস্তুতে পরিণত করে। Differentiation বা বিভেদই হইতেছে, evolution of different organs with different characters and functions, অর্থাৎ গুণকর্ম্মের ভেদে বিভিন্ন অঙ্গের অভিব্যক্তি।

পূর্ণদেহ জীবসমূহের grouping বা সমষ্টির মধ্যেও এইরূপ homogenous ও heterogenous দুই রকম প্রকৃতি দেখা যায়। সাধারণতঃ ইতর জীব এবং অতি নিম্নস্তরের মানবের মধ্যে যে সমষ্টি, তাহা homogenous প্রকৃতি বিশিষ্ট। গুণকর্ম্মের ভেদে সমষ্টিশরীরে বিভিন্ন অঙ্গের ন্যায় বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ দেখা যায় না। কিন্তু উন্নত মানবসমষ্টির মধ্যে গুণকর্ম্মভেদে (character ও functionএর differentiationএ) বিভিন্ন অঙ্গরূপ বিভিন্ন শ্রেণীভেদ দেখা দেয়। ইহাই heterogeneityর লক্ষণ। কিন্তু এই heterogeneityর মাত্রা আবার সব সমষ্টিতে সমান নয়। Homogeneity হইতে ক্রমে heterogeneityর দিকে পরিণতিকেই

'progress of social evolution' বা 'সামাজিক ক্রম-পরিণতি' বলিয়া বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক সমাজ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা ক্রম-পরিণতি; সুতরাং পরিণতিতে উন্নতির বিভিন্ন স্তর বিভিন্ন মানবসমষ্টিতে দেখা যায়। ইঁহাদের মতে এই যে progress of social evolution ঘটিতেছে, তাহা ঘটিতেছে নৈসর্গিক নীতিতে—according to natural laws—যাহার উপরে মানুষের কোনও হাত নাই।

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণকে সমাজ-দেহের প্রধান এই চারিটি অঙ্গ বলিয়া ঋষিরা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রত্যেক অঙ্গের মধ্যে কালের গতিতে স্বাভাবিক অভিব্যক্তির নিয়মে বহু প্রত্যঙ্গ দেখা দেয়, দিতে পারে ও দিয়াছে। কিন্তু মূল অঙ্গ চারিটি বলিয়াই তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা ভগবদুক্তিতে 'ময়া সৃষ্টং'। Natureএর কর্ত্তা তিনি, অথবা Natureই স্বয়ং তিনি। সুতরাং Natural Laws তাঁহারই Laws বা ধর্ম্ম।

এক একটি পূর্ণ মানবদেহের (individual organismএর) সঙ্গে সমষ্টি দেহের বা social organism এর তুলনায় এই সব পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন, যে এক একটি individual man (বা ব্যস্ত মানব) যেন সমষ্টি দেহের এক একটি কোষ বা cell। বহু এইরূপ কোষের সংহতিতে মানবদেহের যেমন এক একটি অঙ্গ হইয়াছে, তেমনই বহু ব্যস্তমানবের সমবায়ে সমষ্টি-দেহের এক একটি শ্রেণী হইয়াছে। এই সব শ্রেণী সমষ্টি-দেহের এক একটি অঙ্গের ন্যায়। বিভিন্ন অঙ্গের সংহতিতে যেমন এক একটি পূর্ণ মানবদেহ হইয়াছে, তেমনই বিভিন্ন শ্রেণী বা বর্ণ রূপ অঙ্গের সমবায়ে এক একটি পূর্ণ মানবসমষ্টি হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র একটা অস্তিত্ব, স্বতন্ত্র এক একটা জীবন ও জীবনের ক্রিয়া আছে। তেমনই আবার তাহাদের জীবন ও জীবনের ক্রিয়া, তাহারা যে অঙ্গকে গড়িয়াছে, তার

জীবন ও জীবনের ক্রিয়ার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বন্ধ।—এই সব অঙ্গের জীবন ও ক্রিয়ারও মোট দেহের জীবন ও জীবনী ক্রিয়ার সঙ্গে তেমনই একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে।

এই সব জৈবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের একটি উক্তি শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব নামক পুস্তকের 'সূত্রাত্মা – ব্যষ্টি ও সমষ্টি' নামক পরিচ্ছেদ হইতে নিম্নে পুনরুদ্ধৃত করিলাম।

"The cells composing an organism are regarded as individual units each with a distinct life and function of its own. * * * Every cell of the colony of cells composing the organism of every animal and plant has thus its special work to perform, the work consisting of in the extraction from its immediate environments of those materials which are necessary for its growth and nutrition. But this work is entirely subservient to and indeed is solely performed for the ultimate nutrition and building up of the whole organism of which each individual cell forms a very small but yet a necessary part."

এক একটি ব্যস্ত জীবদেহে যেমন একটি cell বা কোষ, এক একটি সমস্তদেহে বা Social organismএ তেমনই এক একজন ব্যস্ত মানব বা individual man। মধ্যের একটি স্তর উপরোক্ত উদ্ধৃত অংশে বাদ গিয়াছে,—সেটি হইতেছে পূর্ণদেহের বিভিন্ন অঙ্গের স্তর। প্রত্যেক কোষ যে যে অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত, আগে সে তার ধর্ম্মের অধীন, তারপর সেই অঙ্গ-ধর্ম্মের অধীনতার মধ্য দিয়া সমগ্র দেহের ধর্ম্মের অধীন। এইরূপ বিভিন্ন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ও অঙ্গের ধর্ম্মী হইয়া, অঙ্গের মধ্য দিয়া, পূর্ণাবয়ব দেহকে সে পোষণ করিতেছে, এবং তাহাতেই সমস্তদেহের কোষস্বরূপ ব্যস্তমানবের স্বাভাবিক

একটা বৈষম্য হইয়াছে, নতুবা এক body politic এর অধীন সকলেই সমান হইত।

দেহ বা দেহের অঙ্গে জীবকোষকে সংহত করিয়া রাখিতেছে protoplasm বা জীবপঙ্ক। মানবসমষ্টিকে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতেছে স্থূল এই জীবপঙ্কেরই আধ্যাত্মিক রূপ সূত্রাত্মা— Theosophistরা যাহাকে বলিয়াছেন, the finest thread of spiritual life substance uniting men in the world into one great brotherhood.

মোট কথা, ইঁহাদের মতেও প্রত্যেক মানবসমাজ নৈসর্গিক evolution নীতির অনুবর্ত্তী, কলা কাষ্ঠাদি রূপে পরিণামপ্রদায়িনী মহামায়ার মহাধর্ম্মের অধীন, এক একটি জীবিত শরীরধর্ম্মী বস্তু। আমাদের দেশের ঋষিগণ মানবজীবনের অভিব্যক্তির যে সত্য তাঁহাদের উন্নত বোধির দৃষ্টিতে বা intuitive vision এ দর্শন করিয়াছিলেন, আধুনিক পাশ্চাত্য জৈবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণও তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে সেই সত্যেই উপনীত হইয়াছেন। তবে ইহার মধ্যে বড় পার্থক্য একটি এই যে, আমাদের দেশের ঋষিগণ এই অভিব্যক্তির ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন spiritual homogeneity হইতে material heterogeneityর দিকে, আর পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মতে এই ক্রম material homogeneity হইতে material heterogeneityর দিকে। তবে অধুনা matter ও spiritএর পার্থক্য তাঁহাদের সিদ্ধান্তেও লোপ পাইয়াছে। সব একই force বা শক্তির ক্রিয়া বলিয়া তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যাহা হউক, এই সত্যে ইহাই স্পষ্ট আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, যদিও মূল সেই অদ্বিতীয় এক হইতে সর্ব্বভূতের উদ্ভব ঘটিয়াছে, তবু যে ভাবে ও নিয়মে এই উদ্ভব ঘটিয়াছে, তাহাতে character and functionএর অর্থাৎ গুণকর্ম্মের ভেদে মানবে মানবে একটা স্বাভাবিক বৈষম্যের পরিণতিও ঘটিয়াছে। আবার এই বৈষম্য

সত্ত্বেও অন্তরে এক সূত্রের বন্ধনে এমন একটা সংযোগ আছে, যাহাতে কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া একেবারে পৃথক্ হইয়া পড়িতে পারে না,—পরস্পরের সাপেক্ষ হইয়া পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়া জীবিত এক একটা সমষ্টিদেহ গড়ে, যার বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে গুণ কর্ম্ম অনুসারে তাহাদের স্থান গিয়া পড়ে।

এক একটা বলিলাম, একটা বলিলাম না। এখনও জগতে সমস্ত মানব এক সমষ্টিভুক্ত হয় নাই, বিভিন্ন সমষ্টিতে বিভক্ত। পরিণতির স্বাভাবিক নীতির ক্রিয়ায় ক্রমে এই বিভিন্ন সমষ্টিগুলি বৃহত্তম ও পূর্ণতম একই সমষ্টির বিভিন্ন অঙ্গে পরিণত হইবে কিনা, হইতেছে কিনা, কলাকাষ্ঠাদিরূপে পরিণামপ্রদায়িণী সেই মহামায়াই জানেন।

তবে পাশ্চাত্য জৈবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বিভিন্ন সমষ্টির সম্বন্ধে যে **Natural Selection** ও **Survival of the Fittest** নীতির কথা বলেন, তাহাতে আশার ভরসা বড় পাওয়া যায় না। মানবের সঙ্গে মানবের সম্বন্ধে তাহা স্বীকার করিতেও আমরা পারি না। মানবের ধর্ম্ম সাধারণ ইতর জীবের ধর্ম্মের অনেক উপরে, সে ধর্ম্ম প্রতিযোগিতার ধর্ম্ম নহে, প্রেমের ও সহযোগিতার ধর্ম্ম। সে ধর্ম্মে সবল দুর্ব্বলকে ধ্বংস করে না, আপনার প্রেমের কোলে টানিয়া আনিয়া রক্ষা করে। তবে ইহার মধ্যেও আশার আলোকের কোনও আভাস একেবারেই যে পাওয়া যাইতেছে না, তা নয়। এক সমষ্টি অতি প্রবল হইয়া অন্য সব সমষ্টিকে গ্রাস করিয়া নিবে, রাক্ষসী এই লালসার কথাও শুনা গিয়াছে, যেমন গত যুদ্ধের পূর্ব্বে জর্ম্মাণ 'কল্টুর' বাদের আকাঙ্ক্ষায় প্রকাশ পাইয়াছিল। কোনও এক সম্প্রদায় এক নীতির প্রচণ্ড গদাঘাতে সমাজ-দেহের বিচিত্র অঙ্গ-বিন্যাসকে চূর্ণ করিয়া আপনার এক ছাঁচে সেই ভাঙ্গা সমাজকে নূতন করিয়া গড়িয়া নিবে এরূপ চেষ্টাও হইতেছে, যেমন বোলশেবিক বিপ্লবের চেষ্টা। অতটা সর্ব্বগ্রাসী একাকার না চাহিয়াও, কে কাহাকে কতটা চাপিয়া রাখিয়া পৃথিবীর ভোগ্য অধিকার

করিবে, তার প্রয়াসও বরাবরই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহার মধ্যেও যার যার বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া সকল সমাজ মৈত্রীর সম্বন্ধে পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়া সকলেই যার যার শক্তি মত সকলের সমান স্বার্থ রক্ষা করিবে, সমান মঙ্গলের ভাগী হইবে, এরূপ একটা federation of free nationsএর স্বপ্নও কেহ কেহ দেখিতেছেন। Nationalismএর উপরে European Inter-nationalismএর লক্ষ্যও কতকটা এইরূপ। তবে এইরূপ একটা উন্নত স্তরে মানবপ্রকৃতি কতদিনে উঠিবে জানি না।—এখনও তার লক্ষণ বিশেষ কিছু প্রকাশ পায় নাই। Idealist বা ভাবরসিকের স্বপ্নে মাত্র এই সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।—তবে এইরূপ যুগান্তকর বড় কোনও ঘটনা এই ভাবে আগে idea বা ভাবের আকারেই নাকি মানবের মনে প্রকাশ পায়।

যাহা হউক, এ সব স্বপ্নের কথা এখন থাক্। সৃষ্টির সনাতন নিয়মে বিভিন্ন মানবের ও মানবসমষ্টির প্রকৃতির ও পরস্পর সম্বন্ধের মোট এই যে এ তত্ত্বের বিবৃতি ভারতের প্রাচীন ঋষি ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ করিয়াছেন, তার সঙ্গে ইতিহাসের সাক্ষ্য ও আমাদের ভুয়োদর্শনের ফল মিলাইয়া দেখিলে, মানব সমাজের বাস্তব অবস্থা মোটের উপর এইরূপই আমরা দেখিব। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহারই চেষ্টা করিব।

মানব জীবনের সত্য—

ইতিহাসের সাক্ষ্য।

কবে কি ভাবে এই পৃথিবীতে মানবরূপ জীবের আবির্ভাব হইয়াছিল, অতি বড় পণ্ডিতও কেহ পাণ্ডিত্যমূলক অনুসন্ধানে তাহা বলিতে পারেন নাই। তবে লক্ষ লক্ষ বৎসর নাকি তার পর চলিয়া গিয়াছে। মানব তার আদিম অবস্থায় কেমন ছিল, তার পর যুগের পর যুগে তার জীবনের গতি কোন পথে কি ভাবে চলিয়াছে, এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক অনুসন্ধান, আলোচনা ও কল্পনাও করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের একটা সিদ্ধান্ত এই যে আদিম মানব সভ্যতার সোপানে প্রথম আরোহণ করে, চাষা হইয়া। কথাটা যেন কেমন শুনাইল। তবে 'চাষা' কথাটা ঠিক এখনকার প্রচলিত চাষা কথার অর্থে কেহ নিবেন না। তাঁহারা বলেন, মানুষ প্রথমে একেবারে বুনো ছিল, বনের জন্তু ধরিয়া কাঁচা বা পোড়াইয়া খাইত। পর্ব্বতের গুহায়, গাছের কোটরে কি তলায় থাকিত, জন্তুর চামড়া পরিয়া শীতাতপ হইতে দেহ রক্ষা করিত,—লজ্জানিবারণ করিত, এ কথা বলিতে পারি না; কারণ এরূপ সব বন্যমানুষের এ লজ্জা ছিল, এরূপ মনে করা কঠিন।

ক্রমে তাহারা শান্ত পশু পালিতে শিখিল। পশুর দল নিয়া আজ এখানে কাল ওখানে আস্তানা করিত, কারণ পশুর খাদ্য ঘাস এক অঞ্চলে চিরকাল মিলে না, ঘাস জন্মাইতেও তারা জানিত না: এই অবস্থায় স্থায়ী ঘর বাড়ী করা সম্ভব নয়। থাকিত তারা তাঁবুতে। কিন্তু এই সব তাঁবু ছিল কিসের? তাঁবু সাধারণতঃ হয় মোটা কাপড়ের। কাপড়ের তাঁবু যারা করিতে পারে, তারা যে ঘাস জন্মাইতেও শেখে নাই, এমনটা মনে করা যায় কি? কে জানে হয়ত লতাপাতার ছাউনি করিয়া থাকিত। তাই ছিল তাদের তাঁবু। কিন্তু পরিত কি?

চামড়া কি গাছের পাতা বাকল পরিতে পারে। তবে ইহাদের বিবরণ যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে কোনও একরূপ মোটা কাপড় ইহারা পরিত বলিয়া মনে হয়। কাপাসের না হউক, পালিত পশুর লোম হইতে প্রস্তুত মোটা এক রকম কাপড় কম্বল প্রভৃতি ইহারা ব্যবহার করিত। তাহাও, যেমনই হউক, চরকা তাঁত ছাড়া হয় না। তাই বা তারা কোথায় পাইল? পশুর ঘাস জন্মাইতেও যে তারা শেখে নাই! যাহা হউক, এই ভাবে আরও কত যুগ গেল। ক্রমে তারা পশুখাদ্য ঘাস, সঙ্গে সঙ্গে মানবখাদ্য অন্যান্য ফলশস্যাদিও জন্মাইতে শিখিল। তখন তারা চাষা হইল, গ্রাম পত্তন করিয়া স্থায়ী ঘরবাড়ী করিয়া বসবাস আরম্ভ করিল। এক স্থানে অনেক লোক বসবাস আরম্ভ করিলে মিলমিশেরও একটা বন্দোবস্ত করিয়া নিতে হয়, সুতরাং সমাজেরও সূত্রপাত হইল। সভ্যতার আরম্ভ হইল এই। বসিতে পারিলে শুইবার জায়গা হয়। ক্রমে এই প্রারম্ভ হইতে সভ্যতার আজ এতখানি উন্নতি হইয়াছে যে বিমানেও মানব আজ বেশ আরামে শুইয়া চলা ফেরা করিতে পারে।

তবুও দুই একটা খটকা থাকিয়া যায়। শস্যাদি জন্মাইতে হইলে জমি চষিতে হয়, তার জন্য লাঙ্গল চাই। সুতরাং চাষা হইতে পারিবার আগে তাহাদের লাঙ্গল তৈয়ারী করা শিখিতে হইয়াছিল। ফসল কাটিবার কাস্তেও লাগিত। সুতরাং লোহা দিয়া তারা লাঙ্গল গড়িত, কাস্তে বানাইত। খনি হইতে লোহা তুলিয়া তাই দিয়া লাঙ্গল কাস্তে তৈরী করিতে যারা পারিয়াছিল, তারা যে তখন চাষাও হইতে পারে নাই, কথাটা কেমন যেন লাগে না?

তবে একটা প্রস্তর যুগের কথা ইঁহারা বলিয়া থাকেন, যখন লোকে ধাতুর ব্যবহার শেখে নাই, পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করিত। পাথরের অস্ত্রে জীবজন্তু মারিয়া খাওয়া চলিতে পারে। কিন্তু চাষবাসের কাজ চলে কি? পাথরের লাঙ্গল কাস্তে তৈরী করিতে পারাও ত বড় সহজ কথা নয়। পাথরকে অতখানি ধারালো করিয়া তোলা সম্ভব হইলেও, কম যোগ্যতা ত ইহাতে লাগে না।

কেহ বলিতে পারেন, প্রথমে তারা কাঁচা মাটীতে বীজ ছড়াইত,—শস্য পাকিয়া উঠিলে গাছ হইতে হাতে ছাড়াইয়া নিত। শেষে অনেক পরে লাঙ্গল কাস্তে তৈয়ারী করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু পাকা চাষী হইবার অনেক আগে যে লাঙ্গল কাস্তে চাই। লতাপাতার তাঁবু গড়িতে কি ঘর বাঁধিতেও অস্ত্র কিছু লাগে। খটকা একেবারে যায় না।

কিন্তু খটকা আমাদের মন হইতে একেবারে দূর হউক কি না হউক, মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা সম্বন্ধে এই ধারণাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের চিত্তে দৃঢ়মূল হইয়াছে। এই মতকেই তাঁহারা একরূপ প্রমাণসিদ্ধ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাই যখন তাঁহারা ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হইলেন, ভারতের বেদ অধ্যয়ন করিলেন, এবং নানারূপ হিসাব গনণা করিয়া বুঝিলেন, ইহাই অর্থাৎ বেদের মন্ত্রসংহিতাই মানবজাতির প্রাচীনতম সাহিত্য, তখনই এক বাক্যে সকলে বলিলেন, বৈদিক মন্ত্র সব চাষার গান। কারণ অতি প্রাচীন সেই যুগে ভারতীয় আর্য্যজাতি মানবসভ্যতার আদিম অর্থাৎ চাষের স্তরেই মাত্র উঠিয়াছিলেন। তার উপরে কি প্রকারে উঠিবেন? অত প্রাচীন যুগে কেহ কি তাহা পারে?

কিন্তু সভ্যতার মাত্র সেই আদিম চাষের স্তরে অবস্থিত হইলেও তাঁহারা যে স্বভাবতঃই অতি উন্নতচেতা মানব ছিলেন, এ কথাটা স্বীকার করিতে তাঁহারা বাধ্য হইলেন। কারণ তাঁহাদের মুখে উচ্চারিত বা গীত এই সব মন্ত্র জগতের সাহিত্যে এখনও অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও মহিমা, প্রাকৃতিক ব্যাপার সমূহের আশ্চর্য্য বিকাশ, আশ্চর্য্য শক্তি, মানবকে কত আনন্দ তারা দান করে, মানবের কত হিত কত অহিতও সংঘটন করিতে পারে, এই সব দেখিয়া তাহার সরল চিত্ত যে ভাবে অভিভূত হয়, যে সব উচ্ছ্বাস তাহার প্রাণ ভরিয়া উঠে, যে সব আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, বৈদিক মন্ত্রসমূহে অতি সুন্দর চিত্তগ্রাহীরূপে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। এই সব মন্ত্র আবার উপাস্য দেবগণের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত স্তোত্র। দেবগণ ও ভূতপ্রেত

দান, দৈত্য প্রভৃতি তামস শক্তির অধিকারী অতিলৌকিক জীব নয়, কেবল অচেতন গাছ পাথরও নয়,—প্রকৃতির সুন্দর, মঙ্গলকর ও মহিমাময় শক্তি সমূহ। কেবল শক্তিও নয়, ইহাদের অন্তরে যে চেতন পুরুষ, তাঁহাদিগকেই বৈদিক 'চাষারা' দেবতা জ্ঞানে স্তব করিয়াছেন।

সেই সব স্তোত্রসমূহের মধ্যেই আবার এমন অনেক কথা আছে, যাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, এই স্তুত দেবগণ পৃথক পৃথক নন, মূলে সকলেই এক, একেরই বিভিন্ন বিভূতি বিভিন্ন নামে বর্ণিত ও স্তুত হইয়াছেন। "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।" ইঁহাদের মতে একেবারে আদিম যে ঋগ্‌বেদ তাহাতেই এই কথাটি আছে। তখন তাঁহারা বলিলেন, মন্ত্রসমূহ এক গ্রন্থে সংহিত হইলেও বিভিন্ন যুগের রচিত। প্রাকৃতিক শক্তি সমূহকে বৈদিক যুগের আদিম চাষীরা প্রথমে বিভিন্ন দেবতা বলিয়া স্তবস্তুতি করিত,—পরবর্ত্তী স্তোত্রকারগণ ক্রমে বুঝিতে পারিয়াছেন, এই প্রাকৃতিক দেবতারা মূল এক বিশ্বশক্তির বা বিশ্বদেবতারই বিচিত্র সৃষ্টিব্যাপারে বিচিত্র বিকাশ মাত্র! তাই তাঁহারা বলেন—

"The religion of the Rigveda travels from Nature up Nature's God. The worshipper appreciates the glorious phenomena of nature and rises from these phenomena to grasp the mysteries of creation and its Great Creator. *

অর্থাৎ প্রথমে ভারতীয় আর্য্যেরা প্রাকৃতিক শক্তি সমূহের মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের দেবতা মনে করিয়াছেন, ক্রমে তাহাহইতে পরে বুঝিয়াছেন, বিশ্বসৃষ্টির ও তাহার সেই এক মহান্ স্রষ্টার তত্ত্ব-রহস্য কি।

* Civilisation in Ancient India—R. C. Dutt, Book I, Chap. vi, p. 97.

কিন্তু পরে বুঝিলেও সে আর কত পরে? মন্ত্রসমূহের সংহিতা যখন হয়, তার অবশ্য অনেক আগে। সে যুগ ভগবান্ কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের যুগ। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের মতেও সে যুগের কাল অন্ততঃ খৃষ্ট জন্মের তেরচৌদ্দ শত বৎসর পূর্ব্বে। সংহিতায় সব মন্ত্রই প্রাচীন ঋষিদের দৃষ্ট * বলিয়া উল্লেখ আছে। ভগবান্ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের যুগেও বৈদিক মন্ত্রসমূহ গুরুশিষ্যপরম্পরাক্রমে প্রাচীন কাল হইতে আগত বলিয়া পণ্ডিতবর্গ মনে করিতেন।

একথা কেহই বলেন না যে সমস্ত বৈদিক মন্ত্র একদিনে বা একই সময়ে ঋষিদের মুখে উচ্চারিত হইয়াছিল। তবে মোটের উপর এই ঋষি-কুল একই বিদ্যার অধিকারী, একই চিন্তাপথের পথিক, একই ভাবের ভাবুক, একই তত্ত্বের দর্শক ও প্রচারক, এক ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত মোটের উপর একই যুগে আবির্ভূত মহাপুরুষ। মন্ত্রসমূহের মধ্যেও একই বিধ আধ্যাত্মিক প্রেরণার পরিচয় পাওয়া যায়, একই তত্ত্বের আভাস সর্ব্বত্র রহিয়াছে। একই প্রকৃতির একটা নিবিড় সংযোগ—organic affinity—সকলের মধ্যে আছে। নানা যুগের নানা ভাবের নানা মতের জোড়াতালি দেওয়া বস্তু বৈদিক মন্ত্র সংহিতা সমূহ নয়।

সুতরাং আদিম চাষা হইলেও, সকলেই ইঁহারা মোটের উপর সমান আদিম চাষা। **Nature** হইতে **Nature** এর **God** পর্য্যন্ত পৌঁছিতে যত খানি সিঁড়ি বাহিয়া ধাপে ধাপে ও স্তরে স্তরে গিয়া উঠিতে হয়, তার কোনও পরিচয়, কোনও প্রমাণ ইহার মধ্যে পাওয়া যায় না। তপোবনবাসী ঋষিকুলের জীবনের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তার মধ্যেও যাহাকে 'সভ্যতার ক্রমাভিব্যক্তি' বলে, তার কোনও লক্ষণ বড় দেখা যায় না। সত্য ত্রেতা কি দ্বাপর যে যুগেরই তপোবনের চিত্র পাওয়া যায়,

* বৈদিক মন্ত্রসমূহকে ভারতীয় আচার্য্যগণ ঋষিদের রচিত বলেন না, 'দৃষ্ট' বলেন। ভগবদ্ ভাবে অনুপ্রাণিত ঋষির চিত্তে যখন কোনও সত্য ফুটিয়া উঠে, বাস্তব পদার্থের ন্যায় তিনি তাহা অন্তর্দৃষ্টিতে দর্শন করেন। সেই দৃষ্ট সত্যই তাঁহাদের মুখে ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে।

সেই একই চিত্র। তপোবনের ঋষিরা আদিম চাষাসমাজের স্তরেও উঠেন নাই,—তারও নীচে আছেন। বনের আহৃত ফলমূল ও বনে পালিত গাভীর দুগ্ধ তাঁহারা খান, বনে সংগৃহীত তৃণেপর্ণে নির্ম্মিত কুটীরে বাস করেন, সেই কুটীরে ভূতলেই কুশশয্যায় শয়ন করেন, উপবেশন করেন কুশাস্তরণে, আর পরেন বনতরুর বাকল। আদিম এই বর্ব্বরতার মধ্যেও

'একমেবাদ্বিতীয়ম্'।
'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।'
'একোঽহং বহু স্যাম্।'
'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ
সভূমিংবিশ্বতোবৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।'
'ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণাৎ হি পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥'

এই যে সব বাণী তাঁহাদের মুখে উচ্চারিত হইয়াছিল, তার অপেক্ষা উচ্চতর কোন সত্য কি তত্ত্ব আর কোথাও এপর্য্যন্ত কেহ বলিতে পারিয়াছেন, এরূপ জানিনা।

এই সব ঋষিদের মুখে উচ্চারিত এই সব বাণী জনসমাজ শুনিয়াছিল, তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের পথে তাহাদের জীবন পরিচালিত হইত। যে সমাজ তাহা পারে, সে সমাজও হীন বর্ব্বর সমাজ হইতে পারে না। হীন শিষ্যসমাজে উন্নত গুরুর আবির্ভাব হয় না। উচ্চধর্ম্ম, উচ্চনীতি, উচ্চজ্ঞান উপযুক্ত উচ্চক্ষেত্র ব্যতীত তার ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে না। সমাজের জনগণ উন্নত সংস্কারের অধিকারী হইয়া না জন্মিলে, উন্নত বিদ্যা গ্রহণ করিতে পারে না। শিষ্য গুরুর প্রমাণ, গুরু শিষ্যের প্রমাণ। কোন দেহকে পরিপুষ্ট ও শক্তিতে উন্নত বলিলে, সর্ব্বাঙ্গেই পরিপুষ্ট এবং পরস্পর সমঞ্জস সর্ব্বাঙ্গের শক্তিতেই উন্নত বুঝায়। কেবল মাথা, কেবল হাত পা কি বুক পেট অতিপুষ্ট ও অতি শক্তিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, তাহা দেহের স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়, ব্যাধির বা অপূর্ণতার

লক্ষণ। আবার দেহে দীনক্ষীণ ও অপুষ্ট, মনে উন্নত,—অথবা মনে দীন, অস্ফুট, কিন্তু দেহে মহাবীর,—ইহাও সুস্থ উন্নত জীবনের লক্ষণ নহে। উন্নত ও শক্তিমান্ মানবসমাজ বলিলে, সর্ব্বাঙ্গে পরিপুষ্ট, মনের ও দেহের শক্তির বিকাশে সমঞ্জস, একদিকে জ্ঞানে বিদ্যায় ও ধর্ম্মে, অন্যদিকে পার্থিব শক্তির প্রতিষ্ঠায়, উন্নত সমাজই বুঝিতে হইবে। যেখানে তাহা না হয়, এই ত্রুটি, এই সামঞ্জস্যের অভাব, যেখানে যত বেশী দেখা যায়, মঙ্গলের পথে সমাজের স্বচ্ছন্দগতি সেখানে তত ব্যাহত হয়।

জ্ঞানে, বিদ্যায়, ধর্ম্মে ও চরিত্রের আদর্শে প্রাচীন হিন্দুসমাজের উৎকর্ষ কেহই আজকাল বড় অস্বীকার করেন না। কিন্তু পার্থিব প্রতিষ্ঠায় তাহাদের শক্তি যে বিশেষ প্রকাশ পাইয়াছিল, এ কথা অনেকেই মনে করেন না।—প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার উচ্চ গৌরব দেখাইবার জন্য আমাদের দেশেও অনেকে বলিয়া থাকেন, হিন্দুসভ্যতা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষাত্মক (spiritualistic) সভ্যতা, আর পাশ্চাত্য সভ্যতা ভৌতিক উৎকর্ষাত্মক (materialistic) সভ্যতা। কিন্তু ঠিক যেভাবে বলা হয়, কথাটা ঠিক সেভাবে সত্য নয়। প্রাচীন হিন্দু কেবল এক দল ঋষির, কুটীরবাসী কৌপীনধারী বৈরাগীর জাতি ছিলেন না। যেমন ব্রহ্মবিদ্যায় সমুন্নত বিষয়বিরাগী ঋষি, তেমনই মহাতেজস্বী ও ঐশ্বর্য্যবান্ ক্ষত্রিয় রাজার দৃষ্টান্ত প্রাচীন সাহিত্যে বহু পাওয়া যায়। আবার ব্রহ্মবিদ্যায় উন্নত ক্ষত্রিয় রাজা, ক্ষত্রিয় তেজে দৃপ্ত ব্রাহ্মণ, এরূপ দৃষ্টান্তও আছে। জনক, প্রবহণজৈবলি, চিত্রগার্গ্যায়ণি, অজাতশত্রু *এইরূপ ক্ষত্রিয়ের, এবং অগস্ত্য, বিশ্বামিত্র,* পরশুরাম এইরূপ ব্রাহ্মণের দৃষ্টান্ত। পরে ব্রহ্মণ্য ও ক্ষাত্র ধর্ম্মের সম্মিলিত আদর্শের পূর্ণতা দেখিতে পাওয়া যায় রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের জীবনে।

তারপর, ঋষিরা তপোবনে যখন ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনায় এবং যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মে ব্রহ্মবিভূতির উপাসনা করিতেছিলেন, তখন অন্যদিকে ভারত ব্যাপিয়া আর্য্য অধিকার ও আর্য্য রাজ্য বিস্তৃত

হইতেছিল, রাজ্যে রাজ্যে বহুনগরের প্রতিষ্ঠা হইতেছিল। রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে দক্ষিণদেশে আর্য্য অধিকার বিস্তারের সূচনার স্পষ্ট আভাস একটা পাওয়া যায়। রামচন্দ্র ভরদ্বাজের আশ্রম ত্যাগ করিয়া দক্ষিণদেশাভিমুখে গমন করেন। দণ্ডকারণ্য পর্য্যন্ত কোনও আর্য্য রাজ্য কি আর্য্যনগর তাঁহার পথে পড়ে নাই। মধ্যে মধ্যে মুনির আশ্রম মাত্র তিনি দেখিয়াছেন। এই সব আশ্রমের চতুঃপার্শ্বস্থ অঞ্চল দুর্দ্দান্ত রাক্ষসদের দ্বারা উপদ্রুত। দণ্ডকারণ্যে রাক্ষসের উপদ্রব আরও বেশী। মুনিরা এই উপদ্রব নিবারণের জন্য রামচন্দ্রের সহায়তা প্রার্থনা করেন। মহর্ষি অগস্ত্য বহু অস্ত্র তাঁহাকে দান করেন। তাহার সাহায্যে রামচন্দ্র রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। মুনিদের সঙ্গে পূর্ব্বেও রাক্ষসদের যুদ্ধ অনেক হইয়াছে, তখনও হইত। রাক্ষসদের সঙ্গে যুঝিয়াই মুনিরা তাঁহাদের বিভিন্ন আশ্রমে বাস করিতেন। এই বিবরণ পড়িলে, এই সব মুনিদের আশ্রমগুলিকে আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে দুর্দ্দান্ত নরমাংসভোজী বর্ব্বর জাতিসমূহের মধ্যে আধুনিক যুগের খৃষ্টীয় মিশনারীদের আড্ডার কথা মনে পড়ে। এই সব মুনিরা উত্তরভারতে ব্রহ্মর্ষি দেশের ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ, শমদমাদি গুণের অধিকারী, যতি ব্রতী যাজ্ঞিক ঋষিদের ন্যায় কেবল পরমার্থচিন্তায় ও তার সাধনায় জীবনযাপন করিতেন না। দক্ষিণের অনার্য্যভূমিতে আর্য্য অধিকার ও আর্য্য সভ্যতা বিস্তারই ইঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। নতুবা আর্য্যাবর্ত্তেও আশ্রমের স্থান তখন যথেষ্ট ছিল। তাহা ছাড়িয়া রাক্ষসসঙ্কুল দক্ষিণদেশে কেন তাঁহারা যাইবেন? আর্য্যাবর্ত্তের ঋষিদেরই রাক্ষসের উৎপীড়ন হইতে আশ্রমরক্ষার্থে মধ্যে মধ্যে রাজাদের শরণাপন্ন হইতে হইত, যেমন বিশ্বামিত্র তাড়কাবধের জন্য দশরথের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। এ অবস্থায় সমস্ত আর্য্য রাজ্য হইতে অতদূরে একেবারে রাক্ষসভূমির মধ্যে অগস্ত্যপ্রমুখ এই মুনিরা গিয়া আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন কেন? রামায়ণে ইঁহাদের মুখে উচ্চাঙ্গ কোনও বিদ্যার তত্ত্বও বিবৃত হয় নাই। রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধের

কথা, তার আয়োজনের কথা ও অস্ত্রসংগ্রহের কথাই শোনা যায়।

মোট কথা, কোনও জাতিকে উন্নত বলিলে কেবল আধ্যাত্মিকতায়, কেবল বুদ্ধির প্রতিভায় ও জ্ঞানের অধিকারে, অথবা কেবল ভৌতিক বা পার্থিব শক্তিতেই, অর্থাৎ কেবল spiritual কি কেবল intellectual কি কেবল material উৎকর্ষেই, উন্নত বুঝায় না। একেবারে সমান ও সমঞ্জস না হইলেও, সবদিকেই মানব স্বভাবের শক্তি বিকাশের একটা পরিচয় উন্নত সব জাতির মধ্যে পাওয়া যাইবে।

নিজেদের বলিয়াই নিজেদের কথা একটু বেশী করিয়া বলিলাম,—কিন্তু প্রাচীন—অতি প্রাচীন বহুজাতি এমন ছিলেন, প্রথম ইতিহাসের ক্ষীণ আলোক যখনই তাঁহাদের উপরে পড়িয়াছে, তখনই দেখা গিয়াছে জীবনের নানা দিকে অতি উন্নত সভ্যতার অধিকারী তাঁহারা। যে সব বড় বড় ধর্ম্ম বা religion মানব সমাজের উপরে আজও প্রভুত্ব করিতেছে, এখনও এই rationalistic ও critical যুগে বহু-ধীমান্ মানব ভক্তিতে যাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া পরমশান্তিতে ও পরম তৃপ্তিতে জীবন কৃতকৃতার্থ হইল বলিয়া মনে করিতেছেন, সেই সব ধর্ম্ম প্রাচীন জাতি সমূহের মধ্যেই আবির্ভূত হইয়াছে। অনেক ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষের আবির্ভাব কাল এত প্রাচীন যে ইতিহাসের গণনা সে পর্য্যন্ত এখনও পৌছিতে পারে নাই। এই বিশ্বের তত্ত্ব ও মানব জীবনের তত্ত্ব সম্বন্ধে নানা দেশের নানা জাতির প্রাচীন দার্শনিকগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা বড় কিছু, নূতন কিছু আধুনিক দর্শন বলিতে পারিয়াছেন এরূপ জানি না। প্রাচীনের Intellect বা বুদ্ধির প্রতিভাকেও নবীন এখনও সব দিকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই। আধুনিক ইয়োরোপীয় জাতি সমূহের তুলনায় প্রাচীন গ্রীক জাতির মানসিক উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব (intellectual superiority) একবাক্যে সকল পণ্ডিতই স্বীকার করেন। অনেকে, যাহারা এই সব জাতির প্রাচীন সভ্যতার বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, প্রাচীন

হিন্দু মৈসর প্রভৃতি জাতিরও এই উৎকর্ষের গরিষ্ঠা স্বীকার করিয়াছেন।

অনেক বিষয়ে আবার প্রাচীন জাতিসমূহ যে ভিত্তির পত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহারই উপরে আধুনিক জাতিরা তাঁহাদের জ্ঞানবিজ্ঞানের বিচিত্র ইমারৎ তুলিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীন হিন্দুর ভাষাবিজ্ঞান ও গণিত বিজ্ঞানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইয়োরোপীয় ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণ অন্ধকারে পথ হাতড়াইতেছিলেন। হিন্দু ব্যকরণ ও নিরুক্ত আবিষ্কারের পর এই অন্ধকারে নূতন যে আলোক তাঁহারা পাইলেন, তাহার দৃষ্টিতেই ভাষাবিজ্ঞানের দুরূহ জটিল নীতিসমূহ তাঁহারা উদ্ধার করিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুপণ্ডিতগণ শূন্যের আবিষ্কার করিয়া দশমিক গণনাপদ্ধতির প্রবর্ত্তন করেন। পাশ্চাত্য গণিতবিজ্ঞান খুবই উন্নত; কিন্তু এই উন্নতির ভিত্তি পড়িয়াছিল, একেবারে কাঁচা মাটিতে, এই শূন্যের আবিষ্কারে এবং শূন্যের যোগে ও গুণনে দশমিক গণনায়। ইহা অবশ্য এই দুই বিদ্যার প্রথম স্তর। কিন্তু এই প্রথম স্তরের পত্তনই উপরের অন্যান্য স্তরের রচনাকে সম্ভব করিয়াছে। এই প্রথম স্তরের উদ্ভাবক যাঁহারা, বুদ্ধির উৎকর্ষে পরবর্ত্তী পণ্ডিতদের অপেক্ষা তাঁহারা বড় বই ছোট নন।

মৈশর, আসীরীয়, বাবীলনীয়, চীন, প্রাচীন আমেরিক প্রভৃতি বহু জাতির মধ্যে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও দীর্ঘকাল স্থায়ী সুশাসিত রাজ্য সাম্রাজ্য ছিল, স্পষ্ট এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাদের অতি উচ্চাঙ্গ স্থাপত্য ও ভাস্কর প্রভৃতি বিদ্যার নিদর্শন এখনও এই পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছে। এসিয়ায়, আমেরিকায়, এমন কি অতি বর্ব্বর মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকায়ও বহু বৃহৎ অতি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ বাহির হইয়াছে ও হইতেছে। অতি বিচিত্র স্থাপত্য ও ভাস্কর বিদ্যার যে সব পরিচয় এই সব অবশেষের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া আবিষ্কারকগণ একেবারে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া গিয়াছেন ও যাইতেছেন। এই সব পাওয়া গিয়াছে ও যাইতেছে, আরও যে

কত বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কে তার ইয়ত্তা করিতে পারে ?

তবে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। অতি প্রাচীনকালে এই সব জাতি অতি উন্নত সভ্যতা লাভ করিয়াছিলেন সত্য ; কিন্তু এই উন্নতির স্তরে তাঁহারা যে আদিম সেই বন্য অবস্থা হইতে ক্রমবিকাশের ধারায় স্তরের পর স্তর পার হইয়া উঠেন নাই, কে বলিতে পারে ? কেহই অবশ্য হলপ করিয়া এমন কথা বলিতে পারে না। কিন্তু আদিম অবস্থার বন্য ও শিকারী, তারপর যাযাবর পশুপালক, তারপর গ্রামবাসী, তারপর নগরবাসী, ঠিক এইরূপ স্তরের পর স্তরেই যে সকল জাতি সভ্য হইয়া উঠিয়াছেন, সভ্য জাতিদের ইতিহাসে এমন কোনও অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় কি ? প্রাচীন উন্নত জাতিসমূহ এতখানি সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়াছেন, এমন কিছু সাক্ষাৎ প্রমাণ নাই। তবে সে সব নাকি অতি পুরাতন কালের কথা ; প্রমাণ নাও থাকিতে পারে। কিন্তু আধুনিক উন্নত জাতিসমূহের আদিম অবস্থার ইতিহাস যাহা পাওয়া যায়—যেমন ইয়োরোপীয় কেল্ট, টিউটন প্রভৃতি জাতির ইতিহাস—তাহাতে দেখা যায়, তাঁহারা তখন ভূস্বামী ও গৃহস্থ, সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করেন। কাব্য ও পৌরাণিক সাহিত্যও একটা তাঁহাদের আছে। ধর্ম্মের পরিচয় যাহা পাওয়া যায়, তাহাও হীন ভূতপ্রেত পূজার ধর্ম্ম নহে,—আর্য্য-জাতির সাধারণ ধর্ম্ম, প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে দেবতাবোধে পূজার ধর্ম্ম। এই সব শক্তির—deified natural powersএর—অন্তরে এক বিশ্বদেবতার অস্তিত্বের আভাসও যে ইঁহাদের ধর্ম্মের কথায় না পাওয়া যায় তা নয়। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে এই সব জাতি কখনও বন্য ছিলেন, যাযাবর পশুপালক ছিলেন, এরূপ কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না।

মানবসভ্যতার ইতিহাস যখন হইতে পাওয়া যায়, তারপর সহস্র সহস্র বৎসর চলিয়া গিয়াছে। প্রাচীন কত সভ্য উন্নত জাতির লোপ হইয়াছে, নূতন নূতন কত উন্নত সভ্য জাতির অভ্যুত্থান হইতেছে।

কোনও কোনও জাতির মধ্যে সভ্যতার অক্ষুণ্ণ ধারা অতি প্রাচীনকাল হইতে আজও পর্য্যন্ত চলিতেছে। দেশে দেশে অধুনা সভ্যজাতিসমূহের বহু বিস্তৃতিও ঘটিয়াছে। কিন্তু আদিম সেই বন্য মানব, যাবাবর পশুপালক, সভ্যতার প্রথমস্তরের আদিম চাষী, তার কিছু উপরের ও নিম্নের আরও বহু রকম স্তরের মানব ও মানবসমাজ এখনও এ পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছে। পর পর ক্রমে উন্নত এই সব বিভিন্ন স্তরের মানবের অস্তিত্ব দেখিয়াই, বোধ হয়, সমাজতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণ এইরূপ অনুমান করিয়াছেন, সকল সভ্যজাতিই আদিতে বুনো ছিল, সভ্যতার ক্রমাভিব্যক্তির নিয়মে স্তরের পর স্তরের পার হইয়া তাহারা উন্নত সভ্যতার অবস্থায় আরোহণ করিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে কোনও কোনও জাতিই বা উন্নত হইয়াছে কেন, আবার কোন কোনও জাতি এখনও সেই আদিম বন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে কেন? এই যেমন আফ্রিকার, অষ্ট্রেলোসিয়ার ও মালয় দ্বীপপপুঞ্জের আদিম বর্ব্বর জাতি সমূহ। কত হাজার হাজার বৎসর যাবৎ কত কত বড় জাতি কত উন্নত বিদ্যার, উন্নত শক্তির পরিচয় দিলেন। কত উন্নত জ্ঞান, উন্নত ধর্ম্ম, জগতে প্রচারিত হইল। ইহাদেরই মধ্যে উন্নত ইয়োরোপীয় জাতিসমূহ তাঁহাদের উন্নত সভ্যতা লইয়া বাস করিতেছেন, অবিরত তাঁহাদের সুসভ্য উন্নত জীবনের রীতি নীতি চক্ষে ইহারা দেখিতেছে, কিন্তু তবু তারা সেই আদিকাল হইতে এখনও যে তিমিরে সেই তিমিরে! ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা বরং ইহাই বলেন, সভ্যতার সংস্পর্শ ইহাদের সয় না, তাই ক্রমে অনেকেই ইহারা লোপ পাইতেছে। অধিক দূর যাইতে হইবে কেন? বহু সহস্র বৎসর যাবৎ হিন্দুসভ্যতার প্রতিষ্ঠা-সত্বেও বহু আদিম বন্য ও বর্ব্বর জাতি এই ভারতেই বর্ত্তমান আছে। কেবল পাহাড়জঙ্গলের বুনো জাতিরা নয়, হিন্দুসমাজের মধ্যেও নিম্নস্তরে এমন অনেক জাতি আছে, যাহারা উচ্চতর জাতিসমূহের সমান হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। উচ্চতর জাতিরা ইহাদের চাপিয়া

রাখিয়াছেন, তাই উঠিতে পারিতেছে না, একথা ঠিক নয়। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলে সকলেই ইহা বুঝিতে পারিবেন। ইহার প্রধান কারণ ইহাদের মধ্যে বিশেষ উন্নতিলাভের উপযোগী স্বাভাবিক সংস্কারের অভাব। এরূপ সংস্কার যাহাদের মধ্যে আছে, তাহাদের একেবারে চাপিয়া কেহ রাখিতে পারে না। আর প্রকৃত পক্ষে উন্নত হিন্দুর চাপ এমন শক্ত চাপও নয়। পরে ইহার প্রমাণ দেখাইব।

সভ্যজাতির সংস্পর্শে আসিয়া কোনও কোনও অসভ্য জাতি উন্নতিলাভ করিয়াছে।—যারা করিয়াছে, উন্নতির স্বাভাবিক সংস্কার তাহাদের মধ্যে ছিল। কোনও কারণে সে সব বিকাশ পাইতে পারে নাই,—উন্নত জাতির সভ্যতার প্রভাব সে কারণ দূর করিয়াছে, অবস্থার এমন পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে, যাহাতে সেই সব চাপা সংস্কার ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছে।

মোট কথা, অতি প্রাচীন কাল হইতে এ পর্য্যন্ত অতি উন্নত ও সভ্য, আবার অতি বন্য ও বর্ব্বর, এবং এই দুই রকমের মধ্যবর্ত্তী উন্নতির ও সভ্যতার বহু স্তরের মানব সমাজ এই পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছে। কেহ আরও উন্নত হইতেছে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে কাহারও উন্নত অবস্থার ধরণ পরিবর্ত্তিত হইতেছে,—কেহ কেহ বর্ব্বর অবস্থা হইতে ক্রমে উন্নতিলাভ করিয়াছে, কেহ বা ক্রমে অবনত হইয়াও পড়িয়াছে। কেহ এই অবনতি হেতু আপন স্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট বজায় রাখিতে না পারিয়া নবাগত বা নবাভ্যুত্থিত অধিকতর শক্তিমান্ ও উন্নত জাতির মধ্যে মিলিয়া গিয়াছে,—কেহ বা আপনার সংহতি রাখিতে না পারিয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া বিভিন্ন জাতির জনতাকে পুষ্ট করিয়াছে।

Anthropologist বা মানবজীবন-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ আর্য্য, সেমিটিক, তুরাণ, মোগল, আদিম আমেরিক, নিগ্রো, মালয় প্রভৃতি মানবজাতির বহু বিভিন্ন শাখার বিবরণ দিয়াছেন। আকৃতিতে ও

প্রকৃতিতে, বুদ্ধিতে ও শক্তিতে, ধর্ম্মে ও চরিত্রে, বড় কতকগুলি বৈষম্য এই শাখাভেদের লক্ষণ। কোনও কোনও শাখা—যেমন আর্য্য ও সেমিটিক—প্রাচীন কাল হইতেই উন্নত, পৃথিবীর উপরে চিরদিনই প্রাধান্য করিতেছে।—কোনও কোনও শাখার লোকসমূহ কতক উন্নত, কতক অনুন্নত।—কোনও শাখা একেবারেই অনুন্নত, আদিম বর্ব্বরতার উপরে উঠিতে পারে নাই, পারিবে এরূপ লক্ষণও কিছু দেখা যায় না। আবার উন্নত সমাজসমূহের মধ্যেও বিভিন্ন সমাজ বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন আকারে তাহাদের শক্তি বিকাশ করিয়াছে, উন্নতিলাভ করিয়াছে।

যেমন types of race আলাদা আলাদা, তেমনই তেমন types of civilisationও আলাদা আলাদা। কেবল type বা প্রকৃতিই পৃথক পৃথক নয়,—উন্নতির স্তরেও বহু জাতির মধ্যে বহু বৈষম্য দেখা যায়।

মোটের উপর ক্রমিক একটা বাঁধা ধারায় যে পৃথিবীর সব জাতি উন্নতি লাভ করিয়াছে, এবং এখনও এই উন্নতির ধারা সেই পথে আরও অগ্রসর হইতেছে, এ কথা সত্য নয়। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, যে আধুনিক উন্নত জাতিসমূহ প্রাচীন উন্নতজাতি সমূহের নিকট অনেক বিষয় শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, উন্নতির অনেক উপাদান তাঁহাদের সভ্যতাহইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। কোনও কোনও বিষয়ে তাঁহারা যে ভিত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তার উপরে আরও উন্নত নূতন নূতন বিদ্যার ও নীতির স্তর গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছেন।

কিন্তু এ সব সত্ত্বেও আধুনিক উন্নত জাতি সমূহ সকল বিষয়েই যে প্রাচীন জাতি সমূহকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারিয়াছেন, এ কথা কেহই বলিতে পারেন না।

আধুনিক সভ্যতার অধিকারী ইয়োরোপ পদার্থবিজ্ঞানে, সেই বিদ্যাবলে পার্থিব শক্তিতে এবং জীবনের আরও কোনও কোনও ক্ষেত্রে,

তাহার সফল প্রয়োগে যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, প্রাচীন কোনও জাতিই যে সেরূপ হইতে পারেন নাই, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু অন্য কোনও বিষয়ে ইয়োরোপের জ্ঞান, চিন্তা, ধর্ম্ম ও কর্ম্মশক্তি প্রাচীন সভ্যতাসমূহ হইতে বিশেষ উন্নত স্তরে উঠিয়াছে, এরূপ মনে করিবার কারণ দেখা যায় না।

শক্তির প্রকাশ ইয়োরোপে খুব হইয়াছে, কিন্তু এই শক্তির প্রকৃতি কি? ধর্ম্ম কি? রজোগুণের অভিব্যক্তিই কর্ম্মশক্তিরূপে মানবচরিত্রে প্রকাশ পায়। কিন্তু এই রজঃ যদি তমোদ্বারা অনুবিদ্ধ (permeated) হয়, তবে শক্তি একটা আসুরিক প্রকৃতি ধারণ করে, অপরের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া নিজের ভোগলালসার তৃপ্তি চায়। আবার এই রজঃ যদি সত্ত্বগুণে অনুবিদ্ধ বা (permeated) হয়, তবে শক্তি আপনাকে প্রকাশ করে শক্তিমানের ত্যাগে, সর্ব্বভূতের হিতসাধনে আপন ক্ষমতা প্রকাশে। শক্তির ক্রিয়া বর্ত্তমানে ইয়োরোপে যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে আমাদের দর্শনের ভাষায় বলিতে হয়, আধুনিক ইয়োরোপের এই শক্তি প্রধানতঃ 'তমোনুবিদ্ধ রাজসিকতা'।

বস্তুতঃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ইয়োরোপের যেরূপ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, এবং পূর্ব্বতন সকল সভ্যতা হইতে শিক্ষালাভের অবসরও ইয়োরোপের যেরূপ ঘটিয়াছে, তাহাতে মানবসমাজের ক্রমিক উন্নতির—(social evolutionএর progressivenessএর)—যে নিয়ম ইয়োরোপীয় সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করেন, তাহা সনাতন ও সার্ব্বভৌমিক হইলে, সকল সভ্যতার অতি ব্যাপক এক সমন্বয়, a great and comprehensive synthesis of all civilisations, বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় সভ্যতায় দেখিতে পাইতাম। প্রাচীন সকল সভ্যতাকে ইয়োরোপীয় পণ্ডিত কেহ কেহ partial বা অসম্পূর্ণ এবং নিজেদের সভ্যতাকে comprehensive বা সম্পূর্ণ বলিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রাচীন অন্যান্য

সব সভ্যতাও যেমন, ইয়োরোপীয় সভ্যতাও তেমনই অসম্পূর্ণ। বরং শক্তিতে তমোভাবের এত বড় প্রভাব হেতু, প্রাচীন কোনও কোনও সভ্য তুলনায় হীনতর।

ব্যষ্টিভাবে কি সমষ্টিভাবে, material homogeneity হইতে material heterogeneityর দিকে এবং তাহার অর্থই lower হইতে higher typeএর দিকে পরিণিতকেই evolutionএর ক্রমিক উন্নতি (progressiveness) বলিয়া পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং এই progressive evolution অবিরত এক অখণ্ড ধারায় মোট মানবসমাজে চলিতেছে, ইহাও অনেকে বলেন। সুতরাং মানবজীবন ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, এ কথা তাঁহাদের বলিতেই হয়।

কিন্তু হিন্দু ঋষিগণ সৃষ্টির অভিব্যক্তির রহস্য ব্যাখা করিয়াছেন, অন্য রকমে। তাহার মূল তত্ত্ব কথা,—

'একোঽহং বহুঃ স্যাম্ প্রজায়েয়।'

এই 'এক' একটা material homogeneity নহে। বিশ্বাদ্য, বিশ্ববীজ, পরমাত্মা পরমপুরুষ তাঁহার মহামায়া বা পরাপ্রকৃতি বা পরাশক্তিতে যুক্ত ও ক্রিয়াশীল হইয়া বিচিত্র বিরাট্ বিশ্বরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। এই পরাপ্রকৃতি বা পরাশক্তি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা। এই তিন গুণের অভিব্যক্তির বৈষম্যে বিষম অবস্থাপন্ন বহু অঙ্গে বিরাটের বিচিত্র রূপ হইয়াছে। তাঁহারা আরও বলেন, বিরাটের এই বিশ্বরূপ একবার ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত হইতেছে, জীবনের ক্রিয়া তার চলিতেছে, অন্তে আবার তাঁহাতে লীন হইতেছে। বিরাটের এইরূপ এক একটা প্রকাশের কালকে তাঁহারা কল্প নাম দেন। কল্পের পর কল্পে অনাদিকাল ব্যাপিয়া সৃষ্টিপ্রবাহ চলিতেছে। এককল্পে অর্জ্জিত জ্ঞানের যে সংস্কার, পরবর্ত্তী কল্পে তার উচ্চ অধিকারী হইয়া কোথাও কেহ কেহ আবির্ভূত হন। ইঁহারাই ঋষি, ইঁহারাই মহাপুরুষ,—যখন

যেখানে আবির্ভূত হন, সভ্যতার সূত্রপাত এই অধিকারের বলে তাঁহারই করেন। পূর্ব্বকল্পের উন্নতসমাজও উন্নত সংস্কার সমূহের অধিকারী হইয়া পরবর্ত্তী কালের সৃষ্টিতে প্রকাশ পায়। এই সব সংস্কারই হইয়াছে অন্তর্নিহিত উন্নতির বীজ। উন্নত সভ্যতার বিকাশ এইরূপ সব সমাজের মধ্যেই হয়। আমাদের সাধারণ যুক্তিতে একথা গ্রাহ্য হইবে না। কিন্তু বিশ্বরহস্য সব যুক্তিতে ধরা যায় না। যুক্তির প্রমাণে তার সত্য দেখান যায় না, অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে ধরা পড়ে।

"There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your Philosophy."

যাহাহউক, এরূপ অতীন্দ্রিয় কিছুর অস্তিত্ব, এবং তাহা দেখিবার মত দৃষ্টি বলিয়া মানবস্বভাবে অতীন্দ্রিয় কোনও শক্তি আছে, একথা সকলে স্বীকার করিবেন না। কিন্তু জগতে মানবস্বভাব এবং মানবজাতি-সম্বন্ধে সত্য যাহা বাস্তব তথ্যের আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায়, তাহার সঙ্গে এই theoryর যতটা মিল দেখা যাইবে, অন্য কোনও theoryর ততটা মিল দেখা যাইবে না।—বিজ্ঞানও hypothesis বা অনুমানের সাহায্যে এমন অনেক রহস্যের তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করেন, প্রত্যক্ষ প্রমাণে যাহাদের বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না। যাঁহারা বিশ্বাসী, এই সব বাণীকে কেবল অনুমান মাত্র তাঁহারা মনে করেন না, ঋষিদের অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে আবিষ্কৃত সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন।

প্রসিদ্ধ ইংরেজ পণ্ডিত বেঞ্জামিন কিড় (Benjamin Kidd) তাঁহার Social Evolution নামক গ্রন্থে ধর্ম্মের প্রমাণ ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ultra-rational কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাই ultra-rational, সাধারণ বুদ্ধির বা যুক্তিবাদের অতীত বস্তু। বুদ্ধিতে বা বুদ্ধির যুক্তিতে যাহা সাধারণতঃ ধরা যায় না, অথচ যাহা আছে, তাহাই সাধারণ মানবের পক্ষে বিশ্বাসে গ্রহণ করিবার বিষয়। তাই Benjamin Kidd আর একস্থলে বলিয়াছেন,——

"These beliefs constitute, in short, the natural and inevitable complement of our reason." *

অতি তামস অবস্থা হইতে রাজস ও সাত্ত্বিক অবস্থার বহুবিধ প্রকৃতি-বিশিষ্ট বহু স্তরে অবস্থিত বহু মানবসমাজ চিরদিনই এই জগতে আছে। প্রাচীন কালেও যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে। সব সমাজ এই তামস অবস্থা হইতে রাজসিক কি সাত্ত্বিক অবস্থার উন্নত স্তরে উঠিতে পারে না। কারণ উন্নতিলাভের উপযোগী জন্মগত সংস্কারের অধিকার সকলের মধ্যে সমান নহে। ইহার মূল কারণ যাহাই হউক, মানবজীবন ও মানবসমাজ সম্বন্ধে বাস্তব তথ্যের পরীক্ষা করিলে এই সত্য আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।

সমষ্টিতে সমষ্টিতে এই যে বৈষম্যের কথা আমি বলিলাম, তাহা প্রধানতঃ জাতি বা raceএর হিসাবে। আবার গোষ্ঠী, কুল, সম্প্রদায় প্রভৃতি হিসাবে এক এক জাতির মধ্যে বহু বিষম শাখাসমষ্টিও দেখা যায়। সমান রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ সংযোগহেতু এক একটি জাতি বা race হইতে এক বা ততোধিক আর এক রকম সমষ্টি হয়, সাধারণতঃ তাহা nation নামে পরিচিত। এই nation বস্তুটাকেও আমরা জাতি বলি। কিন্তু race ও nation এই দুইটি কথার অর্থ এক নহে। একাধিক জাতি বা raceএর সম্মিলনেও এক একটি nation হয়। তবে অতি বিষম ভাবাপন্ন একাধিক race মিলিয়া এক nation সহজে হইতে পারে না।—আবার একই ধর্ম্মের শিষ্য, একই শাস্ত্রবিধির দ্বারা শাসিত, একইবিধ আচারনিয়মের অনুবর্ত্তী, এক দেশবাসী এক বা বিবিধ জাতি বা race লইয়া একরূপ জনসমষ্টি হয়, যাহাকে race এবং nation রূপ সমষ্টি হইতে বিশিষ্ট করিবার জন্য সমাজ বা people এই নাম দেওয়া যায় এবং সাধারণতঃ তাহাই দেওয়া হয়। 'সম' এই উপসর্গের সঙ্গে গমনার্থক 'অজ্' ধাতুর যোগে এই সমাজ কথাটা হইয়াছে। অর্থাৎ

* Social Evolution, Benjamin Kidd, Chapter v. p. 126.

যাহারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়া সমান এক পথে গমন করে, অর্থাৎ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহারাই এক সমাজ। *

এই সব কথা মনে করিলে, সমষ্টিভাবে মানবজীবন যে কিরূপ জটিল ও বিচিত্র এবং এই জটিলতার ও বৈচিত্রের সম্যক্ বিশ্লেষণ এবং তাহা হইতে কোনও সমষ্টির প্রকৃতি সম্বন্ধীয় পরিস্ফুট চিত্র অঙ্কন যে কিরূপ কঠিন ব্যাপার, তাহা সকলেই আমরা বুঝিতে পারিব। একই জাতি বা race লইয়া এক 'নেশনে' বা সমাজে যেখানে এক একটা সমষ্টি হইয়াছে, সেই সমষ্টির প্রকৃতি বুঝিতে পারা এমন কঠিন কিছু হয় না। কিন্তু বিভিন্ন জাতি বা race যত বেশী এক একটি 'নেশনে' বা সমাজে মিলিয়াছে, সংঘাতের বা organic সংযোগের রীতিতে এবং অন্যান্য অবস্থায় সেই সব সমষ্টির প্রকৃতি তত বেশী জটিল ও দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে।

যাহা হউক, Racial, national, social—সমজাতীয়, সমরাষ্ট্রীয় বা সমসামাজিক—যে ভাবের অথবা যতটা যে ভাবেরই হউক, মানবের সমষ্টিতে ভেদ নানারকম আছে। আপাততঃ যে বৈষম্যের কথা আলোচনা করিতেছি, তাহা প্রধানতঃ racial বা জাতিগত বৈষম্য। প্রধানতঃ বলিলাম, একেবারে বলিলাম না। কারণ, কোন জাতি বা race রূপ সমষ্টিকে তাহার national ও social—রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রকৃতি হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ধরা যায় না।

এখন কথা হইতেছে, নানা রকমে বড় ও ছোট এই সব জাতির মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ কি হইবে বা হওয়া উচিত? সমানে সমানে যে সম্বন্ধ, এত বৈষম্যের মধ্যে সেরূপ সম্বন্ধ যে সম্ভব নয়, একথা সহজেই সকলে বুঝিবেন ও স্বীকার করিবেন। সে সম্বন্ধ হইতে পারে না. কিন্তু কি সম্বন্ধ হইতে পারে বা হওয়া উচিত? ইহাই সমস্যার কথা। বিষম বিভিন্ন জাতি কেহ কাহারও সংস্পর্শে না

* অবতরণিকা ৩০-৪০ পৃষ্ঠায় এই কথাগুলি বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

আসিয়া একেবারে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিভিন্ন দেশে বাস করিলে, সমস্যা কিছু উঠে না। কিন্তু বহু এমন বিষম জাতি এ পৃথিবীতে এক দেশের অধিবাসী হইয়াছে। হইয়াছেও প্রায় এইভাবে যে বড় বড় জাতিরা ছোট জাতির ভাল ভাল দেশে ঢুকিয়া সে দেশ দখল করিয়া বসিয়াছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংগ্রামে ছোট জাতি যেখানে একেবারে লোপ পাইয়াছে, সব গোল চুকিয়া গিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্র এরূপ ঘটে নাই, ছোট জাতিরা লোপ পায় নাই; এবং কালক্রমে বড় জাতি ও ছোট জাতি এক দেশেরই অধিবাসী হইয়া উঠিয়াছে। জাতিগত বৈষম্য যেখানে বড় বেশী নয়, অথবা ধর্ম্মনীতির অতিশয় বৈষম্য যেখানে মিলনের পক্ষে অলঙ্ঘ্য বাধা হইয়া দাঁড়ায় নাই, সেখানে এরূপ বিভিন্ন জাতি একেবারে মিশিয়া এক একটা সঙ্কর জাতি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু জাতিগত এবং জাতীয় শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবজাত আচারগত বৈষম্য যেখানে অত্যন্ত বেশী, অর্থাৎ সুসভ্য উন্নতপ্রকৃতির জাতি এবং অতি বর্ব্বর তামসপ্রকৃতির জাতি যেখানে এক দেশের অধিবাসী হইয়াছে, সেখানে এরূপ সম্পূর্ণ মিলন ও মিশ্রন ঘটে নাই, ঘটিতে পারে না। যেখানে যে পরিমাণে ঘটিয়াছে, সেখানে সেই পরিমাণে সঙ্করজাতি যে সব জন্মিয়াছে, তাহারা কোথাও উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। কোনও দেশেই নিজেদের একটা বৈশিষ্ট্য তাহাদের ফুটিয়া উঠে নাই। এরূপ স্থলে, হীনতর জাতির সঙ্গে মিশ্রনে আপনারা হীন হইয়া না পড়েন, নিজেদের বৈশিষ্ট না হারান, এ জন্য উন্নত জাতিরা অনেক সময়ে কঠোর নিয়মে আপনাদের স্বাতন্ত্র্যের সীমা বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এক ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও বড় যাঁহারা, সমান সামাজিক সম্বন্ধে ছোটর সঙ্গে মিলিতে চাহেন না।—ইহাই স্বাভাবিক এবং স্বাভাবিক সংস্কারই এইরূপ মিলনে ইঁহাদিগকে বিমুখ করিয়া রাখে।

প্রাচীন ভারতে সুসভ্য ও উন্নত আর্য্যজাতি এবং আদিম বর্ব্বর বহু অনার্য্য জাতি এইভাবে এক দেশের অধিবাসী হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান

যুগে আফ্রিকায় ও আমেরিকায় এইরূপ উন্নত ও সুসভ্য ইয়োরোপীয় জাতি এবং নিগ্রো ও আদিম আমেরিক প্রভৃতি বহু আদিম ও বর্ব্বর জাতি এক দেশের অধিবাসী হইয়াছেন। প্রাচীন সেই অতীতে এবং নবীন বর্ত্তমানে একদেশবাসী এইরূপ দ্বিবিধ জাতির মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধে প্রায় একই রীতি চলিতেছে। সকল মানবের সমান ভ্রাতৃত্ব খৃষ্ট-ধর্ম্মের মূল একটি নীতি। কিন্তু এক খৃষ্টধর্ম্মের শিষ্য হইয়াও আফ্রিকার ও আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ জাতি, কৃষ্ণাঙ্গ তাম্রাঙ্গ প্রভৃতি জাতির সঙ্গে অর্থাৎ coloured races বলিয়া শ্বেতাঙ্গেরা যাহাদের কথা অবজ্ঞায় উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহাদের সঙ্গে সমান সামাজিক সম্বন্ধে মেলা দূরে থাক, এরূপ মিলন কোনও দিক হইতে যাহাতে না ঘটে, সে বিষয়ে যারপরনাই সতর্ক হইয়া অতি কঠোর নিয়মে চলেন। উভয়েই খৃষ্টান, ধর্ম্ম মতে সমান, কিন্তু এক গির্জ্জায় ভজনা করেন না। কালার সাদা পাদরী পর্য্যন্ত সাদার পাদরী-গিরি করিতে পারেন না। সাদার হোটেলে কালার প্রবেশাধিকার নাই, কালার হোটেলে সাদা পদার্পণও করেন না। সাদা কালা ছেলেরা অনেক স্থলে এক স্কুলে পর্য্যন্ত পড়িতে পারে না। কালাকে সাদা অতিশয় একটা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেন, কালাও সাদাকে প্রতিদানে তেমনই দ্বেষ করে। কালা কেহ সাদার বিরুদ্ধে বড় কোনও অপরাধ করিলে, আদালতের বিচারের অপেক্ষাও অনেক সময় করা হয় না। রুষ্ট সাদার দল Lynch law করিয়া কালার কালো জীবনলীলা শেষ করিয়া ফেলেন।

প্রাচীন ভারতেও আর্য্যেরা অনার্য্যদের হইতে আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রাখিয়া চলিতেন। আকৃতি, প্রকৃতি, বুদ্ধি, বিদ্যা ও আচার প্রভৃতিতে অতি উন্নত এবং নিম্ন দুই প্রকার জাতি একদেশের অধিবাসী হইলে সমান সামাজিক সম্বন্ধে তাহারা মিলিতে পারে না, শোনিত সংমিশ্রনও ঘটে না, ঘটা বাঞ্ছনীয়ও নহে। কিন্তু তাই বলিয়া বড় ছোটকে ঘৃণা করিবে, আপন উচ্চতর শক্তিবলে ছোটকে পাড়ন করিবে, সব দিকে চাপিয়া সে যতটুকু ছোট, তার অপেক্ষাও ছোট করিয়া তাকে রাখিবে, কেবল

নিজেদের ভোগসুখের প্রয়োজনে ইহাদের পশুর ন্যায় খাটাইবে, বড়র এ অধিকার নাই।

বড় যেখানে বড়র মত উচ্চদৃষ্টিতে দেখে, ছোট বড় সকলেই এক বিশ্বরূপ বিরাটের বিভিন্ন অঙ্গ, সকলের অন্তরেই একই সেই আত্মা এক প্রেমের সূত্রে সকলকে বাঁধিয়া সূত্রাত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন—তখন ছোটকে সে ঘৃণা করে না, আপনার বৈশিষ্ট বজায় রাখিয়াও, একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ন্যায় একই সমাজ রূপে পরস্পরের মধ্যে একটা সংঘাত বা সংযোগের সম্বন্ধ স্বীকার করে। এই সংঘাত বা সংযোগের সূত্র প্রেম, এই প্রেমের অনুভূতিতেই এই সম্বন্ধ তাহাদের ঘটে, এই সূত্রেই এ সম্বন্ধ তাহাদের বজায় থাকে।

আর্য্য অনার্য্যে—বহুবিধ জাতির সংঘাতে—বিশাল ও জটিল যে এক হিন্দু সমাজ ভারতে হইয়াছে, লক্ষ্য করিয়া দেখিলে তাহাদের মধ্যে মিলনের এই সূত্রই আমরা দেখিতে পাইব। অন্য রকম যাহা দেখা যায়, তাহা ব্যতিরেক বা সাময়িক ব্যাধি, সাধারণ নিয়ম নহে। এই পরীক্ষা, এই বিচার, পরে যথা স্থানে করিব।

এইরূপ বিষম বিভিন্ন জাতি এই ভাবে যেখানে এক সমাজভুক্ত হয়, সমান সামাজিক সম্বন্ধে যেমন তাহারা মিলিতে পারে না, সমাজধর্ম্মে তেমনই সমান অধিকারও তাহাদের হইতে পারে না। গুণে ও যোগ্যতায় যেখানে সমতা নাই, কর্ম্মের অধিকারেও সমতা সেখানে থাকিতে পারে না। উভয় বৈষম্যই সমান স্বাভাবিক বৈষম্য। তাই বিভিন্ন জাতির প্রকৃতির, শক্তির ও যোগ্যতার বৈষম্য হেতু অধিকারের বৈষম্যও সর্ব্বত্র দেখা যায়।

বিভিন্ন জাতির মধ্যেই যে কেবল বৈষম্য আছে তা নয়। এক জাতির মধ্যেও অশেষ এইরূপ বৈষম্য রহিয়াছে। রূপে গুণে চরম উন্নতির ছাপ, আবার একেবারে তামস বর্ব্বরতার ছাপ, পরন্তু এই দুই চরমের মধ্যবর্ত্তী অশেষ রকম ছাপ, একদেশে

একজাতিতে এক সমাজে একই নগরবাসী ও গ্রামবাসী লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত দিয়া প্রমাণ-প্রয়োগে এই সত্য কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না, আপনাহইতেই সকলে লক্ষ্য করিবেন এবং সর্ব্বদাই করিতেছেন। দুই জাতিতে ত কথাই নাই, এক জাতির মধ্যেও বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, শক্তি, পরিমার্জ্জনা, চরিত্র, আচার নিয়ম ও জীবনযাত্রার প্রণালীতে বৈষম্য যেখানে বেশী, একদেশবাসী ও পরস্পর প্রতিবেশী হইয়াও সেখানে সমান সামাজিক সম্বন্ধে তাহারা মিলিতে পারে না। এই বৈষম্য যতদিন রহিবে, মিলিতে পারিবে না। কিন্তু বৈষম্য যদি দূর হয়, মিলিবার পক্ষে স্বাভাবিক বাধা অবশ্য কিছু থাকিতে পারে না।

কোনও কোনও বিশেষ কারণে, কোনও কোনও বিষয়ে কিছু বাধা মানিয়া চলিলেও সাধারণ বান্ধবতার সম্বন্ধে, কর্ম্মের সহযোগিতায় কোনও বাধা কেহই মানে না। এদেশের ভদ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ উভয়েই শিক্ষায় দীক্ষায়, শক্তিতে ও পরিমার্জ্জনায় সমান। প্রচলিত প্রথা মানিয়া বৈবাহিক সম্বন্ধে তাঁহারা কখনও আবদ্ধ হন না বটে,—কিন্তু আর সকল বিষযে অতি ঘনিষ্ঠ বান্ধবতা, সকল কর্ম্মে সমান সহযোগিতা, ইঁহাদের মধ্যে দেখা যায়। অশিক্ষিত অজ্ঞ হীনবৃত্তিক ব্রাহ্মণের সঙ্গেই বরং শিক্ষিত পরিমার্জ্জিত উচ্চবৃত্তিক ব্রাহ্মণ একাসনেও বসিতে চান না। কিন্তু সমশিক্ষিত, সমপরিমার্জ্জিত, সমবৃত্তিক কায়স্থের সঙ্গে এক ফরাসে এক তাকিয়ার গায়ে গায়ে গড়াগড়ি করেন, এক হুঁকায় তামাক খান, এক পাত্রে আহারও অনেকে করেন। সমানে সমানে এই সমতা, আবার বড়তে ছোটতে এই পার্থক্য, ইহা স্বাভাবিক। হাজার ভেদের মধ্যেও ইহা থাকিবে, হাজার সাম্যবিধির মধ্যেও ইহা দেখা দিবে।

কেবল মেলা মেশা বলিয়া কথা নয়, সমান গুণ, সমান যোগ্যতা যখন সকলের নাই, সব কর্ম্মও সকলে সমান ভাবে করিতে পারে না। একই মানুষ সব, কিন্তু গুণানুসারে যে কাজের যোগ্য যে, সেই সে কাজ

করে। যে কাজের যোগ্য যে নয়, সে কাজ করে না, করিতে পারে না। করিতে দিলে কি করিতে গেলেও কাজ সে পণ্ড করে। একই লোহায় সূঁচ হয়, কলম হয়, খাঁড়া তরোয়াল হয়, কোদাল কুড়াল হয়; সূঁচ সেলাই করে, কলম লেখে, খাঁড়াতরোয়াল শত্রু বধ করে, কোদাল কুড়াল জমি খোঁড়ে, গাছ কাটে। একটির কাজ আর একটির দ্বারা হয় না। গুণবৈষম্যে মানুষে মানুষেও এমনই কর্ম্ম বৈষম্য হয়। সুতরাং সকল কর্ম্মে সকলের সমান অধিকার স্বীকার করা যায় না।

গুণ কর্ম্মের—character, capacity এবং functionএর এই বৈষম্য উন্নতসমাজেই দেখা যায়। উন্নতজীবনের লক্ষণই ইহা। ঔদ্ভিদ বা জৈব—সকল living organism বা জীবিত বস্তুর দেহে অপরিণত অবস্থায় একটা একাঙ্গ ভাব বা homogeneity দেখা যায়। আর পরিণত ও উন্নত অবস্থায় গুণকর্ম্মের ভেদে character ও functionএর differentiationএ বিভিন্ন অঙ্গরূপে একটা বহুত্বের ও বৈচিত্রের ভাব বা heterogeneity তার বিশিষ্ট প্রকৃতি হইয়া দাঁড়ায়। বিভিন্ন মানবসমষ্টিও এইরূপ organism, জীবসঙ্ঘাত ও জীবনধর্ম্মী বস্তু। নিম্ন ও অপরিণত এবং উন্নত ও পরিণত অবস্থায় মানবের সমষ্টিজীবনেও এইরূপ বিভিন্নতার লক্ষণ দেখা যায়। বন্য ও বর্ব্বর অবস্থায় কোনও মানবগোষ্ঠীর মধ্যে গুণকর্ম্মের ভেদ কিছু বড় নাই, এবং তদনুসারে কোনও শ্রেণীবিভাগও ঘটে না। কিন্তু উন্নত সমাজে সর্ব্বত্রই এই গুণবৈষম্য রহিয়াছে এবং তদনুসারে শ্রেণীবিভাগও ক্রমে গড়িয়া উঠে।

এখন দেখিতে হইবে, এই গুণ কর্ম্মভেদ এবং তদনুসারে সমাজদেহে এই যে বিভিন্ন অঙ্গভেদের ন্যায় শ্রেণী ভেদ দেখা দেয়, তাহার বাস্তব অবস্থাটা কিরূপ। অসংখ্য মানুষ লইয়া এক একটি এই সমাজ এবং মানুষে মানুষে অশেষ রকম পার্থক্য আছে। দুটি লোক সর্ব্ব বিষয়ে সমান কোথাও দেখা যায় না। জ্ঞানী কি সাধুসজ্জন সর্ব্বত্রই বহু আছেন,—কিন্তু দুটি জ্ঞানী দুটি সাধুসজ্জন, বুদ্ধির প্রতিভায়, জ্ঞানের অধিকারে কি

চরিত্রের ধর্ম্মে ঠিক এক ছাপের নন। দুটি যোদ্ধা, দুটি ব্যবসায়ী, কি দুটি কৃষাণ মজুর কোথাও এক ছাঁচে গড়া পাওয়া যাইবে না। কিন্তু অশেষ এই বৈষম্য ও বৈচিত্রের মধ্যেও যদি আমরা লক্ষ করিয়া দেখি, স্বাভাবিক গুণে এবং গুণানুরূপ কর্ম্মপ্রবৃত্তিতে মোটের উপর চারিপ্রকার মানুষ আমরা সর্ব্বত্র দেখিতে পাইব। কতক লোক এমন আছেন, যাঁহারা স্বভাবতঃই ধীর শান্ত,—বিদ্যালোচনা ও ধর্ম্মসাধনা প্রভৃতি সত্ত্বগুণাত্মক কর্ম্মের দিকেই যাঁহাদের স্বাভাবিক একটা প্রেরণা দেখা যায়। জীবনের অবস্থা প্রতিকূল না হইলে, এই ভাবেই ইঁহাদের চরিত্র গড়িয়া উঠে এবং এই সব কর্ম্মেই আনন্দে ইঁহারা জীবন অতিপাত করেন।—আবার এমন লোকও আছেন, দৈহিক বলে যাঁহারা বিশেষ শক্তিমান্, উদ্দাম তেজস্বিতা ও দুর্দ্ধর্ষ বিক্রম প্রকাশে অতি মাত্র উৎসাহী, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল লোককে আপনাদের শক্তির অধান রাখিতে আগ্রহশাল। এক কথায় রাজসিকতাই যাঁহাদের স্বভাবের প্রধান লক্ষণ। ব্যবসায়বাণিজ্যাদি ধনাগমমূলক কাজকর্ম্মে নিপুণ, এবং সেই সব কাজকর্ম্মের দিকেই স্বাভাবিক প্রেরণা আছে, এরূপ এক প্রকৃতির লোকও সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। আবার একেবারে নিজেরা নিজেদের শক্তিতে ও বুদ্ধিতে কিছুই বড় করিতে পারে না, অন্যের অধীনে থাকিয়া তাহাদের নির্দ্দেশ মত দৈহিক শ্রমসাধ্য কাজকর্ম্ম মাত্র করিতে পারে, এরূপ লোকও বহুসংখ্যায় সকল সমাজে দেখা যায়। সংক্ষেপে ভারতীয় আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রবর্ত্তকগণের ভাষায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি প্রকারের গুণ বিশিষ্ট লোক এবং তাহারা আপনা হইতেই নিজ নিজ গুণের অনুরূপ কাজকর্ম্মে নিযুক্ত আছে, এইরূপ একটা অবস্থা প্রায় সর্ব্বত্র আমরা দেখিতে পাইব। একেবারে স্পষ্ট রেখাটানায় ভাগ করা এই চারি প্রকৃতির লোকই যে সর্ব্বত্র আছে, এবং বংশানুক্রমে যার যার সম্প্রদায়ে যার যার বৃত্তিতে স্থিত হইয়া চলিতেছে, তা বলি না। এক সম্প্রদায় হইতে অন্য সম্প্রদায়ে উন্নয়ন ও অবনয়নও হইতেছে, একই

বংশে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের অথবা বিশ্বকর্ম্মার পুত্র ছুছুন্দরের ন্যায় অন্য প্রকৃতির লোকও জন্মিতেছে। বহু ব্যক্তিতে বিভিন্ন গুণের মিশ্রণও অনেক সময় দেখা যায়। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও, সাময়িক কোনও বিশেষ ভাব কি অবস্থার প্রভাব অথবা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিকূল যেখানে হয় নাই, সমাজবিন্যাস সহজভাবে স্বাভাবিক নিয়মেই হইতে পারিয়াছে, সমাজজীবনের কর্ম্মপ্রবাহ আপন স্বাভাবিক পথে চলার পক্ষে বিশেষ কোনও বাধা মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় নাই, এমন যে কোনও সমাজের মধ্যেই মোটামুটি স্বাভাবিক গুণে এই চারিটি প্রকৃতির, এবং কর্ম্মে এই চারি প্রকার বৃত্তির অনুবর্ত্তী লোক দেখা যাইবে।—আরও দেখা যাইবে, সাধারণতঃ পৈতৃক গুণেরই অধিকারী হইয়া এবং পৈতৃক বৃত্তিরই অনুবর্ত্তন করিয়া সন্তানপরম্পরা চলিতেছে।

সাম্যবাদে মুসলমান সমাজের ন্যায় এমন অগ্রণী সমাজ পৃথিবীতে আর নাই,—সেখানেও গুণকর্ম্মে স্বাভাবিক এই বিভাগ বর্ত্তমান। কেহ কেহ বলিবেন, দাসরূপে আসিয়া যোগ্যতার বলে ও প্রভুর অনুগ্রহে শেষে উচ্চতম পদ ও সম্মান লাভ করিয়াছেন, প্রভুর রাজ্যের উত্তরাধিকারী পর্য্যন্ত হইয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত মুসলমান-সমাজে বহু পাওয়া যায়। হাঁ, পাওয়া যায়। কিন্তু এই সব দাস শূদ্রপ্রকৃতির দাস ছিল না। অপহৃত বা যুদ্ধে বন্দীভূত যে কোনও জাতির বা বংশের বহু বালক ও যুবক এইরূপ দাসরূপে বিক্রীত হইত। ইহারাই যোগ্যতা অনুসারে এইরূপ পুরস্কৃত হইত। মুসলমানের ধর্ম্মবিধানে এমন কোনও কড়া নিয়ম ছিল না যে ভিন্নজাতীর বা অবস্থার বিপর্য্যয়ে দাস বলিয়া মুসলমানসমাজে তাহার স্থান হইবে না। মুসলমানসমাজ কোনও জাতিবিশেষের সমাজ নহে। ধর্ম্মও কোনও দেশবিশেষের বিশিষ্ট ধর্ম্ম নহে। যে কোনও জাতির যে কোনও দেশের লোকই হউক না, মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেই, সে মুসলমান সমাজভুক্ত হইত, মুসলমানী

নূতন একটা নাম গ্রহণ করিত, এবং ধর্ম্মের বিধিতে মুসলমানে মুসলমানে কোনও পার্থক্য ছিল না। সুতরাং প্রকৃতিতে শূদ্র না হইলে, কেবল অবস্থায় দাস বলিয়াই কেহ শূদ্রত্বে পড়িয়া থাকিত না। যোগ্যতা থাকিলেই যে শ্রেণীর যোগ্য, সেই শ্রেণীতে তার স্থান হইত। উন্নত আরবপারসীদের মধ্যেও বৈশ্যশূদ্র ছিল, আবার অপেক্ষাকৃত বর্ব্বর মোগলতুর্কীদের মধ্যেও গুণকর্ম্ম অনুসারে, কেবল জঙ্গীসিপাহী আমীর ওমরাহ নয়, কাজি-মোল্লা উলেমা দরবেশও অনেকে হইতেন। জাতিবর্ণ বিভাগের উপরে প্রতিষ্ঠিত এই হিন্দুসমাজেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল ছিল না। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত রাজপুত্র হইলেও শূদ্রী দাসীর গর্ভজাত, যোগ্য বলিয়া নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া চাণক্য তাঁহাকেই মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। মুদ্রারাক্ষস নাটকে দেখিতে পাওয়া যায়, চাণক্য সর্ব্বদাই তাঁহাকে 'বৃষল' (অর্থাৎ 'শূদ্র') এই নামে সম্বোধন করিতেছেন, অথচ রাজা বলিয়া মানিয়া তাঁহারই মন্ত্রিত্ব করিতেছেন। মৃচ্ছকটিক নাটকে আছে, রাজার অকর্ম্মণ্যতায় বিরক্ত প্রজাবৃন্দ একটা বিপ্লব ঘটাইয়া রাজাকে পদচ্যুত করতঃ আর্য্যক নামে একজন যোগ্য গোপকে রাজ সিংহাসনে বসাইল। আরও দেখা যায়, ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব চারুদত্ত বণিক এবং অন্যান্য বণিকদের সঙ্গে শ্রেষ্ঠিচত্বরে বাস করেন। শর্ব্বিলক নামে অপর একটি ব্রাহ্মণসন্তানের বৃত্তি তস্করতা। শূদ্রসন্তান ধর্ম্মবলে ও চরিত্র বলে ব্রাহ্মণের ন্যায় সম্মান পাইতেছেন, আবার ব্রাহ্মণসন্তান অকর্ম্মণ্যতায় ও চরিত্রহীনতায় শূদ্রেরও অধম হইয়া আছেন, এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত প্রাচীন সাহিত্যে ও বর্ত্তমান বাস্তবজীবনে সকলেই সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবেন। হিন্দুসমাজের বর্ণ বা জাতিবিভাগে কখন কেন কিরূপ পরিণতি ঘটিয়াছিল, তার স্বভাবের ব্যতিক্রম কখন কি ভাবে কতটা তার মধ্যে দেখা দিয়াছে, তার আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। মোটের উপর আমার বক্তব্য এইস্থলে এই, যে স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণতঃ গুণানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি প্রকার

মানবপ্রকৃতি এবং এই চারিপ্রকৃতির গুণানুরূপ কর্ম্মানুসারে মানবসমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিশ্রেণীর মানব আমরা দেখিতে পাই। ব্যতিক্রমের বিশেষ বিশেষ কারণ না থাকিলে বংশানুক্রমিক ধারায় চলিবারই একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ইহাদের মধ্যে আছে। কৃত্রিম উপায়ে জোড়াতালি সাময়িকভাবে গড়া নয়, নৈসর্গিক ধর্ম্মে যেখানে যে সমাজ আপনা হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে, সেইখানেই সাধারণ অবস্থা এইরূপ দেখা যাইবে।

কিন্তু একটি কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে এই যে চারিটি শ্রেণীই এক সমাজদেহের চারিটি অঙ্গ। যার যার স্থানে ও যার যার কর্ম্মে প্রত্যেকেই প্রধান, প্রত্যেকেরই সমান প্রয়োজন সমাজদেহে আছে, সকলেই পরস্পরের উপরে নির্ভর করিতেছে, কাহাকেও বাদ দিলে, কোনও অঙ্গ অতিশয় ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইলে, অথবা অন্যকে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল করিয়া কোনও এক অঙ্গ অধিক প্রবল ও পুষ্ট হইলে, সমাজদেহের সুস্থতা থাকে না, দারুণ বিধ্বংসক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়ে, এবং তাহার ফলে না হইতে পারে এমন অমঙ্গল নাই।

সমষ্টির ও ব্যষ্টির ধর্ম্ম।

মানবের এক একটি সমষ্টি শরীর বা সমাজ যেমন গড়িয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে তার একটা জীবননীতি ও নীতির অনুযায়ী বিধিব্যবস্থার একটা পদ্ধতিও গড়িয়া উঠে। ইহাই সেই সমষ্টির আশ্রয়, ইহাকেই অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক এমন সমষ্টি আপনার স্বরূপ প্রকাশ করে, এবং ইহাই এই স্বরূপে তাহাকে ধারণ করিয়া রাখে। যাহা কোনও বস্তুকে আপনার স্বরূপে ধারণ করিয়া রাখে, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। মৌলিক এই অর্থে এই নীতির ও বিধিব্যবস্থার পদ্ধতিকে সমষ্টির বা সমাজের ধর্ম্ম আমরা বলিতে পারি। প্রাচীন হিন্দুসাহিত্যে এই নামই এই প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে।

এদেশের প্রাচীন সাহিত্যে অবশ্য 'সমাজধর্ম্ম' বলিয়া বিশিষ্ট কোনও নাম নাই, আছে এক নাম 'ধর্ম্ম'। সমষ্টির ধর্ম্ম, ব্যষ্টির ধর্ম্ম, শ্রেণীভেদে বা বর্ণভেদে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, বৈশ্যের ধর্ম্ম, শূদ্রের ধর্ম্ম, সবই এক মহা মানবধর্ম্মেরই বিশেষ বিশেষ ভাব মাত্র। পরস্পরের মধ্যে মহা এক সামঞ্জস্য ব্যতীত বিরোধ কিছু নাই, থাকিতে পারে না। কারণ ব্যষ্টিভাবে কি সমষ্টিভাবে, কিম্বা সমষ্টির দেহে গুণ-কর্ম্মানুযায়ী অঙ্গভাবে, মানব বিশ্বপ্রকৃতিতেই অভিব্যক্ত সত্ত্ব, এবং তাহার ধর্ম্মও বিশ্বধর্ম্মেরই অনুবর্ত্তী। বিশ্বধর্ম্মই এই বিশ্বস্থিতিকে রক্ষা করিতেছে; মানবধর্ম্মও তাহারই মধ্যে মানবের স্থিতিকে রক্ষা করিতেছে। ব্যষ্টি, সমষ্টি, সমষ্টির অঙ্গ, সকল ভাবে সকল রূপেই মানবের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ও অবিরোধী সম্বন্ধে সম্বদ্ধ থাকিয়া পরস্পরের সহায়তা করে, ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে মানবকে মঙ্গলে রাখে, মঙ্গলের পথে পরিচালিত করে। এই সামঞ্জস্য, এই অবিরোধ সহযোগিতা, যেখানে যে পরিমাণে আছে, সেই পরিমাণে মানব সেখানে মঙ্গলের অবস্থায় আছে। যে পরিমাণে এই সামঞ্জস্য ভাঙ্গিয়াছে, বিরোধ ঘটিয়াছে, তত অমঙ্গল সেখানে দেখা দিয়াছে।

মূল এই সত্য ভারতের প্রাচীন ঋষিরা দেখিয়াছিলেন, তাই এই প্রসঙ্গে এক ধর্ম্ম নামই তাঁহারা ব্যবহার করিয়াছেন। আমাদের প্রাচীন সভ্যতার কথা আলোচনা করেন, এইরূপ অনেক ইয়োরোপীয় পণ্ডিত ধর্ম্মকে Law বা laws—অর্থাৎ laws which uphold man and his society—এই নাম দিয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্র বলিতে সেই সব শাস্ত্রই বুঝায়, যাহাতে এই সব laws এর—অর্থাৎ নীতির বা বিধির কথা আছে। প্রাচীন কল্পোক্ত ধর্ম্মসূত্র এবং পরবর্ত্তী যুগের মন্বাদি ঋষিপ্রবর্ত্তিত স্মৃতিসংহিতাসমূহই এই সব ধর্ম্মশাস্ত্র। ব্যষ্টি ভাবে মানবের মঙ্গল কিসে হইবে, জীবনের লক্ষ্য তার পূর্ণ হইবে,—সমষ্টির মধ্যেই বা তার স্থান কি, সেই স্থানে তার কর্ত্তব্য কি,—সমষ্টির সাধারণ ধর্ম্ম কি ভাবে পরিচালিত হইবে, ব্যষ্টিকে কি উপায়ে তার অনুবর্ত্তী রাখিতে হইবে,—এই সব সম্বন্ধীয় নীতি ও বিধিব্যবস্থা লইয়াই এই সব ধর্ম্মশাস্ত্র হইয়াছে।

মোট কথা, ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে মানবকে যাহা তাহার স্বরূপে ধারণ করিয়া রাখে, তাহাই ধর্ম্ম। ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে মানব যেমন এই বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে অভিব্যক্ত হয়, তার এই ধর্ম্মও সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বধর্ম্মের সঙ্গে অভিব্যক্ত হইয়া উঠে। ব্যষ্টিকে যাহা রক্ষা করে, ব্যষ্টির কর্ম্মের ভাগ ব্যষ্টি যাহাতে নির্ব্বাহ করিতে পারে, করিয়া তাহার জীবনের সার্থকতা ঘটে, ব্যষ্টির পক্ষে তাহাই তার ধর্ম্ম। আবার সমষ্টিকে যাহা রক্ষা করে, যাহাতে আশ্রিত হইয়া, যাহার নির্দ্দেশে সমষ্টি তার কর্ম্মের ভাগ করিতে পারে, সমষ্টির পক্ষেও তাহাই তার ধর্ম্ম। উভয়বিধ ধর্ম্মই একই মহাধর্ম্মের দুই বিধা মাত্র, উভয়ই উভয়ের উপরে নির্ভরশীল, উভয়ই উভয়ের সহায়ক, একটি অপরের বিরোধী নহে। এই ধর্ম্মে ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ের মঙ্গলও পরস্পর-সাপেক্ষ।

তাই বলিয়া, উভয়ে যেমন সমান নয়, উভয় ধর্ম্মেরও সকল বিষয়ে সমান অধিকার থাকিতে পারে না। এরূপ সমানে সমানে বাস্তবিক

কোনও নির্ভরশীলতা বা পরস্পর সাপেক্ষতাও সম্ভব হয় না। আবার উভয় ধর্ম্মে বিরোধও এই পৃথিবীতে অনেক সময় দেখা যায়।

ব্যষ্টির মঙ্গল সমষ্টির মঙ্গলসাপেক্ষ বটে, ব্যষ্টির ধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝায় তাহাও সমষ্টির ধর্ম্মের অবিরোধী বটে,—কিন্তু ব্যষ্টি ভুল বুঝিতে পারে। তাহার প্রকৃতিতেও এমন একটা দিক্ আছে, যাহা তাহাকে সমষ্টিধর্ম্মের বিরোধে প্রেরিত করিতে পারে, এবং এই প্রেরণাকে সে তার ধর্ম্মের প্রেরণা বলিয়াও মনে করিতে পারে। করিয়া সেই ভাবে সে চলিতেও পারে। বহু ব্যষ্টি যদি এইরূপ করে, সমষ্টির সংহতি থাকে না, সমষ্টি ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই অবস্থায় সমষ্টিকে যদি তার অস্তিত্ব রাখিতে হয়, এ অধিকার অবশ্য তার থাকিবে যে ব্যষ্টিকে তার ধর্ম্মের অধীন করিয়া রাখিবার উপায় অবলম্বন করে। কারণ ব্যষ্টি অপেক্ষা সমষ্টি বড়, সুতরাং তার ধর্ম্মের উচ্চতর মহিমাকে মানিয়া ব্যষ্টিকে চলিতে হইবে।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি রূপে মানবজীবনের নৈসর্গিক প্রকৃতির সত্য সম্বন্ধে যে সব অলোচনা পূর্ব্বে করিয়াছি, সেই সত্য যাঁহারা স্বীকার করিবেন, এ কথাও তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। অত তত্ত্বের মধ্যে না গিয়া সহজ বুদ্ধিতেও আমরা এই সত্যটা বুঝিতে পারি।

সমষ্টির মধ্যেই ব্যষ্টির স্থান, সমষ্টিতেই ব্যষ্টি আশ্রিত। ব্যষ্টি এক, সমষ্টি সেই এক এক বহু ব্যষ্টিকে লইয়া। ব্যষ্টি এই আসে, এই যায়, জীবনের পরিসর তার অতি অল্প। কিন্তু সমাজ কেবল বর্ত্তমান ব্যষ্টিসমূহ লইয়া নয়, সুদূর অতীত হইতে পুরুষপরম্পরাগত বহু ব্যষ্টির জীবন ব্যাপিয়া তার জীবনধারা বহিতেছে, ভবিষ্যতেও বহু পুরুষ-পরম্পরার জীবন ব্যাপিয়া বহিবে। সমাজ যেন একটা বিশাল নদী-প্রবাহ, ব্যষ্টি তার বক্ষে উর্ম্মির পর উর্ম্মির ন্যায় উঠিতেছে, পড়িতেছে। কেবল বর্ত্তমান ব্যষ্টিবৃন্দের মঙ্গলামঙ্গলেই তার মঙ্গলামঙ্গলের আরম্ভ বা পরিসমাপ্তি হয় না, তার জীবনের মঙ্গলামঙ্গলের একটা ধারা অতীত

হইতে বর্ত্তমানে আসিয়াছে, বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যতে যাইবে। বর্ত্তমানের মঙ্গলামঙ্গল অতীতের কর্ম্মফল সাপেক্ষ, আবার বর্ত্তমানের কর্ম্মফলে ভবিষ্যতের মঙ্গলামঙ্গল নিয়ন্ত্রিত হইবে। সুতরাং আজ যে ব্যষ্টি-মানব সমাজের অঙ্গে আশ্রিত হইয়া আছে, তাকে কেবল বর্ত্তমানে নিজের কথা ভাবিলেই চলিবে না। সমষ্টির এই জীবন-প্রবাহের মধ্যে অতীতের কর্ম্মফলভোগী হইয়া সে আসিয়াছে, ভবিষ্যৎ আবার তাহার কর্ম্মফল ভোগ করিবে। বৃহৎ এই সমাজদেহের অঙ্গীভূতরূপে অতীতের সন্তান সে, ভবিষ্যতের জনক। সুতরাং ব্যষ্টিভাবে তার নিজের স্বার্থ সমষ্টির ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারে না, সমষ্টির ধর্ম্ম মানিয়া তার অধীন হইয়া তাকে চলিতে হইবে। আবার ব্যষ্টিভাবে তার জীবনেরও এমন একটা বিশিষ্টতা আছে, যাহা হারাইয়া সে একেবারে সমষ্টির ক্ষুদ্র একটা প্রাণহীন যন্ত্রে মাত্র পরিণত হইতেও পারে না। বস্তুতঃ এরূপ প্রাণহীন যন্ত্রও সে নয়। প্রাণহীন এরূপ বহু যন্ত্রের বা তদ্বৎবস্তুর সমাহারে প্রাণময় সমষ্টি বা সমাজও হয় না। হয় এইরূপ বহু যন্ত্রের বা বস্তুর অসাড় একটা স্তূপ মাত্র।

প্রত্যেক ব্যষ্টি-মানবের যেমন একটা স্বতন্ত্র স্বরূপ আছে, তেমনই আবার কোনও না কোনও সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া তাহারও অধীন সে। সমষ্টি-শক্তির সুপ্রতিষ্ঠাসম্ভূত মঙ্গলের উপরে তার নিজের মঙ্গল বহু পরিমাণে নির্ভর করে। সুপ্রতিষ্ঠিত কোনও সমষ্টি বা সমাজের মধ্যে প্রত্যেক মানবই বহু সুখসৌভাগ্যের অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করে, পুরুষপরম্পরাগত শিক্ষাদীক্ষা কর্ম্ম-সাধনা ও চরিত্রের প্রভাবে স্বাভাবিক সংস্কার ও শক্তি তার উচ্চতর হয়, ইহার বিকাশে উচ্চতর সুখসৌভাগ্যলাভের সুযোগও সে অনেক পায়। সুতরাং জন্ম হইতেই সমাজের প্রতি তাহার ঋণ কম নয়। এই ঋণের দায়িত্ব পালন করা তাহাদের একটি ধর্ম্ম। কিন্তু দায়িত্ব কেহ হয়ত অস্বীকার করিতে পারে। অস্বীকার করিলে সমাজেরও কেন এ অধিকার থাকিবে না, যে এই ঋণের দেয় তাহার কাছে আদায় করিয়া নিতে

পারে ? এই প্রসঙ্গে একটা কথার উল্লেখ আমরা করিতে পারি, হিন্দু-শাস্ত্র প্রত্যেকের ত্রিবিধ ঋণের কথা কথা উল্লেখ করিয়াছেন,—দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ ও পিতৃ ঋণ। দেবতার প্রসাদে এই পৃথিবীর ধন-ধান্যাদি সম্পদসুখ আমরা ভোগ করিতেছি, যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ায় সর্ব্বভূতের তৃপ্ত্যর্থে তাহা দান করিলে দেবঋণ পরিশোধ হয়। বিদ্যাজ্ঞানের যে অধিকারে মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ আমরা লাভ করি, তার জন্য ঋষিদের কাছে আমরা ঋণী। সুতরাং শিক্ষাদানে অন্যকে এই জ্ঞানবিদ্যার অধিকারী করিতে পারিলে এই ঋষিঋণ আমাদের শোধ হয়। আবার আমরা আমাদের এই দেহাশ্রিত জীবন পিতৃপুরুষদের হইতে পাইয়াছি। সন্তানের জন্মে সেই বংশধারা রক্ষিত হইলে, তাহাদের যথোচিত প্রতিপালনে ও শিক্ষাদানে বংশের বিশিষ্টতা ও গৌরব স্থির রাখিতে পারিলে, এই পিতৃঋণ হইতে আমরা মুক্ত হই। সমাজের কাছে মানবের ঋণের দায়িত্ব ইহাতেই মাত্র শেষ না হইতে পারে; হয়ত কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষেই এই ঋণত্রয়ের দায়িত্ব নির্দ্দেশ হইয়াছিল; অথবা এই তিন ঋণ পরিশোধে সমর্থ যে, অন্য সব ঋণও সহজে সে পরিশোধ করিতে পারে, এই কথাই ইহাতে বুঝায়। যাহাই হউক, ইহা হইতে সমাজের প্রতি মানবের ঋণের একটা দায়িত্ব যে হিন্দুশাস্ত্রে যথেষ্ট ভাবে স্বীকৃত হইয়াছিল, আর তাহার পরিশোধেরও যে একটা বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি।

ঋণ আছে, ঋণের আবার সুদও আছে। কেবল যতটুকু পাইয়াছি, তা দিলে হইবে না; সুদে আসলে পরিশোধ করিতে হইবে। তারপর যে ঋণের ভার মাথায় নিয়া জন্মিয়াছি, তাহাই কেবল ঋণ নয়; জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত বহু মঙ্গল আমাদের সমাজস্থিতি-হইতে আসিতেছে। জন্মের পর জীবনের এ ঋণও বড় কম নয়। কাহারও বেশী, কাহারও কিছু কম। কিন্তু সকলেরই আছে। এ ঋণও জীবন ভরিয়া সুদে আসলে সকলকে শুধিতে হইবে। আজ ঋণ

কাল শোধ,—এই ঋণ এই শোধ—এই ভাবে জীবন ভরিয়া এই দেনা পাওনার হিসাব নিকাশ চলে। মরণে বোধ হয়, ফাজিল অনেক ঋণের দায় মাথায় করিয়া যাই, তাই মাথায় নিয়া আবার ফিরিয়া আসি। এই সব কথা মনে রাখিলে, যে সমাজস্থিতি হইতে বহু প্রকারে আমরা এমন উপকৃত, সমাজের সেই স্থিতিরক্ষার জন্য আমাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বড় কম হইবে না। এই দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের ভার পালন করিতে গেলেই ব্যষ্টিরূপে আমরা আমাদের পুরা স্বার্থ বজায় রাখিতে পারি না। কেবলই আমার ভাল কিসে হইবে, এই ভাবিয়া তাহাই খুঁজিয়া চলিতে পারি না। দেনা থাকিলে, আর সেই দেনা স্বীকার করিলে, পৈতৃক বা উপার্জ্জিত সম্পদ পুরা কেহ ভোগ করিতে পারে না; অনেক খানি ভাগ তার সুদে আসলে দেনা শোধে দিতে হয়; দিয়া বাকী যাহা থাকে, তাহাই মাত্র ভোগে ধর্ম্মতঃ অধিকার মানুষের আছে। প্রত্যেক 'ব্যস্ত' মানবের (বা individual manএর) উপরে 'সমস্ত' মানবের বা Communityর এই দাবী আছে। এই দাবী সকলেই যে সর্ব্বদা আপনা হইতে দিতে চায়, তা নয়। সুতরাং আদায় করিয়া নিবার ব্যবস্থাও সমাজকে করিতে হইবে।

অনেক আবার এমন লোকও আছে, যারা কেবল যে ন্যায্য দাবী দিতে চায় না, তা নয়; কুপ্রবৃত্তির বশে সমাজের বহু অমঙ্গলও সাধন করে। ইহাদিগকে যথোপযুক্ত শাসনে রাখাও প্রয়োজন।—তাছাড়া, বহুব্যষ্টির মধ্যে নানাবিধ সম্বন্ধ যাহা ঘটে, কাজ কর্ম্মের বিনিময় যাহা হয়, যোগ্যতা অনুসারে যে বৃত্তি বিভাগ ঘটে, সে সবের সংস্রবে পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে এবং অন্য আরও কত রকম ব্যাপারে বহু নিয়ম সকলকে মানিয়া চলিতে হয়। এসব নিয়ম কি হইলে ভাল হয়, নিয়ম অনুসারে চলিবার সমীচীন রীতি কি, তাহা সকলে বুঝে না। সকলে আবার সকল নিয়ম মানিয়াও চলে না, চলিতে পারে না, কেহ কেহ চলিতে চায়ও না। সুতরাং এই সব নিয়মের নির্দ্দেশ সমাজকে করিতে হয়, এবং যাহাতে তাহা সুশৃঙ্খলায় চলে, ব্যতিক্রমে বা

ভঙ্গে এই সব সম্বন্ধের সামঞ্জস্য ব্যহত না হয়, তাহাও সমাজকে দেখিতে হয়।

এই সব কাজের জন্য সমষ্টির বা সমাজের একটা বিশিষ্ট শক্তি এবং সেই শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত শাসনপদ্ধতিও সর্ব্বত্র থাকে, এবং থাকাও আবশ্যক। বিভিন্ন সমাজ স্বাভাবিক নিয়মে সঞ্জাত এক একটা organismই হউক, অথবা কৃত্রিম উপায়ে গড়া এক একটা সমবায়ই হউক, এইরূপ এক একটা শাসনপদ্ধতি সকল সমাজেরই থাকিবে, না থাকিলে সমাজ চলে না। সমষ্টির এই শাসন প্রযুক্ত হইবে, বিভিন্ন ব্যষ্টির উপরে, এবং যেখানে স্বাভাবিক গুণকর্ম্মাদির ভেদে বিভিন্ন শ্রেণী সমষ্টিশরীরের বিভিন্ন অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেখানে কেবল ব্যষ্টির উপরে নয়, বহু ব্যষ্টি লইয়া এক একটি এই সব শ্রেণী বা অঙ্গেরও উপরে। এই শাসনের লক্ষ্য সমাজের স্থিতি রক্ষা, যাহাতে *ব্যষ্টিভাবে ও সম্প্রদায়ভাবে সকলেরই মঙ্গল হইতে পারে।*

ব্যষ্টিভাবে ও সম্প্রদায়ভাবে সকলেরই মঙ্গল যাহা, তাহাতে *মোট সমষ্টিরও মঙ্গল।* কারণ ইহাদের লইয়াই যে সমষ্টি, এ কথাটা সকলেই সহজ বুঝিতে পারেন। তবে এই 'ইহারা' কারা? কেবল বর্ত্তমানের জনগণ কি? না, তা নয়। একটা সমষ্টির বা সমাজের জীবনও কেবল বর্ত্তমানের জনগণ লইয়া নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুদূর এক অতীত হইতে প্রত্যেক সমষ্টির জীবনধারা চলিয়া আসিতেছে, বর্ত্তমানে চলিতেছে, ভবিষ্যতেও বহু যুগ আরও চলিবে। ব্যষ্টি ভাবে কত লোকের জীবনের আশ্রয় ইহা ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে। সুতরাং এই সমষ্টি বা সমাজ বর্ত্তমানের কেবল বহুব্যষ্টির একটা সাময়িক সমবায় মাত্র নয়; ইহার জীবনকে বুঝিতে হইলে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের একটা ধারাবাহিক সমগ্রতায় ইহাকে ধরিয়া নিতে হইবে। এই সমগ্রতার মূর্ত্তিই সমষ্টির মূর্ত্তি। সমগ্রতায় ইহার একটা বিশিষ্ট জীবনও

আছে,—যাহা কেবল এক একটি ব্যষ্টির জীবন হইতে নয়; এক দেশের অধিবাসী এক সমাজভুক্ত অগণ্য জনগণের পৃথক পৃথক ব্যক্তিগত জীবন অথবা এই সব ব্যক্তিগত জীবনের একটা কৃত্রিম সমষ্টি যদি কল্পনা করা যায়, তাহা হইতেও, পৃথক্ এক বস্তু। কেবল পৃথক্ও নয়; তত্ত্বদর্শী কেহ কেহ বলেন, তাহার অতীত, তাহা হইতে বৃহত্তর, উচ্চতর এক বস্তু,—পরমাত্মায় জীবাত্মার ন্যায়, যাহাতে বা যাহাহইতে অসংখ্য এই সব ব্যষ্টিজীবন অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং যাহাতে আশ্রিত আছে। ইহাই প্রকৃত পক্ষে সমাজের বা social organism-এর সূক্ষ্ম প্রাণময় দেহ, তার বহির্ম্মূর্ত্তির ধারক। তবে সমাজজীবনের এইরূপ একটা অতীন্দ্রিয় সত্তাকে সকলে স্বীকার করুন কি না করুন, ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল ব্যষ্টি জীবনের একটা ধারাবাহিক ও সংহত সমগ্রতাই যে সমাজ বা সমষ্টির মূর্ত্তি, এবং এই ধারাবাহিকতার ও সংহতির যে একটা নৈসর্গিক ভিত্তি আছে, এই সত্যকে কেহই বড় অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সমষ্টির মঙ্গল বলিতে তার সমগ্রতায় মোট এই জীবনের মঙ্গলই বুঝিতে হইবে, এবং এই ভাবে এই অর্থে তাহার সঙ্গে মোট ব্যষ্টি জীবনের মঙ্গলের বিরোধ কিছু থাকিতে পারে না।

তা পারে না, তবে সময় বিশেষে ও অবস্থা বিশেষে ইহার সঙ্গে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির পার্থিব স্বার্থের বিরোধ ঘটিতে পারে। কিন্তু পার্থিব স্বার্থ সাধনই মাত্র জীবনের মঙ্গল নয়, প্রকৃত মঙ্গল ধর্ম্মপালনে জীবনের কৃতার্থতায়। স্বার্থের ভোগে সাময়িক যে আনন্দ, তার অপেক্ষা ধর্ম্মপালনে সর্ব্বস্বত্যাগের আনন্দ অনেক বড়। তাই কখনও অবস্থার বিপর্য্যয়ে সমাজের মঙ্গল ব্যষ্টির উপরে বহু স্বার্থত্যাগের, বহু কঠোর সাধনার দাবী করে। যাহারা স্বেচ্ছায় এই দাবীর দেনা দেয়, দিয়া ধন্য হয়, তাহাদের সম্বন্ধে কোনও কথা নাই। কিন্তু যাহারা না দেয়, দিতে না চায়, তাহাদের নিকট হইতে প্রয়োজন হইলে বলে এই দাবী কাজেই সমাজকে আদায় করিয়া নিতে হয়। ব্যষ্টিভাবে এই সব লোকের পক্ষে যতই তাহা আপাত দুঃখকর হউক, যতই তাহার স্বাতন্ত্র্যের স্ফুর্ত্তি

ব্যাহত হইল বলিয়া মনে হউক, সমষ্টির মোট মঙ্গল এবং সেই মঙ্গলে বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যতে পুরুষপরম্পরায় বহু ব্যষ্টির, কেবল বহু ব্যষ্টির কেন, সকল ব্যষ্টিরই প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে।

তাই বলিতেছিলাম, ব্যষ্টির মঙ্গলের নয়, ধর্ম্মের নয়, সময়ে সময়ে বিশেষ বিশেষ ব্যষ্টির স্বার্থের মাত্র একটা বিরোধ সমষ্টির মঙ্গলের সঙ্গে দেখা যায়। মোহভ্রান্ত যারা, কেবল বর্ত্তমানের ঐহিক স্বার্থের প্রলোভনে প্রলুব্ধ যারা, তারাই মনে করে ব্যষ্টির মঙ্গলের সঙ্গে সমষ্টির মঙ্গলের এই স্থলে বিরোধ ঘটিল।

কিন্তু সমষ্টি যদি তার ধর্ম্মপালন না করে, মঙ্গলের পথে যদি না চলে? সমষ্টির ধর্ম্মরক্ষক, ধর্ম্মের অভিভাবক যাঁহারা, তাঁহারা যদি ধর্ম্মের মর্য্যাদা অপেক্ষা আপনাদের স্বার্থের হিসাব বেশী করেন? যে পদ্ধতি এই ধর্ম্মের যন্ত্রস্বরূপ, তাহা যদি ব্যষ্টির অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে, আপন মাহাত্ম্যের অত্যধিক গুরুত্বের অভিমানে ব্যষ্টির মর্য্যাদাকে, তার অধিকারকে, অবহেলা করে? তখন কি হইবে? সমষ্টির ধর্ম্ম কেবল শাসন নয়, ব্যষ্টিকে তার অধীন রাখা নয়; আবার ব্যষ্টির ধর্ম্মও কেবল সমষ্টির আনুগত্য নয়, সমষ্টির স্বরূপে আপনাকে একেবারে লোপ করিয়া দেওয়া নয়। তার আপনারও একটা বিশিষ্ট স্বরূপ আছে, বিশিষ্ট একটা লক্ষ্যের সাধনে জীবনের একটা কৃতার্থতাও তার চাই। এই সিদ্ধির পথে, কোনওরূপ বাধা হইয়া দাঁড়ান নয়, সহায়তা করাই সমষ্টি ধর্ম্মের বড় একটি কর্ত্তব্য। সমষ্টি যদি এই কর্ত্তব্য পালন না করে, ব্যষ্টির বিশিষ্টতার পরিণতির পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায়, তখন সমষ্টির সঙ্গে তার বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। এ বিরোধও সমষ্টির ধর্ম্মের সঙ্গে নয়, মঙ্গলের সঙ্গে নয়,—সেই ধর্ম্মের অপ-ব্যবহারের সঙ্গে, ধর্ম্মের দণ্ড যাঁহাদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে, তাঁহাদের স্বার্থের সঙ্গে, ব্যষ্টির ধর্ম্মের ও ব্যষ্টির মঙ্গলের বিরোধ।

যেমন একদিকে সমষ্টির ধর্ম্মের ও সমষ্টির মঙ্গলের সঙ্গে ব্যষ্টির স্বার্থের বিরোধ ঘটে ও ঘটিতে পারে; অন্য দিকেও তেমনই আবার সমষ্টির এই অনাচারের সঙ্গে ব্যষ্টির ধর্ম্মের ও মঙ্গলের বিরোধ ঘটিতে পারে। সমষ্টিধর্ম্মের প্রভুত্ব বা social authorityর সঙ্গে ব্যষ্টির অধিকারের বা individual libertyর বিরোধ যে অনেকস্থলে ঘটে, তার মূলতত্ত্বই ইহা। উভয়ের সামঞ্জস্য যে সমষ্টিতে যত দেখা যাইবে, সমষ্টির শক্তি ও গৌরব সেখানে তত বেশী। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ইংরেজ সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বেঞ্জামিন কিডের একটি উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"Other things being equal, the most vigorous social systems are those in which are combined the most effective subordination of the individual to the Social Organism with the highest development of his own personalty (Social Evolution, Benjamin Kidd, chap· 11, p. 70.) *

অর্থাৎ, অন্যান্য অবস্থা যেখানে সমান আছে, সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী সমাজ তাহাই, যেখানে social organism বা সমাজশরীরের স্বার্থ বা মঙ্গলের অধীন হইয়া ব্যষ্টি-মানবের স্বার্থসাধন চেষ্টা চলিতেছে, অথচ তার ব্যক্তিত্বের মহিমাবিকাশও যতদূর হইতে পারে, তারও অবসর আছে।

উক্ত মন্তব্যের শেষোক্ত কথাটির দিকে পাঠকবর্গের মনোযোগ আমি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিতে চাই। অর্থাৎ সমষ্টির মঙ্গল অব্যাহত রাখিয়া ব্যষ্টির ব্যক্তিত্বের মহিমাবিকাশের অবসর যতটা থাকিতে পারে, তাহা থাকা প্রয়োজন, এই যে কথাটি তিনি বলিয়াছেন, তার দিকে। হাঁ, তাহা থাকিবে, থাকা চাই। কারণ ব্যষ্টিরও ত একটা বিশিষ্ট স্বরূপ আছে, তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের মহিমাও কম নয়। তার

---

* পরবর্ত্তী প্রবন্ধের শেষে টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

বুদ্ধির অধিকারও যথেষ্ট। ব্যষ্টি যেমন বহু রকমে সমষ্টির কাছে ঋণী, বহু মঙ্গলের জন্য সমষ্টির উপরে নির্ভরশীল,—তেমনই আবার সমষ্টির শক্তি, সমষ্টির মহিমা, সমষ্টির সুখসৌভাগ্য, ব্যষ্টির শক্তি, ব্যষ্টির মহিমা, ব্যষ্টির সুখসৌভাগ্যেরই সাপেক্ষ। বস্তুতঃ ব্যষ্টি-জীবন যেখানে দীনহীন দুর্ব্বল ও নির্জ্জীব, প্রতিভাবর্জ্জিত, ধর্ম্মে মূঢ়, কর্ম্মে নিরুদ্যম, সেখানে সমষ্টির উন্নত অবস্থার কোনও অর্থই হইতে পারে না। কারণ ব্যষ্টিকে লইয়া, ব্যষ্টিকে জাড়াইয়াই সমষ্টি। আপন এই মহিমা বিকাশে ব্যষ্টিকে বহু পরিমাণে তার নিজের বুদ্ধিবৃত্তির নির্দ্দেশের উপরে, চিত্তবৃত্তির প্রেরণার উপরে নির্ভর করিতে হয়। সমাজশাসন বা Social authority যদি এই বুদ্ধিবৃত্তির ও চিত্তবৃত্তির যথোচিত উন্মেষের এবং যথাযোগ্য ক্ষেত্রে কর্ম্মশক্তি প্রকাশের সহায় না হইয়া অন্তরায় হয়, তবে বলিতে হইবে, সে শাসন তারা স্বধর্ম্ম পালন করে না।

এ দেশের তত্ত্ববিদ্যার মতে পরমাত্মার জীবাত্মারূপ অভিব্যক্তিতেই ব্যষ্টির এই স্বরূপ হইয়াছে। তাই যত জীব, তত শিব, এই একটা প্রবাদও এদেশে প্রচলিত হইয়াছে। এই শিবত্বের অধিকারে জীবকে কেহ বঞ্চিত রাখিতে পারে না। কিন্তু এই অধিকার ভোগ করিতে হইলে জীবকে আগে তাহার এই শিবত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে। এই শিবত্বই জীবের সর্ব্বোচ্চ মহিমা, ইহার উপলব্ধিতেই তাহার মহিমার সর্ব্বোচ্চ বিকাশ। কিন্তু মায়ার যে আবরণ এই শিবত্বের জ্যোতিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা অপসৃত না হইলে এই জ্যোতি কাহারও মধ্যে ফুটিয়া বাহির হয় না, শিবত্বের উপলব্ধিও তাহার ঘটে না। যত দিন না ঘটে, এই অধিকার ভোগে তাহার দাবী কিছু নাই। এই আবরণের ঘনত্ব যে জীবে যত বেশী, ইহাকে ভেদ করা তার পক্ষে তত কঠিন হইবে। হিন্দু ঋষিগণ বলিয়াছেন, একজন্মে ইহা ঘটে না; জন্ম জন্ম সাধনার সাপেক্ষ ইহা। বস্তুতঃ এই পৃথিবীতে আমাদের চাক্ষুষ এই জন্মে যত লোক আমরা দেখিতে

পাই, তাহাদের মধ্যে এই আবরণের ঘনত্বের স্বাভাবিক বৈষম্য যে কত রকম ও কত বেশী রহিয়াছে, তাহা সকলেই আমরা বুঝিতে পারি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র স্বাভাবিক এই চারি বর্ণের মূলই এই বৈষম্য।

এই সত্য যদি আমরা অনুভব করি, স্বীকার করি, তবে শিবত্বে সকল জীবের বর্ত্তমান এই জীবনে নির্ব্বিশেষ অধিকার আমরা মানিতে পারি না। কিন্তু এই শিবত্ব উপলব্ধির পথে যে যতদূর অগ্রসর হইতে পারে, তার সে অবসর ও অধিকারও সমষ্টির ধর্ম্ম বিধানে থাকা উচিত।

আবার ব্যষ্টি যেমন শিব, সমষ্টিও পরমশিব অথবা তাহার এক একটি বৃহত্তর অংশ। সুতরাং সমষ্টির ধর্ম্মের অধীন হইয়া চলিলে তার শিবত্বের অধিকার ক্ষুন্ন হইতে পারে না। শিবে ও পরমশিবে, জীবাত্মায় ও পরমাত্মার, ব্যষ্টিতে ও সমষ্টিতে প্রকৃত সম্বন্ধের সত্য যিনি অনুভব করিয়াছেন, উভয়ের ধর্ম্মে বাস্তবিক কোন বিরোধ তিনি দেখিবেন না। উভয়ের প্রতি উভয়ের কর্ত্তব্য-নিরূপণে, উভয় ধর্ম্মের সামঞ্জস্যবিধানে, তাঁহারাই অধিকারী। এই সত্য দর্শন এবং তদনুসারে উভয়ের সত্তার পরস্পর সাপেক্ষ ধর্ম্মনির্ণয় মোহ-মুক্ত নির্ম্মল মানব বুদ্ধির বিকাশ তার সর্ব্বোচ্চ মাত্রায় গিয়া উঠিলেই করিতে পারে। সেই highest aspect of Rationalism—কেহ কেহ যাহাকে 'Pure Reason' এই নামও দিয়াছেন—তাহার স্বাভাবই ইহা, এই সত্য তাহার জ্ঞানদৃষ্টিতে স্বতঃই প্রতিভাত হইবে।

এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ইংরেজ আচার্য্য হাক্‌স্লি (Huxley) সাহেবের একটি উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।—

"The one supreme, hegemonic faculty which constitutes the essential 'nature' of man, is most nearly represented by that which, in the language of a later philosophy, has been called the pure reason. It is

this 'nature' which holds up the ideal of the supreme good and demands absolute submission of the will to its behests. It is this which commands all men to love one another, to return good for evil, to regard one another as fellow citizens of one great state."

[Evolution and Ethics, Huxley, chap 11. p. 74-75.]

[অনুবাদ—উচ্চতম যে ধীবৃত্তি বা প্রজ্ঞা মানবকে তার জীবনের পথে পরিচালিত করে, জীবনের ধর্ম্ম তার নির্দ্দেশ করে—(অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্রের ভাষায় মানবের মাথায় তার 'গুরু' যাহা)—মানব প্রকৃতির বিশেষত্বই যাহার উপরে নির্ভর করিতেছে, যাহা না হইলে মানবের মানবতত্ত্বই থাকে না,—তাহা সেই বস্তু যাহাকে আধুনিক দার্শনিক কেহ কেহ pure reason এই নামে ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন। মানবের এই প্রকৃতি বা প্রকৃতির উচ্চতম বৃত্তি এই 'ধী' বা প্রজ্ঞাই শ্রেষ্ঠ মঙ্গলের আদর্শ তাহার সম্মুখে প্রকট করে, এবং তাহার ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে তার আদেশ মানিয়া চলে, ইহা চায়। পরস্পরকে ভালবাসিতে, অনিষ্টের প্রতিদানে অন্যের ইষ্ট সাধন করিতে, এক রাষ্ট্রের সমান প্রজা বা এক সমাজের সমান সামাজিকরূপে পরস্পরকে গ্রহণ করিতে, ইহাই মানবগণকে সর্ব্বদা প্রেরিত করে।]

যাহা ভাল বুঝি, যাহা ভাল লাগে, তাহাই করিব, নিজের ইচ্ছামত চলিব, স্বভাবতঃই মানুষের অন্তরে এমন একটা ঝোঁক আছে, তার স্বভাবেরই বড় একটি দিক্ ইহা। Huxley সাহেব তাঁহার Evolution and Ethics নামক গ্রন্থে এই ভাবে প্রণোদিত মানবকে natural man এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। আবার সেই মানুষই উন্নত বুদ্ধির নির্দ্দেশে এবং উন্নত চিত্তবৃত্তির প্রেরণায় বোঝে ও অনুভব করে, ইহা সুনীতির পথ নহে, মঙ্গলের পথ নহে,—বুঝিয়া তার এই স্বেচ্ছাচারের ভাবকে সংযত করিতে চায়। এই সংযমের দিক হইতে মানুষকে তিনি

ethical man এই নাম দিয়াছেন। এই মানব কখনও natural man, কখনও ethical man। তাহার প্রকৃতির দুইটি দিক, দুইটি ভাব, এই দুইটি নামে প্রকাশ করিতেছে। ভারতীয় ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মানবপ্রকৃতির এই দুইটি দিক বা ভাবকে জীবনের প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তি-মার্গ নাম দিয়াছেন। প্রবৃত্তি মানবকে উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারের দিকে লইয়া যাইতে চায়, নিবৃত্তি তাহাকে সংযত করিয়া ধর্ম্মের পথে, সুনীতির পথে, ফিরাইয়া আনে। মানুষ নিজের অন্তরেই প্রবৃত্তিকে সংযত করিবে তার নিজেরই নিবৃত্তির বুদ্ধি ও প্রেরণার বলে; natural manকে সংযত করিবে,তারই অন্তরের ethical man। এই ethicnal manকে, মানুষের স্বাভাবিক নিবৃত্তির বুদ্ধি ও প্রেরণাকে, একেবারে পিষিয়া ফেলিয়া পোষমানা পশুর ন্যায় কেবল natural manকে শাসনের নিগড়ে চালাইতে প্রয়াসী হওয়া সমষ্টিধর্ম্মের কাজ নহে। তার প্রকৃত সার্থকতা হইতেছে, মানুষের মধ্যে যাহাতে এই ethical man, এই নিবৃত্তির বুদ্ধি ও প্রেরণা, জাগ্রত হয়,—এবং তাহারই শক্তিতে natural manকে, প্রবৃত্তির উদ্দামগতিকে, সে সংযত করে। সমাজধর্ম্ম যদি তার কর্ম্মসাধনে এই সার্থকতা দেখাইতে পারে, জাগ্রত ethical man আপনিই বুঝিবে, তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তির ধর্ম্মে সংযত করিতে পারিলেই মানবধর্ম্ম তার পালন করা হইবে; মানব-চরিত্রের উচ্চ মহিমায় সে ধন্য হইবে। স্বেচ্ছায়, নিজের অন্তরাত্মার প্রেরণাতেই সে তখন সমাজ ধর্ম্মপালন করিবে, individual libertyর অধিকারই তখন তাকে তার বশ্যতা স্বীকার করাইবে, তার বিদ্রোহী করিয়া তুলিবে না। আবার স্বীকার করিয়াও,বিদ্রোহী না হইয়াও, জীবনের বহুবিধ কর্ম্মক্ষেত্র এমন আছে, যাহাতে তার বুদ্ধির ও চিত্তবৃত্তির স্বাধীন স্ফূর্ত্তির যথেষ্ট অবসর সে পায়, তার আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। সত্যে আশ্রিত সমাজ ধর্ম্ম কেবল তার মঙ্গলে যে দিকে যতটুকু প্রয়োজন, সেই দিকে ততটুকু মাত্র মানবের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের অধিকারকে, individual libertyকে, তার নীতির ও বিধির বন্ধনের মধ্যে আনে।

ব্যষ্টিসমূহের উন্নত চিত্তবৃত্তি যাহাতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যথাপ্রয়োজন সমষ্টির ধর্ম্ম মানিয়া চলে এবং অন্যথা তার স্ফূর্ত্তিতে বাধা না পায়, উন্নত সমাজধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্যই থাকিবে এই দিকে ; তার সকল শিক্ষাদীক্ষা, সকল প্রতিষ্ঠান, এই লক্ষ্য সাধনের দিকেই প্রবর্ত্তিত হইবে। শাসন ও দণ্ডের বিধি, বাধ্যতার নীতি, কেবল সেই সেই স্থলেই প্রযুক্ত হইবে, যেখানে এরূপ প্রযত্ন সত্ত্বেও ব্যষ্টির জীবনে উন্নত চিত্তবৃত্তির উন্মেষ হয় না, ইংরেজিতে যাহাকে anti-social tendencies বলে, সেই সব যাহাদের চিত্তে অতি প্রবল,—জীবের শিবত্ব যাহাদের মধ্যে অতি ঘন তামস আবরণে আচ্ছন্ন। এরূপ লোক সব সমাজেই আছে।

সমষ্টির ও ব্যষ্টির মধ্যে সকল বিরোধের সামঞ্জস্য এইভাবেই সংঘটিত হইতে পারে। যেখানে এই সামঞ্জস্যের অভাব, সমষ্টির শাসন ব্যষ্টির ন্যায্য অধিকারের সীমাকে লঙ্ঘন করে, তার উন্নত স্বভাবের শক্তি ও বৃত্তিসমূহের পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায়,—সমষ্টির শাসনের অন্যায় প্রভুত্বের সঙ্গে ব্যষ্টির বিরোধ, তার বিরুদ্ধে ব্যষ্টির বিদ্রোহ, সেখানে অনিবার্য্য।

সমষ্টিশক্তির একটা প্রভুত্ব ব্যষ্টির উপরে আছে, ন'হলে সমষ্টি চলে না। একে অন্যের ন্যায্য অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিলে, প্রবল দুর্ব্বলকে পীড়ন করিলে, তাহার শাসন আবশ্যক। এই শক্তি না করিলে কে তাহা করিবে? আবার সকলেরই বহু সমান মঙ্গল সকলে মিলিয়া সাধন করিতে হয়, সমান স্বার্থ সকলে মিলিয়া রক্ষা করিতে হয়। সকলেরই কর্ম্মের ভাগ ইহার মধ্যে আছে; স্বেচ্ছায় কেহ না করিলে তাহা আদায় করিয়া নিতে হয়। ইহার বিরোধী কেহ হইলে, এই বিরোধকেও দমন করিতে হয়। আবার এই কর্ম্মের একটা পদ্ধতি চাই, তার সম্পাদনে একটা শৃঙ্খলা চাই। ইহাতে যে সমষ্টি যত বড়, তার পক্ষে তেমনই বড় একটা organisation বা শক্তিসংস্থাপনা প্রয়োজন। মোটামুটি এ সব সম্বন্ধে মতদ্বৈধ বড় কিছু নাই। কিন্তু এই সব organisationএর বা শক্তিসংস্থাপনার আকার কিরূপ হইবে, কি নিয়মে

কি ভাবে তাহা গড়িয়া উঠিবে বা গড়া হইবে,—কে গড়িবে, কি নিয়মে কি ভাবে চলিবে, কে চালাইবে,—ব্যষ্টির উপরে তাহার প্রভুত্বের সীমা কত দূর, এবং ব্যক্তিগত অধিকারে জনগণেরই বা এই গঠন ও পরিচালনার উপরে কর্ত্তৃত্ব কিরূপ, মত দ্বৈধ যাহা কিছু আছে, প্রধানতঃ তাহা এই সব বিষয় লইয়া। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে এই কথাগুলিরই যথাসাধ্য আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

সমষ্টিধর্ম্মের স্বরূপ—

গুণকর্ম্মভেদে ব্যষ্টির অধিকার।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিশ্বপ্রকৃতির অভিব্যক্তির সঙ্গে, মানবের সমষ্টি বা সমাজ যেমন গড়িয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে তার একটা ধর্ম্মও গড়িয়া উঠে। সমষ্টির যে স্বরূপ, তাহা তাহার অঙ্গবিন্যাসের রীতিতে এবং যাহাদের লইয়া এই সমষ্টি, সেই সব ব্যষ্টির সাধারণ চরিত্রে ও জীবন-যাত্রার আদর্শে প্রকাশ পায়। আর তার আশ্রয় বা ধর্ম্ম মূল সেই শক্তি, *যাহা সেই স্বরূপে সমষ্টিকে প্রকাশ করে*, স্বরূপে তাহাকে রক্ষা করে, আর তার স্বাভাবিক পরিণতির পথে তাহাকে পরিচালিত করে।

এই আশ্রয় বা ধর্ম্মের একদিকে যেমন একটা বহিঃস্বরূপ আছে, আবার অন্য দিকে তেমন একটা অন্তস্তত্ত্বও আছে। এই বহিঃস্বরূপে সর্ব্বত্রই ইহা একটা রক্ষণ পোষণ পরিচালন ও শাসনের শক্তিপদ্ধতির (protecting, fostering regulating ও controlling, এক কথায় governing organisationএর) আকারে দেখা দেয়। কেন এই আকারে দেখা দেয়, ইহার এই প্রভুত্বের অধিকারের মূল ভিত্তি কি, ইহার মঙ্গলের তাৎপর্য্য কি,—কোথা হইতে, বিশ্বনীতির কোন্ রহস্য হইতে তাহা আসিতেছে, ইত্যাদি সব কথাই ইহার অন্তস্তত্ত্বের কথা। প্রাচীন হিন্দু সাহিত্যে 'ধর্ম্ম' কথাটিতে একদিকে যেমন ইহার অন্তস্তত্ত্বের রহস্যকেও বুঝায়, অন্যদিকে আবার ইহার বহিঃস্বরূপ এই যে শক্তিস্থাপনা-পদ্ধতি, তাহাকেও বুঝায়। ইংরেজীতে এই পদ্ধতিকে বুঝাইতে Social Policy * এই নামটি অনেকে ব্যবহার করেন।

---

* আর একটি নাম প্রচলিত আছে, Social Authority। কিন্তু এই নাম প্রধানতঃ সমষ্টির শাসন প্রভুত্বেরই দ্যোতক। সমষ্টির রক্ষণ পোষণ পরিচালন ও শাসন প্রভৃতি লইয়া সমগ্র ধর্ম্মের শক্তিস্থাপনাকে বুঝাইতে Social Policy নামের যেরূপ একটা সার্থকতা আছে, Social Authorityর তাহা নাই।

'ধর্ম্ম' কথাটির মৌলিক অর্থ অবশ্য যাহা লোকস্থিতিকে ধারণ করিয়া রাখে। কিন্তু নানা প্রসঙ্গে ইহার প্রয়োগ অতি ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে। ইহার তাৎপর্য্যও অতি গভীর। তারপর ইহার একটা বিশিষ্ট ভাব বা রূপ 'রিলিজন' (Religion) এই অর্থে ইহার প্রয়োগ এত বেশী প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে, যে কোনও সমাজের প্রসঙ্গে 'ধর্ম্ম' কথাটা তুলিলে, এই 'রিলিজন' (Religion) কথাটাই সকলের আগে মনে উঠে। তবে 'রিলিজন' (Religion) কথাটিও লাটিন্ 'legere' 'বন্ধন করা' এই মূল হইতে ব্যুৎপন্ন। সুতরাং মৌলিক অর্থে 'ধর্ম্মে'ও 'রিলিজনে' কোনও পার্থক্য বোধহয় নাই। কিন্তু ভগবৎতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিশ্বাস এবং ভগবদুপসনার পদ্ধতি প্রভৃতি যে সব বিষয় মানবাত্মার ভক্তিবৃত্তির আশ্রয় হইয়াছে, জীবনের চরম কৃতার্থতা মানব যাহার সাধনায় পাইতে চায়, তাহাই এই রিলিজন (Religion) কথাটির অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। দাঁড়াইয়া গেলেও, এই রিলিজিন (Religion এর) প্রভাব মানবের উপরে এত বড় যে ইহাকেই আশ্রয় করিয়া অনেক সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে; এবং ইহাই সেই সেই স্থলে Social Policyর প্রধান ভিত্তি হইয়াছে। সুতরাং এই মৌলিক অর্থেই ইহার এই নামের সার্থকতা অনেক বেশী। যাহা হউক, 'রিলিজন' কথাটি এখন বিশিষ্ট এই অর্থের সীমার মধ্যে আসিয়া পড়ায়, যাহা এই 'রিলিজন' সম্বন্ধীয় বা religious নয়, তাহা বুঝাইতে secular কথাটি ইংরাজীতে ব্যবহৃত হয়। Religious হইতে পৃথক্ secular এই যে নাম মানবজীবনের বৃহৎ এক কর্ম্ম-বিভাগের সংস্রবে পাশ্চাত্য অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়, জীবনের এরূপ কোনও পৃথক্ বিভাগ হিন্দুসমাজে স্বীকৃত হয় না। হিন্দুরা দেখিয়াছেন, মানব-জীবন তার সমগ্রতায় একটা organic whole, অঙ্গাঙ্গীভাবে সংহত এক বস্তু। তার ব্যষ্টি জীবন ও সমষ্টি জীবন সম্বন্ধীয় যাহা কিছু, সবই এক এই ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। নীতিশাস্ত্র ও অর্থ শাস্ত্র নামে যে সব শাস্ত্র আছে, সব মোট এক ধর্ম্মশাস্ত্রেরই বিভিন্ন অঙ্গ মাত্র। নীতিশাস্ত্র ও

অর্থশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ও আলোচ্য বিষয় সমূহ ধর্ম্মশাস্ত্র হইতেও বাদ যায় নাই। সব লইয়াই ধর্ম্ম, মোট Social Policyই ধর্ম্ম, ধর্ম্মেরই একটা বহিঃপ্রকাশ। এই ধর্ম্ম নাম হিন্দু Social Policyর বিশিষ্টতাও প্রকাশ করিতেছে। তবে Social Policy বলিতে যাহা বুঝায়, কেবল 'ধর্ম্ম' নামে তাহাকে ব্যক্ত করিতে চাহিলে অর্থ বুঝিতে একটু গোলমাল হইতে পারে। কারণ সাধারণ ব্যবহারে ইহার অন্য নানা রকম অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তারপর religionরূপ বিশিষ্ট অর্থেও কথাটি আমাকে অনেকস্থলে ব্যবহার করিতে হইবে। তাই 'সমাজধর্ম্ম', কখনও বা ইংরেজি 'Social Policy,' এই নামই এই প্রসঙ্গে ব্যবহার করা বোধ হয় সঙ্গত হইবে।

এই ধর্ম্ম তার বহিরঙ্গে, Social Policyরূপে, নানা সমাজে নানা আকারে ও প্রকারে দেখা দিয়াছে। প্রাচীন ইয়োরোপে, গ্রীসেও রোমে,ইহা প্রধানতঃ State বা রাষ্ট্রসংহতির রূপে প্রকাশ পায়। Religion বা ধর্ম্ম এই Stateএর অঙ্গভুক্ত ছিল; ইহার উপরে প্রভুত্ব করিত না, ইহার সঙ্গে চলিত মাত্র। প্রাচীন মিসর পারস্য প্রভৃতি দেশে State বা রাষ্ট্রসংহতির আকারেই এই Social Policyর প্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু Religion বা ধর্ম্মের একটা প্রধান্য ইহার উপরে ছিল। য়িহুদি ও মুশলমান সমাজে State বা রাষ্ট্রসংহতি Religion বা ধর্ম্মেরই একটা যন্ত্ররূপে প্রকাশ পায়। ধর্ম্মের যে শাসন, তাহা এই যন্ত্রের বলে বা সাহায্যে পরিচালিত হইত। বিশিষ্ট এক একটি ধর্ম্মাবলম্বী য়িহুদি ও মুসলমানের সমাজ এবং য়িহুদি ও মুসলমানের ষ্টেট্, উভয়ই প্রায় একই বস্তুর ন্যায় হইয়া দাঁড়ায়। ইয়োরোপায় পণ্ডিতবর্গ যাহাকে Theocratic State * বলেন, তার বিশিষ্টতা এই দুই সমাজের শাসনে যেরূপ প্রকাশ পায়. এরূপ বোধ হয় প্রাচীন আর কোনও সমাজে পায় নাই। এই ষ্টেট্ ধর্ম্ম হইতে অবিচ্ছিন্ন বস্তু।

* অবতরণিকা ৫৮ পৃষ্ঠা।

ধর্ম্মকে মানিতে হইলে এই ষ্টেট্‌কেও মানিতে হয়। এই ভাবটা মুসলমানসমাজেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং মূল এই নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া অতি ব্যাপকভাবে এখনও এই সমাজ পৃথিবীতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রাচীন য়িহুদিসমাজ বিশিষ্ট এক ধর্ম্মাবলম্বী ক্ষুদ্র একটি জাতি বা raceএর বিশিষ্ট এক সমাজ ছিল। ইহাদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসংহতি প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে লুপ্ত হইয়াছে। বিশিষ্ট একরূপ ধর্ম্মমত, উপাসনা পদ্ধতি এবং আরও কতকগুলি আচারনিয়ম মাত্র লইয়া য়িহুদিরা একেবারে বিচ্ছিন্নভাবে নানা দেশে বাস করেন। যে দেশে যাঁহারা বাস করেন, অন্যান্য সকল বিষয়ে সেই দেশেরই অধিবাসীদের ন্যায় চলেন ফেরেন; এবং অনেক স্থলে ইহাদের বিশিষ্ট প্রকৃতি চিনিয়া নেওয়াও কঠিন হয়।

কিন্তু মুসলমান ধর্ম্ম ও সমাজ কোনও race বা nation-রূপ জাতিবিশেষের ধর্ম্ম ও সমাজ নহে। যে কোনও দেশের যে কোনও জাতীয় লোক মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তিনিই মুসলমান ও মুসলমানের সমাজভুক্ত ব্যক্তি, এবং ধর্ম্মবিধি অনুসারে তাঁহাকে মুসলমান-সমাজের প্রধান নায়কের প্রভুত্ব মানিতে হয়। এই নায়ক একাধারে মুসলমান সমাজের ধর্ম্মগুরু ও রাষ্ট্রপতি, কারণ মুসলমানের সমাজ ও রাষ্ট্রসংহতি ধর্ম্মতঃ একই বস্তু। হজরৎ মহম্মদ যখন তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন, সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রসংহতির আকারেই আদিম সেই মুসলমানসমাজ গড়িয়া উঠে। সেই সমাজের ধর্ম্মগুরু ও রাষ্ট্রপতি এই দুইরূপেই মহম্মদ তাহার উপরে প্রভুত্ব করেন। তাঁহার পর তাঁহার প্রতিনিধি বা খলিফারা এই দ্বিবিধ প্রভুত্বই ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে মুসলমানদের মধ্যে এক সম্প্রদায় তৎকালীন খলিফাদের এই অধিকার মানিতেন না। তবে খলিফাদের সাম্রাজ্যের অধিবাসী বলিয়া প্রজা যেমন *defacto* রাজার প্রভুত্বের অধীন থাকে, সেইরূপ ভাবে মাত্র খলিফাদের রাষ্ট্রশাসনের অধীন থাকিতেন। ইঁহারা সিয়া নামে পরিচিত। অপর এবং বৃহত্তর সম্প্রদায়ের

মাম সুন্নী। খলিফার উপাধি ও পদ যিনিই যখন গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারই সম্পূর্ণ সমাজপতিত্বের দাবী ইঁহারা স্বীকার করিয়াছেন, এবং এখনও করেন। বহু অবস্থাবিপর্য্যয়ের পর তুর্কীর সুলতানদের হস্তে এই খলিফার প্রভুত্ব ন্যস্ত হয়, এবং সর্ব্বদেশের সকল সুন্নী মুসলমান ধর্ম্মবিধি অনুসারে ইঁহাদের এই প্রভুত্ব মানিতে বাধ্য। কিন্তু কালক্রমে বিভিন্ন দেশের বহু মুসলমান অন্যান্য রাজাদের অধীন হইয়া পড়িয়াছেন। ঠিক *dejure* অর্থাৎ বিধিসঙ্গত না হইলেও, ইঁহারা তাহাদের *defacto* বা বাস্তব রাজা। প্রজারূপে শাসন না মানিয়া উপায় নাই, তাই মানেন। কিন্তু কাজি উলেমা প্রভৃতি শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ ইহা ঠিক ধর্ম্মবিধিসঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারেন না। তবে মানিয়া চলিতে হয়, তাই চলেন। তবু তাঁহাদের *defacto* রাজাদের সঙ্গে যদি খলিফাদের বিশেষ কিছু বিরোধ না ঘটে, একরকম করিয়া চলিয়া যায়। বিরোধ ঘটিলে ধর্ম্মানুগত মুসলমানের পক্ষে বড় কঠিন একটা সমস্যার সঙ্কট উপস্থিত হয়। ধর্ম্মবিধির সঙ্গে রাজবিধির, মুসলমান রূপে কর্ত্তব্যের সঙ্গে প্রজারূপে দায়িত্বের, বড় একটা বিরোধ ঘটে। এই বিরোধ এবং বিরোধের সঙ্কটই ভারতীয় বর্ত্তমান এই খালিফাৎ আন্দোলনের মূল নিদান। ভারতের মুসলমান বেশীর ভাগই সুন্নী।

প্রাচীন রোমক যুগের অবসানের পর নূতন যে যুগ ইয়োরোপে আসে এবং তাহাতে নূতন যে সমাজ ইয়োরোপে গড়িয়া উঠে, ফরাসীবিপ্লব পর্য্যন্ত তাহারই একটা ক্রমাভিব্যক্তির ধারা চলিয়াছে। ফরাসীবিপ্লবের পর তাহার প্রভাবে সমাজজীবনের নীতির গুরুতর এক পরিবর্ত্তন হেতু সমাজশাসনের বা Social Authority-র প্রকৃতি ও লক্ষ্য অন্য রকম হইয়াছে, তাহার অধিকারের সীমাও অনেক সঙ্কুচিত হইয়াছে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও, মোটের উপর সমাজজীবনের সেই একই ধারা বহিতেছে। এক ফরাসীদেশে ব্যতীত আর কোথাও পুরাতন পদ্ধতিকে একেবারে ভাঙ্গিয়া নূতন একটা পদ্ধতিকে তার স্থান গ্রহণ করিতে হয় নাই। ফরাসীসমাজের এই নূতন পদ্ধতিকেও

অন্যান্য দেশের পদ্ধতির সঙ্গে আপনাকে মানাইয়া মিলাইয়া চলিতে হইয়াছে।

ফরাসীবিপ্লবের পূর্ব্বপর্য্যন্ত সমাজবিন্যাস যে কিরূপ ছিল, তার আশ্রয়স্বরূপ সমাজধর্ম্মের বা Social Policyর নীতি ও রীতি কি ছিল, কিভাবে তার ক্রিয়া পরিচালিত হইত, কেন এই বিপ্লব এবং বিপ্লবের সঙ্গে Rationalistic মতের প্রাদুর্ভাব হয়, তাহার বিস্তৃত আলোচনা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে করিব। তবে Social Authority বা সামাজিক শাসনপদ্ধতি রূপে তার বিশিষ্ট প্রকৃতি কিরূপ ছিল, তার সম্বন্ধে মোটমুটি দুই একটা কথা মাত্র এখানে বলিলে ভাল হয়।

পশ্চিম রোমক সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর খৃষ্টীয় দশমশতাব্দী হইতে যখন নব্য ইয়োরোপের অভ্যুত্থান আরম্ভ হয়, রোমক চার্চ্চ (The Roman Catholic Church) বা রোমক ধর্ম্ম-মহামণ্ডল ইয়োরোপীয় খৃষ্টান সমাজকে আপনার ধর্ম্মশাসনের প্রভুত্বাধীন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ষ্টেটের সহায়তা যে ইহাতে প্রয়োজন, তাহাও চার্চ্চ অনুভব করেন। কিন্তু পূর্ব্বতন রোমকসাম্রাজ্য বিলুপ্ত হওয়ায় সমাজের উপরে এরূপ কোনও ষ্টেট্ তখন পশ্চিম ইয়োরোপে ছিল না। তাই Holy Roman Empire (রোমক রাষ্ট্র-মহামণ্ডল বা ধর্ম্মরাজ্য) নামে নূতন এক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাও করা হয়। রোমক খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ভিত্তিতে যে Social Authority বা সমাজশাসন ইয়োরোপীয় খৃষ্টান সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহা এইরূপে দুইটি বিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল, ধর্ম্মশাসনবিভাগ ও রাষ্ট্রশাসনবিভাগ। দুই-ই ভগবদ্বিহিত শাসন এবং চার্চ্চ ও Empire (বা ধর্ম্মরাজ্য) হইল এই শাসনের দুইটি যন্ত্র। এই দুইটি যন্ত্রের কর্ত্তা পোপ ও সম্রাট্ দুইজনেই ভগবানের নিযুক্ত প্রতিনিধি বলিয়া ঘোষিত হইলেন। মুসলমান সমাজে খলিফার যে প্রভুত্ব, ইয়োরোপীয় খৃষ্টানসমাজে তাহা এই ভাবে দুই ভাগ হইয়া পোপ ও রোমক সম্রাট্ দুইজনের হাতে গিয়া পড়িল। দুই ভাগ হওয়ায় এই দ্বিবিধ প্রভুত্বের মধ্যে স্বভাবতঃই একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হয়।

রাষ্ট্রশাসন ধর্ম্মশাসনেরই অধীন ও তাহার একটি অঙ্গবিশেষ, এই বলিয়া পোপরা সর্ব্বময় প্রধানপ্রভুত্বের দাবী করেন, এবং তদুপলক্ষে ইঁহাদের সঙ্গে সম্রাটদের দীর্ঘকালব্যাপী ভীষণ এক সংগ্রামও হয়। সম্রাটরা এই সংগ্রামে পরাভূত হইলেও, পোপদের এই দাবী স্বীকার করেন নাই। অন্যান্য দেশের রাজারা কার্য্যতঃ সম্রাটের অধীন হইয়া না চলিলেও, রাজপদে তাঁহাদের ধর্ম্মতঃ দাবী ছিল সম্রাটেরই প্রতিনিধি বা সহযোগী বলিয়া, এবং ধর্ম্মবিধি অনুসারে যাজকদের কর্তৃত্বে রাজ্যে অভিষেকও তাঁহাদের হইত। ইঁহারাও কেহ খৃষ্টীয় রাষ্ট্রসংহতির উপরে পোপদের এই দাবী স্বীকার করেন নাই। পোপরাও কোনও দেশের উপরে আপনাদের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিতে প্রয়াস পান নাই। তাঁহাদের প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সম্রাটগণ। কিন্তু ইঁহারা একেবারে নিস্তেজ ও নগণ্য হইয়া পড়িয়াছেন; পোপদের উপরে কর্তৃত্ব দূরে থাক্, তাঁহাদের সঙ্গে কোনওরূপ সমকক্ষতার দাবীও আর করিতেন না। আপনাদের শক্তির ও পদগৌরবের পক্ষে ইহাই পোপরা যথেষ্ট মনে করিতেন।

ষ্টেট্ চার্চ্চের অধীন কি অন্তর্ভুক্ত না হউক, চার্চ্চকেও আপনার অধীন বা অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিতে পারে নাই। কখনও প্রতিযোগিতার ভাব দেখা গিয়াছে, কখনও পরস্পারের সহায়তাও উভয়ে করিয়াছেন, কিন্তু চার্চ্চ ও ষ্টেট্—ধর্ম্মসংহতি ও রাষ্ট্রসংহতি—ইয়োরোপীয় Social Policyর বা Authorityর এই দুই মূর্ত্তি, যার যার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া কতকটা co-ordinate ভাবে, নিজ নিজ অধিকার পরিচালনা করিয়াছেন। তাই ইয়োরোপায় সাহিত্যে সমাজশাসন সম্বন্ধীয় সকল আলোচনার প্রসঙ্গে 'চার্চ্চ' ও 'ষ্টেট্', এই দুইটি কথার ব্যবহার সর্ব্বদাই দেখা যায়।

চার্চ্চ এবং ষ্টেট্ উভয়ের এই co-ordinate বা সমান সহযোগিতার সম্বন্ধ, ধর্ম্মশাসনে রোমক চার্চ্চের একাধিপত্য যতদিন ছিল, ততদিনই বর্ত্তমান ছিল। ষোড়শশতাব্দীর মধ্যভাগে প্রটেষ্টাণ্ট

বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, এবং প্রায় সকল দেশেরই বহু খৃষ্টান রোমক চার্চ্চের অধীনতা বর্জ্জন করেন। যে সব দেশে এই বিদ্রোহ প্রবল হয়, সেই সব দেশে পৃথক্ পৃথক্ প্রটেষ্টাণ্ট চার্চ্চের স্থাপনা হয়। কিন্তু এই সব প্রটেষ্টাণ্ট চার্চ্চগুলির কর্ত্তা কাহারা হইবেন? ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া পোপরা যে দাবীতে রোমক চার্চ্চের উপরে প্রভুত্ব করিতেন, সেরূপ দাবী সেই যুগের ধর্ম্মসংস্কারক কেহই করিতে পারেন না। তারপর রোমক চার্চ্চ ও তাহার অনুগত রাজাদের সঙ্গে ঘোর একটা সংঘর্ষও প্রটেষ্টাণ্টদের উপস্থিত হইল। আত্মরক্ষার জন্য রাজসহায়তা প্রয়োজন। তাই প্রটেষ্টাণ্ট চার্চ্চগুলিকে রাজশাসনের অধীন ও ষ্টেটের অঙ্গভুক্ত করা হইল। রাজারাই হইলেন চার্চ্চের কর্ত্তা, চার্চ্চগুলির নামও হইল ষ্টেট্-চার্চ্চ (State-church) অর্থাৎ ষ্টেটের অধীন বা অঙ্গভুক্ত চার্চ্চ। মার্টিন লুথার জর্ম্মাণ অঞ্চলে প্রধান ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে যে প্রটেষ্টাণ্ট চার্চ্চ বা ধর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হয়,সাধারণতঃ লুথারাণ চার্চ্চ (Lutheran Church) নামে তাহা পরিচিত। জর্ম্মাণীর প্রটেষ্টাণ্ট রাজাদের অধীনতায় এই সব লুথারাণ চার্চ্চের প্রতিষ্ঠা হইল। ইংলণ্ডের প্রটেষ্টাণ্ট যাজক এবং রাজপুরুষবর্গ নিজেদের প্রয়োজন মত একটা বিশিষ্ট পদ্ধতি স্থির করিয়া নিলেন এবং পার্লামেণ্টের আইনে এই পদ্ধতি দেশের ধর্ম্মপদ্ধতিরূপে গৃহীত হইল। তখন রাজপদে ছিলেন রাণী এলিজাবেথ। তাঁহাকে পার্লামেণ্টের আইনে চার্চ্চের Supreme Head বা 'পরম প্রভু' এই উপাধি দেওয়া হইল। এই পদ্ধতির নাম Anglican বা English Church। ক্যাল্ভিন (Calvin) নামক আর একজন প্রধান ধর্ম্মসংস্কারক ফরাসী দেশে প্রাদুর্ভূত হন। ইঁহার প্রবর্ত্তিত পদ্ধতিকে কোনও রাজশাসনের অধীন হইতে দেখা যায় নাই। এই মতের অনুবর্ত্তী যে সমাজ, তাহার মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত প্রধানগণের একটা সভার কর্ত্তৃত্বাধীনতায় এই ক্যাল্ভিন মতের চার্চ্চ থাকিবে, এইরূপ ব্যবস্থা হয়। সুতরাং ইহার শাসনপ্রণালী হয়, অনেকটা ডিমক্রাটিক।

রীতির অনুযায়ী। স্কটলণ্ডে এইরূপ ধর্ম্মশাসনপদ্ধতি প্রচলিত হয়। স্কটিশ চার্চ্চ নামে ইহা পরিচিত।

যাহা হউক, এই কথাটাই আমাদের প্রধান ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে পূর্ব্বে ইয়োরোপে চার্চ্চের যে স্বাতন্ত্র্য ছিল, প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের আবির্ভারের পর, তাহা তার থাকে না,—প্রধান প্রধান প্রটেষ্টাণ্ট দেশের চার্চ্চগুলি সব ষ্টেটের অধীন হইয়া পড়ে।

ষ্টেটের উপরে গত শতাব্দীতে প্রায় সব দেশেই জনসাধারণের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। ষ্টেট্ সব ডিমক্রাটিক্ বা গণতান্ত্রিক হইয়া উঠিয়াছে। ফলে 'ষ্টেট্-চার্চ্চ' গুলিও সব এই ডিমক্রাটিক্ শাসনের অধীন হইয়াছে। ইহা যে কত বড় একটা anomaly, অর্থাৎ বিষদৃশ বা অসমঞ্জস ব্যাপার, এবং ধর্ম্মশাসন যে কি প্রকারে ইহার ফলে তার বিশিষ্ট সার্থকতা হারায়, পূর্ব্বেই (অবতরণিকা ৫১ পৃষ্ঠায়) তাহার আলোচনা করা হইয়াছে।

তারপর এতগুলি প্রটেষ্টাণ্ট চার্চ্চের আবির্ভাবে চার্চ্চের সংহতি-শক্তিও বিনষ্ট হইয়াছে। সমাজের উপরে ধর্ম্মশাসনের জন্য চার্চ্চরূপ শক্তিস্থাপনার (organisationএর) প্রয়োজন আছে কি না, এরূপ শক্তি-স্থাপনার চক্রে পড়িলে ইহার আধ্যাত্মিক প্রকৃতি বজায় থাকে কিনা, এ সব পৃথক্ কথা। তবে চার্চ্চরূপে কোনও শক্তিস্থাপনার সাহায্যে কোন ধর্ম্মের যাজকবর্গ যদি সমাজশাসন করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে এইরূপ বহুবিধ চার্চ্চের উদ্ভবে এই শাসনের সংহতিশক্তি অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হইবে, এবং শাসনও তাহাতে দুর্ব্বল হইবে।

যে সব দেশ রোমক চার্চ্চের অনুগত ছিল, সে সব দেশেও অনেক লোক প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী হয়। এই সব শত্রুকে দমন করিয়া আপনার প্রভাব রক্ষার জন্য রোমকচার্চ্চের যাজকবর্গকে সর্ব্বত্রই রাজশক্তির উপরে নির্ভর করিতে হইত। সুতরাং নামতঃ তাহার একটা সাতন্ত্র্য থাকিলেও, কার্য্যতঃ এই চার্চ্চও ষ্টেটেরই অনুগত হইয়া পড়ে। রোমক সম্রাট্ নামধারী এক রাজা তখনও জর্ম্মাণীতে ছিলেন। কিন্তু

ইঁহাদের এমন শক্তি কিছু ছিল না, যে চার্চ্চকে এই বিপদে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিতে পারেন। সুতরাং পোপরা তখন ফরাসীরাজ এবং স্পেনীয় রাজ এই দুইজন পরাক্রান্ত ভূপতির উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করিতেন। চার্চ্চের রক্ষায় সম্রাটের যে অধিকার, তাহা ইঁহারাই পরিচালনা করিতেন। সুতরাং রোমক চার্চ্চ কখনও ফ্রান্স, কখনও স্পেন, এই দুই দেশের রাজশাসনের অনুগত হইয়া চলিতেন। প্রায় এই দুই দেশের ষ্টেট্-চার্চ্চ রূপেই তখন ইহা পরিণত হয়। তবে রোমক চার্চ্চের যাজকগণ, (প্রধানতঃ Jesuit সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ), এই দুই দেশের রাজশাসনের উপরে যত দূর সম্ভব আপনাদের প্রভাব রাখিতে সর্ব্বদাই চেষ্টিত থাকিতেন। [প্রটেষ্টাণ্ট বিদ্রোহে বিপন্ন রোমক চার্চ্চকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে অতি শক্তিশালী একটি সন্ন্যাসী সম্প্রদায় এই সময় গঠিত হয়, ইহাই জেসুইট (Jesuit) সম্প্রদায় নামে পরিচিত।]

মোটের উপর এই কথাটা আমাদের এখন বুঝিয়া নিতে হইবে, যে খৃষ্টান ভাবে ইয়োরোপীয় সমাজের উপরে যে Social Policy প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা পরস্পরের সহযোগী চার্চ্চ ও ষ্টেট্ এই দুই আকারে আপনাকে প্রকাশ করে। ষোড়শশতাব্দীপর্য্যন্ত চার্চ্চের ষ্টেট্ হইতে একটা স্বতন্ত্র রূপ ও স্বতন্ত্র শক্তি ছিল। ষোড়শশতাব্দীতে প্রটেষ্টাণ্ট চার্চ্চসমূহের অভির্ভাবের পর হইতে চার্চ্চ সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ষ্টেটের অধীন ও অঙ্গভুক্ত হইয়াছে। ষ্টেটের শক্তি ও মহিমা ইহাতে বাড়িয়াছে, কিন্তু চার্চ্চের শক্তি ও মহিমা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে; এবং তাহার সঙ্গে লোকচরিত্রের উপরে ধর্ম্মনীতির প্রভাবও শিথিল ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

এক মাত্র ধর্ম্ম বা religionকে আশ্রয় করিয়াই সর্ব্বত্র Social Policy আপনাকে প্রকাশ করে না। ষ্টেট্‌ও ধর্ম্মের গড়া একটা পদ্ধতি সর্ব্বত্র হয় না। নানা কারণে কোনও অঞ্চল কোনও এক রাজার শাসনাধীনতায় আসিয়া পড়ে। কয়েক পুরুষ

যাবৎ একই রাজবংশের কর্ত্তৃত্বে একই শাসন যদি চলে, এবং প্রজা সব এই শাসন মানিয়া তার বিধিব্যবস্থার অনুগত হইয়া উঠে, তবে তাহাও একটা ষ্টেটে পরিণত হয়। প্রচলিত ধর্ম্মের সঙ্গেও এই ষ্টেটের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়,—রাষ্ট্রবিধির সঙ্গে ধর্ম্মবিধির যোগ হয়, এবং অনেক সময় এই দুই প্রকার বিধির পার্থক্যও বড় ধরা যায় না। দেশে প্রচলিত ধর্ম্মের সঙ্গে দেশের রাষ্ট্রসংহতির বা ষ্টেটের সম্বন্ধ এই ভাবেও অনেক স্থলে ঘটে।

ষ্টেট্ ও চার্চ্চ (রাষ্ট্রসংহতি ও ধর্ম্মসংহতি) ব্যতীত সমাজ-বিন্যাস ও সমাজধর্ম্মের উপরে পরম্পরাগত আচারব্যবহার বা customs এর প্রভাবও বড় কম নয়। ধর্ম্মপদ্ধতি ও রাষ্ট্রপদ্ধতি সাধারণ ভাবে মোট মোট নীতি ও বিধির নির্দ্দেশ করে। কিন্তু অভ্যন্তরে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনযাপনের অসংখ্য রীতি, জীবনযাত্রার বহু কর্ম্মপ্রণালী, সাধারণ চালচলন, এমন কি বেশভূষা ও আহারের ধরণ পর্য্যন্ত পারিপর্শ্বিক বহুবিধ অবস্থার গতিকে যেখানে যখন যেমন মানায় বা প্রয়োজন হয়, তেমনই ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। এবং যে সব নিয়ম মোটের উপর জীবনযাত্রার সচ্ছন্দতার সহায়তা করে, অথবা বিশেষ কোনও অবস্থায় যাহা ব্যতীত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহই সম্ভব হয় না, সেই সব নিয়মই ক্রমে স্থায়ী আচারব্যবহারে পরিণত হয়। কোনওরূপ আচারব্যবহার যদি দীর্ঘকাল যাবৎ কোনও সমাজে চলিয়া আসিতে পারে, বুঝিতে হইবে, মোটের উপর মঙ্গলই তাহাতে হইতেছে। কেন, কি ভাবে হইতেছে, সর্ব্বদা তাহা বুঝা যায় না। জীবননীতির প্রচলিত কোনও theory বা মতবাদ অনু-সারে তেমন কোনও যুক্তিসঙ্গতিও হয়ত তাহার দেখা যায় না, কিন্তু তবু হইতেছে। এই সব customs বা আচারব্যবহার মানিয়া চলাতেই লোকের জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দ ও প্রতিকর হইতেছে, বিশেষ কোনও বাধা কি অসুবিধা কেহ বড় অনুভব করিতেছে না। ব্যক্তিবিশেষ কখনও কিছু করিলেও মোটের উপর যে স্বচ্ছন্দতা ও আনন্দ দশজনে

ইহার অনুবর্ত্তনে ভোগ করিতেছে, তার তুলনায় এ বাধা কি অসুবিধা নগণ্য।

কালধর্ম্মে দেশপাত্রসম্বন্ধীয় অবস্থার পরিবর্ত্তনে বিশেষ কোনও রকম আচারব্যবহার যখনই লোকযাত্রার সুখসচ্ছন্দতা বা মঙ্গল কি উন্নতির পরিপন্থী হয়, আপনাহইতেই তাহা লোপ পায়। পরিবর্ত্তিত অবস্থার অনুরূপ নূতন আচারব্যবহার আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ দেশাচারের দাস এবং এই দাসত্ব-হেতু কোনও রূপ উন্নতির পথে ইহা অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, এই-রূপ একটা অপবাদ ও অভিযোগ অনেকেই ইহার বিরুদ্ধে আনিয়া থাকেন। কিন্তু গত ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যেই হিন্দুর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, মধ্যে থাকিয়া কেহ যদি তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকেন, বলিবেন একটা যুগান্তর ইহার মধ্যে হইয়া গিয়াছে। এসব পরিবর্ত্তন সময় সময়ে অবস্থার পরিবর্ত্তনে এমন করিয়াই হয়। আচার-ব্যবহার এই ভাবেই আসে, এই ভাবেই চলে, আবার এই ভাবেই যখন যেমন দরকার বদলায়। স্বাভাবিক পথে সমাজজীবনের স্বচ্ছন্দ গতির লক্ষণই এই। কোনও একটা theoryর আদর্শ ধরিয়া কোনও সমাজকে তার পরম্পরাগত জীবনের ধারা হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিয়া ভাঙ্গিয়া একেবারে নূতন করিয়া কেহ গড়িতে পারে না। প্রবল এরূপ চেষ্টা যেখানে হইয়াছে, সমাজ ভাঙ্গিয়াছে, এ চেষ্টায় গড়ে নাই। ভাঙ্গার পর আবার গড়িয়া উঠিতে যেখানে পারিয়াছে, আপনাহইতে যে পথে, যে রীতিনীতির অবলম্বনে গড়িয়া উঠিতে পারে, সেই পথে সেই রীতিনীতির অবলম্বনেই পারিয়াছে। সে রীতিনীতি পুরাতন পথ ও আচারব্যবহার হইতে একেবারে পৃথক্ রকম নাও হইতে পারে, যদি না অবস্থার পরিবর্ত্তনে পুরাতন ইতিমধ্যে একেবারেই অচল হইয়া পড়িয়া থাকে।

পুরুষপরম্পরাগত আচারব্যবহার লোকযাত্রার স্বচ্ছন্দতার অনুকূল বলিয়া স্থায়ীভাবে যাহা দাঁড়াইয়া যায়, সমাজশাসনে তাহার প্রভাবও

বড় কম নয়। ধর্ম্মবিধি বা রাষ্ট্রবিধির ন্যায়ই আচারব্যবহার লোকে মানিয়া চলে; না চলিলে সামাজিক লাঞ্ছনার ভাগীও হয়। ধর্ম্মবিধি এবং রাষ্ট্রবিধিও অনেকস্থলে এই সব আচারব্যবহারকে অনুসরণ করে;—আচার ব্যবহার ধর্ম্মপদ্ধতি ও রাষ্ট্রপদ্ধতির অঙ্গীয় হইয়া উঠে। অতদূর না হইলেও, ধর্ম্মবিধি ও রাষ্ট্রবিধি অন্ততঃ এই আচারব্যবহারের রীতির বিরোধী হইয়া চলে না; চলিতে চাহিলেও বেশী দিন পারে না। বস্তুতঃ Social Policy কেবল চার্চ্চ ও ষ্টেট্ রূপে আপনার স্বরূপ প্রকাশ করে না, পরম্পরাগত আচারব্যবহার বা customs এরও বড় একটা অধিকার তার মধ্যে আছে।

Social Policy বিভিন্ন সমাজে কি সব কারণে, কি সব অবস্থার গতিকে, কি ভাবে কি পদ্ধতিতে গড়িয়া উঠিয়াছে, কি ভাবে আপনাকে সমাজের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে,—ধর্ম্মনীতি, রাষ্টনীতি ও আচার-ব্যবহার—ইহার প্রধান এই তিন উপাদানের কোন্‌টির প্রভাব কোন্ পদ্ধতিতে কিরূপ এবং কেনই বা তাহা সেরূপ হইয়াছে, এসব অতি জটিল ও গুরু কথা,—বিশিষ্ট একটা বৃহৎ শাস্ত্রেরই অনুসন্ধান ও গবেষণার বিষয়। এই একটি প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে তাহার বিশদ আলোচনা অসম্ভব। তবে Social Policyর মোট প্রকৃতি যে কিরূপ হইতে পারে, এবং তার আকারের মোট একটা বিশিষ্টতা কি, তাহা অতি সাধারণভাবে একটু বুঝিয়া নেওয়া আমাদের এই আলোচনার পক্ষে প্রয়োজন। তাই কয়েকটি কথা এ সম্বন্ধে বলিতে হইল।

মোটামুটি এই সত্যটুকু অন্ততঃ বোধ হয় আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, যে যত মানবসমষ্টি বা সমাজ এ পৃথিবীতে দেখা দিয়াছে এবং বহুকাল অর একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি ধরিয়া চলিয়াছে, সর্ব্বত্রই ধর্ম্ম (Religion), রাষ্ট্রনীতি এবং আচারব্যবহার (customs) এই তিন রকম factor বা মূলকরণকে অবলম্বন করিয়া তার একটা শক্তিপদ্ধতির বা Social Policyর স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে।

এই ত্রিবিধ factor বা মূলকারণ সাধারণতঃ পরস্পরের সাপেক্ষ ও সহায় হইয়া, অঙ্গাঙ্গী ভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়াই, দেখা দেয়। [illegible]দের মধ্যে প্রাধান্য ও প্রাবল্য সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের এবং ষ্টেটের। আচারব্যবহার (customs) ইহাদের সঙ্গে সর্ব্বদাই থাকে ও থাকিবে। ষ্টেট্ ও ধর্ম্ম—ইহার কোনও একটিকে বাদ দিয়াও যদি সমষ্টি চলে, আচারব্যবহাব বা customs তার একটা বিশিষ্ট প্রভাব লইয়া সকল সমাজে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে,—কারণ সাধারণ জীবনের নিত্যকার বহুব্যাপারের নিয়ামক সর্ব্বত্রই এই আচারব্যবহার। এক রকমের আচারব্যবহার যদি নিষ্প্রয়োজন ও অনিষ্টকর বলিয়া দূর হয়, অন্য রকম আচারব্যবহাব তার স্থান আসিয়া অধিকার করে। ষ্টেট্ বা বিশিষ্ট কোনও রাষ্ট্রসংহতির শক্তি ব্যতীত কেবল ধর্ম্ম ও আচারব্যবহারের উপরে আশ্রিত হইয়াও অনেক সমষ্টি বা সমাজ এ পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছে। বর্ত্তমান যুগে ভারতের হিন্দুসমাজ ও মুসলমানসমাজকে ইহার দুইটি প্রধান দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। ধর্ম্মের প্রভাব মানবচরিত্রের উপরে যেখানে বড় বেশী গভীর এবং আচারব্যবহারের সঙ্গে ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ একটা সম্বন্ধ থাকে, সেইখানেই ইহা সম্ভব হয়। কিন্তু কোন ধর্ম্মের সংস্রব ব্যতীত কেবল ষ্টেট্ বা রাষ্ট্রসংহতি এবং আচারব্যবহার মাত্রই কোনও সমষ্টির আশ্রয় হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত বড় বিরল।

'নেশন' রূপ আধুনিক পাশ্চত্য সমষ্টিসমূহ সম্বন্ধে এইরূপ মনে হইতে পারে বটে, বাস্তবিক তাহা নয়। ষ্টেট্ বা রাষ্ট্রসংহতি এই সব নেশনের প্রধান আশ্রয় সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ social organism বা সমষ্টিশরীরের স্বরূপকে তাই ষ্টেট্ নামও দিয়াছেন। কিন্তু এক মার্কিন দেশ ব্যতীত সর্ব্বত্রই প্রায় ষ্টেটের সঙ্গে কোনও না কোনও চার্চ্চের ঘনিষ্ঠ একটা সম্বন্ধ আছে। তাহা ছাড়া, বহু স্বতন্ত্র চার্চ্চও সকল দেশে বর্ত্তমান। মার্কিন দেশের শাসননীতি কোনও ষ্টেট্-চার্চ্চকে স্বীকার

করে নাই বটে,... কিন্তু সেখানেও, স্বতন্ত্র বা ষ্টেট্-নিরপেক্ষ বহু চার্চ্চ জনসাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা চার্চ্চের প্রভাব এখন অনেক শিথিল হইলেও, জনসমাজের উপরে এই চার্চ্চের মধ্য দিয়া ধর্ম্ম তার স্বধর্ম্ম যে একেবারেই পালন করিতেছে না, এমন হইতে পারে না। ধর্ম্ম বা religion যেখানে সমষ্টির প্রধান আশ্রয়, ধর্ম্মানুরাগ, ধর্ম্মভয়, ধর্ম্মানুগত্য সেখানে লোককে ধর্ম্মবিধির বশীভূত করিয়া রাখে। পাশ্চাত্য জগতে অধুনা ষ্টেট্ই সমষ্টির প্রধান আশ্রয় হওয়ায়, ইহার পরিবর্ত্তে spirit of nationalism বা sentiment of patriotism, অর্থা‹ জাতীয় মর্য্যাদাবোধ বা দেশাত্মবোধ লোককে ষ্টেটের বা রাষ্ট্রসংহতির বশীভূত করিয়া রাখিতেছে। এই যে জাতীয় মর্য্যাদাবোধ বা দেশাত্মবোধ, যাহার প্রেরণায় মানব ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির অনেক উপরে গিয়া উঠে,—ধনসম্পদ, সুখ সচ্ছন্দতা, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত অনায়াসে ত্যাগ করে,—ইহা এক-রূপ ধর্ম্মেরই প্রেরণা,—ধর্ম্মকে কেবল religionএর গণ্ডীর মধ্যে ধরিয়া না রাখিয়া, ইহার ব্যাপক অর্থে যদি গ্রহণ করি, অর্থাৎ পৃথিবীর লোক-যাত্রার আশ্রয় যাহা,যাহা ইহাকে ধারণ করিয়া রাখে, তাহাকেই যদি ধর্ম্ম বলিয়া আমরা বুঝি। সমষ্টির প্রতি ব্যষ্টির আনুগত্য,সমষ্টির সেবায় ব্যষ্টির অনুরক্তি ও তৎপরতা ব্যতীত লোকযাত্রার মঙ্গল সম্ভব হয় না। কর্ত্তব্যপালন যে লোকে করে, তাহা বুদ্ধিবৃত্তির নির্দ্দেশে তত নয়, চিত্তবৃত্তি বা ভাবের প্রেরণায় যত। কর্ত্তব্য কোন অবস্থায় কি তাহা লোকে বুদ্ধিবৃত্তির বা intellectএর নির্দ্দেশ বোঝে, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু তাহা পালনে এই বুদ্ধি লোককে উৎসাহী বা উদ্যত করিতে পারে না। কর্ম্মের প্রকৃতি ও রীতি কি তাহা বুঝায় বুদ্ধিবৃত্তি, কিন্তু কর্ম্মের প্রেরণা বা motive power আসে তার চিত্তবৃত্তি বা sentiment হইতে। এই প্রেরণা না জাগিলে কঠিন কোনও কর্ত্তব্যই মানব পালন করিতে পারে না। এই সব চিত্তবৃত্তির বা sentimentএর বীজ বা instinct মানুষের প্রকৃতিতে থাকে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার ও

শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবজাত অভ্যাসে ইহা জাগ্রত কর্ম্মপ্রেরণার বৃত্তি (বা active sentiment) রূপে প্রকাশ পায়।

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥"

এই বচন আমাদের প্রায় সকলেরই সুপরিচিত; সর্ব্বদা আমরা ইহা বলিয়া থাকি ও শুনিয়া থাকি। অতি উচ্চ একটি সত্য এই বচনটি নির্দ্দেশ করিতেছে। ধর্ম্ম আমরা জানি, অধর্ম্মও জানি,—কিন্তু ধর্ম্মে প্রবৃত্তি নাই, অধর্ম্মে নিবৃত্তি নাই, তাই যাহা জানি তাহা করিতে পারি না। কেবল জানিলেই লোকে যাহা উচিত তাহা করিতে পারে না, যাহা অনুচিত তাহা হইতেও বিরত থাকিতে পারে না। ধর্ম্মে প্রবৃত্তি চাই, অধর্ম্মে নিবৃত্তি চাই। এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিই হইতেছে চিত্তবৃত্তির বা sentimentএর প্রেরণার বস্তু।—নিজের এই অপূর্ণতা বা অভাব বুঝিয়া আমাদিগকে পরিশেষে হৃদিস্থিত হৃষিকেশের উপরে নির্ভর করিতে হয়। তিনি যদি হৃদয়ে জাগ্রত থাকেন. ধর্ম্মের পথে আমাদিগকে পরিচালিত করিবেন, অধর্ম্মের পথ হইতে নিবৃত্ত রাখিবেন। না করেন, না রাখেন, সোজা কথায় তাঁহাকে বলিব, ঠাকুর, দোষ যদি হয়, সে দোষের দায়ী আমি নই, তুমি! কেন তুমি আমার হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া ধর্ম্মের পথে চলিবার শক্তি আমাকে দিতেছ না? ভগবানের উপরে ভক্তের জোর ইহা অপেক্ষা বেশী আর কিছু হইতে পারে না। এই জোর মনে প্রাণে সত্যই যে করিতে পারে, মায়ার তামস ঘোরে নিদ্রিত আত্মস্থ ভগবানকে সে টানিয়া জাগাইয়া তুলিতে পারে।

যাহা হউক, দেশকালপাত্রভেদে যে অবস্থায় মানবের ধর্ম্ম পালনে যেরূপ sentiment বা চিত্তবৃত্তির উন্মেষের প্রয়োজন, সেই অবস্থায় সুকৃতির ফলে সেইরূপ চিত্তবৃত্তির (বা sentimentএর) উন্মেষ হয়।

সমষ্টির স্বরূপ যেখানে প্রধানতঃ ষ্টেটের আকারে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে সমষ্টির সম্বন্ধে আপনার ধর্ম্মপালনে ব্যষ্টিকে স্বভাবতঃই প্রেরিত করিবে, এই spirit of nationalism, sentiment of patriotism অর্থাৎ জাতীয় মর্য্যাদাবোধ বা দেশাত্মবোধ। সুতরাং একথা আমরা বলিতে পারি না যে পাশ্চাত্য অঞ্চলে ষ্টেট্‌রূপ সমষ্টিশরীরের আশ্রয়ে ধর্ম্মের কোনও স্থানই নাই। তারপর, অধুনা যতই শিথিল হউক, সহস্রাধিক বৎসর খৃষ্টীয় ধর্ম্ম বা religion পাশ্চাত্য-সমাজে প্রতিষ্ঠিত আছে; লোকচরিত্রের উপরে ইহার প্রভাবও একেবারে উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। তাই শতাব্দীর অধিককাল নাস্তিক Rationalistic মতের প্রভাব সত্ত্বেও প্রাচীন ধর্ম্মানুগত নীতির বন্ধন, পরম্পরাগত আচারব্যবহারের প্রতিষ্ঠা, এখনও একেবারে লোপ পায় নাই। দেশাত্মবোধের, জাতীয় মর্য্যাদাবোধের, উন্নত প্রেরণা যে এখনও স্বার্থত্যাগে ব্যষ্টিকে সমষ্টির সেবায় নিয়োজিত করিতেছে, সাক্ষাৎভাবে না হউক, পরোক্ষভাবে তাহা এই ধর্ম্মনীতির প্রভাবেরই ফল। ব্যক্তিগত rationalistic বুদ্ধি সাধারণতঃ মানবকে কেবল তার ঐহিক স্বার্থ ও সুখ কিসে ঘটিবে, তাহাই দেখায়, সেই হিসাবই তার মাথায় ঢুকায়,—এরূপ স্বার্থত্যাগে তাকে বড় প্রেরিত করিতে পারে না।

ধর্ম্মশাসন, রাষ্ট্রসংহতি, আচারব্যবহারের রীতি—church, state ও customs—মোটের উপর এই তিনটি মূলকরণ (factor) অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিয়া অথবা পরস্পরের সাপেক্ষ ও সহায় হইয়া মানবের সমাজকে বা সমষ্টিশরীরকে অভিব্যক্ত করিয়াছে। ইহার আশ্রয় এই তিনেরই সম্মিলিত শক্তি। ইহার বহিঃস্বরূপ যাহা, তাহাই Social Policyর রূপে প্রকাশিত, আর অন্তস্তত্ত্ব বিশ্বধর্ম্মের সেই রহস্য, যাহা এই social policyকে তার এই স্বরূপে প্রকাশ করিয়াছে, শাসনের অধিকার তাহাকে দিয়াছে, ব্যষ্টিকে আপনাহইতেই ইহার অধীন করিয়া রাখিতেছে,—তার বুদ্ধিকে ইহার মাঙ্গল্য

বুঝাইতেছে, চিত্তবৃত্তিকে ইহার আনুগত্যের দিকে প্রেরিত করিতেছে।

সমষ্টির সঙ্গে সমষ্টির এই ধর্ম্ম বা Social Policy গড়িয়া উঠে এই যে একটি কথা বারবার বলিতেছি, ইহার তাৎপর্য্য কি? কেহ মনে করিবেন না যে ব্যষ্টিভাবে কোনও মানবের কোনও কর্ম্মের ভাগ ইহাতে নাই, এরূপ কিছু বলা আমার অভিপ্রায়। তার না থাকিলে কারই বা থাকিবে? Social Policy কোথা হইতে আসিবে? প্রত্যেক সমষ্টির মধ্যেই উন্নত বুদ্ধির ও সমুন্নত-আধ্যাত্মিক দৃষ্টির অধিকারী মানব জন্মগ্রহণ করেন। মানবধর্ম্মের সত্য যাহা, ইঁহাদের বুদ্ধিতেই তাহা ধরা দেয়, ইঁহাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতেই প্রতিভাত হয়, এবং ধর্ম্মের পথ ইঁহারাই নির্দ্দেশ করেন,—ধর্ম্মের পথে লোক যাত্রার গতি ইঁহারাই পরিচালিত করেন। যে শক্তি এই গতিকে তাহার পথে স্থির রাখিতে পারে, সেই শক্তির ভিত্তিও ইঁহারা প্রতিষ্ঠা করেন। কেহ ইঁহাদের ঋষি, কেহ prophet বা পয়গম্বর, কেহ sage বা savant, এই সব নাম দিয়া থাকেন। মূলকর্ত্তা ধর্ম্ম, ধর্ম্মের কাজ ধর্ম্মই করেন; ইঁহারা সেই ধর্ম্মদেবের নিমিত্ত বা instrument। এই নিমিত্তরূপে সর্ব্বপ্রধান সমাজনেতা ইঁহারাই। ইঁহাদের নিম্নেও বুদ্ধির, অধ্যাত্মিক দৃষ্টির ও অন্যান্য শক্তির বহু স্তরে ও বহুবিধ দিকে উন্নত-চরিত্র ও শক্তিমান্ বহু মানব জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণতঃ পূর্ব্বোক্ত ঋষি বা ঋষিবৎ নেতৃবর্গের নির্দ্দিষ্ট পথে, ইঁহারাই, কেহ বা ধর্ম্মবিধানে, কেহ বা রাষ্ট্রবিধানে, মানবসংহতিকে পরিচালিত করেন। সর্ব্বত্রই natural leaders of society বলিয়া ইহাদের এই নায়কত্ব লোকে মানে।

বিশ্বধর্ম্মের যে তত্ত্বরহস্যের লীলা জাগতিক অন্যান্য সকল ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, মানবজীবনে তাহারই একটা বিশেষ প্রকাশ ইহা। এই ভাবেই যোগ্যের যোগ্যবুদ্ধির, যোগ্যশক্তির, নির্দ্দেশে ও পরিচালনায় সমষ্টির সঙ্গে তাহার শক্তিপদ্ধতি বা Social Policy

গড়িয়া উঠে,—বুদ্ধিতে ও শক্তিতে অপেক্ষাকৃত হীনতর জনসাধারণের উপরে আপনার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে; জনসাধারণও এই প্রভুত্ব শান্তভাবে গ্রহণ করে। শাসন যদি মোটের উপর সুনীতির অনুবর্ত্তী হয়, নিজের স্বধর্ম্ম পালন করে, অর্থাৎ সমাজকে মোটের উপর মঙ্গলে স্থিত রাখে, এবং জন সাধারণ যদি এই মঙ্গলের ছত্রছায়াতলে সচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তিসমূহের স্ফূর্ত্তির ও তৃপ্তির অবসর পায়, এই শাসন কোথা হইতে কোন অধিকারে কার কর্ত্তৃত্বে তাহাদের উপরে আসিয়া পড়িল, ইহা লইয়া তাহারা বড় মাথা ঘামায় না; এ সব প্রশ্নই তাহাদের মনে বড় আসে না। যত বেশী Social Policy তার এই ধর্ম্মপালন করিতে পারিয়াছে, তত সন্তুষ্টভাবে জনসাধারণ তাহার শাসন গণ্ডীর মধ্যে রহিয়াছে। যখন না পারিয়াছে, হিত অপেক্ষা অহিত বেশী ঘটাইয়াছে, অশান্তির বিক্ষোভও দেখা দিয়াছে।

প্রাচীন সকল সমাজেই এই ভাবে Social Policy যোগ্যের নির্দ্দেশে গড়িয়াছে, জনসাধারণের উপর আপন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইহার প্রকৃতি, অধিকারের সীমা, কর্ম্মের রীতি, জনসাধারণের ইচ্ছায় তাহাদের ভোটে স্থির হয় নাই। হয় নাই বলিয়াই যে জনসাধারণকে কেবল ইহা পীড়নই করিয়াছে, তাহাদের যথাযোগ্য শক্তিবিকাশের অন্তরায় হইয়াছে, তা নয়। কোথাও কোথাও অবশ্য হইয়াছে। জনসাধারণের শক্তিহীনতায় সমগ্র সমাজই অনেক স্থানে শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পীড়ন যেখানে হইয়াছে, অশান্তির বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে,—পীড়ন অসহনীয় মাত্রায় যখন উঠিয়াছে, বিদ্রোহের অভ্যুত্থান হইয়াছে। আবার জনসাধারণের নির্জ্জীবতায় ও অবসাদে সমাজ যেখানেই যখন নির্জ্জীব ও অবসন্ন হইয়াছে, অথবা তাহাদের দুর্নীতির প্রভাব ও উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচার সমাজের স্থিতিকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে,—সেখানেই তখন নূতন জীবনে ও নূতন শক্তিতে সমাজকে জীবিত ও জাগ্রত

করিবার জন্য, এই দুর্নীতিকে দমন ও স্বেচ্ছাচারকে শৃঙ্খলিত করিবার জন্য, ধর্ম্মনীতির ও আচারব্যবহারের যথাপ্রয়োজন সংস্কারের প্রয়াসও হইয়াছে ; যদি না হইয়াছে, অথবা প্রয়াস বিফল হইয়াছে, সমষ্টির অস্তিত্বই বিলুপ্ত হইয়াছে। সেই বিদ্রোহে ও এই সব সংস্কারে জনসাধারণকে পরিচালিত করিয়াছেন, তাহাদের শক্তিকে জাগ্রত করিয়াছেন, তাহাদের চিত্তবৃত্তিকে এই কর্ম্মের দিকে উন্মুখ করিয়াছেন, উন্নতবুদ্ধিতে ও শক্তিতে উন্নত চিত্তবৃত্তির অধিকারে, অথবা উন্নত আধ্যাত্মিক প্রেরণায়, সমুন্নত যোগ্য নায়কগণ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহাও নিসর্গের ক্রিয়া, নৈসর্গিক ধর্ম্মই অথবা সেই ধর্ম্মের অধিপতি স্বরূপ ভগবানই এই সব উন্নতবুদ্ধি, উন্নতচেতা, উন্নতধী, উন্নতাত্মা ব্যক্তিগণের মধ্য দিয়া, ইঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া, অথবা ইঁহাদের স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়া, তাঁহার যে কর্ম্ম তাহা সাধন করেন।

ঠিক এই সত্যই লক্ষ্য করিয়া আচার্য্য হাক্সলি (Huxley) সাহেব এক স্থলে বলিয়াছেন,—

"In the strict sense of the word "nature," it denotes the sum of the phenomenal world, of that which has been, and is, and will be ; and society, like art, is therefore a part of nature."

[Evolution and Ethics, Huxley, ch. V. p, 202-203]

[অনুবাদ।—যাহা ছিল, যাহা আছে এবং যাহা হইবে, সব লইয়া যাহা কিছু এই বিশ্বজগৎরূপে অথবা তাহাতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, nature বা নিসর্গ বলিতে প্রকৃত পক্ষে সবকেই বুঝায়। আর্ট অর্থাৎ মানুষ যাহা করে, তাহাও এই নিসর্গেরই ক্রিয়া। সুতরাং 'আর্টের' ন্যায় সমাজও নিসর্গের অংশ।] *

* এই প্রবন্ধের শেষে টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

সুতরাং প্রাচীন যত সমাজ বা Social Organism এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার আশ্রয়স্বরূপ সমাজধর্ম্ম বা Social Policy, এই ভাবে নৈসর্গিক নিয়মেই যোগ্যের নির্দ্দেশে গড়িয়াছে এবং যোগ্যের কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত হইয়াছে। এখনও তাই হইতেছে। যোগ্যের এই যোগ্যতার তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাইব, উন্নত সংস্কার, উন্নত প্রতিভা. উন্নত বিদ্যা, উন্নত ধর্ম্মবুদ্ধি, ধর্ম্ম-নীতির অনুবর্ত্তিতায় উন্নত চরিত্র, সুনীতিস্থাপনায় ও কর্ম্মশৃঙ্খলার *প্রবর্ত্তনে লোকস্থিতির ভিত্তিকে* দৃঢ় করিবার ও মঙ্গলে তাহাকে পরিচালনা করিবার শক্তি, দুষ্টের দমনে ও শিষ্টের পালনে তাহাকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা প্রভৃতি গুণই যোগ্যকে এই যোগ্যতা দান কবিয়াছে। এক কথায় ব্রহ্মণ্য ও ক্ষাত্র গুণের অধিকারী যাঁহারা, তাঁহারাই যোগ্য, এবং এই যোগ্যতার বলে তাঁহাদের কর্ম্ম এই, এবং এই কর্ম্মের অধিকারীও তাঁহারা। এ যোগ্যতা যে সকলের নাই, বরং সংখ্যার হিসাব করিলে অল্পসংখ্যক লোকেরই আছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। তাই যে নামে ও যে ভাবেই হউক, গুণকর্ম্মের বৈষম্যে একটা অধিকারের বৈষম্যে এবং তাহা লইয়া একটা শ্রেণীভেদ প্রাচীন সকল সমাজেই প্রায় দেখা যায়। ইহাই স্বাভাবিক। ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে গুণে যখন স্বাভাবিক ভেদ রহিয়াছে, কর্ম্মের অধিকারে ভেদ কেন না হইবে? আর এই অধিকারভেদহেতু একটা শ্রেণীভেদও অবশ্যম্ভাবী। যে নৈসর্গিক নীতির প্রভাবে, গুণভেদে কর্ম্মের অধিকারে এইরূপ ভেদ ঘটে, সেই নীতির প্রভাবেই অধিকারভেদ প্রসূত এই শ্রেণীভেদকে অবলম্বন করিয়া সমাজবিন্যাস আপনিই ঘটিয়া উঠে, এবং সাধারণতঃ সকলেই তাহা মানিয়া নেয়, মানিয়া চলে।

সুনীতি স্থাপনায় ও সুশাসনে সমাজ বা রাষ্ট্র মঙ্গলে থাকিবে, এ দাবী সকলেরই আছে। কিন্তু এই নীতি স্থাপনার ও শাসনের উপরে কর্ত্তৃত্বের দাবী সকলের থাকিতে পারে না, যদি না তার

মত যোগ্যতা থাকে। কারণ সে দাবী বাস্তবিক যোগ্যতারই সাপেক্ষ। *

এই যোগ্যতা যাহাদের নাই, সমাজধর্ম্মের সুনীতিস্থাপনা ও সুশাসনের উপরে কর্ত্তৃত্বের দাবী যদি তাহারা করে, এবং সেই দাবী যদি চলে এবং তাহার বলে সমাজধর্ম্মের বা Social Policyর উপরে তাহাদের কর্ত্তৃত্ব যদি বাস্তবিকই প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে সমাজ সুনীতির আশ্রয়ে সুশৃঙ্খলায় পরিচালিত হইবে, অমঙ্গল বই মঙ্গল কিছু ঘটিবে, এরূপ ভরসা করা যায় না। কিন্তু কর্ত্তৃত্ব থাকা বাঞ্ছনীয় নয় বলিয়া ইহাতে ইহাদের কর্ম্মের কোনও ভাগ নাই, কোনওরূপ সহযোগিতার আবশ্যকতা নাই, এমনও হইতে পারে না। তবে এই ভাগ কি, এই সহযোগিতার প্রকৃতি কি হইবে, তার সীমা কি, এই সবই সমস্যার কথা।

যেরূপ যোগ্যতার বৈষম্য ও কর্ম্মাধিকারের বৈষম্যের কথা বলিলাম, তাহাতে নেতা ও নীত, রক্ষক ও রক্ষিত, শাসক ও শাসিত—প্রধানতঃ এই দুইটি শ্রেণীতে সমাজ ভাগ হইয়া পড়ে। জীবনের বৃত্তি সম্বন্ধে অন্য যত রকম ভেদ বা ভাগ বর্ত্তমান থাক্, সমাজ-ধর্ম্মের বা Social Policyর কর্ত্তৃত্ব ও তাহার পরিচালনার হিসাবে, মোট এইরূপ দুটি মাত্র শ্রেণীও অনেক সমাজে দেখা যাইবে। কিন্তু উচ্চতর শাসকসম্প্রদায়ের মোট গুণ যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, তবে ব্রহ্মণ্য ও ক্ষাত্র এই দ্বিবিধ গুণই আমরা

* জর্ম্মাণ রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ব্লুণ্ট্‌স্‌লি (Bluntschli) সাহেব এ সম্বন্ধে অতি সুন্দর একটি কথা বলিয়াছেন—

"The right to be well governed does not involve the right to take part in or control the government. The former is a purely passive right, the latter presupposes personal capacity."

[The Theory of State, Bluntschli, Book II. Ch. XX, p. 204]

দেখিতে পাইব। বিদ্যাজ্ঞানের অধিকারে ও উন্নত চরিত্রধর্ম্মের বলে সুনীতির আদর্শস্থাপনা এবং উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষাদির বিধিব্যবস্থার প্রবর্ত্তনে তাহার পথে লোকসমাজের পরিচালনা প্রভৃতি ব্রহ্মণ্য গুণের কর্ম্ম। আর দুষ্টের দমনে ও শিষ্টের পালনে সমাজস্থিতিকে রক্ষা করা ক্ষাত্র গুণের কর্ম্ম। ক্ষাত্রগুণের কর্ম্ম যতটা ব্রহ্মণ্যপ্রভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিবে, সমাজধর্ম্মের রক্ষণ পোষণ ও শাসনের ক্রিয়া তত সুনিয়ন্ত্রিত থাকিবে, সুপথে চলিবে। নায়ক ও শাসকসম্প্রদায়ের (regulating and governing classএর) মধ্যে দ্বিবিধ এই গুণকর্ম্মের অনুযায়ী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় রূপ বিভিন্ন দুইটি শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইলে, ক্ষাত্রধর্ম্মের উপরে ব্রহ্মণ্য প্রভাব যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে, ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম মোট সমাজধর্ম্মের উপরে যে অধিনায়কত্ব লাভ করিতে পারে, অন্যথা তাহা পারে না। বরং ক্ষাত্রপ্রভাবই বড় হইয়া ব্রহ্মণ্যপ্রভাবকে চাপিয়া রাখে, ব্রাহ্মণের বিদ্যাকে ও শক্তিকে আপনার স্বার্থসিদ্ধির পথে নিয়োজিত করে, এবং ইহার ফলে আপনার বাহুবলের শক্তিকেই সমাজের সর্ব্বময় প্রভুত্বের পদে প্রতিষ্ঠা করিয়া শাসিতসম্প্রদায়কে তার চাপে দীন-প্রাণ ও শক্তিহীন করিয়া ফেলিতে পারে।

কেবল শ্রেণীভেদ হইলেও হইবে না,—ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের নায়কত্ব, ব্রহ্মণ্যপ্রভাবের প্রাধান্য মানিয়া চলার মত মতিগতি ও চরিত্র যাহাতে ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সম্ভব হয়, এরূপ শিক্ষাদীক্ষার প্রবর্ত্তনও আবশ্যক। নহিলে, ব্রাহ্মণসম্প্রদায়কে ক্ষত্রিয়ের রাজসিক প্রভু-শক্তির অনুগত হইয়া পড়িতে হয়, এবং সেই ভাবেই চলিতে হয়। শ্রেণীভেদই তাহাতে ব্যর্থ হয়, এবং সমাজধর্ম্মের মূল নিয়ন্তৃত্বের শক্তি, সমাজদেহের মস্তকস্বরূপ ব্রাহ্মণের যে বিশিষ্ট কর্ম্মাধিকার, কার্যাতঃ তাহা ক্ষত্রিয়ের হাতেই গিয়া পড়ে।

এই গেল উচ্চতর নায়ক ও শাসক সম্প্রদায়ের কথা। আর ইঁহাদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মনীতির অনুবর্ত্তী ও শাসনের অধীন হইয়া সাধারণতঃ

যাঁহারা চলেন; তাঁহাদের মধ্যেও, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গুণকর্ম্মভেদে মোটামুটি দুইটি ভাগ দেখা যায়; এদেশের ভাষায় তাহাদের নাম বৈশ্য ও শূদ্র বলা যাইতে পারে।

প্রধান এই চারিটি ভাগ বা 'চতুবর্ণ'ই সমাজদেহের প্রধান চারিটি অঙ্গ। মস্তক, বাহু, উরু ও চরণ এই ভাবে ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে এই অঙ্গ বিন্যাসের কথা বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূরাজন্যকৃতঃ।
ঊরুতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত।"

ইহার তত্ত্বের সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত বিশ্লেষণের মধ্যে এখন যাইব না। তবে ইহারা সকলে একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ; গুণভেদে কর্ম্মের ভেদ যাহাই হউক, যার যার স্থানে গুণানুসারে সকলেরই কর্ম্মে মোট সমাজদেহেরই কর্ম্ম সাধিত হইতেছে। সকল অঙ্গ লইয়া যেমন পরিপূর্ণ দেহ, তেমনই সকলের কর্ম্মেই পরিপূর্ণ দেহের কর্ম্ম পূর্ণ হয়। কোনও অঙ্গ কি কোনও অঙ্গের কর্ম্মই তুচ্ছ করিবার বস্তু নহে। কোনও অঙ্গ রুগ্ন কি দুর্ব্বল হইলে,তার কর্ম্মের ভাগ ঠিক মত করিতে না পারিলে,সমগ্র দেহই রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এবং কর্ম্মের অপূর্ণতায় বা হানিতে যে ক্ষতি, সে ক্ষতি মোট দেহেরই হয়। সকলেই সকলের উপরে নির্ভর করিতেছে, কাহাকেও বাদ দিয়া কেহ চলিতে পারে না,—কাহাকেও দুর্ব্বল কি অবসন্ন করিয়া রাখিয়া অন্য কোনও অঙ্গের অতিরিক্ত পুষ্টি কি প্রাবল্য মোট সমাজদেহের পক্ষে স্বাস্থ্যের লক্ষণ কি মঙ্গলের কারণ হইতে পারে না। মোট দেহ যদি ব্যাধিগ্রস্ত হয়, অমঙ্গলের ভাগী হয়, প্রত্যেক অঙ্গকে কালে সেই ব্যাধির ও অমঙ্গলের ভাগী হইতে হইবে। একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ বলিয়া কেবল নিবিড় একটা সমযোগিতার নয়, সমবেদনার সম্বন্ধও সকলের সঙ্গে সকলের আছে। বিভিন্ন এই সব অঙ্গে এক সেই বিরাট্‌ পুরুষই আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। সকলের স্থান তাঁহারই একদেহে. কোন অঙ্গ পাড়িত, ব্যথিত, লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইলে, সে পাড়া, সে ব্যথা, সে লাঞ্ছনা তাঁহারই। প্রত্যেক

অঙ্গকে ইহা অনুভব করিতে হইবে, এবং পরস্পরের সঙ্গে সকল কর্ম্মে ও ব্যবহারে সেই ভাবে চলিতে হইবে। এই অনুভূতি যাহাতে জাগ্রত থাকে, এই সম্বন্ধের সূত্র ধরিয়াই যাহাতে পরস্পরের সম্বন্ধে সকল ব্যবহারের রীতি গড়িয়া উঠে, বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে যাহাতে একটা শক্তির সামঞ্জস্য থাকে, সকলের সহায়তায় যার যার গুণানুসারে সকলেই যাহাতে নিজ নিজ কর্ম্মের ভাগ সম্পন্ন করিতে পারে, কোনও এক অঙ্গ অন্য কোনও অঙ্গকে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল করিয়া নিজে অতিপুষ্ট ও অতি প্রবল না হয়, অন্যকে তার ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত করিয়া নিজে অত্যধিক স্বার্থ সঞ্চয় না করে,—যার যার অধিকারের সীমার মধ্যে যে যাহা করিতে পারে তাহা, করিয়া, যে যাহা পাইতে পারে তাহা পাইয়া, সুখে শান্তিতে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে,—সকলের সুখশান্তিতে সকলের মঙ্গলে সমগ্র সমাজ সুখে শান্তিতে ও মঙ্গলে স্থিত থাকে, এবং এই স্থিতি হইতে মানবসমাজ, নিয়ত বিরোধে বিগ্রহে নয়, স্বার্থের সামঞ্জস্যে পরস্পরের সহায়তায়, তার পরিণতির পথে ক্রমে অগ্রসর হইতে পারে,—এইরূপ বিধিব্যবস্থার প্রবর্ত্তন ও তদনুরূপ শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবজাত সংস্কারে মানবচরিত্রের উন্নয়ন, সমাজধর্ম্মের অতি বড় একটি কর্ত্তব্য। পূর্ব্ব প্রবন্ধে ব্যষ্টির ধর্ম্মে ও সমষ্টির ধর্ম্মে সামঞ্জস্যস্থাপনার কথা বলিয়াছি। যেমন তাহা, তেমনই বিভিন্ন অঙ্গের ধর্ম্মের ও কর্ম্মের মধ্যেও এইরূপ সামঞ্জস্য স্থাপনা সমাজধর্ম্মের আর একটি বড় কাজ। দুইই মূলতঃ ব্যষ্টির ও সমষ্টির ধর্ম্মে সেই একই সামঞ্জস্যের দুইটি দিক মাত্র।

এই সামঞ্জস্য রক্ষার এবং তদুপযোগী নীতিস্থাপনার ও শিক্ষাদীক্ষার প্রবর্ত্তনের যে কাজ, তাহাই ব্রাহ্মণের কাজ। ব্রাহ্মণ যে সমাজে যত বেশী এই কাজে সফলতা দেখাইতে পারিয়াছেন, সমাজদেহের মস্তিষ্ক-রূপে, সমাজধর্ম্মের গুরুরূপে, তাঁহার উচ্চপদের গৌরব তত বেশী। *

* গ্রীকদার্শনিক প্লেটো তাঁহার বিখ্যাত 'Republic' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, 'ব্যস্ত'মানবের স্বরূপের সঙ্গে যে ষ্টেট্ বা সমাজরূপ 'সমস্ত' মানবস্বরূপের

এই যে কর্ম্মবিভাগে শ্রেণীবিভাগের কথা বলিলাম, সে কর্ম্মবিভাগ অবশ্য গুণবিভাগের সাপেক্ষ ; কিন্তু একেবারে absolute বা নিরপেক্ষ সম্পূর্ণতায় এরূপ একটা গুণবিভাগ কল্পনা করা যাইতে পারে বটে,

যত বেশী সাদৃশ্য আছে, সেই ষ্টেট্ বা সমাজ তত উৎকৃষ্ট। 'ব্যস্ত' মানবের দেহে বিভিন্ন অঙ্গ আছে ; এক অঙ্গে আঘাত লাগিলে সমগ্র দেহই সে ব্যথা অনুভব করে। তেমনই ষ্টেট্ বা সমাজও বিভিন্ন কর্ম্মের অনুযায়ী বিভিন্ন অঙ্গে গঠিত, এবং তাহারও এক অঙ্গে আঘাত লাগিলে অন্যান্য অঙ্গ সে আঘাতে চঞ্চল হইয়া উঠিবে।

প্লেটো আরও বলেন, মানবধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ প্রকাশ এই ষ্টেট্ বা সমাজ। মানব প্রকৃতির সকল শক্তি পরস্পরের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া এই ষ্টেট বা সমাজের স্বরূপেই আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। মানবপ্রকৃতিতে rational, spirited and desiring—অর্থাৎ এ দেশের তত্ত্ববিদ্যার ভাষায় সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ এই তিনটি গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। সত্ত্বগুণ রজোগুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সত্ত্ব ও রজোগুণ তমোগুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উন্নত মানবচরিত্রের লক্ষণই এই যে সত্ত্বগুণ রজোগুণকে বশে রাখে এবং এই উভয়গুণ তমোগুণকে বশে রাখে। তেমনই উন্নত সমাজেও সাত্ত্বিক (wise), রাজসিক (spirited) এবং তামসিক (desiring) এই তিন প্রকৃতির লোক দেখা যায়। সাত্ত্বিক রাজসিক অপেক্ষা এবং উভয়ই তামসিক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং সাত্ত্বিক অর্থাৎ জ্ঞানেধর্ম্মে উন্নত যাঁহারা, তাঁহারা ষ্টেট্ বা সমাজকে শাসন করিবেন,—রাজসিক অর্থাৎ শৌর্য্যবীর্য্যে শক্তিমান্ যাঁহারা, তাঁহারা ষ্টেট্ বা সমাজকে আপৎকালে রক্ষা করিবেন,—এবং বিষয়লুব্ধ যাঁহারা ব্যবসায়াদি কর্ম্মে ধনোপার্জ্জনে ব্যাপৃত, তাঁহারা প্রথম দুই শ্রেণীর শাসন মানিয়া চলিবেন। আর সমাজদেহের মঙ্গলের জন্য ইহাও প্রয়োজন যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে আশ্রিত বিভিন্ন অঙ্গ যার যার বিশিষ্টকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবে।

ব্যষ্টিভাবে এক একটি মানবের দেহের সঙ্গে মানবসমষ্টির বা ষ্টেটের যে সাদৃশ্য প্লেটো দেখাইয়াছেন, তাহাতে ইহাকে যে organism বলিয়াই তিনি বুঝিয়াছিলেন, একথা বলাই বাহুল্য। এই organismই হিন্দু ঋষিদের বিরাট্ পুরুষের মূর্ত্তি, অথবা তাহার একটা ভাব বা অংশ যাহা মানবসমাজরূপে

কিন্তু বাস্তব অবস্থায় তাহা সম্ভব হয় না। মানবস্বভাবেও এরূপ absolute বা নিরপেক্ষ সম্পূর্ণতায় গুণবিভাগ হইতে পারে না; মানবের মানবত্বই তাহাতে থাকে না। সকলের অন্তরেই মানবত্বের মূল সত্ত্ব (বা essence) স্বরূপ পরমাত্মার অংশ জীবাত্মা রহিয়াছেন। 'প্রকৃতির' সঙ্গে *যুক্ত হইয়া মূল জীবাত্মারূপ 'পুরুষই' * মানবরূপে অভিব্যক্ত হন।*

অভিব্যক্ত হইয়াছে। কেবল তাই নয়, এই organismএর উন্নত অবস্থার আদর্শও তিনি যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তার সঙ্গেও এই সমাজদেহে হিন্দুঋষিদের বর্ণিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণরূপ অঙ্গসংস্থানের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আমরা দেখিতে পাইব।

তবে এই সাদৃশ্যের মধ্যেও একটি বড় পার্থক্যও আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে এই, যে প্লেটো এবং পরবর্ত্তী পাশ্চাত্য সুধীবর্গ মানবসমষ্টির স্বরূপকে ষ্টেট্ রূপে দেখিয়াছেন। ষ্টেট্ বলিতে প্রধানতঃ যাহা বুঝায় এবং ইঁহারাও যাহা বুঝিয়াছেন, হিন্দুঋষিদের বিরাট্‌পুরুষের জ্ঞান বা conception তার অনেক উপরে। যে ধর্ম্মে এই বিরাট পুরুষরূপ সমাজদেহ আশ্রিত, তাহার প্রকৃতিও ষ্টেট্ রূপ সমাজদেহের আশ্রয় যে সব বিধিব্যবস্থাদি, তার প্রকৃতি হইতে পৃথক্ এবং উন্নত স্তরের বস্তু।

আর একটি সামান্য পার্থক্য আমরা লক্ষ্য করিব এই যে প্লেটো তাঁহার আদর্শ সমাজদেহে মাত্র তিনটি অঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—rational (সাত্ত্বিক), spirited (রাজসিক) এবং desiring (তামসিক)। প্রথম দুই অঙ্গ হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুইটি বর্ণের অনুরূপ। বৈশ্য শূদ্রকে তিনি সমান এক desiring বা তামসিক অঙ্গের মধ্যে ফেলিয়াছেন। তা ছাড়া, হিন্দুসমাজের ক্ষত্রিয়ের গুণ কেবলই রজঃ নয়, সত্ত্বের ভাগও তাহাতে যথেষ্ট আছে; আর বৈশ্যও কেবল তমোগুণময় নহে, রজোগুণ তার মধ্যে আছে, সত্ত্বও একেবারে বাদ পড়ে নাই। তমোগুণই প্রধান যাহাদের স্বভাবে, তাহারাই এ দেশের ঋষিদের দৃষ্টিতে শূদ্র।

* 'পুরুষ' ও 'প্রকৃতি' এই দুইটি নাম এখানে আমি সাংখ্যদর্শনের পরিভাষা হইতে গ্রহণ করিয়াছি। এই দর্শনের মতে প্রত্যেক জীবের তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করিলে তার মধ্যে মূল দুইটি সত্ত্ব পাওয়া যাইবে,—একটি সকল কর্ম্ম ও বিকারের অতীত বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ এক বস্তু। ইহাই পুরুষ, এবং বেদান্ত মতের জীবাত্মার

গুণ 'প্রকৃতির' ধর্ম্ম ; সব গুণ লইয়াই তিনি গুণময়ী 'প্রকৃতি'। কাহারও মধ্যে এই 'প্রকৃতি' কোনও গুণকে একেবারে বর্জ্জন করিয়া, তাহা হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া, থাকিতে পারেন না। 'প্রকৃতি'র প্রকৃতিত্বই তাহাতে থাকে না। তবে বিভিন্ন মানবে 'প্রকৃতির' বিভিন্ন গুণের অভিব্যক্তির তারতম্য ঘটে। তাই যদিও প্রত্যেক মানবই পরিপূর্ণ মানবস্বভাবের ও মানবধর্ম্মের অধিকারী জীব, স্বভাবের সকল গুণ, ধর্ম্মের সকল ভাব, সকল শক্তি—সকলের মধ্যে সমান ভাবে বিকাশ পায় না।

পায় যে না, তাহা ত দেখিতেও পাইতেছি। কিন্তু বিকাশই যদি না পাইল, তবে এই সব স্বভাবের গুণ, ধর্ম্মের শক্তি তার মধ্যে যে আছে, তার সার্থকতা কি ? বড় কঠিন একটি সমস্যার কথা উঠিল। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী অনেকে বলেন, মানবের জীবন কেবল মাত্র তার একটি জন্মমৃত্যুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, অখণ্ড এক ধারায় জন্মের পর জন্মে বহু যুগ যুগ তাহা ধরিয়া চলে। এক জন্মের অপূর্ণতা সুকৃতির ফলে ক্রমে জন্মের পর জন্মে পূর্ণ হইয়া আইসে, যতদিন না সম্পূর্ণ সিদ্ধি তার ঘটে। উচ্চতর গুণের ও শক্তির অধিকারী যাঁহারা, তাঁহারাও এইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু জন্মের সুকৃতির ফলে উচ্চতর সেই সব গুণের ও শক্তির অধিকার লাভ করিয়াছেন। অবশ্য অনেকে সত্য বলিয়া একথা শ্রদ্ধায় গ্রহণ করিবেন না ; কারণ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায়, সেরূপ

সঙ্গে ইহাকে একরূপ এক বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে। আর একটি সত্ত্ব রজঃ তমোগুণাত্মক এমন একটা কিছু যাহা, এই পুরুষের সঙ্গে যুক্ত হইয়া তাহার জ্ঞানগোচরে জীবের এই জীবনকে প্রকট করিতেছে। প্রত্যেক জীবই পুরুষ ও প্রকৃতির এইরূপ মিলনসম্ভূত বস্তু। প্রকৃতি হইতে পুরুষের ভেদ সাধারণতঃ আমরা ধরিতে পারিনা। এই ভেদের জ্ঞানকেই প্রকৃত পক্ষে 'বিবেক' বলে। এই বিবেক জাগ্রত হইলেই প্রকৃতির বন্ধন হইতে পুরুষের মুক্তি হয়।

কোনও প্রমাণে এই সত্য সিদ্ধ হইবে না। তবে যাঁহারা করিবেন না, কি করেন না, আর কি সূত্র তাঁহারা এই গুরু রহস্যের ধরিতে পারেন কি দেখাইতে পারেন, তাও জানি না।

সাংখ্যদর্শন 'প্রকৃতি'র মূল তিনটি গুণের কথা বলিয়াছেন, যথা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। প্রাচীন ভারতের পণ্ডিতরা বলেন, সত্ত্বপ্রধান, সত্ত্ব-রজঃ-প্রধান, রজস্তমঃ-প্রধান এবং তমঃ প্রধান, এই চারি প্রকার গুণ-বৈষম্য মানবস্বভাবে দেখা যায়। এই চারি প্রকার বৈষম্যহেতুই ব্রহ্মণ্য ক্ষাত্র বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিপ্রকার গুণধর্ম্মী মানব এই পৃথিবীতে আছে, কোনও একবিধ গুণের সম্পূর্ণতার বা সর্ব্বময়ত্বের হেতু নয়। সুতরাং বীজভাবে বা পরিণতির বিভিন্নস্তরে সকল গুণেরই প্রভাব প্রত্যেক মানবস্বভাবে থাকে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে তামসিকতার এবং বৈশ্যশূদ্রের মধ্যেও সাত্ত্বিকতার প্রভাব তাই অনেক সময়ে প্রকাশ পায়। তারপর সাধারণতঃ বংশপরম্পরায় গুণের সঞ্চার হইলেও, অনেক সময় বড় বড় ব্যতিরেকও দেখা যায়। তাই ব্রাহ্মণকুলে শূদ্রাধম এবং শূদ্রকুলেও ব্রহ্মণোত্তমের আভির্ভাব ঘটে। পরন্তু এই দুই রকমের মধ্যবর্ত্তী আরও বহুরূপ ব্যতিরেকও সর্ব্বত্রই দেখা যাইবে। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে ক্ষত্রিয় সুরথ ও বৈশ্য সমাধির আখ্যানে এই সত্যের সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। উভয়েই একই মেধস্ ঋষির নিকটে দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার উপদেশে দীর্ঘকাল একই নিয়মে দেবীর আরাধনা করেন। দেবী যখন তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলেন,—সুরথ প্রার্থনা করিলেন, রাজ্যৈশ্বর্য্য ;* আর সমাধি প্রার্থনা করিলেন, মোক্ষের অনুকূল তত্ত্বজ্ঞান।

ইহার কারণ কি ? এই যে গুণকর্ম্ম বৈষম্য, তাহা কি তবে সাধারণ একটা নৈসর্গিক নিয়ম নয় ? তাই বা কি প্রকারে বলি ? এই বৈষম্য যে সর্ব্বত্রই দেখা যায়। আবার তার মধ্যে এই সব ব্যতিরেকের দৃষ্টান্তও রহিয়াছে। তবে কি এ সব নিসর্গের খেয়াল (freaks of nature) মাত্র ? কিন্তু নিসর্গের স্বরূপ বা তার কর্ত্তা

যিনি, তাঁহাতে এইরূপ খেয়াল বা freaksএর আরোপই বা কি প্রকারে করা যায় ?

বস্তুতঃ মানবস্বভাবের রহস্য এতই গূঢ়, এতই জটিল, যে ইহাকে ভেদ করিয়া, ইহার বিশ্লেষণ করিয়া, সম্পূর্ণ সমঞ্জস একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বড় সহজ কথা নহে। তবে প্রাচীন তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ, তাঁহাদের কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের তত্ত্বে, এই মীমাংসার একটা সূত্র দেখাইয়াছেন। এই সূত্র যাঁহারা ধরিতে পারিবেন, তাঁহারা বোধ হয় সাধারণ নৈসর্গিক নীতির সঙ্গে তার এই ব্যতিরেকের একটা সামঞ্জস্যের পথ পাইবেন।

যাহা হউক, সাধারণ নীতির মধ্যে এই ব্যতিরেক যখন সত্য, তত্ত্বদর্শীর দৃষ্টিতে অসমঞ্জসও নয়, তখন মানবসমাজের কর্ম্মবিভাগের ব্যবস্থাতেই বা এই নীতির সঙ্গে ব্যতিরেকের একটা সামঞ্জস্য কেন থাকিবে না ? গুণ এবং কর্ম্ম, গুণের অধিকারে কর্ম্মের অধিকার, যদি বাস্তবিকই বর্ণ বা শ্রেণা বিভাগের প্রধান ভিত্তি হয়, বংশানুক্রমিক অধিকারকে যদি তার উপরে তুলিয়া সমাজবিন্যাসের ও কর্ম্মবিভাগের একেবারে অলঙ্ঘনীয় রীতি করা না হয়, তবে এরূপ সামঞ্জস্যের বিধান অসম্ভব কিছু নয়। যে গুণকর্ম্ম শাসক ও পরিচালকের গুণকর্ম্ম, বৈশ্যসন্তান যে পরিমাণে এই গুণের অধিকারী, এই কর্ম্মের যোগ্য, সেই পরিমাণে এই প্রভুত্বে তাহারও ভাগ আছে; শূদ্রসন্তানও তাহাতে বঞ্চিত হইতে পারে না, গুণকর্ম্মে যদি তার এইরূপ অধিকার থাকে। বস্তুতঃ চতুর্ব্বর্ণ যদি ভগবান্ গুণকর্ম্মের বিভাগেই সৃষ্টি করিয়া থাকেন, আর সেই গুণকর্ম্মের বিভাগ যদি একেবারে বংশানুক্রমিক ধারার অধীনই না হয়, তবে ব্রহ্মণ্য কি ক্ষাত্র ধর্ম্মের অধিকার হইতে বৈশ্য-সন্তান কি শূদ্রসন্তান একেবারে বহিষ্কৃত থাকিতে পারে না। বর্ণ বা শ্রেণীতে না হউক, অন্ততঃ কর্ম্মে স্বাভাবিক গুণের এই অধিকারকে কোন সমাজই অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই। কিছু কঠিন হইলেও, গুণ সর্ব্বত্রই আপনাকে স্বাভাবিক অধিকারে

প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। প্রচলিত রীতি সাধারণ নিয়মেরই অনুবর্ত্তী হইয়া চলে বটে, চলার বড় একটা সার্থকতাও আছে; তবে ব্যতিরেকের এইরূপ একটা সামঞ্জস্যের অবসরও তার মধ্যে থাকা চাই। একেবারে প্রাণহীন একটা stereotyped অবস্থায় গিয়া কোনও সমাজ না পড়িলে, তাহা থাকে।

ব্যষ্টিভাবে এক একটি জীবদেহ বা মানবদেহ এক একটি অর্গানিজম্ এবং তাহাদের এক একটি সমষ্টিও অর্গানিজম্। গুণ-কর্ম্মভেদে এই দুই প্রকার organismএর মধ্যে অঙ্গভেদের একটা সাদৃশ্যও পণ্ডিতেরা দেখাইয়া থাকেন। সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে এই ভেদ ঠিক একরকম নয়, একরকম হইতেও পারে না। জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ যে বিভিন্নপ্রকার কোষে (cell এ) গঠিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে সমাজদেহের বিভিন্ন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ব্যষ্টি-মানবের একটা তুলনা করা হয় বটে; কিন্তু সম্পূর্ণ এক একটি ব্যষ্টি-মানবের ধর্ম্ম যে একেবারে এইরূপ এক একটা কোষের ধর্ম্মেরই সমান, একথা কেহ মনে করিতেও পারেন না। এক একটি মানব যেমন জীবাত্মার অধিকারী এক একটি Ego (অর্থাৎ আমি 'জ্ঞাতা' আমি 'কর্ত্তা' এইরূপ বোধের অভিমানী পুরুষ), জীবিত ও প্রাণময় বস্তু হইলেও কোষগুলিতে সেরূপ কিছু ধর্ম্ম আছে, এমন কথাও কেহ কখনও বলেন নাই। ব্যষ্টি-জীবদেহের অঙ্গগঠনে, তাহার ধর্ম্মনিরূপণে, এই সব কোষের কোন কর্ত্তৃত্বের আভাসও পাওয়া যায় না। কিন্তু সমষ্টির দেহগঠনে ব্যষ্টি-মানবের যে বহু কর্ত্তৃত্ব আছে, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তারপর, যে অঙ্গের যেরূপ কোষরূপে তার উদ্ভব হয়, কোষ তাই থাকে। অঙ্গও যে আকার ধরিয়া যে ধর্ম্মের জন্য অভিব্যক্ত হয়, সেই আকারে থাকিয়া সেই কর্ম্মই মাত্র করে। এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের আকার ধরে না, তার কাজও করে না। পা মাথা হয় না, মাথাও পা হয় না; মাথার কাজ পা করে না, পায়ের কাজও মাথা করে না। কিন্তু সমষ্টির বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে

রূপে বা আকারে এরূপ ভেদ নাই ; গুণে কি কর্ম্মেও এমন পূরাপূরি ভেদ কখনও হয় না। কারণ প্রত্যেক মানবই সম্পূর্ণ মানবধর্ম্মের অধিকারী জীব। কেবল সম্পূর্ণ মানবধর্ম্মই বা বলি কেন, যোগীরা বলেন, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই, সূক্ষ্মরূপে মানবদেহেব মধ্যে রহিয়াছে। তাই মানবকে তাঁহারা 'ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড' * এই নামও দেন। সুতরাং বিশাল এই ব্রহ্মাণ্ড যে ধর্ম্মে আশ্রিত, মানবের মধ্যেও সম্পূর্ণ সেই ধর্ম্ম সূক্ষ্ম বীজ আকারে রহিয়াছে। পরমাত্মার জীবাত্মারূপ প্রকাশ যে মানব, এই সত্যই তাহাকে জীবাত্মার পূর্ণ স্বভাবে ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপতা দিয়াছে।

সমষ্টির দেহগঠনে, তার অঙ্গবিন্যাসে, বিভিন্ন অঙ্গের ও সমগ্র দেহের ধর্ম্মের নিয়মসংস্থাপনার উপরে. ব্যষ্টিভাবে মানবের কর্ত্তব্যের যে বড় একটা অধিকার আছে, এবং এই অধিকার বলেই যে অনেক পরিমাণে তাহা নিরূপিত হয়, তাহাতেই ব্যষ্টিরূপ অর্গানিজম্ হইতে সমষ্টিরূপ অর্গানিজমের প্রকৃতিতে এই পার্থক্য হইয়াছে।

জর্ম্মাণসমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ব্লুণ্টস্লি সাহেবের অনেক উক্তি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। এ সম্বন্ধে তাঁহার আর একটি উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"The State, indeed, is not a product of nature, and therefore, it is not a natural organism ; it is indirectly the work of man. The tendency to political life is to be found in human nature, and so far the State

---

* এদেশের প্রাচীন সাহিত্যে বিশ্বজগৎ ও মানব সম্বন্ধে 'ব্রহ্মাণ্ড' ও 'পিণ্ডাণ্ড' এই দুইটি কথা আছে। এ 'পিণ্ডাণ্ড' 'ব্রহ্মাণ্ডে'রই সূক্ষ্ম একটি প্রতিরূপ, যোগীরা এইরূপ বলেন। গ্রীক্ দার্শনিকেরা এই ভাবে macrocosm ও microcosm এই দুইটি নাম ব্যবহার করেন। 'ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড' নামটি এই microcosm কথাটির অনুবাদ। 'পিণ্ডাণ্ড' কথাটি তেমন প্রচলিত নাই বলিয়া এই 'ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড' নামই অনেকে ব্যবহার করেন।

has a natural basis; but the realisation of this political tendency is left to human labour and human arrangement, and so far the State is a product of human activity, and its organism is a copy of a natural organism." *

[The Theory of State, Bluntschli, Book I. Chap. II. p. 19.]

এই পুস্তকের এই অধ্যায়ে ২২ পৃষ্ঠায় তিনি আবার বলিতেছেন,—

"Whilst history explains the organic nature of the State, we learn from it at the same time that the State does not stand on the same grade with the lower organisms of plants and animals, but is of a higher kind; we learn that it is a moral and spiritual organism, a great body which is capable of taking up into itself the feelings and thoughts of the nation, of uttering them in laws and realising them in acts; we are informed of moral qualities and of the character of each State. History ascribes to the State a personality which, having spirit and body, possesses and manifests a will of its own."

ঠিক কথা। তবে প্রথম উদ্ধৃত অংশে তিনি যে ষ্টেটকে বা সমাজকে product of nature ও natural organism নয়, এই কথাটি বলিয়াছেন, তাহা ঠিক এই ভাবে আমরা স্বীকার করিয়া নিতে পারি না। তার পরেই যে তিনি বলিয়াছেন,—it is indirectly the work of man, তাহাও indirectly the work of nature.

* অবতরণিকা ৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এ সম্বন্ধে ১৮৩পৃষ্ঠায় আচার্য্য হাক্‌স্লি সাহেবের উক্তি এবং প্রবন্ধের শেষে টিপ্পনীর দিকে পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

যাহা হউক, মোটের উপর গুণভেদ অনুসারে কর্ম্মভেদের অবশ্যম্ভাবিতা, ইহার প্রয়োজন ও সার্থকতা সকলে যে অস্বীকার করেন, তা নয়। তবে এই ভেদের রকম কি হইবে,এই ভেদ অবলম্বনে স্থায়ী শ্রেণীবিভাগ সমাজে অপরিহার্য্য বা একান্ত প্রয়োজন কি না, যদি হয় তবে এই শ্রেণীবিভাগ বংশানুক্রমিক হইবে কি না, এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে উন্নয়ন কি অবনয়ন হইতে পারে কি না, হইলেও তাহা কিরূপ ভাবে হইবে, পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের ব্যবহার কিরূপ হইবে, অধিকার কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কার কত দূর থাকিবে, কি নিয়মে তাহা চলিবে, ইত্যাদি সম্বন্ধে মতদ্বৈধ অনেক আছে, ও হইতে পারে। আরও একটি বড় মতদ্বৈধের কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, এবং তাহা এই, যে সমষ্টিধর্ম্মের অধিকার ব্যষ্টির জীবনে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কত দূর কি ভাবে থাকিবে, এবং উভয়ের অধিকারের মধ্যে সীমা রেখা কোথায় পড়িবে।

ক্রমে যথাপ্রসঙ্গে এই সব কথার আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

[টিপ্পনী।—১৮৩ পৃষ্ঠায় Nature ও Society সম্বন্ধে অধ্যাপক হাক্‌স্লি (Huxley) সাহেবের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি ; উক্তিটি এই :—

"In the strict sense of the word "nature," it denotes the sum of the phenomenal world, of that which has been, and is, and will be ; and society, like art, is therefore a part of nature."

কিন্তু ইহার পরেই হাক্‌স্লি (Huxley) সাহেব আবার বলিতেছেন, যে সাক্ষাৎভাবে মানুষ যাহা করে, সুবিধার খাতিরে তাহাকে পৃথক্ কিছু বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে। আর্ট অপেক্ষা সমাজের পক্ষে এই পার্থক্যের বিবেচনা যেমন অধিকতর বাঞ্ছনীয়, তেমনই প্রয়োজন। কারণ সমাজের একটা moral বা ধর্ম্মনৈতিক লক্ষ্য আছে, যাহা nature এর নাই। এই জন্যই এইরূপ ঘটে যে ethical man

বা নিবৃত্তিমার্গী মানব জীবনযাপনের যে নীতি অবলম্বন করিয়াছে, তাহা non-ethical বা প্রবৃত্তিমার্গী মানবের জীবনের গতির বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়। যে শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবজাত এই নিবৃত্তিধর্ম্মের গুণে ethical man উন্নত সমাজের যোগ্য সামাজিক, উন্নত ষ্টেটের যোগ্য প্রজা হইতে পারিয়াছেন, সেই শিক্ষাদীক্ষার অভাবেই আদিম বর্ব্বরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত মানব non-ethical রহিয়াছে, এবং একেবারে তার প্রবৃত্তির বশে চলিতে চায়। জীবনসংগ্রামে এই non-ethical মানব একেবারে পশুর ন্যায় তার অসংযত প্রবৃত্তির তাড়নায় চলে, অপরকে একেবারে ধ্বংস করিয়া আপনার স্বার্থের প্রতিষ্ঠা চায়। কিন্তু শিক্ষার সংস্কারে উন্নত ethical man অপর সকলের *মঙ্গলের প্রয়োজনে এই সংগ্রামে নিবৃত্তির রশ্মিতে প্রবৃত্তিকে সংযত করে।*

এই দুইটি উক্তি কতকপরিমাণে পরস্পরের বিরোধী বলিয়া মনে হয়। সবই যদি 'nature' বা নিসর্গের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মার্গ উভয়ই নিসর্গের মার্গ। তামসিক বা তমোনুবিদ্ধ রাজসী প্রবৃত্তি (animal passions) যেমন মানুষের স্বভাবে আছে, তেমনই আবার নিবৃত্তি বা এই animal passionsকে সংযত করিয়া সুপথে চলিবার মত একটা প্রেরণাও তার স্বভাবে আছে। এই প্রেরণাকে বা নিবৃত্তিকে সাত্ত্বিকপ্রবৃত্তিও বলা যাইতে পারে। তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব সবই এক প্রকৃতির ধর্ম্ম। তিন গুণের ক্রিয়া এক প্রকৃতিরই ক্রিয়া। যাহাকে আদিম সমাজ ইঁহারা বলেন, অতি প্রাচীন সেই আদিম সমাজের মধ্যেও নিবৃত্তিমার্গের বা সাত্ত্বিকী প্রবৃত্তির অধিকারী মানবের দৃষ্টান্ত কম নয়। আবার আধুনিক সুসভ্য উন্নত সমাজেও তামসী ও তমোনুবিদ্ধ রাজসী প্রবৃত্তির মানব বহুসংখ্যায় দেখা যায়। এই প্রকৃতির বা নিসর্গের অধিদেবতা যিনি, এই জগৎপ্রপঞ্চ যাঁহাতে বা যাঁহা হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, ethical manএর সংযম ও ত্যাগের প্রেরক ও পথনির্দ্দেশক তিনিই; তাহার উন্নত নির্ম্মল বুদ্ধি ও চিত্তবৃত্তি, এবং non-ethical manএর মোহান্ধকারাচ্ছন্ন মমত্ব, সবই তাঁহারই লীলা। মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীতে বহু শ্লোকে বহুভাবে এই সত্যটি বিবৃত হইয়াছে। তার কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূর্তা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥"

"মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতি মহাদেবী মহাস্বরী॥"
"প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।
কালরাত্রির্ম্মহারাত্রির্ম্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা॥"
"ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্নাভুবি মুক্তির্হেতুঃ॥"

মানবেতর জীবজগতে nature বা নিসর্গের যেরূপ ক্রিয়া বা লীলা দেখা যায়, Evolution Theory তাহাই মাত্র নিসর্গের অধিকারের সীমার মধ্যে ধরিয়াছেন। ইহার মধ্যে Ethicsএর বা ধর্ম্মনীতির কোনও স্থান নাই। মানুষের মধ্যেও nature এর ক্রিয়া যাহা, তাহাকেও তাঁহারা এইরূপই মনে করেন। এই মতের প্রভাবেই বোধ হয় Huxley সাহেব ethical manকে natural man হইতে এই ভাবে বিশিষ্ট করিয়াছেন। বেঞ্জামিন কিডের মধ্যেও এই মতের প্রভাব দেখা যায়। তাই তিনিও এক স্থলে বলিয়াছেন,—

"The interests of the social organism and those of the individuals comprising it at any particular time are actually antagonitstic; they can never be reconciled; they are inherently and essentially irreconcilable." [Social Evolution, Ch. III. P. 85]

এই মতের অনুবর্ত্তনে পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় তাঁহার আর একটি উক্তি এই,—

"All methods and systems alike, which have endeavoured to find in the nature of things any universal rational sanction for individual conduct in a progessive society, must be ultimately fruitless."

যাহা বিজ্ঞানসিদ্ধ (scientifically established) তাহাই rational বলিয়া ইহারা মনে করেন। এই মতানুসারে মানুষ তাহার rational বুদ্ধিতে কেবল নিজের স্বার্থসাধনেরই চেষ্টা করিবে। কিন্তু উন্নতিশীল সমাজে মানুষকে অবিরত সমাজের কল্যাণে অর্থাৎ তাহার উচ্চতর স্বার্থের খাতিরে নিজের ক্ষুদ্রতর স্বার্থকে ত্যাগ করিয়া চলিতে হয়। পূর্ব্ব প্রবন্ধে ১৫৭ পৃষ্ঠায় বেঞ্জামিন কিডের যে একটি উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে সমাজের মঙ্গলে ব্যষ্টির ব্যক্তিগত স্বার্থের যে

effective subordinationএর কথা তিনি বলিয়াছেন, তার প্রকৃত তাৎপর্য্য ইহা। এখন এই স্বার্থত্যাগের প্রেরণা কোথা হইতে আসিবে? তিনি বলেন, ধর্ম্ম হইতে; এবং ধর্ম্মের ভিত্তি তাঁহার মতে rational নয়, ultra-rational অর্থাৎ rationalএর অতীত। যাহা ultra-rational, তাহাই super-natural. কিন্তু ভারতের তত্ত্বদর্শী ঋষিরা তাঁহাদের দৃষ্টিতে naturalএ ও super-naturalএ, rationalএ ও ultra-rationalএ এরূপ কোনও ভেদ দেখেন নাই। তাঁহারা বলেন, সবই এক "গুণত্রয়বিভাবিনী" পরাপ্রকৃতি বা পরাশক্তির, ব্রহ্মময়ী মহামায়ার, বিভিন্ন স্তরে লীলাময়ত্মক প্রকাশ।

তাই সমষ্টির ও ব্যষ্টির ধর্ম্মে তাঁহারা কোনও বিরোধ দেখেন নাই। ব্যষ্টি যাহাতে এই সত্য বুঝিয়া, স্বেচ্ছায়, বাধ্য হইয়া নয়, সমষ্টির ধর্ম্ম মানিয়া চলে চলিয়া ধন্য হয়,—সমাজবিধি, ধর্ম্মনীতি ও শিক্ষার ব্যবস্থা—সকলেরই এই লক্ষ্য ছিল। এই ভাবেই তাহা নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। চেষ্টা সর্ব্বত্রই সফল হইয়াছিল একথা বলি না। কিন্তু চেষ্টা ছিল এইরূপ; এবং বিফলতায় যখন অমঙ্গলের সূচনা দেখা দিয়াছে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম সমাজের আভ্যন্তরিক শক্তিতেই যথাপ্রয়োজন অভ্যুত্থিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি ও ধর্ম্মানুগত চরিত্র, যাহা লইয়া সে ethical man, তাহা তাহার স্বভাবেরই বিশেষ একটা দিকের বিকাশ; বাহির হইতে চাপান কোনও গুণ নহে। অন্তরে এই বুদ্ধির, এই চরিত্রের, যে বীজ থাকে, অনুকূল অবস্থায় ও উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষায় তাহাই ফুটিয়া উঠে। আর এই যে বাহির হইতে চাপান হইবে, সেই বাহিরটা কি? কোথায়? সমগ্র এই বিশ্ব লইয়াই না নিসর্গ বা nature? ইহার বাহিরে কি থাকিতে পারে? Huxley সাহেবের প্রথম উক্তিটি এই সত্যকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। Moral order বলিয়া যে বস্তু, তাহা Cosmic orderএরই একটি ভাব, বিধা বা mode, Cosmic orderকে তাই একেবারে non-moral বলা চলে না। Evolution of Ethics কথাটার অর্থ মানবচরিত্রে ও মানবসমাজে ধর্ম্মনীতির অভিব্যক্তি। অনেকে এই অভিব্যক্তির একটি প্রণালীর কথা বিবৃত করিয়াছেন। যে ভাবেই তাহা করুন, অভিব্যক্তি বলিতেই বুঝা যায় কিছুর প্রকাশ। কিছু বীজ আকারে ছিল বলিয়াই না তার অভিব্যক্তি সম্ভব হয়? 'কিছু না' হইতে কোনও 'কিছুর' প্রকাশ হইতে পারে না.]

ইয়োরোপে ন্যাসনালিজম্।

পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি প্রবন্ধে যে সব কথার আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে মানবজীবন সম্বন্ধে এই কয়েকটি সাধারণ সত্য বোধ হয় আমরা ধরিতে পারিয়াছি।

(১) ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক মানব কোনও না কোনও সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত এবং বহু মঙ্গলের জন্য সমষ্টির উপরে নির্ভরশীল। সুতরাং তার ব্যক্তিত্বের মহিমা যত বড়ই হউক, মোটের উপর তাকে সমষ্টি-ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইবে। নতুবা সমষ্টির সংহতি থাকে না; সমষ্টিভাবে তার কোনওরূপ উন্নতিও হয় না।

(২) ব্যষ্টিকে সমষ্টি-ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইবে বলিয়াই যে তাহার ব্যক্তিত্বের মহিমা কিছু ক্ষুন্ন হয়, তা নয়। মোহমুক্ত উন্নত নির্ম্মল দৃষ্টিতে দেখিলে সমষ্টির ধর্ম্মে ও ব্যষ্টির ধর্ম্মে একটা সামঞ্জস্য ব্যতীত বিরোধ কিছু দেখা যাইবে না। ব্যষ্টি নিজেই বুঝিবে, এই অনুবর্ত্তিতা তাহার ধর্ম্মেরই অঙ্গীয়। ব্যষ্টির ও সমষ্টির ধর্ম্মে বাস্তবিক কোনও বিরোধ নাই,—বিরোধ যাহা আছে, পার্থিব স্বার্থে।

(৩) ব্যষ্টি যেমন সমষ্টির উপরে নির্ভরশীল, সমষ্টির উন্নতিও তেমনই উন্নত ব্যষ্টিজীবনের উপরে নির্ভর করে। সুতরাং ব্যষ্টিজীবনের উন্নতির পরিপন্থী হয়, এরূপ কিছু সমষ্টির প্রকৃত ধর্ম্মের অঙ্গীয় হইতে পারে না।

(৪) সাধারণ কোনও সভাসমিতি যে ভাবে গড়া হয়, মানবের কোনও সমষ্টি বা সমাজ সে ভাবে কোনও এক সময়ের জনগণকর্ত্তৃক নিজেদের বিশেষ বিশেষ কতকগুলি কাজের সুবিধার জন্য সকলের মতে স্থির করা কোনও নিয়মপ্রণালী ধরিয়া গড়া জিনিষ নয়। শক্তিমান্ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির উচ্চতর জ্ঞান, ধর্ম্মের প্রেরণা, কর্ম্মশক্তি প্রভৃতি যতই ইহাতে সহায়তা করুক, প্রত্যেক মানবসমষ্টি

বা সমাজ বিশ্বাভিব্যক্তির মধ্যে মানবজীবনের উন্নতির সঙ্গে নৈসর্গিক নিয়মে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই ভাবে প্রত্যেক সমষ্টির যে এক একটি অর্গাণিক প্রকৃতি আছে, ব্যষ্টিজীবনের সঙ্গে তাহার অনেক সাদৃশ্যও দেখা যায়।

(৫) ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক মানব মানবাত্মার মূলসত্তার অধিকারী হইলেও, যে কারণেই হউক, মানবপ্রকৃতির গুণ সকলের মধ্যে সমানভাবে অভিব্যক্ত হয় নাই; সুতরাং সকল মানব সকল বিষয়ে সমান নহে। পরন্তু বুদ্ধিতে, শক্তিতে ও চরিত্রধর্ম্মে বহু বৈষম্যই মানবে মানবে দেখা যায়। গুণবৈষম্যহেতু কর্ম্মবৈষম্য, এবং কর্ম্মবৈষম্যহেতু কর্ম্মে অধিকারেরও বৈষম্য মানবের মধ্যে স্বাভাবিক বৈষম্য।

(৬) এই বৈষম্য অবলম্বনে উন্নত সমষ্টির মধ্যে একটা শ্রেণী বিভাগ দেখা দেয় এবং এই সব শ্রেণী মোট সমাজদেহের বিভিন্ন অঙ্গ স্বরূপ। সকলেই সকলের উপরে নির্ভর করে, সকলেরই কর্ম্ম পরস্পরসাপেক্ষ। সকলের সমবেত কর্ম্মে মোট সমাজদেহের জীবনের কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়,—এবং তাহাতে সমগ্র এই দেহের মঙ্গলে সকলেরই মঙ্গল সাধিত হয়।

(৭) প্রত্যেক সমষ্টির সঙ্গে সমষ্টির আশ্রয়স্বরূপ তার একটা ধারকশক্তিও গড়িয়া উঠে। ধর্ম্মপদ্ধতি (রিলিজন), রাজশাসন-পদ্ধতি এবং পরম্পরাগত আচারনিয়ম, এই সবকে অবলম্বন করিয়া এই শক্তির একটা স্থাপনা হয়; একটা আকার তাহা ধারণ করে।

(৮) সুনীতির আদর্শ স্থাপনায় ও কর্ম্মশৃঙ্খলার প্রবর্ত্তনে সমষ্টিকে রক্ষা করিয়া উন্নতির পথে তাহাকে পরিচালনা করা সমষ্টির এই শক্তির বা ধর্ম্মের প্রধান কর্ম্ম। ব্যষ্টির ও সমষ্টির এবং বিভিন্ন শ্রেণীর, কর্ম্মের ও ন্যায্য অধিকারের মধ্যে সামঞ্জস্যস্থাপনা ও তাহা রক্ষা করিবার সামর্থ্যের উপরে সমষ্টিশক্তির সার্থকতা বহু পরিমাণে নির্ভর করে।

(৯) গুণকর্ম্মবৈষম্যে সমাজদেহের বিভিন্ন অঙ্গরূপ যে শ্রেণীবিভাগ ঘটে, তাহা সাধারণতঃ চারিটি প্রকৃতির দেখা

যায়। এই চারি প্রকৃতির বিশিষ্টতা ধরিয়া এই চারি শ্রেণীকে প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের ভাষায়, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি নাম দেওয়া যাইতে পারে। ইঁহাদের মধ্যে বিশিষ্ট গুণকর্ম্মে ব্রহ্মণ্য ও ক্ষাত্র ধর্ম্মের অধিকারী যাঁহারা, সমষ্টিশক্তির উপরে নেতৃত্ব ও কর্ত্তৃত্বের ভার তাঁহারাই নিতে পারেন।

(১০) ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেও মুল নিয়ন্তৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণের পক্ষে ব্রাহ্মণই যোগ্যতর, এবং এই ভাবে ক্ষাত্রশক্তি ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাবের দ্বারা সংযত না থাকিলে তাহা অনেক সময় অতিশয় উগ্র হইয়া উঠে। আবার ব্রাহ্মণও অনেক সময়ে ব্রহ্মণ্য গুণের বিশিষ্টতা হারাইয়া ক্ষাত্রশক্তিকে বিকৃতধর্ম্মের অনুশাসনে বশীভূত করিয়া লোকসমাজের বহু অহিত সাধন করিতে পারেন।

(১১) রাষ্ট্রীয়শক্তি বা ষ্টেট্ই প্রধান ধারক, এইরূপ কোন কোনও সমাজে শাসকসম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় স্পষ্ট এইরূপ দুইটি শ্রেণী বিভাগ দেখা যায় না। উভয় ধর্ম্মের অধিকারই মিশ্রিত এক সম্প্রদায়ের হাতে গিয়া পড়ে। এরূপ সব সমাজে ব্রহ্মণ্য গুণ বহুপরিমাণে ক্ষাত্রশক্তির দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে, আপন বিশিষ্টতায় আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না। সুতরাং অসংযত ক্ষাত্রশক্তিই প্রধান হইয়া উঠে। এই শক্তিতে পাড়িত শাসিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে পীড়ক শাসকসম্প্রদায়ের বড় একটা বিরোধও এইরূপ সব সমাজে অনেক সময়ে দেখা দেয়।

(১২) প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ এবং তার পরে ক্ষত্রিয় এই উভয় সম্প্রদায়ের হস্তে স্বভাবতঃই সমাজরক্ষার ও সমাজশাসনের অধিকার গিয়া পড়ে বটে,—কিন্তু যে সমাজে যত তাঁহারা ন্যায়ধর্ম্মানুগত পথে এই অধিকার পরিচালনা করিতে পারেন, যত তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বাধীনতায় অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ সুশৃঙ্খলায় ও নিরাপদে নিজ নিজ কর্ম্মের ভাগ নির্ব্বাহ করিয়া সুখে শান্তিতে থাকিতে পারে, নিজেদের

ন্যায্য অধিকারভোগে জীবনের একটা সার্থকতার তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিতে পারে, সেই সমাজ তত বেশী মঙ্গলে থাকে।

(১৩) কেবল সম্প্রদায়ভাবে নয়, ব্যষ্টিভাবেও, যে সমাজের জনগণ সমষ্টিধর্ম্মের অনুবর্ত্তী থাকিয়াও যত বেশী তার ব্যক্তিগত ধর্ম্মের ন্যায্য অধিকার ভোগ করিতে পারিবে, মঙ্গলে সেই সমাজের স্থিতিও ততবেশী দৃঢ় হইবে।

প্রাচীন কালে এবং প্রাচীনকাল হইতে এ পর্য্যন্ত যত মানব সমাজের ইতিহাস পাওয়া যায়, আভ্যন্তরিক অবস্থা পরীক্ষা করিলে এই সত্যগুলির যথেষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। * তবে ব্যষ্টির ও সমষ্টির সম্বন্ধে

* প্রাচীন গ্রীক ও রোমকসমাজে শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে একটা ইহার ব্যতিরেকের মত ভাব দেখা যাইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই দুইটি দেশের সমাজশক্তির ধারক ছিল, সর্ব্বতোভাবে ষ্টেট; ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক মানবও সর্ব্বতোভাবে ষ্টেটের প্রজা মাত্র বলিয়া গণ্য হইত; ষ্টেটের প্রজা ভিন্ন আর কোনও ভাবে কোন মানবের একটা বিশিষ্ট-স্বাতন্ত্র্য কি এই স্বাতন্ত্র্যের অধিকার স্বীকৃত হইত না। সুতরাং স্বাভাবিক গুণকর্ম্মের বৈষম্য আভ্যন্তরিক অবস্থায় যাহাই থাক, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রই সমষ্টি জীবনের সর্ব্বপ্রধান ক্ষেত্র হওয়ায় এই রাষ্ট্র বা ষ্টেটের শাসনসম্পর্কে প্রজারূপে জনগণের অধিকারকে অবলম্বন করিয়াই একরূপ রাষ্ট্রীয় শ্রেণীবিভাগের রীতি এই দুই দেশে দেখা দিয়াছিল;—অন্যরূপ সামাজিক শ্রেণীবিভাগ স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিবার অবসরই পায় নাই। কিন্তু ইহার মধ্যেও শাসকসম্প্রদায় যে গুণে শাসন করিতেন, তাহা যদি আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, ব্রহ্মণ্য ও ক্ষাত্রগুণই দেখিতে পাইব; এবং কিছু পূর্ব্বে যে ব্রহ্মণ্য ও ক্ষাত্রধর্ম্মের অধিকারী মিশ্রিত এক সম্প্রদায়ের কথা বলিয়াছি, গ্রীক ও রোমক রাজ্যে শাসকসম্প্রদায় অনেকটা এইরূপ মিশ্রিত এক সম্প্রদায়ই ছিলেন। তারপর উচ্চবিদ্যার অধিকার ও আধ্যাত্মিক ধর্ম্মে উৎকর্ষ—দুইই ব্রহ্মণ্যগুণের প্রধান দুইটি দিক্। প্রথম গুণে ব্রাহ্মণ সমাজের বিদ্যাজ্ঞানের স্থাপক ও শিক্ষক, দ্বিতীয় গুণে ব্রাহ্মণ সমাজের ধর্ম্মগুরু এবং ধর্ম্ম-নীতির প্রবর্ত্তক ও পরিচালক। এই দ্বিতীয়গুণ-বিশিষ্ট কোনও ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় এই দুই দেশে না থাকিলেও, প্রথম গুণের অধিকারী ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব ও প্রভাব এই দুই দেশে—বিশেষতঃ গ্রীসে—যারপরনাই জাগ্রত ছিল। গ্রীক

এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অধিকারের একটা সামঞ্জস্যরক্ষায় সকল সমাজের কৃতিত্ব সমান দেখা যায় নাই। কোথাও ব্রাহ্মণের, কোথাও ক্ষত্রিয়ের, কোথাও বা উভয়ের সমবেত শক্তি, অতিপুষ্ট ও অতি প্রবল হইয়া অন্য দুই অঙ্গ বৈশ্য ও শূদ্রের শাসনে ন্যায়ধর্ম্মের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। আবার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়—শাসকসম্প্রদায়ের এই দুই শাখার মধ্যেও শক্তির সামঞ্জস্য রক্ষিত না হইলে সমাজের শাসন সুপথে চলেনা। একের প্রভাব অপরকে অনেক পরিমাণে অভিভূত করিয়া রাখিয়া, আপন শক্তির অপ-প্রয়োগ করে; উভয়ের মধ্যে বড় বিরোধও ঘটিতে পারে। যেখানেই এরূপ ঘটিয়াছে, বহু অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। প্রত্যেক শাখাই আপন প্রাধান্য স্থির রাখিতে সকল শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন, সমাজের মঙ্গল কিসে হইবে সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে পারেন নাই।

বিদ্যার খ্যাতি সকলেরই সুপরিচিত। গ্রীক পণ্ডিতগণ যে ভাবে বিদ্যার আলোচনা এবং শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে এই বিদ্যার প্রচার করিতেন, তাহার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিদ্যালোচনা ও বিদ্যাপ্রচারের রীতির বেশ একটা সাদৃশ্যও দেখা যায়।

তারপর এই দুই জাতি বিদ্যায় ও রাষ্ট্রীয় শক্তিতেই সমধিক উন্নতি লাভ করেন। ব্যবসায়বাণিজ্যাদি ব্যাপারে ইঁহাদের তেমন কোনও প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় না। বিশিষ্ট কোনও বৈশ্যসম্প্রদায়ের উদ্ভব যে ইঁহাদের মধ্যে ঘটে নাই, ইহাও তাহার একটি কারণ। বৈশ্যকে ও শূদ্রকে গ্রীক দার্শনিক প্লেটো যে সমাজের সমান এক desiring element বা তামসিক অঙ্গের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন, ইহাও এই সত্যের সাক্ষ্য দিতেছে।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে ১৮৮—৯০ পৃষ্ঠার পাদটীকায় ষ্টেট ও ষ্টেটের শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে প্লেটোর কয়েকটি মন্তব্যের কথা বলিয়াছি। সমষ্টিজীবনে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেরই এইরূপ সর্ব্বময় প্রতিষ্ঠাহেতু রাষ্ট্রীয়সম্বন্ধে শ্রেণীবিভাগ বাহিরে যে আকারেই গ্রীক্ অঞ্চলে দেখা দিক, অভ্যন্তরে গুণকর্ম্মের বৈষম্যে স্বাভাবিক নীতির একটা প্রভাব যে ছিল, প্লেটোর সেই বিশ্লেষণ ও সমাজশাসনের রীতিনির্দ্দেশ হইতে তাহারও স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

এই *সামঞ্জস্যস্থাপনাও* উচ্চতম ব্রহ্মণ্যের কর্ম্ম। ঋষিতুল্য যে সব মহাপুরুষ সমাজে আভির্ভূত হন, এই সামঞ্জস্যস্থাপনার মূল নীতি তাঁহারাই নির্দ্দেশ করেন। তাঁহাদের আদর্শের অনুবর্ত্তনে তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত শিক্ষায় ও সাধনায় উন্নত চরিত্রবল যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণের মধ্যেও উচ্চতম ব্রহ্মণ্যের অধিকারী, ব্রাহ্মণের গুরু, তাঁহারাই। ব্যক্তিগত কি সম্প্রদায়গত স্বার্থের দিকে নয়, মোট সমাজের মঙ্গল কিসে হইবে, সেই দিকেই ইঁহাদের লক্ষ্য থাকে, জীবনের সকল কর্ম্ম এই লক্ষ্যসাধনের দিকেই প্রেরিত হয়। ইঁহাদের শিষ্যত্বের গুণেই সমাজের মস্তক হইয়া ব্রাহ্মণসম্প্রদায় সমাজধর্ম্মের নিয়ন্তৃত্বের অধিকার পাইতে পারেন। যত এই শিক্ষা তাঁহাদের মধ্যে সার্থক হইবে, ততই তাঁহারা এই নিয়ন্তৃত্বের বেশী যোগ্য হইবেন।

'ইয়োরোপীয় র‍্যাসনালিজম্' *এই সব সত্যকে অস্বীকার করিয়া* ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে মানবের জীবন সম্বন্ধে নূতন ও পৃথক এক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। কেন চায়, এবং এই আদর্শই বা কি, তাহা *এই প্রবন্ধে আমরা বুঝিবার চেষ্টা করিব।*

পশ্চিম রোমসাম্রাজ্য ধ্বংসের পর কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া ইয়োরোপে একটা বিপ্লবের অবস্থা চলে। এই যুগ ইয়োরোপের ইতিহাসে Dark Age বা তামস-যুগ নামে পরিচিত। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে ইয়োরোপে ক্রমে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলার সঙ্গে বিশিষ্ট একটা সমাজজীবন গড়িয়া উঠে। কেহ যে কোনও উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, তদনুরূপ নীতি ও বিধির সাহায্যে এই সমাজ গড়েন, তা নয়। বিপ্লব হইতে রাষ্ট্রীয় স্থিতির অবস্থা যেমন আসিতে লাগিল, এই সমাজ আপনাহইতেই আপনি গড়িয়া উঠিল, রাষ্ট্রীয় বিধানকেও আপনার প্রকৃতির অনুরূপ করিয়া নিল। স্বাভাবিক নীতির অনুবর্ত্তী সমাজের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে,ইহার মধ্যে তাহারই লক্ষণ আমরা দেখিতে পাইব।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মনীতি মানবে মানবে কোনও পার্থক্য স্বীকার করে না। কিন্তু মধ্যযুগের খৃষ্টান এই ইয়োরোপীয় সমাজে পর পর চারিটি

প্রকৃতির বিশিষ্ট চারিটি শ্রেণী আমরা দেখিতে পাই। (১) Clergy বা যাজক সম্প্রদায় (২) Royalty ও Nobility বা শাসক রাজন্য ও ভূস্বামী সম্প্রদায়, (৩) Bourgeoisie (বুর্জোয়াজে) বা নাগরিক ব্যবসায়িক সম্প্রদায় * (৪) Serfs, villeins, labourers বা দরিদ্র কৃষক ও মজুর সম্প্রদায়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৃত্তি বিভিন্ন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকারেও বিভিন্নতা যথেষ্ট ছিল। সকলেই যার যার বৃত্তির ও অন্যান্য অধিকারের সীমার মধ্যে সাধারণতঃ থাকিতেন। যাজকবর্গের বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং এই সম্প্রদায়ের পক্ষে বংশানুক্রমিক একটা জাতি বা casteএর মত কিছু হইবার সম্ভাবনা ছিল না। অন্যান্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গ উপযুক্ত শিক্ষা এবং বিশেষ একটা দীক্ষার পর যাজকপদে বৃত হইতেন। কিন্তু অন্য তিন সম্প্রদায়ের জীবন সাধারণতঃ বংশানুক্রমিক ধারাতেই চলিত। তবে যোগ্যতা থাকিলে এক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে অন্য সম্প্রদায়ে স্থান লাভ করা একেবারে অসম্ভব ছিল না। যদিও এরূপ দৃষ্টান্ত কম দেখা যাইত। Bourgeoisie বা ব্যবসায়িক কাহারও পক্ষে ধনবলে ও শৌর্য্যবীর্য্যে ভূস্বামীসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ লাভ কখনও কখনও ঘটিত বটে, কিন্তু দরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের হইতে কাহারও পক্ষে উচ্চতর দুই সম্প্রদায়ে প্রবেশের ভাগ্য একরূপ ঘটিত না বলিলেই হয়।

ইয়োরোপীয় সমাজের এই চারিটি সম্প্রদায় যে গুণে কর্ম্মে প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুসমাজের চতুর্ব্বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের অনুরূপ, একথা আর না বলিলেও চলে।

এই সম্প্রদায়গুলির নাম ছিল 'Estate' অর্থাৎ সমাজের স্থিতিমূলক বিভিন্ন স্তর বা শ্রেণী। রাজারা রাজকার্য্যের সহায়তার জন্য মধ্যে মধ্যে যে প্রজাসভা আহ্বান করিতেন, তাহাতে বিভিন্ন estate এর প্রতিনিধিরা আসিতেন ; ভিন্ন ভিন্ন বৈঠকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের আলোচনা

---

* প্রবন্ধের শেষে টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

করিতেন। এই সভার নামও ছিল Estates General অর্থাৎ প্রজামণ্ডলীর বিভিন্ন শ্রেণীর সম্মেলন। সাধারণতঃ প্রথম তিন শ্রেণীর প্রতিনিধিরাই আসিতেন; নিম্নতম সম্প্রদায়ের অর্থাৎ ইয়োরোপীয় তৎকালীন শূদ্রের প্রতিনিধি কখনও আসিত বলিয়া শোনা যায় না। ইহাদের এরূপ কোনও অধিকারই স্বীকৃত হইত না; এই অধিকার পরিচালনার যোগ্যতাও ইহাদের ছিল না। এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব অবশ্য ছিল; সর্ব্বত্রই থাকে। কিন্তু বিশেষ কোনও অধিকারভোগী রীতিমত একটা estate বলিয়া প্রথম তিন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা ইহাদের গণ্য করিতেন না। বস্তুতঃ ফরাসী বিপ্লবের যুগে, বিপ্লবনীতির প্রবর্ত্তক লেখকগণ চতুর্থ estate এই নাম কতকটা রঙ্গচ্ছলেই ব্যবহার করিতেন।

এই যে সমাজবিন্যাস তখন ইয়োরোপে ছিল, ইহাতে সুনীতির স্থাপনা, মঙ্গলকর পথে সমাজের পরিচালনা প্রভৃতি কর্ম্মের অধিকার স্বভাবতঃই ইয়োরোপের Clergy বা ব্রাহ্মণের হাতে, এবং তাহার রক্ষণ ও শাসন ইয়োরোপের Royalty ও Nobility বা ক্ষত্রিয়ের হাতে গিয়া পড়ে। কিন্তু ইহাতে ইয়োরোপের এই ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় কেহই তাহাদের কর্ম্মের ভাগ সুসম্পন্ন করিতে পারেন নাই। সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলে সমাজের স্থিতিসম্বন্ধে যে আদর্শের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ আদর্শের মাত্রায় পৃথিবীর কোনও সমাজই যে উঠিতে পারিয়াছে, এই ধর্ম্মপালনে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় (বিশেষভাবে ব্রাহ্মণ) কোনও সমাজেই যে সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে পারিয়াছেন, এ কথা বলিতে পারি না। কিন্তু ইয়োরোপের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ইহাতে যেরূপ ব্যর্থ হইয়াছিলেন, এরূপ ব্যর্থতা বোধ হয় আর কোনও সমাজেই দেখা যাইবে না।

কেবল ব্যর্থ বলিলেই যথেষ্ট হয় না। আপনাদের পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে ইয়োরোপীয় সমাজের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পীড়ন নিম্নতর শ্রেণী সমুহের উপরে এত অধিক মাত্রায় গিয়া উঠিয়াছিল,

ইঁহাদের শাসন ব্যক্তিগতভাবে সকল মানবের এবং শ্রেণীভাবে নিম্নতর দুই শ্রেণীর সকল ন্যায্য অধিকারের সীমা এমনই ভাবে সকলদিকে লঙ্ঘন করিয়াছিল, যে তার তুলনা বাস্তবিক অন্য কোথাও পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ।

যে 'র‍্যাসনালিজিম্' (Rationalism) মতের আবির্ভাব ও প্রভাবের কথা পূর্ব্বে অনেক স্থলে বলিয়াছি, তাহা এই জনপীড়ক অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে অতি প্রবল একটা বিদ্রোহের ফল। সুতরাং এই বিদ্রোহ কেন এই ভাবে প্রকাশ পায়, এই মতের সব নীতিই বা কেন এরূপ হয়, তাহা বুঝিতে হইলে ইয়োরোপায় এই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের স্থাপনার নীতি, শাসনের প্রকৃতি কিরূপ ছিল.—কিভাবে কিরূপ সব অবস্থার প্রভাবে এই রীতি ধরিয়া ইঁহাদের এই স্থাপনা ঘটে, ইঁহাদের শক্তির প্রতিষ্ঠা হয়,—এই সব বিষয়ের একটু আলোচনা প্রয়োজন। কথাটা বুঝাও প্রয়োজন,—কারণ বর্ত্তমান জগতে মানবের বুদ্ধির ও চিন্তার উপরে ইয়োরোপীয় এই Rationalistic মতের প্রভাবই প্রাধান্য করিতেছে, এবং কর্ম্মজীবন ইহার অনুবর্ত্তনে প্রাচীন সকল ধর্ম্মের, সকল আচারনিয়মের বন্ধন ছিন্ন করিয়া নূতন এক পথ ধরিতে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। অথচ এই মত নৈসর্গিক ধর্ম্মের সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত এরূপ বলা যায় না। ইয়োরোপেও অনেকে অধুনা ইহা স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু ইহার এই প্রভাব যে তাহাতে শিথিল হইতেছে, এরূপ লক্ষণ বড় কিছু দেখা যায় না।

খৃষ্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দীতে সমগ্র দক্ষিণ ও পশ্চিম ইয়োরোপ ভরিয়া রোমকসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল।—ইয়োরোপের বাহিরেও পশ্চিম এশিয়ার অনেক অংশ এবং সমগ্র উত্তর আফ্রিকা এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। এই সময়ে রোমকসাম্রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে খৃষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। সম্রাট্‌দের মধ্যে কাহারও কাহারও অতিশয় পীড়ন সত্ত্বেও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রভাবই বাড়িতে লাগিল,—এবং সর্ব্বত্রই বহু প্রজা এই ধর্ম্মের শিষ্য হইল। শেষে খৃষ্টীয় চতুর্থ

শতাব্দীতে সম্রাট্‌গণ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করায় ইহা রোমক সাম্রাজ্যেরই ধর্ম্ম হইল; এবং ক্রমে রোমান্ ও খৃষ্টান দুই নাম প্রায় সমানার্থসূচক হইয়া দাঁড়াইল। রোমক সাম্রাজ্যের বাহিরে খৃষ্টধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা একরকম কিছু ছিল না বলিলেই হয়, সুতরাং যে রোমান্ সেই খৃষ্টান্, যে খৃষ্টান্ সেই রোমান্, সহজেই এইরূপ একটা সংস্কার লোকের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। পূর্ব্ব হইতে ইহার অনুকূল আর একটা সংস্কারও খৃষ্টানদের মধ্যে দেখা দিয়াছিল এই যে খৃষ্টধর্ম্মেরই অস্তিত্ব রোমক সাম্রাজ্যের উপরে নির্ভর করে। রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বংস কখনও হইলেই অতিলৌকিক শক্তিধর একজন খৃষ্ট-বৈরীর (Anti-christএর) আবির্ভাব হইবে। তাই সহস্রপীড়ন সত্ত্বেও খৃষ্টীয় সমাজ রোমকসাম্রাজ্যের শাসনের বিরুদ্ধে কোনও বিদ্রোহচেষ্টা করে নাই।

এই সমাজের ধর্ম্মশাসনের বিভিন্ন কেন্দ্রে 'বিশপ' নামে এক একজন অধ্যক্ষযাজক এবং তাঁহার অধীনস্থ অঞ্চলে আরও অনেক সহকারী যাজক মনোনীত হইতেন। মধ্যে মধ্যে ইঁহারা কোনও এক স্থানে সমবেত হইয়া খৃষ্টীয় সমাজের ধর্ম্মপদ্ধতি কিরূপ হইবে, তাহাও স্থির করিয়া নিতেন। এইভাবে খৃষ্টীয় শক্তির একটা সংহতি ও স্থাপনাও গড়িয়া উঠিতে থাকে। ইহাই হইল খৃষ্টীয় 'চার্চ্চ' নামক organisationএর সূত্রপাৎ। তারপর যখন খৃষ্টীয় ধর্ম্ম রোমক-সাম্রাজ্যের ধর্ম্ম হইল, তখন ক্রমে সেই সাম্রাজ্যের শাসন শক্তির স্থাপনার আদর্শে খৃষ্টীয় যাজকমণ্ডলীরও একটা শক্তিস্থাপনা গড়িয়া উঠিল।

রোমক চার্চ্চ নামক দৃঢ়সঙ্ঘবদ্ধ এক যাজকমণ্ডলীর স্থাপনা বিশিষ্ট এক মূর্ত্তি ধরিয়া এইভাবে দেখা দিল। ইহার আদর্শ হইল এইরূপ :—

রোমক সাম্রাজ্য বা রাষ্ট্রমহামণ্ডলের প্রভু ছিলেন রোমক রাষ্ট্রাধিপতি বা সম্রাট,—তেমনই এই রোমক চার্চ্চ বা ধর্ম্মমহামণ্ডলের

প্রভু হইলেন, রোমের বিশপ বা প্রধান অধ্যক্ষ যাজক, যিনি 'পিতা' এই অর্থসূচক 'পোপ' নামে পরিচিত হন। রাষ্ট্রাধিপতির প্রভুত্বের অধীনতায় বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা, শাসনকর্ত্তাদের নিম্নে যেমন রাজকর্ম্মচারীবর্গের একটা পর্য্যায় ছিল, এবং সকলে যেমন একই রাজধানীর কেন্দ্র হইতে প্রচারিত বিধিব্যবস্থাদি মানিয়া চলিতেন,—তেমনই রোমীয় পোপের অধীনতায় বিভিন্ন প্রদেশের 'আর্চ্চবিশপ' হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম গ্রাম্যযাজক পর্য্যন্ত রীতিমত একটা যাজকের পর্য্যায় হইল, এবং সকলে এক যাজকরাজ পোপের অনুশাসন মানিয়া চলিবেন, এই নীতিও গৃহীত হইয়া উঠিল।

প্রাচীন রোমকসাম্রাজ্য যতদিন বর্ত্তমান ছিল এবং সম্রাটদের প্রতাপের বশীভূত হইয়া পোপদের চলিতে হইত, এই আদর্শে তাঁহাদের প্রভুত্বের স্থাপনা পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। পরে দুই তিনশত-বৎসরব্যাপী জর্ম্মাণবিপ্লবের মধ্যে বহু অনুকূল ঘটনার সহায়তার এই বিকাশ ঘটে।

রোমক সামাজ্যের বাহিরে ইয়োরোপ ভরিয়া বহু গোষ্ঠীতে বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত জর্ম্মাণজাতি বাস করিত। অপেক্ষাকৃত অনেক বর্ব্বরাবস্থাপন্ন হইলেও শৌর্য্যবীর্য্যে ইহারা অতি প্রচণ্ড ছিল। রোমক সম্রাটরা ইহাদের জয় করিতে কখনও পারেন নাই,—রোমক সভ্যতাও ইহাদের মধ্যে কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে দুর্ব্বার একটা প্লাবনের মত ইহারা রোমক সাম্রাজ্যের উপরে আসিয়া পড়িতে লাগিল, এবং ক্রমে সমগ্র পশ্চিম রোমক সাম্রাজ্য ভরিয়া জর্ম্মাণ দলপতিগণের বহু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

ইহার কিছু কাল পূর্ব্বে রোমক সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। পশ্চিম ইয়োরোপব্যাপী পশ্চিমভাগ প্রাচীন রাজ-ধানী রোমের শাসনাধীন ছিল,—এবং গ্রীক্ অঞ্চল, এসিয়া

মাইনর ও মিসর প্রভৃতি পূর্ব্বভাগের রাজধানী হইয়াছিল সম্রাট্ কন্‌ষ্টাণ্টাইন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত নগর কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল। এই ভাগের নাম হয় প্রাচ্য রোমক সাম্রাজ্য এবং অন্য ভাগের নাম হয় প্রতীচ্য বা পশ্চিম রোমক সাম্রাজ্য। পৃথক দুইজন সম্রাট্ও দুইটি ভাগ শাসন করিতে আরম্ভ করেন। যাহা হউক, এই পশ্চিম রোমক সাম্রাজ্য এইরূপে জর্ম্মাণবিপ্লবে ধ্বংস হইল বটে, কিন্তু প্রাচ্য রোমকসাম্রাজ্য বর্ত্তমান রহিল *। রোম সাম্রাজ্যের একটা মহিমা বহুদিন অবধি জর্ম্মাণদের চিত্তকে এতই অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল, যে সমগ্র পশ্চিমসাম্রাজ্য এইরূপে অধিকার করিয়াও তাহারা মনে করিতে পারিত না যে রোমক সাম্রাজ্য বলিয়া প্রাচীন অত বড় একটা শক্তিমান্ প্রতিষ্ঠান নাই বা থাকিতে পারে না। কার্য্যতঃ কোনও আনুগত্য না করিলেও, নূতন এই জর্ম্মাণ রাজারা নামতঃ প্রাচ্য রোমকসম্রাট্‌কে আপনাদের উপরিতন প্রভু বলিয়া মানিয়া নিলেন।

রোমের সাম্রাজ্য ধ্বংস হইল বটে, কিন্তু চার্চ্চ রহিয়া গেল। বরং সম্রাট্‌দের প্রভুত্ব হইতে মুক্ত হওয়ায় ইহার প্রতিপত্তি বাড়িল। সম্রাট্‌দের অভাবে বিদ্যা ও ধর্ম্ম প্রভৃতি রোমক সভ্যতার অবশেষ যাহা

---

* এই সাম্রাজ্য খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। গ্রীক অঞ্চলে ইহার শাসন কেন্দ্র ছিল, এবং গ্রীক বিদ্যা ও সভ্যতার প্রভাবই ইহার মধ্যে প্রধান হয়। তাই 'গ্রাক্ সাম্রাজ্য' এই আর একটা নামও ইহার হয়। রোম ও পশ্চিম সাম্রাজ্য হইতে একেবারে পৃথক হইয়া পড়ায়, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের পৃথক এক রকম পদ্ধতিও এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'গ্রীক চার্চ্চ' নামে ইহা পরিচিত, এবং পেট্রিয়ার্ক (Patriarch) উপাধিধারী কনষ্টাণ্টিনোপলের বিশপ বা যাজক-রাজ ইহার প্রভু ছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তুর্কী জাতি এই সাম্রাজ্য জয় করেন এবং সেই অবধি কনষ্টাণ্টিনোপল তুর্কী মুসলমানদের রাজধানী। মুসলমান অধিকারের পর রুষরাজ্য গ্রীক্ চার্চ্চের প্রধান কেন্দ্র হয়। কনষ্টাণ্টি-নোপলের আর একটি নাম ছিল রোম বা রুম; এসিয়াবাসী মুশলমানগণ তাই তুর্কী সুলতানকে 'রুমের বাদসাহও' বলিয়া থাকেন।

কিছু ছিল, সব রক্ষা করিবার ভারও ইহার হাতে পড়িল। জর্ম্মাণ ভূপতিরাও এই চার্চ্চকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, ইহার বিরুদ্ধাচরণ কিছু করিতেন না। এই সুযোগে রোমকচার্চ্চ আপনার ঘর আরও ভাল করিয়া গুছাইয়া নিলেন, এবং নবাগত এই জর্ম্মাণদিগকে স্বীয় মতানুযায়ী ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া, আপন ধর্ম্মশাসনের মধ্যে আনিলেন। তারপর রোমক সভ্যতার প্রভাব যাহাতে তাঁহাদের বিস্তার লাভ করে, সেই দিকে সর্ব্বপ্রযত্নে ব্রতী হইলেন। এই প্রচেষ্টা তাঁহাদের সার্থক হয়। যে সব জর্ম্মাণ রোমীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে অধিকার ও বসতি স্থাপন করিয়াছিল, তাহারা রোমক ধর্ম্মাবলম্বী হইল, এবং যত দূর সম্ভব রোমক চালচলনের অনুবর্ত্তী হইয়া সাম্রাজ্যের পূর্ব্বতন অধিবাসীদের সঙ্গে একেবারে মিলিয়া এক হইয়া গেল। ইহাদের ভাষাও হইল তখনকার প্রাদেশিক রোমক ভাষা। বর্ত্তমান ইয়োরোপের স্পেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড এবং ইটালীর অধিবাসীরা এইরূপ রোমক মিশ্রিত রোমক ভাবাপন্ন জর্ম্মাণ জাতি সমূহের (Romanised Germanদের) বংশধর।*

---

* ইটালী ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলের প্রজারা ছিল জাতিহিসাবে প্রধানতঃ, কেণ্ট, মূল রোমক বা লাটিন জাতি হইতে পৃথক্ এক জাতি, আর্য্যজাতির ভিন্ন এক শাখা। এই কেণ্টরা পূর্ব্বেই রোমকদের সঙ্গে মিলিয়া একরূপ এক জাতি হইয়া গিয়াছিল। বৃটিশ দ্বীপও রোমীয় সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ ছিল। এই সময়ে জর্ম্মাণদের দুই তিনটি শাখা—বর্ত্তমান্ ইংরেজ জাতির আদিপুরুষ—বৃটিশদ্বীপ অধিকার করেন, এবং তাঁহাদের নাম হইতেই ইহার বড় এক ভাগের নাম হয় ইংলণ্ড। কিন্তু ইহারা প্রাচীন অধিবাসীদিগকে প্রায় উচ্ছেদ বা উদ্বাস্তু করিয়া আপনারাই সমগ্র দেশ অধিকার করেন। রোম হইতে অনেক দূরে এক দ্বীপ বলিয়া রোমক সভ্যতার প্রভাবও এখানে বড় পৌঁছিতে পারে নাই। তাই রোমকসাম্রাজ্য-বিজয়ীদের মধ্যে একমাত্র ইংরেজ জাতিই আপনাদের জর্ম্মাণ বৈশিষ্ট বজায় রাখিতে পারেন, এবং ইংরেজি ভাষাও প্রাচীন জর্ম্মাণ ভাষার একটি শাখা।

এইরূপে রোমক সাম্রাজ্য জয় করিয়া, রোমক প্রদেশগুলির রাজা হইয়াও, জর্ম্মাণরা আর এক ভাবে রোমকচার্চ্চ কর্ত্তৃক বিজিত হইলেন,—রোমক ধর্ম্মশাসনের এবং সভ্যতার প্রভাবের অধীন হইয়া পড়িলেন। বিপ্লব আরম্ভ হইবার দুই তিনশত বৎসরের মধ্যেই জর্ম্মাণদের উপরে রোমকচার্চ্চের এই বিজয়গৌরবের প্রতিষ্ঠা হইয়া যায়। নব্য ইযোরোপে রোমক চার্চ্চের শক্তি ও প্রতিপত্তি যে ইহাতে কত বাড়িয়া উঠিল, তাহা সকলেই সহজে অনুমান করিতে পারিবেন।

ইতি মধ্যে আর একটি ব্যাপার এই শক্তির ও প্রতিপত্তির বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে। যে সব জর্ম্মাণগোষ্ঠী বিধ্বস্ত রোমক-সাম্রাজ্যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহাদের মধ্যে ফ্রাঙ্ক নামক এক গোষ্ঠী বা শাখা ক্রমে অতি প্রবল হইয়া উঠেন, এবং অপর সকলকে একরূপ অভিভূত করিয়া পশ্চিম ও মধ্য ইয়োরোপে বৃহৎ এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

ইঁহারা রোমক চার্চ্চের বিশেষ অনুগত ছিলেন, এবং পোপরাও ইঁহাদের এই প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠায় অনেক সহায়তা করেন। বিনিময়ে আপনাদের শক্তিবৃদ্ধিকল্পে ইঁহাদের বহু সহায়তাও তাঁহারা লাভ করেন। সুবৃহৎ ফ্রাঙ্ক রাজ্য ভরিয়া সহজেই রোমকচার্চ্চের ধর্ম্মশাসন-যন্ত্র বিস্তৃত হইল এবং ইটালীর মধ্যভাগে বৃহৎ এক ভূখণ্ড জয় করিয়া ফ্রাঙ্করাজ চার্চ্চকে তাহা দান করিলেন। পোপদের শাসিত এক রাজ্যের মতই এই অঞ্চল হইয়া উঠিল। এইরূপে ফ্রাঙ্করাজ্য এবং রোমক চার্চ্চের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ একটা মিত্রতার ও সহ-যোগিতার সম্বন্ধ ঘটিল। পশ্চিম ইয়োরোপের রোমকসাম্রাজ্য তখন লোপ পাইয়াছিল, সম্রাট্ও কেহ ছিলেন না। প্রাচ্য রোমক সম্রাটের প্রতি একটা অনুগত্যের রীতিও তখন প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে সার্লেমান্ নামে অতিশয় শক্তিশালী এক রাজা ফ্রাঙ্করাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। খৃষ্টীয় ৮০০ শত সালে 'খৃষ্টমাস' (Christmas) উৎসবের দিন রোমের পোপ এই সার্লেমান্‌কে

রোমকসম্রাট্ উপাধি দান করিয়া সম্রাটের পদে অভিষিক্ত করিলেন।

এইভাবে রোমক চার্চ্চের হাতে রোমক সাম্রাজ্যের একরূপ পুনরুভ্যুদয় হইল। প্রাচীন সেই রোমক সাম্রাজ্যের সঙ্গে ইহার কোনও রূপ ধারাবাহিক সম্বন্ধ, অথবা অন্য কোনওরূপ সাদৃশ্যও ছিল না। কিন্তু লোকে ইহাকেই রোমক সাম্রাজ্য বলিয়া মানিয়া নিল। রোমক চার্চ্চের সঙ্গেও এই রোমক সাম্রাজ্যের একরূপ অঙ্গাঙ্গী একটা সম্বন্ধ হইয়া উঠিল। উভয় অঙ্গের সমবেত শাসনই সমগ্র খৃষ্টীয় সমাজের ধর্ম্মবিহিত শাসন এইরূপ একটি theory বা মতবাদেরও উদ্ভব হইল। ইহার মোট কথাগুলি এইরূপ :—

সমগ্র খৃষ্টীয় সমাজ এক সেই ভগবানের শাসনাধীন। এই শাসনের দুইটা দিক্ বা ভাব। একটি Spitritual—আধ্যাত্মিক ও ধর্ম্মনৈতিক, অপরটি Temporal পার্থিব বা রাষ্ট্রীয়। তাঁহার আধ্যাত্মিক ও ধর্ম্মনৈতিক শাসনের যন্ত্রকে যেমন তিনি রোমক চার্চ্চ বা ধর্ম্মমহামণ্ডলরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, পার্থিব বা রাষ্ট্রীয় শাসনের যন্ত্রকেও তেমনই রোমক সাম্রাজ্য বা রাষ্ট্র মহামণ্ডলরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।*

* রোমক সাম্রাজ্যের অতিলৌকিক একটা মহিমার উপরে প্রথম যুগের খৃষ্টীয় সমাজের কিরূপ একটা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। "Render unto Cæser the things which are Cæser's (অর্থাৎ রোমক সম্রাটের যাহা প্রাপ্য বা অধিকার তাহা তাহাকে দিও) স্বয়ং যিশু খৃষ্টেরই এইরূপ একটা উপদেশ আছে। তাঁহার আদিম প্রধান শিষ্যগণও সম্রাটের শাসনের অনুগত থাকিতে খৃষ্টানদের উপদেশ দিতেন। ইহাহইতেই বোধ হয় খৃষ্টীয়ধর্ম্মের মঙ্গল যে রোমকসাম্রাজ্যের উপরে নির্ভর করে, এইরূপ সংস্কার খৃষ্টানদের মধ্যে জন্মে। সম্রাটের উপরে এই ভগবৎ-প্রতিনিধিত্ব আরোপেরও মূল ভিত্তি এই।

আবার যিশুখৃষ্টের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন, সেণ্টপিটার (St. Peter)। ইঁহার হাতেই যিশুখৃষ্ট 'স্বর্গের চাবী' (key to Heaven) অর্পণ করেন। অবশ্য সর্ব্বপ্রধান গুরুর অধিকারই এই স্বর্গের 'চাবী' কথাটির তাৎপর্য্য বলিয়া

পোপ ও সম্রাট্ এই দুইজন প্রতিনিধির উপরে স্বয়ং ভগবানই তাঁহার এই দুইটি শাসনযন্ত্র পরিচালনার ভার দিয়াছেন,—ইঁহারা দুইজনে যেন তাঁহারই দুইখানি হাত – তাঁহারই দুইটি শাসন দণ্ড ধরিয়া আছেন। সুতরাং ধর্ম্মনীতিসংক্রান্ত এবং রাষ্ট্রনীতিসংক্রান্ত সকল ব্যাপারে খৃষ্টীয় সমাজকে এই দুই ভাগবত শাসনদণ্ডের অধীন থাকিতে হইবে, এবং ভগবৎপ্রতিনিধি বলিয়া ভগবদাদেশের মতই ইঁহাদের আদেশ মানিতে হইবে। নতুবা ভগবদ্‌বিদ্রোহরূপ অমার্জ্জনীয় পাপের ভাগী তাঁহারা হইবেন।

প্রাচীন রোমকসাম্রাজ্যের অধীশ্বরগণের নিরপেক্ষ প্রভুত্ব বা absolute authority প্রজামণ্ডলীকে মানিয়া চলিতে হইত, কিন্তু ইহার নৈতিক ভিত্তি ছিল এই প্রজামণ্ডলীর সম্মতি। সম্রাট্ তাঁহাদের সর্ব্বসম্মত অধীশ্বর, যতদিন এই পদে তিনি বৃত আছেন, (অথবা প্রজারা তাঁহাকে বরণ করিয়া রাখিয়াছে), ততদিন তাঁহার এই শাসনপ্রভুত্ব তাহারা মানিয়া চলিতে বাধ্য। বাস্তবক্ষেত্রে যেভাবেই সম্রাট্‌রা তাঁহাদের অধিকার লাভ করুন বা পরিচালনা করুন, প্রাক্‌খৃষ্টীয় যুগে এই theory বা কল্পনার দ্বারা প্রজাবর্গের উপরে তাঁহাদের প্রভুত্বের একটা নীতিসঙ্গতি দেখান হইত। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম যখন পাকাপাকিভাবে রোমকসাম্রাজ্যের ধর্ম্ম হইল, রোমক চার্চ্চের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে রোমকসাম্রাজ্যবাদের (Empire Theoryর)ও এইরূপ নূতন একটা পরিণতি আরম্ভ হয়।—কিন্তু পোপ ও সম্রাট্ যে ভগবানের দুই বাহুর ন্যায় দুইজন প্রতিনিধি এবং তাঁহারই নিয়োগে ধর্ম্মসম্বন্ধে ও রাষ্ট্রসম্বন্ধে সমগ্র খৃষ্টসমাজের

বুঝিতে হইবে। একটি প্রবাদ এই ছিল যে সেণ্টপিটারই রোমের প্রথম বিশপের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী পোপগণ ইঁহারই উত্তরাধিকারী, সুতরাং এই 'স্বর্গের চাবী' বা প্রধান গুরুর সব অধিকার তাঁহাদের হাতে আসিয়াছে। পোপদের ভগবৎ-প্রতিনিধিত্বের দাবীও প্রধানতঃ এই প্রবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রভু, এইরূপ স্পষ্ট একটা মতবাদ বা theory তখনও দেখা দেয় নাই। দেখা দেয়, সার্লেমানের অভিষেকের পর নূতন এই সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের পরে। পূর্ব্বে ছিল শুধুই রোমকসাম্রাজ্য; নূতন এই সাম্রাজ্যের নামও তাই হইল, The Holy Roman Empire বা রোমক ধর্ম্মরাজ্য। *

সম্রাটের এই প্রভুত্ব বাস্তবভাবে খৃষ্টীয় সমাজের উপরে কখনও প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত হয় নাই। তৎকালীন জর্ম্মাণার রাজারাই সাধারণতঃ সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত হইতেন; কিন্তু জর্ম্মাণীর বাহিরে অন্যান্য দেশের রাজারা তাঁহাদের এই পদগৌরবের উচ্চতর মর্য্যাদাকে স্বীকার করিলেও, কোনওরূপ প্রভুত্ব কেহ কখনও মানিয়া চলেন নাই। সম্রাট্‌রাও বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে এরূপ অসম্ভব একটা দাবী কখনও করিতেন না, কারণ এত বড় দাবী চালাইবার মত কোনও শক্তিই তাঁহাদের ছিল না। জর্ম্মাণীর মধ্যে সামন্ত রাজগণও সাধারণ

---

* এই সাম্রাজ্য নামতঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। অষ্ট্রীয়ার রাজবংশ এই অধিকার ভোগ করিতেন, যদিও লোকে এই সব অধিকারের কথাও তখন বড় ভাবিত না, সম্রাটদেরও ইহার অনুরূপ কোনও শক্তিপ্রতিপত্তি ছিল না। রোমক প্রকৃতির বা ধর্ম্মনীতির প্রভাব যা কিছু ছিল, তাও লোপ পাইয়াছিল। বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত ভল্টেয়ার বিদ্রূপরঙ্গে এই সাম্রাজ্য সম্বন্ধে বড় সুন্দর একটি কথা বলিয়াছিলেন এই যে Holy Roman Empire নামে একটা প্রতিষ্ঠান চলিতেছে, though it was no longer Holy, nor Roman, nor Empire. ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে মহাবীর নেপোলিয়ানের সঙ্গে যুদ্ধের সময় অষ্ট্রীয়রাজ 'রোমক সম্রাট্' উপাধি ত্যাগ করিয়া 'অষ্ট্রীয় সম্রাট্' এই উপাধি গ্রহণ করেন, এবং এইরূপে রোমকসাম্রাজ্যের শেষ নামটাও লোপ পায়। অষ্ট্রীয়রাজের এই অভিপ্রায় ছিল যে নেপোলিয়ন তাঁহার এই অধিকার কাড়িয়া নিয়া নিজে রোমকসম্রাট্ উপাধি গ্রহণ করিতে না পারেন। নেপোলিয়নেরও নাকি এইরূপ একটা অভিপ্রায় এই সময়ে প্রকাশ পায়। যাহাহউক, নেপোলিয়নের তেমন একটা ইচ্ছা হইলে ইহা সত্বেও এই উপাধি গ্রহণ করিতে পারিতেন।

রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব ছাড়া সম্রাটের এইরূপ ভাগবত প্রভুত্ব যে নতশিরে কখনও মানিয়া চলিয়াছেন, এরূপ বড় দেখা যায় নাই। তবে অন্যান্য দেশের রাজারা সম্রাটের কোনও প্রভুত্ব মানিয়া চলুন কি না চলুন, এই theory অনুসারে রাজপদে তাঁহাদের ধর্ম্মতঃ অধিকার হইত সম্রাটের প্রতিনিধি বা সহযোগীরূপে, (অথবা তাঁহার প্রতিরূপ শাসকভাবে); এবং যাজকরাও এই ভাবে ধর্ম্মবিধি অনুসারে রাজাদের অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করিতেন। ইহা ছাড়া অন্য কোনওরূপ নীতির ভিত্তিতে রাজারা আপনাদের প্রভুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে কখনও চান নাই, বরং ইহার বলেই রাজ্যশাসনে আপনাদের Divine Right বা ভগবদ্বিহিত অধিকারের দাবী করিতেন। *

রাজাদের নিম্নে অভিজাত ভূস্বামী সম্প্রদায় (অর্থাৎ ইয়োরোপের ক্ষত্রিয়প্রধানগণ) ছিলেন আবার রাষ্ট্রশাসনে এই সব রাজাদের সহযোগী। যে সব সত্ত্ব ও অধিকার, গোড়াতে বাহুবলে তাঁহারা আয়ত্ত করেন, রাজাদের অনুমোদনেই তাহা বৈধ সত্ত্ব ও অধিকার হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং ধর্ম্মনীতিও সাক্ষাৎভাবে না হউক, পরোক্ষ-ভাবে এই সব অধিকারকে সমর্থন করিত।

---

* এ সম্বন্ধে বাইবেল (New Testament) হইতে প্রমাণ স্বরূপ দুইটি উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

(a) Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but from God's ; the powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God (Romans. Xiii. 1)

(b) Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to the king as supreme, or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evil doers and for the praise of them that do well. (1 Peter. II. 13.)

যাহা হউক, রাষ্ট্রীয়শাসনের বাস্তবক্ষেত্রে সম্রাট্‌দের এই ভাগবত প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা কোথাও তেমন না হউক, ধর্ম্মশাসনে পোপদের এই প্রভুত্ব সর্ব্বত্রই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। চার্চ্চের এই শাসনচক্র রচিত হয়, বিভিন্ন দেশের যাজকমণ্ডলীদের লইয়া। প্রত্যেক দেশেই অতি দৃঢ়সংঘবদ্ধ এক একটি যাজকমণ্ডলী ছিলেন। দেশকে বহু বিভিন্ন অংশে ভাগ করিয়া প্রত্যেক এইরূপ ভাগের উপরে একজন করিয়া বিশপ বা অধ্যক্ষ্যযাজক নিযুক্ত হইতেন। ইঁহাদের পদমর্য্যাদা ছিল, রাজার সামন্তস্বরূপ এক অঞ্চলের কাউণ্ট ডিউক প্রভৃতি উপাধিধারী বড় বড় ভূস্বামীদের ন্যায়,— অধিকৃত সম্পত্তিও এই সব ভূস্বামীদের সম্পত্তি অপেক্ষা বড় কম হইত না। ধর্ম্মশাসনে বিশপদের অধীন এইরূপ এক একটি ভূভাগের নাম ছিল, ডাইওসিস্ (diocese)। প্রত্যেক ডাইওসিসের মধ্যে পদপর্য্যায়ে বিভিন্ন স্তরের বহু যাজক নিযুক্ত হইতেন, এবং সকলকেই বিশপের অধীন থাকিয়া তাঁহার নির্দ্দেশ মত সব কাজ করিতে হইত। এক এক দেশে বহু এমন বিশপ নিযুক্ত হইতেন, এবং এই সব বিশপদের উপরে আবার আরও প্রধান এক একজন যাজক থাকিতেন, তাঁহাদের উপাধি ছিল আর্চ্চবিশপ (বা অধি-বিশপ)। একাধিক আর্চ্চবিশপ কোনও দেশে থাকিলে, একজনের উপরে প্রধান কর্ত্তৃত্বের ভার অর্পিত হইত। এইরূপ সব দৃঢ়সংঘবদ্ধ যাজক-মণ্ডলীদের লইয়া রোমকচার্চ্চের যে শাসনচক্র রচিত হয়, তাহার উপরে সর্ব্বোচ্চ প্রভু ছিলেন চক্রবর্ত্তী যাজকসম্রাট্ রোমের পোপ। এই পোপ আবার ভগবানের প্রতিনিধি; সুতরাং ভগবদ্‌বাণীর ন্যায় তাঁহারও বাণী অভ্রান্ত, এবং তাঁহার সব আদেশ ভগবানের আদেশের ন্যায়ই বিনা বিচারে সকলকে অবশ্য পালন করিতে হইবে। পোপের অধীন যাজকবর্গ সর্ব্বতোভাবে পোপের অনুগত থাকিয়া পোপের অনুশাসন অনুসারে বিভিন্ন দেশের খৃষ্টীয় সমাজশাসন করিতেন। পোপের প্রভুত্বের পরিপন্থী হইলে, রাজশক্তির কোনও আদেশও তাঁহারা মানিতে চাহিতেন না।

সকল দেশের বিশপ বা প্রধান যাজকদের সাধারণতঃ পোপই নিযুক্ত করিতেন। রাজারা কখনও কাহাকেও মনোনীত কি নিযুক্ত করিলেও, পোপকর্ত্তৃক যাজকপদে আনুষ্ঠানিক একটা বরণ না হইলে, ধর্ম্মতঃ তাঁহাদের কোনও অধিকারই হইত না। অধীন অন্যান্য যাজকদিগকে নিজ নিজ পদে বরণ করিতেন এই সব বিশপ। যাজকদের বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। বংশগত উত্তরাধিকার সূত্রে কাহারও যাজকপদ লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। প্রত্যেক যাজকেরই নিয়োগ এইভাবে স্বয়ং পোপ-কর্ত্তৃক অথবা পোপের প্রতিনিধি বা সহকারী বিশপদের কর্ত্তৃক হইত। কিন্তু পোপদের নিয়োগ কে করিতেন? তাহারও ব্যবস্থা ছিল। প্রধান যাজকদের মধ্যে অনন্যসাধারণ মর্য্যাদার অধিকারী সত্তরজন যাজক লইয়া বিশিষ্ট একটি সম্প্রদায় বা সমিতি গঠিত হইয়াছিল,—ইঁহাদের উপাধি ছিল 'কার্ডিনাল'। কোনও পোপ পরলোক গমন করিলে, এই সব কার্ডিনালরাই আপনাদের মধ্য হইতে একজনকে পরবর্ত্তী পোপ নির্ব্বাচিত করিতেন।

সাধারণ যাজকসম্প্রদায়ের বাহিরে অনেক সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ও ছিলেন। ইঁহাদের বহু মঠ বা আশ্রমও নানাদেশে স্থাপিত হয়। সন্ন্যাসীদের মধ্যে কোনও কোনও সম্প্রদায় সংসারের সকল সংস্রব ত্যাগকরতঃ মঠে বা আশ্রমে থাকিয়া কঠোর তপস্যায় ও ভগবদারাধনায় নিরত থাকিতেন; আবার কোনও কোনও সম্প্রদায় ধর্ম্মপ্রচার, লোকশিক্ষাবিস্তার, লোকসেবা প্রভৃতি কর্ম্মে লোকসমাজের মধ্যে বিচরণ করিতেন। তপস্যা ছাড়া অতিথিসেবা, বিপন্নের সহায়তা, বিদ্যালোচনা, সমাগত বিদ্যার্থীদের বিদ্যাদান প্রভৃতি বহু লোকহিতকর কর্ম্মও মঠবাসী সন্ন্যাসীদের করিতে দেখা যাইত। সর্ব্বতোভাবে মঠাধ্যক্ষ্য একজন প্রধান সন্ন্যাসীর শাসনাধীন হইয়া অপর সকল সন্ন্যাসীকে চলিতে হইত। পদমর্য্যাদায় ইঁহারা যাজকদের অধ্যক্ষ বিশপদেরই সমকক্ষ ছিলেন। ধনীদের দানে এই সব মঠ বহু ভূসম্পত্তিরও অধিকারী হইয়াছিল। সন্ন্যাসীরা এই সম্পত্তি

হইতে প্রতিপালিত হইতেন। আয়ের কতক অংশ দীনদরিদ্রের মধ্যেও বিতরিত হইত। ধর্ম্মজীবনের উন্নত আদর্শ এবং বহু লোকহিতকর কর্ম্মানুষ্ঠানহেতু সন্ন্যাসীদের বড় একটা প্রতিপত্তিও লোকসমাজের উপরে হইয়াছিল। এই সব সন্ন্যাসী সম্প্রদায়গুলিকেও রোমক চার্চ্চ আপন অঙ্গভুক্ত করিয়া নিয়া প্রধানভাবে আপন সেবায় ও আপন শক্তিপ্রতিষ্ঠার কার্য্যে নিয়োজিত করেন। প্রথম যুগে ধর্ম্মপ্রচারে এবং ধর্ম্মশাসনপ্রতিষ্ঠায়ও বহু সন্ন্যাসী চার্চ্চকে সহায়তা করেন। স্বয়ং ভগবানের প্রতিনিধি পোপদের বশ্যতা স্বীকার করিতে এবং ভগবানের শাসনচক্র চার্চ্চের অঙ্গীয় হইতে, সম্প্রদায়ভাবেও পরে ইঁহাদের কোনও আপত্তির কারণ বা বাধা কিছু ছিল না।

সন্ন্যাসীর সম্প্রদায়গুলি এইরূপে বিভিন্ন দেশের যাজকমণ্ডলীর ন্যায় যেমন চার্চ্চের আর একটি অঙ্গ, তেমনই তাঁহাদের সম্পত্তিও একরূপ চার্চ্চের সম্পত্তি হইয়া উঠিল। সকলের আগে পোপের প্রভুত্ব ও চার্চ্চের স্বার্থরক্ষা এবং তারপর অন্য কর্ত্তব্য, যাজক ও সন্ন্যাসী—চার্চ্চের উভয় অঙ্গেরই কর্ম্মজীবনের লক্ষ্য ও গতি এইরূপ হইয়া উঠিল।

যাজকগণ লোকসমাজের মধ্যে থাকিয়া চার্চ্চের বিধি অনুসারে লোকের ধর্ম্মকর্ম্মাদি নির্ব্বাহ করিতেন, আর সন্ন্যাসীরা মঠে থাকিয়া ভগবদারাধনা করিতেন, আর মধ্যে মধ্যে লোকসেবা ও লোক শিক্ষাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন,—কর্ম্মে সাধারণতঃ এইরূপ একটা ভাগ ছিল, অন্যথা জীবনের আদর্শে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বড় কিছু দেখা যাইত না। বিবাহ করিবেন না, ব্রহ্মচারী হইয়া পবিত্র জীবনযাপন করিবেন, সকল বিলাসব্যসন ত্যাগ করিয়া দীনভাবে থাকিবেন এবং সর্ব্বতোভাবে সাম্প্রদায়িক অধ্যক্ষের আদেশ মানিয়া চলিবেন—(chastity, poverty and obedience) এই তিনটি নীতি ছিল সন্ন্যাসী জীবনের আদর্শ নীতি। দীক্ষার সময় এইরূপ তিনটি শপথও সন্ন্যাসীদের গ্রহণ করিতে হইত। যাজকদের জীবনসম্বন্ধেও পোপেরা

ক্রমে এই আদর্শের প্রবর্ত্তন করেন। ইহার বড় একটি লক্ষ্য ছিল এই, যে সংসার-জীবনের সকল দায়িত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত থাকিয়া যাজক-মণ্ডলী সর্ব্বোতোভাবে চার্চ্চের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন, এবং চার্চ্চের সম্পত্তি তাঁহাদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সম্পত্তি না হয় অথবা তাহার কোনও অংশ ইঁহাদের সন্তানসন্ততিবর্গের উত্তরাধিকারে না আইসে। বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়াই যে যাজকগণ সকলে একেবারে নির্ম্মল ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করিতেন, তা নয়। কিন্তু এ সব অবশ্যম্ভাবী দুর্নীতি চার্চ্চ একরূপ উপেক্ষাই করিতেন। কারণ তাঁহার সম্পত্তিরক্ষা ও শক্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য ইহা একান্ত আবশ্যক যে যাজকগণ, আর যে দিকে যেমনই হউন, বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্যজীবনের কোনও দায়িত্বে জড়িত না হন; আবার গৃহস্থ হইলে নানা সম্বন্ধে প্রজারূপে রাজার অধীনতা যতটা মানিয়া চলিতে হয়, বিবাহ করিয়া গৃহস্থ না হইলে ততটা মানার প্রয়োজন হয় না।

যে ভাবে, যে উদ্দেশ্যেই হউক, সন্ন্যাসীদের জীবনের আদর্শই যাজকদেরও জীবনের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হওয়ায়, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ একটা সমভাবের সম্বন্ধ ঘটিল। যাজকে ও সন্ন্যাসীতে কর্ম্মের রীতিতে ব্যতীত জীবনযাত্রার নীতিতে কোনও পার্থক্য রহিল না। অনেক যাজক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত হইতেন, আবার সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক শক্তিমান্ পুরুষকেও পোপরা বড় বড় যাজকের পদে নিয়োগ করিতেন। এই পরিবর্ত্তন, পরিবর্ত্তন বলিয়াই কাহারও বড় মনে হইত না। উভয় অঙ্গে এইরূপ জীবনযাত্রার সমতা, সমভাবের প্রেরণা, উভয়েরই চার্চ্চের প্রতি সমান আনুগত্য এবং উভয়েরই সর্ব্বপ্রকারে চার্চ্চের স্বার্থের সঙ্গে সমস্বার্থতার অনুভূতি, চার্চ্চের শক্তিকে ও প্রভাবকে যে কত দূর বলশালী করিয়া তুলিয়াছিল, সে কথা আর না বলিলেও চলে।

* সন্ন্যাসীর উন্নত আদর্শানুরূপ জীবন যে যাজকদের মধ্যে একেবারেই ছিল না এবং এই আদর্শরক্ষার জন্য চেষ্টাও যে

কখনও হইত না, একথা কেহ বলেন না। কিন্তু প্রথম হইতেই সমাজশাসনের উদ্দেশ্যে শক্তিসংগ্রহের যে প্রণালী রোমক চার্চ্চ অবলম্বন করেন, তাহা পার্থিব রাজশাসনপ্রণালীর অনুরূপ। চার্চ্চ তাই বড় একটা organised machinery of powerএ—দৃঢ়সংঘটিত শক্তিচক্রে—পরিণত হয়। ধর্ম্মের মহিমা, এবং যাজক ও সন্ন্যাসীবর্গের এইরূপ একান্ত আনুগত্য, রাজশাসন-চক্র অপেক্ষা চার্চ্চের এই শাসনচক্রকে অনেক বেশী শক্তিশালী করিয়া তোলে। সকল কর্ম্ম প্রচেষ্টা ক্রমে এই চক্রের পরিপুষ্টি, বলবৃদ্ধি ও স্বার্থরক্ষার দিকেই ধাবিত হয়। Vow of chastity বিবাহে বিরত থাকিলেই পরিপালিত হইল বলিয়া গণ্য হইত, vow of obedienceএর একমাত্র লক্ষ্যই হইল যাজকসংঘের শাসনশক্তির সুপ্রতিষ্ঠা। আধ্যাত্মিক সাধনার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পার্থিব শক্তি ও সম্পদের অধিকারী হইলে জীবনে দীনতার আদর্শ কোথাও থাকে না, ইয়োরোপীয় যাজকদের মধ্যেও শেষে আর তাহা বড় দেখা যাইত না।

পোপ ইটালীর মধ্যভাগে ক্ষুদ্র একটি রাজ্যেরও অধিপতি ছিলেন। সকল দেশ হইতে প্রচুর প্রণামী ও ধর্ম্মকর তাঁহারা পাইতেন, রাজার হালে তাঁহারা থাকিতেন, রাজার মতই ভোগবিলাসে দিন যাপন করি-তেন। তাঁহার প্রধান সহযোগী বিশপবর্গও প্রত্যেক দেশে বড় এক এক জন ভূস্বামীর মতই ছিলেন, এবং ভূস্বামীদের মতই আড়ম্বরে জীবনযাপন করিতেন; অনেকে বড় বড় রাজকর্ম্মেও নিযুক্ত হইতেন। ভূস্বামী সম্প্রদায়ের মধ্য হইতেও কেহ কেহ চার্চ্চের সম্পত্তিভোগের লোভে বিশপ হইতেন *। মানবজীবনে যত রকম দুর্নীতি হইতে পারে,

* এই সব ভূস্বামীদের অধিকৃত ভূসম্পত্তি ছোট ছোট রাজ্যের মতই ছিল। জ্যেষ্ঠপুত্র মাত্র তাহার উত্তরাধিকারী হইতেন। অন্যান্য পুত্রদের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও বড় কোনও সম্পদের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যেই বিশপের পদে নিয়োগ করা হইত। এই সব বিশপ যে সুশান্ত, ধর্ম্মনিষ্ঠ, পবিত্র ও দীন যাজকজীবন কিরূপ পালন করিতেন, ইহা বলাই বাহুল্য।

সবই ইঁহাদের মধ্যে দেখা যাইত। বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, বিলাস-ভোগে তাহাতে অতিশয় ব্যাভিচারও তাঁহাদের মধ্যে দেখা দেয়। অতিরিক্ত ভোগবিলাসের জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন হইত। চার্চ্চের সম্পত্তির আয় প্রায় ইহাতেই তাঁহারা ব্যয় করিতেন, আরও অনেক কৌশলে সাধারণ প্রজাদের নিকট হইতেও অর্থশোষণের চেষ্টা করিতেন। রাষ্ট্রশাসনের উপরেও আপনাদের প্রভুত্ব বড় বেশী পরিচালনা করিতে চাহিতেন। খৃষ্টানমণ্ডলীর প্রকৃত আধ্যাত্মিক ও ধর্ম্মনৈতিক মঙ্গল অপেক্ষা আপনাদের সম্পদ সম্ভোগ ও ক্ষমতাবৃদ্ধির দিকে ক্রমে রোমীয় বিশপদের লক্ষ্য বেশী হইয়া উঠিল। নিম্নতর যাজকবর্গ স্বভাবতঃই যত দূর যিনি পারিতেন, বিশপদেরই পন্থানুবর্ত্তন করিতেন। যাজকসম্প্রদায়ের দুর্নীতি ক্রমে সন্ন্যাসীদের মধ্যেও সঞ্চারিত হইল। তাঁহারাও প্রায় সমান ভাবেই ধনলুব্ধ, শক্তি-লুব্ধ ও ভোগলুব্ধ হইয়া উঠিলেন। তবে লোকহিতকর যেসব কর্ম্ম তাঁহারা করিতেন, তাহা হইতেও অবশ্য একেবারে বিরত হইলেন না।

এইরূপে রোমকচার্চ্চ সমগ্র মধ্য ও পশ্চিম ইয়োরোপব্যাপী যেরূপ এক শক্তি চক্রে পরিণত হইল, রোমক ধর্ম্মরাজ্য (The Holy Roman Empire) যে তাহা পারিল না, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। না পারিলেও অন্ততঃ লোকমতে তাঁহাদের মহিমা কম ছিল না। আবার, চার্চ্চের প্রভুত্বের সঙ্গে তাঁহাদের প্রভুত্বের সম্বন্ধ যে co-ordinate সম্বন্ধ, কেহ কাহারও অধীন নহেন, উভয়েই সমান ভাবে ভগবৎপ্রতিনিধি এবং দুই বিভাগে দুই জনে তাঁহারই শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন, theoryতে এই নীতিই ছিল। কিন্তু একই পরিবারে ও সাধারণ প্রতিষ্ঠানে যেমন, এক সমাজচক্রেও তেমনই এই co-ordinate প্রভুত্ব চলে না, বিরোধ ঘটে। চার্চ্চে ও ধর্ম্মরাজ্যেও এই বিরোধ ঘটিল।

বহু খুঁটি নাটি বিষয়ে যখন এই বিরোধ আরম্ভ হয়, পোপরা তখন এই দাবী করিতে আরম্ভ করিলেন যে আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম পার্থিব বিষয়

অপেক্ষা যেমন উচ্চতর বস্তু, তেমনই ধর্ম্মশাসনের অধিকার পার্থিব বা রাষ্ট্রীয় শাসনের অধিকার অপেক্ষা অনেক উচ্চতর অধিকার। সুতরাং তাঁহাদের পদগৌরব রোমকসম্রাটদের পদগৌরবের অনেক উপরে। দাবীর মাত্রা আরও চড়িল। পোপরা পরিশেষে ঘোষণা করিলেন, সমগ্র খৃষ্টীয় জগৎ একটা Civitas Dei, অর্থাৎ ভগবানের একমাত্র ধর্ম্মরাজ্য। চার্চ্চই ভগবানের একমাত্র শাসনযন্ত্র, পোপরা ভগবানের অদ্বিতীয় প্রতিনিধি, এবং খৃষ্টীয় সমাজের রাষ্ট্রীয় শাসনের ভার তাঁহারাই সম্রাট্‌দের হাতে দিয়াছেন। সম্রাটরা তাঁহাদেরই প্রতিনিধি, সাক্ষাৎভাবে ভগবানের প্রতিনিধি নন। রোমক ধর্ম্মরাজ্য বা Empire চার্চ্চের একটি বিশিষ্ট শাখা মাত্র। ইহার শাসন কার্য্যে যে নিয়োগ, তাহা সম্রাট্‌গণ পোপদের প্রতিনিধি রূপে পোপদের হইতেই পাইয়াছেন। আবার পোপরা ইচ্ছা করিলে তাঁহাদেরই কর্তৃক নিযুক্ত এই সম্রাট্‌দের পদচ্যুতও করিতে পারেন। সম্রাট্‌রা অবশ্য এই দাবী স্বীকার করিলেন না।

বিশপবর্গ যেমন চার্চ্চের অধীশ্বর পোপের অধীন, তেমনই আবার সম্রাটের এবং অন্যান্য রাজাদের শাসনাধিকারের মধ্যে তাঁহাদেরও প্রজা। সুতরাং প্রজার দায়িত্ব তাঁহাদের পালন করিতে হইবে। প্রথমে পোপ তাঁহাদের যাজকপদে বরণ করিলেও, সম্রাটের নিকটে উপস্থিত হইয়াও কোনও কোনও অধিকারের নিদর্শন তাঁহাদের গ্রহণ করিতে হইত। তখন সম্রাটের অধীনতাও তাঁহারা স্বীকার করিতেন; যাজকরূপে যে সম্পত্তি তাহারা ভোগ করিবেন তাহাও গ্রহণ করিতেন সম্রাটের হাতে এবং তার জন্য ভূম্যধিকারী প্রজার দায়িত্ব পালন করিতেও অঙ্গীকার তাঁহাদের করিতে হইত। যেমন সম্রাট্‌দের সঙ্গে, তেমনই অন্যান্য দেশের রাজাদের সঙ্গেও বিশপদের এইরূপ একটা রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু পোপরা এখন ঘোর আপত্তি ইহাতে উত্থাপন করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, যাজকগণ সর্ব্বতোভাবে চার্চ্চের অধীন, সম্রাট্‌দের এরূপ কোনও প্রভুত্বের অধিকার তাঁহাদের উপরে থাকিতে

পারে না। তাঁহাদের সম্পত্তি চার্চ্চের সম্পত্তি ; সুতরাং তার জন্য যাহা কিছু দায়িত্ব, তাহা চার্চ্চের কাছে, সম্রাটের কাছে নয়। সম্রাট্‌রাই তাঁহাদের অধিকার ভোগ করেন, চার্চ্চের দানে চার্চ্চের কৃপায়। চার্চ্চ যে বিষয়ে যতটুকু অধিকার তাঁহাদের দিয়াছেন ও দিবেন, তার বেশী কোনও অধিকারের দাবী তাহাদের নাই।

এই বিবাদ ক্রমে ভীষণ এক যুদ্ধে পরিণত হইল। কয়েক পুরুষ যাবৎ সম্রাট্‌দের সঙ্গে পোপদের এই যুদ্ধ চলে। শেষে সম্রাট্‌রা পরাভূত হইলেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই সংগ্রামের অবসান হয়। এই বিজয়ের পর পোপদের পার্থিব শক্তি এবং তাহার আনুষঙ্গিক স্পর্দ্ধা ও দাম্ভিকতা একেবারে চরমমাত্রায় গিয়া উঠিল। ভোগ-বিলাসের আড়ম্বরে তাঁহারা রাজাদেরও ছাড়াইয়া উঠিলেন। ইটালীর মধ্যভাগে যে বিস্তৃত এক ভূখণ্ডের অধিপতি তাহারা ছিলেন, ইহার রাজস্ব এবং অন্যান্য দেশ হইতেও নানারকম ধর্ম্ম কর যে তাহারা পাইতেন, ভোগবিলাসের আড়ম্বর ইহাতেও কুলাইত না। আরও নানা কৌশলে বহু অর্থ তাঁহারা সকল দেশের অধিবাসীদের নিকট হইতে আদায় করিতেন। একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে, এবং তাহা হইতে সকলে বুঝিতে পারিবেন, পোপদের মহিমার উপরে তখনকার লোকের বিশ্বাস কিরূপ ছিল এবং সেই বিশ্বাসের অপব্যবহারও পোপরা কি ভাবে করিতেন। প্রাচীন সাধুরা যত পুণ্য অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মুক্তির জন্য অত পুণ্যের আবশ্যক হয় নাই। ইঁহাদের যত অতিরিক্ত পুণ্য, সব বৃহৎ এক পুণ্যভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে এবং তার চাবি সেণ্ট পিটারের উত্তারাধিকারী পোপদের হাতে। পাপী মানবের মুক্তির জন্য এই পুণ্যের কিছু কিছু ভাগ পোপরা বিতরণ করিতে পারেন। যে পাইবে, ইহার বিনিময়ে কিছু অর্থ চার্চ্চের সেবায় দান করিবে, অর্থাৎ সহজ কথায় পাপমুক্তির জন্য পুণ্য-ভাণ্ডারের মালিক পোপের নিকট হইতে এই পুণ্য লোকে কিনিয়া নিবে। অবশ্য পাপের

গুরুত্ব যার যত বেশী, তত বেশী পুণ্যের প্রয়োজন তার হইবে, দামও তত বেশী দিতে হইবে। অমুক পাপের জন্য তোমাকে মুক্তি দেওয়া হইল, এইমর্ম্মে একটা অনুজ্ঞাপত্র পোপ লিখিয়া দিতেন, এবং উপযুক্ত দাম দিয়া লোকে তাহা কিনিয়া নিত। নিয়া মনে করিত, পাপের দায়িত্ব হইতে সে মুক্ত হইল। নরহত্যা, ব্যভিচার, দস্যুতা, তস্করতা, শাঠ্য, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি যত রকম পাপ হইতে পারে, যথাযোগ্য মূল্যে তার মুক্তির এই অনুজ্ঞাপত্র বিক্রীত হইত। বিশেষ অর্থের প্রয়োজন কখনও হইলে পোপদের স্বাক্ষরিত বহু এমন অনুজ্ঞাপত্র লইয়া তাঁহাদের এজেণ্ট বা গোমস্তারা দেশে দেশে যাইতেন, বিক্রয়লব্ধ অর্থ পোপকে পাঠাইতেন। পাপমুক্তির এই অনুজ্ঞাপত্র বিক্রয় Sale of Indulgences নামে ইতিহাসে পরিচিত, এবং ইয়োরোপের ইতিহাসাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই ইহার কথা জানেন।

পুণ্যবিক্রয়লব্ধ এই অর্থের আমদানীও বড় কম হইত না। পোপদের ভোগবিলাসের আড়ম্বরে অথবা অন্যরূপ পার্থিব উচ্চাকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতার জন্য ইহা ব্যয়িত হইত।

সম্রাট্‌দের শক্তি যতদিন প্রবল ছিল, এইরূপ সব দুর্নীতি ও অনাচার অনেক সময়ে তাঁহারা দমন করিয়াছেন। পোপরাও এই সব শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দীর সম্মুখে শীলতার নীতি একেবারে লঙ্ঘন করিয়া চলিতেন না। কিন্তু সম্রাট্‌দের সেই পরাভবের পর পোপদের শক্তির প্রতিপক্ষ কেহ আর রহিলেন না। সম্রাটের নাম ও পদ অবশ্য বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু শক্তি প্রতিপত্তিতে ইঁহারা একেবারেই নগণ্য হইয়া পড়েন। সুতরাং পোপদের প্রভাব একেবারে অপ্রতিবাধ্য হইয়া উঠিল।

খৃষ্টীয় সমাজ শাসনের যে অধিকার পোপরা দাবী করেন এবং সেই অধিকার পরিচালনার জন্য যে ভাবে চার্চ্চরূপ একটা শক্তিস্থাপনা তাঁহারা করেন, একে ত তাহাই আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের অনুকূল নহে। এই শাসনে আবার সম্রাটদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আপনাদিগকে এবং চার্চ্চকে পর্য্যন্ত তাঁহারা একেবারে এই পার্থিব স্তরে নামাইয়া ফেলেন।

এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়লাভের পর চার্চ্চের এই পার্থিবপ্রকৃতি একেবারে চরম পরিণতি লাভ করে।

কিন্তু আধ্যাত্মিকতা যাহার প্রাণ, কেবল পার্থিবশক্তির উপরে তাহা দাঁড়াইতে পারে না। পার্থিবশক্তিতে চার্চ্চ এই সময়ে তার সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এবং ইহার অপপ্রয়োগ, অনাচার ও অত্যাচারও ক্রমে চরম মাত্রায় গিয়া উঠে।

প্রথম হইতেই চার্চ্চের প্রধান লক্ষ্য ছিল এই যে সর্ব্বতোভাবে ইয়োরোপীয় খৃষ্টান-মণ্ডলী তাঁহাদের ধর্ম্মশাসনের গণ্ডীর মধ্যে থাকে। তত্ত্বাঙ্গ ও সাধনাঙ্গ (Creed ও Ritual) বলিয়া ধর্ম্মের দুইটা দিক আছে : তত্ত্বাঙ্গে বিশেষ কতকগুলি মত একমাত্র সত্য ধর্ম্মমত (doctrines of faith) বলিয়া চার্চ্চ গ্রহণ করেন এবং সাধনাঙ্গে বিশিষ্ট একটা অনুষ্ঠানপদ্ধতিরও প্রবর্ত্তন করেন। চার্চ্চ চাহিতেন, কোনও খৃষ্টান ইহা হইতে অন্যরূপ কোনও মত বা বিশ্বাস পোষণ করিবে না, অন্য কোনরূপ অনুষ্ঠানেরও অনুবর্ত্তন করিবে না। বস্তুতঃ এইরূপ বাঁধাধরা Creed ও Ritual—তত্ত্বাঙ্গে ও সাধনাঙ্গে নির্দ্দিষ্ট একটা সর্ব্বজনগৃহীত নীতি ও পদ্ধতি—ব্যতীত এইরূপ কোনও চার্চ্চই হয় না,—তার সংহতি দৃঢ় থাকে না, শাসন প্রভুত্বও চলে না। চার্চ্চরূপ কোন শক্তিস্থাপনা করিতে হইলে নির্দ্দিষ্ট Creed ও Ritualএর একটা দৃঢ়ভিত্তির উপরে তাকে দাঁড় করাইতেই হইবে। সুতরাং রোমকচার্চ্চ সর্ব্বদাই এ বিষয়ে অতি সতর্ক হইয়া চলিতেন, যে অন্য কোনওরূপ ধর্ম্মমত বা অনুষ্ঠানপদ্ধতির আবির্ভাব আপন শাসনাধিকৃত ইয়োরোপের মধ্যে না ঘটে ; এবং যখনই ইহার সূচনা কোথাও দেখা দিয়াছে, কঠোরশাসনে চার্চ্চ তাহা দমন করিয়াছেন। এইরূপ অপরাধকে চার্চ্চ heresy (ধর্ম্মদ্রোহ) এবং অপরাধীকে heretic (ধর্ম্মদ্রোহী) এই নাম দিতেন।

রোমক চার্চ্চ স্বয়ং ভগবানের শাসনযন্ত্র, তাহার প্রভু পোপ ভগবানের প্রতিনিধি সুতরাং অভ্রান্ত, এবং তাঁহার

আদেশ ভগবানেরই আদেশ, এই যে নীতির উপরে চার্চ্চের ও পোপদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই নীতিকে সত্য বলিয়া মানিলে, ইহাও মানিতে হয়, যে এই চার্চ্চের নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মমতকে এবং অনুষ্ঠানপদ্ধতিকে মানিয়া না চলার যে অপরাধ, তাহা কেবল সাধারণভাবে heresy বা ধর্ম্মদ্রোহ নয়, একেবারে খাঁটি ভগবদ্‌বিদ্রোহ। সাধারণ রাজবিদ্রোহ প্রাণদণ্ডের যোগ্য অমার্জ্জনীয় অপরাধ। কিন্তু সকল রাজার উপরে রাজা, সমগ্র জগতের অধিপতি যে ভগবান্, তাঁহার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের দণ্ড কি হইতে পারে?—পরকালে অবশ্য অত্যুগ্র নরকাগ্নিজ্বালায় সে দগ্ধ হইবে। কিন্তু ইহকালেও এই বিদ্রোহকে উপেক্ষা করা যায় না। করিলে এই পার্থিবজগতে ভগবৎশাসনের মর্য্যাদা থাকে না, শাসনপদ্ধতিও ভাঙ্গিয়া পড়ে। সুতরাং লোকে ভয় পায়, বিশেষ একটা শিক্ষা তাদের একটা হয়, এইরূপ কঠোর দণ্ডে এই বিদ্রোহকে দমন করা আবশ্যক। তাই পরলোকে যে নরকাগ্নিজ্বালায় সে দগ্ধ হইবে, তার কিছু পূর্ব্বাস্বাদ দিয়া সেথায় তাকে পাঠাইবার জন্য এই সব heretic বা ভগবদ্-বিদ্রোহীর দণ্ডের ব্যবস্থা হইল, জীবিত অবস্থায় অনলে দাহন!

এই সময় ইয়োরোপের বিদ্যা যাহা কিছু, সব চার্চ্চের গণ্ডীর মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। যাজক ও সন্ন্যাসীরাই তাহার আলোচনা করিতেন, এবং এই আলোচনায় সর্ব্বদা তাঁহারা চার্চ্চের গৃহীত তত্ত্ববিদ্যার সিদ্ধান্ত ও ধর্ম্মনীতির অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন। নিরপেক্ষ প্রতিভার নূতন কোনও আলোকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নূতন কোনও নীতির অনুসন্ধান চার্চ্চের অভ্যন্তরে কি বাহিরে কোথাও বড় হইত না। কেহ করিতে চাহিলেও কঠোর দণ্ডে রোমক চার্চ্চ তাঁহাকে দমন করিতেন, পাছে কোনও মতে ইহা চার্চ্চের সিদ্ধান্তের ও নীতির বিরোধী হইয়া উঠে, কোনও দিক হইতে তাহার সর্ব্বময় প্রভুত্বের কোনওরূপ হানি তাহাতে ঘটে। একটি দৃষ্টান্ত ইহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সূর্য্য এই জগতের কেন্দ্র, এবং পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণ তাহার চতুর্দ্দিকে

পরিভ্রমণ করিতেছে, ইটালীর বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত গ্যালিলিও যখন এই সত্য আবিষ্কার করেন, রোমক চার্চ্চ তাঁহাকে পর্য্যন্ত দণ্ডিত করিতে উদ্যত হন। কারণ ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দ্দেশ নাকি ইহাই ছিল, যে এই পৃথিবী জগতের কেন্দ্র এবং চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি সব তাহার চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। গ্যালিলিও ধর্ম্মবীর ছিলেন না, ছিলেন মাত্র বৈজ্ঞানিক। ভয়ে ভয়ে শেষে এই মতকে প্রত্যাহার করিয়া এবং পৃথিবীই যে জগতের কেন্দ্র এই ভুল বিশ্বাসকে স্বীকার করিয়া নিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন।

যাহা হউক, মানুষের বুদ্ধির ও প্রতিভার স্বাধীন স্ফূর্ত্তিকে এভাবে একেবারে কোনও শাসন চিরকাল চাপিয়া রাখিতে পারে না। এ সব পীড়ন সত্ত্বেও এখানে ওখানে এইরূপ বিদ্যার আলোচনা হইত। তবে অতি ব্যাপকভাবে এতদিন হইতে পারে নাই। বিশেষ কতকগুলি ঘটনায় ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে ক্রমে প্রাচীন গ্রীক ও রোমক বিদ্যার বহু প্রচার ইয়োরোপে আরম্ভ হইল। এই বিদ্যা অন্ধভাবে পুরুষপরম্পরাগত কোনও ধর্ম্মনীতির নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া সাধারণতঃ চলিত না, মানবের নিরপেক্ষ বুদ্ধির প্রতিভাই ছিল তাহার প্রধান উৎস। এই বিদ্যার প্রভাবে ইয়োরোপের বুদ্ধি ও চিন্তা রোমক-চার্চ্চের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাধা অতিক্রম করিয়া নানাদিকে নানা পথে নূতন নূতন জ্ঞানের অনুসন্ধানে যারপরনাই আগ্রহশীল হইয়া ছুটিল। প্রচলিত বিদ্যাকে, নীতিকে ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে একেবারে অন্ধভাবে সত্য ও মঙ্গলকর বলিয়া গ্রহণ না করিয়া বন্ধনমুক্ত ইয়োরোপের বুদ্ধি ও চিন্তা বিচারে তার একটা যুক্তিসঙ্গতিও খুঁজিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে চার্চ্চের অনাচার ও অত্যাচার তখন সকল প্রকার যুক্তির, শীলতার ও লোকের সহিবার শক্তির সকল সীমা এমনই ভাবে ছাড়াইয়া গিয়াছিল যে এরূপ বিচারে তাহার সমর্থন করা একেবারে অসম্ভব। ফলে রোমক চার্চ্চের বিরুদ্ধে ইয়োরোপব্যাপী এক বিদ্রোহের

অভ্যুত্থান হইল। এই বিদ্রোহ ইয়োরোপের ইতিহাসে 'The Reformation' বা 'ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলন' নামে পরিচিত।

রোমক চার্চ্চও এই বিদ্রোহকে দমন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন।

যখনই কোনওরূপ heresy বা ধর্ম্মদ্রোহ দেখা দিত, চার্চ্চের নির্দ্দেশ ও ব্যবস্থামত এই বিদ্রোহ কার্য্যতঃ দমন করিতেন অবশ্য রাজারা, প্রজাদের উপরে তাহাদের শাসনশক্তির বলে। রাজশক্তির সঙ্গে চার্চ্চের এইরূপ একটা সহযোগিতা বরাবরই ছিল। এখনও সহযোগী ও অনুগত রাজশক্তিই সর্ব্বত্র চার্চ্চের পক্ষ হইতে এই বিদ্রোহ দমনের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন ব্যবস্থা করিলেন। ইয়োরোপ ভরিয়া অগ্নিকুণ্ড জ্বলিয়া উঠিল। কত হাজার হাজার লোককে যে এই সময়ে এই সব কুণ্ডে দগ্ধ করা হয়, তাহার সংখ্যা গণনাও সম্ভব নয়। স্পেনে এই পীড়ন অতি বীভৎস আকার ধারণ করে। সেখানে পোপরা The Holy Inquisition বা 'পবিত্র অনুসন্ধান-যন্ত্র' নামে একটি কর্ম্মবিভাগেরও প্রতিষ্ঠা করান। প্রকাশ্যভাবে যাহারা হেরিটিক (heretic) মতের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিত, কেবল তাহাদেরই দণ্ড দিয়া চার্চ্চ সন্তুষ্ট হইতেন না। গোপনে কেহ কোথাও এইরূপ মত নিয়া চলে কি না, এইরূপ কোনও অনুষ্ঠান করে কি না, তাহা ধরিবার জন্য বহু চরও এই অনুসন্ধানবিভাগ হইতে নিযুক্ত হইত। যাহারই নামে সত্য কি মিথ্যা কোনও অভিযোগ ইহারা করিত, অথবা 'হেরিটিক্' বলিয়া যাহাদের উপরে কোনওরূপ সন্দেহও হইত, তাহাদের সব ধরিয়া এই বিভাগীয় আদালতের সমক্ষে উপস্থিত করা হইত। আগে চেষ্টা হইত, ইহারা অপরাধ স্বীকার করে কি না। স্বীকার করিলেই অমনই জীবন্ত অনলদাহের দণ্ডাজ্ঞা তাহাদের উপরে হইত। আর স্বীকার না করিলে, অতি কঠোর এমন সব দৈহিক পীড়নের (torture) চাপে তাহাদের ফেলা হইত, যাহা এইরূপ মৃত্যুদণ্ড অপেক্ষাও অধিকতর ক্লেশকর হইয়া উঠিত।

সহ্য করিতে না পারিয়া মিথ্যা অভিযোগেও অনেকে স্বীকারোক্তি দিত। দিলেই সেই প্রাণদণ্ডের আদেশ হইত! ধরা একবার যে পড়িত, কোনও মতেই তার আর অব্যাহতি ছিল না। যেসব মত বা বিশ্বাস (doctrines) এবং যেরূপ অনুষ্ঠানপদ্ধতি (rituul) রোমক চার্চ্চ প্রবর্ত্তন করেন, অথবা যে সব নীতি বা বিধির উপরে আপনাদের প্রভুত্বের দাবী প্রতিষ্ঠা করেন, বাইবেলে যিশু খৃষ্টের কিম্বা তাঁহার শিষ্যবর্গের কোন উপদেশের দ্বারাই তাহার সমর্থন করা যাইত না। তাই চার্চ্চের সঙ্গে যাঁহাদের সকল স্বার্থ সংস্পৃষ্ট, সেই সব যাজক ব্যতীত অন্য খৃষ্টানের পক্ষে বাইবেল পড়াও নিষিদ্ধ হয়। যুক্তি ছিল, তারা বাইবেলের সত্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবে না। তাই বাইবেল পড়া অথবা অন্য কোনও দেশের ভাষায় লাটিন বাইবেলের তরজমা করিয়া প্রচার করাও এইরূপ দণ্ডনীয় পাপ বলিয়া বিহিত হইল। বাইবেল পড়িলেও খৃষ্টানের জীবন্ত অনলদাহন দণ্ড হইত! বাইবেল কেহ গোপনেও পড়ে কি না, ঘরে কেহ অতি গুপ্তভাবেও কোন বাইবেল বা তার তরজমা রাখিয়াছে কি না, Inquisition বা অনুসন্ধানবিভাগের চরেরা তাহারও খোঁজ নিত। ধরা পড়িলে, বা সন্দেহও কাহারও বিরুদ্ধে হইলে, তার আর রক্ষা ছিল না। দণ্ড-প্রাপ্ত অপরাধীদের সব কঠোর কারাগারে রক্ষা করা হইত। একদিন শেষে মহাসমারোহে রাজা ও প্রধান রাজপুরুষবর্গের সমক্ষে শত শত এইরূপ পাপীকে প্রকাণ্ড এক অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইত,—নরকের সব বীভৎস দৃশ্যের চিত্রে অঙ্কিত কালোপোষাক পরাইয়া শোভাযাত্রায় সেই বধ্যভূমিতে ইহাদিগকে নেওয়া হইত। এই অনুষ্ঠানের নাম ছিল Auto-da-fe, Act of Faith বা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান। স্পেনের মত অতদূর বীভৎস না হইলেও, অন্যান্য দেশেও ধর্ম্মদ্রোহদমনে অল্প বিস্তর এইরূপ বিধিব্যবস্থারই প্রবর্ত্তন হয়।

বাস্তবিক একদিকে যেমন রোমকচার্চ্চের ন্যায় এরূপ organised বা দৃঢ়সংঘটিত কোনও চার্চ্চ বা ধর্ম্মশাসনমণ্ডলী এ জগতে আর কোনও

সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থাপিত হয় নাই,—তেমনই মানবের বুদ্ধির উপরে, বিচারের উপরে, ধর্ম্মসাধনার অধিকারের উপরে, এত বড় despotic tyranny—একাধিপত্যের পীড়নও—কোনও ধর্ম্মপদ্ধতি কোনও দেশে আর করিয়াছে, এরূপ শোনা যায় না।

তবে ইহাও বলিতে হইবে, বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় সভ্যতার উন্নতির প্রথম বিকাশ রোমকচার্চ্চের সহায়তায় হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মের বিশেষ একটা রূপ বা পদ্ধতি ইয়োরোপীয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল রোমকচার্চ্চ। একই সভ্যতার বিশেষ এক প্রকৃতি ধরিয়া যে ইয়োরোপীয় জাতিসমূহের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, তার প্রধান কারণও এই যে, ইহার উন্মেষের যুগে, এই প্রকৃতি ধরিয়া উঠিবার যুগে, রোমকচার্চ্চ ইয়োরোপায় জাতিসমুহকে একই ধর্ম্মশাসনের অধীনতায় একই সমাজভুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। ইয়োরোপে তখনকার জ্ঞান-বিদ্যার অনুশীলন অর্থাৎ culture যাহা কিছু, তাহাও এই রোমক চার্চ্চের নেতৃত্বাধীন ছিল। প্রায় অরাজক সেই যুগে অতি দুর্দ্দান্ত, উচ্ছৃঙ্খল এবং সুশিক্ষাবর্জ্জিত ভুস্বামীবর্গের অবাধ স্বেচ্ছাচারে উপদ্রুত সামাজে সুনীতির আদর্শস্থাপনার, লোকশিক্ষাপ্রবর্ত্তনের ও লোকহিতকর কর্ম্মের প্রয়াস যাহা কিছু রোমকচার্চ্চের যাজক ও সন্ন্যাসীগণই করিতেন। যে দেশে যাহা কিছু উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে, সকল দেশের সকলেই যে সমানভাবে সহজে তার ফলভোগী হইতে পারিয়াছে, সকলের মধ্যেই যে সামাজিক প্রকৃতির ও রীতিনীতির একটা সমতা দেখা যায়, তাহারও কারণ এই যে সকলে সমানভাবে এই রোমক চার্চ্চের শাসনধীন সমাজভুক্ত ছিল। এক কথায় একটা organism রূপে ইয়োরোপীয় সমাজ যে ধর্ম্মে তখন আশ্রিত ছিল, সেই ধর্ম্মের রূপ ছিল রোমক চার্চ্চ। ইয়োরোপীয় সভ্যতার ঋণ রোমক চার্চ্চের কাছে বড় কম নয়। *

অবতরণিকা ৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কিন্তু রোমক চার্চ্চ এত বড় ট্রাষ্টের বা দায়িত্বের কর্ত্তব্য ঠিক ভাবে পালন করিতে পারেন নাই। সমাজধর্ম্মের মহিমা যত বড়ই হউক, ব্যষ্টির অধিকারও তার মধ্যে বড় কম নয়। ব্যষ্টির সেই অধিকারকে রোমক চার্চ্চ একেবারেই অস্বীকার করিয়াছিল। ব্যষ্টির ব্যক্তিত্বের মহিমা বিকাশের সকল পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল।

চার্চ্চের এই শক্তির প্রতিষ্ঠা যে সব পোপরা করেন, তাঁহাদের যে আধ্যাত্মিক প্রেরণা ছিল, চরিত্রবল ছিল, তাহা যখন শুষ্ক হইয়া গেল, ক্ষীণ হইয়া পড়িল,—এক মাত্র পার্থিব ক্ষমতার অধিকার, পার্থিব ভোগবিলাস এবং সেই ভোগবিলাসের জন্য অর্থ আহরণই হইল রোমকচার্চ্চের প্রধান লক্ষ্য। কোনও সমাজের ধর্ম্মনীতির নেতৃত্ব দীর্ঘকাল যাঁহারা পরিচালনা করিতে চান, পার্থিব বিষয় সম্বন্ধে অসাধারণ ত্যাগী তাঁহাদের হওয়া আবশ্যক। এই ত্যাগের সংস্কার ভারতীয় ব্রাহ্মণের ন্যায় বংশানুক্রমে রোমক যাজকবর্গের ছিল না; ত্যাগের উপযোগী শিক্ষার ও সাধনার ব্যবস্থাও তেমন কিছু দেখা যাইত না। এরূপ অবস্থায় এতদূর ক্ষমতা, শিষ্যবর্গের কেবল অর্থের উপরে নয়, বুদ্ধিরও উপরে, অধিকদিন চলিতে পারে না। প্রাচীন রোমের ও গ্রীসের বিদ্যার আলোচনায় ইয়োরোপীয় চিন্তার স্রোত অন্ধবিশ্বাসের পথ ছাড়িয়া যুক্তির ও বিচারবুদ্ধির পথে যখন চলিতে আরম্ভ করিল, রোমক চার্চ্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তখন অবশ্যম্ভাবী। সেই বিদ্রোহ ঘটিল। প্রত্যেক দেশেরই বহু খৃষ্টান রোমীয় চার্চ্চের শাসনাধীনতা ত্যাগ করিল। এই বিদ্রোহদমনের জন্য রোমক চার্চ্চও তাঁহার কঠোর দণ্ডবিধান এইরূপ অস্বাভাবিক এক দানবীয় কঠোর মাত্রায় নিয়া তুলিলেন। চার্চ্চের বিরুদ্ধে লোকের বিরাগ আরও বাড়িল,—বিদ্রোহীর দল আরও পুষ্ট হইল।

এই বিদ্রোহ, যাহা ইয়োরোপীয় ইতিহাসে Reformation নামে পরিচিত, তাহা মাত্র রোমকচার্চ্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, খৃষ্টধর্ম্মের

বিরুদ্ধে নয়। বিদ্রোহী প্রটেষ্টাণ্টগণ বলিলেন, খৃষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মনীতির ব্যাখ্যা রোমক চার্চ্চ যাহা করিতেছেন, তাহা সত্য ব্যাখ্যা নহে; তাঁহাদের এই প্রভুত্বেরও ধর্ম্মসঙ্গত কোনও ভিত্তি নাই। প্রত্যেক দেশেই বহু ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ও বিদ্রোহের নায়কগণ ধর্ম্ম-নীতির নূতন ব্যাখ্যা করিয়া নূতন নূতন পদ্ধতি দেশে প্রতিষ্ঠা করিলেন।

এই সব নূতন ধর্ম্মপদ্ধতিগুলি প্রটেষ্টাণ্ট চার্চ্চ * নামে পরিচিত। বিচার ও বিবেকের স্বাধীনতার দোহাই দিয়া এই সব প্রটেষ্টাণ্ট চার্চ্চের উদ্ভব হয়। কিন্তু কোনও চার্চ্চই অপরের বিচার ও বিবেকের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে চাহিত না। রাজশক্তির আশ্রয় পাইয়া ইহার কোনও কোনওটি ষ্টেট্‌-চার্চ্চ বা রাজকীয় ধর্ম্মপদ্ধতি হইয়া উঠে। প্রত্যেক ষ্টেট-চার্চ্চ প্রজাবর্গকে আপন ধর্ম্মশাসনের বশবর্ত্তী করিয়া রাখিতে চাহিত। ভিন্ন বিশ্বাস পোষণ করিয়া অন্যরূপ অনুষ্ঠান যাহারা করিত, রাজকীয় কঠোর দণ্ডে তাহারা দণ্ডিত হইত; কখনও বা বহু রাষ্ট্রীয় অধিকারে বঞ্চিত থাকিত। এবিষয়ে রোমক চার্চ্চের সঙ্গে প্রটেষ্টাণ্ট ষ্টেট-চার্চ্চসমুহের পার্থক্য বড় দেখা যাইত না। এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে ইহার পীড়ন সর্ব্বদা ততদূর কঠোর মাত্রায় গিয়া উঠে নাই। রোমক চার্চ্চের তবু এই একটা দাবী ছিল, স্বয়ং ভগবানের শাসনযন্ত্র ইহা, যন্ত্রাধিপতি পোপ ভগবানের প্রতিনিধি,—ইহার বিদ্রোহী যে সে ভগবদ্‌বিদ্রোহী, অতি কঠোর দণ্ডের যোগ্য। কোনও প্রটেষ্টাণ্ট ষ্টেট-চার্চ্চ এরূপ দাবী করিতেন না, সুতরাং কোনও যুক্তির দ্বারাই ইহার এই পীড়ননীতির সমর্থন করা যায় না।

ধর্ম্মমতের বিরোধ, তৎপ্রসূত কলহ-যুদ্ধবিগ্রহাদি, ক্ষমতা ও সুযোগ পাইলেই ভিন্নমতাবলম্বীদের পীড়ন, নিজ নিজ প্রভুত্বপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস, রোমক ও প্রটেষ্টাণ্ট উভয়বিধ চার্চ্চ এই সব লইয়াই এত জড়াইয়া পড়েন, যে সমাজের বাস্তব মঙ্গলস্থাপনা কিসে হইবে, সে দিকে কোনও দৃষ্টিই আর বড় তাঁহাদের ছিল না। দীনদরিদ্র অজ্ঞ জনসাধারণ পার্থিব

* অবতরণিকা ৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কি আধ্যাত্মিক কোনওরূপ হিত ইঁহাদের হইতে বড় একটা লাভ করিত না।

সমাজে এমন সুব্যবস্থার প্রবর্ত্তন, চরিত্রের ও আচারনীতির এমন আদর্শ স্থাপন, যাহাতে দুর্ব্বল ও দরিদ্রের উপরে সর্ব্বদা যথেচ্ছ অত্যাচার করিবার প্রবৃত্তি বা সুযোগ শক্তিমানের না হয়, বরং সাধারণের হিতসাধনের দিকেই তাঁহাদের কর্ম্মশক্তি পরিচালিত হয়, যাজক-সম্প্রদায়ের বড় একটি কর্ত্তব্য সাধন, স্বধর্ম্মের বড় একটি সিদ্ধিই ইহা। তাঁহাদের উচ্চ অধিকার ইহাতেই সার্থকতার গৌরবে ধন্য হয়। ইহাতে অসমর্থ হইলে, অন্ততঃ আধ্যাত্মিক শান্তিতে ও আনন্দে পার্থিব সুখ-দুঃখকে উপেক্ষা করিতে লোকে পারে, এরূপ কোনও পথ তাহাদের দেখাইতে পারিলেও কতক পরিমাণে এই কর্ত্তব্য তাঁহাদের পালন করা হয়। কিন্তু এদিকেও ইয়োরোপায় যাজকমণ্ডলী বিশেষ সফলতা তখন দেখাইতে পারেন নাই। এ সব দিকে কোনও দৃষ্টিই তাঁহাদের ছিল না, কোনও চেষ্টাও তাঁহারা করিতেন না। ক্যাথলিক চার্চ্চ প্রথম যুগে এসম্বন্ধে একেবারে উদাসীন ছিলেন না বটে। কিন্তু শেষে তাঁহার প্রকৃতি ও কর্ম্মপদ্ধতি কিরূপ হইয়া উঠে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রটেষ্টাণ্ট চার্চ্চগুলির মধ্যে ক্যাল্‌ভিন প্রতিষ্ঠিত চার্চ্চেরই প্রাধান্য ছিল। এই ক্যালভিনিক চার্চ্চ এবং আরও অনেক চার্চ্চ জীবনের সকল কর্ম্মে ও আনন্দে ইহকালে কেবলই পাপ, আর পরকালে তার জন্য অনন্ত শাস্তির বিভীষিকাই দেখাইতেন। আশার কথা, সান্ত্বনার কথা, ভক্তের প্রতি ভগবানের অক্ষয় ও অমিত করুণার কথা,—অনুতপ্ত পাপীর ইহকালে না হউক, অন্ততঃ পরকালে শান্তির কথা, শান্তির আশা, রোমক কি প্রটেষ্টাণ্ট কোনও চার্চ্চের যাজকদের নিকট কেহ বড় একটা শুনিতে পাইত না।

মধ্যযুগে রাজশাসন যখন কোনও দেশেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, অতি দুর্দ্দান্ত ও উচ্ছৃঙ্খল ভূস্বামীবর্গের অবিরত যুদ্ধবিগ্রহে ও যথেচ্ছ আচরণে দেশে শান্তি থাকিত না, প্রজাসাধারণ যারপরনাই উৎপীড়িত

হইত, উচ্চ আদর্শের একটা ক্ষাত্রধর্ম্মের অর্থাৎ chivalry নীতির প্রতিষ্ঠা করিয়া রোমকচার্চ্চ তখন সমাজের অনেক মঙ্গল সাধন করেন; চার্চ্চরূপে আপনাদের বড় একটি ধর্ম্মও পালন করিয়া, আপনার অস্তিত্বের ও প্রভুত্বের বিশেষ একটা সার্থকতাও দেখান। কিন্তু খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে সর্ব্বত্র রাজশক্তির প্রভাববৃদ্ধি, ভূস্বামী সম্প্রদায়ের শক্তি হ্রাস, ক্রমে আভ্যন্তরিক যুদ্ধবিগ্রহের শান্তি, উন্নত এক মধ্যবিত্ত Bourgeiosie সম্প্রদায়ের আবির্ভাব প্রভৃতি অনেক কারণে chivalry ধর্ম্ম অনুবর্ত্তনের প্রয়োজন ও অবসর ক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়। রোমক চার্চ্চও ক্রমে তাঁহার আধ্যাত্মিক আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া পার্থিবশক্তি প্রতিষ্ঠার দিকে একেবারে ঝুঁকিয়া পড়েন। এদিকে প্রটেষ্টাণ্টদের মধ্যেও 'মেথডিষ্ট' 'কোয়েকার' প্রভৃতি ক্ষুদ্র দুই চারিটি সম্প্রদায় ব্যতীত সুপ্রতিষ্ঠ কোন চার্চ্চ লোকসেবা বা লোক-শিক্ষার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতেন না।

মোট কথা, সমাজের মঙ্গলস্থাপনার দিকে কোনও চার্চ্চের বা যাজকসম্প্রদায়ের বিশেষ কোনও দৃষ্টি বা প্রচেস্টা শেষে আর ছিল না। এমন কোনও শিক্ষাদীক্ষারও প্রবর্ত্তন তাঁহারা করিতে পারেন নাই, যাহাতে দীনদুঃখী জনসাধারণ ঐহিক কি পারত্রিক কোনওরূপ সুখ-শান্তির তেমন কোনও অবলম্বন পাইতে পারে।

অথচ জনসাধারণেরই অর্থে ইঁহারা প্রতিপালিত হইতেন; আরও অনেক বিশিষ্ট অধিকার বা privilege ভোগ করিতেন। কোনও বিশিস্ট অধিকার বা privilege কোন সম্প্রদায়বিশেষের থাকিলেই বুঝিতে হইবে, কতকগুলি বিশিস্ট দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যও তাঁহাদের আছে। বস্তুতঃ তানুরূপ দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের ভারব্যতীত, বিশিস্ট কোনও অধিকারের যুক্তিসঙ্গত কি ধর্ম্মসঙ্গত কারণ কিছু থাকিতেই পারে না। জনসাধারণের অর্থে প্রতিপালিত হওয়াই যাজকসম্প্রদায়ের বিশিষ্ট একটি অধিকার। কেন লোকে তাঁহাদের অর্থদ্বারা প্রতিপালন করিবে, যদি না বিনিময়ে বিশেষ কোন উপকার পায়? এক গৃহস্থবর্গের

বিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি তাঁহারা সম্পন্ন করিতেন। এই সব অনুষ্ঠানে বিশ্বাসী যাহারা, তাহারা এজন্য স্বেচ্ছায় ইঁহাদের কিছু দান করিতে পারে।—ইহার বিরুদ্ধে আপত্তিরও কিছু কারণ নাই। যাজক সুজন না হইলেও, অথবা দুর্জ্জন হইলেও, যদি কেহ বিশ্বাস করে, অমুক যাজকের দ্বারা অমুক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করাইলে তাহার ঐহিক কি পারত্রিক অমুক মঙ্গল হইবে, সে তাহা সন্তুষ্টচিত্তেই করাইবে, করাইয়া যাজক যাহা দাবী করিবেন তাহাও দিবে। এ অবস্থায় কিছু পাইয়া তার বিনিময়ে সে কিছু দিল।—এ দেশে গুরুপুরোহিত বা অধ্যাপককে দান দক্ষিণা প্রণামী প্রভৃতি লোকে যাহা দেয়, স্বেচ্ছায় এইভাবে দেয়। ব্রাহ্মণেরদ্বারা স্থায়ী সামাজিক মঙ্গল কিছু ঘটিতেছে কি না, তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ও পরিচালিত শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে লোকের আধ্যাত্মিক চরিত্রের উন্নতি কত দূর কি হইতেছে, এ সব আলোচনা কি বিবেচনার প্রয়োজন এস্থলে কিছু নাই। ইহাই যথেষ্ট, যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে কোনওরূপ সহায়তা ইঁহাদের নিকট হইতে লোকে নিতেছে, আর তার বিনিময়ে স্বেচ্ছায় কিছু দিতেছে। বাধ্যবাধকতার কোনও *কথা ইহার মধ্যে নাই।* কেহ বলে না, বলিতে পারেও না, আমি কোনও উপকার চাই বা না চাই, পাই বা না পাই, ব্রাহ্মণকে আমার বৎসরে বা মাসে বাঁধানিয়মে এত করিয়া দিতেই হইতেছে। ইয়োরোপে যাজকবর্গের প্রতিপালনের জন্য এইরূপ বাঁধানিয়মেই একটা ধর্ম্মকরের ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক লোক তাহার আয়ের দশাংশ চার্চ্চের কর-স্বরূপ দিবে, প্রথমে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। তাই এই করের নাম হয়, 'টাইথ' (tythe) বা দশাংশ। ধরুন, আমাদের দেশের কোনও দরিদ্র গৃহস্থ, মাসে যে অতি ক্লেশে দশটাকা উপার্জ্জন করে, একটি করিয়া টাকা যদি তাকে ব্রাহ্মণপ্রতিপালনের জন্য দিতে হইত, এদেশবাসী হিন্দুর এত ধর্ম্মনিষ্ঠা সত্ত্বেও কয়জনে এ ভার সন্তুষ্ট চিত্তে বহন করিতে পারিত? কিন্তু ইয়োরোপে দীনদুঃখী সকল গৃহস্থ প্রজাকেই এই ভার বহন করিতে হইত; বিনিময়ে যাহা

পাইত তাহাও নগণ্য। কোনও কোনও দেশে আবার রোমক চার্চ্চের যাজকগণ রাজকীয় করের দায়িত্ব হইতেও মুক্ত ছিলেন।

রোমক চার্চ্চের organisationকে অনেকে বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন, এবং পাশ্চাত্যজাতির organising genius বা শক্তি-স্থাপনী প্রতিভার বড় একটি দৃষ্টান্ত বলিয়াও ইহার কথা উল্লেখ করেন। হাঁ, organising capacity বা শক্তিস্থাপনী যোগ্যতার দৃষ্টান্তরূপে ইহা প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু এই শক্তিই ইহাকে শক্তিমুখ, পার্থিব বিষয়োন্মুখ করিয়াছে ; এবং এই শক্তির মোহে ও পার্থিব বিষয় লিপ্সায় সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলস্থাপনারূপ যে স্বধর্ম্ম-পালন বা proper functionএর সম্পাদন, তাহাতে ইহা এরূপ ব্যর্থ হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোনও সমাজেই ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণস্থানীয় সম্প্রদায় এই স্বধর্ম্ম পালনে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছেন, এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না। তবে ভারতের ব্রাহ্মণ এই ধর্ম্ম পালনের চেষ্টা কি ভাবে কোন্ পথে করিয়াছেন, তাহা যখন আমরা পরে যথাস্থানে আলোচনা করিয়া দেখিব, বোধ হয় বুঝিতে পারিব, তুলনায় তাঁহাদের এই সাধনার মূল্য কি ?

ইয়োরোপীয় ব্রাহ্মণ গুণকর্ম্মে তাঁহার বিশিষ্ট অধিকার কি ভাবে পালন করিয়াছেন, তাহা মোটামুটি দেখিলাম, এখন ইয়োরোপের ক্ষত্রিয় এই অধিকারের দায়িত্ব কি ভাবে পালন করিতেন, তা দেখা যাউক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই যুগে ইয়োরোপে ক্ষত্রিয়বর্ণের অনুরূপ ছিলেন অভিজাত ভূস্বামী সম্প্রদায়। মধ্যযুগে রাষ্ট্রীয় সংস্থান সাধারণতঃ যেরূপ ছিল, তাহা Feudal System নামে পরিচিত। রাজকীয় শাসনযন্ত্র তখন দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই, কতকটা রাজার অধীনস্থ সামন্তের ন্যায় ভূস্বামীবর্গ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করিতেন। সামরিক ও অন্যান্য রাজকার্য্য প্রয়োজন মত ইঁহারা রাজার সাহায্য করিতেন ; রাজাকে অর্থদানও দুই এক সময়ে করিতে হইত।

কিন্তু ভূমিরাজস্ব বা অন্য কোনও রূপ রাজকর ইঁহাদের দিবার রীতি ছিলনা। শাসনের দায়িত্ব ইঁহাদের হাতে ছিল, অধীনস্থ প্রজাদের নিকট হইতে ভূমিরাজস্ব ও অন্যান্য নানারকম কর ইঁহারাই গ্রহণ করিতেন। রাজা যখন নিজের কর্ম্মচারীর দ্বারা শাসন করিতেন না, তখন করই বা তিনি কেন নিবেন? আর তাঁহার প্রয়োজনই বা হইবে কিসে? কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে নানাদেশে নানা কারণে রাজাদের শক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং দেশের শাসন ক্রমে তাঁহাদেরই আয়ত্ত হইয়া উঠে। ভূস্বামীগণও স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ক্রমে রাজার অধীন হইয়া পড়েন। সামরিক ও শাসন বিভাগে রাজারা ইঁহাদের রাজকর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত করিতে থাকেন। রাজদরবার হইতে এজন্য ইঁহারা বেতন বা বৃত্তি পাইতেন। আবার শাসক ভূস্বামীরূপে যে সব অধিকার ইঁহারা ভোগ করিতেন, তাহাও সব বজায় রহিল। প্রজাদের নিকট হইতে আগের মতই নানারকম কর তাঁহারা নিতেন, প্রয়োজন মত তাহাদের বেগার খাটাইতেন, জবরদস্ত শাসনে আরও যত রকম প্রজাপীড়নের ক্ষমতা ইঁহাদের হাতে ছিল, তাও সব পরিচালনা করিতেন। প্রজাদের প্রদত্ত করে এবং রাজসরকারের উচ্চ বেতনাদিতে অশেষ ভোগ বিলাসে ইঁহারা জীবন যাপন করিতেন। শাসনের দায়িত্ব না থাকায় জমিদারীতে প্রজাদের মধ্যে বাস করিবারও প্রয়োজন বড় হইত না। এদিকে রাজকীয় শাসনের দায়িত্ব বাড়িল। এ দায়িত্ব পালন করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন হইত। ইহার জন্য সাধারণ প্রজাবর্গের উপরে রাজসরকার হইতেও নানারকম কর ধার্য্য হইল। জমিদারের কাজে বেগারের ব্যবস্থা আগেই ছিল। এখন রাজসরকারের কাজেও প্রজাদের অনেক বেগার খাটিতে হইত। যখন তখন আবার রাজারা আপনাদের শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যুদ্ধবিগ্রহও করিতেন। সৈনিক অবশ্য সংগ্রহ করা হইত প্রজাদের মধ্য হইতেই, কোথা হইতে আর হইবে? জবরদস্তীও ইহাতে যথেষ্ট হইত। যুদ্ধে তারা মরিত, আরও অশেষ ক্লেশ ভোগ করিত,—অথচ এই সব যুদ্ধে নিজেদের বিশেষ

কোনও মঙ্গল তাহারা দেখিত না। স্বার্থ সিদ্ধি যাহা হইত, প্রধানতঃ রাজার ও ভূস্বামী সম্প্রদায়ের। . . .

অভিজাত ভূস্বামী সম্প্রদায়ের এই সব উচ্চ অধিকার ও প্রভুত্ব পুরুষ-পরম্পরা ক্রমে চলিয়া আসিতেছিল; আবার রোমীয় চার্চ্চের ধর্ম্মনীতিও যে পরোক্ষভাবে ইহার সমর্থন করিত, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে, 'যে গরুটা দুধ দেয় তার নাথিটাও খাওয়া যায়'। হাঁ, দুধ দিলে নাথিটা খাওয়া যায়; কিন্তু যে দুধ দেয় না, দিবে না,—কেবলই তার নাথি কোন সুখে লোকে কত দিন চুপ করিয়া খাইতে পারে? বড় যে বড়, বড় যোগ্যতায় বড়, বড় দায়িত্বে বড়,। বড় যোগ্যতা সকলের থাকেনা, বড় দায়িত্বের ভারও সকলে বহিতে পারে না। যারা পারে না, তাহাদেরই শাসন ও রক্ষণের ভার বড় যোগ্যতায় বড় যাঁরা তাঁহাদের নিতে হয়। এই শাসন ও রক্ষণের গুণে নিশ্চিন্ত হইয়া যদি তাহারা আপনাদের কাজকর্ম্ম করিয়া সুখে শান্তিতে থাকিতে পারে, সর্ব্ববিষয়ে শক্তি অনুসারে যে যাহার অধিকারী তাহা ভোগ করিতে পারে, তবে উচ্চতর যোগ্যতা-শীল উচ্চতর সম্প্রদায়সমূহের প্রভুত্ব সন্তুষ্ট চিত্তে তাহারা মানিবে, এমন কি অন্যায় অত্যাচার কখনও কিছু হইলে তাহাও সহিবে। কারণ এ অত্যাচার তাহারা সহজেই দুগ্ধবতী গাভীর পদাঘাতের ন্যায় মনে করে। কিন্তু উচ্চতর সম্প্রদায় যদি উচ্চতর পদ ও ক্ষমতার প্রভাবে নিম্নতর সম্প্রদায়কে কেবল পীড়নই করেন, শাসন রক্ষণ বা অন্য কোনও হিতসাধনে তাহাদের প্রভুত্বের অধিকার প্রতিপন্ন না করেন, তবে সে অধিকার কতদিন ইহারা মানিতে পারে? উপযুক্ত সুযোগ উপস্থিত হইলে, পথ ও পথে চলিবার নির্দ্দেশ পাইলে, তাহারা এই অধিকারের বিরুদ্ধে দুর্দ্দম বেগে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে। কেবল এই অধিকারের বিরুদ্ধে নয়; যে ধর্ম্ম, পরম্পরাগত যে সব প্রথা ও প্রতিষ্ঠান এই অধিকারকে সমর্থন করিতেছে, ইহার মূলে রহিয়াছে, এই বিদ্রোহ তাহার বিরুদ্ধেও আপনাকে প্রকাশ করিবে।

ইয়োরোপে চার্চ্চশাসনের অত্যাচার যে স্পেনেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় গিয়া উঠে, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই অত্যাচারের ফলে এবং আরও কতকগুলি কারণে ষোড়শ শতাব্দীতে যে স্পেন ইয়োরোপের মধ্যে শক্তিতে একরূপ সর্ব্বপ্রধান রাজ্য ছিল, সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই তার জাতীয় প্রতিভা একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্পেন ইয়োরোপের মধ্যে অতি নগণ্য একটা রাজ্যে পরিণত হয়। ইংলণ্ডে বরাবরই চার্চ্চ, অভিজাত ভূস্বামীবর্গ এবং নাগরিক ব্যবসায়ী সম্প্রদায়—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—তিন শ্রেণীর মধ্যে মোটের উপর এমন একটা শক্তির সামঞ্জস্য ছিল, যাহাতে উপরের দুই বা কোন এক সম্প্রদায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপরে অত্যধিক প্রভুত্ব কিছু প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। সম্রাট্‌দের পতনের পর জর্ম্মাণী বহু ক্ষুদ্ররাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। রাজ্যগুলির মধ্যে আবার কোথাও রোমক চার্চ্চ, কোথাও প্রটেষ্টাণ্ট চার্চ্চ, প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে এই দুই চার্চ্চের পৃষ্ঠপোষক রূপে এবং পরে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের প্রয়োজনে এই সব রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘকাল যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে। ইহার ফলে দেশব্যাপী বাঁধা একটা রীতিপদ্ধতিতে চার্চ্চের কি রাজন্য ও ভূস্বামীবর্গের প্রভুত্বের অধিকার অন্যান্য সম্প্রদায়ের সকল ন্যায্য অধিকারের উপরে একেবারে চাপিয়া বসিতে পারে নাই; যদিও ইঁহাদের এই প্রভুত্বই দেশে প্রধান ছিল, এবং অনেক সময় পীড়নও যথেষ্ট হইত।

কিন্তু ফ্রান্সের অবস্থা ছিল অন্যরূপ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রখ্যাত-নামা চতুর্দ্দশ লুই (Louis XIV)এর সুদীর্ঘ রাজত্বকালে দেশে রাজার অতি দৃঢ় একটা একাধিপত্য স্থাপিত হয়। রাজানুগৃহীত ভূস্বামিবর্গ বড় বড় রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, এবং রাজপ্রসাদে এমন সব অধিকারও (privileges) তাঁহারা লাভ করেন, যাহাতে সাধারণ প্রজাবর্গ অপেক্ষা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সকল বিষয়ে অনেক বেশী ক্ষমতা এবং সুখ সুবিধা ভোগের সুযোগ তাঁহাদের আয়ত্ত হয়। এই সব অধিকার

(privileges) এবং অধিকারপ্রসূত ক্ষমতার বলে তাঁহাদের অধিকৃত ভূভাগ সমূহের প্রজাদের উপরে অশেষ রকম পীড়নের অবসরও তাঁহারা পাইতেন। ইহার উপর আবার রাজকীয় করভার ও অন্যান্য বেগার কাজের ভারও এত বেশী এই সব প্রজাদের উপরে আসিয়া পড়ে যে তাহাদের দুঃখের আর অবধি ছিল না। অভিজাত ভূস্বামী-সম্প্রদায়ের ন্যায় প্রধান যাজকবর্গও বিশেষভাবে রাজানুগ্রহের ভাগী হন। তাহাতে চার্চ্চের অধিকার (privileges) ও প্রতিপত্তিও অনেক বাড়িয়া উঠে।

ধর্ম্মক্ষেত্রে ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে নেতৃত্বের ও অন্যান্য বহু ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত হইলেও ফরাসী Bourgeoisie (যাহাকে আমরা বৈশ্য বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি এবং করিয়াছি) নানাবিধ বিদ্যার আলোচনায় এবং ব্যবসায়বাণিজ্যাদির প্রসারে বেশ উন্নত অবস্থায় তখন উঠিয়াছিলেন। শাসনের পীড়ার ভার গিয়া পড়িয়াছিল দেশের কৃষিবল প্রজাসাধারণের উপরে। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত হইতেই ইহাদের আর্থিক দুর্গতির অবস্থা সকলে বুঝিতে পারিবেন। ইহারা যে আয় করিত, তার শতকরা ৫৩ টাকা রাজসরকারকে, ১৪ টাকা নিজেদের ভূস্বামীকে এবং ১৪ টাকা যাজকদের ধর্ম্মকর দিতে হইত। বাকী থাকিত মোটে উনিশ। ইহার দ্বারাই তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইত। ইহার উপর আবার অনেক বেগার তাহাদের খাটিতে হইত। তারপর গম ভাঙ্গিয়া আনিতে হইত জমিদারের কলের যাতায়, রুটি সেঁকিয়া আনিতে হইত জমিদার বাড়ীর উনানে,মদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য আঙ্গুরাদি ফল মাড়িয়া আনিতে হইত জমিদারের মাড়নকলে! ইহার বিনিময়ে দামও দিতে হইত। জমিদারের সকের ঘোড়া কুকুর, শিকারের জন্য বনে পালিত পশুপক্ষী সব কৃষকদের ক্ষেতের শস্য নষ্ট করিয়া ফেলিলেও তার কোনও প্রতিকারের উপায় ছিল না। আরও ছোটখাট যে কত অত্যাচার হইত, তাহা না বলিলেও চলে। অথচ তাহাদের শাসনরক্ষণের কোনও দায়িত্ব

জমিদারের হাতে ছিল না। যাজকসম্প্রদায় হইতেও এই সব অত্যাচারের প্রতিকারে অথবা অন্য রকমে বিশেষ কোনও সহায়তা কি উপকার তাহারা লাভ করিত না। বরং চার্চের ধর্ম্মনীতি সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে রাজার ও রাজসহকারী ভূস্বামীসম্প্রদায়ের এই শক্তি-প্রতিষ্ঠার সমর্থনই করিত।

সমাজে যে বৈষম্য স্বাভাবিক, তাহা লোকে বুঝিতে পারে। কোনও শ্রেণীর লোককে অন্যায় পীড়নও তাহা করে না। বৈষম্যের মধ্যেও লোকে সন্তুষ্ট থাকে, যাহা তারা পাইবার যোগ্য তাহাও পায়। তারপর যারা উপরে আছে, উপরের বড় দায়িত্ব বহন করিতেছে। এই দায়িত্ববহনে নিম্নতর শ্রেণীর লোকেরা যে কতখানি উপকৃত হইতেছে, কতটা নিরুদ্বেগ হইয়া যার যার জীবনের বৃত্তি অনুসরণ করিয়া শান্তিতে আছে, ইহাও সকলে অনুভব করে। ইহার উপর উচ্চতর সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের ব্যবহারে যদি স্নেহ ও সমবেদনা, তাহাদের সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি সদয়দৃষ্টি, তারা দেখিতে পায়,—বহু কর্ম্মে, পরস্পরের সঙ্গে বহু সম্বন্ধে, যদি তার পরিচয় পায়, তাঁহাদের বিরুদ্ধে একটা অসন্তোষের উত্তেজনাও নিম্নতর শ্রেণী সমূহের মধ্যে হয় না। কিন্তু ফরাসীসমাজে নিম্নতর জনসাধারণের মধ্যে এরূপ কিছু বুঝিবার কি ভাবিবার অবসর একেবারেই ছিল না,—অস্বাভাবিক একটা অতি কঠোর পীড়নই কেবল তাহাদের উপরে চাপিয়া ছিল। সমাজে ও রাষ্ট্রে যেমন প্রত্যেকেরই সুখসুবিধা অনেক আছে, তেমন দায়িত্বও অনেক আছে। সুখসুবিধাগুলি রক্ষার জন্য ত্যাগ অনেক করিতে হয়, ক্লেশও অনেক পাইতে হয়। কিন্তু ফরাসী রাষ্ট্রের ও সমাজের অবস্থা তখন এমনই হইয়াছিল যে এই সব দায়িত্বের, ত্যাগের ও ক্লেশের, ভাগটা একেবারেই গিয়া পড়িয়াছিল দরিদ্র জনসাধারণের উপরে, আর সুখ-সুবিধাগুলি ভোগ করিতেন সবই উচ্চতর অভিজাত ভূস্বামী সম্প্রদায় আর উচ্চতর যাজকবর্গ। কেবল তাই নয়, দরিদ্র জনসাধারণকে নানা-রকম পীড়ন করিবারও ক্ষমতা এবং অধিকার তাঁহাদের হাতে ছিল।

কোনও নীতি, কোনও যুক্তি দ্বারা এই বৈষম্যকে, বৈষম্যের এই পীড়নকে সমর্থন করা যাইত না। বেশী হউক, অল্প হউক, বুদ্ধি ও বিচারশক্তি মানবমাত্রেরই আছে। সকলেই ভাবিত, কেন আমরা এত দুঃখ সহিতেছি? কিন্তু ভাবিয়া কোনও কুল পাইতনা। জীবনের এমন একটি দিক ছিল না, যে দিকে দরিদ্র একটু শান্তির ও আশার আলোক পাইতে পারে। ইহকালের দুঃখও লোকে বরদাস্ত করিতে পারে, পরকালের কথা ভাবিয়া,—পার্থিব দুঃখের ভার বহিতে পারে আধ্যাত্মিক শান্তির আশ্রয়ে। কিন্তু তৎকালীন ধর্ম্মপদ্ধতিও এরূপ কোনও আশার বা শান্তির পথ লোককে দেখাইতে পারে নাই। এ অবস্থায় পীড়িত মানবের চিত্তে সমগ্র সমাজবিধান ও ধর্ম্মবিধানের বিরুদ্ধেই অতি ভীষণ একটা অসন্তোষের উত্তেজনা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু অজ্ঞ জনসাধারণের দুঃখ এবং দুঃখপ্রসূত অসন্তোষ সহজে কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া প্রতিকারের উদ্দেশ্যে ছুটিতে পারে না। সুতরাং এমন সব নেতার আবশ্যক, যাঁহারা ইহার তত্ত্ব ও নিদান আলোচনা করিয়া জনসাধারণের অবসন্ন বুদ্ধিকে জাগাইয়া তুলিবেন. তাহাদের লক্ষ্যহীন উত্তেজনাকে নির্দ্দিষ্ট একটা পথে, নির্দ্দিষ্ট একটা লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করিবেন। রুষো, ভল্টেয়ার, দিদিরো প্রভৃতি এইরূপ অনেক নেতারাও আবির্ভাব ফরাসী দেশে এই সময়ে হয়। প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত সকল রাষ্ট্রবিধান, সমাজবিধান ও ধর্ম্মবিধানের বিরুদ্ধে ইঁহারা মানবের সাম্য ও স্বাধীনতা বাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। অতিতৃষ্ণার্ত্ত যেমন আগ্রহে শীতল জল পান করে, সে জলে কোনও কঠিন রোগের বীজাণু আছে কিনা, ভাবে না,—তেমনই আগ্রহে জনসাধারণ ইঁহাদের প্রচারিত নীতি গ্রহণ করিতে লাগিল। তার মধ্যে অসত্যের অমঙ্গল কিছু আছে কিনা, থাকিতে পারে কিনা, তাহা ভাবিবারও একটু অবসর কাহারও হইল না।

দেশের আর্থিক অবস্থায়ও বড় একটা সঙ্কট এই সময়ে দেখা দেয়।

ভীষণ দুর্ভিক্ষের পীড়নে দরিদ্র একেবারে উন্মত্তবৎ হইয়া উঠে। অনুকূল আরও এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে ফরাসী জনসাধারণ রাজা ও উচ্চতর সম্প্রদায়সমূহের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া একে-বারে খড়গহস্ত হইয়া উঠিল,—প্রাচীন রাষ্ট্রবিধান, সমাজবিধান, ধর্ম্মবিধান, সব চূর্ণ করিয়া ফেলিল।

বৈষম্য ও অন্যায় শাসন যখন সীমা ছাড়াইয়া যায়, সাম্যের বিদ্রোহ তার বিরুদ্ধে তেমনই প্রবলভাবে উত্থিত হয়; ইহাও সকল সীমা ছাড়াইয়া যায়।

ফরাসী বিপ্লবের যুগে যেমন সাম্যের, তেমনই স্বাধীনতার, দাবী সকল সীমা ছাড়াইয়া অতি উৎকট একটা অস্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ পায়। প্রাচীনের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ একেবারে ছিন্ন করিয়া নূতন এক অস্বাভাবিক সাম্য ও স্বাধীনতার নীতি ধরিয়া মানবসমাজকে একেবারে নূতন ছাঁচে নূতন করিয়া গড়িয়া নিবারই প্রয়াস হয়।

মোটকথা, ধর্ম্মনীতি, রাষ্ট্রনীতি এবং পরম্পরাগত আচারব্যবহারের প্রভাবে ইয়োরোপের Clergy ও Nobility (তৎকলীন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়) উচ্চতর এই দুইটি সম্প্রদায়ের হাতে বহুবিধ অন্যায় অধিকার (rights & privileges) গিয়া পড়িয়াছিল, এবং নিম্নতর অন্যান্য সম্প্রদায় সমূহ বহু ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছিল। এইরূপ অন্যায় অধিকারভোগী সম্প্রদায় বা priviliged classes, ন্যাব্য অধিকারে বঞ্চিত (unpriviliged) সম্প্রদায় সমূহের উপরে বহুপ্রকার পীড়নের অবসর পাইতেন, পীড়নও যথেষ্ট করিতেন। এই বৈষম্যের অসঙ্গতি এবং ইহার পীড়ন, ফরাসী দেশেই সর্ব্বোচ্চ মাত্রায় গিয়া উঠিয়াছিল। এই অসঙ্গতি বুঝিয়া এবং পীড়ন আর সহিতে না পারিয়া সেখানে এই সব unprivileged classes বা সম্প্রদায় সমূহ privileged classes বা সম্প্রদায় সমূহের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহে মাথা তুলিয়া উঠিল। এই বিদ্রোহ যে কেবল স্থানীয় একটা সম্প্রদায়িক বিরোধের ক্রিয়ায় এবং তাহার জয়পরাজয়েই পর্য্যবসিত হয়, তা

নয়। যে Social Authority এই অতি অসঙ্গত ও লোকপীড়ক অধিকারের বৈষম্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, জনসাধারণের বুদ্ধি তাহারই বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়,—যে ধর্ম্মনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আচার ব্যবহার বা customs ইহার আশ্রয় স্বরূপ ছিল, তাহারই ন্যায়-সঙ্গতি একেবারে অস্বীকার করে, জীবননীতির এক নূতন আদর্শের দিকে প্রবলবেগে ধাবিত হয়।

এই আদর্শ কি? সকল রকম Social Authorityর কর্ত্তৃত্ব ও নির্দ্দেশের নিরপেক্ষ হইয়া মানব তাহার নিজের বুদ্ধিতে তার জীবনের পথ স্থির করিয়া নিবে, যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝে তাহা করিবে, এবং ইহাতে তার নিজের বুদ্ধি ব্যতীত আর কাহারও কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই। নিজের বুদ্ধিতে Social Authorityর কোনও রূপ নির্দ্দেশ, কোনও রীতি, যদি সে ভাল বলিয়া বুঝে, ইচ্ছা হইলে তদনুসারে সে চলিতে পারে। কিন্তু কোনও শাসনপদ্ধতির কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের এ অধিকার নাই, বাধ্য করিয়া তাহাকে চালাইতে পারে। কোনও ধর্ম্ম নহে, কাহারও বা কোনও কিছুর প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা নহে, মানবের নিরপেক্ষ বুদ্ধি বা Reasonই তাহার জীবনযাত্রার একমাত্র নিয়ন্তা, তাই নূতন এই মতবাদ বা চিন্তার ধারা Rationalism নামেই পরিচিত হইয়াছে। সুতরাং যে বিদ্রোহ ফরাসী বিপ্লবে প্রকাশ পায়, তাহার মূলতত্ব হইতেছে, Social Authorityর বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ মানববুদ্ধির বা Independent Human Reasonএর বা তাহায় স্বাতন্ত্রের, এককথায় Individual libertyর বিদ্রোহ। ফরাসীদেশের অতি উৎপীড়িত ও অসন্তুষ্ট un-privileged classকে ভীষণ এক উন্মাদনায় উত্তেজিত করিয়া privileged classএর বিরুদ্ধে উঠান হয়, কারণ সেখানে Social Authorityরই প্রতিভূস্বরূপ ছিলেন, এই privileged class। দেশ কাল পাত্রের বিশিষ্ট অবস্থায় এই আকারে এই বিদ্রোহ সেখানে ঘটে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা কেবল একটা স্থানীয়

সাম্প্রদায়িক বিরোধ নহে, অথবা কেবল তৎকালে প্রতিষ্ঠিত বিশিষ্ট Social Authorityর বিরুদ্ধেও জনসাধারণের বিদ্রোহ নহে। এইরূপ প্রাচীন যে কোনও Social Authority, যে ধর্ম্ম বা মূলনীতি তাহার ভিত্তি, তাহারই বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ মানব বুদ্ধির বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ প্রাচীন এই সব Social Authorityকে ভাঙ্গিয়া জনসমাজে ব্যষ্টির স্বাতন্ত্র্য, Individual libertyর প্রাধান্য, প্রতিষ্ঠা করিতে চায়।—Social Authority যাহা প্রয়োজন, ব্যষ্টিসমূহ নিজেরা তাহা গড়িয়া নিবে,—তার অধিকারের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিবে। কিন্তু এইভাবে তাহাদের সৃষ্ট নয়, এরূপ কোনও Social Authorityকে কেহই মানিবে না।

Reformation বা রোমক চার্চ্চের বিরুদ্ধে প্রটেষ্টাণ্টবিদ্রোহই ইয়োরোপীয় Individualism এর সূত্রপাৎ করে, তবে একটা সীমা অতিক্রম করিয়া যায় না। খৃষ্টধর্ম্মকে ইহা মানিয়া চলিয়াছে,—দাবী তার এই মাত্র ছিল যে খৃষ্টধর্ম্মের তত্ত্ব কি তাহা বুঝিয়া তদনুসারে চলিবার একটা নিরপেক্ষ অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু Individualism বস্তুটা এমনই যে একবার মুক্ত হইয়া ছুটিবার পথ পাইলে, *কোনও সীমার মধ্যে সে বড় থাকে না।* দুর্ব্বার প্রবল গতিতে সকল বন্ধন ছাড়াইয়া, সকল সীমা লঙ্ঘন করিয়া, যাইতে চায়। চার্চ্চের শক্তিও এতদূর শিথিল ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, এই পথে সে আর কোনও বাধা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না।

ক্রমেই ইহার বল বৃদ্ধি পাইতেছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে এমন কতকগুলি অবস্থা আসিয়া পড়িল, যাহার প্রভাবে যে বন্ধনটুকু সে মানিত, যে সীমা সে একেবারে লঙ্ঘন করিতে চায় নাই. সে বন্ধনও ছিন্ন করিয়া, সেই সীমাও লঙ্ঘন করিয়া, নূতন এক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইল। এই লক্ষ্য মুক্ত নিরপেক্ষ Rationalism, আর তাই ধরিয়া জীবনের সকল ক্ষেত্রে Individualismএর মহিমা প্রতিষ্ঠা,—সমষ্টির সঙ্গে সকল সম্বন্ধে democracyর প্রবর্ত্তন।

বস্তুতঃ Rationalismএর ধর্ম্ম বা essential characterই ইহা নয়, যে Social Authorityর উপরে Individual libertyর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবে। Individual libertyরও জীবনের বিশেষ বিশেষ কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ অধিকার আছে। Social Authorityকে যে তাহার বিরোধী হইতেই হইবে, তাহাকে ধ্বংস করিয়া আপনাকে মানবজীবনের উপরে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত রাখিতেই হইবে, এমন কোনও কথাও নাই। তবে ইয়োরোপে বিশেষ কতকগুলি কারণে এইরূপ হইয়াছিল।

ব্যষ্টির উপরে সমষ্টির শাসনের সব চেয়ে বড় দাবী আইসে ধর্ম্মের বা religionএর দিক্ হইতে। ধর্ম্মের সঙ্গে যুক্ত হইলে ষ্টেট্ বা রাষ্ট্র-পদ্ধতির বড় একটা বল হয় বটে, কিন্তু অন্য বহু উপায়ও আছে, যাহার সাহায্যে ষ্টেট্ তার প্রজার উপরে আধিপত্য রক্ষা করিতে পারে। সুশাসনে ও শান্তিরক্ষায় যে ষ্টেট্ প্রজাকে মঙ্গলে রাখিতে পারে, তার উন্নতির পথে সহায় হইতে পারে, প্রজা সন্তুষ্ট চিত্তে তাহার শাসন মানে। শাসনে এই ভাবে প্রজার যে একটা পরোক্ষ সম্মতি বা অনুমোদন, তাহাও ষ্টেট্‌কে কম শক্তিমান্ করিয়া তোলে না। আবার এই শাসন পরিচালনাও করিতে হয়, প্রজার সাহায্যে। কখনও কোনও সম্প্রদায়বিশেষের হাতে অধিক ক্ষমতা গিয়া পড়িলেও ষ্টেটের শক্তিরক্ষা কল্পে সকল শ্রেণীর প্রজাকেই কিছু না কিছু সহায়তা করিতে হয়। যখন তখন আবার বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে প্রজাসাধারণের সাক্ষাৎ সম্মতিও অনেক ষ্টেট্‌কে নিতে হয়। সুতরাং সন্তুষ্ট প্রজা-সাধারণের অনুমোদন ও স্বেচ্ছার আনুগত্য ব্যতীত কোনও ষ্টেট্ তাহার প্রভুত্ব দীর্ঘকাল কোথাও চালাইতে পারে না। রাজাই সাধারণতঃ ষ্টেটের প্রতিভূস্বরূপ, তাই ভারতবর্ষে প্রজারঞ্জনই বিশেষ ভাবে রাজধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রজাকে রঞ্জন করেন বলিয়াই রাজা রাজা। তারপর রাষ্ট্রশাসন সাধারণতঃ রাষ্ট্রসম্বন্ধেই প্রজার উপরে প্রযুক্ত হয়। জীবনের বহু প্রকার সুখ শান্তি ও মঙ্গলের আশ্রয়স্বরূপ

অনেক এমন কর্ম্মক্ষেত্র আছে, যেখানে মানব স্বাধীন ; রাষ্ট্রশাসন তাহার এ স্বাধীনতাকে ব্যহত বড় করে না : স্বচ্ছন্দে নিজের ইচ্ছামত সে চলিতে পারে।

আচারব্যবহারের (Customsএর) প্রভাব অতিব্যাপক বটে, কিন্তু যখনই আচারব্যবহার অবস্থার পরিবর্ত্তনে জীবনযাত্রার স্বচ্ছন্দতার অন্তরায় হয়, তাহার প্রভাব থাকে না, আপনিই বদলায় এবং কালোপযোগী অন্য রকম আচারব্যবহার তাহার স্থানে দেখা দেয়।

কিন্তু ধর্ম্মের বা religionএর শাসন পৃথক রকমের। ধর্ম্ম সাধারণতঃ কোনও যুক্তি সিদ্ধান্তের সাপেক্ষ বস্তু নয়, ভক্তি ও বিশ্বাস ইহার আশ্রয়। ভগবৎপ্রেরিত বলিয়া ভক্তিতে ও বিশ্বাসে লোকে ইহা গ্রহণ করে, বুদ্ধি এই ভক্তি ও বিশ্বাসের অধীন হইয়া চলে। একেবারে বাঁধাধরা কোনও ধর্ম্মমত (creed) এবং উপাসনাপদ্ধতি (ritual) যে ধর্ম্মের প্রধান প্রকৃতি, সেই ধর্ম্ম মানবের বুদ্ধিকে এবং ভক্তিবিশ্বাসের অবলম্বনকে এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনিতে চায়। সমাজশাসনেও এই সব ধর্ম্ম লোকের বুদ্ধিকে এই ভাবে আপনার বিধির অনুগত করিয়া রাখিতে চায়। বিধি যে সুনীতিসঙ্গত ও মঙ্গলকর, যুক্তির দ্বারা বিচারে ইহা বুঝিয়া বা বিবেকে অনুভব করিয়া স্বেচ্ছায় ও আনন্দে লোকে তাহা মানুক, সে দিকে অনেক স্থলেই ধর্ম্মবিধির লক্ষ্য বড় থাকে না। ভগবৎপ্রেরিত ধর্ম্মের নির্দ্দেশ ইহা, মানিতেই হইবে, যে মানিবে না সে পাপেরভাগী হইবে আর উপযুক্ত শাস্তিভোগ করিবে, এই ভাবে ধর্ম্মের গুরু যাঁহারা, তাঁহারা শিষ্যসমাজের উপরে সাধারণতঃ ধর্ম্মের শাসনকে চাপাইয়া রাখিতে চান। আর যেখানে যেমন হউক, ইয়োরোপের পূর্ব্বতন Social Authorityর মধ্যে চার্চ্চ বা ধর্ম্মশাসনরূপ অঙ্গের ক্রিয়া এই ভাবেই পরিচালিত হইত। Individual libertyর উপরে, মানুষের ব্যক্তিগত বুদ্ধির অধিকার ও চিত্তবৃত্তির স্ফূর্ত্তির উপরে সর্ব্বোপেক্ষা কঠোর চাপ আসিয়া পড়ে এই ধর্ম্মশাসন বা চার্চ্চের প্রভুত্ব হইতে।

সুতরাং ইহা স্বাভাবিক যে ইয়োরোপীয় Rationalism প্রধান ভাবে ইহারই বিরোধী হইবে। জীবনের সকল চিন্তায় ও সকল কর্ম্মে, বিশেষ ভাবে ধর্ম্ম বিশ্বাসে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে, প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত কোনও রূপ authority—ব্যক্তি বিশেষের, সম্প্রদায় বিশেষের, দেশাচারের বা শাস্ত্রের কোনও প্রমাণের কোনও প্রভুত্ব—না মানিয়া কেবল reason বা নিরপেক্ষ বুদ্ধির নির্দ্দেশমাত্র মানিয়া চলাই মানবের পক্ষে rational পথে চলা, Rationalismএর ব্যাখ্যাই এইরূপ করা হয়। *

যাহা হউক, এই নীতি মানিলে এক কথায়ই আমাদের স্বীকার করিয়া নিতে হয়, যে ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক মানব সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন, বাহিরের কোনও শক্তির কোনও অধিকার নাই, তাহার এই স্বাধীনতার পথে কোনও বাধা দেয়, যদি না স্বেচ্ছায় এই অধিকার সে স্বীকার করে। এই স্বাধীনতার তাৎপর্য্য এই তিনটি কথায় সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়—freedom of thought, freedom of conscience আর freedom of action—অর্থাৎ প্রত্যেক মানবের প্রত্যেক বিষয়ে স্বীয়বুদ্ধি অনুসারে চিন্তা ও বিচার করিবার অবাধ অধিকার, ভাল কি মন্দ নিজে বুঝিয়া চলিবার অবাধ অধিকার, আর নিজের স্বার্থরক্ষা ও উন্নতির জন্য ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম করিবার অবাধ অধিকার। এই স্বাধীনতা অবশ্য প্রত্যেক ব্যষ্টিরই থাকিবে, কারণ কেহ অপর কাহারও আদেশে চলিবে ইহাই এই নীতির বিরুদ্ধ। সকলেই সমান স্বাধীন, সুতরাং অধিকারে কোনও বৈষম্য থাকিতে পারে না। স্বাধীনতার সঙ্গে সাম্যের নীতি আপনাহইতেই আসিয়া পড়ে। প্রথমটিকে স্বীকার করিলে দ্বিতীয়টিকেও স্বীকার করিতে হয়।

* ধর্ম্ম সম্বন্ধে কেবল free reason বা নিরপেক্ষ বুদ্ধির নির্দ্দেশের উপরে নির্ভর করিলে মানুষ প্রায় নাস্তিকই হইয়া উঠে। ইয়োরোপেও freethinker কথাটা 'নাস্তিক' অর্থেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশেও একটা প্রচলিত প্রবাদ আছে—"ভক্তিতে পাইবে মুক্তি তর্কে বহু দূর।"

স্বতন্ত্র ও সমান অধিকারভোগী বহু মানব একত্র হইয়া বাস করিবে। কিসের বন্ধন তবে এই সংহতিকে রক্ষা করিবে? সহজ উত্তর হইল, মৈত্রীর বা ভ্রাতৃত্বের। বর্ত্তমানে এই মৈত্রীর বা ভ্রাতৃত্বের অভাব দেখা যায়, বৈষম্য হেতু। বড় যে, সে ছোটকে অবজ্ঞা করে, পীড়ন করে; ছোট যে সে বড়কে ভয় করে, দ্বেষ করে। এঅবস্থায় মৈত্রীর বা ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ সম্ভব হয় না। কিন্তু সকল বৈষম্য ও অন্যান্য সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সকলে সমান হইয়া দাঁড়াইলে এই ভ্রাতৃত্বের বোধ আপনিই আসিবে, এবং তাহাই পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধের নিয়ামক হইবে।

স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী—liberty, equality and fraternity—ফরাসী বিপ্লবের motto বা নীতিসূত্রই হয় এই তিনটি কথা। রুষো প্রমুখ মনীষীগণ এই নীতির প্রচারক ছিলেন। তাঁহারা বুঝাইতে চেষ্টা করেন, এই নীতিই মানবজীবনের স্বাভাবিক নীতি। বিকৃত, দুষ্ট-ব্যাধিগ্রস্ত পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিলে, এই নীতি অনুসারে স্বাভাবিক যে সমাজ হইবে, তার মধ্যে সকল মানবের পরম সুখশান্তি লাভ হইবে। মানব সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে, ইহাই মানব প্রকৃতির পক্ষে স্বাভাবিক, এবং সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে হইলে প্রত্যেকে একেবারে যার যেমন ইচ্ছা চলিতে পারে না। স্বাধীনভাবে একমাত্র নিজের বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি অনুসারে চলিবার অবাধ অধিকার যদি সকলের থাকে, নিয়ত সংঘর্ষ ইহবে। দুর্ব্বল প্রবলের হাতে সর্ব্বদা লাঞ্ছিত ও পাড়িত হইবে। কেবল মৈত্রীর ও ভ্রাতৃত্বের প্রেরণায় ইহার প্রতিকার হইতে পারে না। সুতরাং সামাজিক শাসন যে অপরিহার্য্য, ইহাও এই পণ্ডিতগণ উপলব্ধি করেন। কিন্তু কোন্ অধিকারে কে এই শাসন করিবে? অথচ এই শাসন নহিলেও নয়। একটা কৈফিয়ৎ চাই। এই কৈফিয়ৎ হইল, রুষোর Social Contract Theory বা সামাজিক চুক্তিবাদ। এই মতবাদের মোট কথা এই যে, এক দেশবাসী সকল মানব প্রথমে মিলিয়া পরস্পরের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে

স্বেচ্ছায় একটি contract বা চুক্তিতে তাহাদের একটা সামাজিক সমবায় বাঁধিয়া নিয়াছে,—স্বেচ্ছায় নিজেদের স্বাধীনতার অধিকার কতক কতক ছাড়িয়া সেই সেই বিষয়ে কর্ত্তৃত্বের ভার এই সমবায়ের কর্ত্তা স্বরূপ গবর্মেণ্টের হাতে দিয়াছে। ইহার বলেই এই গবর্মেণ্ট বা সমবায়শক্তি প্রত্যেক ব্যক্তিকে শাসন করিতে পারে,—আর পারে মাত্র ততটুকু, যতটুকু ভার এই স্বেচ্ছাকৃত চুক্তিতে তার হাতে দেওয়া হইয়াছে।

এই সামাজিক চুক্তিবাদটা এতই অস্বাভাবিক এবং পদে পদে এতই logical fallacy বা যুক্তির ভুল ইহাতে আসিয়া পড়ে, যে পরবর্ত্তী rationalist মতের পণ্ডিতগণ ইহা একেবারেই অশ্রদ্ধেয় ও অগ্রাহ্য বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছেন। ইহার আলোচনার মধ্যে আমাদেরও যাইবার আবশ্যকতা নাই।

Social Contract theory বর্জ্জন করিলেও স্বাধীনতার ও সাম্যের নীতি ইঁহারা মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ-নীতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এই নীতির অনুসারে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় সমবায় যেরূপ হইতে পারে, তার authorityর বা প্রভুত্বের ন্যায্য সীমা কি, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সকলেই যখন সমান, তখন এই সমবায়ের শক্তি নিরূপিত হইবে, সকলের ইচ্ছায়।—সুতরাং সম্পূর্ণ গণ-তান্ত্রিক বা democratic state ভিন্ন আর কোনও রকম আকারেই ইহার গঠন হইতে পারে না।

সকলেরই সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছামত চলিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। ইহাতে কোনও বাধা দিবার কোনও অধিকার কাহারও নাই, যদি না একজনের এই স্বাধীনতার অধিকার পরিচালনা অন্যের সমান স্বাধীনতার অধিকারে কোনও বাধা উপস্থিত করে। সুতরাং বিভিন্ন ব্যষ্টির সম্বন্ধে এই রাষ্ট্রীয়-শক্তির শাসনাধিকার মাত্র ততটুকুই হইতে পারে, যাহাতে কাহারও কোনও গর্হিত আচরণে অন্য কাহারও সমান স্বাধীনতা ব্যহত না হয়।—তাহা ছাড়া, এই রাষ্ট্রের শক্তিরক্ষার জন্য এবং সকলের সমান স্বার্থ যে বিষয়ে আছে তাহা

যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তারজন্য, ব্যষ্টির নিতান্ত যাহা কর্ত্তব্য তাহা পালনেও এই শক্তি তাকে বাধ্য করিতে পারে,—অর্থাৎ প্রত্যেক মানবের civic ও political duties ও responsibilities বলিলে যাহা বুঝায়, তাহারও নিয়ন্তৃত্বে সমষ্টি-শক্তির অধিকার থাকিবে। জীবনের অন্যান্য সকল কর্ম্মক্ষেত্রে, প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন।—জ্ঞানচর্চ্চা, ব্যবসায়বাণিজ্য, ধর্ম্মনীতি, বিষয়সম্ভোগ, অন্যের সঙ্গে কোনওরূপ স্বার্থের বা প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন—এ সব বিষয়ে স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি মাত্রই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তার ইচ্ছামত চলিবে। ষ্টেট্ বা অন্য কোনওরূপ authorityর কোনও রকম প্রভুত্ব জীবনের এই সব ক্ষেত্রে স্বাধীন মানবের উপরে থাকিবে না, ন্যায়তঃ থাকিতে পারে না।

ব্যষ্টির ও সমাজের এই যে rationalistic আদর্শ, ইহাতে ব্যষ্টির সম্পূর্ণ প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে, সমষ্টি কেবল বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য তাহাদের গড়া একটা ব্যবস্থা। স্বাভাবিক ধর্ম্মে গড়িয়া ওঠা, স্বাভাবিক পরিণতির নিয়মের অধীন living organism রূপে, সমষ্টিশরীররূপে, সমাজকে এই মতের অনুবর্ত্তী পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন নাই, স্বীকার করিতেও পারেন না। সমাজের আদর্শই ইহাতে একেবারে অন্যরূপ হইল। সমষ্টি অপেক্ষা ব্যষ্টি বড় হইল।

নূতন এই স্বাধীনতা সাম্য ও মৈত্রীর নীতি ধরিয়া আর একটি Social Theory বা সামাজিক মতও ইয়োরোপে আবির্ভূত হইয়াছে। Anarchism নামে ইহা পরিচিত। অধুনা আমাদের দেশে anarchism কথাটা যেভাবে ব্যবহৃত হয়, এ anarchismএর অর্থ তাহা নহে। ইহার মোট কথা হইতেছে এই, যে স্বভাবতঃই স্বাধীন ও সমান সব মানব একমাত্র মৈত্রীর সম্বন্ধে সমাজ-বদ্ধ বাস করিবে। কোনও গবর্মেণ্টের কোনও শাসন ইহার মধ্যে থাকিবে না। শাসন থাকিলেই মানবের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবে, তার শক্তির সহজ স্ফূর্ত্তি

বাধা পাইবে। গবর্মেণ্ট থাকিলেই, যে প্রকৃতিরই তাহা হউক, কোনও কোনও ব্যক্তির হাতে শাসন ভার পড়িবে, এই ক্ষমতার অপব্যবহার হইবে, শাসিত জনসাধারণ পীড়িত হইবে। বস্তুতঃ বর্ত্তমান ডিমক্রাটিক গবর্মেণ্টের শাসন-প্রণালী হইতেই বহু দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, বহু প্রমাণে ও যুক্তিতে এই মতবাদী পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্ব্বত্র গৃহীত এরূপ গবর্মেণ্টও লোকপীড়নের পাপ ও তার সম্ভাবনা হইতে মুক্ত নয়। সুতরাং গবর্মেণ্ট মাত্রই বর্জ্জনীয়। গবর্মেণ্টকে বর্জ্জন করিয়া স্বাভাবিক মৈত্রীর সম্বন্ধে থাকিলেই লোকের সকল দুঃখ দূর হইবে, সকল সামাজিক সমস্যার সুসিদ্ধান্ত হইবে। কোনওরূপ গবর্মেণ্ট, রাজশাসন বা archy থাকিবে না, তাই এই মতের নাম হইয়াছে Anarchism। মহামতি টলষ্টয় এই মতের একজন প্রধান প্রবর্ত্তক। তাঁহার মতে rational life, যুক্তিযুক্ত বা ন্যায়সঙ্গত জীবনই এই anarchyর অবস্থা,—প্রত্যেক মানবের শক্তির অবাধ ক্রিয়ায়, চিত্তবৃত্তির অবাধ স্ফূর্ত্তিতে, মানবের পরম সুখ-শান্তি ও চরম উন্নতি সম্ভবই হইতে পারে মাত্র এইরূপ অবস্থায়।—কিন্তু মানব-স্বভাব এখনও এরূপ স্তরে উঠে নাই, যাহাতে শাসন ব্যতীত কেবল মৈত্রীর প্রভাবে সমাজ সুশৃঙ্খল শান্তিতে থাকিতে পারে। Social Authority যেরূপ archyতেই আপনাকে প্রকাশ করুক, অমঙ্গল যাহা তাহাতে হইবে, তার উপায় কিছু নাই। অন্ততঃ anarchyতে যত অমঙ্গলের সম্ভাবনা, কোনওরূপ archyতে ততদূর হইতে পারে না। সুতরাং যে অবস্থায় অমঙ্গল কম, তাহাই আমাদের বাছিয়া নিতে হইবে। Evil যদি মানব-জীবনে অনিবার্য্যই হয়, lesser evil অবশ্য গ্রাহ্য হইবে।

Anarchismএর নানা রকম আদর্শ আছে, পরে এক স্থলে Socialism প্রভৃতি নূতন যে সব Social Theory ইয়োরোপে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিব।

[টিপ্পনী :—২০৭ পৃষ্ঠায় ইয়োরোপের 'বুর্জোয়াজি' সম্প্রদায়কে প্রাচীন ভারতের বৈশ্যসম্প্রদায়ের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। এদেশের বৈশ্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের নিয়ে তৃতীয় বর্ণ এবং ইয়োরোপের 'বুর্জোয়াজি'ও যাজক ও অভিজাত ভূস্বামী সম্প্রদায়ের নিয়ে তৃতীয় এষ্টেট্ (estate)। বৃত্তি উভয়েরই প্রধানতঃ ব্যবসায়বাণিজ্যাদি ধনাগমমূলক কর্ম্ম। কিন্তু এই সমতার মধ্যেও বৈশ্য হইতে 'বুর্জোয়াজির' বড় একটা পার্থক্য আছে, তাহারই ইঙ্গিত 'নাগরিক' এই বিশেষণে দেওয়া হইয়াছে। 'বুর্জোয়াজি' কথাটার মৌলিক অর্থ citizen বা নাগরিক। 'বুর্গো' (burgh বা borough) বা নগর হইতে এই নামটির ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। আর বৈশ্য নাম আসিয়াছে 'বিশ্' অর্থাৎ 'মানব' এই মূল হইতে। সব দেশেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সংখ্যায় অল্প। অধিকাংশ লোকই কৃষিশিল্পবাণিজ্যাদি বৃত্তি-অবলম্বনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। Bulk of the people, people in general (জনসাধারণ) বলিতে ইঁহাদেরই বুঝায়,এবং 'বিশ্' শব্দটি এইরূপ অর্থেই ব্যবহৃত হইত। সুতরাং কৃষিশিল্পবাণিজ্যাদি কর্ম্মে নিযুক্ত দেশের গৃহস্থ-বর্গকে বুঝাইতে 'বিশ্' শব্দ হইতে 'বৈশ্য' এই নাম হইয়াছে। গ্রামে কি নগরে যেখানেই যিনি বাস করুন, এইরূপ সব বৃত্তির অনুবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত উন্নতশীল স্বাধীন গৃহস্থগণ সাধারণতঃ বৈশ্যবর্ণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইঁহাদের নিয়ে শূদ্রের বৃত্তি ও স্থান যে কি ছিল, তার সম্বন্ধে বিশেষ কোনও মন্তব্য এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

ইয়োরোপে এই সময়ে পল্লীজীবনে ও নাগরিক জীবনে (country life ও city lifeএ) যেরূপ একটা পার্থক্য ছিল, আমাদের দেশে সেরূপ কখনও দেখা যায় নাই। কৃষিই ছিল পল্লীজীবনের একমাত্র অবলম্বন। জমিদার ও কৃষক প্রজা লইয়াই প্রধানতঃ পল্লীসমাজ হইত। বণিক ও শিল্প ব্যবসায়ীরা সাধারণতঃ নগরে বাস করিতেন। এই সব ব্যবসায়ীদের ঘনসন্নিবিষ্ট বসতিগুলিই এক একটি নগরে পরিণত হয়। আর পল্লীবাসী গৃহস্থদের বসতি ছিল, কৃষিক্ষেত্রসমূহের ব্যবধানের অবসরে কিছু দূরে দূরে। নাগরিক শাসনও নাগরিকদের municipality বা corporation নামক সমিতির হাতে ছিল। এক অঞ্চলে যত নগর ছিল, প্রত্যেকটি এইরূপ পৃথক এক একটা civic unit বা স্বায়ত্ত রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র হইয়াছিল,—চতুপার্শ্বস্থ পল্লী অঞ্চলের সঙ্গে কোনওরূপ রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ তাহাদের ছিল না।

প্রথমে প্রত্যেক নগরের নাগরিকবর্গ পৃথক্ এক একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রীয় সমষ্টির মত ছিল। ক্রমে এক এক দেশের সকল নগরের নাগরিকদের মধ্যে সমান বৃত্তিতে

এবং সমান রাষ্ট্রীয় অবস্থায় ও স্বার্থে একটা সমভাবের ও সমযোগিতার সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে, এবং দেশের সব নাগরিক সমান একটা Bourgeoisie বা citizen সম্প্রদায়ে পরিণত হয়।

পল্লী অঞ্চলে ক্ষুদ্র এমন অনেক ভূস্বামী ছিলেন, পদে ও শক্তিতে যাঁহারা উচ্চতর ভূস্বামীদের অপেক্ষা অনেক হীনতর এবং ইঁহাদের সঙ্গে সমান সামাজিকতার সম্বন্ধেও মিলিতে পারিতেন না। অনেকেই আবার এ দেশের যোতদার গৃহস্থদের মত কৃষিব্যবসায়ই জীবিকার উপায় স্বরূপ অবলম্বন করেন। কোনও কোনও দেশে নাগরিক বণিক ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সম্বন্ধে এই সব ক্ষুদ্র ভূস্বামীদের অনেকটা সমতা ঘটে। গ্রাম্য ও নাগরিক মধ্যবিত্ত এই দুই সম্প্রদায়কে একত্র করিয়া ধরিলে একরূপ আমাদের বৈশ্যসম্প্রদায়ের মতই হয়। কিন্তু নাগরিক স্বায়ত্ত শাসনের অধিকারী হওয়ায় যেরূপ বিশিষ্ট একটা রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি ইয়োরোপীয় Bourgeoisie বা citizen সম্প্রদায়ের হয়, এদেশের বৈশ্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে সেরূপ একটা প্রকৃতি হইতে পারে নাই। এদেশের বৈশ্য মোট হিন্দুসমাজের মধ্যে বিশেষ একবিধ বৃত্তির ও সামাজিক রীতিনীতির অনুবর্ত্তী এক সম্প্রদায় ছিলেন। কিন্তু ইয়োরোপীয় Bourgeoisie বা citizenবর্গ প্রধানভাবে বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রীয় অধিকারভোগী এক সম্প্রদায় হইয়া উঠেন। কেবল ব্যবসায়ী ও বণিক নন, নগরের অন্যান্য অধিবাসীরাও—বৃত্তি যাঁহার যাহাই হউক্—সকলেই সমান অধিকারভোগী সমান citizen রূপে গণ্য হইতেন। নগর-গুলিতে কতকটা ডিমক্রাটিক ধরণের স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহায় সব অধিকারের মর্ম্ম ইহারা বুঝিতেন, অধিকারের উপরে দরদ বড় একটা জন্মে, এবং অধিকারের পরিচালনায় যোগ্যতাও ইঁহারা লাভ করেন। পরবর্ত্তী যুগে ইয়োরোপে যে জাতীয় (national) ডিমক্রাটিক শাসন প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার ভিত্তি এই সব নাগরিক শাসনে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই নাগরিক সম্প্রদায়ই এই শাসনের প্রধান ধারক ও পরিচালক হইয়া উঠেন। শাসনের প্রভুত্বও ক্রমে তাঁহাদেরই আয়ত্ত হইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়বাণিজ্যের বহুল প্রসারে ইঁহাদের শক্তিই ইয়োরোপে অধুনা সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠিয়াছে। ইঁহাদের নিম্নতর দরিদ্র শ্রমিক সম্প্রদায় তাই ইয়োরোপের বর্ত্তমান এই ডিমক্রাটিক শাসনকে Bourgeoisie শাসন বলেন, প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন বলিতে চান না।

যাহা হউক, ইঁহাদের এই citizen নাম হইতে ষ্টেটের প্রজার নামই এখন citizen হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে পূর্ব্বে নাগরিকগণ এক একটা

নাগরিক স্বায়ত্তশাসনে যে সব অধিকার ভোগ করিতেন, যে দায়িত্ব পালন করিতেন, ষ্টেটের সকল প্রজাই এখন তাহা করে। এই citizen সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও পরিণতি সম্বন্ধে ব্লণ্টস্‌লি সাহেবের Theory of State গ্রন্থ হইতে একটি অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি। কথাটা আরও একটু স্পষ্ট তাহাতে হইবে।

4. The following are the characteristic features of the mediæval citizen class.

(a) It does not, like the Clergy and the Nobility form a privileged order, but a national class. It is distinguished from the peasants by its relation to the town, by its culture., its freedom and its law.

(b) In spite of differences of origin and of occupation, the citizen body is felt to be a united and homogenous class. It is the guardian of civic freedom, and of the equality of all before the law. It lives by the same town laws, and has the independent ordering of its constitution. The citizens are sons of the town, and share in its common life. The political and social life of the town are closely connected.

(c) But further, the citizen class obtained a political position and significance which went beyond the precincts of a single town, and embraced the citizens of many towns in one corporate class. This new development found expression in the organisation of the mediaeval Estates, provincial and imperial. From the middle of the thirteenth century, the citizens of the English towns, at first separately from the knights, afterwards along with them, obtained the right of representation in the national parliament. In France, the representatives of the bourgeoisie formed the 'third estate' (tiers etat) summoned at first separately from time to time, but from the beginning of the fourteenth century as part of the Estates General.

In Germany, the 'benches of the towns' in the Imperial Diets after the elevation of Rudolf of Hapsburg in some measure represented the citizen class, and in the Provincial Diets the towns received a seat and vote, as a third estate, by the side of the nobility and clergy.

5. Finally, the new ideas which had taken form in the citizen class of the towns were extended to the wider field of the whole nation; the citizenship of the town gave birth to the modern citizenship of the State.

[The Theory of the State, Bluntschli, Book II, Chap. XIV, pp. 167-68.]

ন্যাসনালিজম্ ও ডিমক্রাসী

সমষ্টি বা সমাজ কোনও organism নয়, মানবজীবনের নৈসর্গিক ধর্ম্মে গড়িয়া উঠে নাই, ব্যষ্টিমানবের সুবিধার জন্য তাহাদের হাতে গড়া একটা artificial association বা কৃত্রিম সমবায় মাত্র, এই মত যাঁহারা পোষণ করেন, ব্যষ্টির অধিকার সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা বলেন, ঠিক সেই নীতি অনুসারে চলিলে, তাহার ফল ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে মানবজীবনের উপরে গিয়া কি দাঁড়ায় এবং এই কৃত্রিমসমবায়ের কর্ম্মশক্তির অবস্থাই বা কিরূপ হয়, সেই কথাগুলি এখন বুঝিতে চেষ্টা করিব। এই মতের নীতি অনুসারে ব্যষ্টি-*মানবের কথাই বড় কথা*, তার স্বাধীনতার ও অধিকারভোগের দাবীর উপরে আর কিছুর কোনও দাবী হইতে পারে না। সমষ্টিরূপ সমবায়ের মাত্র এই উদ্দেশ্য যে, এক ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতার ভোগ অপরের সমান স্বাধীনতার ভোগে বাধা উপস্থিত না করে,—আর সকলের সমান স্বার্থ যে সব ব্যাপারে, তাহা সকলের সমান চেষ্টায় রক্ষিত হইতে পারে। সুতরাং এই ধর্ম্ম সাধারণতঃ Individualism নামে পরিচিত। বাঙ্গলায় আমরা ইহাকে 'নিরপেক্ষ ব্যষ্টিপ্রাধান্য' বা 'ব্যষ্টিস্বাতন্ত্র্য' নামে অভিহিত করিতে পারি। কারণ, ঠিক এই মত এ দেশে দেখা দেয় নাই, ইহার কোনও বিশেষ নামও এ দেশে নাই।

ইয়োরোপে শতাব্দীর অধিককাল এই মত এমনই প্রাধান্য করিয়াছে যে, সমাজ একটা organism, organism রূপে তার একটা বিশিষ্ট ধর্ম্মও আছে,—সেই ধর্ম্মের প্রকৃতি কি, লক্ষ্য কি, এই সব কথার অধুনা বহু প্রচার সত্বেও এই Individualistic বা ব্যষ্টিস্বাতন্ত্র্য মতের প্রভাব ইয়োরোপীয় জীবনে এখনও বেশ দেখা যাইতেছে। Social Organism বা সমাজশরীরের ধর্ম্মসম্বন্ধে যাঁহারা এত সূক্ষ্ম আলোচনা করিতেছেন,

তাঁহারাও যে সকলে একেবারে ইহার প্রভাব এড়াইতে পারিয়াছেন, তাও মনে হয় না। তারপর আমাদের দেশেও ইহার প্রভাব যথেষ্ট আসিয়া পড়িয়াছে। এই মত এ দেশে যাঁহারা প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা আবার আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কি বলিতেছেন, তার আলোচনাও বড় করেন না। Individualistic নীতির আদর্শ ই তাঁহাদের চিত্তকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই মোহবশতঃ সমাজের সকল নীতির বন্ধন হইতে ব্যষ্টিমানবের সম্পূর্ণ মুক্তিই ইঁহারা কামনা করেন,—বলেন, তাহাতেই ভারতসন্তানের কল্যাণ হইবে। কারণ শাস্ত্র বা Scripture দ্বারা শাসিত যে ধর্ম্ম, faith বা বিশ্বাস যাহার আশ্রয়, free reason বা নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি নয়, সেইরূপ ধর্ম্মমূলক নীতির বন্ধন হইতে মুক্তিতেই নাকি মানবের শ্রেষ্ঠ কল্যাণ সাধিত হইবে।

বিখ্যাত ইংরেজ মনীষী জন ষ্টুয়ার্ট মিলের নাম সকলেই শুনিয়াছেন। Rationalistic মতের যুক্তির উপরে ব্যষ্টিভাবে মানবের অধিকারের কথা তিনি যেরূপভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার তুলনা বাস্তবিক আর মিলে না। এই তত্ত্বের সর্ব্বপ্রধান ইংরেজ ভাষ্যকার তাঁহাকে বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার 'Liberty' নামক গ্রন্থে বড় একজন জর্ম্মাণ rationalistic পণ্ডিত ব্যারণ উইল্‌হেল্‌ম ভন হামবোল্ডের নিম্নলিখিত উক্তিটি তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"The end of man, or that which is prescribed by the eternal or immutable dictates of reason, and not suggested by vague and transient desires, is the highest and most harmonious development of his power to a complete and consistent whole;" that, therefore, the object "towards which every human being must ceaselessly direct his efforts, and on which

especially those who design to influence their fellow-men must ever keep their eyes, is the individuality of power and development ;" that for this there are two requisites, "freedom and variety of situations ;" and that from the union of these arise "individual vigour and manifold diversity," which combine themselves in "originality,"

[On Liberty, Mill, Chap, III.]

অর্থাৎ—"মানব জীবনের লক্ষ্য তার সমস্ত শক্তির উচ্চতম এবং যথাসম্ভব পরস্পর-সমঞ্জস বিকাশ, যাহাতে সব সমানভাবে মিলিয়া একটা সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে। ইহা সাময়িক ও অস্পষ্ট বাসনার প্রেরণা নহে, reason বা বিবেক বুদ্ধির নিত্য ও ধ্রুববাণী। সুতরাং ব্যক্তিত্বের শক্তির ক্রমপরিণতি কিসে হইতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই প্রত্যেক মানবের—বিশেষভাবে যাঁহারা অন্যান্য মানবের জীবন বিশেষ কোনও দিকে পরিচালনা করিতে চান তাঁহাদের—সকল কর্ম্মচেষ্টা প্রয়োগ করিতে হইবে; আর ইহা নির্ভর করে স্বাধীনতার ও অবস্থার বৈচিত্রের উপরে। নানারকম অবস্থার মধ্যে প্রত্যেকে যদি নিজের স্বাধীন বুদ্ধি অনুসারে চলিতে পারে, তবেই ব্যক্তিত্বের প্রকৃত শক্তি ও তার বৈচিত্র বিকাশ পাইবে। এবং তাহা হইতেই orginality বা মৌলিকতা অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিতে যে কিরূপ ও কতখানি স্বকীয় শক্তি আছে, তাহা প্রকাশ পাইবে।"

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, মানব কি কেবল তবে আপনার উপরেই নির্ভর করিবে, পুরুষপরম্পরার সঞ্চিত জ্ঞান এবং এই জ্ঞানের দৃষ্টিতে যে সব নীতি অনুসৃত হইয়া আসিতেছে, তার দিকে একেবারেই চাহিবে না, তার অনুসরণ করিয়া একেবারে চলিবে না ?

মিল্ ইহার উত্তরে বলেন,—

"On the otherhand, it would be absurd to pretend

that people ought to live as if nothing whatever had been known in the world before they came into it; as if experience had as yet done nothing towards showing that one mode of existence, or of conduct, is preferable to another. Nobody denies that people should be so taught and trained in youth as to know and benefit by the ascertained results of human experience. But it is the privilege and proper condition of a human being, arrived at the maturity of faculties, to use and interpret experience in his own way. It is for him to find out what part of recorded experience is properly applicable to his own circumstances and character."

[On Liberty, Mill, Chap, III.]

অর্থাৎ—"কোনও একরূপ নীতি, অন্যরূপ নীতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিনা, অতীতের জ্ঞান যে এ সম্বন্ধে কিছুই একটা পথ নির্দ্দেশ করে নাই, একথা বলা ঠিক নয়। প্রথম জীবনে প্রত্যেক লোককে শিখাইতে হইবে, মানবের অতীত জ্ঞান কোন্ বিষয়ে কি বুঝিয়াছে এবং জীবনের কোন্ সম্বন্ধে কোন্ নীতি অনুসারে চলিলে ভাল হয় তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছে। কিন্তু মানব তার শক্তির পরিণতি লাভ করিলে, পুরুষপরম্পরাগত অতীতের জ্ঞানকে ও সেই জ্ঞাননির্দ্দিষ্ট নীতিসমূহকে নিজের নিরপেক্ষ বুদ্ধিতে বিচার করিয়া দেখিবে এবং নিজের জীবনের অবস্থায়, তার বিশেষ বিশেষ গুণ, রুচি ও শক্তির পক্ষে যার যতটুকু গ্রহণ করা সে ভাল মনে করে তাই করিবে।"

কেন? মিলের যুক্তি এ সম্বন্ধে এই,—

"The traditions and customs of other people are, to a certain extent, evidence of what their experience

has taught them, presumptive evidence, and as such have a claim to his deference ; but, in the first place, their experience may be too narrow ; or they may not have interpreted it rightly. Secondly, their interpretation of experience may be correct, but unsuitable to him. Customs are made for customary circumstances and customary characters ; and his circumstances or his character may be uncustomary. Thirdly, though the customs be both good as customs and suitable to him, yet to conform to custom, merely as custom, does not educate or develop in him any of the qualities which are the distinctive endowment of a human being. The human faculties of perception, judgment, discriminative feeling, mental activity and even moral prefererce, are exercised only in making a choice. He who does anything because it is the custom makes no choice. He gains no practice either in discerning or in desiring what is best for him."

[On Liberty, Mill, Chap, III.]

অর্থাৎ—"পুরুষপরম্পরাগত যে সব মত ও রীতিনীতি অন্য লোকে অনুবর্ত্তন করিয়াছে, কতক পরিমাণে তাঁহাদের অভিজ্ঞতায় ভাল বুঝিয়াছে বলিয়াই করিয়াছে। সেগুলি বর্ত্তমানে সকলের পক্ষেই শ্রদ্ধায় পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বস্তু সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও হইতে পারে, সে সব অতি সঙ্কীর্ণ এবং তাহারা হয়ত তার তাৎপর্য্য ভুলও বুঝিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, তাহারা ভুল না বুঝিতেও পারে, কিন্তু হয়ত তাহাদের পক্ষে সে সব উপযোগী ছিল, বর্ত্তমান কোনও ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী নয়। তৃতীয়তঃ, সেগুলি হয়ত ভাল এবং তার পক্ষেও

উপযোগী হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া কেবল পুরুষপরম্পরাগত ও প্রচলিত রীতি বলিয়াই তাহা যদি লোকে মানিয়া নেয় এবং তদনুসারে চলে, তবে মানবোচিত যে সব গুণ ও শক্তির, যে বুদ্ধির অধিকারী হইয়া সে জন্মিয়াছে, তার যথোচিত বিকাশ হয় না। প্রত্যেক নীতি নিজের বুদ্ধিতে বিচার করিয়া বাছিয়া নিবে, এই অধিকার থাকিলেই তবে মানবের ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব বিকাশ পাইতে পারে। প্রচলিত রীতি নীতি বলিয়াই তাহার অনুবর্ত্তন যে করে, সে বুঝিয়া বিচার করিয়া কিছুই নেয় না, এই শক্তির অনুশীলনও তাহার কিছু হয় না।"

ব্যষ্টিমানবকে নিরপেক্ষভাবে প্রধান বলিয়া ধরিয়া নিলে, তার অধিকারের ও উন্নতির পথের কথা যতদূর খোলসা বলা যাইতে পারে, তাহা উদ্ধৃত কয়েকটি উক্তিতেই বেশ বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আর কোনও প্রামাণিক বচন উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

কোনও সমষ্টি বা সমাজকে ইঁহারা organism ভাবে দেখেন নাই, তাহার একটা বিশিষ্ট জীবন, সেই জীবনের একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম থাকিতে পারে, এ কথাও ভাবেন নাই। তবে সমষ্টির একটা অস্তিত্ব ইঁহারা স্বীকার করেন, এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহা ইঁহাদের মতে আপনাদের সুবিধার জন্য একদেশবাসী বহুব্যক্তির একটা কৃত্রিম সমবায় বা artificial association মাত্র। প্রত্যেক ব্যষ্টির বহু স্বার্থ এই সমবায় হেতু রক্ষিত হইতেছে, সকলের সমান কতকগুলি মঙ্গলও এই সমবায়ের বলে সাধিত হইয়া থাকে। আবার একের স্বার্থসাধন-চেষ্টা অন্যের স্বার্থসাধনচেষ্টায় যে সব অন্যায় বাধা উপস্থিত করে, তাহারও নিবারণ ও প্রতিকার সমবায়ের বলেই হইতে পারে। সুতরাং এই সমবায়ের অস্তিত্ব এবং এই সব উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী শক্তি যাহাতে বজায় থাকে, তাহা নিতান্ত আবশ্যক। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা এজন্য কিছু খর্ব্ব করিয়া রাখিতে হইবে। এইখানে ব্যষ্টিতে ও সমবায়ের শক্তিতে সংঘর্ষ একটা বাধিতে পারে। সুতরাং উভয় পক্ষেরই

কর্ত্তৃত্বের একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা থাকা আবশ্যক। সেই সীমা কি হইবে? মিল বলেন,—

"To individuality should belong the part of life in which it is chiefly the individual that is interested, to Society the part which chiefly interests Society."

[On Liberty, Mill, Chap, IV.]

অর্থাৎ—"ব্যষ্টির স্বার্থ যেখানে প্রধান, সেখানে ব্যষ্টির অধিকার প্রধান থাকিবে। আর যেখানে সমাজের স্বার্থ প্রধান, সেখানে সমাজের অধিকার প্রধান থাকিবে।"

কথাটা শুনিতে বেশ ভাল এবং অতি যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু জীবনের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ব্যষ্টির স্বার্থই প্রধান, যাহার উপরে সমষ্টির কোনও অধিকার থাকিবে না, ইহা নির্দ্দেশ করাটা এমন সহজ নয়। তবে ইঁহারা বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির civic এবং political duties ও responsibilities বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাই মাত্র সমষ্টির বা সমাজের ক্ষেত্র এবং তাহাই মাত্র সমাজের কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিবে,—আর তার নিজের কাজকর্ম্ম ও চরিত্রধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যাহা কিছু ব্যাপার, তাহাতে ব্যষ্টির স্বার্থই প্রধান, তাহা ব্যষ্টির ক্ষেত্র, সে সব বিষয়ে প্রত্যেক ব্যষ্টি তাহার স্বাধীন বিচার বুদ্ধিতে চলিবে, তার নিজের স্বার্থের, প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির হিসাবে যাহা ভাল মনে করে, তাহাই করিবে,—তার উপরে সমাজের কোনও কর্ত্তৃত্ব চলিবে না।

কিন্তু সমষ্টির বা সমাজের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা যাহা, তাহাতেও ব্যষ্টিমানবের জীবনযাত্রার রীতিনীতির উপরে সমাজের মঙ্গলামঙ্গল কিছু নির্ভর করে কি না, একথা তাঁহারা তেমন করিয়া ভাবেন নাই। একেবারে যে করে না, তাহাও বলেন না। তবে তাঁহাদের কথা এই যে, এই সব ব্যাপারে সমাজের কর্ত্তৃত্বে ব্যষ্টির অনিষ্ট অনেক বেশী হইবে। বিশেষতঃ ব্যষ্টির স্বাধীনতারূপ যে সনাতন অধিকার, তার উপরে সমাজের পক্ষ হইতে অন্যায় বাধা

আসিয়া পড়িবে, ব্যষ্টির ব্যক্তিত্বের মহিমা ক্ষুণ্ণ হইবে। ব্যষ্টি-মানব এসব বিষয়ে অসঙ্গত আচরণ কিছু করিলে ক্ষতি যাহা হইবে তাহা নিজের,—সমাজের অসুবিধা যেটুকু হইবে তাহা সামান্য, সমাজ তাহা সহিয়া নিতে পারে। কিন্তু সমাজের হাতে ইহার কর্তৃত্ব থাকিলে ব্যষ্টির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে যে ক্ষতি হইবে, তাহা অনেক বড়।

মিল তাই বলেন,—

"But with regard to the merely contingent or as it may be called, constructive injury which a person causes to society, by conduct which neither violates any specific duty to the publie, nor occasions perceptible hurt to any assignable individual except himself, the inconvenience is one which society can afford to bear, for the sake of the greater good of human freedom."

[On Liberty, Mill, Chap. IV.]

কিন্তু তাই কি? ব্যষ্টির এরূপ কোনও স্বৈরাচার কেবল কি তাহারই অনিষ্ট করে, আর সে অনিষ্ট কি কেবল তাহার নিজের জীবনের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে? তার প্রভাব কি অন্যান্য সকলের জীবনের উপরে গিয়া পড়ে না? কেবল একটু অসুবিধা ছাড়া বড় কোনও অহিত সমাজের হয় না? এরূপ স্বৈরাচারকে উপেক্ষা করিলে ব্যষ্টিভাবেও কি বহু মানবের বহু অমঙ্গলের হেতু তাহা হয় না?

কথাগুলি এত সহজে উড়াইয়া দিবার মত কথা নয়।

পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, Rationalistic Individualism-এর দিক হইতে মানবের অধিকার সম্বন্ধে যে সব কথা বলা হয়, তাহা সত্য নয়, নৈসর্গিক ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী নয়। রাষ্ট্র-শাসন, বৃত্তি এবং ধর্ম্মনীতি—জীবনের বড় এই তিনটি ক্ষেত্রে নৈসর্গিক নিয়মের বিরোধী এই স্বাধীনতার ও সাম্যনীতির আদর্শ

ইয়োরোপে যতদূর অনুসৃত হইয়াছে, ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে মানব-জীবনের উপরে তাহার ফল কিরূপ ঘটিয়াছে, পর পর ক্রমে এখন এই কথাগুলি আলোচনা করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিব। তাহাতে এই সত্য আরও স্পষ্ট আমাদের নিকট হইবে।

এই প্রবন্ধে রাষ্ট্রশাসনে সকলের সমান অধিকারের নীতি গৃহীত হওয়ায় ইয়োরোপের শাসনপদ্ধতি কি আকার ধারণ করিয়াছে, কি কি ভাবে সে শাসনপদ্ধতি চলিতেছে এবং তাহার ভবিষ্যৎ কিরূপ দেখা যাইতেছে, তাহার আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সকলেই সমান স্বাধীন, সুতরাং সকলের সমান ইচ্ছায় রাষ্ট্রশাসন-পদ্ধতি বা গবমেণ্ট গড়া হইবে এবং তাহার শাসনের অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইবে, ইহাই Rationalistic মত। এই শাসন-প্রণালী কিরূপ হইতে পারে? ইহার এক উত্তর Democracy বা গণতন্ত্র। ফরাসী বিপ্লবের প্রারম্ভে ফরাসীদেশে যে ধ্বনি উঠিয়াছিল—Vox populi vox Dei অর্থাৎ জনসাধারণের বাণীই ভগবদ্‌বাণী, ইহাতেই ডিমক্রাসীর বড় একটি দাবী ব্যক্ত হইয়াছে। এই দাবী আর একটি কথায়ও প্রকাশিত হইয়াছে—Sovereignty of the people.

কিন্তু সকলের একই রকম ইচ্ছা সকল বিষয়ে হয় না। এ অবস্থায় উপায় কি? সকলেই সমান এক এক ভোট দিবে, সব চেয়ে বেশী ভোটে যে মত সমর্থিত হয়, সেই মত সকলকেই গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং এই Sovereignty of the peopleএর অর্থ Soverignty of the majority। ইহা ছাড়া বাস্তবিক আর কোনও সমীচান পথও দেখা যায় না। Democratic বা গণতন্ত্র শাসনে মাইন-রিটীকে (minorityকে) মেজরিটীর (majorityর) শাসন মানিয়া চলিতেই হইবে। কেবল civic এবং political duties ও respon-sibilities এর মধ্যে যদি শাসনের সীমা থাকে, তবু এক রকম চলিয়া যায়। কিন্তু ধর্ম্মনীতির, পারিবারিক জীবনের ও বৃত্তির ক্ষেত্রে যদি

এই শাসন প্রসারিত হয়, তবে কেবল ভোটের জোরে মাইনরিটীর উপরে এই মেজরিটীর পীড়ন যে কিরূপ হইতে পারে তাহা না বলিলেও চলে।

মানুষ সব সমান ও স্বাধীন। এ অবস্থায় এমন হইতে পারে না যে কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের কর্তৃত্ব বিনা ওজরে সকলে মানিয়া নিবে। এ অধিকারও কোনও ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের নাই, যদি না দেশের সব লোক স্বেচ্ছায় তাহাদের হাতে আপনাদের শাসন ভার দেয়।

কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল,—এরূপ নিয়োগ একটা hypothesis অর্থাৎ অনুমান কি কল্পনার কথা ছাড়া বাস্তব ক্ষেত্রে ঘটিয়া উঠে না। যেখানে এরূপ দৃষ্টান্ত দুই একটি দেখান হয়, সে একরূপ মনকে চোকঠার দেওয়া। ব্যক্তি বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের অধিকৃত ও পরিচালিত ক্ষমতার একটা ওকালতী সমর্থনচেষ্টা মাত্র। লোকমত গ্রহণের বাস্তব একটা চেষ্টা যেখানে হইয়াছে, তাকেও শক্তিশালী ব্যক্তিদের অভিনীত একটা প্রহসন বই আর কিছু বলা যায় না। রোমীয় Republicএর শেষ যুগে কন্সল, প্রিটর, প্রো-কন্সাল প্রভৃতি শাসকগণ এই অভিনয় করিতেন। আরব-সাম্রাজ্যে সুন্নী খলিফারাও বাহুবলে সিংহাসন অধিকার করিয়া, এইরূপ একটা লোকমতের ফাঁকা অনুমোদন নিতেন। রোমের সম্রাটরাও এইরূপ লোকমতের সমর্থনের দাবীতে সাম্রাজ্যের উপরে একাধিপত্য করিতেন।

সুতরাং Sovereignty of the people অর্থাৎ জনসমাজের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব তাহাদের নিজেদেরই অধিকারে, এই মতের উপরে প্রতিষ্ঠিত democracyই অবশ্য শ্রেষ্ঠ শাসনতন্ত্র বলিয়া এস্থলে মনে হইবে; আর এই democratic শাসনের পরিচালনা demos বা জনসাধারণ নিজেরাই করিবে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এলাহাবাদ হইতে 'ডিমক্রাট' (Democrat) নামে একখানি পত্রিকা বাহির হইয়াছিল। সেই পত্রিকার মুখবন্ধে ডিমক্রাসীর লক্ষ্য সম্বন্ধে এই কথাগুলি ঘোষিত হয়।

"We shall try to be true to our name. We stand for democratic ideal in very walk and relation of life. This ideal recognises no privilege arising from physical accidents as they are called either of birth or sex, or economic or political accidents of wealth or rank. It demands that all human beings shall be given exactly the same social opportunities for higher possible realisation of their inherent humanity and no man or woman shall be restrained in the freest exercise and enjoyment of their powers both of mind and body as long as they do not, in pursuit of their own freedom, infringe the equal freedom of others to freely pursue their own personal or social end. Democratic ideal demands in common concerns of social or political life, collective ideals wishes and interests of all shall prevail over individual ideas and wishes and particularistic or sectional interests, and the voice of all shall direct the common business of State or Church."

'ডিমক্রাট' এই মুখবন্ধে যে কথা বলিতেছেন, ডিমক্রাসী সম্বন্ধে তার অপেক্ষা বেশী কোনও কথা আর বলিবার নাই। আধুনিক পাশ্চাত্য সুধীবর্গ ডিমক্রাসীর দাবী যতদূর করেন, এ দাবী তাহাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। তাঁহারা ধর্ম্মনীতির অর্থাৎ Church ও Ethics-এর ক্ষেত্রে সংহতির কোনও দাবী করেন না, ব্যষ্টি মানবকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাখিতে চান। কিন্তু আমাদের এই ডিমক্রাট সে ক্ষেত্রেও ডিমক্রাটিক সংহতিশক্তির শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে চান। তবে, একটু সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হইবে, কেবল রাষ্ট্র বা

civic ও political ক্ষেত্রে নয়,—বৃত্তিব্যবসায়ের ক্ষেত্রে; ধর্ম্মনীতির ক্ষেত্রে, সর্ব্বত্রই মানবে মানবে সম্বন্ধ বড় ঘনিষ্ঠ, সর্ব্বত্রই সংহতির একটা আবশ্যকতা আছে। সংহতিশক্তি ন্যায়তঃ ও স্বভাবতঃ যদি ডিমক্রাটিকই হয়, তবে ডিমক্রাসীর প্রভুত্ব সকল ক্ষেত্রে সকল সম্বন্ধেই মানিতে হইবে। মানবজীবন একটা organic whole; বিভিন্ন ভাবের, শক্তির ও কর্ম্মের এমন একটা নিবিড় সংঘাতের সম্বন্ধ তার মধ্যে আছে, যে একটিকে অপর সকল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথক্ একদিকে চালান যায় না। যে দিকে যাইবে, সব পরস্পরসাপেক্ষ হইয়া একযোগে এক ভাবে যাইবে। যাহা হউক, ডিমক্রাটের এই উক্তি সম্বন্ধে বিশেষভাবে একটা কথা বলিবার আছে। সাধারণভাবে এই কথার আলোচনা এইরূপ অন্যান্য যে সব কথার উল্লেখ করিয়াছি তার সঙ্গেই হইবে। কিন্তু বিশেষ যে কথাটি বলিবার আছে, তাহা এই খানেই বিশেষভাবে বলিলে ভাল হয়:

কথাটা হইতেছে এই উক্তির বিশেষ প্রেরণা যাহা তার সম্বন্ধে। ভারতবাসী ইংরেজের রাষ্ট্রশাসনের অধীন। ইংরেজসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া ভারতের রাষ্ট্রশাসন যাহাতে ভারতবাসীর স্বায়ত্ত হয়, তার জন্য একটা আন্দোলন চলিতেছে, এবং তার পক্ষে যত রকম যুক্তি থাকিতে পারে, সবই দেশহিতৈষণার প্রেরণায় প্রবুদ্ধ জননায়কগণ অবলম্বন করিতেছেন। তবে একটি কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না। তাহা এই, যে ইংরেজ জাতিরূপ বিশেষ এক মানবসমষ্টি ভারতীয় মানবসমষ্টিকে শাসন করিতেছেন। স্বায়ত্ত শাসনের দাবী এখানে ন্যায়তঃ আসিবে ভারতীয় জনসমষ্টির পক্ষ হইতে, ইংরেজ জনসমষ্টির নিকটে। তার বিচার হইবে, ইংরেজ জনসমষ্টির এরূপ কোনও অধিকার আছে কি না, তাহা লইয়া। কিন্তু ভারতীয় জনসমষ্টির আভ্যন্তরিক শাসন কিরূপ প্রকৃতির হইবে, সমাজ কি আকার ধারণ করিলে ভাল হয়, ধর্ম্মপদ্ধতিই বা কি ভারতবাসীর উপযোগী, এ সব একেবারে পৃথক্ কথা। ইংরেজের সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রীয় শাসনের অধিকার লইয়া যে

বোঝাপড়া হইতেছে, তার মধ্যে এ সব কথা আসিতে পারে না। এই ঘোষণা হইতে যাহা বুঝা যায়, তাহাতে মনে হয়, ইহার লক্ষ্য ভারতীয় সমাজকে ও ধর্ম্মকে একেবারে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়া। তাই যদি ডিমক্রাটের উদ্দেশ্য হয়, তবে সে আলাদা কথা। কিন্তু ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় অবস্থার উন্নতি সাধন যদি ডিমক্রাটের অভিপ্রায় হয়, তবে তার মধ্যে ঠিক এই কথা আসিতে পারে না। এক একবার মনে হয়, ডিমক্রাট যদি এই কথাটা ভাবিয়া দেখিতেন, তবে বুঝি এই ঘোষণা তাঁহার মুখে বাহির হইত না।

প্রাচীন গ্রীস অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এক একটি নগরই এক একটি ষ্টেট্ ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অনেক এইরূপ ষ্টেটে সকল প্রজা একত্র হইয়া শাসকসমিতি নির্ব্বাচন করিত। ইহাই হইল খাঁটি ডিমক্রাসী, অর্থাৎ প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্র শাসন।

আধুনিক ইয়োরোপে যখন সকল শ্রেণীর প্রজাবর্গের সমান অধিকারের নীতি গৃহীত হয়, তার আগে সমাজে একটা শ্রেণী বিভাগ ছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজাদের প্রতিনিধি লইয়া বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত একটা প্রজাসমিতি হইত,—তাহাদের অভিমত জানিয়া রাজারা রাজ্য শাসন করিতেন। রাজা এই সব সমিতির মতানুসারে কতদূর চলিবেন, তাহার একটা ঠিক মাপ সকল দেশে ছিল না। ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীতেই প্রজাসমিতির মতের প্রাধান্য স্থাপিত হয়,—অন্যান্য অনেক দেশে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্তও রাজার ক্ষমতাই প্রধান ছিল। যাহা হউক, ডিমক্রাসী বা গণতন্ত্রবাদের আদর্শই যখন শ্রেষ্ঠ বলিয়া গৃহীত হইল, তখন এই প্রতিনিধি নিয়োগাত্মক প্রজাতন্ত্র শাসন অর্থাৎ Representative democracy সব চেয়ে সুবিধার পদ্ধতি বলিয়া সকলে মনে করিলেন,—কারণ একেবারে সাক্ষাৎ গণতন্ত্রশাসন বা direct democracy, অর্থাৎ সকল প্রজা একত্র হইয়া যেখানে শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে মত দিতে পারে, এমন ব্যবস্থা

বড় বড় দেশে লক্ষ লক্ষ প্রজার বাস যেখানে, সেখানে সম্ভব হয় না। কাজেই বিভিন্ন স্থানের প্রজারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া পাঠায়; আর সেই সব প্রতিনিধিদের যে সভা হয়, পার্লামেন্ট, কংগ্রেস বা কাউন্সিল যে নামেই হউক, সেই সভার নির্দ্দিষ্ট বিধিব্যবস্থা অনুসারে সেই সভারই নিকট দায়ী কর্ম্মচারিবর্গ শাসনকার্য্য চালান। এখনকার representative democracyর সাধারণ কর্ম্মপদ্ধতি হইল মোটের উপর এইরূপ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিধিব্যবস্থা কিছু আর সকলের একমতে হইতে পারে না। প্রতিনিধিসভার মেজরিটীর (majorityর) অর্থাৎ অর্দ্ধাধিক সভ্যের মত যাহা হইবে, তাহাই শাসনবিধি বলিয়া মানিয়া নিতে অপর ন্যূনার্দ্ধ বা মাইনরিটি (minority) বাধ্য, যতই এই সব বিধি অন্যায় ও অসঙ্গত বলিয়া তাঁহারা মনে করুন। তবে নিজেদের বড় কোনও স্বার্থ ব্যাহত যদি তাহাতে হয়, তবে বিদ্রোহই তাঁহাদের একমাত্র উপায়।

গত মহাযুদ্ধের কেবল পূর্ব্বে আয়র্লণ্ডকে স্বায়ত্তশাসন দিবার প্রস্তাব বৃটিশ পার্লামেণ্টে উঠে। আয়র্লণ্ডবাসী ইংরেজ প্রজাবর্গের স্বার্থের হানি ইহাতে হইতে পারে, তাই তাঁহারা বহু আপত্তি করেন। কিন্তু যখন দেখা গেল, সব আপত্তিসত্ত্বেও এই আইন পার্লামেণ্টে তখনকার মন্ত্রীসভার চেষ্টায় পাশই হইবে, ইহাঁরা অস্ত্রবলেই এই আইনের প্রতিরোধ করিবার আয়োজন আরম্ভ করিলেন। এমন সময় জর্ম্মাণযুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। এতবড় বিপদের সম্মুখে আত্মকলহে ও অন্তর্ব্বিদ্রোহে একেবারে সর্ব্বনাশ হইবে বুঝিয়া সে চেষ্টায় ইঁহারা ক্ষান্ত হইলেন। বস্তুতঃ মেজরিটীর ভোট ছাড়া আইন করিবার আর কোনও উপায় গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালীতে নাই। একটা ভোট মাত্র একদিকে বেশী হইলেও তাহাই মেজরিটী হইল,—প্রায় অর্দ্ধেক লোককে অপর অর্দ্ধের মতানুসারে চলিতে হয়, বিজয়ী অর্দ্ধসংখ্যার এই মত পরাভূত অর্দ্ধসংখ্যক লোকেরা যতই অন্যায় বলিয়া মনে করুন।

আর সম্ভব হইলে, পরাভূত দল অস্ত্র ধরিয়া বিদ্রোহী হইয়া বিপ্লবও একটা ঘটাইতে পারে। সুতরাং এই শাসনকে একেবারে নিখুঁৎ শাসন বলা যায় না, ইহার ভিত্তিরও এমন পাকা গাঁথুনি কিছু নাই।

আবার এই সব প্রতিনিধিনির্ব্বাচন-ব্যাপারেও ইলেক্‌টর বা *নির্ব্বাচকদের মেজরিটীর* ভোট যাঁহারা পান, তাঁহারাই নির্ব্বাচিত হন। মাইনরিটী হয়ত অর্দ্ধেকের কাছাকাছি হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের নির্ব্বাচিত লোকদের রাষ্ট্রীয় প্রজাসমিতির মধ্যে কোন স্থান হয় না। কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধেক প্রজার প্রতিনিধিদের লইয়া হইল রাষ্ট্রীয় প্রজাসমিতি, আবার তাঁহাদেরও কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধেকে যাহা বলিবেন, তাহাই হইবে আইন। সুতরাং এই আইন যে সর্ব্বসাধারণের সম্মত নয়, এ কথা বলাই বাহুল্য।

তারপর ভোটের অবস্থার কথা। রাষ্ট্রীয় শাসন ও রক্ষণাদির ব্যাপারে সকলের সমান স্বার্থ রহিয়াছে। সকলে একত্র মিলিতে পারে না, তাই প্রতিনিধির প্রথা হইয়াছে। এই প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনে সকল প্রজার সমান অধিকার, সুতরাং সমান ভোটেরই ব্যবস্থা ডিমক্রাসীর নীতিতে গৃহীত হইয়াছে। অবশ্য এই 'প্রজার'ও একটা সংজ্ঞা প্রত্যেক দেশেই দেওয়া হয়। পরিণত বয়স্ক যে কোনও পুরুষ কোনও কর্ম্মে আপনাকে প্রতিপালন করিতেছে এবং রাজকর কিছু দিয়া থাকে, সেই প্রায় সর্ব্বত্র এখন এই ভোটের অধিকারভোগী প্রজা। নারীরাও এখন এই অধিকার দাবী করিতেছেন এবং পাইতেছেন।

ভোট সকলেরই সমান, অর্থাৎ প্রত্যেক প্রজারই এক এক ভোট মাত্র। কিন্তু ধনে ও পদে, বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে, গুণে ও যোগ্যতায়, সকলে ত সমান নহে। সাম্যবাদীরাও সকলের absolute বা নিরপেক্ষ সাম্য মানেন না। এই পর্য্যন্ত তাঁহারা বলেন, যোগ্যতা অনুসারে যে যা পাইতে পারে, সে তাই পাইবে,—আর তার জন্য সমান সুযোগ সকলের থাকিবে, (each according to his desert and equal

opportunity for all)। সম্প্রদায় বিশেষের বা ব্যক্তি বিশেষের বংশগত কি পদগত এমন কোনও বিশিষ্ট অধিকার কিছু থাকিবে না, যাহাতে ইহার বাধা হইতে পারে। সকলের সমান যোগ্যতা নাই, যোগ্যতানুসারে যে যা পাইতে পারে, সে তাই পাইবে—ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তবে মানুষে মানুষে এত বৈষম্যের মধ্যে রাষ্ট্রীয় শাসনের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ছোট বড় সকলের সমান ভোট স্থায়সঙ্গত কি করিয়া হয়? যোগ্যতায় এমন মানুষ আছে, হাজার মানুষের যোগ্যতা একত্র করিলেও যার সেই যোগ্যতার কাছেও দাঁড়াইতে পারে না,—অথচ এই হাজার লোকের হাজার ভোট তার সেই এক ভোটকে কোন্ অতলে ডুবাইয়া রাখিতে পারে। প্রতিভাবান্ সুবিজ্ঞ ও সুযোগ্য লোক সকল দেশেই অতি অল্প। মাঝামাঝি এক রকম লোক আছে, যাদের সংখ্যা নিতান্ত কম না হইলেও খুব বেশীও নয়। কিন্তু সকল দেশের বেশীর ভাগ লোকই অজ্ঞ, অবিবেচক, গুরু কোনও দায়িত্ব পরিচালনার অযোগ্য। সুতরাং প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে সকলের সমান ভোট হইলে, দেশের মাথা যাঁহারা, দেশ যাঁহাদের বুদ্ধিতে ও শক্তিতে আশ্রিত হইয়া কল্যাণের পথে চলিতে পারে, তাঁহারাই একেবারে এই জনগণ বা mobএর হাতে গিয়া পড়িতে পারেন। তাঁহাদিগকে তলাইয়া রাখিয়া তারা যা খুসী তাই করিতে পারে।

কিন্তু এ যাবৎ এরূপ অবস্থা কোথাও বড় দেখা যায় নাই,—কারণ শক্তিমান্ ও সুযোগ্য নায়কবর্গের বড় একটা প্রভাব জনসাধারণের উপরে সর্ব্বত্রই রহিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও সর্ব্বসাধারণের এই সমান ভোট একটা প্রহসনের মতই হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ পদস্থ ও সম্পন্ন ব্যক্তিরাই সর্ব্বত্র প্রতিনিধির পদপ্রার্থী হইয়া দাঁড়ান। ইহাদের ভোট-যাচাই ব্যাপারটা যেরূপ হইয়া থাকে, এ দেশের মিউনিসিপালিটীর, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের ও লোকালবোর্ডের কমিশনার এবং ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের নির্ব্বাচনে তাহার নমুনা সকলেই দেখিয়াছেন। সুশিক্ষিত লোকের মধ্যেও, বিবেচনা করিয়া, ভাল লোক বাছিয়া, ভোট কয়জনে

দিয়া থাকেন বা দিতে পারেন? কেহ খাতিরে, কেহ চক্ষুলজ্জায়, কেহবা অন্য পাঁচ রকম স্বার্থের বিবেচনায় ভোট দেন। নির্ব্বাচন-প্রার্থীরাও যার হাতে ভোটার যার উপরে যতটুকু ক্ষমতা আছে, তা প্রয়োগ করিয়া থাকেন,—যে উপায়ে যাকে বাধ্য করিতে পারেন, তার কিছুই ছাড়ে না। শিক্ষিত ভদ্রলোকের মধ্যেই এই অবস্থা, অশিক্ষিত জনসাধারণের ভোট যে কি ভাবে লোকের হস্তগত হয়, তাহা না বলিলেও চলে। তলে তলে কত ঘুষ, কত লোভ দেখান, কত বা ভয় দেখান—ইহাদের বাধ্য করিয়া রাখিতে কি যে না হয়, তাহা আর বলা যায় না। কখনও অশেষ রকম ছলে মিথ্যা আশায় প্রলুব্ধ করিয়া, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যে কোনও অজুহাতে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াও, ইহাদের পক্ষে রাখিবার চেষ্টা করা হয়। শেষে ভোটপ্রার্থী এজেণ্টরা ইহাদের যে ভোট দেওয়াইতে লইয়া যায়, সে অতি সাবধানে কড়া পাহাড়ায়, পাছে এই সব অমূল্যনিধি পথে কেহ লুটিয়া নেয়। লুটের চেষ্টায় কাড়াকাড়ি টানাটানিও অনেক হইয়া থাকে। ভোটারদের আদরই বা তখন কত! অবজ্ঞায় যাহাদের দিকে ফিরিয়াও যাঁহারা তাকান নাই, সেই একটি দিন তাহাদের মাথায় করিয়া তাঁহারা নাচেন, জামাই আদরে খানাপিনা যোগান। আদরে ও আপ্যায়নে ইহারাও গলিয়া যায়। এ সব Electioneering Tactics। ইহার কিছুতেই কেহ দোষ দেখেন না; যতই জঘন্য হউক, শিষ্টসমাজে এ সব চাল চল হইয়া গিয়াছে।

এ দেশেরই অবস্থা যে এইরূপ তা নয়,—ইয়োরোপেও ঠিক এই অবস্থা। এই অদ্ভুত রকমগুলা ইয়োরোপেরই আমদানী। তুলনা করিলে সেখানকার অবস্থাটা বরং আরও বিশ্রী বলিয়া মনে হইবে। প্রত্যেক নির্ব্বাচন-প্রার্থীকে এই সব ভোটারদের মদ খাওয়াইতেই প্রচুর সেখানে অর্থ ব্যয় করিতে হয়। সম্ভ্রান্ত মহিলারা চুম্বনের বিনিময়ে ভোট সংগ্রহ করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্তও আছে।

ইয়োরোপে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক দল আছে, প্রত্যেক

দলে দলপতিও আছেন। প্রত্যেক স্থানে, যেখানে ভোটে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়, এই সব দলের শাখা আছে, শাখাদলের নায়কও আছেন; ইঁহারা প্রধান দলপতিদের সহযোগী। নির্ব্বাচনের সময় যখন আসে, এই সব দলনায়কগণ নিজেরা প্রার্থী হইয়া দাঁড়ান, অথবা মনোমত প্রার্থী খাড়া করেন। তখন ভোট যাচাই আরম্ভ হয়। যার হাতে যতরকম উপায় আছে, তার দ্বারা তিনি আপন দলের প্রার্থীর পক্ষে ভোট সংগ্রহে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যান। প্রত্যেক দলের মুখপাত্র-স্বরূপ কতকগুলি করিয়া সংবাদপত্রও আছে। ইহারা নিজ নিজ দলের নীতির ও নায়কগণের অজস্র সুখ্যাতি ও প্রতিপক্ষদলের নীতির ও নায়কগণের অজস্র নিন্দা প্রচার করিতে থাকে। নির্ব্বাচনের সময়কার দলের লড়াই বা electioneering campaign এর আট ঘাট বাঁধা, পাকা একটা বন্দোবস্ত বা organisation সর্ব্বত্র আছে,এবং লড়াইটাও তেমনই পাকা কৌশলে চলে। কাহারও সাধ্য কি যে যোগ্য লোক বাছিয়া ভোট দিবে? যাদের এসব বিষয়ে ভালমন্দ বিবেচনার শক্তি আছে, তারাই পারে না,—কোনও না কোনও দলের মতে তাদের চলিতেই হয়। আর অজ্ঞ জনসাধারণ—তাহাদের ত কথাই নাই। যে স্থানে যে দলের নায়কদের প্রতিপত্তি তাহাদের উপরে বেশী, তাঁহারাই বেশী ভোট তাহাদের পান। অনেক স্থান একেবারে স্থায়ী ভাবেই এক একটা দলের করায়ত্ত হইয়া আছে।

নির্ব্বাচনপ্রার্থী যাঁহারা হন, তাঁহাদিগকেও কোনও না কোনও দলের লোক গিয়া হইতে হয়, সেই দলের সাহায্যে নির্ব্বাচিত হইতে হয়। 'দলো' রাজনীতির মধ্যে অনেক কূটচাল কুচাল আছে, ভালতে মন্দতে দলকেই মানিয়া চলিতে হয়, অনেক স্থলে অনেক রকম হীনতাও স্বীকার করিতে হয়। এ সব যাঁহারা পারেন না, বা অতিশয় সাধুবুদ্ধি হেতু করিতে চান না,—তাঁহাদের পক্ষে হাজার যোগ্যতা থাকিলেও সাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি হইয়া পার্লামেণ্টে স্থান লাভ করা একরূপ অসম্ভব।

প্রতিনিধিরা সব দলের লোক, নির্ব্বাচিত হন দলের জোরে বেশী ভোট পাইয়া,—শেষে পার্লামেণ্টে যে আইন পাশ হয়, শাসননীতি ধার্য্য হয়, তাও হয় দলের বুদ্ধিতে। প্রতিনিধিরা যার যার দলের নায়কগণের মতানুসারে ভোট দিয়া থাকেন। ইহার ব্যতিক্রম হয় অতি কম। যেখানে হয়, সেখানেও একদলের প্রতিনিধিরা আপনাদের নায়কদের ছাড়িয়া প্রতিপক্ষদলের নায়কদের অনুবর্ত্তন করেন। সাধারণতঃ প্রধান দুইটি দলই থাকে, দুইদলের নির্দ্দিষ্ট নীতিও কতকগুলি করিয়া আছে। সংঘর্ষ যাহা কিছু হয়, এই দলের মধ্যে, কোন্ দলের নীতি শাসনযন্ত্রে প্রভুত্ব করিবে তাই লইয়া। বিভিন্ন লোকের মতের কোনও বৈচিত্র দেখা যায় না, কেহ নিরপেক্ষভাবে কোনও মত প্রকাশ করেন না, নূতন কোনও দিকে প্রতিনিধিদের মতিগতির ও চিন্তার ধারা পরিচালিত করিবার একটা প্রয়াসও কাহারও মধ্যে দেখা যায় না।

মোট কথা, সমগ্র রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যাপারটাই বিশেষ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট নীতির অনুযায়ী দলগুলির হাতে গিয়া পড়িয়াছে। দলে দলে লড়াই চলিতেছে। যে দল বেশী ভোট সংগ্রহ যখন করিতে পারেন, সেই দল শাসনযন্ত্রে তখন প্রধান্য করেন।

এই দলগু'ল আবার বাছা কতকগুলি নায়কের হাতে। বড় বড় নায়ক কয়জন করিয়া আছেন,—তাঁহাদের সহকারী বহু উপনায়কও আছেন। সুতরাং রাষ্ট্রীয় শাসন কখন কোন্ নীতি অনুসারে কি ভাবে চলিবে, তাহা একেবারেই এই সব দলনায়কবর্গের হাতে। লোকমতের সমর্থন তাঁহাদের এই কর্ত্তৃত্বের ভিত্তি বলিয়া তাঁহারা গর্ব্ব করিয়া থাকেন। কিন্তু সে লোকমত যে তাঁহাদেরই গড়া, তাঁহাদেরই আয়ত্ত মত,—লোকের নিরপেক্ষ স্বাধীন মত নয়, আর প্রতিনিধিরাও যে জনসাধারণের নিরপেক্ষ স্বাধীন বুদ্ধিতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি নন, একথা বিশেষ করিয়া আবার না বলিলেও চলে। এই দলাদলি, এই electioneering campaignএর ব্যাপারটা যে কত বড় একটা বিশ্রী ব্যাপার, ডিমক্রাসীর কেমন একটা প্রহসন মাত্র, তাহা

কাহারও চক্ষেও বড় পড়ে না। কারণ, এই ব্রতের এই-ই কথা; আর এই ব্রতই শ্রেষ্ঠ ব্রত বলিয়া সকলে আমরা ধরিয়া নিয়াছি।

এখন, এই সব দলনায়ক কাহারা? যাঁহারাই হউন, জনসাধারণের স্বেচ্ছায় বৃত নায়ক তাঁহারা নন। দেশের সম্ভ্রান্ত, সম্পন্ন, পদস্থ, নানাদিকে শক্তিশালী লোক ইঁহারা—জনসাধারণ হইতে স্বতন্ত্র এক শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু উচ্চতর সম্পদ, পদমর্য্যাদা ও তৎপ্রসূত শক্তিবলে সাধারণ লোকের উপর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ইঁহাদের আছে। আছে বলিয়াই জনসাধারণের ভোট ইঁহারা এত সহজে পান।

দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বুদ্ধি ও প্রতিভার অধিকারী সর্ব্বদা ইঁহারা না হইলেও, মোটের উপর দেশে সামাজিক প্রাধান্য ইঁহাদেরই এবং রাষ্ট্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণেও ইঁহারা অযোগ্য নন। ইঁহাদিগকেই এক প্রকার natural leaders of society বলা যাইতে পারে। সুতরাং এখন পর্য্যন্ত শাসননীতি নামে democracy হইলেও, কার্য্যতঃ শাসনব্যাপার যোগ্য লোকের হাতেই রহিয়াছে, এবং রহিয়াছে বলিয়াই রাষ্ট্রশাসন অতি বিশৃঙ্খল ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে নাই।

কিন্তু সর্ব্বসম্মত মূলনীতির সঙ্গে শাসনের বাস্তব রীতির এই বৈপরীত্য হেতু অসুবিধাও অনেক হইতেছে। অতি যোগ্যেরও এক ভোট, আবার হাজার অযোগ্যরও ঠিক সেই এক এক ভোট। সুতরাং যোগ্যকে তার দায়িত্বের স্থান রক্ষা করিতে হইলে, এই সব হাজার হাজার অযোগ্য লোকের মন যোগাইয়া চলিতে হয়, অথবা তাহাদের বাধ্য করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে হয়। আবার প্রতিপক্ষ অপর যোগ্য লোকের সঙ্গেও অতি সতর্ক হইয়া যুঝিতে হয়। Electioneering campaignএর উদ্দেশ্যও তাই। ইহাতে অনেক শক্তি তাঁহাদের ক্ষয় হয়। পার্লামেণ্টেও এইদিকে তাঁহাদের বেশী দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয় যে ভবিষ্যতের নির্ব্বাচনে তাঁহাদের পদ তাঁহার কিসে রাখিতে পারেন। এক মনে ধীরভাবে কেবল সুনীতিসম্মত সুশাসনে দেশের মঙ্গল কিসে হইবে, এসব ভাবিবার এবং তদনুসারে

ধীরচিত্ত হইয়া চলিবার অবসর কাহারও বড় হয় না। শাসন প্রকৃতপক্ষে ডিমক্রাসী নয়, অথচ ডিমক্রাসীর ঠাট একটা দেশে খাড়া করা হইয়াছে। তার সঙ্গে নিজেদের মানাইয়া চলিবার হাঙ্গামাতেই বড় বেশী ব্যস্ত তাঁহাদের থাকিতে হয়। তারপর দলের লড়াই আছে; এটাও পুরাদমে চালাইতে হয়। ফলে তাঁহাদের বুদ্ধি, মতিগতি, সব লড়ায়ে ধরণের হইয়া উঠে। নিজেরাও শান্তি স্বস্তি কি তাও জানেন না, দেশেও তার মঙ্গল প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না। সর্ব্বত্র, জীবনের সকল সম্বন্ধে, কেবল একটা লড়াই—দলে দলে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে,ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, অবিরত একটা স্বার্থের লড়াই—সর্ব্বত্র প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। আর এই লড়াইয়ের মধ্যে সত্যের, ন্যায়ের, তিতিক্ষার বা অন্যান্য সুনীতির সকল বিবেচনা, সকল মর্য্যাদা, অবিরত অবজ্ঞাত ও পদদলিত হইতেছে। এ সব সম্বন্ধে কোনও দোহাই কেহ দিলেও তাহা হাস্যস্কর কথা হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ডিমক্রাটিক শাসন-প্রণালীই কেবল ইহার কারণ নয়,—আরও কারণ আছে। যেদিক দিয়াই আসুক, সব কারণের মূল সেই Individualism.

রাষ্ট্রীয় শাসনই দেশের সর্ব্বোচ্চশক্তি; এই শাসন যাঁহাদের হাতে, তাঁহারাও কেবল এই আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই লইয়াই আছেন। দেশে শান্তি ও স্বস্তির মঙ্গল প্রতিষ্ঠা করিতে যদি কেহ পারেন, তাঁহাদেরই পারিবার কথা। কিন্তু এ অবস্থায় তাঁহারা তা পারেন না।

এই লড়াই, আর অবিরত সকলের পরস্পরকে ঠেলিয়া অধিকতর পার্থিব সুখসৌভাগ্যে ও শক্তিতে অগ্রসর হওয়া, ইহাই নাকি উন্নতশীল জীবনের লক্ষণ। পার্থিব সম্বন্ধে পরস্পরের সঙ্গে যতদূর সম্ভব শান্তিতে থাকিয়াও যে মানব অন্যদিকে—জ্ঞানে, আধ্যাত্মিক সাধনায়, ত্যাগে, লোকহিত ধর্ম্মে—কত উন্নতি লাভ করিতে পারে, আর সেই উন্নতির পক্ষে পার্থিব সম্বন্ধে এই শান্তি যে কিরূপ প্রয়োজন, ইহা পাশ্চাত্য

বুদ্ধি ঠিক বুঝিতে পারে নাই। তাই কেবল এই লড়াইকেই উন্নত জীবনের লক্ষণ বলিয়া লোকে সেখানে মনে করে।

এতটা বিশ্রী ব্যাপার হইত না, যদি মুড়িমিছরীর সমান দরে সকলের সমান ভোট না হইয়া যোগ্যতার অনুপাতে প্রত্যেকের ভোটের সংখ্যা বেশী কম হইত। সাম্যের মধ্যেও স্বাভাবিক যোগ্যতার এবং যোগ্যতানুযায়ী ভাগ্যের বৈষম্য ইঁহারা মানেন। তাহাতে ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা ইহাই হয়। কিন্তু এই বৈষম্য রকমে এত বিচিত্র,—আর যে দিকেই হউক, যোগ্যতার পরিমাণ এবং যোগ্যতালব্ধ ভাগ্যের পরিমাণ বিভিন্ন ব্যক্তিতে এমন ভাবে এতই তফাৎ, যে ইহার একটা মাপ করিয়া সেই অনুসারে প্রত্যেকের ন্যায্য ভোটের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নয়, যেমন নাকি যৌথকারবারে অংশী হিসাবে অংশীদের ভোটের তারতম্য করা হইয়া থাকে। সম্ভব হইলেও, নির্দ্ধারণ করে, কার এ অধিকার আছে?—ইঁহারা শাস্ত্রশাসন মানেন না, জ্ঞানে ও সাধনায় উন্নত কোনও সম্প্রদায় বিশেষের কোনও কর্ত্তৃত্বও মানেন না।

যাক, যে কথা বলিতেছিলাম। শাসনের বাস্তব অধিকার, যে ভাবেই হউক, যোগ্য ব্যক্তিদের হাতেই আছে। কিন্তু যোগ্য যেমনই হউন, অন্যান্য দেশের সঙ্গে শক্তির সমতা একটা তাহাতে যতই রাখিতে পারুন, আভ্যন্তরিক শাসন সম্পর্কিত সকল বিধিব্যবস্থার প্রণয়নে ইঁহারা যে একেবারে ন্যায়নিষ্ঠ থাকিবেন, সকলের স্বার্থ সমান ভাবে দেখিয়া চলিবেন, তাহা নাও হইতে পারে। সাধারণতঃ ইহাঁরা জনসাধারণ হইতে পৃথক্ ও উচ্চতর এক শ্রেণীর লোক, অনেক বিষয়ে ইঁহাদের স্বার্থ সাধারণ লোকের স্বার্থ হইতে পৃথক্; পরন্তু বিরোধীও হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় ক্ষমতা যাঁহাদের হাতে থাকে, আপনাদের স্বার্থের দিকে টানিয়াই তাঁহাদের বেশী চলিবার সম্ভাবনা। এরূপ দৃষ্টান্তও যে না ঘটিয়াছে, তা নয়। আবার, কোনও একদল জনসাধারণের স্বার্থের দিকে বেশী চান, এই ভাব দেখাইয়া প্রতিপক্ষ দলকে পরাভূত করিতে চেষ্টা করিতে পারেন, যেমন ইংলণ্ডের পুরাতন লিবারেল দল,

জনসাধারণ অধিকতর অধিকার পাইতে পারে, তাহাদের হিত বেশী ঘটিতে পারে, এইরূপ ভাবে আইনসংস্কারের অভিলাষী হইয়া conservative বা রক্ষণশীল দলকে অনেক সময় পরাভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই লিবারেল দল দীর্ঘকাল একাধিপত্য ভোগ করিতে পারেন নাই। রক্ষণশীল দলও তাঁহাদের প্রাধান্য বজায় রাখিতে এইরূপ আইন অনেক করিয়াছেন,—শাসনযন্ত্রেও পর্য্যায়ক্রমে সমান প্রধান্য করিয়াছেন। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও Conservative কি Liberal, Tory কি Whig, সকল দলের নায়কগণই সমাজে উচ্চতর সম্প্রদায়ের লোক, অনেক বিষয়ে তাঁহাদের স্বার্থ সমান এবং অনেক এমন স্বার্থ আবার জনসাধারণের বহু স্বার্থের বিরোধী। এরূপ অবস্থায় স্বভাবতঃই তাঁহাদের সকলেরই একটা প্রয়াস হইবে, বিধিব্যবস্থা এমন না হয়, যাহাতে নিজেদের স্বার্থ বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। কেবল এইটুকু মাত্র দেখা যাইতেছে, যে দরিদ্র জনসাধারণ যতটুকু তাহাদের স্বার্থ বুঝিতে পারিতেছে, যতটুকু বল সংগ্রহ করিয়া সেই স্বার্থের দাবী করিতে পারিতেছ, রাষ্ট্রনায়কত্বের অধিকারী দলপতিগণ ততটুকুই আপনাদের স্বার্থ ছাড়িয়া তাহাদের স্বার্থের দিকে চাহিয়া আইন করিতেছেন। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের উপরে এমন কোনও একটা শক্তি নাই, সেই শক্তিতে স্থিত এমন কোনও বিধিব্যবস্থা নাই, যাহা এইসব বিপরীত স্বার্থের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রাখিতে পারে। কাজেই অবিরত একটা সাম্প্রদায়িক সংগ্রামে কে কার কোলে কতটা ঝোল টানিতে পারে, সেই চেষ্টাই চলিতেছে। ইহাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক সমবেদনা ও সহযোগিতার ভাব দূর হইয়া কেবল দ্বেষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবই প্রকট হইয়া উঠিতেছে।

যাহা হউক, এতদিন এই ভাবে চলিতেছিল তবু এক রকম মন্দ নয়। রাষ্ট্রনায়কগণ শাসনযন্ত্র যোগ্যতাসহকারেই চালাইতেছিলেন। ইঁহারা সকলেই কিছু আর স্বার্থপর, সঙ্কীর্ণচেতা ও অবিবেকী নহেন।

উচ্চজ্ঞানাধিকার, সুবুদ্ধি, উদারতা, এসব গুণও অনেকের আছে। ধর্ম্মবুদ্ধিও একেবারে লোপ পায় নাই। জনসাধারণের দুঃখে করুণা বোধও অনেকে করেন। আর ইহাও অনেকে বুঝেন, জনসাধারণের উন্নতি ব্যতীত দেশের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না, নিজেদের বহু মঙ্গলও জনসাধারণের মঙ্গলসাপেক্ষ। কতক এই সব প্রেরণায় ও বিবেচনায় এবং কতক অসন্তুষ্ট জনসাধারণের দাবীতেও, নিত্যই যখন যেরূপ প্রয়োজন তাদের স্বার্থ ও মঙ্গলের দিকে চাহিয়া বিধিব্যবস্থাও ইঁহারা করিতেছিলেন।

কিন্তু সম্প্রতি কতকগুলি অবস্থা পাশ্চাত্যদেশে আসিয়া পড়িয়াছে, যাহাতে জনসাধারণ আর তাঁহাদের নেতৃত্ব না মানিয়া নিজেদের স্বার্থরক্ষা নিজেদেরই বলে নিজেরা করিতে চাহিতেছে। অনেকে বলিবেন, ইহা সুলক্ষণ। কিন্তু ঠিক তা নয়। অষ্টাদশশতাব্দীতে প্রচারিত এই সব সাম্য ও স্বাধীনতা, সকল কর্ম্মে সকলের সমান অধিকার, প্রভৃতি নীতির প্রচার ও অনুসরণের ফলে ইয়োরোপের ব্যবসায়বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটা যুগান্তর হইয়া গিয়াছে। তাহাতে ধনী মহাজন ও বড় বড় ব্যবসায়িক নায়কদের হাতে সকল রকম ব্যবসায় গিয়া পড়িয়াছে, দরিদ্র এবং জনসাধারণ একেবারে ইঁহাদের বেতনভোগী মুজুরে পরিণত হইয়াছে। ভদ্রলোক যারা লেখা পড়া কিছু জানে, তারা কেরাণী মজুর; আর নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত দৈহিক শ্রমজীবীরা কুলিমুজুর। কেরাণী মজুরের অপেক্ষা কুলিমজুরের সংখ্যা অবশ্য অনেক বেশী। মজুরীর রীতি কড়া, খাটুনী বেশী, কিন্তু বেতন কম। ইহাতে এই সব শ্রেণীর সকলেরই বারপরনাই একটা ক্লেশের অবস্থা আসিয়াছে। কেমন করিয়া কিসে এই সব নীতির অনুসরণের ফলেই ঠিক এই অবস্থাটা আসিয়া পড়িয়াছে, এবং ইহা যে দরিদ্র প্রজাসাধারণের পক্ষে কেমন দুঃসহ ক্লেশকর হইয়াছে, তার বিস্তৃত অলোচনা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে করিতে চেষ্টা করিব। কারণ তাহাই ইয়োরোপীয় বর্ত্তমান সমাজসমস্যার সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং পৃথক ও বিস্তৃতভাবেই তার আলোচনা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রশাসনের যে নায়কবর্গ, তাঁহারা প্রধানতঃ আবার এই সব বড় বড় ব্যবসায়বাণিজ্যেরও নায়ক, অথবা ইঁহাদের বৃত্তিভোগী বা নিয়োজিত রাজনীতিকুশল শক্তিধর পুরুষ। সুতরাং ইঁহাদের স্বার্থে এবং দরিদ্র জনসাধারণের অর্থাৎ মজুরশ্রেণীসমূহের স্বার্থে যারপরনাই একটা বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। জনসাধারণ এতদিন যে ভাবে এই নায়কদের নেতৃত্ব মানিয়া চলিয়াছে, এখন আর তা চলিতে চাহিতেছে না। ক্লেশ তাদের এতদূর কঠোর হইয়া উঠিয়াছে যে আর তা পারিতেছেও না। উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে জ্ঞানী ও সহৃদয় ব্যক্তিগণ ইঁহাদের দুঃখ বোঝেন, প্রতিকারের চেষ্টাও করেন। কিন্তু স্বার্থান্ধ মহাজন ও ব্যবসায়িক নায়কবর্গের হাতে ক্ষমতা এত বেশী গিয়া পড়িয়াছে এবং দলবদ্ধ হইয়া নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতেও তাঁহারা এত সচেষ্ট, যে তাঁহাদের বিরুদ্ধে কাহারও কোনও চেষ্টা সফল হইতেছে না। তাই কিছুকাল যাবৎ মুজুররাও দল বাঁধিতেছে, এবং দল বাঁধিয়া ধর্ম্মঘট প্রভৃতি উপায়ে আপনাদের সুবিধা কিছু কিছু করিয়া নিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু কেবল তাহাতেও আশানুরূপ ফল হইতেছে না। রাষ্ট্রশাসনপদ্ধতিই ইয়োরোপের সংহতিশক্তির একমাত্র আকার। তাই ইহার মধ্যেই তাহারা আপনাদের প্রধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। ডিমক্রাটিক নীতির তাৎপর্য্যও তারা এখন বুঝিতেছে। মনে করিতেছে, তারাই যখন দেশের বেশীর ভাগ লোক, তাদের শ্রমেই যখন রাষ্ট্রশাসন, যুদ্ধবিগ্রহ, ব্যবসায়বাণিজ্য সব চলিতেছে,—তখন তার সকল সুফল ভোগ করিবার বেশী দাবী তাহাদেরই আছে। তারা কেবল খাটিবে আর দুঃখ পাইবে, উচ্চশ্রেণীর অল্পসংখ্যক লোকেরা মাত্র সকল বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিবেন, সকল সুখ-সুবিধা ভোগ করিবেন, অশেষ আরামে বিরামে ও ভোগবিলাসে জীবন কাটাইবেন, ইহা কখনও হইতে পারে না।

তাই আপনাদের দলের লোককেই নির্ব্বাচন করিয়া শাসনযন্ত্রে আপনাদের এরূপ প্রধান্য তাহারা স্থাপন করিতে চায়, যাহাতে প্রচলিত

সামাজিক রীতিনীতি—যার দরুণ ছোট বড় ভেদ জন্মাইতেছে; ধনীকে প্রভু, দরিদ্রকে তার অধীন করিয়া ফেলিতেছে—সব উঠিয়া গিয়া নূতন এমন সব নিয়মের প্রবর্ত্তন হয়, যাহাতে ধনী দরিদ্রের ভেদ উঠিয়া যায় এবং দরিদ্র শ্রমজীবীরা বড় বড় লোকদের সমান হইয়া সমান সুখ ভোগ করিতে পারে,—আর এই অবস্থাই স্থায়ী হয়।

যে গণবিপ্লবে রুষিয়া ধ্বংস হইয়াছে, জর্ম্মাণী, অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি মধ্য ইয়োরোপের শক্তিশালী রাজ্যসমূহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, অন্যান্য দেশও কতকটা টলমল হইয়া উঠিয়াছে, সেই 'সোসিয়ালিষ্ট' বা 'বোলশেভিক' বিপ্লববাদ ইহারই চরম একটা প্রকাশ। Demos বা জনসাধারণ সকলের সঙ্গে সমান সুখ ভোগের ও সমান অধিকারের লোভে ক্ষেপিয়া উঠিলে, তাহার পরিণাম এইরূপই হইবে।

জনসাধারণ কোনও দেশেই সুশিক্ষিত ও সুবিবেচক নয়। উত্তেজনার বশে ইহারা না করিতে পারে, এমন কাজ নাই। শিক্ষিত, ধীরবুদ্ধি এবং উন্নত সংস্কারের অধিকারী উচ্চতর শ্রেণীর নায়কবর্গের পরিচালনাধীনতায় সুপথে ইহারা সংযত না থাকিলে, কোনও দেশেরই মঙ্গল হয় না। শক্তিমান্, অথচ কূটবুদ্ধি লোক কেহ বড় বড় ভাবের কথায়, সাম্য স্বাধীনতা ও মানবোচিত উচ্চ অধিকার প্রভৃতি সম্বন্ধীয় চিত্তগ্রাহী বক্তৃতার ছটায়, ভাবের উন্মাদনায় ইহাদিগকে প্রমত্ত করিয়া কি যে অত্যহিত না ঘটাইতে পারে, তা বলা যায় না। ফরাসী বিপ্লব আর সেই বিপ্লবসংসৃষ্ট যত কিছু লোমহর্ষণ ভীষণ ঘটনা, এই ভাবেই ঘটিয়াছিল। ছোট আরও বহু দৃষ্টান্ত ইয়োরোপের ইতিহাসে, জগতের অন্যান্য দেশের ইতিহাসেও, পাওয়া যায়। বর্ত্তমান ইয়োরোপে বোল্শেবিক্ বিপ্লবও ইহার একটি বড় দৃষ্টান্ত। ফরাসীবিপ্লব কতকগুলি কঠোর বৈষম্য ও অতি কঠোর শাসন হেতু ঘটিয়াছিল। বর্ত্তমান ইয়োরোপেও সাম্য ও স্বাধীনতার বাদ প্রচারের ফলে ধনগত যে ভয়ানক বৈষম্য এবং দরিদ্র জনসাধারণের যে আর্থিক দাসত্ব ঘটিয়াছে, তাহাদের বর্ত্তমান এই যে অভ্যুত্থান—

যাহা ইয়োরোপীয় সমাজবিধানকে ও রাষ্ট্রবিধানকে পর্য্যন্ত চূর্ণ করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছে—তাহাও সেই বৈষম্য ও দাসত্বের বিরুদ্ধে বড় একটি বিদ্রোহ। একেবারে খাঁটি ডিমক্রাসী—যাহাতে সংখ্যায় অধিক বলিয়াই জনসাধারণের প্রাধান্য হইবে,—তাহা যে প্রকৃত সুশাসন হয় না,—রাষ্ট্রশাসনে যে বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, গভীর রাজনীতিজ্ঞান আবশ্যক, তাহা যে সর্ব্বদা লাভ করা যায় না,—অসংযত, অবিবেচক, অস্থিরমতি ও সাময়িক উত্তেজনার বশেই পরিচালিত জনসাধারণ বা mobএর কর্তৃত্বই যে সকলের উপরে গিয়া উঠিতে পারে, দুষ্টবুদ্ধি লোকের প্ররোচনায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া ইহারা এমন সব কাণ্ডও করিয়া ফেলিতে পারে, যাহাতে দেশের একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতে পারে, অভিজ্ঞ রাজনীতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাহা বেশ বুঝেন, এবং অসংযত ডিমক্রাসীর পক্ষপাতীও তাঁহারা নহেন।

ডিমক্রাসীই একমাত্র ন্যায়সঙ্গত ও সমীচীন শাসনপ্রণালী এবং সংখ্যাহিসাবে জনগণের ভোটই ইহার ন্যায়সঙ্গত ও সমীচীন ভিত্তি, এই ধারণা এমনই ভাবে অধুনা সকলের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, যে ইহার ন্যায়সঙ্গতি কি সমীচীনতার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিতে গেলেই লোকের একটা চমক লাগিয়া যায়। সকলেরই মনে হয়, তাইত, এ কি কথা! এইরূপ ডিমক্রাসী ছাড়া আর কোনও রকম শাসন কি আর আধুনিক জগতে চলিতে পারে? তার কোনও কথাও কি কেহ ভাবিতে পারে? ইহার পরিবর্ত্তে অন্য কোনও রূপ শাসনের কল্পনাও যে বাতুলতা।

আধুনিক জগতে ডিমক্রাসী ছাড়া আর কোনওরূপ শাসনপ্রণালী যে সহজে চলিতে পারে না, এ কথা সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া আধুনিক জগতে প্রচলিত ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত নীতি কি প্রতিষ্ঠান মাত্রই যে সনাতন সত্য-ধর্ম্মসঙ্গত এবং মানবসমাজের মঙ্গলকর হইবে, এমন কথাও কেহ বলিতে পারেন না। নীতির মূলে সত্য কতটা আছে, নীতি আধুনিক জগতে কি ভাবে চলিতেছে, ফলাফল কি দেখা যাইতেছে,

ভবিষ্যতে কোন্ দিকেই বা মানবসমাজকে তাহা লইয়া যাইতেছে, এই সব তথ্যের প্রমাণে বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে, বর্ত্তমান এই ডিমক্রাসী বাস্তবিক ন্যায়সঙ্গত শাসনব্যবস্থা কি না, এবং লোকসমাজের মঙ্গলের দৃঢ় ভিত্তি ইহা হইতে পারে কি না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানুষ যখন সকলে সমান নয়, বিদ্যায় বুদ্ধিতে ও যোগ্যতায় বহু পার্থক্য যখন মানুষে মানুষে রহিয়াছে, তখন সকলেরই সমান এক এক ভোট সর্ব্বত্র গৃহীত হইলেও, এই নীতি ন্যায়সঙ্গত নীতি হইতে পারে না। ইহা যে ভাবে চলিতেছে এবং ইহার স্বাভাবিক পরিণতি যে পথে ইহাকে পরিচালিত করিতেছে, তাহা যে সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে না, হইতে পারে না, বরং এক একটি সমাজকে একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারে, ইহারও আভাস পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। আরও একটু বিস্তৃত ও সূক্ষ্মভাবে কথাগুলি আলোচনা করিয়া দেখিলে মন্দ হয় না।

Direct democracy এখন কোথাও বড় নাই। এক একটি নগরবাসী জনগণ অথবা ছোট এক একটি সম্প্রদায় বা tribe মাত্র লইয়া যেখানে এক একটি ষ্টেট্ হয়, সেইখানেই direct democracy চলিতে পারে। যেমন প্রাচীন গ্রীসে এবং প্রাচীন অনেক বর্ব্বর সম্প্রদায়ের মধ্যে চলিত। কিন্তু আধুনিক উন্নত বড় বড় দেশ ও জাতির মধ্যে তাহা চলে না, কাজেই representative democracy বা প্রতিনিধি নিয়োগাত্মক গণতন্ত্রের প্রচলন হইয়াছে। ইহাতে দেশের সব 'প্রজা' বা 'citizen' ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে এবং সেই সব প্রতিনিধির হস্তে শাসনভার অর্পিত হয়। এই প্রতিনিধি নির্ব্বাচন অবশ্য ইহাদের সমান ভোটে হয়,—এবং এই ভোটের জন্য দেশের এই প্রজাবৃন্দকে প্রধানতঃ সংখ্যার হিসাবে অনেক-গুলি electorateএ বা নির্ব্বাচককেন্দ্রে ভাগ করা হয়। এরূপ ব্যবস্থা কেবল যে ন্যায়সঙ্গত নয়, তাহা নয়,—যোগ্য লোকই যে সর্ব্বদা নির্ব্বাচিত হইতে পারিবে, এরূপ সম্ভাবনাও ইহাতে বিশেষ থাকে না।

এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহারই সমর্থনে জর্ম্মাণ রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ব্লুণ্টস্‌লি সাহেবের কয়েকটি উক্তি আমি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। ইহার উক্তি এই প্রসঙ্গে অনেক স্থলে আমি উদ্ধৃত করিয়াছি। কারণ এ সব সম্বন্ধে এরূপ যুক্তিযুক্ত উক্তি কমই পাওয়া যায়, এবং উদ্ধৃত অংশগুলি যিনি পড়িবেন, তিনিই ইহা স্বীকার করিবেন। ডিমক্রাসীর মধ্যে কত দিকে কত ত্রুটি রহিয়াছে, এবং কিরূপ ভাবে এই সব ত্রুটি বাস্তব শাসনক্ষেত্রে প্রকাশ পাইতেছে, তাহাও এই উক্তিগুলি হইতে বিশেষ স্পষ্টভাবে সকলে বুঝিতে পারিবেন।

(a) "Moutesquien (a great French thinker) declared the principle of democracy to be virtue. But virtue, as a political principle, presupposes, not the equality of all, but a respect for the moral worth of the rulers, which is not to be found in pure democracy."

(b) "Its principle is that the best man of the nation govern in the name and by the commission of the nation. But the great difficulty lies in organising the elections so as to secure that the best man both in intellect and character shall be chosen.

The democratic tendencies of the present day are in favour of regulating elections simply by the number of electors. Democracy, placing, as it does, great value upon equality, readily adopts mathematical rules for its institutions; it counts the citizens, and assigns equal rights to an equal number.

But this system is better suited to direct democracy, which extends the exercise of power to all

citizens alike, than to representative democracy which distinguishes citzens according to their worth, and only entrusts the administration of public affairs to the better among them Thus the latter form regards the quality of the elected and it is unnatural that it should regulate the electoral divisions symply by quantity."

(c) "The popular assembly of a direct democracy is not merely a mass of individuals with equal rights; it is readily influenced by the magistrates, by the great orators, and the most respected citizens; the decision of the majority will probably correspond to the true character of the whole nation. But in ar representative democracy the nation is not thus united; on the contrary, it is divided into a number of scattered units, which may be equal in number, but which in regard to quality stand in a wholly different relation to the whole, and are therefore very unequal parts of the nation."

(d) "This difference in the electoral districts demands logically that a different value shall be placed upon their votes. True representation can only be secured by arranging the elections *so that every element and every interest in the nation shall be represented in proportion to its relation to the whole.* Number has a certain value, but it is not sufficient by itself. Other qualities, such as property, education,

occupation, and mode of life, must also be regarded, and it is best to do this *in connection with organic parts of the nation rather than with merely arbitrary subdivisions."*

(e) "We may thus lay down two fundamental principles for representative democracy.

(1) Whenever the whole body of citizens act together, or when a vote is given by the whole nation, it is enough to reckon merely the number of votes, as in a direct democracy.

(2) On the other hand, the mere counting of votes is insufficient when parts of the nation are electing representatives for the whole. *The parts must be arranged according to quality, so as to guarantee the election of the best men, and to give due proportion to the intellectual, moral and material elements of the nation."*

(f) "The peculiarity of representative democracy is that it ascribes the right of sovereignty to the majority, but entrusts its exercise to the minority. To secure that the minority shall rule according to the wishes of the majority, the latter reserves to itself the choice of those who are to act in its name, and new elections are held at short intervals of time.

The constitution recognises that the majority has neither the leisure nor the ability actually to

exercise the self-government which it claims as its natural right. But it credits the majority with sufficient intelligence and interest in the State to take part in the elections, and to find the ablest men for its representatives."

[The Theory of the State, Bluntschli, Book VI, Chap. XXIII, PP. 480-82]

(g) "The equality which commends itself to a democracy is equality of number. Its formula is not each according to its merit, but one as another."

(h) "It is a questionable proof of the merits of democracy that it can endure the baseness of the masses better than the superiority of individuals."

[The Theory of the State, Bluntschli, Book VI. Chap. XXI. P. 467.]

উদ্ধৃত মন্তব্যগুলির মধ্যে (d) ও (e) সংখ্যক অংশে (ইটালিক অক্ষরে মুদ্রিত) কথা কয়টির দিকে বিশেষভাবে আমি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। নির্ব্বাচিত যে প্রতিনিধিবর্গের হাতে সমগ্র জাতির শাসনকর্তৃত্ব অর্পিত হইবে, প্রকৃতপক্ষে জাতীয় শক্তির প্রতিভূ তাঁহারা হইতে পারেন, যদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা দীক্ষার, শক্তির ও যোগ্যতার তারতম্য কিরূপ, সমাজজীবনের সকলকার উপরে কতটা নির্ভর করিতেছে এবং তার জন্য সমাজশক্তির উপরে ন্যায় সঙ্গত স্থান কোথায় কার কতটা হইতে পারে, এই সব দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নির্ব্বাচনের নিয়ম করা হয়। কেবল সংখ্যার হিসাবে এবং কেবল সংখ্যা গনণায় নির্ব্বাচনের কেন্দ্র বা electorate ভাগ করিলে তাহা হয় না। ব্লুণ্টস্লি সাহেব বলিতেছেন, parts must be arranged according to quality, অর্থাৎ

গুণানুসারে নির্ব্বাচনের কেন্দ্র বিভাগ হইবে, যাহাতে যোগ্যতম লোক সর্ব্বদাই নির্ব্বাচিত হইতে পারেন এবং জাতির intellectual, moral ও material elements অর্থাৎ বিদ্যাবুদ্ধির বল, চরিত্রধর্ম্মের বল এবং সাধারণ ভাবে পার্থিব ধনবল বা জনবল, গুরুত্বের অনুপাতে যাহার যে যোগ্য স্থান, তাহা প্রতিনিধিসমিতিতে গ্রহণ করিতে পারে। এ সম্বন্ধে একটি ইঙ্গিত তিনি করিয়াছেন—it is best to do this in connection with organic parts of the nation, অর্থাৎ গুণকর্ম্মভেদে কোনও জাতির মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গের ন্যায় যে শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে, তাহার অনুসারে নির্ব্বাচনকেন্দ্র স্থির হইলেই উত্তম ব্যবস্থা হয়।

বাস্তবিক এক এক স্থানের কেবল জনসংখ্যার হিসাবে এক একটি নির্ব্বাচন কেন্দ্র গঠন করিলে এমনও ঘটিতে পারে যে একটিও সুশিক্ষিত যোগ্য লোক নির্ব্বাচিত হইবেনা। অন্যরূপ জটিল শ্রেণীবিভাগের কথা কিছু না ধরিলেও, একদিকে সুশিক্ষিত, আচার ব্যবহারে সুপরিমার্জ্জিত, উন্নতধী এবং উন্নতশক্তিমান্ উচ্চতর এক সম্প্রদায়, এবং অপরদিকে অজ্ঞ, উচ্চসংস্কারবর্জ্জিত, অবিবেচক, দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মভারগ্রহণে *অযোগ্য নিম্নতর প্রাকৃতজনগণ—(classes এবং masses)*—মোট এই দুই প্রকার শ্রেণীভেদ সকল দেশে সকল জাতির মধ্যেই রহিয়াছে। জনসংখ্যা ধরিলে classes অপেক্ষা masses অনেক বড় হইবে। বিভিন্ন নগরে,গ্রামে, জেলায় কি দেশের যে কোনও স্থানে কি কেন্দ্রেই হউক, অধিবাসীদের মধ্যে classes বা শিক্ষিত সম্প্রদায় অপেক্ষা masses অর্থাৎ প্রাকৃত জনসাধারণের সংখ্যাই বেশী। ইহার ব্যতিক্রম অতি কমই দেখা যায়। এক এক স্থানের অধিবাসীদের কেবল সংখ্যা হিসাবে যদি electorate বা নির্ব্বাচনকেন্দ্র ধার্য্য করা হয়, আর অশিক্ষিত জনগণ যদি জোট বাঁধিয়া মতলব করে যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাহাকেও নির্ব্বাচন করিবে না, তবে ইহাদের কাহারও পক্ষে জাতির প্রতিনিধি হইয়া জাতীয় পার্লামেণ্টে স্থান

গ্রহণ করিবার উপায় নাই। অনেকেই বলিবেন, এরূপ বড় ঘটে না। এখনও বড় ঘটে নাই, তার কারণ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নেতা ও নীত, অভিভাবক ও অভিভাবিত ভাবে একরূপ একটা সহযোগিতার সম্বন্ধ এখনও বর্ত্তমান আছে। কিন্তু এই ভাব ও সম্বন্ধ বর্ত্তমানযুগে সর্ব্বত্রই ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছে ; সহযোগিতার স্থানে পরস্পর একটা প্রতিযোগিতার ভাব দেখা দিতেছে। সংখ্যায় তোমরা বেশী, নিজেরাই দেশের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইতে পার, অল্পসংখ্যক বড় লোকের বা ভদ্রলোকের তাঁবেদারে কেন থাকিবে, তাহাদের কথামত কেন চলিবে, নিজেরাই তাহাদের উপরে বড় কর্ত্তা হইতে পার, দেশের সব সুখসম্পদ উচ্চপদের গৌরব জনবলে অধিকার করিয়া নিজেরাই ভোগ করিতে পার, ইত্যাদি সব আপাত প্রীতিকর কথা বলিয়া অনেকে আবার classএর বিরুদ্ধে massকে উত্তেজিতও করিতেছেন। ইহার ফলে এমন দিন অচিরে আসিতে পারে, যখন ইহারা নির্ব্বাচনের সময় উচ্চতর সম্প্রদায়ের কাহাকেও ভোট দিবে না, এবং প্রত্যেক নির্ব্বাচনকেন্দ্র হইতেই এমন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেন, যাহারা কেবলই massএর লোক, classএর কেহ নন। অর্থাৎ সমগ্র প্রতিনিধি সমিতি বা পার্লামেণ্ট এই সব অজ্ঞ অশিক্ষিত অযোগ্য লোকের একটি ব্যবস্থাপকসভায় পরিণত হইতে পারে। অতদূর না হইলেও, অন্ততঃ এমন একটা অবস্থা সহজেই ঘটিতে পারে, যে শিক্ষিত ও যোগ্য কেহ কেহ নির্ব্বাচিত হইতে পারিলেও, পারিতে পারেন কেবল massএর ভোটারদের মন যোগাইয়া, অসংযত ও অব্যবস্থিত চিত্তের খেয়ালে যখন তাহারা তাঁহাদের যাহা করিতে বলিবে, তাহাই করিতে প্রস্তুত হইয়া,—আর সর্ব্বদা তাঁহাদের এইদিকে লক্ষ রাখিয়াই চলিতে হইবে কিসে ইহারা খুসী থাকিবে, ভাবী নির্ব্বাচনে ইহাদের ভোট কেমন করিয়া পাইবেন। তাঁহাদের নিজেদের মধ্যেও আবার পরস্পরের মধ্যে ইহা লইয়া এইরূপ একটা কঠোর প্রতিযোগিতা দেখা দিতে পারে, কে কত বেশী ইহাদের মন যোগাইয়া চলিতে

পারেন, কে কত বেশী ইহাদের খুসী করিয়া আপন পক্ষে রাখিতে পারেন।

কত বড় অমঙ্গলকর যে এই সব ব্যাপার হইতে পারে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ব্লুণ্টস্‌লি সাহেবের আর একটি উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

"The populace gives the rein to its evil passions; it envies and oppresses the nobler and better minority, whose existence is a standing reproach and protest against its rule. The worst qualities of the demos come to the surpace—pride, arbitrary caprice, the love of frequent and useless change, brutality; the less it rules itself, the more oppressive is its rule of others. Parties are formed whose mutual hatred is stronger than patriotism, and whose mortal struggles distract and ruin their common country. The state is endangered by incessant changes, and brought to ruin by the want of stability. Thus the Athenian state was brilliant in its greatness; but that greatness was short-lived, and was followed by a long decadence from which Athens never recovered."

[The Theory of the State, Bluntschli, Book VI. Chap, XXI. P. 466]

প্রাচীন রোমক রিপাব্লিক (Republic) বা প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালীর পতনও অনেকটা এই কারণে ঘটে এবং সেই রিপাব্লিকের উপরে শেষে সম্রাট্‌দের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমে শেষে এইরূপ রীতি দাড়াইয়া যায় যে স্থানীয় ও প্রদেশিক শাসনকর্ত্তাদের নিয়োগ রোমীয় নাগরিকগণই করিত। প্রধান নায়কগণ অর্থবিতরণে, খাদ্যবিতরণে এবং জনগণের চিত্তবিনোদক ক্রীড়াকৌতুকের অনুষ্ঠানে

সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন, কিসে এই. সব নাগরিক তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে। ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে এই সব ব্যাপারে যথেষ্ট প্রতিযোগিতাও চলিত। এই সব উপায়ে যিনি যত বেশী জনগণের তুষ্টি বিধান করিতে পারিতেন, তাঁহারই পক্ষে এই সব উচ্চপদে নিয়োগ তত বেশী সহজ হইত। যতদিন শাসনকর্ত্তৃত্বের পদে তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন, আগামী নির্ব্বাচনের সময় নাগরিকগণের মনোরঞ্জনের জন্য অর্থ আহরণের দিকেই প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাদের চলিতে হইত। এত সামর্থ্য অধিক লোকের থাকে না। কাজেই শেষে অতি অল্প কয়েকজন অসাধারণ শক্তিমান্ পুরুষ দেশের মধ্যে প্রধান হইয়া উঠিলেন। ইঁহাদের এক এক জনের হাতে সৈন্যবলও যথেষ্ট থাকিত। অন্যান্য ক্ষুদ্রতর প্রতিদ্বন্দ্বী সকলকে দমন করিয়া ইঁহারাই শেষে দেশের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইলেন। তখন ইঁহাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিল। একজন শেষে সৈন্য বলে ও বহু কৌশলে অপর প্রতিদ্বন্দ্বীদের ধ্বংস করিয়া রাষ্ট্রশাসনের সকল ক্ষমতা নিজে আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। ইহাও ঘটিল একরূপ একটা নির্ব্বাচনের প্রহসনাভিনয়ে। এই শক্তিমান্ পুরুষের নাম ছিল আগষ্টাস্ সিজার। রোমীয় রিপ্লাবিক পূর্ব্বেই একরূপ অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার স্থানে সম্রাটের একাধিপত্য এই ভাবে ইনিই প্রথমে প্রতিষ্ঠিত করেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, প্রাচীন গ্রীসে ও রোমে ডাইরেক্ট ডিমক্রাসি (Direct Democracy) ছিল। প্রজারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহাদের উপরে শাসনব্যবস্থার ভার অর্পণ করিত না, নিজেরাই শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিয়া দিত। প্রাচীন direct ও আধুনিক representative ডিমক্রাসীতে বড় একটা পার্থক্যও এইখানে। Direct ডিমক্রাসীতে প্রজারা সকলে নগরের কোনও বৃহৎ সভাক্ষেত্রে সমবেত হইয়া সাক্ষাৎভাবে একেবারে শাসনকার্য্যের ভারই আপনাদের মনোমত ব্যক্তিদের হস্তে অর্পণ করে।

আর representative ডিমক্রাসীতে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রজারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আসিয়া আপনাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে, এবং এই সব প্রতিনিধিরা শাসনের ব্যবস্থা করেন। বড় বড় সব দেশে যে এখন representative ডিমক্রাসীর প্রবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার একটি প্রধান কারণও এই যে এরূপ কোনও দেশের সব প্রজা একস্থানে এক সময়ে সমবেত হইতে পারে না,—কেবল রাজধানী ও তাহার সন্নিকটবর্ত্তী প্রজারাই এই উচ্চ অধিকার ভোগ করিবার সুযোগ পায়। আরও একটি বড় সুবিধা ইহার এই যে এইরূপ বাছাই করা প্রতিনিধিরা সাধারণ প্রজাবর্গ অপেক্ষা বিজ্ঞতর ও যোগ্যতর লোক হইবেন, এইরূপ ভরসা করা যায়।

রোম তখন অতি বৃহৎ এক রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের হাতে ক্ষমতাও ছিল অপরিসীম। ইঁহাদের নিয়োগ এই ভাবে অজ্ঞ অবিবেচক ও দায়িত্বজ্ঞানবিহীন নাগরিক জনসাধারণের হাতে গিয়া পড়ায়, তাহার এইরূপ অপব্যবহার হইয়াছিল। Representative ডিমক্রাসীতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে এরূপ অনাচার ও ভোটাধিকারের অপপ্রয়োগ ঘটিবার সম্ভাবনা তেমন নাই। যাহা হয়, তাহাতে তেমন অনিষ্টও কিছু হইতে পারে না। কারণ শাসনকার্য্য যাঁহাদের হাতে পড়ে, তাঁহারা এইসব প্রতিনিধির মনোনীত লোক, সাক্ষাৎভাবে জনসাধারণের মনোনীত নহেন। কিন্তু Representative ডিমক্রাসীর অজ্ঞ ভোটারগণ সাক্ষাৎভাবে একেবারে শাসনকর্ত্তাদের মনোনীত না করুক, শাসনকর্ত্তাদেরও উপরে কর্ত্তা যাঁহারা, শাসন যাঁহাদের ব্যবস্থায় চলিবে, শাসনকর্ত্তারা যাঁহাদের নির্দ্দেশ মত, যাঁহাদের সমর্থনের বলে শাসন করিবেন, তাঁহাদের মনোনীত করিয়া দেয়। এ ক্ষমতাও বড় কম ক্ষমতা নয়। ইহারা যে লোকের দোষগুণ, যোগ্যতা অযোগ্যতা, ঠিক বিচার করিয়া, দেশের ভাল মন্দ কার হাতে কি হইতে পারে ঠিক বুঝিয়া, ভোট দিতে পারে না, একথার পুনরুক্তি আর নিষ্প্রয়োজন। হয় ইহারা উচ্চতর সম্প্রদায়ের

শক্তিমান্ ও ধনবান্ দলনায়কগণের হাতে গিয়া পড়িবে এবং তাঁহাদের বাছাই করা লোকদিগকে যন্ত্রের মত ভোট গণিয়া দিবে,—অথবা নিজেরাই দল বাঁধিয়া,কেবল নিজেদের সম্প্রদায়িক স্বার্থ দেখিয়া,এমন সব লোককে বেশী ভোটের বলে বাছিয়া দিবে, যাঁহারা জাতির মোট মঙ্গলের দিকে না চাহিয়া কেবল ইহাদের আপাতলোভনীয় সাময়িক স্বার্থ মাত্র দেখিবেন। আর যদি আত্মম্ভরিতা বশতঃ কেবল নিজেদের মধ্য হইতেই লোক ইহারা বাছিয়া দেয়, মেজরটী যদি এরূপ লোকই হয়, তবে যে রাষ্টীয় শক্তির কিরূপ আশ্রয় ও ধারকই তাহারা হইবে, সেকথা আর না বলিলেও চলে।

দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত সুব্যবস্থিত ও সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রশাসনের উপরে প্রত্যেক মানবসমষ্টিরই, কেবল বর্ত্তমান মঙ্গল নয়, ভবিষ্যতের মঙ্গলও, যে কতদূর নির্ভর করে, তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যকতা কিছু নাই। রাষ্ট্রাশ্রিত নেশনরূপ সমষ্টির ত কথাই নাই, রাষ্ট্রাতীত ধর্ম্মে আশ্রিত সমাজরূপ যে সব সমষ্টি, তাহাও রাষ্ট্রীয় সুশাসন ব্যতীত মঙ্গলে থাকিতে পারে না। *

* রাষ্ট্রশ্রিত 'নেশন'রূপ এবং রাষ্ট্রাতীত ধর্ম্মে আশ্রিত 'সমাজ'রূপ সমষ্টি— এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কি, পূর্ব্বে অনেক স্থলে তাহা বলা হইয়াছে। যে ধর্ম্ম এই সমাজের ধারক ও আশ্রয়, এই সমাজকে তার বিশিষ্ট স্বরূপতায় গড়িয়া তুলিয়াছে, ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহা রাষ্ট্রশক্তি বা রাষ্ট্রীয় সংহতির গুণ নহে, তাহার অতীত বা উপরের এক বস্তু। কিন্তু তাই বলিয়া এমনও হইতে পারে না যে রাষ্ট্রীয় শক্তির সহায়তা ব্যতীত কেবল সেই ধর্ম্মই কোনও সমাজকে মঙ্গলে ধরিয়া রাখিতে পারে। এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে স্বকীয় কোনও রাষ্ট্রশক্তি-ব্যতীতও সমাজের অস্তিত্ব বজায় থাকে এবং সমাজধর্ম্ম সমাজভুক্ত জনগণের বহু মঙ্গল সাধন করিতে পারে। ভারতের হিন্দুসমাজ ও মুসলমানসমাজ ইহার বড় দুইটি দৃষ্টান্ত। স্বকীয় রাষ্ট্রশক্তি হারাইয়াও হিন্দুসমাজ প্রায় ৭।৮ শত বৎসর কাল এবং মুসলমান সমাজ প্রায় দেড়শত বৎসর কাল বর্ত্তমান রহিয়াছে। রাষ্ট্রশক্তি পরকীয় হইলেও দুষ্টের দমনে সামাজিকবর্গের বহু স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করিয়া চলিতেছে। একেবারে অরাজক অবস্থায় তাহা সম্ভব হয় না।

এই সুশাসনের পক্ষে ইহা নিতান্ত প্রয়োজন যে দেশের রাষ্ট্রনীতি-বিশারদ যোগ্যতম ব্যক্তিগণ রাষ্ট্রশক্তির নায়ক ও ধারক হইয়া থাকিবেন, এবং সমগ্র জাতির বর্ত্তমান ও ভাবী মঙ্গল কিসে হইবে, কেবল সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া ধীরভাবে কেবল তাহারই কথা চিন্তা করিয়া, বিধিব্যবস্থাদির প্রণয়ন ও তাহার প্রয়োগ প্রভৃতি কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিবার অবসর পাইবেন।

স্বকীয় রাষ্ট্রশক্তি সমাজের যত মঙ্গল সাধন করিতে পারে, পরকীয় রাষ্ট্রশক্তি তাহা পারে না। কিন্তু অরাজক অবস্থা দীর্ঘকাল চলিলে সমাজ যেমন একেবারেই ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে, পরকীয় রাষ্ট্রশক্তির আশ্রয়ে অন্ততঃ তেমন একটা সর্ব্বনাশের আশঙ্কা থাকে না। এই পরকীয় রাষ্ট্রশক্তিও যত সুব্যবস্থিত হইবে, তাহার আশ্রয়ে সমাজজীবন তত বেশী স্বচ্ছন্দে চলিতে পারিবে। মুসলমান আমলে রাজশাসনে ঘন ঘন বহু বিপর্য্যয় উপস্থিত হইত, কোনও রাজাই সমাজ-রক্ষার উপযোগী সুব্যবস্থিত কোনও শাসনপদ্ধতি দীর্ঘকাল কোথাও বড় দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিতে পারেন নাই। কিন্তু এই অভাব পূরণ করিয়াছিল, আভ্যন্তরিক সামন্ত রাজগণের শাসন। রাষ্ট্রশাসন প্রাচীন ভারতে 'দণ্ড' নামে পরিচিত ছিল। সমাজধর্ম্ম রক্ষার পক্ষে এই দণ্ডের সার্থকতা হিন্দুসমাজের নায়কগণ স্বীকার করিয়াছেন।—মনুসংহিতায় এই ভাবে দণ্ড মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে:—

অস্যার্থে সর্ব্বভূতানাং গোপ্তারং ধর্ম্মমাত্মজম্।
ব্রহ্মতেজোময়ং দণ্ডমসৃজৎ পূর্ব্বমীশ্বরঃ॥

[মনু, ৭।১৪]

তস্য সর্ব্বাণি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
ভয়াদ্ভোগায় কল্পন্তে স্বধর্ম্মান্ন চলন্তি চ॥

[মনু, ৭।১৫]

স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ।

[মনু, ৭।১৭]

দণ্ডঃশাস্তি প্রজাঃ সর্ব্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি।
দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি দণ্ডং ধর্ম্মং বিদুর্বুধাঃ॥

[মনুঃ ৭।১৮]

বর্ত্তমান ডিমক্রাটিক শাসনে প্রতিনিধিনির্ব্বাচনের যে নীতি গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে এরূপ দূরদর্শী, ধীরবুদ্ধি ও রাষ্ট্রশক্তি-ধারণক্ষম নায়কগণের নির্ব্বাচন, দেশের মাথার মত মানুষ যাঁহারা দেশকে মঙ্গলের পথে পরিচালনা করিতে পারেন এরূপ ব্যক্তিবর্গের পক্ষে রাষ্ট্রশক্তির কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ, ক্রমেই দুরূহ হইয়া উঠিতেছে। যাঁহারা নির্ব্বাচিত হন, অতি অল্পকাল—কতিপয় বৎসর মাত্র—তাঁহারা এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। এই সময় টুকুও প্রতিদ্বন্দ্বিদের সঙ্গে অবিরত দলাদলির সংগ্রামে তাঁহাদিগকে ব্যাপৃত থাকিতে হয়,—আর প্রধানতঃ এই দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়, কিসে নির্ব্বাচকমণ্ডলী খুসী থাকিবে, কিসে আগামী নির্ব্বাচনে তাহাদের অনুগ্রহে বঞ্চিত না হইতে হয়। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল এই হয় যে শাসকবর্গকে সর্ব্বদাই শাসিত প্রজাদের মুখ চাহিয়া, তাহাদের খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়। সুশাসন ও শান্তির দায়িত্ব যে কত বড় দায়িত্ব, দায়িত্ববিহীন জনসাধারণকে যে সর্ব্বদা ইহাতে সন্তুষ্ট রাখা যায় না, ইহা শাসনকার্য্যের বাস্তব ভার যাহারা গ্রহণ করিয়াছেন, পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। কিন্তু বুঝিয়া কি করিবেন? পাছে পদভ্রষ্ট হন, তার জন্য ভয়ে ভয়ে তাঁহাদের থাকিতে হয়,—সুশাসনের জন্য শাসনদণ্ড যে ভাবে চালাইতে হয়,

অনুবাদ—"ইহার জন্য (অর্থাৎ রাজা যাহাতে দুষ্টের দমনে ও শিষ্টের পালনে প্রজাসকলকে রক্ষা করিতে পারেন, তার জন্য।) পূর্ব্বে ঈশ্বর ধর্ম্মস্বরূপ, আত্মজ, ব্রহ্মতেজোময় সর্ব্বপ্রাণীর রক্ষাকর্ত্তা দণ্ডকে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

"দণ্ডের ভয়েই চরাচর সমুদয় জগৎ স্ব স্ব ভোগে প্রতিষ্ঠিত আছে; কেহই স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইতে পারে না।"

"দণ্ডই রাজা, দণ্ডই পুরুষ (অর্থাৎ রাজশক্তি যোগে পুরুষবিধ বা personal entity); দণ্ডই রাজ্যের নেতা ও শাসনকর্ত্তা।"

"দণ্ড সমুদয় প্রজাকে শাসন করিয়া থাকেন; দণ্ডই তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন; সকলে নিদ্রিত হইলে একমাত্র দণ্ডই জাগ্রত থাকেন; পণ্ডিতেরা দণ্ডকেই ধর্ম্মের মূল বলিয়া জানেন।"

দেশের মঙ্গলে চালান উচিত, এই ভয়ে অনেক সময় তাহা তাঁহারা পারেন না।

আবার এক একটা জাতির অদূর বা দূর ভবিষ্যতের অনেক বড় ও স্থায়ী মঙ্গলের জন্য বর্ত্তমানের বহু সাময়িক স্বার্থকে উপেক্ষা করিতে হয়, বলি দিতেও হয়। অতি দূরদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহার প্রয়োজন বুঝিতে পারেন। সাধারণ লোকে সর্ব্বদা পারে না। এইরূপ কোনও লক্ষ্যসাধনের উদ্দেশ্যে কোনও নীতির প্রবর্ত্তন বা বিধির প্রণয়ন ইঁহারা করিতে চাহিলে, শাসনের কোনও প্রভুত্ব এইদিকে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিলে, অদূরদর্শী জনসাধারণ সাময়িক স্বার্থহানির আশঙ্কায় ইঁহাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিতে পারে। এরূপ অবস্থায় স্বভাবতঃই ইঁহারা এই সব ব্যাপারে হাত দিতেও ভরসা পান না।

Representative ডিমক্রাসীর শাসন কার্য্য সাধারণতঃ কি ভাবে চলে, তার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বুঝাইয়া বলিলে, এই অবস্থাটা সকলে আরও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

প্রজাদের নির্ব্বাচিত এই সব প্রতিনিধিদের যে সভা বা পার্লামেণ্ট, তাহার কাজ হইতেছে প্রধানতঃ বিধিব্যবস্থার প্রনয়ন বা আইন করা। এই জন্য এই সভাগুলিকে সাধারণতঃ Legislature বা ব্যবস্থাপক সভাও বলে। কিন্তু কেবল আইন করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেও চলে না। আইন অনুসারে যাহাতে শাসনকার্য্য পরিচালিত হয়, ইহাও এই সভাকে দেখিতে হয়। সুতরাং শাসনের উপরে একটা control বা আয়ত্তিও ইহাকে রাখিয়া চলিতে হয়। প্রতিনিধি সদস্যগণ সাধারণতঃ দুইটি বাঁধা দলের লোক হইয়া থাকেন। যে দলের যখন মেজরিটী হয়, সেই দলের নায়কগণই শাসনকার্য্যের ভার গ্রহণ করেন, নতুবা শাসনকার্য্য চালানই সম্ভব হয় না। কারণ প্রতিপক্ষ দল মেজরিটী হইলে প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহারা বাধা দেন, এবং বাধা দিয়া মাইনরিটী দলের শাসনকে অচল করিয়া ফেলা একটা রীতির মতই এখন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।—তাই এই মেজরিটী যতদিন যে দলের

নায়কবর্গ হাতে রাখিতে পারেন, ততদিনই শাসনকর্তৃত্ব তাঁহাদের হাতে থাকে। সুতরাং সর্ব্বদা তাঁহাদের এই চেষ্টায় মন রাখিতে হয়, কিসে এই মেজরিটীকে হাতে রাখিতে পারিবেন। আবার প্রতিপক্ষ মাইনরিটীরও সর্ব্বদা এই দিকেই লক্ষ্য থাকে, কেমন করিয়া আপনারা মেজরিটী হইয়া শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে পারেন। যতদিন এক একটি প্রতিনিধিসভার অস্তিত্ব থাকে, নায়কবর্গকে অনেক সময় এই দলাদলির লড়াই লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে হয়,—সকল মন সকল প্রাণ এই দিকেই রাখিতে হয়।

মেজরিটীর মতেই আইন হয়। কিন্তু আইন করিবার সময় বিষম একটা বাদবিতণ্ডা উপস্থিত হয়। কোনও মতে মেজরিটীকে পক্ষে রাখিয়া আইন পাশ করাইতে হইবে, ইহা ছাড়া, আইনটি ঠিক কিরূপ হইলে ভাল হয়, জাতির ভবিষ্যৎজীবনের উপরে এই আইনের ফলাফল গিয়া কিরূপ দাঁড়াইবে, এ সব কথা ভাবিবার অবসর কি তার মত ঠাণ্ডামাথাই কাহারও বড় থাকে না। কেবল প্রতিনিধিসভায় বা পার্লামেণ্টেই যে এই বাদবিতণ্ডা হয়, তাহা নয়। বড় কোনও গুরুবিষয়ক আইন প্রণয়নের সময়ে দেশের জনসাধারণের মধ্যেও তুমুল একটা বাদবিতণ্ডার ঝড় বহিতে থাকে। সংবাদপত্রসমূহ সবই কোনও না কোনও দলের মুখপাত্র, আবার বক্তা জননায়কগণও সকলে দলের লোক। প্রস্তাবিত আইনের মূলে যে নীতি রহিয়াছে, নিরপেক্ষভাবে তাহার তত্ত্ব বিশ্লেষণ, সত্যের ও ন্যায়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহার ভালমন্দের বিচার, কোনও পক্ষই বড় করেন না, করিতে পারেনও না।—এই উপলক্ষে কোন দল কি ভাবে প্রতিপক্ষকে অপদস্থ করিয়া, জনমতকে আপনার দিকে টানিয়া আনিবেন, সেই দিকেই সকলের মন থাকে। আত্মপ্রতিষ্ঠার মোহ এমনই ভাবে সকলের বুদ্ধিকে ও চিত্তকে অভিভূত করিয়া রাখে যে সত্যের ও ন্যায়ের মহিমা, দেশের স্থায়ী মঙ্গলের পথ, যে ইঁহাদের সকল বাদবিতণ্ডার

বাহিরে অন্যদিকে অবজ্ঞাত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, এ কথা কেহ চিন্তাও করেন না; অনুভবও কেহ বড় করিতে পারেন না। এই হাঙ্গামা হুজ্জতের গোলমালে, দেশব্যাপী একটা উত্তেজনার মধ্যে, কোনও মতে হয়ত মেজরিটীর ভোটের জোরে একটা আইন পাশ হইয়া গেল। ধীরভাবে বিবেচনা কি ভাল মন্দ বিচার করিয়া দেখিবার অবসর পাইলে, উভয় পক্ষই হয়ত বুঝিতে পারিতেন, আইনটি ঠিক ভাল হয় নাই এবং ইহার ক্রিয়ার ফলে, আজ না হউক কাল, দেশের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই বেশী হইবে।—অথবা দুই একটা ধারার এমন পরিবর্ত্তন করা যাইত, যাহাতে ইহার মন্দটা অনেক কমিত। ভাল যা আছে, তারও ভালর দিকটা অনেক বাড়িত।

বস্তুতঃ জাতির বহু মঙ্গলামঙ্গল এই সব বিধিব্যবস্থার বা আইনের উপরে নির্ভর করে। অনেক ভাবিয়া, কোন আইনের ক্রিয়া বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে কি ভাবে কি ফল প্রসব করিবে, অতি ধীরচিত্তে, নির্ম্মলদৃষ্টিতে, উন্নত বুদ্ধির বিচারে সব বুঝিয়া,—অনভিজ্ঞ ও মোহভ্রান্ত জনগণের আপাত তুষ্টিকর তাহা হইবে কিনা, এসব দিকে একেবারেই লক্ষ্য না রাখিয়া,—তবে এইরূপ সব বিধিব্যবস্থার প্রণয়ন করিতে হয় যাহার উপরে জাতীয় শক্তির স্থিতি ও উন্নতি নির্ভর করে। কিন্তু ডিমক্রাটিক শাসনে ব্যবস্থাপক প্রতিনিধিসভায় যোগ্য লোক সংখ্যায় যথেষ্ট নির্ব্বাচিত হইলেও, এ অবস্থায় তাহা যে কত দূর কঠিন তাঁহাদের পক্ষে হইয়া দাঁড়ায়, একথা সকলেই এখন বুঝিতে পারিবেন। কেবল আইনপ্রণয়ন কেন, এরূপ অদূরদর্শী অব্যবস্থিতচিত্ত 'জনমতে'র উপরে নির্ভরশীল যে প্রতিনিধি সভা, আবার সেই প্রতিনিধিসভার উপরে নির্ভরশীল যে শাসকসমিতি (বা Executive Council of Government)—তার পক্ষেও রাষ্ট্রশক্তিকে দেশে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ও যথোচিত প্রভাবশাল করিয়া রাখা বড় সহজসাধ্য ব্যাপার হয় না। শাসনের দায়িত্বের গুরুত্ব বা শক্তিস্থিতির প্রয়োজন অনেক সময়ে

প্রতিনিধিসভার সদস্যগণও বিশেষ উপলব্ধি করিতে পারেন না। কখনও জনমতকে আপনাদের পক্ষে অনুকূল রাখিবার উদ্দেশ্যে, কখনও প্রভুত্বের মোহে, কখনও বা দেশব্যাপী সাময়িক কোনও উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া, শাসকসমিতি বা Executive govermentএর প্রতিকার্য্যে এমন সব বাধা ইঁহারা উপস্থিত করেন, এমন ভাবে তাঁহাদের হাত পা বাঁধিয়া রাখিতে চান, যে তাঁহাদের পক্ষে দেশের শান্তিরক্ষা ও সুশাসন অনেক সময় প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে। *

সুব্যবস্থা প্রণয়ন ও সুশাসনের পক্ষে এই সব অবস্থা যতই প্রতিকুল হউক, উন্নত বুদ্ধিতে ও শক্তিতে দেশের যোগ্যতম ব্যক্তিগণ—একটা দেশের জাতীয় শক্তির প্রকৃত ধারক ও নায়ক যাঁহাদের বলা যাইতে পারে এরূপ সব লোক—যদি অধিক সংখ্যায় প্রতিনিধিসভার সদস্য

---

* "The frequent elections make the rulers dependent upon the ruled, and yet the latter have to obey during the interval. The freedom of the subjects is more securely founded than the authority of the government. The chief magistrates are regarded rather as the servants than heads of the republic. Although, according to Guizot, a state can only be ruled from above and not from below, the representative democracy tries to maintain as much as possible the appearance of being ruled from below."

"The weakness of authority shows itself least in the legislative bodies; in fact there is a danger that the representives may identify themselves altogether with the nation and may be carried away by the illusions of omnipotence. The government, on the other hand, has great difficulty in making its authority really strong and vigorous. The frequency of elections makes its position insecure and dependent upon the changeable opinions of the people."

[Theory of the State, Bluntschli, Book VI. Chap. XXIII. P. 482-3.]

হইতে পারেন, মন্দের মধ্যেও ভাল অনেকটা রক্ষা করিয়া তাঁহারা চলিতে পারেন, দেশের একেবারে বড় একটা সর্ব্বনাশ হইয়া সহজে যাইতে পারেনা। কঠিন কোনও সঙ্কটের সময় পরস্পর প্রতিযোগিতার সংগ্রাম স্থগিত রাখিয়া দলনায়কবর্গ সকলে একযোগে কাজ করিয়াও থাকেন। বিগত মহাযুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে ইহার বড় একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। অত বড় একটা যুদ্ধ চালাইতে হইবে, যাহার জয়পরাজয়ের উপরে জাতির অস্তিত্বই নির্ভর করিতেছে। তখন বিভিন্ন দলের শ্রেষ্ঠ নায়কবর্গ একটা সমবেত শাসকসমিতি (coalition ministry) গঠন করিয়া দেশরক্ষার ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু ডিমক্রাসীর স্বাভাবিক পরিণতি অধুনা যেরূপ দেখা যাইতেছে, demos বা প্রাকৃত জনগণ আপনাদের সংখ্যাধিক্যের বল বুঝিয়া যেভাবে রাষ্ট্রশক্তির উপরে আপনাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে, তাহাতে এরূপ এক অবস্থা অচিরেই আসিতে পারে, যে ইহাদেরই প্রকৃত প্রতিনিধি, ইহাদেরই আপনাদের লোক, প্রতিনিধিসভায় অতি বড় মেজরিটী হইয়া উঠিবে এবং রাষ্ট্রশক্তি একেবারে ইহাদেরই আয়ত্ত হইবে। ইংলণ্ডে সম্প্রতি যে নির্ব্বাচন হইয়া গেল, তাহাতে শ্রমিক দলের সদস্য (labour member) এত বেশী সংখ্যায় পার্লামেণ্টে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন যে প্রাচীন কন্‌সারভেটিব্ (Conservative) বা লিবারেল (Liberal) কোন দলই স্বতন্ত্র ভাবে মেজরিটী হইতে পারেন নাই। দুই দল মিলিতে না পারায় শ্রমিক দলই মন্ত্রিসভা (ministry) গঠন করিয়া সাম্রাজ্যের শাসনভার হাতে নিয়াছেন। তবে এই শ্রমিক দলের বর্ত্তমান সদস্যগণ শ্রমিকসমাজের লোক বড় নহেন। উচ্চতর সম্প্রদায়েরই বহু শক্তিমান্ ব্যক্তি, এমন কি অভিজাত সম্প্রদায়ের কেহ কেহও শ্রমিক দলের বর্ত্তমান অভ্যুদয় লক্ষ্য করিয়া এই দলে যোগ দিয়া ইহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। র‍্যাম্‌সে ম্যাকডোনাল্ড, কর্ণেল ওয়েজউড্ প্রমুখ কেহ কেহ অবশ্য অনেক পূর্ব্বহইতেই এই দলের হিতসাধনের উদ্দেশ্যে ইহাদের নায়কত্ব করিতেছিলেন।

সুতরাং শিক্ষাদীক্ষায় ও অন্যান্য বিষয়ে এই সব শ্রমিক সদস্যদের অযোগ্য লোক বলা যায় না। এবার এইরূপ হইল বটে। ভবিষ্যতে যদি শ্রমিক জনগণ—(সংখ্যায় ইহারা অনেক বেশী)—আরও দৃঢ়সংঘবদ্ধ হইয়া, উচ্চতর শ্রেণীর ব্যক্তি মাত্রকেই বর্জ্জন করিয়া কেবল নিজেদের সমাজভুক্ত লোকদের নির্ব্বাচিত করে, পার্লমেণ্টে যদি ইহারাই বড় হইয়া উঠে এবং উচ্চতর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা যদি সংখ্যায় একেবারে নগন্য হইয়া পড়েন, তবে কি হইবে ? এরূপ অবস্থার অর্থই—জাতির বিদ্যার, সভ্যতার ও উন্নত শক্তির সকল বলের পক্ষে, গৌরবের সকল অবলম্বনের পক্ষে, একেবারে সকল অধিকার হইতে বিচ্যুত হওয়া। দেশের ভাগ্য একেবারে 'মবে'র (mobএর) খেয়ালের হাতে গিয়া পড়া। কোনও জাতির উন্নতি ও গৌরবের কথা দূরে থাক্, অস্তিত্ব রক্ষাই এঅবস্থায় অসম্ভব হইয়া উঠে।

কেহ বলিতে পারেন, না না, অত বাড়াবাড়ি হইবে না। কেবলই নিজেদের মধ্য হইতে অযোগ্য লোককে ইহারা নির্ব্বাচিত করিবে না, তাহাদেরই হাতে দেশের শাসনভার সঁপিয়া দিবে না। কিন্তু দিতে তাহারা পারে। আর যদি দেয়, তবে প্রতিকারের কোনও পথ বর্ত্তমান ডিমক্রাসীর নীতিতে কেহ দেখাইতে পারেন কি ? সম্প্রতি শিক্ষিত ও পদস্থ উচ্চতর শ্রেণীর এবং অশিক্ষিত দীনহীন নিম্নতর শ্রেণীর (classes ও masses—Bourgeoisie ও Proletariatএর) মধ্যে যেরূপ তীব্র একটা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ইয়োরোপে দেখা দিয়াছে। masses বা Proletariat, classes বা Bourgeoisieকে যেরূপ দ্বেষ করে, আপনাদের সকল দুঃখ দুর্ভাগ্যের মূল বলিয়া মনে করে, ইহাদের বিরুদ্ধে আপনাদের স্বার্থের সংগ্রামে সর্ব্বদা যেরূপ ধীর বিবেচনা অপেক্ষা অধীর উত্তেজনার বশে চলে, তাহাতে এরূপ একটা অবস্থা আসিয়া দাঁড়ান কিছুই অসম্ভব নয়। ইয়োরোপীয় সমাজই এখন, প্রধানতঃ, Bourgeoisie ও Proletariat এই দুইটি সম্প্রদায়ে ভাগ হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা উভয়েই উভয়ের সহযোগী, মোট সামাজিক-

কর্ম্মক্ষেত্রে উভয়েরই যথাযোগ্য স্থান আছে,উভয়ের মঙ্গল এই সহযোগিতার উপরেই নির্ভর করে, মোট সমাজের মঙ্গলের পক্ষে উভয়ের প্রতি উভয়ের এই নির্ভরশীলতা অপরিহার্য্য, এই ভাবটাই ইয়োরোপ হইতে যেন দূর হইয়া যাইতেছে। Proletariat সম্প্রদায়ের লক্ষ্যই হইতেছে, কেমন করিয়া Bourgeoisie বা উচ্চতর সম্প্রদায়কে একেবারে লোপ করিয়া দিয়া বা চাপিয়া রাখিয়া নিজেরাই দেশে সর্ব্বেসর্ব্বা হইবে। সংখ্যায় কম হইলেও এই Bourgeoisie সম্প্রদায়েরও যে জাতির মধ্যে বড় একটা স্থান আছে,—জাতির বিদ্যা ও সভ্যতা, জাতির শক্তি, জাতির স্থায়ী মঙ্গল,—এক একটা জাতি যাহা লইয়া এই জগতে মাথা উচু করিয়া থাকিতে পারে, তার জাতীয় জীবনের বিশেষত্বকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে, মানবধর্ম্মের অভিব্যক্তির ধারায় নূতন যে একটা শক্তির উৎস খুলিয়া দিতে পারে, নিজেদের জাতীয় সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, তাহা যে কত বেশী এই সম্প্রদায়ের উপরে নির্ভর করিতেছে, এ সব কথাও তাহারা কখনও ভাবে না। এরূপ অবস্থায় ডিমক্রাটিক শাসনাধীন সকল দেশের রাষ্ট্রীয় শক্তি যে, আজ না হউক কাল, একেবারে ইহাদের আয়ত্ত হইয়া পড়িতে পারে, ইহা কি একেবারে অসম্ভব বলিয়া কেহ মনে করিতে পারেন? প্রতিনিধি সব একেবারে ইহারা নিজেরাই না হউক, অন্ততঃ এমন লোক হইবেই, যাহারা ইহাদেরই খেয়ালে চলিতে বাধ্য হইবে, ইহাদের সাময়িক স্বার্থকে মাত্র অতিরিক্ত পোষণ করিতে গিয়া জাতির স্থায়ী ও উচ্চতর স্বার্থকে বলি দিবে। রাষ্ট্রীয় শক্তির উপরে কর্ত্তৃত্বের পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার লোভে এই ভাবে ইহাদের মন যোগাইয়া চলিতে প্রস্তুত হইবেন এবং হইতেছেনও, এরূপ লোকের অভাব নাই। ইহাদিগের আপাত বশ্যতা স্বীকার করিয়া, উচ্চশক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া, সেই শক্তির প্রভাবে শেষে ইহাদেরই চাপিয়া রাখিয়া, নিজেরাই দেশের প্রভু হইয়া উঠিবেন, এরূপ অভিসন্ধিও যে কাহারও কাহারও নাই, এমন কথাও বলা যায় না।

এই প্রতিনিধিসভা তাহার মেজরিটীর ভোটে যেরূপ সব আইন করিবেন, তাহারই উপরে জাতীয় শক্তির স্থিতি, জাতীয় জীবনের মঙ্গল, সম্পূর্ণ না হউক, বহু পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। Demos বা প্রাকৃত জনগণের প্রতিনিধি ইঁহারা। Demos যদি জনাধিক্যবলে বাস্তবিকই তাহাদের নিজেদেরই এমন সব মনোমত লোক নির্ব্বাচিত করে, আর আইন যদি সব ইহাদের খেয়ালমত, ইহাদেরই সাম্প্রদায়িক সাময়িক স্বার্থেরদিকে চাহিয়া তাঁহারা করেন, তবে যে কিরূপ একটা অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইতে পারে, একবার ভাবিয়া দেখিলে মন্দ হয় না।

সর্ব্বত্রই জাতির উচ্চতর বিদ্যা, শিল্পকলা ও ধর্ম্মমূলক প্রতিষ্ঠানাদির রক্ষা ও উন্নতির কল্পে রাষ্ট্রশক্তি রাজকোষের বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। আবার প্রবল শত্রুর আক্রমন হইতে দেশরক্ষার জন্যও সুদৃঢ় ও সুনিয়ন্ত্রিত একটি সমরসজ্জার আয়োজন রাখিতে হয়। আধুনিক এই বৈজ্ঞানিক রণসঙ্কুল যুগে ইহার ব্যয়ও বড় কম নহে। প্রাকৃত জনসাধারণের মাথায় এমন একটা ভাব ঢুকিতে পারে, কেহ ঢুকাইয়া দিতেও পারে, যে এ সব অতি অপব্যয়, অকর্ম্মণ্য ও সৌখিন বা স্বার্থপর বুর্জোয়াজি সম্প্রদায়ের সখের বা স্বার্থের ব্যয়,—প্রজাসাধারণের প্রদত্ত করে নিজেরা ভোগবিলাসে প্রতিপালিত হইবেন, নিজেদের ক্ষমতা আরও দৃঢ় করিয়া নিবেন, তাহারই ফন্দী মাত্র। উচ্চবিদ্যার কি উচ্চতর শিল্প-কলার কদর তাহারা বড় করে না। জাতীয় সভ্যতার ও জাতীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন সার্থকতার পক্ষে এই সবের গুরুত্ব যে কি, তাহা অনেকেই বোঝে না। এ সবের উপকার কি আনন্দ লাভের অবসরও সাক্ষাৎভাবে তাহাদের বড় ঘটে না। দেশরক্ষার জন্য এত ব্যয়ের যে প্রয়োজন হইতে পারে, ইহাও হয়ত তাহারা অনুভব না করিতে পারে। সুতরাং যদি ইহারা দাবী করে, আর প্রতিনিধিরা সেই দাবীতে আইন করিয়া এসব ব্যয়বহুল ব্যাপার একেবারেই তুলিয়া দেন, অথবা এমন ভাবে পোষণের উপকরণ সব বন্ধ করেন, যাহাতে সব থাকা না থাকার সমান হইয়া পড়ে, আপনিই ভাঙ্গিয়া পড়ে, কি প্রতিকারের

পথ তাহার থাকিতে পারে ? খরচ অনেক বাঁচে, রাজকর অনেক তুলিয়া দেওয়া যায়, অথবা এই অর্থ জনসাধারণের মধ্যেও এমন ভাবে ব্যয় করা যায়, যাহাতে তাহাদের সুখস্বচ্ছন্দতা আর একটু বাড়িতে পারে, আরও কম খাটিয়া বেশী আরামে তাহারা থাকিতে পারে। করভার কমে, দরিদ্রের সুখস্বচ্ছন্দতা বাড়ে, কম খাটিয়া বেশী আরামে লোকে থাকিতে পারে, ইহা বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তার জন্য দেশের উচ্চ বিদ্যার ও উচ্চ শিল্পকলার অনুশীলন, ধর্ম্মস্থাপনা, দেশরক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি সব একেবারে এমন বলি দিবার প্রয়োজন নাও হইতে পারে। এ সবকে যথোচিত পোষণে স্থির রাখিয়াও দরিদ্রের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি অসম্ভব নয়, যদি না লোকে একেবারে অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া কেবল আরামেই থাকিতে চায়। কিন্তু গুরু দায়িত্বের বোধহীন অদূরদর্শী প্রাকৃত জনগণ যদি এতটা ক্ষমতা হাতে পায়, আপাত স্বার্থের লোভে এমন সব দাবী করিয়া এইরূপ সব আইন করাইয়া এমনই আলস্যে বা অল্পশ্রমে অনেক বেশী সুখে থাকিতে চাহিতে পারে। অচিরে যে জাতীয় শক্তির অবনতির সঙ্গে তাহাদেরও সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতে পারে,—যে লোভ তাহারা করিবে সেই লোভের সব ধনই যে দেশে ফুরাইয়া যাইবে, তার সকল উৎস শুষ্ক হইবে,—যে ক্ষমতার মোহে তারা আজ মত্ত, সেই ক্ষমতার মূল ভিত্তিই যে ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে,—এ সব হিসাব, এ সব বিবেচনা, একেবারেই হয়ত তাহাদের মাথায় ঢুকিবে না। ক্ষমতার মোহে, লোভের মোহে, মত্ত হইলে সুশিক্ষিত বুদ্ধিমানেরও এ সব বিবেচনা অনেক সময় থাকে না। তাহাদের যে থাকিবে, এরূপ ভরসা বিশেষ করা যায় কি ?

Rationalistic Individualismএর বড় কথাই এই যে সংহতিশক্তির অধিকার রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মাত্র,— ব্যক্তিগত স্বার্থসম্বন্ধীয় কোনও ব্যাপারে এই সংহতি শক্তি হস্তক্ষেপ করিবে না। কিন্তু যদি করে, কে তাহা ঠেকাইবে ? অধুনা যে প্রাকৃত জনসাধারণ সংখ্যাধিক্যের বলে শাসনযন্ত্রে তাহাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা

করিতেছে, তাহাদের একটা লক্ষ্য এই যে বড়কে বড় যোগ্যতার বলেও বড় হইতে দিবে না, ব্যষ্টিগত যে সব অধিকারের বলে তাহা সে করিতে পারে তাহাও লোপ করিতে হইবে। ব্যষ্টি মানবের বড় একটা অধিকার হইতেছে স্বোপার্জ্জিত সম্পদে সম্পূর্ণ স্বত্বের দাবী—যাকে বলা হয় rights of private property। নূতন যে সমাজের আদর্শ ইহারা প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, তার মধ্যে rights of private property বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, তাহা থাকিতে পারে না। কারণ ইহারা মনে করে, এই সব rights বা অধিকার হইতেই ধনী দরিদ্রের মধ্যে এত বড় বৈষম্য ঘটিয়াছে, সুখসৌভাগ্যের ও শক্তির সমতা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে না। এই rights of private property লোপ করিয়া ইহাদের বাঞ্ছিত সাম্যের অবস্থা রক্ষা করিতে হইলে, পারিবারিক জীবন, স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ, পিতাপুত্রের সম্বন্ধ, এখন সর্ব্বত্র যেরূপ ভাবে আছে, তাহা থাকিতে পারেনা। সুতরাং এসবও অন্য রকম করিয়া ফেলিতে হইবে, আইনের জোরে। *

এই সব ত চাহিতেছে, আরও যে কি চাহিবে,—তাহা কেহই বলিতে পারেন না। যদি তা ইহারা পারে ও করে, তবে যে ব্যষ্টির স্বাধীনতার জন্য এত কথা, এত হাঙ্গামা, তাহা যে কত দিকে কত ভাবে ক্ষুণ্ণ হইবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এ পর্য্যন্ত অন্যান্য মানবসমাজে বহু বৈষম্য ও বাধার মধ্যেও অতি দীনহীন ব্যষ্টিমানব যে টুকু স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে, তাহাও তার ভাগ্যে এই democracyর ফলে কিছু থাকিবে এমন সম্ভাবনা বড় কম।

ডিমক্রাসীর পক্ষে বড় দাবী একটা এই যে ইহা ছাড়া অন্য যে কোনও রকম শাসনই হউক, তাহা ব্যক্তি বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের শাসন হইবে। এরূপ অধিকার কোনও ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের থাকিতে পারে না। আমি মানুষ, অপরেও মানুষ; উভয়েরই

* এ সব Socialismএর কথা। socialismএর নীতি পদ্ধতি সম্বন্ধে পরে একপ্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

আমাদের মানবত্বের সকল অধিকারে সমান দাবী। সুতরাং আমার উপরে অন্য কাহারও কোন শাসন প্রযুক্ত হইতে পারে না, যদি না স্বেচ্ছায় তাহাকে আমি সেই অধিকার দিই, যদি না এই ভাবে আমারই প্রতিনিধি সে হয়। সকলের সমান এক এক ভোটে প্রতিনিধিনির্ব্বাচনের রীতির মূলে এই দাবীই রহিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন যে ভাবে হয় বা হইতে পারে, তাহাতে এই প্রতিনিধিদের দেশের সব লোক আপনাদের প্রতিনিধি বলিতে পারেন না। এই নির্ব্বাচন যদি নিখুঁত ন্যায়ের পথে বাস্তবিক সকলের মুক্ত ইচ্ছায় ও সুবিবেচনায়ও হয়, তবু এই সব প্রতিনিধিরা মাত্র মেজরিটীর প্রতিনিধি, দেশের সকলের প্রতিনিধি নহেন। তার পর শাসন পরিচালিত হয় আবার ইহাদের মেজরিটীর মতে, সকলের মতে নয়। তাহা হইতেও পারে না। আবার সাম্প্রদায়িক প্রভাবও ইহার মধ্যে অতি অধিক মাত্রায় রহিয়াছে। অধুনা ভোটার সব, যাঁহাদের Bourgeoisie বলা হয়, তাঁহাদেরই হাতে রহিয়াছে; তাঁহারাই শাসনের উপরে প্রভুত্ব করিতেছেন। অদূর ভবিষ্যতে Proletariat ভোটারবর্গ ইহাদের হাতছাড়া হইয়া পড়িতে পারে, এবং সে অবস্থায় Proletariat সম্প্রদায়ই শাসনের উপরে প্রভুত্ব করিবে,—Bourgeoisie সম্প্রদায় তলাইয়া যাইবেন। কোনও সমাজেই দেশের সব লোক সমান এক সামাজিক সম্প্রদায়ের লোক নহেন। এরূপ হইতেও পারে না। সুতরাং শাসন সম্বন্ধে প্রত্যেক মানবের পক্ষে এই যে অধিকারের দাবী, তাহা একেবারেই একটা কাল্পনিক দাবী মাত্র, বাস্তবিকপক্ষে এরূপ কোনও অধিকার চলে না। এই অধিকারকেই অন্য কথায় sovereignty of the people নামে ব্যক্ত করা হয়। কিন্তু জনে জনে প্রত্যেক লোকের এরূপ কোনও sovereignty চলিতে পারে না। চলিতে পারে, সকলের মিলিত একটা sovereignty। কিন্তু তাহার অর্থ কি? এইরূপ মিলিত অবস্থার স্বরূপ কি? প্রত্যেক লোককেই individually পৃথক্

পৃথক্‌ভাবে ধরিয়া সমান স্বার্থে তাহাদের একটা সাময়িক ও কৃত্রিম সমবায় মাত্রকে যদি এই মিলিত অবস্থার স্বরূপ বলিয়া আমরা মনে করিয়া নিই, তাহা হইলে তাহাদের sovereigntyর অধিকার যে ডিমক্রাটিক শাসনে বাস্তবপক্ষে কিরূপভাবে পরিচালিত হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। আর হইতে পারে, এক একটা people অর্থাৎ জাতি বা সমাজকে তার নৈসর্গিক সমগ্রতায় একটা organic whole রূপে ধরিয়া নিলে। এ অবস্থায়, দেহের মধ্যে মাথার ন্যায়, এক একটা সমষ্টিশরীরের বা Social Organismএর মধ্যে যে সব ব্যক্তিতে বা সম্প্রদায়ে তাহার শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি, শ্রেষ্ঠ শক্তি, শ্রেষ্ঠ চরিত্রবল (whatever is best and highest in a people) অভিব্যক্ত হইয়াছে, যাঁহারা ইহার জীবনধর্ম্মের মূল ধারক ও আশ্রয়, people এর পক্ষে peopleএর sovereignty তাঁহাদের মধ্যদিয়াই পরিচালিত হইতে পারে; রাজদণ্ড তাঁহারাই ধারণ করিতে পারেন। ইহার প্রকৃত অধিকারীও তাঁহারা।

কিন্তু Demosএর ভোট এইরূপ সব মাথার মত লোককে বাছিয়া দিতে পারে না। কিসে তবে পারে? কঠিন সমস্যার কথা সন্দেহ নাই; সিদ্ধান্তও সহজ নয়। তবে এইটুকু অন্ততঃ বলা যাইতে পারে, যে নৈসর্গিক ধর্ম্মে এক একটা জাতি বা সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই ধর্ম্মেই যদি তাহা স্থিত থাকে, সেই পথেই সহজভাবে চলিতে পারে, তবে সেই ধর্ম্মই যোগ্যতমের হাতে সমাজশাসনের নেতৃত্ব রাখিবে। আর প্রজার ভোটেই যদি তাহা স্থির করিতে হয়, ভোটের ব্যবস্থা করিতে হইবে, গুণের হিসাবে, কেবল সংখ্যার হিসাবে নয়। কিন্তু কে তাহা করিবে? গুণের ওজন কার কত, কার কিরূপ, তাহার একটা হিসাব নিকাশ করিয়া নেওয়াও ত যেমন তেমন একটা কথা নয়।

আর একটি কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন, ডিমক্রাটিক ছাড়া অন্য কোনওরূপ শাসন সর্ব্বসাধারণের হিতকর হয় না। ইহার একমাত্র

উত্তর পাশ্চাত্য জগতে বর্ত্তমান ডিমক্র্যাটিক শাসনের ফলে সর্ব্বসাধারণের হিত কতদূর ঘটিতেছে, তাহা হইতেই পাওয়া যাইবে। এই শাসনে শাসনের বর্ত্তমান প্রভু ধনিক Bourgeoisieর স্বার্থ যে শ্রমিক জন-সাধারণের স্বার্থকে কতদিকে কি ভাবে চাপিয়া রাখিতেছে, কি ভীষণ দুর্গতির অবস্থায় তাহাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, সে সব দিকে একবার চাহিয়া দেখিলে, একথা কেহই বলিতে পারিবেন না যে ইহা সকলের পক্ষে হিতকর হইয়াছে। ঊর্দ্ধসংখ্যায় মাত্র শতাব্দীকাল পাশ্চাত্য জগতে এই ডিমক্রাটিক শাসন চলিতেছে। ইতিমধ্যেই এ সম্বন্ধে এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, it has been weighed in the balance and found wanting *. শাসন যদি সুখেরই হইত, সকলের পক্ষে হিতকরই হইত, ইতিমধ্যেই সর্ব্বত্র ইহার বিরুদ্ধে Proletariat-বিদ্রোহ এমন করিয়া মাথা তুলিয়া উঠিত না; এই শাসনকে চূর্ণ করিয়া সমাজের উপরে Proletariat-শক্তিকেই প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিত না। Socialism, Anarchism, Syndicalism প্রভৃতি মতবাদীদের দল ডিমক্রাসীর সঙ্গে বর্ত্তমান সমাজকেই ভাঙ্গিয়া এমন সব নিতির উপরে নূতন করিয়া তাহাকে গড়িতে চাহিত না, যাহা নৈসর্গিক ধর্ম্মের একেবারে বিরোধী, যাহার উপরে কোনও সমাজ দাঁড়াইতে পারে না। †

তারপর তুলনা করিয়াও দেখিতে হইবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অন্যান্য জাতির মধ্যে অন্যরূপ যে সব শাসনপদ্ধতি ছিল, তাহাতে জনসাধারণ সুখসুবিধা যতটা ভোগ করিয়াছে, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য ডিমক্রাসীতে তাহা করিতেছে কি না। তুলনা করিয়া যদি দেখি, এখানেও দেখিব, বর্ত্তমান ডিমক্রাসীর অভাব ত্রুটি অনেক বেশী।

তারপর ডিমক্রাসীর বর্ত্তমান পরিণতির লক্ষ্য যেরূপ দেখা যাইতেছে, বহু আলোচনা তার করিয়াছি। তাহা হইতেও সকলে বুঝিতে

* The Old Testament, Daniel, 5—27.

† পরবর্ত্তী এক প্রবন্ধে এই সব কথার কিছু বিস্তৃত আলোচনা করিব।

পারিবেন, এক একটা মানব সমাজের ভাগ্য এই ডিমক্রাসীর হাতে সঁপিয়া দেওয়া যায় কি না।

পাশ্চাত্য কোনও দেশেই এরূপ অবাধ ডিমক্রাসীর হাতে এখন পর্য্যন্তও বাস্তবিক কোনও দেশের ভাগ্য সঁপিয়া দেওয়া হয় নাই। জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের একটি মাত্র সভার উপরেই আইন করিবার ভার বা শাসনের উপরে একাধিপত্যের অধিকার কোথাও নাই। এই সভা ব্যতীত আর একটি সভা আছে, যাকে সাধারণতঃ Second Chamber বা দ্বিতীয় সভা বলে। ইহার সদস্যগণ জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি নহেন। কোনও কোনও দেশে ইহা যেমন ইংলণ্ডের লর্ড সভা বা House of Lords—অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত। কোথাও কোথাও অন্য এমন ব্যবস্থা আছে, যাহাতে দেশের সুবিজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তিগণই ইহার সদস্য মনোনীত হইতে পাবেন। এই উভয় সভাব মত ছাড়া কোনও আইন হয় না। এই সভা জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিসভার উদ্দাম খেয়ালের গতিকে অনেকটা চাপিযা রাখিতে পারেন। তারপব সাধারণ প্রতিনিধিসভাবও একবারেব ভোটেই কোনও আইনেব পাণ্ডুলিপি সর্ব্বত্র পাশ হইযা যায় না। ইংলণ্ডে এই রীতি আছে, প্রত্যেকটি আইনেব পাণ্ডুলিপি কমন্স সভায় তিনবার আলোচনা কবিয়া পাশ করিতে হয়। তারপর তাহা লর্ডসভায় যায়।

এইরূপ নানা রকম checks বা safeguards ডিমক্রাসীব উপবে সব দেশেই আছে। আছে বলিযাই বড় কোনও বিভ্রাট এখনও উপস্থিত হইতেছে না। কিন্তু এই যে সব checks বা safeguards আছে, দ্বিতীয় একটি অভিজাত কিম্বা সুবিজ্ঞ ব্যক্তিদেব সভা যে সাধারণ প্রতিনিধি সভার সঙ্গে রহিয়াছে, এবং ব্যবস্থাপ্রণয়ন ও শাসনের উপরে তারও যে বড় একটা অধিকারের ভাগ রহিযাছে,—ইহা এই সত্যেরই সাক্ষ্য দিতেছে যে absolute and unrestricted democracy, একেবারে নিরপেক্ষ অবাধ গণতন্ত্রশাসন, কোথাও

প্রচলিত নাই,—এবং সেরূপ শাসন যে চলিতে পারে না, দেশের পক্ষে-হিতকর হয় না, ইহাও এই শাসনপদ্ধতি যাহাদের নিয়ন্তৃত্বে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাঁহারা বুঝিতেন। কিন্তু এই সব checks ও safeguards কত দিন আর চলিবে, বলা যায় না। জনসাধারণের প্রতিনিধিসভার শক্তি ও প্রতিপত্তি সর্ব্বত্রই বাড়িয়া উঠিতেছে, এবং দ্বিতীয় এই অভিজাত কিম্বা প্রবীণদের সভার অধিকার ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। সুতরাং এই সব সভাকে এবং আরও যত রকম শৃঙ্খলার বন্ধন আছে, সব একে বারে তুলিয়া দিয়া একমাত্র গণপ্রতিনিধির সভা সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া absolute ও unrestricted (নিরপেক্ষ ও অবাধ) ডিমক্রাসীর প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। Demosএর এরূপ লক্ষ্যও যে না আছে, তা বলা যায় না। তা যদি ঘটে, তবে যে সব অমঙ্গলের সম্ভাবনা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, তেমনই একটা অবস্থা সর্ব্বত্র দেখা দিবে। বিপ্লব তখন অবশ্যম্ভাবী। এই বিপ্লবে হয় শক্তিমান্ ব্যক্তিবর্গ আপনাদের জবরদস্তী শাসন দেশে প্রতিষ্ঠা করিবেন, না হয় এক একটা জাতি ও তার সভ্যতা একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

র‍্যাডিক্যালিজম ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজম

দশম শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত যে সমাজপদ্ধতি ইয়োরোপে প্রচলিত ছিল, তাহাতে মোটের উপর চারিটি শ্রেণী বিভাগ দেখা যাইত, (১) Clergy বা যাজকমণ্ডলী (২) Nobility বা অভিজাত ভূস্বামী সম্প্রদায় (৩) Bourgeoisie বুর্জ-ওয়াজি (বা নাগরিক ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও সমাবস্থাপন্ন স্বাধীন ক্ষেত্রস্বামিবর্গ) এবং Serfs and labourers (দরিদ্র ও প্রায়-দাসবৎ কৃষি-শ্রমজীবিসমূহ।)

ভারতীয় সমাজবিন্যাসে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি বর্ণের সহিত এই চারিটি শ্রেণীর বেশ তুলনা করা যাইতে পারে। শেষোক্ত এই শূদ্রবৎ সার্ফ ও মুজুর (serfs ও labourers) ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের অবস্থা মোটের উপর মন্দ ছিল না। রোমীয় চার্চ্চ বা যাজকমণ্ডলীর সঙ্গে রাজন্যবর্গের বিশেষ বিশেষ কতকগুলি ব্যাপারে অধিকার লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ কিছু হইত বটে, কিন্তু মোটের উপর প্রথম তিন সম্প্রদায় যার যার বৃত্তি ও সামাজিক অধিকারেরই মধ্যে একরূপ শান্তিতে বাস করিতেন। উচ্চ নীচ ক্রমে সামাজিক পদের পর্য্যায় যাহা ছিল, তাহার জন্য বিশেষ অসন্তোষ বা তাহা লঙ্ঘন করিয়া সমান পদ বা সমান অধিকার পাইবার জন্য একটা আগ্রহ বড় দেখা যাইত না। তবে সার্ফ বা শূদ্র সম্প্রদায় সময়ে সময়ে বড় পাড়িত হইত, এবং তার জন্য তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহও মধ্যে মধ্যে ঘটিত। যে চাপ উপরে ছিল, তাহাতে যে ক্লেশ তাহারা পাইত, তাহা প্রধানতঃ আর্থিক বা Economic। সামাজিক অবস্থাতেও অতি হীন তাহারা অবশ্য ছিল। দীনতার সঙ্গে এই হীনতা এমনই ভাবে সংসৃষ্ট ছিল যে, এই বিদ্রোহের ভাব হীনতার বিরুদ্ধেও মধ্যে মধ্যে প্রকাশ পাইত।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে একবার ইংলণ্ডে রায়ত বিদ্রোহ ঘটে। সেই বিদ্রোহের উত্তেজনার সময় রায়তরা একটি শ্লোক আবৃত্তি করিত ;

যথা—

"When Adam delved and Eve span,
Who was then a gentleman?"

ইহা হীনাবস্থায় অসন্তুষ্ট মানবের সম্ভ্রান্তবংশীয় উচ্চপদস্থের সঙ্গে সাম্যেরই দাবী।

এই সব শ্রেণী বা সম্প্রদায় বিভাগের সঙ্গে বৃত্তিরও অবশ্য একটা বিভাগ তখন ছিল। যাজকমণ্ডলী বিদ্যার-আলোচনা করিতেন, শিক্ষা দিতেন, এবং ধর্ম্ম অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করিতেন। উচ্চনীচ পদ গত একটা পর্য্যায় তাঁহাদের মধ্যে ছিল, ধর্ম্মকর একটা আদায় হইত,—পদানুসারে এই কর তাঁহারা ভোগ করিতেন। বাঁধা একটা পদ্ধতিই ইহার ছিল। উচ্চতর যাজকগণ অনেকে বড় বড় রাজকার্য্য করিতেন, কেহ কেহ জমিদারের মত ভূসম্পত্তিও শাসনরক্ষণ করিতেন। ক্ষাত্রসম্প্রদায় অর্থাৎ অভিজাত ভূস্বামিবর্গ যুদ্ধ করিতেন, রাজকার্য্য করিতেন, ভূমির উপস্বত্ব তাঁহাদের প্রধান জীবিকা ছিল। ব্যবসায়বাণিজ্য অর্থাৎ বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণ করা তাঁহারা গ্লানিকর মনে করিতেন, কেহ করিলে স্ব-সমাজে তাঁহার মর্য্যাদা থাকিত না। Bourgeoisie বা বৈশ্য-সম্প্রদায় ব্যবসায়বাণিজ্য করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ের হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ইহাদের মধ্যে গঠিত হয় এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় কঠোর কতকগুলি বিধির অনুবর্ত্তন করিয়া বাঁধা একটা শৃঙ্খলা মত কাজ কর্ম্ম করিত, নিজ নিজ ব্যবসায়ের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিত, বাহিরের প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষা করিত, এবং সম্প্রদায়টিকে মোটের উপর বলিষ্ঠ করিয়া তুলিত। যার যার সম্প্রদায়ের মধ্যেও বড় একটা সমযোগিতা ছিল,—সম্প্রদায়ভুক্ত দরিদ্র তাহাতে রক্ষা পাইত। ছোটতে বড়তে, মনিবে ভৃত্যে, পার্থক্য বড় দেখা যাইত না। প্রত্যেক ব্যবসায়ী গৃহস্থ নিজের গৃহে কাজ কর্ম্ম করিত, একা না পারিলে এপ্রেণ্টিস (apprentice) রাখিত। প্রচলিত কতকগুলি বিধি মানিয়া এই এপ্রেণ্টিসরা কাজ করিত, যথা সময়ে এই সব রীতি

অনুসারেই সেই সম্প্রদায়ভুক্ত স্বাধীন ব্যবসায়ী গৃহস্থ হইয়া বসিত। কারখানার মালিকে আর কুলিতে যে প্রভেদ, সেরূপ কোনও প্রভেদ সামাজিক কি ব্যবসায়িক ব্যবহারে এই সব মনিবে ও এপ্রেণ্টিসে কোথাও দেখা যাইত না। এই সব ব্যবসায়িক সম্প্রদায়গুলির নাম ছিল ইংরেজিতে guild। এই guild গুলি কতকটা আমাদের দেশের ব্যবসায়িক জাতিসমূহের মতই ছিল। ব্যবসায়ের সব কাজ কর্ম্ম, মনিবে এপ্রেণ্টিসে সকল সম্বন্ধ, প্রচলিত প্রথা বা Customs অনুসারেই নির্দ্দিষ্ট হইত।

সকলেই পরম্পরাগত প্রথা বা রীতি মানিয়া চলিত। স্বাধীনভাবে নিজ নিজ সুবিধার খাতিরে প্রথা লঙ্ঘন করিয়া কেহ কিছু করিত না, করিতে পারিতও না। কারণ সকল ব্যবসায়ই এইরূপ সব নিয়মাধীন সম্প্রদায়গত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রত্যেক ব্যবসায়ীকেই তার guild বা জাতির মধ্যে থাকিয়া তার সব রীতি নীতি মানিয়া চলিতে হইত।

সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়েও কোনরূপ প্রতিযোগিতা ছিল না। প্রতিযোগিতা যাহা কিছু ছিল, কোনও এক গিল্ডের গৃহস্থদের পরস্পরের মধ্যে,—তাহাতেও কোন গৃহস্থ একাই সেই গিল্ডের সকল ব্যবসায় অধিকার করিয়া ফেলিত না; অন্য গিল্ডের কোনও কর্ম্মে ত হস্তক্ষেপ করিবারই যো কাহারও ছিল না। ব্যবসায়িক নীতিপদ্ধতির এমনই জোর তখন ছিল।

যেমন ধরুন, কোনও নগরে কামারদের গিল্ড আছে, কুমারদের গিল্ড আছে, চামারদের গিল্ড আছে। বহু স্বাধীন গৃহস্থ এক এক গিল্ডের অন্তর্ভুক্ত। ধরুন, কামার গিল্ডের সকলেই যার যার বাড়ীতে কাজ কর্ম্ম করিবে,—সেই ভাবে সেই কাজে যতটুকু প্রতিযোগিতা পরস্পরের সঙ্গে চলে, তাই মাত্র তাহাদের ছিল। বিশেষ কোনও কামার গৃহস্থ—যতই ওস্তাদ সে হউক, এমন একটা কারখানা ফাঁদিয়া বসিতে পারিত না, যাহাতে অন্যান্য সব গৃহস্থের কাজকর্ম্ম একেবারে

অচল হইয়া পড়ে, আর তারা নিরুপায় হইয়া তার কারখানায় গিয়া মজুরী গ্রহণ করে। রীতিই এরূপ ছিল না, এমন কল্পনাও কাহারও মনে আসিত না, এমন প্রয়াসও কেহ করিত না,—করিলেও অন্যান্য সব গৃহস্থদের সমবেত প্রবল একটা সামাজিক বাধা তার এই অতি-লোভকে দমন করিয়া ফেলিত। মোটের উপর প্রত্যেক গিল্ডের গৃহস্থদের মধ্যে এমন একটা সামাজিক সহযোগিতার ভাব ছিল, যাহাতে আধুনিক এই cut-throat competitionএর আবির্ভাবই সম্ভব হইত না। এপ্রেণ্টিস বা শিক্ষানবীশরা নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসরের জন্য একটা এগ্রিমেণ্ট করিয়া কোনও না কোনও গৃহস্থের সঙ্গে কাজ আরম্ভ করিত। এগ্রিমেণ্টের সময় উত্তীর্ণ হইলে, গিল্ডের অন্যান্য গৃহস্থদের অনুমোদনে তারাও এক একজন স্বাধীন গৃহস্থ হইয়া বসিত। সুতরাং স্বাধীন গৃহস্থ শিল্পী ও তাহার এপ্রেণ্টিসদের মধ্যে সামাজিক পদমর্য্যাদার কোনও পার্থক্য ঘটিতে পারিত না। গিল্ডের মধ্যে এইরূপ ব্যবহার ছিল। বাহিরের সম্বন্ধেও, ধরুন, কামার গিল্ডের কোনও বিশেষ গৃহস্থ অথবা সমগ্র গিল্ড বা কামারসমাজ, কুমার কি চামার কি অন্য কোন সমাজের ব্যবসায়েও যাইত না, তাহাদের সামাজিক কোনও ব্যবহারের মধ্যেও হস্তক্ষেপ করিত না।

ছোট ছোট নগরে এই সব গৃহস্থ শিল্পীরা বাস করিত, স্বাধীন ও সচ্ছন্দ ভাবে নিজেদের কাজ কর্ম্ম করিত, যেমন নাকি আমাদের দেশে এখনও বহু শিল্পী জাতির মধ্যে দেখা যায়। সমাজবন্ধন ও সামাজিক ব্যবহারও তাহাদের মধ্যে এমন ছিল, যাহাতে মোটের উপর তাহারা বেশ সুখে শান্তিতেই জীবনযাপন করিত। স্বাধীন গৃহস্থ জীবনের যে আরাম বিরাম, যে স্বচ্ছন্দতা, সবই তারা বেশ ভোগ করিত। নিজ নিজ ব্যবসায়ের মধ্যে নিজের শ্রমে যে যাহা পাইতে পারে, তাহা পাইবার পক্ষে বিশেষ কোনও বাধা ছিল না। অভিজাত ভূস্বামী-সম্প্রদায় হইতে সামাজিক পদমর্য্যাদায় তাহারা নিম্নতর ছিল, উচ্চতর রাজকার্য্যাদিতে তাহারা বড় গৃহীত হইত না; কিন্তু তাহাদের স্বক্ষেত্রে

অর্থাৎ ব্যবসায়বাণিজ্যের মধ্যে তাহারাই ছিল সর্ব্বে সর্ব্বা। উচ্চতর রাষ্ট্রীয় অধিকারের বলে অভিজাত ভূস্বামী সম্প্রদায় তার মধ্যে কোনও স্থান নিতে চাহিতেন না। জীবনের বৃত্তিতে তাঁহারাও customs বা রীতি মানিয়া চলিতেন। জমিদারী ও রাজকর্ম্মই ছিল তাঁহাদের পুরুষপরম্পরাগত বৃত্তি। বাণিজ্যে লক্ষ্মী যতই 'বসতি' করুন, সে লক্ষ্মীর প্রসাদ ভোগে কোনও কামনা তাঁহাদের ছিল না।

তবে উদ্ধত ও দুর্দ্ধর্ষ ভূস্বামী অনেকে বাহুবলে তাঁহাদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ব্যবসায়িক সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে অন্য রূপ পীড়নে, অত্যধিক কর আদায়ে, নানারূপ ক্লেশ ঘটাইবার চেষ্টা অনেক স্থলে করিয়াছেন। কিন্তু অনেক দেশেই শেষে ব্যবসায়ীরা রাজার নিকট হইতে সনন্দ লইয়া নিজেদের আভ্যন্তরিক শাসনভার স্বতন্ত্রভাবে নিজেরা গ্রহণ করিয়াছিল। জমিদারীর সীমানার মধ্যে অবস্থিত হইলেও, ব্যবসায়িক নগরগুলিতে এক একটি স্বতন্ত্র শাসনক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যে নগরের ব্যবসায়িগণ যত অধিক এই স্বতন্ত্র শাসন লাভ করিত ও তাহা রক্ষা করিতে পারিত, ভূস্বামীদের পীড়ন হইতে ততই তারা অব্যাহতি পাইত। ভূস্বামীদের ক্ষমতা তখন এত প্রবল ছিল, রাজাকে এত বেশী তাঁহাদের বাধ্য হইয়া চলিতে হইত, যে নাগরিক ব্যবসায়িগণকে এই অধিকার সহজেই তাঁহারা দিতেন। ইহাদের নিকট এজন্য বিশেষ এক একটা কর বা সেলামীও রাজারা পাইতেন, আরও তাহাদের আনুগত্য লাভ করিতেন। প্রবল ভূস্বামীদের উপরে অনেক দেশেই রাজারা ইহাদের সহায়তায় আপনাদের প্রভুত্ব চালাইবার বেশ একটা সুযোগ পাইয়াছেন। অন্ততঃ ভূস্বামীদের শক্তি অনেকটা সংযত করিয়াও ইহাতে রাখিতে পারিয়াছেন।

এ সব বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে যাইবার অবকাশ এ প্রবন্ধে নাই। মোট যে বিষয়টি আমার আলোচ্য, তার পক্ষে তার প্রয়োজনও তেমন নাই। সাধারণভাবে এই কথাটি বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন, যে পূর্ব্বে ইয়োরোপে স্বাধীন গৃহস্থ ব্যবসায়িগণ

কি ভাবে বাস করিত, এবং মোটের উপর তাহারা সুখশান্তিতেই ছিল এবং স্বাধীনগৃহস্থ জীবনের স্বচ্ছন্দতাও বেশ ভোগ করিত। দশম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে এইরূপ সমাজবিন্যাস ও ব্যবসায়পদ্ধতি গড়িয়া উঠে।

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে ইয়োরোপের ব্যবসায় ক্ষেত্রে আমূল এক পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। পূর্ব্বের অবস্থা এমন ভাবেই ইহাতে বদলাইয়া গেল, যে এই পরিবর্ত্তনকে সাধারণতঃ Industrial Revolution বা 'ব্যবসায়িক যুগান্তর' এই নাম দেওয়া হয়। এক সময়ে বড় দুইটি কারণের সমবায়ে এই পরিবর্ত্তন ঘটে। একটি কারণ হইতেছে, বৃত্তি ও অধিকার ভেদ সম্বন্ধে প্রাচীন সংস্কারের পরিবর্ত্তন, নূতন সংস্কারের প্রভাবে লোকের প্রাচীন প্রথা সমূহের বর্জ্জন, এবং আগ্রহে নূতন নীতি ও নূতন আদর্শের অনুবর্ত্তন। সকলেই সমান, সকলেরই সকল *বিষয়ে সমান অধিকার, জীবনের বৃত্তি প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে যার যার* রুচি ও ইচ্ছামত বাছিয়া নিতে পারে, সাম্প্রদায়িক কোনওরূপ গতানুগতিক পন্থার অনুবর্ত্তন অনাবশ্যক, অনিষ্টকর, তথা স্বাধীনতার পরিপন্থী। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের উন্নতির জন্য যে কোনও উপায় অবলম্বন করিতে পারে, এবং ইহাতে অপরের স্বাধীন অধিকারের সীমা লঙ্ঘন না করিলে গবর্মেণ্টের আইন অথবা সামাজিক কোনও বিধি তাহাতে ন্যায়তঃ বাধা দিতে পারে না। কর্ম্মক্ষেত্রে স্বাধীন ভাবে ইচ্ছামত সকলেই সকলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া উন্নতি লাভের চেষ্টা করিবে। যার সঙ্গে যে কাজ করিবে, নিজের সুবিধা বুঝিয়া স্বেচ্ছায় তার চুক্তি করিয়া নিবে, কেবল প্রচলিত প্রথার অধীন হইয়া চলিবে না। ইহাতেই সকলের শক্তির সম্যক্ স্ফুরণ হইবে, দেশের ও জাতির সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ হইবে।

এই সব কথাই সকলের চিত্ত আকৃষ্ট করিল,—এইসব নীতিরই অনুসরণ করিতে সকলের মন প্রাণ উন্মুখ হইয়া উঠিল। ফরাসীদেশে যে সামাজিক বৈষম্য ও তার পীড়ন ঘটে, এই সব নীতির আবির্ভাব যে

প্রধানতঃ তাহার ফল ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দরিদ্র যাহারা দুঃখ পাইতেছিল,—বাঁধা গণ্ডির মধ্যেই চলিতে বাধ্য হইত, উচ্চতর কাহারও সঙ্গে সমান পদমর্য্যাদা, সমান অধিকার ভোগ করিবার সম্ভাবনা কিছু দেখিত না,—তারা ভাবিল, স্বাধীনভাবে নিজের বৃত্তি বাছিয়া নিতে পারিলে, উন্নতির জন্য সকলের সঙ্গে সমান সুযোগ পাইলে, সহজেই সে যত বড় হইতে পারে তা হইবে, কোনও দুঃখ তার আর থাকিবে না। কেন সে বাঁধা প্রথা মানিয়া চলিবে? নিজের সুবিধা বুঝিয়া স্বাধীনভাবে, যার সঙ্গে যে ব্যবসায়িক সম্বন্ধে তাকে আসিতে হয়, তাহা সে স্থির করিয়া নিবে। স্বাধীন মানবের সেই ত উন্নত অধিকার, মঙ্গলের পথ!

পূর্ব্বে ব্যবসায়বাণিজ্যাদি সম্বন্ধীয় সকল কর্ম্ম প্রধানতঃ পুরুষ পরম্পরাগত প্রথা বা customsএর অনুসরণ করিয়া চলিত।—এখন মূল নীতি হইল—স্বাধীন চুক্তি বা free contract। আগে লোকের বৃত্তি ছিল সম্প্রদায়গত, এখন সম্প্রদায়ের সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া লোকে স্বেচ্ছাবৃত্তিক হইতে আরম্ভ করিল। এই বৃত্তি নির্ব্বাচনে, নির্ব্বাচিত বৃত্তিগ্রহণ করিয়া নিজ নিজ উন্নতিসাধনে, অবাধ একটা প্রতিযোগিতা করিয়াই অবশ্য সকলে সকলের সঙ্গে চলিবে। যার যে ক্ষমতা আছে, অবাধে তার বলে যে কোনও ব্যবসায়ে যে যতদূর উন্নতিলাভ করিতে পারে তা করিবে। Freedom of labour, freedom of contract, freedom of competition—ইহাই হইল এখন সকল ব্যবসায়ের মূল কথা।

সময়মত বড় কতকগুলি সুযোগও উপস্থিত হইল। এই সব সুযোগের অবস্থাকে এই পরিবর্ত্তনের দ্বিতীয় কারণ বলা যাইতে পারে। পূর্ব্ব হইতেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইয়োরোপীয় জাতি সমূহের বাণিজ্য, উপনিবেশ ও অধিকার বিস্তৃত হইতেছিল,—এই সময় আরও তার প্রসার ঘটে। ইহাতে প্রচুর ধনাগম ইয়োরোপে হয়। এই সব বাণিজ্যে যাঁহারা ব্যাপৃত ছিলেন, বৈদেশিক অধিকারসমূহের শাসনকার্য্যে

যাঁহারা নিযুক্ত হইতেন, এই ধন অবশ্য তাঁহাদের হাতে গিয়াই জমিত। ব্যবসায়ে এই ধন নিয়োগ করিবার জন্য নূতন নূতন ব্যবসায়ের পথও তাঁহারা খুঁজিতে থাকেন। দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া বিদেশে তাহা রপ্তানি করিতে পারিলে প্রচুর লাভ হয়। এদিকেও তাঁহারা মনোযোগী হইলেন। গৃহে গৃহে গৃহস্থ শিল্পীরা এত দিন যাহা উৎপাদন করিত, দেশের অভাব তাহাতে কুলাইয়া যাইত, রপ্তানী বড় বেশী হইত না। রপ্তানির জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে ইঁহারা স্থানে স্থানে কারখানা স্থাপন করিয়া গৃহস্থ শিল্পীদের বেতন দিয়া তাহাতে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। নানারকম কলের আবিষ্কারও এই সময়ে আরম্ভ হয়। ক্রমে ষ্টিম এঞ্জিনের সাহায্যে কল চালাইবারও উপায় হইল।

এই সব কলে অল্প শ্রমে অল্প সময়ে অনেক দ্রব্য উৎপন্ন হয়; কলের কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার টাকারও অভাব নাই। নানা স্থানে কলের কারখানা বসিয়া গেল, দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠিতেও লাগিল। দরিদ্র স্বাধীন গৃহস্থশিল্পী যারা ছিল, ঘরে তাহারা হাতে যাহা করিতে পারিত, কলে প্রস্তুত দ্রব্যের মত সুলভ তাহা হইত না, তেমন প্রচুরও তাহা জন্মিত না। সুতরাং তাহাদের ব্যবসায় ক্রমে অচল হইয়া পড়িল। নিরুপায় হইয়া ক্রমে তাহারা গিয়া কারখানার মুজুর হইতে লাগিল। বিদেশে অধিকার বিস্তারের সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রেরও প্রসার হইতেছিল। যত জিনিষ প্রস্তুত হয় ততই কাটে, যত কাটে তত টাকা বাড়ে। যেমন টাকা বাড়ে, কলের কারখানাও বাড়ে। বিজ্ঞানচর্চ্চার উন্নতির সঙ্গে কলেরও আরও উন্নতি হইতে লাগিল,—নূতন নূতন আরও কত রকম কল হইল। শিল্পের কাজ হাত ছাড়িয়া কলের অধিকারে যত দূর আসিতে পারে, তা আসিল। রেল হইল, ষ্টীমার হইল, টেলিগ্রাফ হইল, ব্যাঙ্কের পর ব্যাঙ্ক হইতে লাগিল, দেশ বিদেশে ব্যবসায়বাণিজ্য হুহু করিয়া বাড়িয়া উঠিল। মহাজনেরা সব বড় বড় কারখানা, বড় বড় বাণিজ্যের মালিক হইয়া

উঠিলেন। ব্যবসায়ের ধরণই বদলাইয়া গেল। অতি বেশী মূলধন যে সব ক্ষেত্রে প্রয়োজন, সেখানে joint-stock বা যৌথ মূলধনের কারবার আরম্ভ হইল। তার পদ্ধতি স্বতন্ত্র। বড় বড় মালেকান কারবারগুলিও সেই পদ্ধতি ধরিল। এই সব বড় বড় ব্যবসায়বাণিজ্য নূতন পদ্ধতিতে বড় বড় আফিস করিয়া তদনুরূপ লোকজন রাখিয়া চালাইতে যেরূপ যোগ্যতার প্রয়োজন, দরিদ্র প্রাকৃত জনসাধারণের মধ্যে সেরূপ যোগ্যতাও বড় দেখা যায় না। প্রাচীন গৃহশিল্পজীবীরা প্রধানতঃ এই শ্রেণীরই লোক ছিল। স্বাধীনভাবে কোনরূপ ব্যবসায় করা ইহাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হইল। ধনী মালিকদের মুজুরী ব্যতীত গত্যন্তর কিছু আর তাহাদের রহিল না।

এই পরিবর্ত্তনের পূর্ব্ব হইতেই বণিক ও শিল্পী গৃহস্থদের মধ্যে একটা ভেদ ও বিরোধের ভাব দেখা দিয়াছিল। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে, 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।' কৃষিকর্ম্মকে এখানে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদনের সাধারণ একটা নাম বলিয়াই ধরিয়া নিতে হইবে। কৃষিতে হউক, কি শিল্পে হউক, গৃহস্থ নিজের গৃহে নিজের ও পরিজনবর্গের শ্রমে যাহাই উৎপাদন করিতে পারুক, তাহাতে প্রভূত ধনাগম সাধারণতঃ তার হয় না। কিন্তু বণিক যারা, যেখানে যাহা সুলভে মিলে তাই কিনিয়া দূরে যেখানে তাহা মিলে না, সেখানে নিয়া অধিক দরে বিক্রয় করিতে পারে, তাদের লাভ অনেক বেশী হয়। যত বেশী লাভ হয়, মূলধন বাড়ে, তত আরও সস্তায় বেশী মাল কিনিয়া মজুত করিয়া রাখিয়া আরও বেশী বিক্রয় করিবার সুযোগ করিয়া নিতে তারা পারে, এবং ক্রমেই অধিকতর সম্পন্ন হইয়া উঠে। সম্পদবৃদ্ধির সঙ্গে তাদের পদমর্য্যাদা বাড়ে, ক্ষমতা যোগ্যতা বাড়ে। দেশবিদেশে গমনাগমনে নানাবিষয়ে অভিজ্ঞতা বাড়ে, সন্তানসন্ততিগণের উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা তারা করিতে পারে। ক্রমে আরও উন্নত ও শক্তিমান্ হইয়া উঠে। এই জন্য সর্ব্বত্রই প্রায় দেখা যায়, সাধারণ কৃষক ও শিল্পীগৃহস্থদের অপেক্ষা বণিকদের অবস্থা

উন্নত। তেমন সুযোগ উপস্থিত হইলে, বাণিজ্যের প্রসার তেমন ঘটিলে, ইহারা কৃষক ও শিল্পীগৃহস্থদের অনেক নীচে ফেলিয়া অনেক উপরে গিয়া নিজেরা উঠে।

দেশবিদেশে সমুদ্রযাত্রা, নূতন নূতন অনেক দেশের আবিষ্কার, সেই সব দেশে উপনিবেশ ও অধিকারস্থাপন এবং বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কারণে ষোড়শ শতাব্দী হইতেই ইয়োরোপে বৈদেশিক বাণিজ্যের বিশেষ প্রসার আরম্ভ হয়। অনেক দেশের বহু ধনরত্ন, বহু স্বর্ণরৌপ্যাদি মূল্যবান্ ধাতু, ধাতুর খনি, নানাউপায়ে ইয়োরোপীয় বণিক্‌গণের মধ্যে যাহারা সুযোগ্য ও উদ্যমশীল, তাহাদের হস্তগত হয়। ফলে ইঁহারা সম্পদে, পদমর্য্যাদায় ও সর্ব্ববিধ ক্ষমতায় অনেক উপরে গিয়া উঠিলেন। নগরে নগরে ইঁহারাই প্রধান হইলেন; শিল্পকারখানাও সব ইঁহারাই প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। ধনবলে আবিষ্কৃত কলসমূহ ইঁহাদেরই হাতে গিয়া পড়িল। বড় বড় ধূমকল (steam engine) ছোট গৃহস্থেরা বাড়ীতে বাড়ীতে বসাইয়া বড় এক একটা কারখানা কিছু আর করিতে পারে না। আবার ঘরে ঘরে হাতে কাজ করিয়াও বড় কলকারখানার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া চলিতে পারে না। সুতরাং যার যার স্বাধীন বৃত্তি ছাড়িয়া *কারখানার মুজুরী ছাড়া তারা আর কিই বা করিতে পারে?*

এই সব কল কারখানার প্রতিষ্ঠা এবং তার জন্য বহু জনসমাগম যে পুরাতন নগরগুলিতেই কেবল হইত তা নয়, নূতন নূতন স্থানেও হইত। যেখানে হইত, সেইখানেই বড় এক একটা নগর হইয়া উঠিত। পুরাতন নগরগুলিরও আকার একেবারে বদলাইয়া গেল। নূতন সব নগরে নূতন করিয়া ত হইতেই পারে না, পুরাতন নগরগুলিতেও স্বাধীন গৃহস্থ শিল্পীদের গৃহবাস সব উঠিয়া গেল। কারখানার বাড়ীঘরেই নগর ছাইয়া পড়িল। কারখানার সঙ্গে কুলীব্যারাকও হইল, মুজুরীরা সপরিবারে এই সব ব্যারাকে গিয়া আশ্রয় নিল। গৃহস্থ শিল্পব্যবসায়েও কেবল বয়স্ক পুরুষরাই কাজ করে না; নারীরা, বালক বালিকারা,

সকলেই অবসর মত যার যার সামর্থ্য মত ছোটখাট অনেক কাজে পুরুষদের সাহায্য করে। সকলেই সাধ্যমত কাজ করে, তাই সংসার চলিয়া যায়। নতুবা কেবল বয়স্ক পুরুষরাই সব কাজ করিয়া উঠিতে পারে না, আর তাহাতে সংসারও চলে না। এদেশে গৃহস্থ শিল্প-ব্যবসায় এখনও বহু পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। ইহাদের কাজকর্ম্মের রীতি যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, গৃহকর্ম্মের অবসরে নারীরা এবং ক্রীড়ার অবসরে বালকবালিকারাও কি পরিমাণ ও কত রকম সাহায্য ব্যবসায়ের কার্য্যে করিয়া থাকে।

ঘরে যদি সকলেরই কাজের দরকার হয়, কারখানায়ই বা কেবল বয়স্ক পুরুষদের মুজুরীতে চলিবে কেন? বস্তুতঃ তা চলিত না। ব্যারাক-বাসী মুজুররা সপরিবারেই কারখানার কাজে নিযুক্ত হইত। প্রতিদিন হয়ত ১০ ঘণ্টা ১২ ঘণ্টা করিয়া কারখানা চলিত। যতক্ষণ চলিত, স্ত্রীপুরুষ, বালকবালিকা, সকলকেই কাজ করিতে হইত। গৃহস্থ শিল্পব্যবসায়ে নারীরা স্বামীপুত্রের ব্যবসায়ে সাহায্য করে, বালকবালিকারা পিতাভ্রাতার কাজে খাটে। মুজুরীর রুটিন ইহার মধ্যে কিছু নাই, নির্ম্মম চুক্তির নিয়মেও বাঁধা কেহ থাকে না। রন্ধনাদি গৃহকর্ম্ম, সন্তানপালন প্রভৃতি গৃহস্থ নারীদের সকল কর্ত্তব্য সব নির্ব্বাহ করিয়া অবসরকালে তারা এই সব কাজে হাত দেয়। গৃহস্থ জীবনের সুখস্বচ্ছন্দতার ব্যাঘাত তাহাতে বড় হয় না। কিন্তু কারখানার কুলী ব্যারাকে গৃহস্থালী চলে না, গৃহধর্ম্ম বলিয়াও কিছু থাকিতে পারে না। বাঁধা দুই এক ঘণ্টা ছুটির সময় কোনও মতে দুটি আহারের যোগাড় করিয়া মাত্র নারীরা নিতে পারে। ৭।৮ বৎসর হইলেই বালকবালিকারা কারখানার কাজে নিযুক্ত হইত। কিন্তু কাজ করিতে পারে না এমন ছোট ছোট শিশু যারা, তাদের লালন পালন জননীদের পক্ষে একেবারেই সম্ভব হইত না। বৃদ্ধা স্ত্রীলোক দুই চারিজন করিয়া থাকিত; মায়েরা কাজে যাইবার সময় শিশুদের তাদের কারও কাছে ফেলিয়া যাইত। শতাধিক অসহায়

শিশুও হয়ত এইরূপ এক একটি কড়া বুড়ীর হাতে থাকিত। সে যে কি যত্নই তাহাদের করিত, তাহা আর না বলিলেও চলে।

মানুষ যতই দরিদ্র হউক, নিজের কুটীরে তার স্বাধীন গৃহস্থজীবন, নিজের গৃহে থাকিয়া খাটিয়া খাওয়া, সেই এক রকম,—আর ব্যারাকের এই কুলীর জীবন, এই এক রকম। এই ধরণে এই সব ব্যবসায়ের প্রসার যত বাড়িবে. যত বড় বড় কারখানা, বড় বড় ফার্ম্ম (firm) প্রতিষ্ঠিত হইবে, যতই দেশের সকল ব্যবসায় এই সব কারখানার আর ফার্ম্মের আয়ত্ত হইবে, ততই দরিদ্র জনসাধারণের স্বাধীন গৃহস্থ জীবন লুপ্ত হইবে, ব্যারাকবাসী কুলীপরিবারে তারা পরিণত হইবে। লেখা পড়া যারা কম জানে, গতরেই কেবল খাটিতে পারে, তারা হইবে কুলী বা দৈহিক মজুর। আর দরিদ্র ভদ্রসন্তান যারা কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছে, তারা হইবে কলমপেষা কেরাণী মজুর। মজুরীর হার উভয়েরই এত অল্প যে, তাহাতে গৃহস্থজীবন, নিজ নিজ গৃহে সপরিবারে বসবাস, কাহারও পক্ষেই সম্ভব হইতে পারে না। কুলীদের মত কেরাণীদেরও ব্যারাকবাস অবলম্বন করিতে হয়। অজ্ঞ অশিক্ষিত কুলীদের অপেক্ষা কিছু শিক্ষাপ্রাপ্ত ও ভদ্রোচিত সংস্কারে উন্নতবুদ্ধি কেরাণীদের হিতাহিত বিবেচনা কিছু বেশী, তাই তারা বিবাহের দায়িত্ব সহজে গ্রহণ করিতে চায় না। অধুনা ইয়োরোপে অবিবাহিত বহু নরনারী এইরূপ কেরাণীর কাজে বা বড় বড় দোকানের কেনাবেচার কাজে যৎসামান্য জীবিকা অর্জ্জন করে। ব্যারাকের মত বাড়ীতে ইহারা বাস করে। যারা বিবাহ করে, স্ত্রীপুরুষ উভয়েই কাজ করে, আর ব্যারাকেই ঘর ভাড়া করিয়া থাকে। ইয়োরোপে, বিশেষ ভাবে আমেরিকায়, এত বড় বড় ব্যারাক এখন হইয়াছে, যে শত শত—কখনও সহস্রাধিক—পরিবারও এক একটি ব্যারাকে থাকে। ছোট বড় সব ফ্লাটগুলি ভাগ করিয়া রাস্তার মত সব বারান্দা বা corridor তার মধ্যে আছে। সেখানে পুলিশ পাহারা মোতায়েন থাকে। পারিবারিক আবরু বা প্রাইভেসী (privacy) ইহাদের একেবারেই সম্ভব

হয় না। সুখশান্তি যাহা হয়, তাহা আর না বলিলেও চলে। দরিদ্রের যেখানে এই গতি—আর দরিদ্রই সব দেশে বেশী,—সেখানে জনসাধারণের প্রকৃত সুখ যে কি আছে, তাহা বেশী আর না বলিলেও চলে।

আধুনিক শিল্পব্যবসায়ে এবং বাণিজ্যে যে সব দেশ বড় হইয়া উঠিবে, সেখানে দরিদ্র জনসাধারণের ইহা ছাড়া গতি নাই। তবে কৃষিব্যবসায়ে সর্ব্বত্র ঠিক এইরূপ হয় না। ইউরোপে কোনও কোনও অঞ্চলে ছোট ছোট জমির মালিকরূপে ছোট ছোট গৃহস্থ কৃষকরা চাষ বাস করে। ইহাদের অবস্থা মন্দ বলা যায় না। কিন্তু যেখানে জমির মালিক এই গৃহস্থেরা নয়, খাজনা দিয়া জমিদারের জমি অস্থায়ী ভাবে জমা নিয়া চাষ করে, আর জমিদার ইচ্ছামত খাজনার হার বাড়াইয়া নিতে পারেন, সেখানে গৃহস্থ হইলেও কৃষকদের দুঃখ বড় ঘোচে না। ইংলণ্ডে এবং অন্য কোনও কোনও স্থানে চাষবাসের রীতি আবার আলাদা। চাষের যোগ্য জমি বড় বড় ফার্ম্মে (farmএ) বা কৃষি ক্ষেত্রে ভাগ করা থাকে। ফার্ম্মার (বা যোতদার) নামক অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থগণ জমিদারের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট খাজনার চুক্তিতে এই সব ফার্ম্ম জমা নেয়, মজুর রাখিয়া চাষ বাসের কাজ করায়। এইরূপ প্রত্যেক ফার্ম্মেও চাষী মজুরদের ব্যারাক আছে,—সেইখানে তারা থাকে। প্রবন্ধের প্রারম্ভে যে সার্ফ (serf) সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তারাই কালে এই কৃষিমজুরে পরিণত হইয়াছে। কতক গ্রাম ছাড়িয়া নগরে গিয়া কারখানার মজুর হইয়াছে; যারা রহিয়া গিয়াছিল, তারাই এখানকার কৃষি মজুর। তারপর শিল্পে ও বাণিজ্যে যত বৃহৎমাত্রায় ব্যবসায় করা যায়, সাধারণ কৃষিতে তা হয় না। তাই কৃষিব্যবসায় বড় বড় মহাজনদের হাতে গিয়া একেবারে পড়ে নাই। তবে আমেরিকায়, আফ্রিকায়, এবং ভারতেও নানা স্থানে, চা, তুলা, কাফি প্রভৃতি এমন অনেক কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়, যার জন্য বড় বড় ফার্ম্ম করিয়া কুলীর দ্বারা কাজ করান সুবিধা হয়। এই সব

স্থানে, এই সব কৃষি ব্যবসায়ের মধ্যে কুলীর আমদানী যথেষ্ট হইতেছে, কুলীদের ব্যারাক জীবনও বেশ দেখা দিতেছে। সকলেই জানেন, ভারত হইতে বহু কুলী এই সব অঞ্চলে চুক্তিবদ্ধ হইয়া যায়,—তাদের জীবনের দারুণ দুর্গতির কথাও সকলে শুনিয়া থাকেন। শ্বেত দেশে শ্বেতাঙ্গ কুলীর ব্যারাক-জীবনই সুখের নয়। শ্বেতাঙ্গের ফার্ম্মে কালো কুলির যে কি গতি হইতে পারে, তাহা কি আর বলিতে হইবে ?

দরিদ্র যে স্বাধীন ভাবে কোনও বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে না, তাকে মুজুরী বা চাকুরী নিয়া অন্যের অধীনে কাজ করিতেই হইবে। এরূপ মুজুর বা চাকর চিরদিনই মানব-সমাজে আছে। মুজুরীর হার বা চাকুরীর বেতন কম হইলে দুঃখ-ক্লেশও তাহাদের পাইতে হয়। কিন্তু আধুনিক ব্যবসায়বাণিজ্যের রীতিতে ইহাদের সংখ্যা বড় বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। দরিদ্র প্রায় সকলেই এখন মুজুরী করিতে বাধ্য হইতেছে। পূর্ব্বে কোন্ মজুরীতে কে কি পাইবে, তারও একটা বাঁধা রীতি ছিল। সে সব রীতি এখন উঠিয়া গিয়াছে। কাজের পাওনা স্থির হয় স্বাধীন চুক্তিতে,—কোন পক্ষ কি পাইবে, তাহা স্থির হয় demand ও supplyএর—চাহিদার ও যোগানের—কড়া নিয়মে। আমার টাকা আছে, কাজ করাইব, লোক চাই। তোমার টাকা নাই, কাজ করিতে আসিয়াছ। আমি দেখিব, কত কম দিয়া আমি পারি। তুমিও দেখিতে পার কত বেশী তুমি নিতে পার। অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় মুজুরী বা labourও একটা বেচাকেনার জিনিশ হইয়াছে। সে সবের দর যেমন demand ও supply বা চাহিদা ও যোগানের অনুপাতে স্থির হইয়া থাকে, মুজুরীর দামও তাই হইবে। কাজে আমার যত লোক চাই, তায় চেয়ে অনেক বেশী লোক যদি তোমরা কাজ নিতে আইস, তোমাদের কাজের দাম বা মুজুরীর হার স্বাভাবিক নিয়মেই কম হইবে। তোমাদের চলে না ? তা আমার কি ? ব্যবসায়ের সব চুক্তিতে 'fair field and no favour'. তোমরা পার, বেশী

নেও। দুঃখ পাও, যদি পারি, দয়া যদি হয়, দানখয়রাৎ কিছু কখনও করিতে পারি। সে হইল আলাদা কথা। কিন্তু মুজুরীর হার কেন তার জন্য বেশী করিবা দিব? ইচ্ছা হয়, পোষায়,—আইস, কাজ কর। না পোষায়, আর যেখানে খুসী যাও। দেখ, বেশী কোথাও পাও কি না।

কলকারখানা সব যখন প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল,—গৃহস্থেরা যখন নিরুপায় হইযা কলেব মুজুরী নিতে আসিল, স্বাধীন চুক্তি বা free contract নিয়ম এই demand ও supplyএর নিয়মেই হইত। দুর্ভাগ্যক্রমে ইয়োরোপে সর্ব্বত্রই প্রায় demand এর তুলনায় মুজুরের supply অনেক বেশী অর্থাৎ কাজে যত লোক লাগে, তার চেয়ে অনেক বেশী লোক কাজের প্রার্থী হইয়া আসে। Contract নামে free বটে,—কিন্তু এক পক্ষ একেবারে নিরুপায়, আজ কিছু না পাইলে তার একেবারে অনাহারে থাকিতে হয়,—অপর পক্ষের সেরূপ দায় কিছু নাই। এ অবস্থায় দুর্ব্বল পক্ষ প্রবলের সঙ্গে ঠকিয়াই contract কবিতে বাধ্য হয়। অল্প বেতনে কাজ নিলে তবু একবেলা আধপেটাও সে খাইতে পায়। কিন্তু না নিলে, বেতন যাহা হয় কিছু না পাইলে, তাকে একেবারেই উপবাসী থাকিতে হয়। সুতরাং অগত্যা একবেলার আধপেটা অন্নেরও সংস্থান তখন সে করিয়া নেয়, আর সেই রকমই একটা contract করে। অতি প্রবলে আর অতি দুর্ব্বলে free contract এইরূপই হইয়া থাকে।

তখনকার প্রচলিত নীতি অনুসারে যে কোনও ব্যবসায়ে অবাধ অধিকার সকলেরই হইয়াছিল। আমার শক্তি আছে, ধন আছে, অমুক ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভ হইতে পারে, কেন সে ব্যবসায় আমি অবলম্বন করিব না? অন্য যারা সেই ব্যবসায় করিতেছে, তাদের ক্ষতি হইবে? হউক, আমার কি? তাদের ব্যবসায় ত আমি লাঠি মারিয়া ভাঙ্গিয়া দিতেছি না। আমার টাকার জোরে উন্নত প্রণালীতে সেই ব্যবসায় আমি করিব। অল্প ব্যয়ে, অল্প শ্রমে, বহু দ্রব্য উৎপন্ন

হইবে। দ্রব্য সুলভ হইবে, দেশ বিদেশে চালান যাইবে, বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, দেশে ধনাগম হইবে, আরও কতও নূতন নূতন ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা হইবে। এ সব ত উন্নতির কথা, দেশের মঙ্গলের কথা! পুরাতন ছোট ব্যবসায়ীদের ক্ষতি যদি হয়, সে আর কতটুকু ক্ষতি? তাদের দ্বারা দেশের ব্যবসায়ের উন্নতি, দেশের ধনবৃদ্ধি, এ সব ত তেমন কিছুই হইতেছে না। আর তারা পারে, আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া আমারই মত কি আমার চেয়েও ভাল ব্যবসায়ই করুক না? *সে অধিকার ত তাদের আছেই।*

হাঁ, অধিকার আছে—আইনে। কিন্তু আইন ত দুর্ব্বলকে প্রবলের সঙ্গে প্রতিযোগিতার শক্তি কিছু দিতে পারে না? প্রবল জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল বৃত্তিতে অবাধ অধিকার পাইলে, দুর্ব্বলের সাধ্য আছে কোথাও মাথা তুলিয়া তার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইতে পারে? এ অবস্থায় তার সব কাজে সমান অধিকার আছে, অবাধ প্রতিযোগিতা করিয়া সে উন্নতি লাভ করিতে পারে, এ সব কথা বলা তাকে বড় নিষ্ঠুর বিদ্রূপ করা বই আর কিছুই নহে। এমন হইলে যা ঘটে, ইয়োরোপে তাই ঘটিয়াছে,—ধনী মহাজনগণ ক্রমে সকল ব্যবসায় এমন করিয়া দখল করিয়া ফেলিয়াছেন, যে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল দরিদ্র জনসাধারণ সকল স্বাধীনতা হারাইয়া, ইহাদের মুজুরী নিতে বাধ্য হইয়াছে। হাজার যোগ্যতা হাজার প্রতিভা থাকিলেও এই মুজুরী বই তাহাদের আর গতি নাই।

এই মুজুরীতে তাহারা কত খাটিয়া কি পাইবে, তাও নির্দ্ধারিত হইবে, স্বাধীন চুক্তিতে বা free contractএ। তাহাতে তাহাদের ভাগ্য যে কিরূপ হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি।

Freedom of labour, freedom of competition, free contract—ব্যবসায়ে ও জীবনের বৃত্তিনির্ব্বাচনে ব্যষ্টি মানবের স্বাধীনতার পূর্ণতা যতদূর হইতে পারে, তা এই কয়টি কথাতেই বেশ সূচিত হইতেছে!—এই স্বাধীনতার নীতি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যখন

অনুসৃত হইল,—[illegible] মনে করিয়াছিলেন, এই অধিকার [illegible] পৃথিবীতে মানবের সুখস্বচ্ছন্দতা বহু[illegible] হইবে। কিন্তু ফলে দেখা গেল এই! ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিই যে ইহা! আর কি হইতে পারে? পৃথিবীর [illegible] সব ভোগ্য এক স্থানে সঞ্চিত করিয়া রাখ,—সবল দুর্ব্বল, সাবালক নাবালক, সুস্থ রুগ্ন, সকলকে বল, ঐ ভোগ্যে তোমাদের সকলের সমান অধিকার আছে। কারও কোনও বাধা নাই; যে যা পার, নেও, ভোগ কর। তখন সবল, সাবালক ও সুস্থ যাহারা, দুর্ব্বল, নাবালক ও রুগ্নকে ঠেলিয়া পিছনে ফেলিয়া সব গিয়া তারাই কাড়াকাড়ি করিয়া নিবে। দুর্ব্বলের, নাবালকের কি রুগ্নের ভাগ্যে কি মিলিবে? ভোগ্য বহিয়া ঘরে নিতে কি তাহা ভোগ করিতে ইহাদের সাহায্য যেটুকু নিতে হয়, প্রবলেরা তাই মাত্র নিবে; তাতে যৎসামান্য যা দিতে হয়, তাই মাত্র দুর্ব্বলকে দিবে। মানব সমাজেরও মোটের উপর এই অবস্থা। সেখানে সবল আছে দুর্ব্বল আছে, সুস্থ আছে রুগ্ন আছে, সাবালক আছে নাবালক আছে। প্রবল যারা, তাদের অত্যধিক লোভ ও স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিয়া রাখিতে হইবে। ধন যাহাতে আসে, জীবিকা যাহাতে নির্ব্বাহ হয়, অর্থাৎ জীবনের ব্যবসায় বা বৃত্তির ক্ষেত্রে, সকলেরই ইচ্ছামত, সাধ্যমত ও প্রয়োজনমত একটু নড়িবার চড়িবার অবসর রাখিতে হইবে। 'Free competition and equal opportunity for all,' 'Fair field and no favour'—এই সব নীতি প্রবলের হাতেই এত অধিক সুযোগ দিয়া দেয়। যাহাতে তাহারা দুর্ব্বলকে একেবারে কোণঠাসা করিয়া ফেলিয়া সব নিজেরা দখল করিয়া রাখিতে পারে। এমন নীতি সুনীতি, সমীচিন নীতি, মঙ্গলের নীতি, কখনও হইতে পারে না। কিন্তু সেই সুনীতি, সমীচীন নীতি ও মঙ্গলের নীতি—যাহাতে দুর্ব্বল একেবারে প্রবলের আর্থিক দাসে পরিণত না হইয়া যথাশক্তি স্বাধীনতা ও স্বচ্ছন্দতা কিছু ভোগ করিতে পারে, কে তার প্রবর্ত্তন করিবে? কার এ অধিকার আছে? সমস্যা ত এইখানে।

এই অবস্থার সমর্থনে এক অজুহাতে কেহ কেহ এই দেখাইয়া থাকেন, শক্তিমানের হাতে সব ব্যবসায় গিয়া ব্যবসায়ের বিপুল উন্নতি এখন হইয়াছে। দেশবিদেশে ইয়োরোপের বাণিজ্য ছড়াইয়া পড়িয়াছে, *দেশবিদেশের ধন ইয়োরোপেই সব পুঞ্জীভূত হইতেছে।*

ঠিক। দেশ বিদেশে যার ধন তার না থাকিয়া সব এক ইয়োরোপে গিয়া জমিতেছে। ইহা যদি পৃথিবীর পক্ষে মঙ্গলের অবস্থাই হয়, তবু ইয়োরোপে ব্যবসায়বাণিজ্যের প্রসারে এই আর্থিক উন্নতি কারা ভোগ করিতেছে? ধনী মহাজনগণ মাত্র, দরিদ্র জনসাধারণ নয়। বরং ধনী মহাজনগণের প্রভুত্ব উত্তরোত্তর এই ধনবৃদ্ধিতে আরও বাড়িতেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে এই সব নূতন নীতির প্রবর্ত্তনে এই ব্যবসায়িক যুগান্তর ইয়োরোপে আরম্ভ হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের মধ্যেই দরিদ্র জনসাধারণ অর্থাৎ মুজুরসম্প্রদায় দুর্গতির চরমসীমায় গিয়া উপস্থিত হইল। প্রত্যহ ১০ ঘণ্টা ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অবিরত কারখানায় খাটিয়া অথবা অন্যরূপ মুজুরী নিয়া, স্ত্রী পুরুষ মুজুররা যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহাতে পুরাপেট অন্ন তাহাদের জুটিত না, দারুণ শীতে দেহ রক্ষার বস্ত্র তারা পাইত না, ব্যারাকের আলোক-বিহীন অতি ছোট ছোট ঘরে কোনও মতে এক একটা পরিবার বাস করিত। বাস করিত না পশুশালের মত রুদ্ধ খোয়ারে থাকিত! দারুণ দারিদ্র্য, অশেষ ক্লেশ, শিশুদের প্রতিপালনও জনকজননীরা করিতে পারিত না! মরিয়া বাঁচিয়া কোনও মতে যারা বড় হইয়া উঠিত, তাদেরও নিয়তি একমাত্র এই কুলীর জীবন! সুখ কিছু নাই, সুখের কিছু আশাও নাই, অবসর সময় স্ত্রী পুরুষ সকলে মদ খাইয়া দুঃখ ভুলিয়া থাকিতে চাহিত! আর যত দুর্নীতি এই অবস্থায় মানব চরিত্রে ঘটিতে পারে, তাও বাকী বড় থাকিত না। দুঃখের দুর্দ্দশায় আর অবনতির চরমে দরিদ্র মজুরের জীবন তখন গিয়া নামিয়াছিল।

এই সময়ে অর্থনীতি বা বৃত্তিশাস্ত্র যাঁহারা আলোচনা করিতেন,

তাঁহারা দরিদ্রের এই দুঃখ যে না বুঝিতেন, তা নয়। কিন্তু তাঁহাদের মত এই ছিল যে, ব্যবসায়ক্ষেত্রে সকল সম্বন্ধ স্বাভাবিক নিয়মে—মজুরী সম্বন্ধে demand ও supplyএর নিয়মে যেমন—এইরূপ সব স্বাভাবিক নিয়মেই স্থির হওয়া সঙ্গত। গবর্মেণ্ট এই সব দুঃখ প্রতিকারের চেষ্টায় ব্যবসায়ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিলে ব্যবসায়ের স্বাভাবিক গতি ও পরিণতি ব্যাহত হইবে। মানবের স্বাধীনতা যেমন স্বাভাবিক, ব্যবসায়ক্ষেত্রে এই সব দুঃখও তেমনই স্বাভাবিক নিয়মেরই অবশ্যম্ভাবী ফল। আপাততঃ যে সব কারণে, যে সব নীতির ক্রিয়ায় দরিদ্র জনসাধারণের জীবনে এই সব দুঃখ দেখা দিয়াছে,—তাহা বেশী দিন থাকিবে না, এই সব স্বাভাবিক নীতির ক্রিয়াতেই যথাসময়ে ইহার প্রতিকার যত দূর হইতে পারে তা হইবে। গবর্মেণ্ট ইহার মধ্যে হস্তক্ষেপ করিলে, কৃত্রিম আইনে স্বাভাবিক নীতির ক্রিয়াকে বাধা দিতে চেষ্টা করিলে, ফল মোটের উপর মন্দ বই ভাল হইবে না। ব্যবসায়ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নীতি সমূহের ক্রিয়াই অবাধে চলিতে থাকুক, পরিণামে তাহাতেই মঙ্গল বেশী হইবে। 'Let well alone' ফরাসী ভাষার কথায় 'laissez faire' অর্থাৎ অবাধে আপনা হইতেই যাহা হইবে তাহাই ভাল,—খুব জোরে এই নীতির প্রচার তাঁহারা করিতেন। নীতির নামই হইল, 'doctrine or principle of laissez faire'. ইঁহারা যে সব যুক্তি দেখাইয়া laissez faire নীতির সমর্থন করিতেন—তার আলোচনার মধ্যে যাইবার আবশ্যকতা আমাদের নাই। কারণ ইহা চলিতে পারে না। লোকের দুঃখ যে ইহাতে বাড়ে বই কমে না, এই মতই এখন সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে এবং এই নীতি ভুল বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের বাহিরে জীবনের আর সকল ক্ষেত্রে মানব সম্পূর্ণ স্বাধীন, স্বাধীন বিচারবুদ্ধিতে আপনার ভাল মন্দ বুঝিয়া স্বাধীন ভাবে সকল বিষয়ে চলিবার অধিকার তার আছে, এবং এই অধিকার অব্যাহত থাকিলেই সকলের উভয়ের মঙ্গল হইবে, এই যে নীতিসূত্র তখন গৃহীত হইয়াছিল,

doctrine of laissez faire ব্যবসায়ক্ষেত্রে তাহারই একটা বিশিষ্ট প্রকাশ।—গবমেণ্টও বহুদিন পর্য্যন্ত এই মতের অনুবর্ত্তন করিয়া চলিয়াছেন, প্রতিকারের কোনও চেষ্টা করেন নাই।

মহাজন মালিকরা সবই একেবারে স্বার্থান্ধ ও নির্ম্মম ছিলেন, মুজুরদের ভালর দিকে একেবারেই কেহ চাহিতেন না, একথা বলিলে অন্যায় বলা হয়,—মানব চরিত্রের উপরে বড় একটা কলঙ্ক আরোপ করা হয়। কোনও দেশের কোনও সম্প্রদায় সকলেই অতি লোভী ও নিষ্ঠুর, সুযোগ বুঝিয়া দুর্ব্বলকে পিষিয়া কড়ায় গণ্ডায় কেবলই পাওনা আদায় করে, কাহাকেও ছাড়িয়া কিছু দেয় না, এরূপ বড় দেখা যায় না। এমন মালিকও ছিলেন, যাঁহারা অধীন মুজুরদের প্রতি সস্নেহ ব্যবহার করিতেন, তাহাদের দুঃখে সহানুভূতি দেখাইতেন, তাহারা একটু ভাল ভাবে থাকিয়া ক্রমে ভাল কাজ শিখিয়া বেশী বেতন পাইতে পারে, তার জন্যও চেষ্টা করিতেন। আবার মুজুর ভাল হইলে, ভাল *কাজ করিতে পারিলে, উৎপাদন বেশী* হইবে, কারবারে লাভ বেশী আসিবে, এই লাভের দরুণ মুজুরীর হারও কিছু বাড়ান যাইতে পারে। কেহ কেহ মুজুরদিগকে কারবারের মোট লাভের একটা অংশও ভাগ করিয়া দিতেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, এরূপ সহৃদয় উন্নতচেতা মালিক বড় অধিক ছিলেন না। আর মোটের উপর মুজুরসম্প্রদায়ই এত হীন অবস্থায় গিয়া পড়িয়াছিল, সামাজিক ভাবে পস্পরের সঙ্গে তাদের এমনই একটা সংস্রব ও সম্বন্ধ ছিল, যে স্থান বা কারখানা বিশেষের দুই চারি দল মুজুরের অপেক্ষাকৃত একটু উন্নত অবস্থা অনেক সময় স্থায়ী হইত না, তার প্রভাব অন্যান্য মুজুর দলের উপরেও বড় কিছু দেখা যাইত না। আর যাহাই এই সব সহৃদয় মালিকরা করুন, করুণাপ্রণোদিত হইয়াই করিতেন। ব্যবসায়ের নীতিপদ্ধতিতে এমন কিছু ব্যবস্থা ছিল না যাহাতে স্বাধীন ভাবে কেহ কোনও রূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আপনাদের বলেই সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে।

পূর্ব্বে গৃহস্থশিল্পী আর তাদের এপ্রেণ্টিস – ইহাদের মধ্যে আর্থিক

অবস্থায় ও সামাজিক পদে পার্থক্য কিছুই এক রকম ছিল না। এপ্রেণ্টিস্‌রা জানিত, যে নিয়মের শাসনে তারা আজ এপ্রেণ্টিস্ আছে, সেই নিয়মের শাসনেই কাল মনিবের সঙ্গে সমান গৃহস্থ তারা হইবে, সমান অবস্থায় সমান পদমর্য্যাদা ভোগ করিবে। সাধারণ মুজুরী যারা করিত, তাদের সঙ্গেও গৃহস্থ শিল্পীদের সঙ্গে বড় বেশী একটা পার্থক্য তখন ছিল না। কারণ, ইহাদের পক্ষেও গৃহস্থশিল্পী হইয়া কোনও না কোনও গিল্ডের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিবার সুযোগ অনেক সময়ে ঘটিত। তারপর গৃহস্থরাও সব এত বড় বড় লোক ছিলনা যে তাহাদের কাছে ইহারা একেবারে হীন ও অবজ্ঞাত হইয়া থাকিবে। আমাদের দেশেও আমরা দেখিতে পাই, কামার, কুমার, মালাকার প্রভৃতি শিল্পীগৃহস্থ আর কৃষাণ, ইহাদের মধ্যে অবস্থাগত কি পদগত বড় বেশী একটা পার্থক্য নাই।

কিন্তু এখন এই Industrial Revolution এর ফলে মালিকে আর মজুরে বড় বেশী একটা আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্য ঘটিয়া উঠিয়াছে। মহাজন মালিকরা সব এখন খুবই বড়লোক, প্রাসাদতুল্য বাটীতে অশেষ ঐশ্বর্য্যভোগে জীবনযাপন করেন,—আর মুজুররা অতি দীন, অতি হীন; ইহাদের একরূপ দাসের ন্যায় যারপরনাই দুঃখে কালপাত করে। ইহারাই দেহপাত করিয়া খাটে, ইহাদের শ্রমজাত ধনে মালিকদের এই ঐশ্বর্য্য, এই সুখ, এই পদগৌরব;—আর তারা উদর পূরিয়া দুটি অন্ন পায় না, শীতে আচ্ছাদন পায় না, যে সব গৃহে বাসকরে তাহাকে গৃহ নামই দেওয়া যায় না। অসহায় শিশু পুত্রকন্যাগণ—তাদের ক্ষুধায় অন্ন দিতে পারে না, রোগে ঔষধ দিতে পারে না, মা বাপ হইয়া সন্তানের মত তাদের পালন করিতে পারে না, শিক্ষা কিছু দিতে পারে না; উৎপাত করিলে, নিষ্ঠুর শত্রুর মত কেবল তাদের তাড়নাই করিতে হয়।

একদিকে সেই ঐশ্বর্য্য, সেই বিলাসভোগের কত আড়ম্বর, আবার তারপাশেই এত দুঃখ, এত দারিদ্র্য, এত হীনতা, এত মর্ম্ম-পীড়া।

এ কি যেমন তেমন বৈষম্য। অন্যায় সামাজিক ব্যবস্থার যেমন তেমন পীড়ন।—তারা অবিরত পরিশ্রম করিয়াও এত দুঃখে আছে, আর তাদেরই শ্রমের ফলে মালিকরা ও মহাজনরা এত সুখ ভোগ করিতেছে। এই দারুণ বৈষম্যের পীড়ন যে কত বড় একটা অন্যায় পীড়ন, তাহাও তারা ক্রমে অনুভব করিয়া বড় চঞ্চল ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল।

ওদিকে আবার অনেক সহৃদয় ও সুশিক্ষিত ব্যক্তির দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। শ্রমজীবীদের দুর্গতির অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাঁহারা পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই দুঃখের প্রতিকার *যাহাতে হয়, তার জন্য*ও আন্দোলন করিতে লাগিলেন। গবর্মেণ্ট প্রধান ভাবে মহাজনসম্প্রদায়ের আয়ত্ত হইলেও এই আন্দোলন তাঁহারা একেবারে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। প্রধান রাজপুরুষগণও বুঝিলেন, laissez faire নীতি চলিতে পারে না। ব্যবসায়-বাণিজ্যের রীতিপদ্ধতির মধ্যে তাঁহাদের হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক। কারখানায় মজুরদের বড় বেশী সময় কাজ করিতে হয়; কারখানার কলসমূহ এমন ভাবে রাখা হয় ও চালান হয়, যাহাতে অবিরত দুর্ঘটনা ঘটে,—অনেক কুলি মারা যায়, অনেকে বিকলাঙ্গ ও কর্ম্মে অক্ষম হইয়া অশেষ ক্লেশে পড়ে। স্ত্রীলোকেরা সারাদিন কলে কাজ করে, সন্তান পালন করিতে পারে না। বালকবালিকারাও তেমনই সারাদিন কলে কাজ করে, তাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও কিছু নাই। আর সকলেরই বেতন বড় অল্প। প্রথমে ইংলণ্ডে, তারপর অন্যান্য দেশেও এই সব দুরবস্থার প্রতিকার কল্পে আইন হইতে লাগিল। Factory Laws নামে এই সব আইন পরিচিত। আইনে বেতনের হার বাড়ান হইল, কাজের সময় কমান হইল, স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদের কাজের সময় এমন ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইল, যাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট না হয়; গৃহকর্ম্মের এবং ক্রীড়ার ও শিক্ষার অবসর কিছু পায়। অতিরিক্ত কাজ কেহ কিছু স্বেচ্ছায় যদি করে, অতিরিক্ত মজুরী তার জন্য পাইবে।

কারখানার কলগুলি এমন ভাবে সুরক্ষিত অবস্থায় রাখিতে হইবে, যাহাতে দুর্ঘটনা কম ঘটে। ব্যারাকের ঘরগুলি আর [illegible] হইবে। কুলি পরিবারের ছেলেপিলেদের শিক্ষার ব্যবস্থাও মালিকদের করিতে হইবে। ইত্যাদি।

কিন্তু কেবল আইনে যে সব দুঃখ লোকের সারে না, একথা বলাই বাহুল্য। যাহাই হউক, একটি কথা আমাদের এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে। যে সব সাম্য ও স্বাধীনতার নীতি অনুসরণের ফলে দরিদ্র জনসাধারণের এই অসহনীয় দুর্গতির অবস্থা ঘটিয়াছিল, তার প্রতিকারের উপায় করিতে হইল ঠিক সেই সব নীতির বিরোধী আইন করিয়া। এদিকে শ্রমজীবীরাও বুঝিতেছিল, এত অল্প বেতনে যে তারা মুজুরী করিতে বাধ্য হয়, এত খাটিতে হয়, এত দুঃখ পায়. তার কারণ-চুক্তির সময় তেমন জোর দাবী তারা করিতে পারে না। জনে জনে গিয়া তারা মুজুরী নেয়,—কেহ এত অল্প বেতনে এত সময় খাটিতে না চাহিলে মালিকদের কিছুই আসে যায় না। কারণ অনায়াসে অন্য লোক তাঁহারা পান; মুজুরীর জন্য চাহিলে লোকের অভাব হয় না। কিন্তু তারা যদি দল বাঁধিয়া এমন একটা ব্যবস্থা করিয়া নিতে পারে, যাহাতে ন্যায়মত যে দাবী তারা করিবে মালিকদের তাই দিতে হইবে, অন্য কোনও স্থান হইতে সস্তায় মুজুর তাঁহারা অনিতে পারিবেন না, কেহ আসিলেও কাজ করিতে পারিবে না, তবে সুবিধা হইতে পারে। এই ভাবে দল তারা বাঁধিতে আরম্ভ করিল। ধরুন, ম্যাঞ্চেষ্টারের কোনও কাপড়ের কলে কুলীরা হপ্তায় পাঁচশিলিং করিয়া পায়; কিন্তু তাতে চলে না। এখন তারা জোট করিল, হপ্তায় সাত শিলিংএর কমে কাজ করিবে না। মালিকরা তা দিবেন না। কুলিরা ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ ছাড়িয়া দিল। বেশ দিক্। ইহার কমে তাদের পোষায় না, কেন কাজ করিবে? মালিকরা অন্য কোথা হইতে হপ্তায় পাঁচশিলিং রেটেতেই লোক আনিয়া কাজ চালাইতে পারেন। কিন্তু যদি তা করেন, তবে ইহাদের আর শক্তি কিছু থাকে না; না খাইয়া

সকলে মরে। বাহিরের লোক কেবল কেন, ঐ স্থানেরই অনেক লোক হয়ত ঐ পাঁচশিলিং বেতনেই কাজ করিতে প্রস্তুত। তাতেও কাজ কতক চলিতে পারে। যদি তা পারে, ক্রমে আরও লোক গিয়া জোটে, ধর্ম্মঘট বিফল হয়। যারা শক্ত হইয়া থাকে, তারাই শেষে পাথারে পড়ে। সুতরাং ধর্ম্মঘট সফল করিতে হইলে, ইহা নিতান্ত প্রয়োজন যে বহিরাগত বা স্থানীয় কোনও মুজুর গিয়া সেই কলে কাজ না করিতে পারে। অনেক সময় জবরদস্তী করিয়াও ইহাদের বাধা দিয়া রাখিতে হয়। ইহাতে ইহাদের স্বাধীনতায় আবার বাধা পড়ে। তারা যদি স্বেচ্ছায় অল্প বেতনে কাজ করিতে চায়, স্বেচ্ছায় তার চুক্তি কাহারও সঙ্গে করিয়া নেয়, অপরের তাহাতে জোর করিয়া বাধা দিবার কি অধিকার আছে? এই যুক্তি তুলিয়া কেহ কেহ এই চেষ্টার নিন্দাও করিয়াছেন। কিন্তু বাধা না দিলেও ত চলে না। ধর্ম্মঘট যদি করিতে হয়, তার সার্থকতা একটা চাই। ইহা ছাড়া সার্থকতাও ত হয় না। যারা কাজ বন্ধ করে, তারাই শেষে মরে। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, তার কাছে এ সব যুক্তির দোহাই চলে না। মুজুররা সর্ব্বত্রই দল বাঁধিতে আরম্ভ করিল; সহজে তাহাদের দাবী গ্রাহ্য না করিলে ধর্ম্মঘটও করিতে থাকিল; আবার ধর্ম্মঘট বজায় রাখিতে জবরদস্তীও তারা করিত।

কিন্তু এই সব ধর্ম্মঘটের দোষও অনেক আছে। অনেকস্থলে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও শান্তিভঙ্গ ঘটে। সাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবসায়ে ধর্ম্মঘট ঘটিলে, সর্ব্বসাধারণকেই অতি ক্লেশ অনেক সময় পাইতে হয়। তারপর মালিকরা যদি চাপিয়া বেশীদিন থাকিতে পারেন, মুজুররাও বড় দুঃখ পায়। যে বেতন তারা পায়, তাতে কোনও মতে দিন গুজরান তাদের হয়। এই অবস্থায় দুই এক সপ্তাহও বসিয়া থাকিতে হইলে, একেবারেই তাদের সংসার অচল হইয়া পড়ে। এদিকে ধর্ম্মঘট, যে ভাবেই হউক, মিটিয়া গেলে, ধর্ম্মঘটে মালিকদের যে লোকসান হয়, বেশী মুজুরী যাহা দিতে হয়, তাহা তাঁহারা উৎপাদিত

দ্রব্যের দাম চড়াইয়া পোষাইয়া নেন। ক্ষতি গিয়া পড়ে সর্ব্ব-সাধারণের উপরে, যারা এই সব দ্রব্য ব্যবহার করে। মুজুরাও যে পরিমাণে এই সব দ্রব্য ব্যবহার করে, চড়া দামেই কিনিতে হয়; বাড়া বেতন ততটুকু তাদের কমিয়া যায়।

কিন্তু এ সব অসুবিধা সত্ত্বেও দল বাঁধিয়া এই ভাবেই উচ্চতর বেতন এবং অন্যান্য সুব্যবস্থা আদায় করিতে না পারিলে, মুজুরের পক্ষে তাহা পাওয়ার সুযোগ আর বড় কিছুতে ঘটে না। গবর্মেণ্টের কর্ত্তৃত্ব প্রধানতঃ মহাজনদেরই হাতে। তাঁহারা যেখানে যতটুকুই প্রতিকারের চেষ্টা করুন, তেমন বড় একটা সুবিধা তাদের হয় না। অন্ততঃ নিজেদের জোরে দাবী করিতে পারিলে যত সুব্যবস্থা তারা আদায় করিয়া নিতে পারে, গবর্মেণ্টের আইনে কিছু আর ততদূর হইতে পারে না। সুতরাং দল বাঁধা আর দলের জোর বাড়ানর দিকেই তারা মনযোগী হইল। সর্ব্বত্র সকল শ্রেণীর মুজুরই এখন দল বাঁধিয়াছে, দাবীও তাদের বাড়িতেছে। ধর্ম্মঘট যাহাতে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে, তার জন্য নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া বড় বড় ফণ্ডও তারা করিয়াছে। অধুনা অতি ব্যাপক এবং বহুদিন স্থায়ী বড় বড় ধর্ম্মঘটের কথা আমরা শুনিতে পাই।

কতক গবর্মেণ্টের আইনে এবং কতক ধর্ম্মঘটের বলে মুজুরদের দুর্গতি অনেক কমিতেছে বটে; কিন্তু তারা যা চায়, যত চায়, তা এখনও পাইতেছে না। তা পাইলে, অনেক স্থলে আবার মহাজন ও মালিকদেরও বড় ক্ষতি হইতে পারে। স্বার্থরক্ষার জন্য তাঁহারাও দল বাঁধিতেছেন। মুজুর যেমন ধর্ম্মঘট বা Strike করিয়া কাজ ছাড়িয়া দেয়, তাঁহারাও তেমনই উল্টা এক রকম ধর্ম্মঘটে কারখানা বন্ধ করিয়া রাখেন। ইংরেজিতে ইহাকে Lock out বলে। ইহাতেও রোজগার বন্ধ হওয়ায় মুজুররা অনেক সময়ে বড় বিপন্ন হইয়া পড়ে। তবে মুজুরদের Strikeএর কথা যত বেশী শোনা যায়, মহাজনদের Lockoutএর কথা তত বেশী শোনা যায় না। এই ভাবে মুজুরে আর মহাজনে—Labourএ ও Capitalএ পাশ্চাত্য জগৎ ভরিয়া ভাষণ এক সামাজিক সংগ্রাম

আরম্ভ হইয়াছে। আবার মহাজনদের এ সব দল যে কেবল মুজুরদের বিরুদ্ধে স্বার্থরক্ষার জন্যই হইতেছে, তা নয়। ব্যবসায় ক্ষেত্রে যে প্রাধান্য তাঁহারা লাভ করিয়াছেন, সেই প্রধান্য অক্ষুণ্ণ থাকে, আরও বাড়ে, নূতন প্রতিযোগীর আবির্ভাবে কোনওরূপ অসুবিধা তাঁহাদের না হয়, তার জন্যও তাঁহারা বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছেন, কত কৌশল অবলম্বন করিতেছেন। ব্যবসায়গুলিও ক্রমে এত বড় হইয়া উঠিতেছে, ব্যবসায়ীদের হাতে আর্থিক শক্তিও এত বেশী গিয়া জমিতেছে, যে, তার বলে সকলের সকল স্বাধীনতা, সকল উন্নতির প্রয়াস দমন করিয়া তাঁহারাই সর্ব্বত্র একমাত্র প্রভু হইয়া উঠিতেছেন।

এই কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, ব্যবসায়বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শক্তি বিন্যাসের মধ্যেও যে কত বড় একটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং তাহার ফল ব্যবসায়বাণিজ্যের উপরে কি ভাবে গিয়া পড়িতেছে, কিরূপ পরিণাম তাকে দান করিয়াছে: শ্রমিক প্রভৃতি দরিদ্র জনসাধারণের ভাগ্যের উপরেই বা তাহার প্রভাব কি ভাবে আসিয়া পড়িতেছে, এই কথাগুলির আর একটু বিস্তৃত আলোচনা দরকার।

Fredom of labour freedom of competition, freedom of contract এবং equal opportunity for all—অর্থাৎ জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে বৃত্তিনির্ব্বাচনে সমান অবাধ অধিকার সকলের আছে, পরস্পরের সঙ্গে অবাধ প্রতিযোগিতা করিয়া সকলেই যথাশক্তি *উন্নতি লাভ করিতে পারিবে, কোনওরূপ* customs বা পরম্পরাগত রীতির অনুবর্ত্তন না করিয়া ব্যবসায়িক সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে নিজের সুবিধা বুঝিয়া সকলে চুক্তি করিয়া তদনুসারে কাজ কর্ম্ম করিবে,—এই সব নীতির প্রচার যখন ইয়োরোপে হয়, তার পূর্ব্বহইতেই যে ব্যবসায়বাণিজ্যের বিশেষ একটা প্রসার এবং তার ফলে উন্নত ও শক্তিমান্ ব্যবসায়ীদের হাতে যে প্রভূত ধনাগম হইতেছিল, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

এই যে অবাধ প্রতিযোগিতায় সকলেরই যথাশক্তি উন্নতিলাভের অধিকারের কথা বলিলাম, ইহা অবশ্য পার্থিব ধনে ও পার্থিব শক্তিতে উন্নতির অধিকার। আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে সকলের সমান অধিকার খৃষ্টীয় সমাজে প্রথম হইতেই ছিল। বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মমণ্ডলীর বা চার্চ্চের আপন আপন প্রধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য অতি অসঙ্গত একটা চেষ্টা সত্ত্বেও, প্রত্যেক মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত যে কোনও ব্যক্তিই যোগ্যতা থাকিলে বা ইচ্ছা করিলেই, ধর্ম্ম-যাজকতা গ্রহণ করিতে পারিতেন. এবং রোমান্ ক্যাথালিক সমাজে মঠের সন্ন্যাসী হইয়া তপশ্চর্য্যা করিতেও সকলে পারিতেন। সুতরাং এসম্বন্ধে নূতন কোনও নীতির প্রবর্ত্তনের আবশ্যকতা ছিল না।

তারপর আধ্যাত্মিক উন্নতিতে কোনও প্রতিযোগিতা নাই। এ উন্নতির অধিকারী যে. সে লোককে প্রচুর দেয়, কারও কিছু বলে কি কৌশলে কাড়িয়া নেয় না,—আপন উন্নতির সঙ্গে অপরকে সে তুলিয়া নেয়, কাহাকেও চাপিয়া নীচে ফেলিয়া তাকে উপরে উঠিতে হয় না। ইয়োরোপে এই সময়ে যে সকলের সমান অধিকারের ধূয়া উঠে,—সে অধিকার একেবারে পার্থিবভোগের অধিকার। পার্থিবভোগের প্রধান উপায়, পার্থিব শক্তিরও বড় একটা অবলম্বন, এই ধন। ধনাগম ব্যবসায়বাণিজ্যে যেমন হয়, এমন আর কিছুতে হয় না। রাজকর্ম্ম-অন্য কারণে যতই আকাঙ্ক্ষিত হউক, ধনাগমের হিসাবে ব্যবসায়-বাণিজ্যের তুলনায় তাহা অনেক নিম্নে। আমাদের দেশেও একটি সংস্কৃত প্রবাদ এ সম্বন্ধে আছে,—যথা—

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ॥"

তবে মানুষ এমন অনেক আছেন, এমন সব সংস্কার বংশপরম্পরায় অনেকে লাভ করেন, যাঁহারা বাণিজ্যবাসিনী এই লক্ষ্মীকে লাভ করিতে তেমন ব্যগ্র হন না, বিশেষ যদি অন্য পথে অন্যবিধ শক্তিতে তাঁহারা বাণিজ্যের লক্ষ্মীশ্বরদের অপেক্ষাও উচ্চতর পদগৌরব ভোগ

করেন, ইহাঁদের উপরেও প্রভুত্ব করিতে পারেন.—যেমন নাকি ইয়োরোপীয় ক্ষাত্রসমাজ বা অভিজাত ভূস্বামী সম্প্রদায় ছিলেন। ব্যবসায়বাণিজ্য হানতর বৃত্তি বলিয়া তাঁহারা অবজ্ঞা করিতেন। ওদিকে পদমর্য্যাদায় তাঁহারা বণিক্ সম্প্রদায় অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিলেন, রাষ্ট্রশাসনের প্রভুত্বও তখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের হাতে ছিল।

এদিকে বণিক্ সম্প্রদায়ের দ্রুত অভ্যুদয় হইতেছিল। বিদেশে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা ও অধিকার বিস্তার ইঁহাদের উদ্যমেই হইত। সে সবের শাসনও প্রধানতঃ ইঁহাদের কর্ত্তৃত্বে চলিত। ফলে দেশের শাসনেও ইঁহাদের প্রভাব বাড়িতে লাগিল। ক্রমে অতি ধনী ও শক্তিমান্ বণিকগণ অভিজাত ভূস্বামী সম্প্রদায়ের অনেকটা সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন। বংশমর্য্যদায় অপেক্ষাকৃত হীন হইলেও, ঐশ্বর্য্যে ইঁহারা অনেকই ভূস্বামীদের অতিক্রম করিয়া উঠিলেন। সম্পদের সঙ্গে বংশমর্য্যাদার বিনিময়ও আরম্ভ হইল,—অর্থাৎ অভিজাত ভূস্বামী অনেকে ঐশ্বর্য্যশালী বণিকদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধেও আবদ্ধ হইতে লাগিলেন।

সম্প্রদায় বিভাগের রীতি ইয়োরোপে কখনও কঠোর বংশানুক্রমিক রীতি অনুসরণ করিয়া চলিত না। যোগ্য যে কোনও ব্যক্তিকে রাজা, লর্ড, কাউণ্ট, নাইট্ প্রভৃতি উপাধি দিয়া অভিজাত ভূস্বামী অর্থাৎ *ক্ষাত্রসমাজে* উন্নীত করিয়া নিতে পারিতেন। কিন্তু এই উন্নয়ন ক্ষাত্রবীর্য্যের পুরস্কার স্বরূপই আগে ঘটিত,—অর্থাৎ কেহ শৌর্য্যবীর্য্যে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইলে, তাঁহাকেই রাজা অভিজাত সমাজের পদবী ও অধিকার প্রদান করিতেন। কিন্তু এখন ঐশ্বর্য্যবান্ বণিক্রাও এই অধিকার লাভ করিতে আরম্ভ করিলেন। কেবল ঐশ্বর্য্য কেন, জ্ঞানবিদ্যার অনুশীলনে অসাধারণ প্রতিভা কাহারও দেখা গেলে, রাজারা সময়ে সময়ে তাঁহাদেরও অভিজাত পদবী ও অধিকার দানে পুরস্কৃত করিতেন।

যাহা হউক, মোট কথা হইতেছে এই যে পূর্ব্বে ক্ষাত্রধর্ম্মের উচ্চ অধিকার ব্যতীত নিম্নতর সম্প্রদায়ভুক্ত কেহ ক্ষাত্র বা অভিজাত সমাজে

উন্নীত হইত না; ক্ষাত্র বা অভিজাত সমাজভুক্ত কেহ ক্ষাত্রবৃত্তি ছাড়া অন্য কোনও বৃত্তিও অবলম্বন করিতেন না। এখন ধনী বণিকেরা বণিকরূপেই ক্ষাত্র বা অভিজাত সমাজে স্থান পাইতে লাগিলেন। ধনে এবং অন্যান্য অনেক যোগ্যতায়ও তাঁহারা অভিজাত ভূস্বামী সম্প্রদায়ের সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন। ধনে বরং অনেকে ভূস্বামীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠই হইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় বণিকবৃত্তি ও অন্যান্য উচ্চতর ব্যবসায়ের প্রতি অভিজাত সম্প্রদায়ের অবজ্ঞা ক্রমে কমিয়া আসিবারই কথা। বরং তাঁহাদের ধনবত্তা দেখিয়া এই সব বৃত্তিতে তাঁহাদের সহযোগী হইয়া আপনাদের সম্পদ বৃদ্ধির দিকেই তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে। হইলও তাহাই।

অনেক বড় বড় ব্যবসায়ের অংশী তাঁহারা হইতে লাগিলেন। টাকা জমিলেই তাহা তাঁহারা ব্যবসায়ে খাটাইতে আরম্ভ করিলেন। বস্তুতঃ এই সময়ে যে সব বড় বড় ব্যবসায় আরম্ভ হয়, তাহার সহযোগী হওয়া গ্লানিকর বলিয়াও আর বিবেচিত হইত না। ব্যবসায় যতদিন ছোট থাকে, তার কাজকর্ম্ম সব ব্যবসায়ীকে নিজের হাতে করিতে হয়, পরিমার্জ্জিতরুচি সম্ভ্রান্তবংশীয় লোকেরা তাহা হীন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু, এখন যে পদ্ধতিতে নূতন নূতন সব যৌথ মূলধনের ব্যবসায় পরিচালিত হইত, তাঁহার সঙ্গে অন্ততঃ অংশীভাবে সংস্পৃষ্ট থাকা কোনও দেশের রাজা নিজে পর্য্যন্ত মর্য্যাদার হানিকর বলিয়া মনে করেন না। শুনিয়াছি, ভূতপূর্ব্ব জর্ম্মাণ কাইসার আমেরিকার অনেক বড় বড় ব্যবসায়ের অংশ ক্রয় করিয়াছিলেন।

এইরূপে ইয়োরোপের ক্ষাত্রসমাজ ও উচ্চতর বৈশ্যসমাজ প্রায় সমান হইয়া উঠিল, রাষ্ট্রশাসন দুইটি সম্মিলিত শক্তির আয়ত্ত হইয়া পড়িল। রাজনীতি বৈশ্যস্বার্থ বা ব্যবসায়বাণিজ্যের স্বার্থের অনুগামী হইল। এই সময়ে আবার democracy বা গণতন্ত্র শাসনপদ্ধতির প্রবর্ত্তন হইতে থাকে। Democracy—direct or representative—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা প্রতিনিধিমূলক—যেরূপই হউক, তাহা

প্রকৃতপক্ষে শক্তিমান্ নায়কদেরই শাসন, Demos বা প্রাকৃত জনসাধারণ ইঁহাদেরই নায়কত্বের অধীন হইয়া চলে। অন্ততঃ ঐ যাবৎ এই অবস্থাই চলিয়াছে। অধুনা যে পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা দিয়াছে, এবং তাহার পরিণাম যে কিরূপ ঘটিতে পারে, সে কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

শক্তিমান্ নায়কের শাসনই যোগ্য ও শক্তিশালী শাসন। এই শাসনই দেশ রক্ষা করিতে পারে, জাতিকে উন্নত করিয়া তুলিতে পারে। কিন্তু এই শক্তিমানের শক্তি পাশ্চাত্য জগতে এখন সম্মিলিত ক্ষাত্র-বৈশ্যশক্তি। আর ইহা যদি কোনওরূপ ব্রহ্মণ্যশক্তির বা আধ্যাত্মিক ধর্ম্মনীতির অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত না হয়, তবে তার অবশ্যম্ভাবী ফল হইবে *সর্ব্বত্র ইহাদেরই স্বার্থের* প্রতিষ্ঠা,—রাষ্ট্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য হইবে, ব্যবসায়বাণিজ্যের প্রসার, আর সেই ব্যবসায়বাণিজ্যে শাসক-সম্প্রদায়ের ক্রমবর্দ্ধনশীল প্রভুত্বের বিস্তার। ধনলোভ, ধনপ্রসূত শক্তির লোভ ধন ও শক্তির অধিকারে পার্থিব ভোগের লোভ, সবই অতি বড় লোভ। বড় সুযোগ যদি উপস্থিত হয়, আর ধর্ম্মনীতির ও সমাজনীতির কোনও বাধা যদি না থাকে, তবে এরূপ না হইয়াই পারে না। দেশের শক্তিমান্ পুরুষ যাঁহারা তঁাহাদের স্বার্থলিপ্সা এ অবস্থায় সকল সীমা ছাড়াইয়া যাইবে; দেশের সকল ধন, সকল শক্তি, সকল ব্যবসায় বাণিজ্য একেবারে তাঁহাদেরই হস্তগত হইবে।

হিন্দুসমাজে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের অনুশাসন সকল সম্প্রদায়ের উপরে যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সকল সম্প্রদায়কে যেরূপ নীতির বন্ধনে সংযত রাখিতে পারিয়াছিল, ইয়োরোপের চার্চ্চ সেরূপ কখনও পারে নাই। কারণ, পুরুষ পরম্পরাগত সে সব উচ্চ সংস্কারের অধিকার ভারতীয় ব্রাহ্মণের মধ্যে দেখা যাইত, ইয়োরোপীয় চার্চ্চের যাজকবর্গের মধ্যে তাহা কিছু সম্ভব হইত না। যাজকবৃত্তি বংশগত বৃত্তি ছিল না যে কোনও সম্প্রদায়ের যে কোনও লোকই যাজক হইতে পারিত। ক্যাথলিক যাজকদের বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। প্রটেষ্টাণ্ট যাজকগণ

বিবাহ করিতেন বটে, কিন্তু যাজকের সন্তান বলিয়াই যে কেহ যাজকতা গ্রহণ করিতেন, তা নয়। যজকবৃত্তি বংশানুগত কখনও হয় নাই। বাল্যাবধি যেরূপ একটা শিক্ষা ও সাধনার প্রণালী অনুসারে ব্রাহ্মণের জীবন গঠিত ও পরিচালিত হইত, ইয়োরোপে তার ব্যবস্থা কিছু ছিল না। পার্থিব সম্বন্ধে যে দীনতা ও ত্যাগ ব্রাহ্মণজীবনের আদর্শ ছিল, কার্য্যতঃ ইয়োরোপের যাজকবৃন্দ সে আদর্শ কখনও পালন করেন নাই। বরং পার্থিব ধন-শক্তি ও ভোগের অধিকার লাভের দিকেই তাঁহাদের অধিক আগ্রহ দেখা যাইত। তবু ক্যাথলিক ধর্ম্মের অক্ষুণ্ণ প্রভুত্ব যতদিন ছিল, সকল দেশের রাষ্ট্রপদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র এবং উচ্চতর একটা শক্তিরূপে তার একটা প্রতিষ্ঠা ছিল, যে ভাবেরই হউক, একটা ধর্ম্মনীতির অনুশাসন তার সকলে মানিত।

মধ্যযুগে ইয়োরোপের প্রচণ্ড রণদুর্ম্মদ অভিজাত ভূস্বামীবর্গকে ক্ষাত্রধর্ম্মের উন্নত কতকগুলি নীতির শাসনে সংযত ও সুপথে পরিচালিত করিতে রোমীয় চার্চ্চ বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। ইয়োরোপের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা Chivalry ধর্ম্মের কথা জানেন। সত্যপালন, বিশ্বস্ততা, দরিদ্রের রক্ষণ, বিপন্নের উদ্ধার, নারীর মর্য্যাদা, পরাভূত শত্রুর প্রতি সদয় ব্যবহার, ধর্ম্মরক্ষার্থে যুদ্ধে সর্ব্বস্বপণ, এইগুলিই সাধারণতঃ Chivalry ধর্ম্মের নীতি ছিল। বলা বাহুল্য, ভারতীয় ক্ষাত্রধর্ম্মের নীতির সঙ্গে এই Chivalry ধর্ম্মের নীতির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। বীরগণের ক্ষাত্র একটা দীক্ষা হইত এবং দীক্ষার সময়ে এরূপ শপথও তাঁহাদের গ্রহণ করিতে হইত যে এই সব ধর্ম্ম তাঁহারা পালন করিবেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিদ্রোহে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। যে সব দেশে এই ধর্ম্ম প্রধানভাবে গৃহীত হয়, চার্চ্চ বা ধর্ম্মশাসন-পদ্ধতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পায়, রাষ্ট্রশাসনের অধীন ও অন্তর্ভুক্ত তাহা হইয়া পড়ে। ক্রমে রাষ্ট্রশাসন যখন democratic হইয়া উঠিল, চার্চ্চও স্বভাবতঃই এই democracyর অধীন হইল।

চার্চ্চের একটা প্রভুত্ব, তার কোনও অনুশাসনের জোর যে এ অবস্থায় বিশেষ কিছু থাকিতে পারে না, একথা বলাই বাহুল্য। প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম এবং তারপর democratic শাসননীতি প্রবর্ত্তনের ফলে ক্যাথলিক দেশসমূহে ক্যাথলিক ধর্ম্মের শাসনও বহুপরিমাণে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানবের ব্যক্তিত্বের অধিকার সম্বন্ধে যে সব নীতি ইয়োরোপে সর্ব্বত্র গৃহীত হয়, তার মধ্যে কোনও ধর্ম্মপদ্ধতির কোনওরূপ শাসন বা প্রভাব আদৌ চলিতেই পারে না। কারণ, ধর্ম্ম অর্থাৎ প্রচলিত যে সব শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম আছে তাহা মানিলে মানবের নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধির অতীত অর্থাৎ ultra-rational কোনও শক্তির প্রভুত্ব মানিতে হয়। ইয়োরোপীয় নূতন Rationalism তা মানিতেই পারে না।

ষোড়শ শতাব্দীর পর হইতে যে সব নূতন প্রভাব ইয়োরোপে দেখা দেয়, যে একটা বড় যুগান্তর ইয়োরোপে আরম্ভ হয়, সামাজিক অবস্থার যে সব বড় পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাহার যে পরিণতি ঘটে, তাহাতে ধর্ম্মশাসন ইয়োরোপে একেবারে শিথিল হইয়া পড়ে. প্রায় লুপ্ত হয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। Chivalry ধর্ম্মের যে সব নীতি অভিজাত ভূস্বামীবর্গ জীবনের আদর্শ বলিয়া মানিতেন *অবস্থার পরিবর্ত্তনে তার কোনও প্রভাব থাকে না।* Days of Chivalry are gone—এই একটি কথা সর্ব্বদাই আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যে এখনও পাওয়া যায়।

কোনওরূপ ধর্ম্মপদ্ধতির অনুগত নীতির শাসন নাই। স্বাধীনভাবে সকলেই যাহা ভাল মনে করে, তাই করিতে পারে। পার্থিব ভাগ্যে উন্নতির জন্য যে যাহা সুবিধা মনে করে, তাহাই করিবে, কাহারও কোনও বাধা তাহাতে নাই, কোনও সম্প্রদায়ের কোনও বিশেষ ধর্ম্ম-পালনে বা বিশেষ বৃত্তির অনুসরণে কোনওরূপ বাধ্যতা কিছু নাই। ইহাই হইল সর্ব্বত্র গৃহীত উত্তম নীতি। এই সময়ে আবার

ব্যবসায় বাণিজ্যের অত্যধিক প্রসারে দেশে প্রভূত ধনাগম এবং বণিক ও ব্যবসায়িকবর্গের যারপরনাই অভ্যুদয় একটা হয়। ধর্ম্মনীতির উপরে অধিকাররূপ যে ব্রহ্মণ্য শক্তি তাহা একরূপ লোপ পাইল। ক্ষাত্রসমাজ তার বিশেষত্ব হারাইয়া অভ্যুদয়শালী উন্নত বৈশ্যসমাজের সঙ্গে মিলিয়া গেল। সম্মিলিত এই ক্ষাত্র-বৈশ্য সমাজ ব্যবসায়বাণিজ্যে কেবল ধনাগম কিসে হইবে, ধনগত শক্তি ও ধনসুলভ ভোগ কিসে বাড়িবে, এই দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িল। [illegible] ইঁহাদের আয়ত্ত রাজনীতির লক্ষ্যও হইল, কিসে [illegible] কার বাড়িবে, আর সঙ্গে সঙ্গে অধিকৃত দেশের সকল ব্যবসায়বাণিজ্য ইহাদের হস্তগত হইবে। তাও বাড়িতে লাগিল, ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসারও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠিল। প্রভূত ধনবলে ক্রমে দেশের সকল ব্যবসায়বাণিজ্য ইঁহারা এমনভাবেই দখল করিয়া ফেলিতে লাগিলেন যে জনসাধারণের পক্ষে তাঁহাদের মুজুরী ব্যতীত আর গত্যন্তর রহিল না। ইঁহারা কেবল যে বিদেশবাসী জনবর্গকে আপনাদের রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসায়িক দাসত্বে পরিণত করিয়াছেন, তা নয়। নিজেদের দেশের অধিবাসীরাও একরূপ ইঁহাদের দাসত্বে বাঁধা হইয়াছে। নামতঃ রাষ্ট্রীয় শাসনে তাহাদের অধিকার একটা স্বীকৃত হয় বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা যে কি, পূর্ব্ব প্রবন্ধেই তাহা আমরা দেখিয়াছি। ব্যবসায়িক দাসত্ব যে ইহাদিগকে কিরূপ পীড়ন করিতেছে, তাহার কতক আভাস পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে, ক্রমে আরও দেখিতে পাইব।

দেশের ধনবান্ ও শক্তিমান্ যাঁহারা, তাঁহারা এইভাবে তাঁহাদের সকল বল, সকল শক্তি ব্যবসায়ের দিকে নিয়োগ করিলেন। ব্যবসায়-মুখী তাঁহাদের এই কর্ম্মশক্তি, তাহার এই গতি, এক লক্ষ্যের দিকেই ক্রমবর্দ্ধনশীল বেগে ছুটিতেছে, অসীম প্রসারে তাহা কি যে এক বিরাট বিশ্বগ্রাসী পরিণতি লাভ করিতেছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত, স্তম্ভিত হইতে হয়! দেখিলে সত্যই ভগবানের বিশ্বরূপদর্শনে স্তম্ভিত অর্জ্জুনের মত বলিতে হয়—

"নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রং।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো॥"

অথবা—

"লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমস্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥"

এই ব্যবসায়িক যুগান্তরের প্রথমভাগে অনেক কারবার ছিল, ব্যক্তিগত মালেকান সত্ত্বের। ধনী মহাজনেরা নিজের টাকায়, বড় কোনও কারবার প্রতিষ্ঠা করিতেন, নিজেরাই দেখিয়া শুনিয়া লোকজন রাখিয়া তাহা চালাইতেন। মহাজন মালিকদের সঙ্গে মজুর, কেরাণী ও অন্যান্য লোকজন যারা খাটিত,তাহাদের মনিব-ভৃত্যের ন্যায় ব্যক্তিগত একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও অনেক স্থলে দেখা যাইত। ভৃত্য যাহারা, তাহারা তাহাদের দুঃখের কথা, অসুবিধার কথা, মনিবকে জানাইতে পারিত। মনিবও অনেক সময় ইহাদের স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। মনিব-ভৃত্যের ন্যায় এরূপ ব্যক্তিগত একটা সম্বন্ধ যেখানে মালিক-মজুরে থাকে, সর্ব্বদা দেখা শুনা হয়, সেখানে একেবারে কঠোর নির্ম্মম নিয়মানুগত যন্ত্রের শাসনের ন্যায় শাসন চলিতে পারে না। মুজুররাও মনিবকে শ্রদ্ধা করে, মনিবের স্নেহ ও সহানুভূতির ভাবও অধীনস্থ মুজুরদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাহাদের দুঃখ লাঘব করিবার দিকেও, যেরূপই হউক, একটা যত্ন মনিবের পক্ষ হইতে দেখা যায়। মনিব সহৃদয় হইলে ত কথাই নাই।

কিন্তু এই সব অপেক্ষাকৃত ছোট মালেকান কারবার এখন প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। বড় বড় যৌথ কারবার তার স্থান অধিকার করিতেছে। প্রত্যেক রকমের ব্যবসায় এত বড় ও ব্যাপক হইয়া

উঠিতেছে যে দুই একজন মহাজন মাত্র নিজেদের মূলধনের উপরে নির্ভর করিয়া তাহা চালাইতে পারেন না। তাই মূলধনের বড় বড় সমবায় হইতেছে। এই সব সমবায় যাঁহারা ঘটান, তাঁহারা আজকাল সাধারণতঃ intrepreneur বা business organiser নামে পরিচিত। সকলে ইঁহারা নিজেদের মূলধনের উপরেও নির্ভর করেন না। নানারকম ব্যবসায়ের মধ্যে থাকিয়া অসাধারণ ব্যবসায়িক organisationএর বা স্থাপনার শক্তি ইঁহাদের আয়ত্ত হইয়াছে। তার বলে বহু মূলধনের সমবায় ঘটাইয়া বড় বড় joint-stock কারবার ইঁহারা প্রতিষ্ঠা করেন। যাদের টাকা আছে, টাকা লইয়া নিজেরা বড় কিছু করিতে পারে না, তাহারাও এই কারবারের অংশ খরিদ করে। নিশ্চিন্তভাবে ঘরে বসিয়া তার সুদ বা dividend খায়।

এই সব joint-stock কারবার ইয়োরোপে ও আমেরিকায় আজকাল যে কত বৃহৎ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা আমরা সহজে কল্পনাও করিতে পারি না। এক একটি কারবারে কোটি কোটি টাকার মূলধন খাটিতেছে। বেশীর ভাগই তার ধনী মহাজনদের আর intre-preneur বা organiserদের। দেশের সাধারণ লোকও যে যতটা পারে তার অংশ খরিদ করে। অংশ খরিদ যে না করে বা করিতে না পারে, সে তার টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখে। ব্যাঙ্কের টাকাও নানা-রকমে এই সব কারবারে খাটে।

কোটি কোটি টাকার মূলধন এক এক কারবারে খাটিতেছে, দেশময় শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইতেছে। লক্ষ লক্ষ লোক তাহাতে চাকরী বা মুজুরী করিতেছে। না করিয়া আর করিবেই বা কি? গৃহস্থালী ব্যবসায় আগে হইতেই উঠিয়া যাইতেছিল,—এখন ত একেবারেই তা চলিতে পারে না।

এই কারবাররূপ সমবায়গুলি রীতি মত আইন কানুনে বাঁধা এক একটি corporation এর মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সব সমবায় বা corporation সমূহের কর্তা বড় বড় intrepreneur বা

ব্যবসায়িক নায়কবর্গ। বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রস্থানে থাকিয়া মূলশক্তির নিয়ন্তৃত্ব ইঁহারা করেন। আসল কাজ যাহা, তার পরিচালনার ভার থাকে ইহাদের নিযুক্ত বেতনভোগী বড় বড় কর্ম্মচারীদের হাতে। Corporationএর আইন কানুন যেরূপ হয়, কর্ত্তাদের যখন যেরূপ হুকুম তাঁরা পান, তদনুসারে কাজ কর্ম্ম তাঁহারা চালান। অসংখ্য কেরাণী ও মুজুর যাহারা বিভিন্ন শাখায় কাজ করে, তাহাদের সঙ্গে আসল মালিকদের কোন সম্বন্ধই থাকে না। বস্তুতঃ আসল মালিক যে কাহারা, ইহাদেব সুখ দুঃখ, সুবিধা অসুবিধার দায়িত্ব যে কাহাদের, তাহা বুঝিয়া উঠাই দায়।

একটি কথা আমাদের এইখানে পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়া নিতে হইবে। এই সব বড় বড় joint-stock corporation এর মূলধনের মালিক অর্থাৎ capitalist এবং প্রধান পরিচালক অর্থাৎ Intre preneur বা organiser সর্ব্বদা একই ব্যক্তি নহেন;—তাঁহাদের function অর্থাৎ কর্ম্মের ভাগ ও দায়িত্বও ঠিক এক নহে। এই intrepreneur বা ব্যবসায়িক নায়কগণ গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রী করিয়া এক একটি joint-stock কারবার প্রতিষ্ঠা করেন এবং সরকারী আইনেরই নির্দ্দিষ্ট সব বিধি অনুসারে সেগুলি পরিচালনা করেন। নিজেরাও যতদূর পারেন কারবারের অংশ খরিদ করেন,—বাহিরের লোকও যে যত পারে অংশ খরিদ করে। সুতরাং অংশীদের স্বার্থ এবং intrepreneurদের স্বার্থ পৃথক ; এবং অংশীদের স্বার্থ যাহাতে রক্ষিত হয়, তার জন্য আইন আছে। Intrepreneurগণ যত অংশেরই মালিক হউন, intrepreneur রূপে তাঁহাদের যে কর্ত্তৃত্ব ও দায়িত্ব তার সঙ্গে অংশীরূপে তাঁহাদের স্বার্থের কি কর্ত্তৃত্বের কি দায়িত্বের কোনও সম্বন্ধ নাই। এই দুই পক্ষে পরস্পরের যাহা কিছু সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধে পরস্পরের যাহা কিছু দায়িত্ব, তাহা সরকারী আইনেই নির্দ্ধারিত হয়।

অংশী মহাজনগণ বলিতে পারেন;আমারা কি জানি,অমুক কারবারের

অংশ খরিদ করিয়াছি মাত্র, কারবার আমরা চালাই না. কি হয় না হয় তা আমরা জানি না,—তার দায়িত্বও কিছু আমাদের নাই। আবার Intrepreneur বা পরিচালকগণও বলিতে পারেন, কারবারের মালিক আমরা নই, পরের টাকা লইয়া কারবার চালাই ; যাদের টাকা, তাদের স্বার্থ যাহাতে বজায় থাকে, তাহা আমাদের করিতে হইবে ; তার জন্য আইনও আছে, আইনে আমাদের হাত পা বাঁধা। আমরা কি করব ?

কোনও পক্ষের কথা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। মালেকান দায়িত্ব এই সব কারবারে একেবারে কাহারও উপরেই আরোপ করা যায় না।

প্রকৃত মহাজন যাহারা, যাহাদের টাকায় ব্যবসায় চলে, তাহারা সারাদেশে ছড়ান। আইনে তাহাদের কতক অধিকার নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু সকলে একত্র হইয়া কোনও ব্যবসায়ের উপরে কোনওরূপ কর্ত্তৃত্ব করিবার সুযোগ কি সম্ভাবনা ইহাদের হয় না। ব্যবস্থা এমনই থাকে, কাজকর্ম্ম এমন ভাবেই চালান হয়, যে কারবারের ডাইরেক্টরদের নির্ব্বাচনেও ইহাদের স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব বড় কিছু চলে না। পার্লামেণ্টের সভ্যনির্ব্বাচনে তবু সকলের সমান ভোট আছে, এখানে ভোটের সংখ্যা অংশের হিসাবে ধরা হয়। সুতরাং অপেক্ষাকৃত ছোট অংশীদের ভোটের বল একেবারেই নগণ্য। ডিভিডেণ্টের টাকা পান, ইহাই মাত্র কারবারের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ। আর বাৎসরিক অতি জটিল একটা হিসাব বাহির হয়। কিন্তু তার মধ্যে দন্তস্ফুট করা—সে হিসাববিজ্ঞানে অতি দক্ষ ব্যক্তি ব্যতীত আর কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। প্রত্যাশিত ডিভিডেণ্টের টাকা পাইলে, ইহার জন্য মাথা ঘামাইতেও বড় কেহ চান না।

টাকার মালিক নন, মালিক ভাবে কাজও করেন না ; তাই এই সব কারবারে মালেকান দায়িত্ব Intrepreneur বা ব্যবসায়িক নায়কবর্গের উপরেও আরোপ করা যায় না। কিন্তু দেশের ব্যবসায় সম্পর্কিত মূলধন যাহা কিছু, সব এখন ইহাদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে, এবং ব্যবসায় ক্ষেত্রে

ইঁহারা অপ্রতিহতপ্রভাব বা autocratic রাজার মত হইয়া উঠিয়াছেন। যে ব্যবসায়ে যত টাকাই লাগুক, অনায়াসে ইঁহারা আয়ত্ত করিতে পারেন। Creditও ইঁহাদের অসীম; Organising capacity বা সংঘটনশক্তিও ইঁহাদের অসাধারণ। দেশের সকল মূলধন আয়ত্ত করিয়া তার বলে সকল ব্যবসায়ে ইঁহারা প্রভুত্ব করিতেছেন। তাই আধুনিক এই সব ব্যবসায়ের ধরণ বা ধর্ম্মের নামই হইয়াছে capitalism।

এই সব বড় বড় ব্যবসায়িক corporation সর্ব্বত্র এমন ভাবে আপনাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, দেশের সকল বৃত্তি এমন ভাবেই ইহাদের আশ্রিত ও অধীন হইয়া পড়িয়াছে, এবং জীবনের সকল কর্ম্মক্ষেত্রে মানবে মানবে ব্যবসায়িক সম্বন্ধই এমন ভাবে প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে সমগ্র সমাজ একটা ব্যবসায়িক সমাজে—Industrial Societyতে পরিণত হইয়াছে বলিলেই হয়। ব্যবসায়িক নায়কগণ এই সমাজের কর্ত্তা, আর সকলেই কোনও না কোনও ভাবে ইঁহাদের অধীন বেতন-*ভোগী। ব্যবসায়িক প্রভু* আর তাঁহাদের ব্যবসায়িক ভৃত্য, জনসমাজ প্রধানতঃ এই দুই শ্রেণী বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। নানারকম ব্যবসায়ে ছোট বড় স্বাধীনবৃত্তিক গৃহস্থজীবনের যে বৈচিত্র কোথাও আর তাহা বড় দেখা যায় না। এক গ্রাম অঞ্চলে কৃষিকর্ম্মে এইরূপ স্বাধীন গৃহস্থ কোথাও কোথাও কিছু দেখা যায়। তবে ইহাও অনেক পরিমাণে বড় বড় নায়কদের পরিচালিত plantation বা বিস্তৃত কৃষি ব্যবসায়ের অধীন হইয়া পড়িয়াছে।

অন্যান্য সকল ব্যবসায় বড় বড় নগরের বড় বড় কারবারে গিয়া কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। অসংখ্য লোক, কেহ কেরাণী, কেহ কুলী, কেহ কেহ ওভারসিয়ার, এইরূপ কোনও না কোনও কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া সেই ব স্থানে গিয়া জমায়েত হইয়াছে। আফিসে কি কার-খানায় বাঁধা এক নিয়মে, সেই একই কড়া রুটিনে, দিনের পর দিন সকলে কাজ করে,—অবসর সময়ে ব্যারাকে আসিয়া কোনও মতে

আহারাদি ও বিশ্রাম করে। এই সব স্থানে সেই সব বড় বড় ব্যারাকের ঘরে ব্যতীত গৃহস্থের ন্যায় নিজ নিজ বাড়ীতে বাস করা কাহারও পক্ষে সম্ভব আর হয় না। এরূপ বাড়ী কোথায়? নগরগুলি যে একেবারে কারবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে,—জমির দাম, বাড়ীভাড়া সব আগুন। অল্প আয় যাহাদের, তাহাদের সাধ্য কি পৃথক বাড়ীতে থাকে? নগরের পর নগরে যেখানে যাও, মানবজীবনের, মানব সমাজের, এই একই চিত্র চক্ষে পড়িবে।

রাত্রিপ্রভাতে কলের বাসীতে ফুঁ পড়িল। ব্যারাকবাসীরা ধড়ফড়িয়া সব উঠিল,—কোনও মতে কাপড় চোপড় পরিয়া, যার যা জুটিল কিছু মুখে দিয়া সব কারখানায় গিয়া কাজ আরম্ভ করিল। মধ্যে একবার আহারবিরামের জন্য একটু ছুটি আছে,—বাকী প্রায় সমস্তটা দিন বড় বড় কলে ঠিক কলেরই অংশের মত হাজার হাজার মুজুর কাজ করিবে, একটু চক্ষু ফিরাইবার কি একটা কথা কাহারও সঙ্গে বলিবার মুহূর্ত্ত অবকাশ নাই। কারণ, একজনের কাজ একটু এদিক ওদিক হইলে সকলের সব কাজ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। বায়োস্কোপের ছবিতে এই সব বড় বড় কারখানায় মজুররা কেমন যে যন্ত্রের মত চলে, তাহা অনেকে দেখিয়াছেন। ইয়োরোপে, আমেরিকায় কি জাপানে যাঁহারা যান, তাঁহারা দেখিয়া আসিয়া কি গদগদ প্রশংসাতেই এই কর্ম্মশৃঙ্খলার বর্ণনা করিয়া থাকেন! বস্তুতঃ দেখিতে ইহা বেশ সুন্দরই লাগে। মনে হয়, আহা, কি চমৎকার শিক্ষা ইহাদের! কি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা ইহাদের কাজের! আমরা একদিন ছবিতে বা কলে গিয়া দেখিয়া আসি, চক্ষে বেশ লাগে। কিন্তু মনে করিয়া দেখুন, পুতুল নয়, যন্ত্র নয়, ইহারা সব মানুষ। একদিন নয়, দুই দিন নয়, সারাটি জীবন, দিনের পর দিন প্রত্যহ ৮।১০ ঘণ্টা করিয়া ইহাদের এইভাবে কাজ করিতে হয়। সমস্ত জীবন ইহাদের অবিরামগতি একটা যন্ত্রের মত চলে। জীবনের সুখ কি, স্বস্তি কি, কিছুই ইহারা জানে না। বলিবেন, জীবিকার জন্য খাটিতে হয়, বেশ ত, বাঁধা

নিয়মে শৃঙ্খলামত খাটে। ইহা ত উন্নতির লক্ষণ।—কিন্তু শৃঙ্খলাই ত জীবনের চরম লক্ষ্য নয়। শৃঙ্খলায় সুখ সুবিধা লোকের বেশী হয়, তাই শৃঙ্খলা প্রার্থনীয়। কিন্তু এখানে কি সুখ সুবিধা তাহাদের হইতেছে? সারাটি জীবন ত কেবল ঐ শৃঙ্খলার দাস হইয়াই তাহাদের থাকিতে হয়। এ দাসত্বভার সে বহন করে. কারণ ইহা ব্যতীত যৎসামান্য অন্নবস্ত্রের সংস্থানও তার হইতে পারে না। সুখ সুবিধা এই শৃঙ্খলা হইতে যাহা কিছু,তাহা ভোগ করিতেছেন কারবারের প্রভু যাঁহারা তাঁহারাই। ইহারা ত এই দাসত্ব করিয়া প্রাণহীন একটা যন্ত্রের মতই জীবনটা কাটাইয়া দেয়। মানবজীবনের সর্ব্বোপরি কাম্য যে স্বস্তি, যে শান্তি,— ইচ্ছামত কাজ করিবার যে আনন্দ যে আরাম, তাহার ত কিছুই ইহারা জানে না।

ইহাদের সঙ্গে স্বাধীন কোনও গৃহস্থ—এই যেমন আমাদের দেশের কামার কুমার কি ছুতারের তুলনা করিয়া দেখুন। কি আরামে, কি আনন্দে, তাহারা তাহাদের কাজ কর্ম্ম করে। হাসিতেছে, গল্প করিতেছে, গান করিতেছে, তামাক খাইতেছে, ক্লান্তি বোধ হইলে উঠিয়া হয়ত একটু ঘুরিয়াও আসিতেছে; আবার নিজেদের কাজও বেশ করিতেছে। এই ভাবে ইহারা যাহা উপার্জ্জন করে তার চেয়ে কলের কুলীদের উপার্জ্জন বেশী নয়। আর কেবল পাউণ্ড শিলিংএ এই উপার্জ্জনের হিসাব করিলেও হইবে না। Nominal বা money wages কুলিদের যাহাই হউক, real wages অর্থাৎ উপার্জ্জিত পয়সায় অন্ন বস্ত্র কি মিলে, তার হিসাব যদি আমরা নিই, বুঝিতে পারিব, ইহাদের তুলনায় স্বাধীন গৃহস্থ ব্যবসায়ীরা অনেক ভাল অবস্থায় আছে।

কেবল কারখানার কুলি বলিয়া নয়, এই সব ব্যবসায়ের সঙ্গে যাহারাই যে ভাবে কাজ করে, সকলেরই অবস্থা এইরূপ। কাহারও একটু স্বস্তি নাই, আনন্দ নাই, আরাম নাই! একটানা অবিরামগতি এক একটা যন্ত্রের মত সকলের জীবন চলিয়া যাইতেছে।

কর্ম্মক্ষেত্রে কাজের অবস্থা এই। উপার্জ্জন যাহা হয়, তাহাতে সচ্ছলভাবে কাহারও চলে না। আর গৃহস্থালী হইতেছে ব্যারাকের সেই সব গৃহে। কোথাও অসংখ্য অবিবাহিত নর-নারী, যার যার মনে থাকে, যা খুসী তাই করে। আর কোথাও নানারকমের হাজার হাজার পরিবার, প্রকাণ্ড এক একটা বাড়ীতে ভাগ করা ছোট ছোট খণ্ডে বাস করে, বা বাঁধা খোয়ারে কোনও মতে জীবন কাটায়। ছেলে-পিলেগুলি যে ইহার মধ্যে কি ভাবে মানুষ হয় তাহা আর না বলিলেও চলে।

আরও দুর্ভাগ্যের কথা ইহাদের পক্ষে এই যে এই দুর্গতির অবস্থা হইতে নিষ্কৃতির উপায় কাহারও কিছু নাই। এই দাসত্বের যন্ত্রে একেবারে জীবনের মত সকলে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে। কোনও লোক যতই বুদ্ধিমান, সাধুমতি ও শ্রমশীল হউক, স্বাধীনভাবে কোনও কাজ কর্ম্ম করিয়া আর্থিক অবস্থায় উন্নতি লাভ করিবে, তাহার কোনও পথ, কোনও অবকাশ, আধুনিক পাশ্চাত্য industrial সমাজের মধ্যে নাই। কি আর ইহারা করিতে পারে? এক চাষবাস। কিন্তু এত লোক গিয়া চাষী গৃহস্থ হইবে, এত জমি কোথায়? স্বাধীন গৃহস্থালীতে কুটীর-শিল্প একান্ত অপরিহার্য্য বলিয়া যাহা কিছু আছে, তার মধ্যেও নূতন বেশী লোক গিয়া কিছু করিয়া খাইতে পারে না। আর যত কিছু ব্যবসায়, সব এই সব মহাজনী কারখানার আয়ত্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই কারখানায় এই সব মুজুরী ছাড়া আর কোথাও কোনও রূপ কর্ম্মে যৎসামান্য জীবিকা উপার্জ্জনেরও উপায় তাহাদের নাই। তারপর এই সব কাজ করিয়া, এই সব নগরে এই ভাবে থাকিয়া, এমন অভ্যাস ইহাদের হইয়া গিয়াছে যে নূতন ধরণের অন্য কোনও স্বতন্ত্র বৃত্তি সহজে কেহ অবলম্বন করিতে পারে না।

এই যে দারুণ দুঃখের জীবনের দুটি দুঃখের অন্ন, তাও কি সকলের ভাগ্যে জোটে? যতটি মুজুর কাজে লাগে, তার বেশী মুজুর ত মালিকরা নিবে না। বাকী সকলের উপায় কি?

Problem of unemployment (বেকার শ্রমিক সমস্যা) যে বড় একটা সমস্যা পাশ্চাত্য জগতে হইয়া উঠিয়াছে, তাহার আভাস এদেশের সংবাদপত্রেও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। সমস্যাটা বড় সহজ সমস্যা নয়; বর্ত্তমান ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে ইহা একরূপ অপরিহার্য্য, প্রতিকারের উপায় কিছুই একরূপ নাই, যদি না ব্যবসায়ের এই পদ্ধতিই বদলায়। সব ব্যবসায়ই কলের কারখানার আয়ত্ত; এই সব কারখানার কাজ চালাইতে দেশের সব দরিদ্র শ্রমজীবীর শ্রমের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন না হইলে, অনর্থক বেতন দিয়া মালিকরা লোক পুষিবেন কেন? তাই বহুলোক এমন আছে, যাহারা খাটিয়া খাইবার একটু যায়গা কোথাও পায় না। আবার কলের লক্ষ্যই এই যে হাতের কাজ কিসে কম হয়, অল্প লোক দিয়া অনেক বেশী কাজ কিসে করা যায়। যত নূতন নূতন উন্নত কলের আবিষ্কার আর তার প্রয়োগ যেখানে হয়, তত মুজুর সেখানে কম লাগে। আবার একরূপ কোনও দ্রব্য হয়ত কোনও কোনও কারখানায় প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে, কোনও কারণে তার চাহিদা (demand) খুব কমিয়া গেল; অনেক কারখানা উঠিয়া গেল, হাজার হাজার মুজুর বেকার হইয়া পড়িল। এক রকম জিনিষের চল উঠিয়া গিয়া অন্য রকম কোনও জিনিষের চল হইল, যাহা প্রস্তুত করিতে নূতন যে কল লাগে, নূতন যে কারখানা করিতে হয়, তাহাতে অত মুজুর লাগে না। আবার কোনও ব্যবসায় ফেল পড়িল, তার সব মুজুরও গিয়া বেকারের দল পুষ্ট করিল। মহাজনরাও এ সব অবস্থায় বিপন্ন হন সত্য, কিন্তু তাঁহারা কয়জন? আর টাকার জোরও আছে, একেবারে মারা যান না। মারা যায় শ্রমিকরা। তারপর অধিক বয়স পর্য্যন্ত কলে একই রকম একটা কাজে যারা বুড়া হইয়া উঠিয়াছে, অন্য কোনও রকম কাজ তারা সহজে করিতে পারে না। এমন একটা বিশ্রী অভ্যাস তাদের হইয়া যায় যে নূতন কোনও কাজে তারা হাতই দিতে পারে না।

তারপর কাজ করিতে করিতে যারা বৃদ্ধ, রুগ্ন কি বিকলাঙ্গ হইয়া

পড়ে, তাদেরও আর কোনও কাজে কেহ রাখে না। কত বলিব? কত রকমে যে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য ব্যবসায়পদ্ধতি দীন দুঃখী শ্রমিক জনসাধারণকে ইহার কঠোর যাঁতাকলে ফেলিয়া পেষণ করিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

কেহ আদবেই কাজ পায় না,—কেহ কাজ পাইয়াও অসময়ে বহিষ্কৃত হয়, কেহ বা বার্দ্ধক্য, ব্যাধি কি বিকলাঙ্গতা হেতু কাজের অযোগ্যই হইয়া পড়ে। এই ভাবে হাজার হাজার বেকার ও অসহায় লোক এক এক দেশে জমিয়া যায়। গবর্মেণ্ট ইহাদের দুঃখের প্রতিকারের জন্য অনেক চেষ্টা অবশ্য সর্ব্বত্রই করেন। কিন্তু গবর্মেণ্টের সাধ্য কি যে ইহার তেমন কিছু একটা কিনারা করিয়া উঠিতে পারেন? অন্নসত্র কি ধর্ম্মশালা খুলিয়া এত লোকের আহার ও বাসের ব্যবস্থা কোনও গবর্মেণ্টেই করিতে পারেন না। কাজ করিয়া সকলেই ইহারা কোনও মতে দুটি খাইতে পায়, এমন সব লাভজনক ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠাও গবর্মেণ্টের সাধ্যায়ত্ত নহে। এরূপ ব্যবসায়ের অবসরই যদি থাকিত, ব্যবসায়ীরাই তাহার পত্তন করিত; গবর্মেণ্টের অপেক্ষায় কেহ বসিয়া রহিত না। Work-house, Alms-house, *

---

* প্রত্যেক গ্রামের ও নগরের অধিবাসীদের নিকট হইতে একরূপ কর নেওয়া হয়, ইহাকে দরিদ্রকর বা poor tax বলে, এই করের আয়ে সর্ব্বত্রই এক একটি work-house বা কর্ম্মাশ্রম পরিচালিত হয়। বৃদ্ধ, রুগ্ন বা বিকলাঙ্গ বলিয়া যাহারা কোনওরূপ কর্ম্মই আর করিতে পারে না, তাহারা এই আশ্রমে থাকে ও খাইতে পরিতে পায়। কাজ যারা করিতে পারে, তাহাদের কিছুকিছু কাজ করাইয়া কিছু পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। কেহ একেবারেই এই সব স্থানে থাকে, কেহ বা সময় মত গিয়া কাজ করিয়া কিছু কিছু সাহায্য লইয়া আইসে। কিন্তু এরূপ সব নির্ম্মম কঠোর নিয়মে এই সব আশ্রমের কাজকর্ম্ম পরিচালিত হয় যে কোনওরূপ আনন্দ কি স্বচ্ছন্দতা এখানে কেহ অনুভব করে না। তারপর যেই যাহা পায়, তাহা অতি যৎসামান্য। একেবারে অনাহারে কি অনাবৃত অবস্থায় রাস্তায় পড়িয়া মরিতে হয় না, এইটুকু যা সুবিধা এই সব আশ্রমে ঘটে। তাই, যতই যে দরিদ্র হউক, দুঃখ

প্রভৃতি যে সব প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাতেও এত বেকার কি অক্ষম দরিদ্রের ভরণ-পোষণের সমস্যার তেমন সিদ্ধান্ত কিছু হইতেছে না। অনেকে ইহার কাছেও ঘেঁসে না। কিছু নির্ভর করিলেও সম্পূর্ণরূপে এই সব প্রতিষ্ঠানের উপরে নির্ভরও সকলে করে না। এ নির্ভরতা একেবারেই কাহারও পক্ষে সুখের হয় না। ইহার উপরে নির্ভরশীল জীবন অতি কঠোর—সকলদিকে একেবারে হাত পা বাঁধা অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট একরূপ চিরদাসত্বের জীবন। যতই দুঃখী হউক, যতই দুঃখে ক্লেশে থাক্, মানুষ সর্ব্বদাই খোঁজে, কোথায় স্বাধীনভাবে ইচ্ছামত চলিয়া ফিরিয়া একটু আনন্দ সে পাইবে, আরামে একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবে। শিষ্ট সমাজে সুপথ সব বন্ধ হইলে, তার বাহিরে, তার তলে, অতল পঙ্কে ডুবিয়াও, যে কোনও অপথে কুপথে সে ইহা খুঁজিবে। ডুবিয়া তা খুঁজিয়া পাক্ না পাক্, তবু ডুবিবে, ডুবিয়াই খুঁজিবে।

বহু লোক বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সমাজে এইরূপ সমাজের তলে

পাউক, work-houseএর আশ্রয় বা সাহায্য কেহই বাঞ্ছনীয় মনে করে না। এড়াইতে পারিলে নিতেও যায় না ; অনেক সময় বলে বাধ্য করিয়া জেলে যেমন কয়েদীকে লইয়া যায়, তেমনই ভাবে work-houseএ দরিদ্র বেকারদের ধরিয়া লইয়া যাওয়া হয়। অতি দুঃখীও স্বাধীনভাবে একটু চলিতে ফিরিতে চায়, জীবনের একটু তৃপ্তি কিছুতে পাইতে চায়, না পাইলেও যে পথে যে ভাবেই হউক, তাহা খোঁজে। কিন্তু কোনও work-houseএ কাহারও ভাগ্যে তা ঘটে না। চিরদুঃখের এই দাসত্বের অপেক্ষা জেলের কয়েদীর ভাগ্যও অনেকে বাঞ্ছনীয় মনে করে।

এই সব গেল work-house ; এগুলি সরকারী করে পরিচালিত সরকারী প্রতিষ্ঠান। কোনও ধনীর দানে দরিদ্র প্রতিপালনের যে সব আশ্রম আছে, তাহা সাধারণতঃ alms-house নামে পরিচালিত। এগুলিও সমান কঠোর নিয়মে বিশেষ বিশেষ কমিটির দ্বারা পরিচালিত। গৃহস্থের গৃহে ভিক্ষায় যে করুণা আছে, প্রাণের যে স্পর্শ আছে, তাহাদের মধ্যে তার কিছুই কোথাও নাই।

অতল পঙ্কে ডুবিয়া আছে। Social Residuum বা slum population. এইরূপ সব নামে কেহ কেহ ইহাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

উইলিয়ম গ্রেহাম (William Graham) নামক বিখ্যাত একজন ইংরেজ অধ্যাপক তাহার 'Social Problem' নামক গ্রন্থে ইহাদের সম্বন্ধে বলিতেছেন।—

"We come finally to what is perhaps the largest class of all—the class that constitutes the shame and sorrow and danger of society and civilisation; the class, if class it can be called, that has no common class distinction. save that it possesses nothing; the great lowest stratum of society underneath the lowest paid labouring classes; without land, without money, without goods, without houses, sometimes without houseshelter, for the most part without honest art or handicraft, or ways of obtaining any of these things; the greater part of whom must necessarily beg or steal or receive public charity or contrive by various mysterious arts that necessity teaches, but which science has not penetrated, to get from others the necessary means of life.

This huge class or congeries of classes embraces both those who can work, but for whose services there is insufficient demand, and those past their work—the worn out human plant cast aside by employers because it no longer pays to use it;—those again who never could work from physical or mental weakness

and those who will not work because all work is disagreeable to them."

* * * *

"The victims of nature, of fate of society and social arrangements are here. The victims of their parent's poverty and vice are here—poor perplexed pariahs, summoned without asking into such a world, for them fall cold and frowning and hostile and threatening, with all things occupied in advance and guarded by law with scarce place for them even in the sunshine.

* * * *

"This is our social abyss or inferno on earth, a wide and mournful territory at the bottom of our society, within a bow-shot of our social paradise and abode of the blest, though between a rigidly impassable gulf is fixed—a region in which many are born, and into which many whose plight is sadder pass, but from which few escape ; a land without hope."

* * * *

"Truly terrible things exist—terrible sights are to be seen in these dark regions below the daylight in our so called civilised society."

The Social Problem. William Graham.chap VI, P. P. 148—193.

*'মুক্তি ফৌজ' বা Salvation Armyর প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা জেনারেল চার্লস্ বুথ সাহেবের কথা অনেকেই জানেন। দারুণ

দুর্গতি হইতে, ইহাদের উদ্ধারকল্পেই ইনি প্রথমে এই ত্যাগী কর্ম্মিসংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। বহুশ্রমে তিনি ইহাদের জীবনের অবস্থার একটি বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করেন। Labour and Life of the People, London, এই নামে বিভিন্ন খণ্ডে এই বৃহৎ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন, কোনও কাজকর্ম্ম করেনা বা পায় না, না করিয়া ও না পাইয়া একেবারে এই সামাজিক পঙ্কে ডুবিয়া আছে, এক লণ্ডন সহরেই এরূপ লোকের সংখ্যা শতকরা ৩৮-৭ অর্থাৎ প্রায় চল্লিশ-জন। ইহাদের সঙ্গে, দরিদ্র শ্রমজীবী যাহারা কাজকর্ম্ম করিয়াও তাহাব যৎসামান্য আয়ে কোনও মতে দেহভার বহন করিতেছে, তাহাদের একত্র করিয়া ধরিলে, মোট সংখ্যা অনেক বেশী—শতকরা প্রায় ৭৮ জন হইবে। ধনী ও মধ্যবিত্তের সংখ্যা শতকরা মাত্র ১৭-৮। তাঁহার এই বিবরণী ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাহার পর এই তেত্রিশ বৎসর চলিয়া গেল। ভালর দিকে ইহার তেমন কোনও পরিবর্ত্তন হইয়াছে এরূপ মনে করিবার বিশেষ কারণ নাই। বৈজ্ঞানিক ইভোলিউসন (Evolution)-বাদীরা বলেন, জীবনসংগ্রামে সামাজিক স্বাভাবিক পরিণতির বা progress এর সঙ্গে দুর্ব্বল ও দরিদ্রের এই ক্রমবর্দ্ধনশাল দুর্গতির একটা নিত্য ও অপরিহার্য্য সম্বন্ধ (inevitable and necessary association) রহিয়াছে। অবশ্য নির্ম্মম এই জীবন সংগ্রাম—প্রবলের পক্ষে দুর্ব্বলকে চাপিয়া কি পিছনে ঠেলিয়া দিয়া কেবল নিজেদের পার্থিব স্বার্থের পথে অগ্রসর হওয়াই—যদি মানবজাতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম হয়, তবে এই উন্নতি বা progress দুর্ব্বল বহুজনের ভাগ্যে এই ফলই প্রসব করিবে। তবে মানব ধর্ম্ম বা সেই ধর্ম্মে মানবজাতির উন্নতির এই লক্ষণ প্রাচীন আর কোন জাতির মনীষীরা নির্দ্দেশ করেন নাই। তাঁহারা না করুন, ইহাই মানবজীবনের নৈসর্গিক নীতি এবং এই নীতির কঠোর ধর্ম্মে ইহাই মানবসমাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, ঊনবিংশাতাব্দীর পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ প্রায় সকলে এই মতই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, এই আদর্শ ও এই সব নীতি যতদিন চলিতেছে, ইহার প্রতিকারের কোনও আশা নাই। তাই আচার্য্য Huxley সাহেব বড় দুঃখে একস্থলে বলিয়াছেন,—

"Even the best of modern civilisations appears to me to exhibit a condition of mankind which neither embodies any worthy ideal nor possesses the merit of stability. I do not hesitate to express the opinion that if there is no hope of a large improvement of the condition of the greater part of the human family, if it is true that the increase of knowledge, the winning of a greater dominion over nature which is its consequence, and the wealth *which follows upon that dominion*, are to make no difference in the extent and the intensity of want with its concomitant physical and moral degradations amongst the masses of the people, I should hail the advent of some kindly comet which would sweep the whole affair away as a desirable consummation."

[Government, Anarchy or Regimentation, by Professor Huxley, Ninteenth Century, May, 1890]

একরূপ ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বিখ্যাত পণ্ডিত হেন্‌রী জর্জ্জ এক স্থলে বলিয়াছেন,—

"It is my deliberate opinion that if, standing on the threshhold of being, one were given the choice of entering life as a Terra-del-Feugan, a black-fellow of Australia, an Esquimaux in the Arctic circle,

or among the lowest classes in such a highly civilised country as great Britain; he would make infinitely the better choice in selecting the lot of a savage."

[Progress and Poverty, Henry George, Chap II. Book v.]

কিন্তু সত্যই কি এই দুঃখের একটা সীমা নাই? কত এমন দুঃখের ভার এই পৃথিবী বহন করিতে পারে? এসব প্রশ্নও তাঁহাদের মনে উঠিয়াছে। কিন্তু উত্তর কি তাঁহারা দিয়াছেন? Malthus নামক বিখ্যাত একজন ইংরেজ পণ্ডিত দারুণ এই সমস্যার সমাধানের এক পথ দেখান এবং আজও পর্য্যন্ত বহুপণ্ডিত এই পথের কথাই বলিতেছেন, এবং ইহাকেই একমাত্র পথ বলিয়া মনে করিতেছেন। এই পথ কি? না, দরিদ্রের জনসংখ্যা হ্রাস। কেমন করিয়া ইহা ঘটিতে পারে?

পারে, যদি ইহারা সহজে বিবাহ না করে অথবা বিবাহ করিলেও অধিক সন্তান যাহাতে না হয়, সে সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক ও সচেষ্ট থাকে। অধুনা সেরূপ মতিগতি ইহাদের নাই। কোনও মতে পশুপালের মত এই পৃথিবীতে জীবন ধারণ করিয়া থাকিতে পারিলেই ইহারা নিশ্চিন্ত থাকে, বয়স হইলেই যৌনলালসা পরিতৃপ্তির জন্য বিবাহ করে, আর পালে পালে সন্তান হয়। ইহাদের লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে কি না, খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষ করিয়া তুলিতে পারিবে কি না, এ সব হিসাব একেবারেই কেহ করে না। এইভাবেই দরিদ্রের জনসংখ্যা বাড়িতেছে। কিন্তু পৃথিবী এত খাবার কোথা হইতে যোগাইবেন? তাঁহার বক্ষে এত লোকের কর্ম্মক্ষেত্রের স্থানই বা কোথা হইতে আসিবে? তাই যখনই লোকভার বড় বেশী হয়, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ঝটিকা, জলপ্লাবন, ভূকম্প, যুদ্ধ প্রভৃতি উৎপাতে সংহারলীলার অবতারণা করিয়া প্রকৃতিদেবী এই ভার লঘু করিয়া থাকেন। সুতরাং উপায় হইল মোট দ্বিবিধ। একটি দরিদ্রের নিজের হাতে; সে হিসাবী হইবে, বুঝিয়া চলিবে, নিজেদের জন সংখ্যা যাহাতে

অত্যধিক না বাড়ে, তাহার চেষ্টা করিবে। যদি তারা একটু সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে শেখে, জীবনযাত্রার রীতি (standard of living) একটু উন্নত হয়, আর তাতেই অভ্যস্ত হইয়া উঠে, তবে ক্রমে এই সব হিসাবের বুদ্ধি তাদের মাথায় আসিবে; বুঝিবে, বিবাহিত ও সন্তানসন্ততির দায়গ্রস্ত হইলে এই স্বচ্ছন্দতা তাহাদের থাকিবে না। তখন কাজেই তাহারা বিবাহে বিরত থাকিবে। আর নিতান্তই যাহারা বিবাহ করিবে, যাহাতে প্রতিপাল্য পরিবার বৃদ্ধি না পায়, অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি অন্ততঃ দুই একটির বেশী না জন্মে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকিবে। কিরূপে এইরূপ চেষ্টা সফল হইতে পারে এ সম্বন্ধে অনেক পুস্তকও বাহির হইতেছে। আর যদি তা না করে, যথাযোগ্য শিক্ষা ও বিবেচনার অভাবে দরিদ্রের ঘরে বহু প্রতিপাল্যের আবির্ভাব ঘটে, প্রকৃতি দেবী আছেন, লোকক্ষয়ের যথাপ্রয়োজন ব্যবস্থা তিনি করিবেন। এক কথায়, ইহাদের নিজেদের চেষ্টায় আপনা হইতেই যদি লোকসংখ্যা কম না থাকে, তবে প্রকৃতির শাসনে নানা দৈব উৎপাতে দরিদ্রকে মরিতেই হইবে; আর কোনও উপায়ই ইহার নাই।

উচ্চতর কোনও ধর্ম্মের অনুরোধে সংসার ত্যাগ করিয়া যাহারা সন্ন্যাসী হয়, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। দাম্পত্যপ্রণয়, সন্তানসন্ততির স্নেহ এবং এই স্নেহে তাহাদের প্রতিপালনের আনন্দই, সাধারণ মানবের জীবনকে এ পৃথিবীতে মধুময় করিয়া রাখে। জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দনিকেতনই তার নিজের পরিবারে; তাহাদের লইয়া সংসারধর্ম্মেই জীবনের পরম কৃতার্থতা তার ঘটে; তার স্বাভাবিক সব চিত্তবৃত্তি এই পরিতৃপ্তির দিকেই সর্ব্বদা তাকে প্রেরিত করে। একটু ভাল ঘরে থাকা আর পেট ভরিয়া দুটি খাওয়া, ইহাতেই মানবজীবনের একটা রস কেহ পায় না; জীবনটা কেহ সার্থক মনে করিতে পারে না। জীবন ধারণই তার পক্ষে অতি নীরস নিরানন্দ কঠোর ভার বহন মাত্র হয়। এই ভার লঘু করিবার জন্য যে পথে সে তখন একটু আনন্দ খুঁজিবে, তাহা দুর্নীতির পথ। অনেকে আবার পরিবারিক জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ অপেক্ষা দরিদ্রের

পক্ষে এই দুর্নীতির পথকেও সমাচীন পথ বলিয়া মনে করেন। এই পথের রীতিপদ্ধতি কিরূপ হইলে সুবিধা হয়, যৌনসম্বন্ধে নরনারী কোন্ অবস্থায় কি সব হিসাব কিতাব করিয়া চলিবে, ইত্যাদি বহু কথার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া যাহাতে এই দিকেই লোকের বুদ্ধি ও চিত্তবৃত্তি পরিচালিত হয়, সেরূপ চেষ্টাও লোকহিতকামী (?) অনেক পণ্ডিত করিতেছেন।

ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুনীতি দুর্নীতি, এসবের হিসাব ছাড়িয়া দিলেও, এই সব পথ এবং এই পথাভিমুখ মতিগতির পরিণাম মানব-জীবনের পক্ষে কেবল পার্থিব সম্বন্ধেও সুখকর কি কল্যাণকর হইবে কিনা, সমাজ-স্থিতিকেই রক্ষা করিতে পারিবে কিনা, এ সব কথা ইঁহারা একেবারেই ভাবেন নাই ;—ভাবিয়াছেন, বর্ত্তমান সমাজনীতির—যাহাকে তাঁহারা Progressive Society বা উন্নতপন্থী সমাজের সনাতন নৈসর্গিক ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন—তাহারই অবশ্যম্ভাবী ক্রিয়ার ফলে যে দুর্গতির বিভীষিকা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে ভীতচিত্তে আশু কি প্রতিকার হইতে পারে তাহারই কথা!

অসংখ্য দরিদ্রকে—এক একটি সমাজের অতি অধিকসংখ্যক মানবকে—যাহা এতদূর কঠোর দুঃখে আনিয়া ফেলিতে পারে, তাহা যে progress বা উন্নতির অবস্থা নয়, মানবজীবন বা মানবসমাজ সম্বন্ধে এই নির্ম্মম জীবনসংগ্রামের নীতিই যে নৈসর্গিক নীতি নাও হইতে পারে,—কেবল মানবসমাজের পক্ষে কেন, ইতর জীব-সমাজের পক্ষেও law of mutual aid বা পরস্পর সহায়তার নীতি যে law of mutual struggle বা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংগ্রামনীতি অপেক্ষা সকলের সুখের পক্ষে, সমাজসংহতি রক্ষার পক্ষে, অনেক বড় নীতি হইতে পারে, এই সব কথা যদি তাঁহারা একটু তলাইয়া ভাবিয়া দেখিতেন, তবে ইহার সমর্থনে এরূপ সব কথা বোধ হয় বলিতে পারিতেন না *। বরং

* The chapters which Darwin gave in "The Descent of Man" to the development of human ethics out of the

ইহাই দেখিতেন, পরস্পর এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংগ্রামের পরিবর্ত্তে সহৃদয় সহযোগের নীতি, law of mutual struggleএর পরিবর্ত্তে law of mutual aid যদি মানবে মানবে সামাজিক সম্বন্ধের প্রধান নিয়ামক হইত, শক্তিশালী ধনীর হাতে গিয়া সব ব্যবসায়বাণিজ্য

---

sociable habits of the animal ancestors of man, might have been the starting point for working out a conception excedingly rich in consequences, of the nature and evolution of human societies (Goethe had already divined it); but these chapters of Darwin passed unnoticed. It was only in 1879, in a lecture given by the zoologist Kessler, that we find a clear conception of the relations existing in Nature between the struggle for existence and mutual aid. "For the progressive evolution of a species," the Russian professor said, giving a few examples, "the law of mutual aid has far more importanee than the law of mutual struggle."

* * * *

"Among animals mutual aid is, in fact, not only the most efficacious weapon in the struggle for existence against the hostile forces of Nature and against other inimical species, but it is also the principal instrument of progressive evolution. Even to the otherwise weakest animals it guarantees longevity (and consequenetly accumulation of experience), security for breeding their offspring, and intellectual progress.

* * * *

This fundamental fact was not noticed by Spencer until 1890. He accepted on the contrary, an acute struggle for life within each species as an established fact which needed no proof—as an axiom. * * * It was only in 1890 that he began to understand, up to a certain point, the importance of mutual aid, or rather the sentiment of mutual sympathy in the animal world, and began to collect facts and make observations in the direction. Even then, the primitive

গিয়া না পড়ে সামাজিক কর্ম্মবিভাগের ব্যবস্থা যদি এরূপ হইত, তবে এত লোককে এরূপ দারুণ দুর্গতিতে পড়িতে হইত না,—একটু স্বচ্ছন্দ-ভাবে নড়িয়া চড়িয়া খাটিয়া খাইয়া খাইবার যায়গা এই বসুন্ধরার বুকে তার সকল সন্তানের পক্ষেই ঘটিত। যায়গা দিবার কি আহার যোগাইবার শক্তির অনুপাতে সন্তান বেশী জন্মাইয়া, তারপর সেই ভুল শোধরাইবার জন্য মহামার উৎপাতের সৃষ্টি করিয়া মহারাক্ষসীর ন্যায় তাহাদের ধ্বংস করিবার প্রয়োজন তাঁহার হইত না। সন্তানের জন্ম আপন হিসাবেই তাঁহার তখন কম হইত। এ হিসাবটুকু তাঁহার বুদ্ধিতে নাই, এমন কথা বলা যায় না। *

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, গৃহহীন, কর্ম্মবিহীন এই যে পাপরত দুঃখী জনগণ, চিরকালই সমাজে এইরূপ সব লোক ছিল, চিরকালই থাকিবে। সমাজদেহে ইহা একরূপ অপরিহার্য্য ব্যাধি। হাঁ, ছিল, থাকিবে; ইহা একরূপ অপরিহার্য্য ব্যাধিও বটে। কিন্তু অধুনা এই উন্নতির যুগে, এই Industrial সমাজে, এই ব্যাধি অনেক বেশী বাড়িয়াছে,—বাড়িয়াছে তার কারণ law of mutual aid অপেক্ষা law of mutual struggle এই যুগের প্রধান ধর্ম্ম হইয়াছে,

man always remained for him, the ferocious beast of his own imagination, which exists only on condition of siezing the last bit of food from the mouth of its neighbours.

(Modern Science and Anarchism, Peter Kropotkin, Chap. VI. PP 31-3?)

* বড় বড় যুদ্ধে লোকক্ষয়ের পর কিছুদিন জন্মসংখ্যা বাড়িয়া প্রাকৃতিক নিয়মে এই ক্ষতিপূরণ হয়। যুদ্ধে সাধারণতঃ নারী অপেক্ষা পুরুষ অনেক বেশী মরে। তাই ইহাও নাকি দেখা যায়, এরূপ অবস্থায় কন্যা সন্তান অপেক্ষা পুং সন্তান বেশী জন্মে। সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতদের এই সিদ্ধান্ত। যে প্রকৃতির নিয়মে এমন হইতে পারে, সেই প্রকৃতিকে একেবারে অন্ধ ও জড়ই বা বলি কি প্রকারে? Malthus যে সব প্রাকৃতিক postive checksএর কথা বলিয়াছেন, তাহাতেই বা লোকক্ষয়ে এই গুরুতার তেমন লঘুতর হইতেছে কই?

এবং কর্ম্মবিভাগ কৌলিক বা সাম্প্রদায়িক রীতি ছাড়িয়া অবাধ ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার অধীন হইয়াছে।

ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতির পক্ষে একটা প্রতিযোগিতার প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাহারও একটা সীমা থাকা চাই, যাহা ছাড়াইয়া গেলে এই প্রতিযোগিতা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও দরিদ্রের পক্ষে একেবারে প্রাণান্তকর ব্যাপার হইয়া উঠে। সকলক্ষেত্রে সমানভাবে শক্তিমান্ ধনী ও দুর্ব্বল দরিদ্রের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা যেখানে ঘটে, সেখানে দুর্ব্বল দরিদ্রের সাধ্য নাই কোনও ক্ষেত্রে কোনও কাজকর্ম্মে আপনাদের কোনও স্বার্থ, কোনও পদপ্রতিষ্ঠা তাহারা রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রায় সমাবস্থাপন্ন গৃহস্থদের মধ্যে প্রতিযোগিতা সাধারণতঃ যে ভাবে চলে, তাহাতে কেহ বড় মারা যায় না। কারণ অপর সকলকে একেবারে চাপিয়া রাখিতে পারে, এত বড় শক্তি এ অবস্থায় কাহারও হাতে বড় থাকে না। পূর্ব্বে কৌলিক বা সাম্প্রদায়িক ব্যবসায়বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা যাহা ছিল, এইরূপই ছিল; এমন মারাত্মক বা cut-throat ধরণের কখনও তাহা হইত না।

তার পর আরও একটি বড় কথা ইহার মধ্যে আছে। এই সব কুল, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়, যে নামেই আমরা তাহাদের অভিহিত করি, সব বাঁধা ছিল পরস্পর মমত্বমূলক একটা সহযোগিতার বন্ধনে। সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ সকলেই ছিল সকলের 'জাত ভাই'। এই 'জাত ভাই'এর বোধ সামাজিক সকল প্রকার সম্বন্ধে সকলকে পরিচালিত করিত,—তাই law of mutual aid হইয়াছিল এই সব গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মূল ধর্ম্ম বা ধারকশক্তি। মূলে এই ধর্ম্মকে মানিয়া প্রতিযোগিতা বা স্বার্থের বিরোধ যেটুকু চলিত, তাহা law of mutual struggleএর আমলে আইসে না। এই law of mutual struggle এইরূপ সব গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে ভাঙ্গে, ধরিয়া এক করিয়া রাখিতে পারে না। 'জ্ঞাতি শত্রু' সুসময়ে আমার সঙ্গে

বিরোধ যতই করুক, অসময়ে সে আমার 'জাত ভাই'; জাত ভাই ভাইএর দায়িত্ব ত্যাগ করিতে পারে না।

'জাতভাই' এর দায়িত্ব এই যে জাতভাই কেহ নিরন্ন হইলে সে তাহাকে অন্ন যোগাইবে, গৃহহীন হইলে গৃহে স্থান দিবে, খাটিয়া খাইবার কাজ না পাইলে আপনার কাজের ভাগী তাকে করিয়া নিবে,—সকল রকম দুঃখে বিপদে আপন জন হইয়া তার পাশে দাঁড়াইবে, তাকে রক্ষা করিবে। এই যা সব করিবে, কেবল কৃপায় নয়, আপন বলিয়া তার সুখ দুঃখ মঙ্গলামঙ্গলের জন্য আপনি দায়িক বলিয়া। কৃপার দান সহৃদয় ধনীরাও অনেক দূর হইতে, বাহির হইতে, উপর হইতে, দুঃখী দরিদ্রকে করিয়া থাকেন। কিন্তু জাতভাই দূর হইতে, বাহির হইতে, উপর হইতে, পরের মত এমন কৃপা তার জাতভাইকে করে না। সহায়তা যাহা করে, করে মমত্বের বোধে,—জাতভাই জাতভাইএর অবশ্য প্রতিপাল্য, অবশ্য রক্ষণীয়, স্বাভাবিক এই সংস্কার বশতঃ,— জাত-ভাইএর এই দাবী জাতভাইএর উপরে আছে, মর্ম্মে ইহা অনুভব করিয়া। এই দাবীর দেয় দেওয়া তার অভ্যাসই হইয়া গিয়াছে,— দিয়া দিয়া না দিয়া আর পারে না।

যৌথ পরিবারের কথা আমরা জানি। পাশ্চাত্য ব্যষ্টিস্বাতন্ত্র্যের (Individualismএর) প্রভাবে আমাদের শিক্ষিত নাগরিক জীবনে এইরূপ পরিবারের বন্ধন এখন যতই শিথিল হইয়া পড়ুক, পল্লী অঞ্চলে প্রাচীন ধরণের যৌথ-পরিবার এখনও বর্ত্তমান আছে। যতই অক্ষম কি নির্গুণ অথবা রুগ্ন কি বিকলাঙ্গ কেহ হউক, পরিবারভুক্ত অন্য সকলের সঙ্গে সমান সুখে ও সমান মর্য্যাদায় প্রতিপালিত হইবার একটা দাবী তার আছে। দাবী অবজ্ঞাত হইলে, রোজগার করে না কি কম করে বলিয়া, কৃপার পাত্রের ন্যায় ছোট করিয়া কাহাকেও রাখিলে, সে বড় নিন্দার কথা হয়, বড় একটা অন্যায় ও অধর্ম্ম হইল বলিয়া সকলে মনে করে। গোষ্ঠীগত বা সম্প্রদায়িক দায়িত্বও কতকটা এইরূপ পরিবারিক দায়িত্বের মত। তবে মমত্বের সম্বন্ধ এক একটি

পরিবারে যত ঘনিষ্ঠ, এক এক গোষ্ঠীতে কিছু আর তত হইতে পারে না। আমার আপন ঘরের ভাইটি আমার যত আপন, জ্ঞাতভাই কিছু আর তত আপন হয় না। কিন্তু তত না হইলেও, সেও ত আপন বটে, ফেলিবার নয়, ফেলিতে তাকে পারি না। সে উপবাসী থাকিলে, আমি সুখে ভাত খাইতে পারি না,—সে গাছতলায় পড়িয়া থাকিলে, আমি নিশ্চিন্ত আরামে ঘরে শুইয়া থাকিতে পারি না। এরূপ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় যেখানে আছে, কেহই তাহা পারে না।

পূর্ব্বে যখন গৃহস্থেরা ঘরে ঘরে ব্যবসায় করিত, এইরূপ গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, তারা বাঁধা ছিল। এইরূপ কোনও না কোনও গোষ্ঠীর মধ্যে দাঁড়াইবার একটু স্থান নাই, আপন বলিয়া আর পাঁচজনের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ নাই, এমন অসহায় অবস্থায় অতি অল্প অভাগাই এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিত *। তবে স্বভাবতঃই এমন দুর্ব্বুদ্ধি ও অসদ্‌বৃত্ত লোক আছে, যাদের কোনও নীতির বন্ধনই কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারে না। ইহারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া চৌর্য্য বা দস্যুতা অবলম্বন করে, সমাজের বাহিরের লোক (প্রকৃত out-caste) হইয়া পড়ে। অবশ্য ভিক্ষায়, চৌর্য্যে বা অন্যরূপ অসদ্‌বৃত্তি অবলম্বনে জীবনযাপন করে, এইরূপ দুই চারিটা গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ও সর্ব্বত্র ছিল; এখনও আছে! সমাজের নিম্নতম স্তরে আগে যে সব দুর্ব্বৃত্ত ও দুঃখী ছিল, তারা ইহারাই। সাধুবৃত্তিক গৃহস্থ

* মনুসংহিতায় দ্বাদশ রকম পুত্রের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রী পুরুষের যত রকম সাম্মিলনে সন্তান জন্মিতে পারে, এই দ্বাদশ রকম পুত্রের মধ্যে সকলেরই কোনও না কোনও স্থান গিয়া পড়ে। সকলেরই লোকসমাজে একটা স্থান ছিল, সন্তানের পিতৃকুলের, মাতৃকুলের, অথবা যে তাহাকে গ্রহণ করিত তাহার কুলের, একটা দায়িত্ব তাহার প্রতিপালনের জন্য থাকিত। শৈশবে স্বজনপরিত্যক্ত অনেক বালকও পুত্ররূপে এই ভাবে কাহারও কর্ত্তৃক গৃহীত হইত। কানীন, সহোঢ় ও গূঢ়জ পুত্রও মাতার যে স্বামী, তার পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইত; পিতার দায়িত্ব তাকে পালন করিতে হইত।

যাহারা খাটিয়া খাইতে চায়, অথচ অবস্থা বিপর্য্যয়ে দুঃস্থ হইয়া পড়ে, অনন্যোপায় হইয়া তাহারা গিয়া ইহাদের দল বড় পুষ্ট করিত না। সুতরাং ইহাদের সংখ্যা কোথাও এমন অত্যধিক হইত না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আধুনিক যুগে ব্যবসায়িক পদ্ধতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আগেকার সব ব্যবসায়িক সম্প্রদায় বা guild ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত গৃহস্থেরা সমান সব কারখানার কুলি হইয়াছে। এরূপ অবস্থাপন্ন লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে ছোট ছোট গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের গৃহস্থজীবনসুলভ সেই সহৃদয় মধুর মমত্বের সম্বন্ধ একে ত সম্ভবই বড় হয় না,—তার পর আবার পূর্ব্বের সেই মমত্বমূলক সহযোগিতার আদর্শও উঠিয়া গিয়াছে, law of mutual aid এর স্থানে law of mutual struggle সমাজের উচ্চনীচ প্রায় সকল স্তরেই মানবে মানবে ব্যবসায়িক সম্বন্ধের নিয়ামক হইয়া উঠিয়াছে। কেহ এখন আর সেরূপ কোনও গোষ্ঠীর মধ্যে আর পাঁচজনের আপন জনের মত জন্মে না, এইরূপ মধুর সম্বন্ধের মধ্যেও বড় হইয়া উঠে না। পিতা মাতার অভাব হইলে, অথবা তাহারা পালন করিতে অসমর্থ হইলে, শিশুরা এখন একেবারেই অসহায়, আপন বলিতে তাহাদের আর কেহই থাকে না। বয়স্ক কেহও অক্ষম হইয়া পড়িলে, আপন বলিয়া, জাত ভাই বলিয়া, কাহারও উপরে তার কোন দাবী আর এখন নাই। সকলেই যার যার মত স্বতন্ত্র, নিজের সুখ দুঃখের জন্য দায়ী কেবল নিজে। আর উপরে আছে এক ষ্টেট্। কিন্তু ষ্টেট্ নির্ম্মম, মানবতার প্রাণের সাড়া ইহার মধ্যে পাওয়া যায় না। ষ্টেট্ তার আইনের বলে তার কর্ম্মচারীদের দ্বারা বাঁধা রুটিনের রীতিতে প্রজাকে রক্ষা করে, শাসন করে, কিন্তু এই সব আইন মমতার মধুর সম্বন্ধে সহজভাবে গড়িয়া উঠে না, যেমন গোষ্ঠীগত রীতিনীতি গড়িয়া উঠে। ষ্টেটের কর্ম্মচারীবর্গ কাহারও 'জাতভাই' নয়, জাতভাইএর সে মমতাও কেহ অনুভব করে না। Work-house, orphanage প্রভৃতি যে সব প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ষ্টেট্ দুঃখীর সহায়তা করে, তাও আইনের বস্তু; ষ্টেটের এক

একটি কর্ম্মবিভাগের (departmentএর) মত। উপরে এক ষ্টেট্, আর অনেক নীচে এই সব দুঃখী প্রজা, মাঝে আপন বলিয়া তাহাদের ধরিতে, মমতায় তাদের মঙ্গলের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে, আর কেহই নাই। অধুনা শ্রমিক সাধারণের মধ্যে স্বার্থরক্ষার জন্য যে সব সমবায় বা union হইতেছে, সে সবও কঠোর নিয়মে বাঁধা বড় বড় organisation। দুঃখীর দুঃখ কিছু তাহাতে দূর হয় বটে, কিন্তু আগেকার সব গোষ্ঠীতে বা সম্প্রদায়ে যে মমতার দায়িত্ব পরস্পর অনুভব করিত, সেই মধুর বস্তুটি এই সব organisationএর কোনও সহায়তার মধ্যে নাই; থাকিতেও পারে না। কাজেই দুঃখ যেমন বাড়িয়াছে, জীবন সব দিকে যেমন কঠোর ও নীরস হইয়া উঠিয়াছে, লোকের মতিগতি ও বুদ্ধিও তেমনই কঠোর ও পশুবৎ (brutalised) হইয়া পড়িতেছে। যাহারা কাজ পায় না, কাজের বাহির হইয়া পড়ে, অথবা কাজের মধ্যেও এরূপ কঠোর নীরস জীবনভার বহিতে পারে না,—তাহারা সকলেই এই slumএ বা সমাজ-পঙ্কে গিয়া নিমজ্জিত হয়। বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাদের সংখ্যা যে অনেক বেশী হইবে, একথা আর নূতন করিয়া বলিবার আবশ্যকতা কিছু নাই।

এই গেল নিম্ন শ্রেণীর শ্রমিক জনগণের কথা—যাহারা অধুনা সাধারণতঃ প্রলেটারিয়েট (Proletariat) নামে পরিচিত। 'বুর্জ্জোয়াজি' বা উচ্চতর শিক্ষিত ভদ্র-সমাজের মধ্যেও আর্থিক অবস্থায় হীন যাঁহারা, তাঁহারাও এই Industrial যুগে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে কোথাও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। ইঁহাদের মধ্যে কতক অংশ উপযুক্ত শিক্ষা ও যোগ্যতা লাভ করিয়া রাজকর্ম্ম, শিক্ষকতা, যাজকতা, বিদ্যানুসন্ধান, কাব্যকলাদির অনুশালন, আইন ব্যবসায় প্রভৃতি কর্ম্মে—ইংরেজিতে যাহাকে learned professions বলে সেই সব বৃত্তিতে—জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকেন। আর্থিক অবস্থায় সকলে অতিশয় উন্নত না হইলেও,

পদমর্য্যাদায় সমাজে ইঁহাদের স্থান উচ্চে, প্রতিপত্তিও যথেষ্ট আছে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেই যদি এই সব বৃত্তিতে এইরূপ সচ্ছল অবস্থায় ও সম্মানে থাকিতে পারিতেন, তবে দুঃখের কোনও কথা ছিল না। কিন্তু কোথাও তাহা সম্ভব হয় না। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার নানা রকম স্তরও আছে। সকলের সমান প্রতিভা নাই; সমান শিক্ষায় সমান যোগ্যতাও সকলে লাভ করিতে পারেন না। অতি অধিক সংখ্যক লোকের পক্ষে এই সব বৃত্তিতে (learned professionsএ) প্রতিষ্ঠা লাভ করিবারও অবসর থাকে না। ব্যবসায়বাণিজ্যেই অধিকাংশের জীবিকা চলিতে পারে, এবং তাই বরাবর চলিয়া আসিতেছে। যে সব ব্যবসায় কেবল দৈহিক শ্রমে চলেনা, মাথার বুদ্ধিতে ভাল করিয়া গুছাইয়া চালাইতে হয়, তাহা এই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরাই বরাবর করিয়া আসিতেছেন,—ইঁহারাই করিতে পারেন। 'বুর্জ্জোয়াজি' বলিতেও উচ্চতর ব্যবসায়বাণিজ্যে নিযুক্ত, শিক্ষিত ও পরিমার্জ্জিত আচারবিশিষ্ট, মধ্যবিত্ত (অর্থাৎ অভিজাত ধনী ভূস্বামী ও দরিদ্র শ্রমিক এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থাপন্ন) নাগরিক সম্প্রদায়কেই বুঝায়। Learned professions যে সব, আগে সেগুলি প্রধানতঃ যাজক ও ভূস্বামী সম্প্রদায়ের হাতেই ছিল। অধুনা সামানভাবে তাহা বুর্জ্জোয়াজির হাতে আসিয়াছে। বৃত্তিগত যে সম্প্রদায়িক ভেদ, তাহা, যেমন নিম্নতর শ্রেণীর মধ্যে, তেমনই উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যেও এখন উঠিয়া গিয়াছে। উচ্চতর সকল সম্প্রদায়ই এখন সমান এক বুর্জ্জোয়াজি-শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন বলিলেই হয়। ধনবত্তায় ও পদমর্য্যাদায় ব্যবসায়িক বুর্জ্জোয়াজিতে আর অভিজাত ভূস্বামীতে পার্থক্য বড় কিছু নাই,—বরং বড় বড় ব্যবসায়ী কেহ কেহ যেরূপ অমিত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া থাকেন, কেবল ভূস্বামী কাহারও ভাগ্যে সেরূপ ঘটে না। যাঁহারা হন, ব্যবসায়ে ধন খাটাইয়াই হইতে পারেন,—কেবল জমিদারীর আয়ে millionaire, multimillionare অর্থাৎ ক্রোরপতি কি বহুক্রোরপতি কেহ হইতে

পারেন না। জমিদার, কি বড় বড় যাজক, কি অন্য যে কোনও উচ্চতর বৃত্তির লোকই হউন, সকলের উদ্বৃত্ত বা সঞ্চিত ধন সমান-ভাবেই ব্যবসায়ে খাটে, সকলেই সমানভাবে ব্যবসায়ে খাটাইয়া যার হাতে যে ধন আছে তাহা বাড়াইতে চান। ইঁহারা সব অন্য বৃত্তিতে আছেন, নিজেরা ব্যবসায় করেন না, বড় বড় ব্যবসায়ের অংশ খরিদ করেন, এবং তাহার লাভের বা ডিভিডেণ্ডের টাকা তাঁহাদের উপরি আয়। এই আয়ের টাকা দিয়াও আবার নূতন নূতন ব্যবসায়ের অংশ অনেকে কিনিয়া থাকেন। এই ভাবে ক্রমে টাকা বাড়িয়াও অনেকে ইঁহারা বড় বড় ধনী হইয়া উঠেন।

কিন্তু ঘরে এইরূপ জমা টাকা আছে, অথবা অন্যান্য বৃত্তিতে যাহা আয় করেন, তাহার উদ্বৃত্ত টাকায় ব্যবসায়ের অংশ খরিদ করিতে পারেন, এরূপ ভাগ্যবান্ লোকের সংখ্যা যে খুব বেশী তা নয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উচ্চতর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ যাঁহারা রাজ-কর্ম্মাদি ভদ্রজনোচিত বৃত্তিতে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন, তাঁহাদের সংখ্যা বড় অধিক কোথাও হয় না। বেশীর ভাগ লোককেই সাক্ষাৎ-ভাবে ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয়। কিন্তু ধনী মহাজনদের প্রতিযোগিতায় অপেক্ষাকৃত অল্প ধনের মালিক যাঁহারা তাঁহাদের পক্ষে ক্রমেই ইহা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। কেন হইবে না? যে নীতিতে ব্যবসায় বাণিজ্য চলে, তাহাতে ইহা যে অনিবার্য্য।

যার যত টাকা আছে, সব তা সে যে কোনও ব্যবসায়ে খাটাইতে পারে। যে ব্যবসায়ে যে যত বেশী টাকা খাটাইতে পারিবে, টাকা কোনও ব্যবসায়ের মধ্যে ফেলিয়া আশু লাভ না চাহিয়া যে যতদিন অপেক্ষা করিতে পারিবে, তার তত বেশী সুবিধা হইবে, প্রতিযোগিতার সংগ্রামে সে তত বেশী টিকিতে পারিবে। যে তা পারিবে না, তাকে তত হটিয়া যাইতে হইবে। এই ভাবে ছোট ছোট ব্যবসায় ক্রমে সব উঠিয়া গিয়া, বড় বড় কোম্পানীর বড় বড় ব্যবসায়গুলি আরও বড় হইয়া উঠিতেছে। কলকারখানার প্রতিযোগিতায় গৃহস্থ শিল্পীদের যে দশা হইয়াছিল, বহু

মূলধনের মালিক বড় বড় কোম্পানীর প্রতিযোগিতায় অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট মহাজন ও কোম্পানীর মালিক বা পরিচালকদেরও সেই দশাই হইতেছে। স্বাধীন ব্যবসায় তাহাদের উঠিয়া যাইতেছে, বড় বড় কোম্পানীর মধ্যে কেরানীগিরি বা অন্য রকম চাকরী নেওয়া ব্যতীত আর গত্যন্তর রহিতেছে না। আগে যারা বুর্জ্জোয়স্ (Bourgeois) ছিল, তাহারাও এই ভাবে অনেকে প্রলেটারিয়েট্ (Proletariat) হইয়া পড়িতেছে। ছোট ছোট দশবিশটা ব্যবসায়ে যত লোক করিয়া খাইতে পারে, সব গিয়া দুই একটা বড় ব্যবসায়ে জমিলে, তত লোক তাহার কাজে লাগে না। সুতরাং স্বভাবতঃই এই সব চাকরীর demand বা চাহিদা অপেক্ষা supply বা যোগান কম। বেতনের হারও কম হয়; সকলে আবার কাজও পায় না। ইহাদের মধ্যেও নিম্নতর শ্রমিক প্রলেটারিয়াটদের ন্যায় সমান সেই বেকার-সমস্যা দেখা দিয়াছে। নূতন কোনও পথে নূতন কোনও ব্যবসায় করিবে, তারও কোনও উপায় নাই। সর্ব্বত্র সমান সেই বড়র প্রতি-যোগিতা; সব পথেই বড়র বড় বড় টাকার শক্ত দেয়াল খাঁড়া হইয়া রহিয়াছে, মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও এমন একটু খানি ঠাঁই তার খসিয়া পড়িবে না, যে তার ফাঁকে গলিয়া কেহ ওধারে যাইতে পারে।

আধুনিক এই প্রতিযোগিতার স্বাভাবিক ও সাধারণ ধর্ম্মে এইরূপই ঘটিবে; ছোট ছোট ব্যবসায় সব উঠিয়া গিয়া কেবল বড় বড় ব্যবসায়গুলি মাত্র রহিবে। তারপর এই সব বড় বড় ব্যবসায়ীরা যদি একটা জোট বাঁধিতে পারেন, তবে ত কথাই নাই। যতই বুদ্ধির বল কি টাকার বল থাক্, নূতন কাহারও কি সাধ্য যে কোন ব্যবসায়ের মধ্যে গিয়া কিছু করিয়া উঠিতে পারে? প্রত্যেকটি ব্যবসায়ই এইরূপ এক একদল ধনী মহাজনের একচেটিয়া হইয়া পড়ে। হইতেছেও তাই।

ধরুন, কোনও এক দেশে আগে ছোট বড় নানা রকম একশতটি লোহার কারখানা ছিল। প্রতিযোগিতায় ক্রমে ছোটগুলি সব

উঠিয়া গেল, বড় মাত্র দশটি রহিল। তখন এই দশটি ব্যবসায়ের কর্ত্তারা দেখিলেন, নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিয়া এমন লাভ কিছু নাই, ক্ষতিও হইতে পারে। তার চেয়ে এই দশটি ব্যবসায়কে সমবেত কর্ত্তৃত্বে চালাইলে অনেক সুবিধা হইবে। এই দশটি কারবারের দশটি আফিসের কাজ এক আফিসের মধ্যে আনা যাইতে পারে। তাহাতেও খরচ অনেক কম পড়িবে। দশটি আফিসে যত লোক আছে, একটি সমবেত ও বৃহত্তর আফিসের কাজ তার সিকিলোকেও চলিতে পারে। তারপর প্র'তযোগিতা কিছু নাই, উৎপাদিত দ্রব্যের দর তাঁহারা চড়াইয়া রাখিতে পারেন। লোকে এই বেশী দাম দিয়াই সব কিনিবে, অপেক্ষাকৃত অল্প দ্রব্যের উৎপাদনেই তাঁহাদের লাভ বেশ পোষাইয়া যাইবে। ইহাতেও অপেক্ষাকৃত অল্প লোক রাখিয়া কম খরচে ব্যবসায় চালান যায়। বিভিন্ন কারবারের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকিলে, অনেক সময় অনেক বেশী দ্রব্য উৎপন্ন হয়। Demand বা চাহিদার মাপে যোগান বা supply বেশী হইয়া পড়ে, মাল সস্তায় বেচিতে হয়; অন্ততঃ বেশী দামে বেচিবার কোনও ভরসাই থাকে না। কিন্তু এই ভাবে সমবেত হইতে পারিলে, আগে বেশ হিসাব কিতাব করিয়া মাত্র তত পরিমাণ মাল তাঁহারা উৎপাদন করিতে পারেন, যাহাতে supply বা যোগান সর্ব্বদাই demand বা চাহিদার কম থাকে, আর বেশ ভাল দরে সব বিকায়। দেশের লোক বেশী দরে জিনিশ কিনিতে বাধ্য হইবে। হউক, তাঁহাদের কি? তাঁহারা ত অল্প খাটিয়া, অল্প টাকায় অল্প লোক খাটাইয়া, পূরা কি পূরার বেশীও লাভ করিয়া নিতে পারেন।

এই সব সমবায়গুলির নাম হইয়াছে 'ট্রাষ্ট' (trust)। আধুনিক ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল (Industrial) সভ্যতায় আমেরিকা সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর। প্রাচীন সামাজিক সম্প্রদায় বিভাগ ও রীতিনীতির প্রভাব ইয়োরোপের অনেক দেশ হইতে একেবারে লোপ পায় নাই,—পূরাভাবে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সমাজও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। কিন্তু আমেরিকা (অর্থাৎ

আমেরিকার United States নূতন দেশ, নূতন সাম্য ও স্বাধীনতার নীতিকে পূরাভাবে অবলম্বন করিয়াই এই দেশের অভ্যুদয় হইয়াছে। আমেরিকায় রাজা নাই, রাজবংশ নাই, অভিজাত কুল নাই, প্রাচীন কোন চার্চ্চ নাই, প্রতিপত্তিশালী ধারাবাহিক কোনও যাজকসম্প্রদায় নাই; এ সবের কোনও প্রভাব কোথাও নাই। ধনী মহাজনরাই সমাজের শীর্ষস্থানীয়, দেশের সব শক্তিও সম্পূর্ণরূপে ইঁহাদের আয়ত্ত। সুতরাং আধুনিক ব্যবসায়িক পদ্ধতির পরিণতি যতদূর হইতে পারে, আমেরিকায় তাহা হইয়াছে। সব ব্যবসায়ই—গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয় পর্য্যন্ত—একেবারে বড় বড় ট্রাষ্টের হাতে গিয়া পড়িয়াছে।

এই সব ট্রাষ্টের এক দিকে যেমন লক্ষ্য কেমন করিয়া অল্প দ্রব্য জন্মাইয়া বেশী দামে বেচিয়া অনেক লাভ করিবেন, অন্যদিকে আর একটি বড় লক্ষ্য এই যে কেমন করিয়া সকল প্রতিদ্বন্দ্বিকে দমন করিয়া ব্যবসায়ে আপনাদের এই একাধিপত্য রক্ষা করিবেন। তার জন্য প্রত্যেক ট্রাষ্টের তহবিলে বহু জমা টাকা (reserved fund) থাকে। বাহিরের কেহ এইরূপ ব্যবসায় আরম্ভ করিলে, ট্রাষ্ট অবিলম্বে তার দাম একেবারে কমাইয়া দেয়, খরচও পোষায়না এমন দরে তাহা বিক্রয় করিতে থাকে। ট্রাষ্টের এমন ক্ষতি তাহাতে কিছু নাই। রিজার্ভ ফাণ্ডের টাকা আছে,—তাহা হইতে আপাততঃ এই লোকসান পোষাইয়া যায়। কিন্তু নূতন যারা ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে, তারা অচিরে ফেল পড়ে। তাদের ত এমন জমা টাকা কিছু নাই; কি দিয়া কতদিন এই লোকসানের ভার বহিবে? তার পর ইহারা যখন ফেল পড়ে, প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহ থাকে না, ট্রাষ্টের কর্ত্তারা তখন জিনিশের দাম আগের চেয়েও বেশী চড়াইয়া দেন। কখনও কখনও প্রতিদ্বন্দ্বীর ব্যবসায়টি বেশী টাকায় নিজেরা কিনিয়াও নেন, যদি বুঝিতে পারেন, নূতন হইলেও প্রতিদ্বন্দ্বী এত প্রবল যে এই ভাবে

তার ব্যবসায় নষ্ট করা সহজ হইবে না।* যখন যেমন সুবিধা তাই করেন। মোট কথা, কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীকে কোনও ট্রাষ্ট তিষ্ঠিতে দেন না, যাহাতে আপনাদের এই প্রভুত্ব, এই monopoly, একটুও ক্ষুন্ন হইতে পারে। নিজেরাও প্রচুর দ্রব্য উৎপন্ন ইচ্ছা করিয়াই করেন না, পাছে সস্তায় বেচিতে হয়; আবার কেহ যদি করে, তাহাও এই ভাবে রোধ করেন। লোকে কি করিবে? কোথায় আর তা কম দরে পাইবে? বেশী দরেই কিনিতে বাধ্য হয়। ট্রাষ্ট্রওয়ালাদেরও রিজার্ভ ফাণ্ডের যেটুকু খাকতি পড়িয়াছিল, তাহা এই ভাবে পুরিয়া উঠে। শ্রমিকদের বেতনের হার আমেরিকায় অপেক্ষাকৃত উচ্চতর। ইহাদের সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য উচ্চহারে মহাজনরা বেতন দিয়া থাকেন। কিন্তু এই খরচও সুদে আসলে পোষাইয়া নেন, জিনিশের দাম চড়াইয়া রাখিয়া। যে পরিমাণে এই সব দ্রব্য শ্রমিকদের কিনিতে হয়, সেই পরিমাণে এই বেশী বেতনও যে তাদের ব্যর্থ হয়, ইহা বলাই বাহুল্য।

এই সব ট্রাষ্টের monopoly বা ব্যবসায়িক একাধিপত্য ত আছেই; তা ছাড়া আর এক কৌশল বড় বড় মহাজন বা মহাজন-সমিতি (commercial syndicates) অনেক সময় অবলম্বন করিয়া থাকেন। সকলের নিত্য ব্যবহার্য্য কোনও দ্রব্য সব তাঁহারা আগেই

* আমেরিকার বিখ্যাত ধনকুবের কার্ণেগির নাম অনেকেই জানেন। কার্ণেগির অতি সুব্যবস্থিত একটি ইস্পাতের ব্যবসায় ছিল। যত সুলভে যেরূপ উৎকৃষ্ট ইস্পাতের রেল প্রভৃতি তাঁহার কারখানায় প্রস্তুত হইত, আমেরিকার ইস্পাতের ট্রাষ্টওয়ালাদের ব্যবসায়ে তাহা সম্ভব হইত না। অন্য উপায়ে ধনকুবের কার্ণেগিকে হটাইয়া দেওয়া সম্ভব নয় বুঝিয়া তাঁহারা ৪।৫ গুণ অধিক মূল্য দিয়া তাঁহার এই ব্যবসায়টি কিনিয়া নেন। কার্ণেগি ব্যবসায়ে যে টাকা ফেলিয়াছিলেন, তাহার অনেক বেশী পাইলেন, ইহারাও এখন একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত হইতে রক্ষা পাইলেন। ক্ষতি হইল জনসমাজের; সুলভে ভাল ইস্পাত তাহাদের কাজে লাগাইবার যে সুযোগ হইয়াছিল তাহা ঘুচিয়া গেল।

কিনিয়া ফেলেন, অথবা আগাম দাদন দিয়া উৎপাদকদের এমন ভাবে হাতে রাখেন, যে তাহারা তাঁহাদের ফর্ম্মাইস মত ছাড়া কোনও দ্রব্য উৎপাদন করে না। এই ভাবে সেই দ্রব্যের বাজারে তাহাদের একটা একচেটিয়া অধিকার জন্মে। তারপর খুব বেশী লাভ হয়, এমন চড়া দরে তাঁহারা তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। লোকে নিরুপায় হইয়া সেই দরেই এই সব দ্রব্য কেনে। না কিনিয়া উপায় কি?—কোথায় আর পাইবে? ব্যবসাদারীর এই যে কৌশল, তাহা সাধারণতঃ corner নামে পরিচিত।

গোড়ায় অবাধ প্রতিযোগিতামূলক সব ব্যবসায় এই ভাবে 'ট্রাষ্টে'র ও 'কর্ণারে'র প্রভাবে এখন ধনী মহাজনদের একচেটিয়া হইয়া পড়িয়াছে। দুই দিক হইতে ইহা লোকসমাজকে পীড়ন করিতেছে। এক ব্যবসায়ক্ষেত্র হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প ধনের মালিক যারা, তারা বহিষ্কৃত হইয়া ক্রমে প্রলেটারিয়েট্ দলে গিয়া পড়িতেছে। তার পর সমগ্র সমাজের দরিদ্রজনগণ নিরুপায় হইয়া চড়া দরে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিতে বাধ্য হইতেছে। *

---

* প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বাজারে ধনী মহাজনদের এই প্রভুত্ব যে দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে কতদূর আর্থিক পীড়নের হেতু হইতে পারে, তাহা আজকাল এ দেশের অবস্থা হইতেও কতক পরিমাণে উপলব্ধি আমরা করিতে পারিব। বাঙ্গলার কাপড়ের বাজারে মাড়োয়ারী বণিকদের যে প্রভুত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা কতকটা আমেরিকার এই সব ট্রাষ্টের মত বলা যাইতে পারে। দেশী ও বিলাতী মিলওয়ালাদের সঙ্গে ইহাদের আগাম একটা বন্দোবস্ত হয়। কি পরিমাণ কাপড় বাজারে আমদানী করিলে সুবিধা হয়, তার একটা হিসাব ধরিয়া ইহারা এই বন্দোবস্ত করেন। সেই চুক্তি মতই কাপড় প্রস্তুত করিয়া মিলওয়ালারা ইহাদের হাতে দেন। সুতরাং কাপড়ের supply বা যোগান একেবারে ইহাদের এই হিসাবের আয়ত্ত। এই ভাবে ইঁহারা যে পরিমাণ মিলের কাপড় বাজারে আমদানী করিবেন, তার বেশী আর আমদানী হইবার যো নাই। দরও ইহারা বাঁধিয়া দেন, তার কম দরেও কোনও কাপড় বাজারে চলিতে পারে না। বেশী আমদানী করিয়া কমদরে কে চালাইবে? ইঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বাজারে

এই সব গেল এক একটি পৃথক্ ব্যবসায়ের পৃথক্ পৃথক্ 'ট্রাষ্ট'। কিন্তু এক এক দেশের বিভিন্ন ব্যবসায় পরস্পরের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। প্রত্যেক ব্যবসায়ের বহু স্বার্থ অপর বহু ব্যবসায়ের স্বার্থের সঙ্গে বহু পরিমাণে ও বহু ভাবে সংস্পৃষ্ট। সব ব্যবসায়ই আবার বড় বড় ব্যাঙ্কের সঙ্গে আর্থিক সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। দেনা

আর কেহ নাই। যে দরে যে পরিমাণে যেরূপ কাপড় ইঁহারা বাজারে যোগাইবেন, সেই পরিমাণে সেই দরেই সেই কাপড় খরিদ্দারদের কিনিতে হইবে।

মিলওয়ালারাও ইঁহাদের ফরমায়েস যেরূপ ও যে পরিমাণ হয়, সেই পরিমাণে সেইরূপ কাপড়ই মাত্র উৎপাদন করেন। বেশী উৎপাদন করিলে বাজারে তাহা চালান সম্ভব হয় না। ইঁহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া আর কেহ তাহা চালাইতে পারে না। এরূপ মূলধনের কি ব্যবসায়িক সংগঠনের বল আর কোথাও কাহারও নাই। কেহ চেষ্টাও করে না সত্য। কিন্তু চেষ্টা সফল হওয়াও বড় সহজ নয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংগ্রামে কেহ নামিলে, আমেরিকার ট্রাষ্ট-ওয়ালারা যে ভাবে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিদের দমন করেন, ইঁহারাও সেইরূপ করিতেন।

গত যুদ্ধের সময় কাপড়ের দর হঠাৎ খুব চড়িয়া যায়। যুদ্ধের পর কিছু নামিলেও পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণেরও অধিক দর এখনও রহিয়াছে। স্থায়ীভাবেই যে তাহা রহিয়া যাইবে, ইহাতে এখন আর সন্দেহ নাই। এই চড়া দরের প্রধান কারণই কাপড়ের বাজারে এই বণিক্‌সম্প্রদায়ের প্রায় ট্রাষ্টের ন্যায় স্থায়ী একটা monopaly বা এক চেটিয়া অধিকার। এই বণিক সম্প্রদায়ের ন্যায় মিলওয়ালাদের মধ্যেও এইরূপ একটা জোট আছে, যাহাতে তাঁহারাও কম দরে উৎপাদিত কাপড় ছাড়েন না। শুনিতে পাওয়া যায়, কোনও কোনও বড় মিলে শতকরা দুই তিন শত টাকা হারে ডিভিডেণ্ট দেওয়া হয়। মাড়োয়ারীদের মধ্যে সম্প্রদায়িক একটা জোট থাকিলেও পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহারা কারবার করেন। কোম্পানীর ন্যায় বার্ষিক হিসাব তাঁহাদের কারবারের বাহির হয় না। হইলে বোধ হয় দেখা যাইত, তাঁহাদেরও লাভের হার বড় কম নয়। তাঁহারা যে অতি দ্রুত বিপুল ধনের অধিকারী হইয়া উঠিতেছেন, ইহা সকলেই আমরা চক্ষে দেখিতেছি। ধনের বলে ও সংঘবদ্ধতার বলে বাজারের একচেটিয়া মালিক হইয়া এই অত্যধিক লাভ তাঁহারা করিতেছেন, আর সেই লাভের কড়ি

পাওনায় ব্যাঙ্ক গুলিও পরস্পরের উপরে নির্ভরশীল। তাই সকলেরই স্বার্থ রক্ষার জন্য এই সব ট্রাষ্টের মধ্যেও বড় ঘনিষ্ঠ একটা সংযোগ হইয়াছে। ইহাতে ব্যবসায়ের বাজারে ধনী মহাজনদের ক্ষমতা যে কত প্রবল, কিরূপ অপ্রতিহত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট (সম্প্রতি পরলোকগত) উড্রো উইলসনের (Widrow Wilsonএর) 'নিউ ফ্রিডম্' (The new freedom) নামক পুস্তক হইতে নিম্নে উদ্ধৃত কয়েকটি অংশ হইতে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন।

যোগাইতেছে দীনদারিদ্র খরিদ্দারগণ, সমগ্র জনসমাজ, ন্যায্য দরের দ্বিগুণ ত্রিগুণ দরে জিনিশ কিনিতে বাধ্য হইয়া।

এই গেল কাপড়ের বাজারের অবস্থা। ইহা ছাড়া বাঙ্গলার চাউল, ডাইল, ঘি, তৈল, গুড়, চিনি প্রভৃতি আহার্য্যের বাজারেও এই সব বণিকদের একরূপ কর্ণার (corner) যেন পাকা গাঁথুনিতে বসিয়া গিয়াছে। সর্ব্বত্র ঘুরিয়া উৎপাদক-দের তাঁহারা আগেই দাদন দিয়া রাখেন, কখনও বা ক্ষেতের সব শস্য একেবারে কিনিয়া ফেলেন। প্রায় সব আগে এই ভাবে তাঁহাদের হাতে আইসে, তারপর তাঁহাদের ধরিয়া দেওয়া চড়াদামে বাজারে চলে। আগে সুবৎসর দুর্ব্বৎসরের একটা পার্থক্য ছিল। সময়মত জলবৃষ্টি হইলে, ক্ষেতে প্রচুর শস্য জন্মিত, ধান চাউল সস্তা হইত, লোকের মুখে কত আশার কত আনন্দের কথাই না শুনা যাইত! কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ দেখা যাইতেছে, দেবতারা বৎসরকে যতই 'সু' করিয়া দিউন, লোকে তাহা অনুভব করিতে বড় পারে না। সুজল বৎসরের সুফল যাহা কিছু, সব এই বণিকদের হাতে চলিয়া যায়, তার পর তাহাদের সমান সেই কড়া হিসাবের নিক্তির ওজনে তাহা দেশবাসীর মধ্যে বিতরিত হয়। এক যে সব অঞ্চলে গৃহস্থগণ ক্ষেতের শস্য নিজেদের ব্যবহারের জন্য ঘরে রাখে, আর অতিরিক্ত কিছু বিক্রয় করে,—সুবৎসরে তারাই মাত্র অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দে থাকে। গত কয়েক বৎসর যাবৎ ধান চাউল ডাল কলাই প্রভৃতির দাম প্রায় সমান এক চড়া দরে রহিয়াছে। বাজার এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই ভাবে বিশিষ্ট এই বণিক সম্প্রদায়ের আয়ত্ত হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ জনসমাজের পক্ষে বাজারের এই পরিবর্ত্তনটা যে কিরূপ ভয়ানক হইয়া উঠিতেছে, এখনও সকলে তেমন ভাবে লক্ষ্য করিতেছেন না।

"The dominating danger in this land is not the great individual combinations—that is dangerous in all conscience—but the combination of combinations, of the railways, the manufacturing enterprises, the great mining projects, the great enterprises for the development of the natural water-powers of the country, threaded together in the personnel of a series of boards of directors into a "community of interest" more formidable than any single combination that dare appear in the open.

The organisation of business has become more centralised, vastly more centralised, than the political organisation of the country itself. Corporations have come to cover greater areas than states * ; have come to live under a greater variety of laws than the citizen himself, have excelled states in their budgets and loomed bigger than whole commonwealths in their influence over the lives and fortunes of entire communities of men."

[The New Freedom—Widrow Wilson. pp. 179-180]

এই অবস্থাটাই বুঝাইতে উইড্রো উইলসন্ সাহেব, এই পুস্তকের আর একস্থলে বলিতেছেন—

* আমেরিকার এক একটি 'ষ্টেট্ বা প্রদেশ, যে সবের সংযোগে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ (The united States) দেশটি হইয়াছে। আভ্যন্তরিক শাসনে প্রত্যেকটি 'ষ্টেট্' স্বতন্ত্র, সকল ষ্টেটের সমান স্বার্থ যাহা লইয়া তাহাই মাত্র সমবেত United States-এর সরকারী গবর্ণমেণ্টের হাতে।

"The facts of the situa tion amount to this : that a comparativly small number of men control the raw materials of the country ; that a conparatavely small member of men control the water-powers that can be made useful for the economic production of the energy to drive our machinery ; that that same number of men control the rail roads ; that by agreement handed around themselves they control prices, and that the same group of men control the larger credits of the coun try,"

(The New Freedom—Widrow Wilson, P. 182]

সংক্ষেপে এক কথায়, ব্যবসায়বাণিজ্যের সকল রকম কার্য্যকরী শক্তি এবং প্রয়োজনীয় সকল মূলধনের বাজার একেবারে অল্পসংখ্যক নায়ক মহাজনের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। ইঁহাদের অধীনতায় বা তাঁবেদারে কাজকর্ম্ম করা ছাড়া, উপযুক্ত মূলধন সংগ্রহ করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে কোনও ব্যবসায়বাণিজ্যে সফলতা লাভ অন্য সকলের পক্ষেই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। তাই আর এক স্থলে উইড্রো উইলসন সাহেব বলিতেছেন,—

"It is the mere truth to say that the financial resources of the country are not at the command of those who do not submit to the direction and domination of small groups of capitalists who wish to keep the economic development of the country under their own eye and guidance. The great monopoly of this country is the monopoly of big credits. So long as that exists, our old variety and freedom of individual energy of development are out of the question.

* * * The growth of the nation, therefore, and all our activities, are in the hands of a few men, who even if their action be honest and intended for the public interest, are necessarily concentrated upon the great undertakings in which their own money is involved and who necessarily by very reason of their own limitations, chill and destroy geniuine economic freedom."

[The New Freedom, Widrow Wilson, P. 178]

বাহিরের কাহারও অতিরঞ্জিত কথা নয়, আমেরিকারই একজন মহামনিষী ও জগৎ বিখ্যাত জননায়কের এই সব মন্তব্য হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ বিকাশ যে দেশে হইয়াছে, আমেরিকার সেই ইউনাইটেড্ ষ্টেটসে সেই সভ্যতারই অতি প্রধান একটি অঙ্গ ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজম্ (Industrialism) দৃঢ় সঙ্ঘবদ্ধ ধনী মহাজনদের হাতে কত বড় শক্তি আনিয়া দিয়াছে এবং সেই শক্তি সমগ্র জনসমাজকে কিরূপ কঠোর চাপে চাপিয়া একেবারে ইঁহাদের আর্থিক (economic) দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। এরূপ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সমাজে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অন্য সকল অবস্থা, সকল অধিকারও, আর্থিক অবস্থার ও আর্থিক অধিকারের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও ইঁহারা অগ্রণী, ইঁহারাই সর্ব্বশক্তিমান্। স্বাধীন ভাবে কোনও দিকে কিছু করিয়া উন্নত অবস্থা, উন্নতশক্তি ও পদমর্য্যাদা লাভ করিবার কোনও অবসর কোনও ক্ষমতা এই ধনীর গণ্ডীর বাহিরে কাহারও বড় নাই। আমেরিকার গবর্ণমেণ্টও একেবারে ইঁহাদের কেনা বলিলে হয়। এই সব ধনী মহাজন বা ব্যবসায়িক 'রাজা' (industrial kings) যাঁহারা সমগ্র দেশের এই ব্যবসায়িক সংঘের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন, তাঁহাদের হাতের কতিপয় শক্তিমান্ লোকই এখন আমেরিকার গবর্ণমেণ্টের

হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। ইঁহারা সাধারণতঃ 'বস্‌' (Boss) নামে পরিচিত। যে দলের নায়ক বলিয়াই ইঁহাদের নামের মার্কা থাক্‌, তলে তলে সকলেই এক স্বার্থের হিসাব বুঝিয়া চলেন। সে স্বার্থ ধনী এই ব্যবসায়িক সঙ্ঘের স্বার্থ, আর সেই সঙ্গে নিজেদের আর নিজেদের সাঙ্গোপাঙ্গ যাহারা তাহাদের স্বার্থ। আমেরিকার কংগ্রেসের বা পালামেণ্টের সদস্য খুব বেশীর ভাগই ইঁহাদের হাতের লোক। নির্ব্বাচনের সকল শক্তি এমনই ভাবে ইঁহাদের অর্থের বশীভূত যে ইহারা যাহাদের চান, তাহাদের ছাড়া আর কাহারও পক্ষে নির্ব্বাচিত হইয়া কংগ্রেস যাইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। সরকারী কর্ম্মচারীবর্গ, আদালত গুলি পর্য্যন্ত, ইঁহাদের টাকায় কেনা। ব্যবসায়ের কাজকর্ম্মে যত বড় অন্যায়, যত অত্যাচার, যত জাল জুয়াচুরীই (frauds) হউক, বিচারকর্ত্তারা, বলিতে লজ্জা হয়, ইঁহাদের অর্থের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না। সকলেই আমরা মনে করি, আগেকার অনেক পুস্তকেও পড়িয়াছি, আমেরিকা স্বাধীনতার লীলাভূমি, এখানে অভিজাত ও অবজাত বলিয়া সাম্প্রদায়িক ভেদ নাই,—উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র, সকলেই সর্ব্ববিষয়ে সমান অধিকার ভোগ করে, সকল দিকে উন্নতি লাভ করিবার সমান অবসর পায়। হাঁ, ছিল, একদিন অন্ততঃ শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীর পক্ষে এমনই অবস্থার ও অধিকারের সাম্য একটা ছিল। কিন্তু সেদিন আর নাই। গারফিল্ড লিঙ্কনের দিন চলিয়া গিয়াছে। অধিকারের সাম্য এখনও স্বীকৃত হয় বটে, কিন্তু আর্থিক অবস্থার দারুণ বৈষম্য এই সাম্যকে নামে মাত্র পরিণত করিয়াছে, সকলের সকল অধিকার কার্য্যতঃ ধনীর টাকার থলিয়ায় বাঁধা পড়িয়াছে। পূরা র‍্যাসনালিষ্টিক্‌ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সভ্যতার এমনই মহিমা!

এই দুর্গতি হইতে পরিত্রাণের কোনও উপায় নাই। এক গবর্মেণ্ট ব্যতীত জনসমাজের উপরে সামাজিক কি ধর্ম্মনৈতিক আর কোনও শক্তি নাই। গবর্মেণ্ট ত ব্যবসায়িক সঙ্ঘের হাতে

কেনা একটি যন্ত্র মাত্র, যাহা তাঁহাদের অঙ্গুলীহেলনে তাঁহাদেরই ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষা করিয়া মাত্র চলিতেছে। দেশের মধ্যে এমন কোনও আইন হইতে পারে না, যাহাতে এই ব্যবসায়িক সঙ্ঘের সর্ব্ব-গ্রাসী কবল হইতে কোনও একটু ফাঁকে বাহির হইয়া হাঁফ ছাড়িয়া লোকে বাঁচিতে পারে। লোকে কাজকর্ম্ম যাহা করিবে, ইঁহাদের ব্যবসায়িক যন্ত্রের মধ্যে, যন্ত্রেরই করা নিয়মে; উপার্জ্জন করিবে ইঁহারা ন্যূন পক্ষে যে বেতন দিবেন তাই; আর খাইয়া পরিয়া দেশে থাকিবে, ইঁহারা যে দরে যে পরিমাণ জিনিশ যোগাইবেন, তাহাই মাত্র যে ভাবে যতটুকু পারে কিনিয়া!

অন্য কথা সব দূরে থাক্‌, দেশের বাজারে সস্তায় খাওয়াপরার জিনিশ পত্রও যে কিছু বেশী আমদানী হইবে, তার কোনও উপায় কোথাও নাই। দেশের মধ্যে সব উৎপাদন, সব আমদানী, ট্রাষ্টের হাতে। বিদেশার কোনও প্রতিযোগিতা চলে না। এমন ভাবে টারিফ (tariff) বা আমদনী শুল্কের ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট করেন যে বাহির হইতে এমন কোনও দ্রব্য আমেরিকার বাজারে আসিতে পারে না, যাহা আমেরিকায় উৎপন্ন কোনও দ্রব্য হইতে কমদরে বিক্রীত হইতে পারে। ওজুহাত, দেশে দেশের ব্যবসায়বাণিজ্যের স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠারক্ষা, মূল কারণ যে এই ব্যবসায়িক সঙ্ঘের স্বার্থরক্ষা—জনসমাজ তাহাতে যতই দুঃখ ক্লেশ পাক্‌—একথা বলাই বাহুল্য। আর এই টারিফের ব্যবস্থা না করিলেই বা কি? বিদেশের মালপত্র কিছু আমদানী হইলে এই ব্যবসায়িক সঙ্ঘের হাতেই হইবে; তাঁহারা যে দরে বাজারে তাহা চালাইবেন, সেই দরে ততটা মাত্রই চলিতে পারিবে। ইহার অন্যথা কিছু হইতে পারে না।

মহাজনদের এই শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে এক শ্রমিক সঙ্ঘ-সমূহ। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশেও তাই দাঁড়াইতেছে। কিন্তু আমেরিকায় ইহাতেও বড় একটা বাধা আছে। আমেরিকার শ্রমিকবর্গ সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—এক আমেরিকার অধিবাসী শ্বেতাঙ্গ নিপুণ

শ্রমিক, আর নবাগত এশিয়া ও আফ্রিকার পিতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আনাড়ী শ্রমিক। সংখ্যাতে শেষোক্ত শ্রমিকরাই বেশী। কিন্তু দুই শ্রেণীর মধ্যে কোনও মিল নাই, মিল হইবার সম্ভবনাও কিছু দেখা যাইতেছে না। সুতরাং উভয়ের সমবেত চেষ্টার কোনওরূপ প্রভাব ধনী মহাজনসঙ্ঘের উপরে আসিতে পারিতেছে না। এই অবস্থাটা ধনী মহাজনদের রাষ্ট্রীয় শক্তিকে আরও দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিতেছে। কোনও কোনও ষ্টেটে ইঁহাদের ক্ষমতা শাসনযন্ত্রের উপরে এত বেশী যে শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটও অনেক সময় পুলিশ ও স্থানীয় সৈনিকদের দ্বারা দমন করা হয়। বেশী দিনের কথা নয়, গত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ কলোরেড়ো ষ্টেটে লাড্‌লো নগরে খনির শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট করে। ইহা লইয়া স্থানীয় সৈনিকদের (militiaর) সঙ্গে ধর্ম্মঘটীদের বড় একটা দাঙ্গা হয়। ফলে গুলিতে ও বারুদের আগুনে অনেক অসহায় নারী ও বালক বালিকা পর্য্যন্ত পুড়িয়া মরে। *

এ কথা সত্য যে আমেরিকার গবর্মেণ্ট দরিদ্র জনসাধারণের সুখ সুবিধার জন্য এমন অনেক বিধি ব্যবস্থা করেন, যাহা অন্য দেশে বড় দেখা যায় না। অনেক বড় বড় ধনী মৃত্যুকালে বিপুল সম্পত্তিও ইহাদের হিতকর কার্য্যের জন্য দিয়া যান। কিন্তু জনসমাজকে আর্থিক ও রাষ্টীয় দাসত্বে বাঁধিয়া, তাহাদের স্বতন্ত্র কর্ম্মচেষ্টার সকল পথ রুদ্ধ করিয়া, তারপর দয়া করিয়া তাহাদের উপকার করা এক কথা, আর তাহারা স্বাধীনভাবে কাজকর্ম্ম করিয়া নিজেদের ভাগ্য

* At Ludlow (Colorado) in 1914, (April 20th) a battle of the militia and the miners took place, in which as the result of the firing of militia a number of women and children were burnt to death. Many other instances of pitched battles could be given, but enough has been said to show the peculiar character of labour disputes in the United States.

[Roads to Freedom—Bertrand Russel, Chap. II. p. 90.]

নিজেরা গড়িয়া নিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে গৃহস্থালী করিয়া দেশে থাকিতে পারে, সামাজিক এমন একটা সাধারণ অবস্থার প্রবর্ত্তন আর এক কথা।

প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইয়া গেল। বাস্তবিক বর্ত্তমান ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সভ্যতার অভ্যুদয় ও জন সমাজের উপরে তাহার ফলাফল কি হইয়াছে, তাহার আলোচনা এত বড় একটা গুরু ও বিস্তৃত বিষয় যে বড় একখানি পুস্তকেও তাহার সকল কথা বুঝাইয়া শেষ করা যায় না। একটি প্রবন্ধের সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে যত দূর সাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। এ দেশের সাধারণ পাঠকবর্গ এই অবস্থার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নহেন, কারণ পাশ্চাত্য ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজম্ এখনও তেমন প্রকট এখানে হয় নাই, সমাজজীবনকেও একেবারে অধিকার করিতে পারে নাই। তাই ইহার ক্রিয়া ও ফল সচরাচর আমাদের চক্ষে পড়ে না। তবে আরম্ভ হইয়াছে, শ্রাদ্ধ কতদূর গড়াইবে জানিনা। যদি সতর্ক আমরা না হই, এই ভাগ্যের ভাগী যে আমাদেরও হইতে হইবে না, এমন কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি না।

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া।

বেঞ্জামিন কিড্ তাঁহার Social Evolution নামক পুস্তকের একস্থলে লিখিয়াছেন——

Throughout the history of the Western peoples, there is one central fact which underlies all the sifting scenes which move across the pages of the historian. The political history of the centuries so far may be summed up in a single sentence; it is the story of the political and social enfranchisement of the masses of the people hitherto universally excluded from participation in the rivalry of existence in terms of equality. * * * The point at which the process tends to culminate is a condition of society in which the whole mass of the excluded people will be at last brought into the rivalry of existance on a footing of equality of opportunity. [Chap. VI. p. 151.]

(অর্থাৎ, পূর্ব্বে এজগতে সর্ব্বত্রই দরিদ্র জনগণ জীবনের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্ম্মক্ষেত্রে উচ্চতর শ্রেণীসমূহের সঙ্গে সমানভাবে প্রতিযোগিতা করিয়া চলিবার অধিকারে বঞ্চিত ছিল। ইয়োরোপে ক্রমে তাহাদের পক্ষে এই সব বাধা দূর হইয়া যাইতেছে। সময়ে সময়ে অন্য সব ঘটনার ও অবস্থার বৈচিত্র্য যেমনই দেখা যাক, গত কয়েক শতাব্দী যাবৎ জনগণের পক্ষে এই সব অধিকার লাভের কথাই ইয়োরোপীয় ইতিহাসের মূল কথা। এই ভাবে ইয়োরোপীয় সভ্যতার অভিব্যক্তি যে দিকে চলিয়াছে, তাহাতে তাহার চরম পরিণতি সমাজকে

এমন এক অবস্থায় নিয়া তুলিবে, যখন নিম্নস্তরে চাপা দরিদ্র জনগণ সকল অন্যায় বিধির ও রীতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, উচ্চতর অন্যান্য সকলের সঙ্গে জীবনের সকল কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে সমান প্রতিদ্বন্দী হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে।)

উন্নত পন্থী ইয়োরোপীয় সমাজের এই পরিণতিকে ইংলণ্ডের বিখ্যাত ব্যবস্থাবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত সার হেনরী মেন্ (Sir Henry Maine) পারিবারিক বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাধীনতার পরিবর্ত্তে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্যক্তিগত দায়িত্বের প্রতিষ্ঠা, অন্য কথায় Status হইতে Contractএর দিকে গতি, বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।*

* The movement of progressive societies has been uniform in one respect. Through all its course, it has been distinguished by the gradual dissolution of the family dependency, and the growth of individual obligation in its place. The individual is steadily substituted for the family as the unit of which civil laws take into account. * * * Nor is it difficult to see what is the tie between man and man which replaces by degrees those forms of reciprocity in rights and duties which have their origin in the family. It is Contract. Starting as from one terminus of history, from a condition of society, in which all the relations of Persons are summed up in the relations of Family, we seem to have steadily moved towards a phase of social order in which all these relations arise from the free agreement of individuals.

* * * The word Status may be usefully employed to construct a formula expressing the law of progress thus indicated, which, whatever be its value, seems to me to be sufficientty ascertained. * * * It we then employ Status, agreeably with the usage of the best writers to signify those personal conditions only, and avoid applying the term to such conditions as are the immediate or remote result of agreement, we may say that the movement of

প্রাচীন কোনও সমাজে সাধারণতঃ পৃথক্ ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও কোনও স্থান ছিল না। যে পরিবারে যে জন্মিত, অপরের সঙ্গে সকল সম্বন্ধে সেই পরিবারের অধীন হইয়া তাকে চলিতে হইত। আবার কোনও পরিবার একেবারে স্বতন্ত্রভাবে চলিতে পারিত না, কুলগত বা বৃত্তিগত কোনও না কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে তার স্থান ছিল, এবং সেই সম্প্রদায়ের রীতি নীতি তাকে মানিয়া চলিতে হইত। এইরূপ বহু সম্প্রদায় লইয়া সমাজের বড় একটি শ্রেণী হইত, এবং সেই শ্রেণী গুলির সমবায়ে সম্পূর্ণ এক একটি সমাজ হইত। শ্রেণীতে শ্রেণীতে এবং শ্রেণীর মধ্যে কুলগত বা বৃত্তিগত সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পরম্পরাগত একটা অধিকার ভেদ ছিল। কর্ম্মক্ষেত্রে ইহার সীমা লঙ্ঘন করিয়া যাইবার রীতি ছিল না; বিধি ব্যবস্থাও অধিকাংশ স্থলে এই সীমা রক্ষা করিয়া চলিত, লঙ্ঘনে বাধা দিত। শ্রেণী (class, estate, বা caste); শ্রেণীর মধ্যে কুলগত বা বৃত্তিগত সম্প্রদায় (tribe, clan, guild, বা sub-caste)এবং এই সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিবার (family), ইহাই ছিল সমাজবিন্যাসের ধরণ। পরিবারই ছিল এইরূপ বিন্যস্ত সমাজে, ভাগের দিক হইতে চরম বিভাগ এবং গঠনের দিক হইতে চরম একক বা unit. এইরূপ এক একটি শ্রেণীর অধীন যে সম্প্রদায় এবং সেই সম্প্রদায়ের অধীন যে পরিবার, সেই পরিবারেরই এক একটি জীবিত অংশ বা অঙ্গ ব্যতীত ব্যক্তিগত ভাবে মানবের কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা অধিকার সামাজিক সম্বন্ধে স্বীকৃত হইত না। (অবশ্য একথাও বলিতে হইবে, যে এই সব পরিবার, সম্প্রদায় এবং শ্রেণী গুলিও মোট সমাজদেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায়ই ছিল। মোট এই সমাজ দেহ হইতে স্বতন্ত্র কোনও অস্তিত্ব বা অধিকার ইহাদের

---

the progressive societies has hitherto been a movement *from Status to Contract.*

[Ancient Law, Sir Henry Maine, Chap, 5, pp 149-151.]

কোনটিরও স্বীকৃত হইত না। *) এই ভাবে যে সম্প্রদায়ভুক্ত যে পরিবারে যে ব্যক্তি জন্মিত, সেই সম্প্রদায়ের বা পরিবারের সমাজের মধ্যে যে স্থান বা status, তাহাই হইত প্রত্যেক মানবের সামাজিক স্থান বা status. এই statusকে অতিক্রম করিয়া চলিবার অধিকার সাধারণতঃ কাহারও ছিল না। অপরের সঙ্গে তাহার সকল সামাজিক সম্বন্ধ স্থির হইত জন্মগত তার এই ষ্টেটাস্ (status) এর রীতি অনুসারে, জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র তার এই ষ্টেটাস্ (status) এর সীমার মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিত। ইহাকে অতিক্রম করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে নিজের শক্তিতে অন্য রূপ উন্নত ভাগ্য অর্জ্জন করা নিম্নতর ষ্টেটাসের কোনও *ব্যক্তির পক্ষে সহজসাধ্য* হইত না। পরম্পরাগত আচারই (customs) ছিল, সকলের এইরূপ কর্ম্মের প্রধান নিয়ামক। রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থাও ষ্টেটাসের এই পার্থক্য ও তৎসংশ্লিষ্ট সকল আচারের ধারা মানিয়া চলিত।

মানুষ সব সমান, যে কুলে যে পরিবারে কি যে অবস্থায় যেখানেই যে জন্মগ্রহণ করুক, মানুষে মানুষে কোনও ভেদ থাকিতে পারে না। সকল কর্ম্মে, সমান ভাগ্য লাভে প্রত্যেকের সমান অধিকার আছে, এই মত প্রতিষ্ঠালাভ করিলে, জীবননীতি ও রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থাদি এই মতের

* বলা বাহুল্য হিন্দু সমাজবিন্যাসের প্রকৃতিও এইরূপ। হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রত্যেক হিন্দুরই কুলগত এবং পরিবারগত একটা অবিচ্ছেদ্য বন্ধন আছে। গৃহস্থ মাত্রকেই এই বন্ধন মানিয়া চলিতে হয়; কেবল সন্ন্যাসীই ইহা হইতে মুক্ত। তবে এই বন্ধনের মধ্যেও হিন্দুধর্ম্ম তাহার ব্যক্তিত্বের মহিমাকে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে চায় নাই। সামাজিক, সম্প্রদায়িক বা পরিবারিক ধর্ম্মের অনুবর্ত্তিতার মধ্যে ব্যক্তিত্বের মহিমা বিকাশের অবসর যে দিকে যে ভাবে যতটা হইতে পারে, তাহার যথোচিত ব্যবস্থা ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনায় হিন্দু-নীতির কৃতিত্ব যেরূপ দেখা যায় এরূপ আর কোথাও দেখা গিয়াছে কিনা সন্দেহ! পরে ইহার আলোচনা করিব।

অনুবর্ত্তী হইয়া উঠিলে, ষ্টেটাসের (status এর) ভেদ আর থাকিতে পারে না, সকলেই সমান অধিকারে সর্ব্ববিধ কর্ম্মক্ষেত্রে সকলের সমান প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু মানুষ ত সব একেবারে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া এ পৃথিবীতে বাস করে না। বিষয় কর্ম্মে এবং সংসারযাত্রার বহু প্রয়োজনে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে তাহাদের আসিতে হয়। কি ভাবে এই সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে ? না, বিভিন্ন ব্যক্তির স্বেচ্ছাকৃত চুক্তির ব্যবহারে বা contractএর নিয়মে। তাই সার হেনরী মেন্ (Sir Henry Maine) ইয়োরোপীয় সমাজের এই পরিবর্ত্তনকে বিশেষ ভাবে ষ্টেটাস (Status) হইতে কন্ট্রাক্ট (Contract) এর দিকে পরিবর্ত্তন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

নরনারী, প্রবীন নবীন, অভিজাত অবজাত নির্ব্বিশেষে সকলেই সমান মানব, মানব রূপে সকলেই সর্ব্ববিষয়ে সমান অধিকারভোগী। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কেহ কাহারও অধীন নয়; সকলেই সমান স্বাধীন। জন্ম, পুংস্ত্রীভেদ বা বয়ঃক্রম-ভেদ (birth, sex and age) এ সব accident বা বাহিরের অবান্তর অবস্থা মাত্র; জীবনধর্ম্মের নৈসর্গিক নিয়ম ইহার মধ্যে কিছু নাই। ষ্টেটাস্‌কে আশ্রয় করিয়া যে সব আচারনিয়ম সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, ষ্টেটাসের লোপে তাহার কোনও সার্থকতা কি প্রভুত্বের দাবী থাকিতে পারে না। সুতরাং কেবল বৈষয়িক সম্বন্ধ নয়, সামাজিক ও সাংসারিক সম্বন্ধও ব্যষ্টিভাবে মানবে মানবে স্বেচ্ছাকৃত চুক্তির ব্যবহারের বা free contractএর অধীন হইবে। বিবাহ, পারিবারিক জীবনে স্বামিস্ত্রীর সম্বন্ধ, সব স্বাধীন দুইটি নরনারীর বিশিষ্ট একটা চুক্তির ব্যবহার মাত্র। ভাইএ ভাইএ ত কথাই নাই, বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের সঙ্গেও পিতার পারিবারিক সম্বন্ধ এইরূপ একটা চুক্তির সম্বন্ধ মাত্র হইতে পারে। এক একজন কর্ত্তার অধীন এক একটি পরিবার (family) এ অবস্থায় সমাজের চরম একক (unit) আর থাকিতে পারে না। নরনারী ও জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠ নির্ব্বিশেষে সকলেই যখন সমান ও স্বতন্ত্র,

তখন প্রত্যেক এইরূপ বয়ঃপ্রাপ্ত নর বা নারীই. সমাজ-রাষ্ট্রজন-সঙ্ঘের এক একটি **unit.** উপরে সেই এক সমাজ বা ষ্টেট্, আর নীচে এক একটি সমান ও স্বাধীন নর বা নারী,—মধ্যে পরিবার, সম্প্রদায় কি শ্রেণী যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সব এই সব নরনারীর স্বেচ্ছার চুক্তিতে উদ্ভূত হইয়াছে। তাহাদের এই ইচ্ছার অতীত আর কোনও নৈসর্গিক নীতির ক্রিয়া কিছু ইহার মধ্যে নাই।

কিন্তু জন্মগত ষ্টেটাসকে অস্বীকার করিলে ঠিক এই সিদ্ধান্তেই আমাদের উপনীত হইতে হয় কি? সামাজিক সকল সম্বন্ধ, রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থাদি এই সিদ্ধান্তেরই অনুসারী হইয়া ওঠা একেবারে অবশ্যম্ভাবীই কি?

যোড়শ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, বিশেষ ভাবে ফরাসী বিপ্লবের পর উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া, ইয়োরোপীয় সমাজের পরিণতি যে প্রাধানতঃ এই দিকে হইয়াছে, একথার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এই পরিণতির প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করিলে প্রধানতঃ দুইটি লক্ষণ আমরা দেখিতে পাইব। একটি কুলবংশ নির্ব্বিশেষে সকল মানবের অধিকার সমতা, আর একটি প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,এই স্বাধীনতার তাৎপর্য্য এই যে ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক মানব সর্ব্বথা নিজের ইচ্ছামত চলিতে পারিবে, নিজের বুদ্ধিতে যাহা ভাল বুঝে তাই করিতে পারিবে; ইহাতে কোনও বাধা দিবার অধিকার কাহারও বা কোনও শক্তির থাকিবে না, যদি না সে অন্যের সমান স্বাধীনতার সীমা লঙ্ঘন করে। এই স্থানেও তাহাকে বাধা দিবে মাত্র তাহাদেরই সকলের সম্মতিতে প্রতিষ্ঠিত কোনও শাসনশক্তি বা গবর্মেণ্ট, পরম্পরাগত বা traditional কোনও শক্তি বা Authority নয়,—তা সে চার্চ্চই হউক কি ষ্টেটই হউক কি দেশাচারই হউক।

কিন্তু মানুষ সব সমান, এই কথা স্বীকার করিয়া নিলে ব্যক্তিগত-ভাবে মানবের এমন একটা স্বাধীনতাকেও যে স্বীকার করিয়া নিতেই হইবে, এই দুইটি নীতির মধ্যে এমন কোনও সম্বন্ধ

বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্ম মানবে মানবে কোনও ভেদের কথা মানেন নাই, বরং সমতার কথাই ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু কোনও ধর্ম্মই এরূপ স্বাধীনতার কথা বলেন নাই, বরং ধর্ম্মের শিষ্যবর্গ সকলে শাস্ত্রকে মানিয়া, নতশিরে শাস্ত্রশাসন ও ধর্ম্মাচার্য্যগণের উপদেশ অনুসারে চলিবে, ইহাই আদেশ করিয়াছেন। নব্য ইয়োরোপে সোসিয়ালিজম্ প্রভৃতি যে সব নূতন সমাজবাদ প্রচারিত হইতেছে, তার মধ্যেও সকল মানবের সমান অধিকারের দাবী আছে; কিন্তু এরূপ স্বাধীনতার দাবী নাই। বরং ছোট বড় সকলেই যাহাতে সমান সুখে থাকিতে পারে, তার জন্য মানবের স্বাধীনতার অধিকারকে সকল দিকে এমন ভাবে চাপিয়া রাখিতেই সোসিয়ালিষ্টরা চান যে ষ্টেটাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জাতিভেদ কি সম্প্রদায় ভেদে পরিপূর্ণ প্রাচীন কোনও সমাজে নিম্নতম শ্রেণীর কোনও ব্যক্তিও যেটুকু স্বাধীনতা ভোগ করিত, তাঁহাদের আদর্শ সমাজে কেহ তাহাও ভোগ করিতে পারে না।

সুতরাং ষ্টেটাসের বন্ধন তুলিয়া দিলে একেবারে যে ব্যক্তিগত কণ্ট্রাক্টের মধ্যে আসিতেই হইবে, মানবে মানবে সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপনের অন্য কোনও পথ নাই, এমন হইতে পারে না। কোনও ধর্ম্মানুগত (religious) সমাজে এই সম্বন্ধ শাস্ত্রবিধি-অনুসারে ঘটে। সোসিয়ালিষ্টরা সাধারণতঃ নাস্তিক; কোনও শাস্ত্রবিধির ধার ধারেন না। তাঁহারাও তাঁহাদের মত এক পথ দেখাইয়াছেন। এনার্কিষ্ট নামে আর এক নূতন দলের অভ্যুদয় ইয়োরোপে হইয়াছে। ইহারা মানবের অত্যধিক স্বাধীনতার পক্ষাপাতী এবং এই বিষয়ে ইঁহাদের মত সোসিয়ালিষ্ট মতের সম্পূর্ণ বিপরীত বলিলেও হয়। ইঁহারাও সকল ক্ষেত্রে মানবের এইরূপ অবাধ স্বাতন্ত্র্যকে মানিয়া চলিতে পারেন না। সুতরাং তাহাদের মতানুযায়ী সমাজেও এইরূপ contract চলিতে পারে না।

আধুনিক জৈব বিজ্ঞান বহুতথ্যের প্রমাণে প্রতিপন্ন করিয়াছেন,

মানুষ সব সমান নয়। যেমন ব্যক্তিগত ভাবে মানুষে মানুষে স্বাভাবিক ভেদ আছে, তেমন আবার সামাজিক হিসাবেও বিভিন্ন সমাজের মধ্যে যথেষ্ট ভেদ রহিয়াছে। ব্যক্তিগত বৈষম্য অনুসারে এক এক সমাজের মধ্যেও স্তরে স্তরে বহু বৈষম্য দেখা যায়। প্রাচান তত্ত্ববিদ্যায় দৃষ্টিও এই সত্যেরই সাক্ষ্য দিতেছে। ব্যক্তিগত কি সামাজিক ভাবে সকল মানব অভিব্যক্তির সমান স্তরে এখনও উঠিতে পারে নাই, ইহাই এই বৈষম্যের কারণ বলিয়া ইঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই অভিব্যক্তির সমান স্তরে সকলে কেন উঠিতে পারে নাই তার রহস্য বৈজ্ঞানিকগণ ধরিতে না পারিলেও তত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণ যে পারেন নাই তা নয়। এসম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা পূর্ব্বে দ্বিতীয় প্রবন্ধে করা হইয়াছে। তাহার পুনরুক্তি এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়, মহম্মদীয় প্রভৃতি ধর্ম্ম যে ভাবে মানুষে মানুষে সম্বন্ধের কথা প্রচার করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্যও এরূপ নয়, যে সব মানুষ নিক্তির ওজনে একেবারে সমান, সকলেই এই পৃথিবীতে সমান অধিকারে সমান দাবীতে যার যার পাওনা বুঝিয়া নিবে, কেহ কাহারও স্নেহ করুণার উপরে নির্ভর করিবে না, কেহ কাহারও আদেশ বা উপদেশের অপেক্ষা করিয়া চলিবে না। এই সব ধর্ম্মের যাঁহারা ঋষি, গুরু ও আচার্য্য, তাঁহাদের মূল কথা এই যে মানুষ সব এক প্রেমময় ভগবানের সন্তান, ভাই ভাই। ভাই ভাই যারা তাদের মধ্যে বড় ভাইও আছে, ছোট ভাইও আছে। বড় বড়র মত চলিবে, বড়র কাজ করিবে; ছোট ছোটর মত চলিবে, ছোটর কাজ করিবে; কিন্তু সকলেই সমান সুখে শান্তিতে এই জগৎসংসারে থাকিবে। ইহার মধ্যে আছে কেবল dutyর বা কর্ত্তব্যের আদান প্রদান; rights বা অধিকারের কাড়া কাড়ি কিছু নাই। এ সম্বন্ধেও পূর্ব্বে প্রথম প্রবন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি। পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ইয়োরোপ খৃষ্টান; প্রায় দেড়হাজার বৎসর যাবৎ ইয়োরোপ

ভরিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এক ভগবানের সন্তান সকল মানব ভাই ভাই, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের এই নীতি সত্ত্বেও কিঞ্চিদধিক শতাব্দী কাল পূর্ব্বপর্য্যন্তও যে ইয়োরোপীয় সমাজে কেবল গুণকর্ম্মভেদে নয়, কুলবংশের মর্য্যাদাভেদেও অধিকার বৈষম্য লইয়া একরূপ শ্রেণী বিভাগ ছিল, একথা পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপদ্ধতির যে সংস্কারপ্রচেষ্টা মধ্যে মধ্যে হয়, তাহারও লক্ষ্য ছিল, এই পদ্ধতির মধ্যে যাহা কিছু অনাচার ঢুকিয়াছিল, তাহা দূর করা আর ধর্ম্মচিন্তায় ও ধর্ম্মসাধনায় মানুষের বিবেককে (conscienceকে) চার্চ্চের কঠোর শাসন হইতে মুক্ত করা। শেষোক্ত এই লক্ষ্য সাধনেও যে এই সংস্কার-প্রচেষ্টা বিশেষ সার্থক হয় নাই, প্রটেষ্টাণ্ট চার্চ্চগুলিও যে রোমক চার্চ্চের ন্যায় সমান কঠোর শাসনে খৃষ্টীয় জনমণ্ডলীর এই স্বাধীনতাকে চাপিয়া রাখিতে চাহিয়াছেন, ইহাও আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। আর যে স্বাধীনতাই এ বিষয়ে সংস্কারকগণ দিতে চান, তাহাও খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের গণ্ডীর মধ্যে, তাহাকে অতিক্রম করিয়া মানুষের বুদ্ধি অন্য কোনও ধর্ম্মবিশ্বাসকে আশ্রয় করিবে, অন্য কোনও পথে ধর্ম্মসাধনার চেষ্টা করিবে, একথা কল্পনাও কেহ কখনও করেন নাই। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রথা কি বিধিব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার তেমন কোনও প্রয়াস হয় নাই বলিলেই হয়। মধ্যে মধ্যে জমিদারের পীড়নে রায়ত বিদ্রোহ যাহা ঘটিয়াছে, তাহার দাবী কতকটা এইরূপ থাকিলেও, কোনও প্রভাব জনসমাজের মধ্যে কোথাও দাঁড়াইতে পারে নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফরাসী দেশে মানবজীবন সম্বন্ধে যে র‍্যাসনালিষ্ট (rationalist) আদর্শ প্রচারিত হয়, যাহার প্রেরণায় ফরাসী জনসমাজ প্রচলিত ধর্ম্মপদ্ধতি, রাষ্ট্রপদ্ধতি ও সমাজপদ্ধতির অত্যধিক অন্যায় পীড়নের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, প্রাচীনকে একেবারে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়া নবীন সেই আদর্শে নূতন করিয়া মানবজীবনকে গড়িয়া নিতে প্রয়াস পায়, তাহার পর

হইতেই ক্রমে ইয়োরোপে সকল মানবের সর্ব্বত্র সমান অধিকারের নীতি গৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্বে দ্বিতীয় প্রবন্ধেই আমরা দেখিয়াছি, মানবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই এই র্যাসনালিষ্ট আদর্শের গোড়ার কথা,—সকলের সমান স্বাধীনতার অধিকারই র্যাসনালিষ্ট সাম্য-নীতির ভিত্তি।

প্রত্যেক মানবই স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্রভাবে ইচ্ছামত যে যার পথে চলিবে, যে দিকে যত পারে নিজের চেষ্টায় উন্নতিলাভ করিবে, Individualism বা ব্যষ্টিস্বাতন্ত্র-নীতির চুড়ান্ত এই দাবী স্বীকার করিয়া নিলে মানবে মানবে অবাধ একটা প্রতিযোগিতার সম্বন্ধ আপনিই আসিয়া পড়ে। তাই সেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আর প্রতিযোগিতা (Individuality ও Competition) বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় জীবননীতির মুলসূত্র হইয়াছে।

এই প্রতিযোগিতার মধ্যেও অনেক সময় দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে একটা সহযোগিতার সম্বন্ধ স্থাপনের আবশ্যকতা হয়। অনেক স্থলে অপর কোনও ব্যক্তি বা দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সংগ্রামে আত্মরক্ষা বা জয়লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ সহযোগিতা প্রয়োজন হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় এই সহযোগিতার সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে, এই সব বিভিন্ন ব্যক্তির স্বেচ্ছাকৃত একটা চুক্তির ব্যবহারে মাত্র, আর কোনও পথ নাই। বাহিরের কোনও ধর্ম্ম কি কোনও নিয়মের শাসন ইহার মধ্যে আসিতেই পারে না। ষ্টেটাস্ হইতে কন্ট্রাক্টের দিকে যে ইয়োরোপীয় সমাজজীবনের পরিণতি হইতেছে, তাহার কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর এই র্যাসনালিষ্ট আদর্শই ষ্টেটাস্কে ভাঙ্গিয়াছে, ভাঙ্গিয়া মানবে মানবে সকল সমাজিক সম্বন্ধ কেবল কণ্ট্রাক্ট বা চুক্তির ব্যবহারের আমলে আনিয়া ফেলিতেছে।

বিজ্ঞান বলেন, মানুষ সব সমান নহে। সমান না হইলে সকলের সমান অধিকারও চলে না। আবার বিজ্ঞান ইহাও দেখাইয়াছেন, যে সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টিবর্গ যত বেশী সমষ্টিশক্তির বশবর্ত্তী হইয়া চলিবে, সে সমষ্টি তত শক্তিমান্ হইবে, তত বেশী সমষ্টিগত

জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিবে। সমষ্টির এই মঙ্গলের ভাগী ব্যষ্টিও সকলে হইবে। সুতরাং ব্যষ্টির পক্ষে এতটা অবাধ স্বাধীনতাকে উত্তম নীতি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। বৈজ্ঞানিক সত্যের উপরে যদি র‍্যাসনালিজম্‌কে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই ফরাসী প্রতিভাপ্রসূত র‍্যাসনালিজম্ সত্য র‍্যাসনালিজম্ নহে। ধর্ম্ম বা religionও উচ্চনীচ ভেদে সকল মানবের পক্ষে সমান সুখে শান্তিতে ও মঙ্গলে থাকিবার অধিকার দাবী করিয়াছেন, কিন্তু এতাে স্বাধীনতার অধিকার দাবী করেন নাই। বরং যে নীতিমার্গ ধর্ম্মগুরু-গণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সমাজের মঙ্গলে ব্যষ্টির পক্ষে ত্যাগের মার্গ, শাস্ত্রবিধির অনুবর্ত্তিতার মার্গ। প্রবৃত্তির বশে নিরঙ্কুশ আগ্রহে স্বার্থসাধনের ও ভোগ্যসংগ্রহের প্রয়াসে সকল শক্তি নিয়োগ করিলে মানবের পরমার্থ হইবে, ইহা কোনও ধর্ম্মের আচার্য্যগণ সুনীতি বলিয়া অনুমোদন করেন নাই। সুতরাং এই যে র‍্যাসনালিজম্, ইহার মূলে ধর্ম্মের কোনও প্রভাব নাই। ধর্ম্মের সঙ্গে এরূপ কোনও সম্বন্ধের দাবীও র‍্যাসনালিষ্টরা করেন না। বরং প্রত্যাদিষ্ট বা ঋষিপ্রবর্ত্তিত কোনও ধর্ম্মের প্রমাণই তাঁহারা মানবজীবনে গ্রাহ্য বলিয়া মনে করেন না। পূর্ব্বে ইহাও আমরা দেখিয়াছি, যে মানব বুদ্ধির উচ্চতম ভাব (highest aspect of human reason) যে প্রজ্ঞান, তাহার দৃষ্টি যে এই র‍্যাসনালিজমের আদর্শকেই সত্য বলিয়া দেখিয়াছে এবং বিজ্ঞানের ও ধর্ম্মের তত্ত্বকে অস্বীকার করিয়াছে, তাহা নয়। বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম, Science ও Religion, বরং সমান এক ভূমিতে মিলিয়া একই সত্যের সাক্ষ্যস্বরূপ হইয়া এই প্রজ্ঞানের দৃষ্টিতে ধরা দিয়াছে।

তবে বিজ্ঞান ও তত্ত্ববিদ্যা যে সত্যের সাক্ষ্য দিতেছে, তাহার সঙ্গে মিল না থাকিলেও, যে আদর্শের কথা পূর্ব্বে বলা হইল, তাহাই সাধারণতঃ র‍্যাসনালিষ্ট আদর্শ নামে পরিচিত। ইয়োরোপের এই 'র‍্যাসনালিজমের' গতি কেন কি ভাবে কি সব অবস্থায় ও ঘটনা পরম্পরায় এই আদর্শের দিকেই পরিচালিত হয়, তাহার

বিস্তৃত-আলোচনা "ইয়োরোপে র‍্যাসনালিজম্" নামক এই গ্রন্থের ষষ্ঠ প্রবন্ধে করিয়াছি।

প্রত্যেক মানবের পক্ষে সমান নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠার আর পরস্পরের সম্বন্ধে অবাধ প্রতিযোগিতার অধিকার (Equal rights of individuality and free competition for all), আরও সংক্ষেপে ব্যক্তিত্ব ও প্রতিযোগিতা (individuality and competition), এক কথায় ইহাই এই র‍্যাসনালিষ্ট আদর্শের মূল সূত্র। মানবজীবনের যে অভিব্যক্তির ধারাকে আমরা ইয়োরোপীয় সভ্যতার বিকাশ বলিয়া বুঝি, তাহা এই সূত্র ধরিয়াই অভিব্যক্ত হইয়াছে, ইহারই ক্রিয়ার ফল,—এবং ইহাই ইয়োরোপায় সভ্যতাকে তার বিশিষ্টতা দান করিয়াছে।

এই আদর্শ যে ইয়োরোপের চিত্তকে এমন ভাবে আবিষ্ট করে, চিন্তা যে একেবারে এই ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়া পড়ে, জীবনের সমগ্র শক্তি যে তদবধি অদম্য আবেগে এই আদর্শ ধরিয়া এই পথেই অমিত প্রসারে আপনাকে স্ফূর্ত্ত করিয়া তুলিতেছে, তাহার কারণ ইহারই মধ্যে বর্ত্তমান ইয়োরোপ তার 'স্বধর্ম্মের' সাড়া পাইয়াছে,—বুঝিয়াছে, এই পথেই তার জাতীয় প্রতিভা, জাতীয় প্রকৃতির বিশেষত্ব, পূর্ণ বিকাশ লাভ করিবে। ইহার বীজ বা মূল সংস্কার তাহার অন্তরে চাপা ছিল, এই সময়ে অনুকূল অবস্থার প্রভাবে তার স্ফূর্ত্তি আরম্ভ হয়; এবং তারপর এই শতাব্দীকাল এই স্ফূর্ত্তির ক্রিয়াই চলিতেছে।

কোথায় কিভাবে এই বীজ বা সংস্কার ইয়োরোপের অন্তরে ছিল? কি লক্ষণ তার দেখা গিয়াছে? কিসের চাপে তাহা চাপিয়া রাখিয়াছিল?

বর্ত্তমান ইয়োরোপের অভ্যুদয়ের রহস্যকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, চারিটি মূল করণ বা factorএর ক্রিয়া আমরা দেখিতে পাইব,—টিউটন বা জর্ম্মাণের প্রাণ, রোমক সভ্যতা, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম আর গ্রীক্ চিন্তা। রোমক সাম্রাজ্যের উপরে টিউটন বা জর্ম্মাণ জাতির অভিযান ও অধ্যাসন হইতে যে নব্য ইয়োরোপের অভ্যুদয় হইয়াছে, একথা পূর্ব্বেই

একস্থলে বলিয়াছি। জর্ম্মাণের জাতীয় প্রকৃতির বিশেষত্বই ছিল ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের দিকে প্রবল আগ্রহ, স্বাধীন গৃহস্থজীবনই ছিল প্রত্যেক জর্ম্মাণের আদর্শ জীবন। আত্মরক্ষা বা নূতন দেশ জয়ের প্রয়োজনে যখন তাহারা মিলিত হইত, স্বেচ্ছায় আপনাদেরই মনোনীত কোনও বীরনায়কের কর্ত্তৃত্ব তাহারা স্বীকার করিত। অন্যথা আপনাদের গার্হস্থ্য স্বাধীনতা তাহারা সহজে ত্যাগ করিতে চাহিত না। যে ব্যক্তিত্ব বা individualityর বিকাশ বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় সভ্যতার প্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার বীজ এই ভাবে জর্ম্মাণের জাতীয় স্বভাবের মধ্যে ছিল। রোমক সভ্যতার প্রধান প্রকৃতি ছিল, প্রতিষ্ঠিত শাসনশক্তি বা ষ্টেটের সম্পূর্ণ অনুবর্ত্তিতা। প্রত্যেক রোমান্ সর্ব্বতোভাবে ষ্টেটেরই প্রজা,—এই প্রজাধর্ম্মের উপরে, কাহারও ব্যক্তিত্বের কোনও স্বতন্ত্র অধিকার রোমক সাম্রাজ্যনীতিতে স্বীকৃত হইত না। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম শিষ্যবর্গের মধ্যে কোনও ভেদ মানিত না বটে, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে নিহিত ভগবদ্‌বিধি এবং সাধুমণ্ডলীর প্রবর্ত্তিত নীতির বশবর্ত্তিতা প্রত্যেক খৃষ্টানের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সমাজশাসনে প্রথম প্রথম খৃষ্টীয় জনসঙ্ঘের একটা অধিকার ছিল, ক্রমে তাহার কর্ত্তৃত্ব বিশপ প্রভৃতি বড় বড় অধ্যক্ষ যাজকদের হাতে গিয়া পড়ে। পরে যখন রোমক সাম্রাজ্যনীতির (imperial policyর) আদর্শে রোমক চার্চ্চের প্রতিষ্ঠা হইল, তখন সর্ব্বতোভাবে এই চার্চ্চের বশবর্ত্তিতাই খৃষ্টানের পক্ষে ধর্ম্ম-জীবনের মূল প্রমাণ হইয়া দাঁড়াইল। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপদ্ধতির এই পরিণতিও যে রোমক সভ্যতার প্রভাবেই ঘটে, ইহা বলাই বাহুল্য। এই সময়ে আবার 'The Holy Roman Empire' বা 'রোমক ধর্ম্মরাজ্য' নামে নূতন ভাবে রোমক সাম্রাজ্যের পুনরভ্যুদয় হয়। রোমক চার্চ্চ ও রোমক ধর্ম্মরাজ্য—উভয় প্রতিষ্ঠানই রোমক প্রকৃতির প্রতিষ্ঠান, উভয়েরই লক্ষ্য হইল সমগ্র ইয়োরোপীয় খৃষ্টানমণ্ডলীকে ইহার অনুবর্ত্তী করিয়া রাখা। কিন্তু জর্ম্মাণ প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি এই

অনুবর্ত্তিতার বিপরীত দিকে। বিপরীত এই দুই গতির মধ্যে সংঘর্ষও অনেক ঘটে, এবং ইহারই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে মধ্যযুগে 'ফিউডাল' সমাজের অভিব্যক্তি হয়। যাহা হউক, ক্রমে ধর্ম্মশাসনে ও রাষ্ট্রশাসনে রোমক নীতির প্রভাবই প্রবল হইয়া উঠিল। ধর্ম্মশাসনে চার্চ্চের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রশাসনে সম্রাটের কর্ত্তৃত্ব নগণ্য হইয়া পড়িলেও বিভিন্ন দেশে রাজাদের প্রভুত্ব রোমক রাষ্ট্রনীতি ধরিয়াই গড়িয়া উঠিতে থাকে। ইয়োরোপের নবীন জাতিসমূহ যে বিজিত প্রাচীন রোমক * ও বিজেতা নবীন জর্ম্মাণ জাতিদ্বয়ের মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিজেতা জর্ম্মাণ উপাদানের প্রভাবই যে এই সব জাতির উচ্চতর শ্রেণী সমূহের মধ্যে প্রধান হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। সুতরাং রোমক নীতির প্রভাবে অনেকটা চাপা পড়িলেও জর্ম্মাণ প্রকৃতির স্বাভাবিক সেই স্বাধীনতা বা ব্যষ্টি স্বাতন্ত্র্যের সংস্কার একেবারে লোপ পায় নাই। ফিউডাল নায়কগণ সর্ব্বদাই রাজশক্তির বিরুদ্ধে আপনাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে প্রয়াস পাইতেন। নাগরিক বুর্জ্জোয়স্ স্বায়ত্তশাসনে ইহার আর একটি লক্ষণ প্রকাশ পায়। চার্চ্চের বিরুদ্ধেও মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহের প্রয়াস দেখা দেয়।

প্রাচীন গ্রীক্ বিদ্যাতে মানববুদ্ধির স্বাধীন চিন্তার ধারা প্রকাশ পায়। রাষ্ট্রনীতিতে রোমক সভ্যতার গতি যেরূপই হউক, রোমক বিদ্যা গ্রীক্ বিদ্যারই পথ ধরিয়া চলিত। প্রাচীন সেই গ্রীক্ ও রোমক বিদ্যা যখন ইয়োরোপে প্রচারিত হইল, জর্ম্মাণ প্রকৃতির সহজ স্বাধীনতার সংস্কার আপন প্রাণেরই সাড়া তার মধ্যে পাইল; সাড়ায় তার অবসন্ন মৃতপ্রায় প্রাণ নূতন জীবনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। যে রস তার প্রাণ চাহিত, তাহাতে বঞ্চিত তৃষিত চিত্ত তাহারই আস্বাদ ইহার মধ্যে পাইয়া আগ্রহে তাহা আকণ্ঠ পান করিতে

* এখানে রোমক বলিতে কেবল 'জাত' রোমক নয়, রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিম ইয়োরোপের যে সব কেল্টিক জাতি রোমকদের সঙ্গে মিশিয়া একেবারে রোমক ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহাদেরও বুঝিতে হইবে।

ছুটিল। নববিদ্যার প্রভাবে এই নবজাগরণ ইতিহাসে Renaissance নামে পরিচিত। বিদ্যার অনুশীলনে স্বাভাবিক সংস্কারের এই স্ফূর্ত্তি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরম্ভ হয়। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে ইহার কোনও প্রভাব বড় প্রকাশ পায় না। সে পর্য্যন্ত রোমক সভ্যতার ও রোমীয় খৃষ্টধর্ম্মপদ্ধতির মূলনীতি যে ব্যক্তিগত জীবনের উপরে শাসনশক্তির (Established Authorityর) সর্ব্বময় প্রভুত্ব, তাহারই প্রাধান্য বজায় ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে এই স্ফূর্ত্তি Reformation বা ধর্ম্মসংস্কারপ্রচেষ্টায় দেখা দেয়। কিন্তু ইহার মধ্যেও প্রটেষ্টাণ্ট চার্চ্চসমূহের শাসন-পদ্ধতিতে সেই রোমক নীতিরই প্রভাব প্রকাশ পায়। ঘাত প্রতি-ঘাত চলিতে থাকে, পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসীবিপ্লবের যুগে রোমক প্রভাবজাত সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া জর্ম্মাণ প্রকৃতিগত স্বাধীনতার বৃত্তি অবাধে আপন লক্ষ্যের দিকে ছোটে।

মোট কথা, নব্য ইয়োরোপের অভ্যুদয়ে এই যে চারিটি factor বা মূলকারণের উল্লেখ করা হইল, ইহার মধ্যে খৃষ্টীয় factor মানবে মানবে একটা সমভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ স্বীকার করিত বটে, কিন্তু লোক-শাসনে সম্পূর্ণরূপে রোমক factor এর অনুবর্ত্তী হইয়া পড়ে। এই দুই factorই ব্যক্তি-জীবনকে অতিমাত্রায় একটা প্রভুশক্তির (Authorityর) বশবর্ত্তী করিয়া রাখিতে চায়। টিউটন বা জর্ম্মাণ factor ইহার বিরোধে কর্ম্মজীবনে individualityকে বা ব্যক্তিত্বের প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। গ্রাক্ factor চিন্তা ও ভাবের দিক্ হইতে ইহাকেই পোষণ করে। প্রথম দুইটি factorএর লক্ষ্য প্রভু-শক্তির অনুবর্ত্তিতা—submission to authority; আর শেষোক্ত দুইটি factorএর লক্ষ্য ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য—individual liberty.

বর্ত্তমান ইয়োরোপের প্রথম যুগে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মোটের উপর রোমক ও খৃষ্টীয় নীতিই প্রভুত্ব করিয়াছে। ষোড়শ

শতাব্দী হইতে গ্রাক্ চিন্তাধারার স্পর্শে জাগ্রত হইয়া জর্ম্মাণের ব্যক্তিত্ব বা individuality মাথা তুলিয়া উঠে। তখন পরস্পরবিরোধী এই দুইটি গতির মধ্যে সংগ্রাম উপস্থিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই সংগ্রাম চলিতে থাকে, তখন ফরাসী বিপ্লবে প্রাচীন রোমক ও খৃষ্টীয় নীতির প্রভাব একেবারে অভিভূত হওয়ায় জর্ম্মাণের ব্যক্তিত্ব বা individualityর স্ফূর্ত্তিই ইয়োরোপীয় জীবনশক্তির আশ্রয় হইয়া দাঁড়ায়।

ইহারই প্রেরণা অষ্টাদশ শতাব্দীর র‍্যাসনালিজম্‌কে উদ্বুদ্ধ করে, ইহাকে আশ্রয় করিয়া, ইহারই পথে পণ্ডিতমণ্ডলীর চিন্তা ও যুক্তির ধারা পরিচালিত হয়, এবং তাঁহাদের প্রতিভা ইহাকে বাস্তব জীবনের একটা বিশিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতির (a practical programme of lifeএর) আকার দান করে। প্রভুশক্তি বা Authority যেমন ব্যক্তিত্বের বা individualityর সকল অধিকারকে চাপিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল,—নূতন এই ব্যক্তিত্বের স্ফূর্ত্তি তেমনই প্রভুশক্তির সকল অধিকারকে অস্বীকার করিল। উভয়ের মধ্যে যে একটা সামঞ্জস্য ঘটিতে পারে, একে অপরের ন্যায্য অধিকারের সীমা লঙ্ঘন না করিয়াও যার যার স্বকীয় ক্ষেত্রে স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম পালন করিতে পারে, এবং তাহাতেই যে সমাজের সর্ব্বোচ্চ মঙ্গল সাধিত হয়, এই সত্যকে পূর্ব্বকার প্রভুশক্তিও মানিয়া চলে নাই, নূতন এই ব্যক্তিত্বের স্ফূর্ত্তিও মানিয়া চলিতে চাহিল না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্যক্তিত্বের স্ফূর্ত্তি সম্বন্ধে সকলের সমান নিরপেক্ষ অধিকারকে মানিলে, পরস্পরের সম্বন্ধে সকলের সমান প্রতিযোগিতার অধিকারকেও মানিতে হয়। এই প্রতিযোগিতাপরায়ণ ব্যক্তিত্ব মূলক জীবনযাত্রার যে পদ্ধতি (programme of life) র‍্যাসনালিষ্ট আদর্শে নির্দ্দিষ্ট হয়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাহারই প্রতিষ্ঠার একটা সর্ব্বব্যাপী প্রচেষ্টা ইয়োরোপ ভরিয়া দেখা গিয়াছে, এবং এই প্রচেষ্টার সার্থকতা যেখানে যে পরিমাণে হইয়াছে, সেই পরিমাণে সেখানে

ইয়োরোপীয় সভ্যতার বিশেষত্বও ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রীয় জীবনে ও ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইহার ক্রিয়া কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, এবং তাহার ফল কিরূপ দেখা যাইতেছে, পূর্ব্ব দুই প্রবন্ধে তাহা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। ধর্ম্মনীতির ক্ষেত্রে ইহার ক্রিয়া আগে তেমন স্ফুটভাবে প্রকাশ পায় নাই,—সম্প্রতি পাইতেছে, এবং কোন পরিণতির দিকে তাহা ইয়োরোপের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে লইয়া যাইতেছে, পরে এক প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। এই ব্যক্তিত্ব ও প্রতিযোগিতামূলক সভ্যতা বিকাশের ক্রিয়া রাষ্ট্রীয় জীবনে ও ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যাহা ঘটিয়াছে, তাহারই প্রতিক্রিয়া যে কিভাবে কি ঘটিতেছে, এবং কোন্‌দিকে এই বিপুল শক্তিশালী সভ্যতার স্রোতকে ফিরাইয়া তাহা নিতে চাহিতেছে, তাহাই আগে এই প্রবন্ধে বুঝিবার চেষ্টা করিব। পূর্ব্ব দুইটি প্রবন্ধের সঙ্গে ইহারই একটা অবিচ্ছিন্ন পারম্পর্য্যের সম্বন্ধ আছে।

রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রাচীন সব এষ্টেট্ (Estate) বা অন্যরূপ সম্প্রদায়ের ভেদে অধিকার ভেদ এই শতাব্দীর মধ্যে উঠিয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রীয় সব বিধিব্যবস্থা উচ্চনীচ সকল প্রজাকেই সমান বলিয়া গণ্য করে, এবং শাসনশক্তির নিয়ন্তৃত্বে ডিমক্রাসীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে উচ্চনীচ নির্ব্বিশেষে সকলেরই সমান এক এক ভোট। শাসন ও বিচার প্রভৃতি সম্বন্ধীয় উচ্চদায়িত্ব-মূলক সব রাজকর্ম্মে যোগ্যতা থাকিলে সকলেই এখন নিযুক্ত হইতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য মণ্ডলে অর্থাৎ ইয়োরোপে ও আমেরিকায় সর্ব্বত্রই প্রায় জনগণ বা masses উচ্চতর শ্রেণী সমূহের সঙ্গে সমান এই সব অধিকারে উন্নীত হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আমরা দেখিয়াছি, জনগণের সমান ভোটের অধিকার সত্ত্বেও ডিমক্রাসীর প্রকৃত যে শক্তি, কেমন করিয়া তাহা ধনবান্ ও শক্তিমান্ দলনায়ক বা party leaderদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। আরও দেখিয়াছি, এই সব দলনায়ক বা party leaderগণ উচ্চতর বুর্জ্জোয়াস্

সম্প্রদায়েরই লোক, এবং তাহাতে রাষ্ট্রীয় শাসনে বুর্জ্জোয়াস্ প্রভুত্বই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।

ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও সাম্প্রদায়িক বা ষ্টেটাস্ অনুযায়ী কর্ম্ম বিভাগের রীতি উঠিয়া গিয়াছে। সকল ব্যবসায়ে সকলের সমান প্রতিযোগিতার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার স্বাভাবিক ক্রিয়ার ফলে কি ভাবে ক্রমে যে সকল ব্যবসায় বাণিজ্য ধনী মহাজনদের বা বুর্জ্জোয়াজির আয়ত্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং কেবল দরিদ্র শ্রমিক জনগণ নহে, ধনবলে দীনতর বুর্জ্জোয়াস্‌বর্গ পর্য্যন্ত, একেবারে তাঁহাদের আর্থিক বা economic দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া কিরূপ দুর্গতির অবস্থায় আসিয়া নামিয়াছে, ধনবলে এবং ধনসুলভ প্রতিপত্তির বলে রাষ্ট্রীয় সকল শক্তিও যে কিরূপ ভাবে এই ধনী বুর্জ্জোয়াজির করায়ত্ত হইয়া তাহাদেরই স্বার্থের প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত হইতেছে, তাহাও দেখিয়াছি।

প্রতিযোগিতাপরায়ণ ব্যক্তিত্বমূলক জীবনযাত্রার যে পদ্ধতি গৃহীত হয়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাহারই প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়িক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ধনী মহাজনদের এমনই একটা প্রবল আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, যাহার চাপে এই সব উচ্চ অধিকারের বড় বড় কথা সত্ত্বেও দেশের জনগণ কোনও দিকে আর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না। পূর্ব্বে রাজা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের শাসন (Monarchic and Aristocratic rule) দরিদ্র জনগণকে যে পীড়ন করিত, অন্য ভাবে এই মহাজন বা বুর্জ্জোয়াজি শাসনের পীড়ন তাহাদের পক্ষে বেশী বই কম ক্লেশকর হয় নাই। ইউরোপে ফ্রান্স প্রভৃতি কোনও কোনও দেশেই রাজকীয় ও অভিজাত শাসন একসময়ে অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার সীমায় গিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু রাজকীয় বা অভিজাত শাসন সাধারণতঃ যেরূপ হয়, তার সঙ্গে যদি এই বুর্জ্জোয়াজি বা মহাজন শাসনের তুলনা করা যায়, তবে দেখিতে পাইব, দুর্ব্বল দরিদ্র শ্রমজীবীর পক্ষে রাজকীয় ও অভিজাত-শাসন

অনেক বেশী কল্যাণকর। এই শাসন সময়ে সময়ে অন্যরূপ পীড়ন যাহাই করুক, দরিদ্রের জীবিকার ক্ষেত্রে হাত দেয় না,—দরিদ্র স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ জীবিকার ক্ষেত্রে ইচ্ছামত কাজ কর্ম্ম করিতে পারে, এবং করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দেও থাকে। বরং ব্যবসায়বাণিজ্যাদি কর্ম্মে যাহাতে ইহারা উন্নতিলাভ করে, ধনাগম ইহাদের হয়, সেই দিকেই রাজশক্তির লক্ষ্য থাকে, কারণ সুবিজ্ঞ শাসকমাত্রই জানেন, প্রজারা ঘরে ধন বাড়িলে রাজকোষেও ধন বাড়িবে। কিন্তু মহাজন বা বুর্জ্জোয়াজি শাসনের মূল লক্ষ্যই হইতেছে, ব্যবসায়বাণিজ্যে এমন ভাবে সর্ব্বদা আপনাদেরই শক্তিপ্রতিষ্ঠা, যাহাতে সকল ধন আপনাদের হাতে পুঞ্জীভূত হয়। দরিদ্রের ঘরবাড়ী ইঁহারা ভাঙ্গিয়া দেন না, হালগরু কি যন্ত্রপাতিও বলে কাড়িয়া নেন না, তার সঞ্চিত ধনও লুঠিয়া নিয়া যান না, কিন্তু এমনই সব রীতিনীতি ও বিধিব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেন, যাহাতে দরিদ্র ঘর বাড়ী ছাড়িয়া, হালগরু কি যন্ত্রপাতি বেচিয়া, ইহাদের সব বড় বড় কারখানার মুজুরের যে কঠোর দুঃসহ দুর্গতির জীবন, অনন্য-গতি হইয়া তাহাতেই সপরিবারে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। মানুষ সব সমান নয়; গুণভেদে কর্ম্মভেদ এবং গুণকর্ম্মভেদে অধিকার ভেদ মানব সমাজের পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা। গুণবৈষম্য না মানিয়া সকল কর্ম্মেই সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ফল এই হইয়াছে, যে ধনে ও অন্যান্য শক্তিতে অপেক্ষাকৃত হীন যাহারা, তাহাদের সব বৃত্তির ক্ষেত্র ধনী ও শক্তিমান্ যাঁহারা তাঁহারা দখল করিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের বৃত্তির ক্ষেত্রে দরিদ্র ও দুর্ব্বল জনগণ প্রবেশ করিতে পারে নাই। এবং ইহার ফলে আর এক ভাবে বিকট এক অস্বভাবিক যে কর্ম্মভেদ দেখা দিয়াছে, তাহাতে দরিদ্র কেবল দুঃখই পাইতেছে।

তারপর অধিকারের কথা। ব্যাসনালিষ্ট নীতির জোরে, আইনে, গুণ-কর্ম্মাদির ভেদ নির্ব্বিশেষে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেই কেবল সকলের সমান একটা অধিকার স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু আইন মানুষে মানুষে স্বাভাবিক

যে বৈষম্য রহিয়াছে, তাহা দূর করিতে পারে না, এবং গুণসাম্যে, কর্ম্ম-সাম্যে ও ধনসাম্যে সামাজিক সাম্যও প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। সমান রাষ্ট্রীয় অধিকার সত্ত্বেও সামাজিক এই সাম্য ইয়োরোপে ঘটে নাই, বরং আধুনিক অত্যধিক ধনবৈষম্য সামাজিক বৈষম্যকে অতি বিসদৃশ এক বিকট অবস্থায় নিয়া তুলিয়াছে। একদিকে বিত্তবানের অমিত ঐশ্বর্য্যের ও অশেষ বিলাসভোগের আড়ম্বর এবং তাহারই পাশে লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের অতি হীন দুর্গতি—ইহাই সর্ব্বত্র ইয়োরোপীয় নাগরিক জীবনের সাধারণ দৃশ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইয়োরোপের সভ্যতাই একরূপ নাগরিক সভ্যতা। পল্লীঅঞ্চলেও এই নাগরিক সভ্যতার প্রভাব বেশ গিয়া পড়িয়াছে। সেখানেও এক এক-*জন নাগরিক ধনীর বিলাসসম্ভারে পূর্ণ* বিরাম-নিবাসের এক একটি সৌধ যেন গর্ব্বে মাথা তুলিয়া চারিধারে শতশত দরিদ্র কৃষিমুজুরের দীন কুটীরের কঠোর অভাবপীড়িত জীবনকে নিত্য উপহাস করিতেছে। অশেষ দুঃখক্লিষ্ট এই যে শ্রমিক জনগণ, সর্ব্বদাই ইহারা শুনিয়া থাকে অন্য সকলের সঙ্গে ইহারা সমান অধিকার ভোগী প্রজা, দেশের Sovereignty বা রাজশক্তির স্থাপক ও ধারক জনবলে ইহারাই, ইহাদেরই ভোটে রাষ্ট্রীয় পার্লামেণ্ট গঠিত হয়। অথচ এই দারুণ দুর্গতির অবস্থায় তারা আছে, কেবল খাটিয়াই মরিতেছে, সুখশান্তির কোন আস্বাদ পাইতেছে না। আর অল্পসংখ্যক একদল ধনী ক্রমে আরও অতি ধনী হইয়া দেশের সকল সুখ সম্পদ ভোগ করিতেছে। কেবল তাই নয়, সকল শক্তি, সামাজিক সকল প্রতিপত্তি উন্নতি-লাভের সকল সুযোগ, উন্নত কর্ম্মের সকল ক্ষেত্র একেবারে ইহাদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। নামে সমান হইয়াও কার্য্যতঃ কোনও বিষয়ে ইহাদের কাছেও তারা ঘেঁসিতে পারিতেছে না। কোন্ যুক্তিতে কি বলিয়া তাহারা মনকে বুঝাইবে? তথাকথিত সাম্যের *অধিকারের মধ্যে বাস্তব এই দারুণ বৈষম্যকে কোন্ যুক্তিতে সঙ্গত ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করিয়া নিবে?* শিক্ষার বিস্তার হইতেছে।

আপনাদের অধিকারের সকল তত্ত্ব দুঃস্থ এই জনগণ শিখিতেছে। ভোট বাচাইএর সময় এই সব অধিকারের কথাও বিশ্লেষণ করিয়া দল-নায়কবর্গ সকলকে বুঝাইয়া থাকেন। তা ছাড়া, এই সাম্যের অধিকার সত্ত্বেও কি ভাবে সকল ধন ও রাষ্ট্রীয় শক্তি গিয়া ধনী বুর্জ্জোয়স্-সম্প্রদায়ের হাতে গিয়া পড়িয়াছে, দরিদ্রের কি দুর্গতি তাহাতে হইতেছে, সে সব কথাও বহু মনীষী পুস্তকে লিখিয়া প্রচার করিতেছেন, এবং তাঁহাদের এই সব কথা আবার বহু জননায়ক জনগণের মধ্যে প্রচার করিতেছেন। এই শিক্ষায় তাহাদের চক্ষু খুলিতেছে, অধিকার বুঝিতেছে, অথচ অধিকার সত্ত্বেও বর্ত্তমান সব ব্যবস্থার মধ্যে মুক্তির কোনও সহজ পথ তাহারা দেখিতেছে না। সুতরাং এই অবস্থার আমুল পরিবর্ত্তন ছাড়া তাহাকে বজায় রাখিবার দিকে তাহাদের বুদ্ধি কি মতিগতি পরিচালিত হইতে পারে না।

তাই বেঞ্জামিন কিড্ তাঁহার Social Evolution গ্রন্থের একস্থলে বলিয়াছেন,—

"Whatever else may be the effect of a close study of this literature, it must leave the impression on the mind of an unprejudiced observer, that in our present day societies, where we base on the fabric of political equality the most obvious social and economic inequality, the lowest classes of our population have no sanction from their reason for maintaining the existing conditions."

[Social Evolution, Benjamin Kidd, Chap. III, P. 74.]

অর্থাৎ, এই বিষয়ে এই যে সব গ্রন্থাদি প্রচারিত হইয়াছে, গভীর অভিনিবেশ সহকারে তাহা পাঠ করিলে, আর যাহা কিছু ফলই তাহার হউক, নিরপেক্ষ কোনও পাঠক একটি সত্যকে স্বীকার না করিয়াই

পারিবেন না। তাহা এই যে আমাদের বর্ত্তমান সব সমাজে সমান রাষ্ট্রীয় অধিকারের ভিত্তির উপরে সামাজিক ও আর্থিক যে দারুণ একটা বৈষম্য অতিশয় পরিস্ফুট ভাবে মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আমাদের নিম্নতম স্তরের জনগণ বর্ত্তমান অবস্থাকে উত্তম ও সঙ্গত বলিয়া তাহাদের বুদ্ধির যুক্তিতে গ্রহণ করিতে পারে না, এবং ইহাকে বজায় রাখিতেও তাহাদের কোনও আগ্রহ হইতে পারে না।

বজায় রাখিতে তাহারা চাহিতে পারে না, এবং তাহাদের এই জাগ্রত বুদ্ধি যদি বাস্তব কর্ম্মের দিকে পরিচালিত হয়, বজায় থাকিতেও পারে না। হেনরী জর্জ্জ তাই তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Progress and Povertyর ভূমিকায় বলিয়াছেন,—

"To educate men who must be condemned to poverty is but to make them restive; to base on a state of most glaring social inequality political institutions under which men are theoretically equal is to stand a pyramid on its apex".

অর্থাৎ, দারুণ দারিদ্র্য যাহাদের অবশ্যম্ভাবী নিয়তি তাহাদিগকে এই সব অধিকারের তত্ত্ব শিক্ষা দিলে অসন্তুষ্ট ও অধীর তাহারা হইয়া উঠিবেই। রাষ্ট্রীয় সব প্রতিষ্ঠানে নামতঃ সকলের সমান অধিকার স্বীকার করা হয়। কিন্তু সেই সব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি যে সমাজ, তার মধ্যে অতি বিসদৃশ এই বৈষম্য বর্ত্তমান। বাস্তব এই সামাজিক বৈষম্যের উপরে এরূপ সব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা মাথার কোণের উপরে পিরামিড স্থাপনারই ন্যায় বিফল হয়।

তাই ত! যে পদ্ধতি এমনই ভাল বলিয়া গৃহীত হইল, সমাজের সকল অন্যায় অত্যাচার ও অকল্যাণ যাহা হইতে দূর হইবে, এই ভরসা সকলে করিলেন, মাত্র শতাব্দী কালের মধ্যেই আজ তাহা হইতে এত বড় একটা অন্যায় পীড়নের, অসহনীয় দুঃখের সৃষ্টি হইল কেন? যাহাদের মঙ্গলই ইহার প্রধান লক্ষ্য ছিল, তাহারাই কেন আজ এই দুঃখের

পীড়নে অতিষ্ঠ হইয়া ইহার আমূল পরিবর্ত্তন চাহিতেছে ? ইহাই ত সমস্যা। এই সমস্যা সম্বন্ধেই এমিলে দি লাভেলিয়ে (Emile-de Laveleye) নামক একজন ফরাসী পণ্ডিতের উক্তি তুলিয়া বেঞ্জামিন কিড্ একস্থানে সে বলিতেছেন।

"The message of the eighteenth century to man was, he (Emile-de Laveleye) said, 'Thou shalt cease to be the slave of nobles and despots who oppress thee; thou art free and sovereign." But the problem of our times is, 'It is a grand thing to be free and sovereign, but how is it that the sovereign often starves ? How is it that those who are held to be the source of power often cannot, even by hard work, provide themselves with the necessaries of life ?

[Social Evolution, Benjamin Kidd, Chap. I, P. 4]

অর্থাৎ মানুষের নিকটে অষ্টদশ শতাব্দীর বাণী ছিল, তোমরা রাজা কি জমিদারবর্গের যথেচ্ছ পীড়নের অধীন দাস আর থাকিবে না। তোমরা স্বাধীন ; তোমরাই রাজা। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের সমস্যা হইতেছে, হাঁ স্বাধীন হওয়া আর রাজা হওয়া অতি বড় কথাই বটে ; কিন্তু রাজা কেন খাইতে পায় না ? সকল শক্তির উৎস বলিয়া যাহারা পরিগণিত, প্রাণান্ত শ্রম করিয়াও কেন তাহারা জীবনরক্ষার উপযোগী সামান্য অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে পারে না ?

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী বিপ্লব প্রাচীন এক যুগের অবসান করিয়া নূতন এক যুগের প্রবর্ত্তন করে। প্রাচীন সেই যুগ শ্রেণী-ভেদ ও অধিকারভেদ মানিত। অত্যধিক সব অন্যায় অধিকার-ভোগী উচ্চতর সম্প্রদায়ের অত্যাচার যখন নিম্নতর সম্প্রদায়গুলিকে

চাপিয়া পিষিয়া ফেলিতেছিল, তখন সকলের সঙ্গে সমান অধিকারের দাবী করিয়া ইহারা বিদ্রোহী হইল, এবং সেই বিদ্রোহের প্রচণ্ড বিপ্লবে উচ্চতর সম্প্রদায় সব ভাসিয়া গেল। এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন বুর্জ্জোয়াজি সম্প্রদায়। দরিদ্রজনসাধারণ দুঃখ দুর্গতি আর সহিতে পারিতেছিল না; কতক ইঁহাদের প্রচারিত স্বাধীনতার ও সমান অধিকারের বাণীতে নূতন আশায় প্রবুদ্ধ হইয়া, কতক অত্যাচারী অভিজাতসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার উত্তেজনায় উন্মত্ত হইয়া, ইঁহাদের নেতৃত্বে এই বিপ্লব তাহারা ঘটায়। বিপ্লবেব পরে সকলের সমান রাষ্ট্রীয় অধিকারের ভিত্তিতে গণতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিক সম্বন্ধেও সকলের সমান ব্যক্তিত্ব ও প্রতিযোগিতার অধিকার স্বীকৃত হয়। তখন সমাজের বড় সমস্যা হইয়াছিল, উচ্চতর অধিকারে শক্তিমান্ উচ্চতর সম্প্রদায়ের পীড়ন হইতে ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত জনসাধারণকে মুক্ত করা যায় কি প্রকারে? সহজ উত্তর হইল, অধিকারভেদ লোপ করিয়া সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায়। সেই সমান অধিকারেরও প্রতিষ্ঠা হইল; ইহারই ভিত্তির উপরে রাষ্ট্রশাসনপদ্ধতি সব ডিমক্রাটিক আকার ধরিয়া উঠিল। কিন্তু দরিদ্রের দুঃখ ত কিছুই দূর হইল না। বরং সকল ব্যবসায়িক বৃত্তি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল সুযোগ ও শক্তি, এমনই ভাবে ধনীর হাতে গিয়া পড়িয়াছে, যে দরিদ্রজনসাধারণ কোনও দিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার অবকাশ পাইতেছে না। ধনীর প্রভুত্ব হইতে কিসে তাহারা মুক্ত হইতে পারে, কিসে এই দুর্গতি তাহাদের দূর হয়, সমান অধিকার যদি তাহাদের আছে, কিসে তার বলে তাহারা সমান শক্তি, সমান সুযোগ, সমান সুখ অন্য সকলের সঙ্গে ভোগ করিতে পারে, ইহাই হইতেছে এখনকার সমস্যা। ফরাসী বিপ্লব শ্রেণীভেদে প্রাচীন সেই অধিকারভেদ লোপ করিয়াছিল, উচ্চনীচ নির্ব্বিশেষে সমান অধিকারও সকলকে দিয়াছিল। কিন্তু সে অধিকার রাষ্ট্রীয় জীবনের সীমা অতিক্রম করিয়া সমাজ জীবনে কোনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। রাষ্ট্রীয় জীবনেও সকলের

পক্ষে সমান আইন, সমান বিচার, সমান দণ্ড, আর ডিমক্রাটিক ব্যবস্থাপরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে সকলের সমান এক এক ভোট, ইহার উপরে বাস্তব পক্ষে কোনও শক্তির সাম্য স্থাপিত হয় নাই। সম্পদের সাম্য ত কিছু হয়ই নাই বরং অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে ভয়ঙ্কর যে বৈষম্য দেখা দিয়াছে, তাহাতে সামাজিক বৈষম্যকে আরও কঠোর করিয়া তুলিয়াছে, এবং রাষ্ট্রীয় অধিকারের সঙ্গে যে শক্তির সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারিতেছে না, তাহারও প্রধান কারণ এই ধনবৈষম্য ও সামাজিক বৈষম্য। ফরাসী বিপ্লবের ব্যর্থতাই এইখানে।—কেবল ব্যর্থতা বলিলেই যথেষ্ট হয় না, সমান অধিকারের যে গর্ব্বিত উচ্চ ধ্বজা আকাশে তুলিয়াছিল, সেই ধ্বজার তলেই যে সকল দিকে এত বড় একটা বৈষম্য আসিয়া জমিয়া দাঁড়াইয়াছে,—ব্যবসায়িক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল কার্য্যকরী শক্তি যে একেবারে ধনীর করায়ত্ত হইয়া পড়িয়াছে, এই শক্তি যে ধনীর স্বার্থের দ্বারে দরিদ্রের সুখস্বচ্ছন্দতাকে অবিরত বলি দিতেছে,—ধনীর হাতের এমন একটা শক্ত ও জটিল নাগপাশে সমগ্র সমাজই এমনভাবে বাঁধা পড়িয়াছে যে কোথাও কেহ স্বচ্ছন্দভাবে একটু নড়িয়া চড়িয়া স্বাধীন জীবিকার কোনও সংস্থানই করিতে পারিতেছে না,—কোন ব্যাবসায়িক বৃত্তিতে স্বতন্ত্র গৃহস্থজীবনের শান্তি ও আনন্দভোগের, সহজ একটু আরামবিরামের, একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবার অবসর দরিদ্রের দূরে থাক্, অপেক্ষাকৃত অল্প ধনীর পক্ষেও যে দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে,—মোটের উপর সাধারণ লোকের দুঃখদুর্গতির তীব্রতা, এবং ইহাতে একটা নিরুপায়ের অবস্থা যে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে বই কমে নাই,—ইহাতে ইহাই বলিতে হইবে যে negative ভাবে কেবল ব্যর্থই হয় নাই, positive ভাবে বহু অমঙ্গলই এই বিপ্লবের নীতি প্রসব করিয়াছে।

প্রাচীন সমাজে ক্রটি যাহা ছিল, তাহা দূর হইয়াছে, কিন্তু তার স্থানে নূতন এই সমাজে নূতন যে সব ক্রটি দেখা দিয়াছে, তাহা তার অপেক্ষা বড় বই ছোট ক্রটি নয়। পূর্ব্বে অভিজাত ভূস্বামী সম্প্রদায়ের

হাতে লোকপীড়নের যে ক্ষমতা ছিল, নামে না হউক কার্য্যতঃ ধনীর হাতে দরিদ্রপীড়নের ক্ষমতা তার অপেক্ষা এখন অনেক বেশী গিয়া পড়িয়াছে। এরিষ্টোক্রাসী (Aristocracy) বা অভিজাতশাসন উঠিয়া গিয়া তথাকথিত ডিমক্রাসীর মধ্যে বাস্তব যে প্লুটোক্রাসী (Plutocracy) বা ধনীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার নির্ম্মম কঠোরতা যে কিভাবে জনসাধরণকে পেষণ করিতেছে, পূর্ব্বে তার সম্বন্ধে বহু আলোচনা করা হইয়াছে, নূতন করিয়া আর কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই।

কেন এমন হইল, কিসে ইহার সংশোধন হইতে পারে, ইহাই হইতেছে এখনকার বড় প্রশ্ন। ধনীর হাতে বড় বেশী ধন গিয়া জমিয়াছে, আরও জমিতেছে, এবং এই ধনই ধনীকে এমন শক্তিমান্ করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং ধনী যাহাতে এমন ধনসঞ্চয় আর না করিতে পারে, ধনবলে এত বড় শক্তির অধিকারী না হইতে পারে, তাহাই করিতে হইবে। কিসে তাহা হইতে পারে? বর্ত্তমান সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে যাহা কিছু ধনীকে এই ধনসঞ্চয়ে এবং ধনসুলভ শক্তিসঞ্চয়ে সুযোগ দিতেছে, তাহাই দূর করিতে হইবে। ব্যাধির নিরাকরণ করিতে হইলে, আগে তার মুল নিদান কি তাহাই ধরিতে হইবে, তারপর সেই নিদানের নিরাকরণ করিতে হইবে। ব্যাধি তখন আপনিই নিরাকৃত হইবে। ব্যক্তিত্বের ও প্রতিযোগিতার পূর্ণ অধিকার—যাহা ব্যক্তিত্বের স্বার্থপ্রতিষ্ঠাকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য বলিয়া ধরিয়া নিয়াছে এবং এই স্বার্থপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ধনী দরিদ্র, সবল দুর্ব্বল, বিজ্ঞ ও অজ্ঞ—সকলকেই সকল কর্ম্মক্ষেত্রে সমান প্রতিযোগিতার নির্ম্মম সংগ্রামের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে, তাহাতেই দুর্ব্বল ও দরিদ্র সর্ব্বত্র এমন কোনঠাসা হইয়া দারুণ এই দুর্গতির অবস্থায় আসিয়া নামিয়াছে। প্রতিযোগিতাপরায়ণ ব্যক্তিত্বের (competitive individualityর) এই অধিকারই হইল সামাজিক এই ব্যাধির নিদান, সুতরাং এই অধিকারকেই লোপ করিতে হইবে।

ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হইল এই।—ক্রিয়ার ফলে competitive individualityর প্রতিষ্ঠা যত দূর হইবার এক উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই তাহা হইয়াছে। এখন এই ক্রিয়াকে রোধ করিবার দিকে, তার ফলকে বিফল করিবার উদ্দেশ্যে, এই প্রতিক্রিয়ার সূচনা দেখা দিয়াছে।

কিসে? কি ভাবে?

নামে সমাধিকার মূলক ও ডিমক্রাটিক হইলেও বাস্তব পক্ষে 'বুর্জ্জোয়স'-প্রধান ও ধনায়ত্ত যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সমাজ ও ইম্পিরিয়াল রাষ্ট্রপদ্ধতি উনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহারই বিরুদ্ধে দলবদ্ধ প্রলেটারিয়েট্দের অভ্যুত্থানে।

কেন এ অভ্যুত্থান হইবে না?—জনবলে তাহারা অনেক বড়। ডিমক্রাসীর ভোট আর সেই ভোটের যে sovereignty বা রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব, প্রয়োগ করিতে পারিলে একেবারে যে তাহা তাহাদেরই হাতে। এই প্রভুত্বের মর্ম্ম তাহারা এখন বুঝিতেছে।—যদি বুঝিতেছে, কেন তাহারা এই বৈষম্য ও বৈষম্যের পীড়ন নীরবে সহিবে, এই দুর্গতির ভার নিশ্চেষ্টভাবে বহন করিবে? এই অধিকারসাম্যের মধ্যে যে সব কারণ বাস্তব অবস্থায় এই বৈষম্য ঘটাইয়াছে, তাহা দূর করিয়া অবস্থার সাম্য স্থাপন যতদূর সম্ভব হয়, আপনাদের শক্তিবলে কেন না তাহারা করিতে চাহিবে?

এতদিন তাহারা অজ্ঞ ছিল, ব্যবসায়ের কৌশল কিছু ধরিতে পারিত না; এই সব অধিকারের মর্ম্ম ও তেমন বুঝিতনা। বিচ্ছিন্ন ছিল; বুঝিলেও সমবেতভাবে আপনাদের অধিকারের বল প্রয়োগ করিতে পারিত না। ওদিকে বুর্জ্জোয়াসবর্গ জ্ঞানী, কৌশলী, আর সমবায় বদ্ধ। তাই তাহাদেরই শ্রমীয় ও রাষ্ট্রীয় সকল বল আপনাদের শক্তিগঠনে ও স্বার্থপ্রতিষ্ঠায় তাঁহারা নিয়োগ করিয়াছেন। এখন এই অজ্ঞতা তাহাদের দূর হইতেছে। তাহারা বুঝিতেছে, বুঝান তাদের হইতেছে, কেমন করিয়া তাহাদেরই শ্রমে ব্যবসায়বাণিজ্য করিয়া শ্রমজাত ধন অতি যৎসামান্য মাত্র তাহাদের দিয়া বাকী সব বুর্জ্জোয়স্রা নিজেরা নিতেছেন। কি ভাবে

প্রাপ্যে বঞ্চিত হইয়া তাহারা দুঃখ পাইতেছে, কেবল ঘানির বলদের মত খাটিতেছে, আর মহাজন মালিকরা সব ধন দখল করিয়া নিয়া রাজার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন। বুঝিতেছে, ধনী যে এই ভাবে আহৃত ধন একেবারে আপনার সম্পত্তি বলিয়া দাবী করিতে পারেন, যে কোনও ব্যবসায়ে তাহা নিজের লাভের জন্য খাটাইতে পারেন, তাহাতেই তাহার এই ধনবল আরও বাড়িয়া যাইতেছে, এবং প্রতিযোগিতার সংগ্রামে দরিদ্র কোথাও তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিতেছে না।

প্রতিকার করিতে হইলে ধনীকে এই সব অধিকারে বঞ্চিত করিতে হইবে। ব্যবসায়বাণিজ্যে শ্রমিকের শ্রমজাত ধন শ্রমিককে বঞ্চিত করিয়া ধনী তাঁহার আপন ঘরে নিয়া যাইতে পারিবেন না। যে ধন তাঁর হাতে আছে, সম্পূর্ণ স্বত্বের দাবীতে নিজের স্বার্থে তাহা ব্যবসায়ে খাটাইতে পারিবেন না। কোনও ব্যবসায়ে ধনীর স্বত্বাধিকার কিছু থাকিবে না, সব সাধারণের সম্পত্তি হইবে। সকলেই যে যেমন পারে খাটিবে, যার যেমন প্রয়োজন, অথবা যে যেমন খাটে, সেই পরিমাণে অশনবসনাদি ভোগ অথবা তাহার মূল্যস্বরূপ বেতন গ্রহণ করিবে। যেই যাহা এই ভাবে পাক্, কোনও উদ্বৃত্ত অংশ তার সঞ্চিত করিয়া নিজের স্বত্ব স্বামিত্বে কোনও ব্যবসায় করিতে পারিবে না। এইরূপ সব বিধিব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের কথাই প্রলেটারিয়েটবর্গের মধ্যে হতেইছে। বলাবাহুল্য, এঅবস্থায় প্রতিযোগিতা একেবারেই নিরর্থক হইয়া পড়ে এবং ব্যক্তিত্বের অধিকারও যতদূর খর্ব্ব হইবার তা হয়। তাহার পরিবর্ত্তে বাধ্যতামূলক একটা সহযোগিতা ও সমভোগিতা (a compulsory co-operation and communistic enjoyment) ধনোৎপাদনে ও ধনাধিকারে সকল সামাজিক সম্বন্ধের মূলনীতি হইয়া দাঁড়ায়।

এখন বর্ত্তমান সমাজের competitive individuality বা প্রতিযোগিতাপরায়ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারকে লোপ করিয়া নূতন এই compulsory co-operation and communistic enjoyment—

বাধ্যতা মূলক সহযোগিতা ও সমভোগিতার নীতি—এক কথায় যাহাকে কমিউনিজম (communism) বলা হয়, তাহা প্রতিষ্ঠা কি প্রকারে করা যায়?

সামাজিক সকল কার্য্যকরী শক্তি এখন ডিমক্রাটিক ষ্টেটের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। সচেষ্ট হইলে এই ষ্টেটে তাহাদেরই প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে; ধনী বুর্জ্জোয়সদের কোনও স্থান তার মধ্যে থাকে না এমনও করা যাইতে পারে। কারণ ভোটের বল তাহাদের অনেক বেশী। অধুনা ধনবলে ও নানা কৌশলে বুর্জ্জোয়স্‌রা প্রলেটারিয়েট্‌দের বশে রাখিয়াছেন, তাহাদের সব ভোট নিজেদের ইচ্ছামত ও প্রয়োজনমত ব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু প্রলেটারিয়েটরা নিজেরা যদি অবস্থাটা ভাল করিয়া বোঝে,—বুর্জ্জোয়স্‌বর্গ তাহাদের কত বড় শত্রু, কেমন করিয়া সব দিকে তাদের ঠকাইয়া, চাপিয়া রাখিয়া, কেবল আপনাদের সুখস্বার্থ দেখিতেছেন, ইহা যদি তেমন ভাবে তাদের বুঝাইয়া দেওয়া যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাবলে নিজেদের হাতে কত বড় শক্তি রহিয়াছে, ইহাও যদি উপলব্ধি তারা করিতে পারে, তবে কত দিন আর বুর্জ্জোয়সরা এই ভাবে তাহাদের হাতে রাখিতে পারিবেন? এই সব তাহাদের বুঝাইতে হইবে, এবং এমনই ভাবে দলবদ্ধ তাহাদের করিতে হইবে, যাহাতে এই শক্তির প্রয়োগে অর্থাৎ ভোটের বলে বুর্জ্জোয়স্‌প্রধান্য তুলিয়া দিয়া রাষ্ট্রশক্তি তাহারা অধিকার করিতে পারে।

তারপর সেই রাষ্ট্রশক্তির বলেই সম্পদগত সকল ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া, সমাজকে তাহাদের নূতন আদর্শে গড়িয়া নিবে।

এই গেল এক মতের, এক দলের কথা। অন্য একদল বলিতেছেন, যত দিন ব্যবসায়বাণিজ্যাদি ও তৎসংসৃষ্ট সকল ধনবল বুর্জ্জোয়স্‌ সম্প্রদায়ের হাতে আছে এবং প্রলেটারিয়েটবর্গ অন্নবস্ত্রের জন্য তাহাদেরই ধনায়ত্ত, তাঁহাদেরই নিয়ন্তৃত্বে পরিচালিত, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপরে নির্ভরশীল সামান্য বেতনভোগী ভৃত্য মাত্র, ততদিন এমন ভাবে শক্তিসঞ্চয় করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়, যাহাতে

কেবল ভোটের বলে বুর্জ্জোয়স্‌প্রাধান্য লোপ করিয়া রাষ্ট্রশক্তি তাহারা অধিকার করিয়া ফেলিতে পারিবে। সামাজিক সকল শক্তির মূল হইতেছে ধনবল, এবং এই ধনবল ব্যবসায়বাণিজ্যের আয়ত্ত। বুর্জ্জোয়স্‌রা যে আজ রাষ্টশক্তি এবং তার সঙ্গে সামাজিক অন্যান্য সর্ব্ববিধ কর্ম্মশক্তি ও প্রতিপত্তি অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন, সব তাঁহাদেরই অভিপ্রায় মত বা স্বার্থানুযায়ী হইয়া চলিতেছে, তার কারণ ব্যবসায়বাণিজ্যগত দেশের সব ধনবল তাঁহাদের হাতে। সুতরাং প্রলেটারিয়েটরা যদি সমাজে প্রধান হইতে চায়, আগে তাহাদিগকে ব্যবসায়বাণিজ্যগত এই ধনবলকে অধিকার করিতে হইবে। তা যদি পারে, সকল সমাজশক্তি ও রাষ্ট্রশক্তি আপনিই তাহাদের হাতে আসিবে।

ব্যবসায় বাণিজ্যের স্বত্বাধিকার কেবল তাহাদের হাতে আসিলেই হইবে না, কারণ তাহাতে সব আবার তাহাদেরই দলভুক্ত শক্তিমান্‌ ব্যক্তিদের হাতে গিয়া পড়িবে এবং ইহারা নূতন একদল বুর্জ্জোয়স্‌ হইয়া দরিদ্র শ্রমিক জনসাধারণকে তেমনই আবার পীড়ন করিবে। সুতরাং, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তারা চায় ব্যবসায়বাণিজ্যে ব্যক্তিগত বা সমান স্বার্থে মিলিত একাধিক ব্যক্তির সমবায়গত সকল প্রকার স্বত্বস্বামিত্বের লোপ করিয়া, সব সমান ভাবে সকল কর্ম্মীর সাধারণ সম্পদে পরিণত করিতে, যাহাতে সকলেই যে যেমন পারে কাজ করিয়া উৎপাদিত ধন সমান ভাবে, প্রয়োজন মত, অথবা শ্রমের অনুপাতে ভোগ করিতে পারে।—তাহারা যে ব্যবসায়বাণিজ্য সব অধিকার করিবে, তাহার লক্ষ্য হইতেছে ইহা, বর্ত্তমান বুর্জ্জোয়সদের বদলে কেবল নূতন একদল কর্ত্তার স্বত্বপ্রতিষ্ঠা নয়।

ব্যবসায় বাণিজ্যের মধ্যে, দেশের সম্পদ্‌ ব্যবস্থার উপরে, যদি এই আদর্শ আগে তারা প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, রাষ্ট্র ও সমাজ এই সাম্যের আদর্শে আপনিই গড়িয়া উঠিবে। তাহার উপরে তাহাদের এই অধিকার তখন সার্থক হইবে। কারণ ইহাদের নায়কবর্গ বলেন,

কেবল যে সব ধনাধিকারীর প্রভুত্বের অধীন হইয়া চলে তা নয়, যে কোনও দেশেরই হউক, রাষ্ট্র ও সমাজ কখন কি আকার ধারণ করিবে, কি আদর্শে কি ভাবে চলিবে, তাহাও নির্ভর করে, ধনোৎপাদন ও ধনবিভাগ কি আদর্শে কি ভাবে কি রীতিপদ্ধতি ধরিয়া চলিতেছে, তাহারই উপরে।

তাই ইঁহারা বলেন, প্রলেটারিয়েটদের ভোটে দেশের পার্লামেণ্ট দখল করিয়া, শেষে পার্লামেণ্টের ভোটে বুর্জ্জোয়সদের হাত হইতে ব্যবসায়বাণিজ্য সব সরকারী দখলে আনিয়া, জনসাধারণের মধ্যে আর্থিক সাম্য স্থাপনের চেষ্টা করিতে যাওয়া উল্টা একটা জটিল পথে একরূপ বৃথা শক্তিক্ষয় মাত্র। সিদ্ধি এপথে, সম্ভব কখনও হইলেও, সুদূরপরাহত। সহজ পথ হইতেছে, সাক্ষাৎভাবে প্রলেটারিয়েটদের দলবাঁধা শক্তিপ্রয়োগে বুর্জ্জোয়সদের অধিকৃত ব্যবসায়বাণিজ্য সব এমন ভাবে অচল করিয়া ফেলা, যাহাতে প্রলেটারিয়েটদের হাতেই তাঁহারা সব ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবেন। সকল অবস্থার সকল শক্তির মুল যেখানে রহিয়াছে, তাহা যদি এই ভাবে আগে হাতে আইসে, ঠিক হইয়া যায়, আর সব আপনিই ঠিক হইয়া যাইবে।

কাজকর্ম্ম ত তারাই সব করে। ধর্ম্মঘট কয়িয়া সব কাজ তারা বন্ধ করিয়া দিতে পারে, অথবা কাজের মধ্যে থাকিয়াও নানা উপায়ে নানা কৌশলে কাজ তারা নষ্ট করিতে পারে, * কাজকর্ম্ম কাজেই সব অচল হইয়া পড়িবে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিজেদের দলের বলে এই ভাবে ব্যবসায়বাণিজ্য সব দখল করিয়া নেওয়ার যে চেষ্টা, তাহা সাধারণতঃ 'ডাইরেক্ট এক্সন' (Direct action) নামে পরিচিত হইয়াছে। আর সেই ঘোরাল পথে ভোটের বলে পার্লামেণ্টের আইন দ্বারা যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, তাহা

* এই সব কৌশল সাধারণতঃ 'স্যাবটেজ' (Sabotage) নামে পরিচিত। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে ইহার কথা আছে।

'পলিটিকাল' বা 'পার্লামেন্টারী এক্সন্' (Political or Parliamentry action) নামে পরিচিত। Direct action কি Parliamentry action—কোন্‌টা বেশী সুবিধার পথ, কোন্ পথে কার্য্যসিদ্ধি সহজ হইতে পারে, ইহা লইয়া অনেক বাদানুবাদও হইয়া থাকে, এবং এই দুইটি নীতির পক্ষে প্রলেটারিয়েটদের মধ্যে মোটের উপর দুইটি বেশ পাকা দলও গড়িয়া উঠিতেছে। তবে অনেকে আছেন, যাঁহারা যখন যেমন প্রয়োজন দুইটি নীতির প্রয়োগ করিতে চান।

যে পথই যাঁহারা সমীচীন মনে করুন, প্রধানতঃ একটি কথার উপরে সকলেই সমান জোর দিতেছেন, সেটি হইতেছে সাম্প্রদায়িক বিরোধের কথা—(the idea of class war)। বুর্জ্জোয়স ও প্রলেটারিয়েট—বর্ত্তমান ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সমাজে এই যে দুইটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে, উভয়ের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী। উভয়েই উভয়ের প্রতিপক্ষ ও শত্রু। বুর্জ্জোয়সরা সমাজের আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় সকল শক্তি দখল করিয়া বসিয়া আছেন, বসিয়াই থাকিতে চান। ভালবাসিয়া কি সাধ করিয়া এই শক্তির কিছুই তাঁহারা ছাড়িয়া দিবেন না। দল বলেই প্রলেটরিয়েটদের তাহা কাড়িয়া নিতে হইবে। সুতরাং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সংগ্রাম এ অবস্থায় স্বাভাবিক এবং তাহাই অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। নানা যুক্তি দেখাইয়া খুব জোরে প্রলেটারিয়েট নেতৃবর্গ ইহাই প্রচার করিতেছেন এবং এই ভাবটাই প্রলেটারিয়েটদের একেবারে আবিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছ। উভয়ের মধ্যে সমান স্বার্থের একটা যোগ আছে, উভয়েই উভয়ের উপরে নির্ভরশীল,—এই সমান স্বার্থের যোগকে এই নির্ভরশীলতাকে স্বীকার করিয়া, তাহারই ভিত্তিতে এমন কোনও ব্যবস্থা সম্ভব কিনা, যাহাতে স্বার্থের ও শক্তির সামঞ্জস্যে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল হইতে পারে, একথা বুর্জ্জোয়স্রা কখনও ভাবিলেও প্রলেটারিয়েটরা একরূপ ভাবেই না। ইহারা শত্রু, অত্যাচারী, শত্রুভাবে ইহাদের দেখিতে হইবে, ইহাদের সঙ্গে

যুঝিতে হইবে, যুঝিয়া ইহাদের পরাভূত ও বিধ্বস্ত করিয়া অত্যাচারের শোধ নিতে হইবে, আর তার জন্যই দল বাঁধিতে হইবে, ইহাই প্রলেটারিয়েটদের একমাত্র কথা হইয়াছে। এইদল বাঁধাটাই যেন তাহাদের সমরসজ্জা। পার্লামেণ্টারী পন্থা (Parliamentary action) কি ডাইরেক্ট পন্থা (Direct aciton), কি উভয়বিধ পন্থা, যাঁহারাই যে পন্থা ধরিতে চান, এই দলবাঁধা, এই সমরসজ্জা, সকলের পক্ষেই সমান প্রয়োজন এবং সকলেই সমান ভাবে সেই আয়োজনে মন দিয়াছেন। এক একটি ব্যবসায়ের কেন্দ্রে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের সমাবেশ হইয়াছে; সুতরাং এই দলবাঁধাও অনেকটা সহজ হইয়া উঠিয়াছে। শ্রমিকভাবে এক একটি ব্যবসায়ের মধ্যে আপনাদের ব্যবসায়িক স্বার্থরক্ষার জন্য দল তাহাদের মধ্যে আগে হইতেই হইতেছিল, এখন বিভিন্ন দলের মধ্যে সমবায় স্থাপন করিয়া ইহার জোর আরও বাড়ান হইতেছে।

পঞ্চাশ ষাট বৎসরের পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, তার তুলনায় প্রলেটারিয়েটদের অবস্থা এখন অনেক ভাল হইয়াছে। কতক পরার্থপরায়ণ সহৃদয় ব্যক্তিগণের আন্দোলনে, কতক গবর্মেণ্টের আইনে, কতক বা ইহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে ও ধর্ম্মঘটের বলে, শ্রমিকদের বেতনের হার বাড়িয়াছে, শ্রমের পরিমাণ কমিয়াছে, অন্য অনেক রকম অভাব অসুবিধা ও অত্যাচার দূর হইয়াছে ও হইতেছে। বেকারসমস্যা দূর করিবার জন্য প্রত্যেক দেশের গবর্মেণ্ট সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া থাকেন। Slum population অর্থাৎ সমাজের নিম্নতম স্তরে পতিত যে অতি দুঃখী ও দুর্ব্বৃত্ত জনগণ, তাহারাও যাহাতে মানুষের মত এই মানব-সমাজে বাস করিতে পারে, তাহারও প্রয়াসও যে কিছু কিছু না হইতেছে এমন নয়। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও প্রলেটারিয়েটবর্গ সর্ব্বত্রই বুর্জ্জোয়সদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেছে, এবং তাঁহাদের ধ্বংস করিয়া অথবা টানিয়া আপনাদের সমান স্তরে নামাইয়া একাকার এক শ্রমিক বা প্রলেটারিয়েট সমাজ বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হইয়াছে।

Dictatorship of the proletariat * অর্থাৎ 'প্রলেটারিয়েটদের একাধিপত্য ইহার প্রধান সোপান। এই একাধিপত্য তাঁহারা বা তাঁহাদের নেতৃবৃন্দ লাভ করিতে পারিলে, বলে অন্য সকলকে বাধ্য করিয়া নূতন এই পদ্ধতির বশীভূত করিতে পারিবেন, তাই এই প্রলেটারিয়েটদের ডিক্টেটরশিপ বা একাধিপত্য স্থাপনার জন্য অনেক স্থলেই একটা উদ্দাম আগ্রহ জাগিয়া উঠিয়াছে। এই আন্দোলনের একটা ধ্বনিই হইয়াছে 'Dictatorship of the Proletariat.'

কেন এরূপ হইল?—বর্ত্তমান পদ্ধতির মধ্যেই শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি ক্রমে ঘটিতেছে, আরও ঘটিতে পারে এরূপ সম্ভাবনাও যখন দেখা যাইতেছে,—তখন এই পথে, এই ভাবেই, আরও উন্নতিলাভের চেষ্টা না করিয়া একটা বিপ্লবের দিকে, বর্ত্তমান সমাজ-পদ্ধতিকে একেবারে উল্টাইয়া দিয়া নূতন এক একাকার সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে, শ্রমিক-আন্দোলনের এত আগ্রহ কেন? বর্ত্তমানযুগে ব্যবসায়-বাণিজ্য সব যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল পদ্ধতি ধারণ করিয়াছে, তাহার আমূল পরিবর্ত্তনে শ্রমিকগণ স্বাধীন ভাবে ব্যবসায়বাণিজ্য করিয়া গৃহস্থ-জীবনের সুখ স্বচ্ছন্দতার অধিকারী হইতে পারে, অর্থাৎ বড় বড় ফ্যাক্টরী-শিল্পের স্থানে কুটীর-শিল্পের প্রবর্ত্তন হয়, এইরূপ কিছু একটা যদি এই আন্দোলনের লক্ষ্য হইত, তবু এক কথা ছিল আলাদা। কিন্তু তা নয়। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ধরণের তেমন কোনও পরিবর্ত্তন কেহ চায় না; চায়, এখনকার কলকারখানা সব যেমন আছে, তেমনই থাকিবে, বরং আরও বড় হইবে,—যে সব বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাহা চলিতেছে,

* বোল্‌শেভিক রুশিয়ার যে সোভিয়েট (Soviet) গবর্মেণ্ট, তাহা এই dictatorship of the proletariat. Workingmen বা শ্রমিকদের যে সমিতি, তাহারই নাম সোভিয়েট এবং গবর্মেণ্টের সকল শক্তি এই সব সোভিয়েট এখন পরিচালনা করিতেছেন। স্থানীয় ছোট ছোট সোভিয়েট সব বড় বড় কেন্দ্রীয় সোভিয়েটের সঙ্গে যুক্ত।

তাহাই চলিবে, বরং এই প্রণালী আরও বৈজ্ঞানিক হইবে,—কেবল এই সব কারখানার মালিক হইবে সমবেত প্রলেটারিয়েটবর্গ, অথবা তাহাদেরই হস্তগত ষ্টেট্। একটা ব্যবস্থামত তাহারা কাজ করিবে, ছোট বড়, মালিক মুজুর, ভেদ কিছু থাকিবে না। যত অল্প খাটিয়া যত বেশী বেতন তাহারা পাইতে পারে, তাহার দিকেই সকল বিধিব্যবস্থার লক্ষ্য থাকিবে। তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি, নাগরিক ফ্যাক্টরী-জীবনের পরিবর্ত্তে স্বতন্ত্র সব ব্যবসায়ের স্বাধীন গৃহস্থ-জীবন তাহারা চাহিতেছে না,—চাহিতেছে, এই ফ্যাক্টরী-জীবনই তাহাদের পক্ষে যতদূর কম ক্লেশকর হয়, তাহাই। ধনী মালিকস্বরূপ বুর্জ্জোয়স্ সম্প্রদায়ের কর্ত্তৃত্বাধীনতায় ব্যবসায়বাণিজ্য সব থাকিলেও এরূপ হইতে পারে কিনা, একথা, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রলেটারিয়েটরা এখন বিবেচনার মধ্যেই আনিতে চায় না; বুর্জ্জোয়সদের একেবারে ধ্বংস করিয়া ব্যবসায় বাণিজ্যে এবং ষ্টেটে সম্পূর্ণ প্রলেটারিয়েট-প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠা করিতে চায়।

চায়, তার কারণ তাহারা বেশ বুঝিতেছে, দল বাঁধিতে পারিলে, ভোটের বলে ষ্টেট্ দখল করিতে পারে, আর সোজাসুজি ইচ্ছামত আইন কানুন করিয়া বুর্জ্জোয়স্‌দের সকল অধিকার লোপ করিয়া দিতে পারে। অথবা ধর্ম্মঘটাদি উপায়ে বুর্জ্জোয়স্‌দের ব্যবসায়বাণিজ্যও একেবারে অচল করিরা ফেলিতে পারে। তখন তারা বলিতে পারে, সব আমাদের হাতে ছাড়িয়া দেও, কাজে যদি ভাগ চাও ত আমাদের সঙ্গে জোট, সমান হইয়া আমাদের সঙ্গে খাট; আর মালপত্র যা জন্মে, আমাদের সঙ্গে সমান ভাগ করিয়া নেও। না কর, রাজি না হও, গোল্লায় যাও! আমরাই সব দখল করিয়া নিব, কাজকর্ম্ম নিজেরা চালাইব, সুখে খাইয়া পরিয়া দেশে থাকিব। তোমরা মর বাঁচ, কিছুই আমাদের আসিয়া যায় না। যদি আপত্তি কর, বাধা দেও, তোমাদের ছন্নছাড়া করিয়া ফেলিব! তোমরা কয়জন? কি করিবে? পুলিস্ আমরা, সেনা আমরা, কাজের লোক সব আমরা, আমাদের

ছাড়া তোমারা যে সব একেবারে "ঠুঁটো জগন্নাথ"। ঠুঁটো জগন্নাথ করিয়াই তোমাদের রাখিব। মনে মনে যতই যা ভাব, নড়িয়া চড়িয়া কিছুই করিতে পারিবে না,—ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলে মাটিতে গড়াইবে, হাত নাই, পা নাই, খাঁড়া হইয়া দাঁড়াইবে কিসের বলে?

ঠিক কথাই বলিতেছে।—ইহাদের ব্যতীত বুর্জ্জোয়স সম্প্রদায় ঠুঁটো জগন্নাথই বটেন। ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া জগন্নাথের রত্নবেদী ইহারা দখল করিয়া নিতে পারে; জগন্নাথকে সেই বেদীর তলে মাটিতেই গড়াইতে হইবে।

এতখানি ক্ষমতা প্রলেটারিয়েটদের আছে, আর আছে যে, তাহাও তাহারা বুঝিতেছে। সুতরাং কেন না তাহারা এই ঠুঁটো জগন্নাথকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া রত্নবেদী দখল করিতে চাহিবে?

কিন্তু তাহারা সেই রত্ন বেদী দখল করিয়া রাখিতে পারিবে ত? তাহাদের এত বড় ভারী একটা দলের উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম নৃত্যে সে বেদী ভাঙ্গিয়া পড়িবে না ত? ভাঙ্গা বেদীর তলে ভাঙ্গা ও ধূলিসাৎ সেই জগন্নাথের সঙ্গে সমানভাবে তাহাদেরও শেষে মাটিতে লুটাইতে হইবে না ত? তাহাদের ব্যতীত জগন্নাথ ঠুঁটোই বটেন। কিন্তু নিজের হাত পা না থাকিলেও তাহাদের সব হাত পা গুলিকে ঠিক পথে, ঠিক কাজে চালাইবার মত বুদ্ধি সেই জগন্নাথেরই মাথায় আছে কি না, সেই বুদ্ধির নিয়ন্তৃত্ব ব্যতীত সেই রত্নবেদীই গড়িত কি না, বজায় থাকে কি না, এসব কথা ভাবিবার মত মন তাহাদের নাই। কেবল ইহাই তাহারা দেখিতেছে, এই ক্ষমতা তাহাদের আছে। ক্ষমতা যদি থাকে আর তাহা প্রয়োগের সুযোগ যদি ঘটে, তবে তাহার প্রয়োগে প্রতিপক্ষকে দমন করিয়া আপনারাই প্রধান হইয়া দাঁড়াইতে কাহারা না চায়?

যাহাদের কাছে ছোট হইয়া আছে, তাহাদের সমান হইবে, সমান-সুখ তাহাদের সঙ্গে ভোগ করিবে, অথবা তাহাদেরও উপরে কর্ত্তা হইয়া তাহাদের চাপিয়া রাখিবে, পিষিয়া ফেলিবে,—সকল সুখ নিজেরাই ভোগ করিবে,—এইরূপ সব আশা বা লোভ, কম আশা, কম লোভ নয়।

ইহারই প্রেরণায়, ইহার উত্তেজনায়, প্রমত্ত তাহারা হইয়া উঠিয়াছে।* বুর্জ্জোয়সদের সঙ্গে কোনও রফার মধ্যে না আসিয়া, একেবারে এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব লোপ করিয়া, একাকার এক প্রলেটারিয়েট সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। বুর্জ্জোয়সবর্গকে তাহারা আপনাদের প্রতিপক্ষ ও শত্রু বলিয়া বুঝিতে শিখিতেছে। এই শত্রুপক্ষ ছলে, বলে কৌশলে সকল ন্যায্য অধিকারে এতদিন তাহাদিগকের বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, অশেষ দুঃখ দিয়াছে,—অবিরত এই সব শুনিয়া প্রবল একটা বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার উত্তেজনাও তাহাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে। এতদিন তাহারা সহিয়াছে, আজ প্রতিশোধের দিন আসিয়াছে। বুর্জ্জোয়সদের প্রভুত্বমূলক সকল পদ্ধতি সকল প্রতিষ্ঠান চূর্ণ করিয়া, এই সম্প্রদায়কেই একেবারে ছিন্ন বিছিন্ন—ধূলিসাৎ করিয়া আজ তাহারা ফেলিতে পারে। কেন ফেলিবে না? শত্রুপক্ষকে ধ্বংস করিব, অত্যাচারের প্রতিশোধ নিব, নিজেরা সকল দুঃখদুর্গতির পাশ হইতে মুক্ত হইব, এইরূপ একটা ভীষণ রোষাত্মক রণোন্মাদনার ভাবও মুক্তিকামী প্রলেটারিয়েট সম্প্রদায়ের এই মনের গতিকে কম উত্তেজিত করিয়া তুলে নাই। ঠিক এমনই সব কথা বুঝাইয়া অগ্নিময়ী বাণী প্রচার করিয়া দুর্দ্দম এই উত্তেজনাকে অনেকে আবার অতিজ্বলন্ত করিয়াও তুলিতেছেন।

---

* আধুনিক সোসিয়ালিষ্ট মতের প্রধান গুরু কার্ল মার্কস্ (Karl Marx) তাঁহার বিখ্যাত 'Communist Manifesto' নামক পুস্তিকার এক স্থলে বলিতেছেন,—"Our epoch, the epoch of the Bourgeoisie......has simplified the class antagonisms. Society as a whole is more and more splitting up into two great hostile camps, into two great classes directly facing each other: Bourgeoisie and Proletariat. * * * The bourgeoisie during its rule of scarce one hundred years, has created more massive and more colossal productive forces than have all preceeding generations together. * * * The weapons with which the bourgeoisie felled feudalism to the ground are now turned against the bougeoisie

তারপর আরও কথা আছে। বুর্জ্জোয়স্ সম্প্রদায়কে তাহাদের বর্ত্তমান অধিকারে বজায় রাখিয়া যাহা কিছু রফা হইতে পারে, সব এক রকম জোড়াতালি দেওয়া ব্যবস্থা হয়। তার চেয়ে যাহা দরিদ্র জনগণের পক্ষে এত দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছে ও করিতে পারে, সেই

itself. But not only has the bourgeoisie forged the weapons that bring death to itself, it has also called into existence the men who are to wield those weapons—the modern working class—the proletarians. * * *

"The modern industry has converted the little workshop of the patriarchal master into the great factory of the industrial capitalist. Masses of labourers, crowded into the factory, are organised like soldiers. As privates of the industrial army they are placed under the command of a perfect hierarchy of officers and sergeants. Not only are they slaves of the bourgeoisie class, and of the bourgeoisie State, they are daily and hourly enslaved by the machine, by the overlookers, and above all by the individual bourgeois manufacturer himself. The more openly this despotism proclaims gain to be its end and aim, the more petty, the more hateful and the more embittering it is. * * *

"The proletariat goes through various stages of development. With its birth begins its struggle with the bourgeoisie. At first the contest is carried on by individual labourers, then by the work people of a factory, then by the operatives of one trade, in one locality against the individnal buorgeoisie who directly exploits them. They direct their attacks not against the bourgeois conditions of production, but against the instruments of production themselves. * * *.

"The collisions between individual workmen and individual bourgeois take more and more the character of collisions between two classes. * * * The real fruit of the battle lies not in the immediate result, but in the ever-expanding union of the workers. * * * The proletarian

পদ্ধতিরই একেবারে মূলোৎপাটন করিয়া ফেলিতে পারিলে, সব আপদ চুকিয়া যায়। তাহা যখন সম্ভব, তখন আর এ সব জোড়াতালি দেওয়া ব্যবস্থার মধ্যে যাওয়ার প্রয়োজন কি? এসব ব্যবস্থা রাখিতেও অবিরত একটা হাঙ্গামা করিতে হয়। মূলে যদি সব দোষের বীজই নষ্ট করিয়া ফেলা যায়, তবে তা রাখিয়া এসব হাঙ্গামায় আর প্রয়োজন কি? শত্রুর শেষ রাখিতে নাই। রাখিলেই পরে অনেক গোলমালের আশঙ্কা থাকে। বুর্জ্জোয়সরা তাহাদের কে? অহিত বই কোনও হিত তাহাদের দ্বারা হইতে পারে না। স্বার্থের বিরোধ বই কোনও সমতা তাহাদের সঙ্গে নাই। কেন অনর্থক এইরূপ আপোষ একটা তারা করিতে যাইবে? †

---

movement is the self-conscious independent movement of the immense majority. The proletariat, the lowest stratum of our present society, cannot stir, cannot raise itself up, without the whole superincumbent strata of the official society being sprung into the air."

ইস্তাহারের উপসংহারে এই বিদ্রোহের প্রচেষ্টা ও অভিপ্রায়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া কার্ল মার্কস্ বলিতেছেন,—

"The communists disdain to conceal their views and aims. They openly declare that their ends can be attained only by the forcible overthrow of existing social conditions. Let the ruling classes tremble at a communistic revolution. The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win. Working men of all countries unite !"

[Roads to Freedom, Bertrand Russel, pp. 31-37]

† The Industrial Workers of the World (I. W. W.) নামক আমেরিকার একটি বিখ্যাত শ্রমিকসমিতি তাঁহাদের চতুর্থ সাধারণ সভায় আপনাদের আন্দোলনের লক্ষ্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ঘোষণা প্রচার করেন,— The working class and the employing class have nothing in common. There can be no peace so long as hunger and want are found among mil'ions of the working

শেষ কথা, দারুণ দুর্ম্মূল্যতায়, কাজকর্ম্মের অভাবে, গত যুদ্ধের পর হইতে সর্ব্বত্র দরিদ্রের দুঃখক্লেশও এত বেশী বাড়িয়াছে, তাহার চাপে এমনই অতিষ্ঠ সকলে হইয়া উঠিয়াছে, যে সকলেই অনুভব করিতেছে; বর্ত্তমান অবস্থা আর চলিতে পারে না, ইহার আমূল একটা পরিবর্ত্তন চাই। দেশের অবস্থা আর জনসাধারণের মনের গতি যখন এইরূপ হয়, বড় সামাজিক বিপ্লবের সূচনা তখনই দেখা দেয়।

যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে, তেমন প্রত্যেক জাতিকে ও সম্প্রদায়কেও তাহার কৃতকর্ম্মের ফল এমনই ভাবে ভোগ করিতে হয়। বুদ্ধি বিদ্যায়, ধনেমানে ও কর্ম্মশক্তিতে সমাজের শীর্ষ স্থান যাঁহারা অধিকার করেন, তাঁহারা যদি তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালন না করিয়া কেবল নিজেদেরই স্বার্থ খোঁজেন,—অধীন ও নির্ভরশীল জনগণকে সেই স্বার্থের অনুরোধে কেবলই চাপিয়া রাখেন, দুঃখ দেন,—তবে একদিন না একদিন দুঃখীজনগণ দুঃখের ভার আর সহিতে না পারিয়া এমনই বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে,—কেবল দুঃখের মুক্তিই চাহিবে না, প্রতিহিংসার বশে অত্যাচারী সম্প্রদায়কেই একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে চাহিবে। কেবল সুযোগের অপেক্ষা, শক্তিসংগ্রহের

people and the few, who make up the employing class, have all the good things of life. Between these two classes a struggle must go on until the workers of the world organise as a class, take possession of the earth and the machinery of production, and abolish the wage system. * * * Instead of the conservative motto, 'A fair-day's wages for a fair-day's work,' we must inscribe on our banner the revolutionary watch word, 'Abolition of the wage system.'

এই সমিতির সম্পাদকও এক সভায় বলেন,—

"There is but one bargain the I. W. W. will make with the employing class—*Complete surrender of all control of industry to the organised workers.*

[Roads to Freedom, Bertrand Russel, pp, 88–89.]

অপেক্ষা। সে সুযোগ, সে শক্তিসংগ্রহের সম্ভাবনা, বিধাতার অমোঘ বিধানে এই অত্যাচারের, এই প্রভুত্বের ব্যভিচারের মধ্যে, আপনিই ঘটিয়া উঠে। ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্বে তৎকালীন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের ব্যভিচারের ফলে সময় মত সুযোগ আসিয়া এমনই এক বিদ্রোহ ঘটাইয়াছিল। সেই বিদ্রোহের পর যে সম্প্রদায়ের হাতে প্রভুত্ব গিয়া পড়িয়াছে, তাহার ব্যভিচার আবার নূতন এই বিদ্রোহের সূচনা করিয়াছে। তখন বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন বুর্জ্জোয়স সম্প্রদায়; দুঃখী জনগণ হইয়াছিল তাঁহাদের হাতের অস্ত্র। এখন এই দুঃখী জনগণ নিজেদেরই নায়কত্বে এই বিদ্রোহ করিতে চাহিতেছে।

কিন্তু ঠিক তাই কি? নায়কত্বের গৌরব তাহাদের দেওয়া হইতেছে; কিন্তু ঠিক নায়ক কি তাহারা? যে সব শক্তিমান্ লেখক, বাগ্মী ও কর্ম্মী এই আন্দোলনকে পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহারা সত্যই কি একেবারে খাঁটি প্রলেটারিয়ান? কার্ল মার্কস্, বাকুনিন্, ক্রোপটকিন, সোরেল, হেণ্ডারসন্, রুষিয়ার বোলশোভিক্ বিপ্লবের নায়ক লেনিন্, ট্রটস্কী প্রভৃতি অসাধারণ ধীমান্ ও শক্তিমান্ পুরুষগণকে কি শিক্ষা-দীক্ষায় ও সামাজিক অবস্থায় বুর্জ্জোয়স্ ছাড়া প্রলেটারিয়ান বলা যায়? তবে প্রলেটারিয়ানদের পক্ষে, তাহাদের নামে, এই আন্দোলন তাঁহারা চালাইতেছেন। ফরাসী বিপ্লবের নায়কগণও জনগণের পক্ষে, তাহাদের নামে, উচ্চতর সম্প্রদায়সমূহের সঙ্গে তাহাদেরই সাম্যের দাবী করিয়া বিপ্লব ঘটান। তবে সে বিপ্লবের প্রধান লক্ষ্য ছিল, ডিমক্রাটিক ষ্টেটের প্রতিষ্ঠা। এই বিদ্রোহের লক্ষ্য হইতেছে, কমিউনিষ্টিক্ সমাজ বা সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। তখনকার অবস্থায় ডিমক্রাটিক ষ্টেটই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু একশত বৎসরে দেখা গেল, জনগণের দুঃখশান্তির পক্ষে তাহা কিছুই নয়। তাই ইঁহারা আশা করিতেছেন, নূতন পদ্ধতির এই সমাজে ও রাষ্ট্রে সকলের দুঃখ দূর হইবে। কিন্তু সত্য হইবে কি? ইহা কে বলিবে? আবার যে নূতন একদল বুর্জ্জোয়স্ অন্য নামে ইহার মধ্যেও দেখা দিবে না, অথবা

এই বিপ্লবে সমগ্র সমাজই ধ্বংস হইয়া যাইবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? ফলেন 'পরিচীয়তে'।

প্রলেটারিয়েট বিদ্রোহরূপ এই যে প্রতিক্রিয়ার কথা বলিতেছিলাম, লক্ষ্য যে দিকেই থাক, ইহার এই যে ক্রিয়া, লক্ষ্য সাধনোদ্দেশে যে কর্ম্মপ্রচেষ্টা, তাহাকেও পরিচালিত করিতেছে, সেই প্রতিযোগিতা-মূলক আত্মপ্রতিষ্ঠার নীতি; তফাৎ এই যে একক ভাবে কেবল ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া একটা সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহা প্রসার লাভ করিয়াছে। এই আত্মপ্রতিষ্ঠার তত্ত্বের মধ্যে একটু সূক্ষ্মভাবে যদি আমরা প্রবেশ করি, দেখিতে পাইব, অপরের জন্য আমার কি করিবার আছে, অপর সকলের হিতে আমার কি দেয়, তার অপেক্ষা নিজে আমি কত সুখ ভোগ করিব, অপর সকলের কাছে আমার নিজের কি প্রাপ্য—এক কথায় আমার duty বা ধর্ম্ম অপেক্ষা আমার right বা পাওনার অধিকারই—ইহার মধ্যে অনেক বড় কথা; একমাত্র কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। Duty বা ধর্ম্মের বুদ্ধি মানুষকে ভোগ হইতে ত্যাগের দিকে পরিচালিত করে। অপরের কাছে তার কি পাওনা এ কথা যদি সে একবার ভাবে, একশতবার ভাবে তার দেনা আর সকলের কাছে কি, এবং এই পাওনা আদায় করার চেয়ে দেনা দিতেই সর্ব্বদা তাহাকে ব্যগ্র দেখা যায়। আর rights বা পাওনার হিসাব মানুষকে বড় স্বার্থান্বেষী করিয়া তোলে। এই rights বা পাওনার হিসাবকে আজকাল এদেশে আমরা 'অধিকার' এই নামে ব্যক্ত করিয়া থাকি। কেবলই এই অধিকারের কথা ভাবিতে ভাবিতে, এই অধিকার চাহিতে চাহিতে, অধিকারের জন্য লড়াই করিতে, সকল মতিগতিই আমাদের এমন হইয়া উঠে, যে অন্যের কি ন্যায্য অধিকার আছে, অন্য সকলের ভাল কিসে হইবে, তার জন্য আমাদের কতটা ছাড়িতে হইবে, কি দিতে হইবে, এসব কথা আর মনে বড় আইসে না,—ভুলিয়া যাই "অপরের মঙ্গলে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারাই মনুষ্যত্বের সবচেয়ে বড় অধিকার, ভোগীর অপেক্ষা ত্যাগীর চরিত্রের

মহত্ত্ব অনেক—অনেক বড়,—অপরের কাছ হইতে আপনার পাওনা কাড়িয়া নিবার যে শক্তি; তার অপেক্ষা অপরকে যা দিতে হইবে ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে শাস্ত ও সন্তুষ্ট চিত্তে তাহা দিতে পারার শক্তি অনেক বড় শক্তি, তার গৌরবও অনেক বড়। হাঁ, শক্তিমান্ কেহ আমার ন্যায্য অধিকারে আমাকে বঞ্চিত করিতে চাহিলে কি বঞ্চিত করিয়া রাখিলে, তাহা রক্ষা করিতে কি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে আমাকে চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু এস্থলেও আমার ন্যায্য অধিকার বাস্তবিক কি, আর তারই বা ন্যায্য অধিকার কি, উভয়ের মধ্যে সীমারেখা কোথায়, এ সব বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। তার যেমন আমার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিবার দাবী নাই, আমারও তেমনই তার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিবার দাবী কিছু নাই। এসব বিচার সর্ব্বদা সকলে নিজের বুদ্ধিতে করিতে পারে না : ধর্ম্মবেত্তা, ধর্ম্মপরায়ণ ও ত্যাগী আচার্য্যগণের উপদেশপরম্পরা ইহার পক্ষে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। এই প্রমাণ উপেক্ষা কি অবজ্ঞা করিয়া, নিজ নিজ বুদ্ধিতে সকলে চলিলে, বিষম সামাজিক অনর্থ উপস্থিত হইতে পারে। পাশ্চাত্য জগতে ঠিক এমনই একটা অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে।

বেশীর ভাগ মানুষই পৃথিবীতে এমন যে নিজের কথা যত ভাবে, পরের কথা তত ভাবে না,—নিজে যত পারে নিতে চায়, অপরে তার পাওনা পাইল না পাইল সেদিকে চাহিয়াও বড় দেখে না। আধুনিক competitive individuality বা প্রতিযোগিতাপরায়ণ ব্যক্তিত্বের নীতি আবার এই ভাবটিকে আরও টাইয়া তুলিয়াছে। প্রতিযোগিতার সংগ্রামে জয়ী হইয়া বুর্জ্জোয়সরা সবদিকে যতখানি সুখ সুবিধা দখল করিয়া নিতে পারেন তাহা নিয়াছেন, দরিদ্র জন-সাধারণের কথা কিছুই ভাবেন নাই। নিতে পারিলে, নিবার অধিকার তাঁহাদের আছে ; কেন নিবেন না ? ইহাই মাত্র তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন। দরিদ্র জনসাধারণের ন্যায্য অধিকারের সীমা ইহাতে লঙ্ঘিত হইবে কি না, তাহাদের মঙ্গল এবং তাহাদের মঙ্গলে মোট সমাজের মঙ্গল এতটা

নেওয়ায় বজায় থাকিবে কি না, এই মঙ্গলকে স্থির রাখিতে তাঁহাদের যে বড় একটা কর্ত্তব্যের দিক আছে, বহু পার্থিব স্বার্থত্যাগে সমাজধর্ম্মের বড় একটা দাবী তাঁহাদের উপরে আছে, এসব কথা তাঁহারা ভাবেন নাই, ভাবিবার মত কোনও শিক্ষাও এই নীতির মধ্যে তাঁহারা পান নাই। দরিদ্র জনসাধারণ বা প্রলেটারিয়েটরাও এখন ঠিক এই ভাবেই চলিতেছে। জনবলে তারা অনেক বড়, দল বাঁধিতে পারিলে এই জনবলের সম্মুখে বুর্জ্জোয়স্‌রা দাঁড়াইতেও পারেন না। সব তারা এখন কাড়িয়া নিতে পারে; নিবার অধিকার তাদের আছে, কেন নিবে না? যাঁহাদের তারা বুর্জ্জোয়স বলে, সমাজস্থিতির পক্ষে তাঁহাদেরও যে বড় একটা কর্ম্মের ভাগ আছে, ন্যায্য অধিকার অনেক আছে, সেই সব অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিবার কোনও অধিকার তাহাদের নাই,—যত পারে সব নিলেই কেবল চলে না, অনেক ছাড়িয়াও দিতে হয়, – সমাজের মঙ্গলে এই ছাড়ায়, এই কর্ত্তব্য পালনে, সমাজ ধর্ম্মের বড় একটা দাবী তাহাদের উপরেও আছে,—এসব কথা আজ তাহারাও ভাবিতেছে না। ঐ একই ভাবে, একই নীতির প্রভাবে, কাড়াকাড়ি করিয়া, কে কত নিতে পারে, দুই পক্ষে কেবল এই চেষ্টা, এই উদ্যম, এইরূপ একটা সংগ্রামই চলিতেছে। নেওয়া ছাড়া দেওয়ার কথা কোন পক্ষই কিছু ভাবিতেছে না। কেবলই assertion of rights বা অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা; পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যের দায়িত্ব কি, সমাজের মঙ্গলে আপনার ধর্ম্ম কি, এ সব দিকে কোথাও কাহারও কোনও মন দেখা যাইতেছে না।

কার ভাল কিসে হইবে সকলেই তাহা নিজে নিজে বুঝিয়া নিবে, ব্যক্তিগত ভাবে সকলেই সকলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া যে যার স্বার্থ বা শক্তি যতটা প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, তাই করিবে,—ইহাই ছিল, competitive individuality বা প্রতিযোগিতাপরায়ণ ব্যক্তিত্বের গোড়ার কথা। বহুলোকের মধ্যে এই স্বার্থের একটা সমতাও দেখা যায়; সমান এই স্বার্থরক্ষার জন্য তারা দলও বাঁধিতে পারে। ভাল যদি

মনে করে, এমন দল বাঁধিবার অধিকারও অবশ্য তাহাদের আছে। এ অধিকার যেখানে আছে, একাধিক এমন দল হওয়াই সেখানে স্বাভাবিক। আর তাহা হইলে, যেমন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, তেমনই দলে দলেও একটা প্রতিযোগিতা অবশ্য হইবে, এবং প্রত্যেক দলই চাহিবে, অপর সব দলকে চাপিয়া, হঠাইয়া দিয়া, নিজেরা কতখানি সুখ সুবিধা কতখানি শক্তি দখল করিয়া নিতে পারে।

বর্ত্তমান যুগে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইয়োরোপে সমস্বার্থের হিসাবে সম্প্রদায় এবং সম্প্রদায় ধরিয়া দল হইয়াছে প্রধানতঃ দুইটি, বুর্জ্জোয়স এবং প্রলেটারিয়েট। বুর্জ্জোয়সরা আগেই বেশ একটা দল বাঁধিয়া নিয়াছিলেন, এখন প্রলেটারিয়েটরাও দল বাঁধিয়া নিতেছে, এবং দুই দলে প্রবল একটা প্রতিযোগিতার সংগ্রাম বাধিয়া উঠিয়াছে। এক সেই individualistic competition—ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতাই—এখন বড় দুইটি দলে প্রসারিত হইয়াছে; এবং এক সেই ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার সংগ্রাম এখন দলগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এইখানেই ইহা শেষ হয় নাই, এই প্রতিযোগিতাই আবার জাতিতে জাতিতে অর্থাৎ 'নেশনে' 'নেশনে' দেখা দিয়াছে। প্রত্যেকটি জাতি বা 'নেশন' অপর সব জাতি বা 'নেশনের' প্রতিযোগী বড় এক একটি দল বা বৃহত্তর ব্যক্তির মতই হইয়া উঠিয়াছে,—এবং কে কাহাকে চাপিয়া, হঠাইয়া দিয়া, এই পৃথিবীর সকল সম্পদ দখল করিবে, ভোগ করিবে, আপনার স্বার্থকেই অপর সকলের উপরে প্রতিষ্ঠা করিবে, ইহা লইয়া সকলের মধ্যে বিষম একটা কাড়াকাড়ি বাধিয়া গিয়াছে। এই ভাবে ইংরেজ, ফরাসী, জর্ম্মান্, আমেরিকান্ প্রভৃতি ইয়োরোপের সব শক্তিমান্ জাতি, এবং ইয়োরোপীয় ভাবাপন্ন এসিয়ার জাপ পর্য্যন্ত, সকলেই এখন পৃথিবী ভরিয়া নিজ নিজ সাম্রাজ্য বিস্তারে অতিশয় আগ্রহশীল হইয়াছে, তাহারই জন্য শক্তিসংগ্রহ করিতেছে,—আর রাজনৈতিক কূট কৌশলের চাল যে যত পারে চালিতেছে। ইহাদের মধ্যে যে জাতীয় প্রতিযোগিতা (national competition), তাহা

এখন সাম্রাজিক প্রতিযোগিতার (imperial competitionএর) আকার ধরিয়াছে। প্রত্যেক শক্তিমান্ জাতির Nationalism—Imperialismএ, জাতীয়তা সাম্রাজিকতায়, স্বারাজ্যতন্ত্র সাম্রাজ্যতন্ত্রে, পরিণত হইয়াছে। এই সাম্রাজিক প্রতিযোগিতার সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রামে জয়ী হইয়া আপনাকে সর্ব্বোচ্চ শক্তিতে প্রতিষ্ঠা করাই প্রত্যেক জাতির প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে।

কেহই আর কাহারও কথা কিছু ভাবিতেছে না। সকলেরই যে এই পৃথিবীতে একটা স্থান আছে, যার যার ন্যায্য স্থানে থাকিয়া, সকলেই সকলের ন্যায্য একটা দেনা পাওনার দাবী মানিয়া নিয়া, সুখে ও মঙ্গলে এ পৃথিবীতে থাকিতে পারে,—থাকিবার একটা ভগবৎ-প্রদত্ত অধিকার সকলেরই আছে,—এ সব কথা কোনও জাতির মাথায়ই এখন আর বড় আইসে না। অবশ্য দুই বা ততোধিক জাতির মধ্যে সাময়িক এক একটা মিত্রতা বা allianceও ঘটে। সে মিত্রতাও হয়, আপনাদের সমান স্বার্থে এবং অপর সকলের বা এইরূপ ভাবে মিলিত অপর দুই চারিটি জাতির স্বার্থের বিরুদ্ধে মিত্রতা। স্বার্থের মিল এবং প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিরোধের সমতা যতদিন থাকে, ততদিনই মাত্র এই মিত্রতা থাকে। যখনই তার কিছু ব্যত্যয় দেখা দেয়, মিত্রতা ভাঙ্গিয়া যায়। গত জর্ম্মাণ্ যুদ্ধে এই imperialistic struggle বা সাম্রাজিক সংগ্রামের এবং তাহার আয়োজনে একদিকে জর্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া ও তুর্কীর এবং অপর দিকে ইংরেজ, ফরাসী ও রুষের মিলনে এইরূপ মিত্রতার, একটা দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে।

অনেকেই তখন আশা করিয়াছিলেন, ভীষণ সেই মহামার সংগ্রামের পর সকলে অনুভব করিবে, এ পথ সকলেরই সমান সর্ব্বনাশের পথ, লোকক্ষয়ে, ধনক্ষয়ে ও শক্তিক্ষয়ে সকলকেই সমান অবসন্ন হইয়া পড়িতে হয়, পৃথিবীতে প্রভুত্ব লাভ করা দূরে থাক, অস্তিত্ব রক্ষাই প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। লোকসমাজে তখন নূতন বুদ্ধির নূতন ভাবের উদয় হইবে, নূতন এক যুগ দেখা দিবে। কেমন করিয়া

অপর সকলকে চাপিয়া পিষিয়া মারিয়া ফেলিয়া, নিজে একেশ্বর হইয়া থাকিব, এই যে একটা জিঘাংসাপরায়ণ বিজিগীষার মদমোহে সকল জাতি প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছে, এভাবেই আর থাকিবে না,—মিত্র ভাবে সকলেই সকলের সঙ্গে মিলিয়া, আপোষে সকল বিরোধের নিষ্পত্তি করিয়া, সকলেই যাহাতে এজগতে সুখে শান্তিতে থাকিতে পারে, সেই দিকেই সকলের মন যাইবে, সেই চেষ্টাই সকলে করিবে। এক কথায় আধুনিক এই মারাত্মক প্রতিযোগিতার পরিবর্ত্তে, স্বার্থসমতার বা মৈত্রীর সহযোগিতা বিভিন্ন জাতির মধ্যে ব্যবসায়িক ও রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধের প্রধান ধর্ম্ম হইবে। ক্রমে তাহা হইতে প্রত্যেক জাতির মধ্যেও সামাজিক সম্বন্ধ এই ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া উঠিবে।

যুদ্ধের পরিবর্ত্তে আপোষে অন্তর্জ্জাতিক (international) বিরোধের নিষ্পত্তির অভিপ্রায়ে ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেও মধ্যে মধ্যে অন্তর্জ্জাতিক সম্মিলনী (International Conference) হইত। এই সব সম্মিলনীতে যে সব বিধিব্যবস্থা (International Laws) গৃহীত হইয়াছিল, গত যুদ্ধে তাহা বড় প্রতিপালিত হয় নাই। যুদ্ধের পর এইরূপ বড় একটা লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমেরিকা যুক্তরাজ্যের পরলোকগত প্রেসিডেন্ট উইড্রো উইলসন্ সাহেব জাতীয় সংঘ বা League of Nations নামে একটি অন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রীয় সমবায় গঠনের প্রস্তাব করেন। ছোট বড় সকল স্বাধীন জাতিরই স্থান ইহার মধ্যে থাকিবে, আভ্যন্তরিক শাসনে প্রত্যেক জাতিই স্বকীয় নির্দ্ধারণের অধিকার (right of self-determination) ভোগ করিবে, পরস্পরের সঙ্গে ব্যবসায়িক ও রাষ্ট্রীয় সকল সম্বন্ধ এই সংঘের মতে স্থির হইবে, ইত্যাদি অনেক কথাই তখন হয়। কিন্তু ইহার মধ্যেও নবযুগের সেই যে নূতন আশা—প্রতিযোগিতা ও বিরোধের পরিবর্ত্তে মৈত্রীপ্রসূত সহযোগিতার ধর্ম্মের উপরে জগৎবাসী মানবের সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপনায় যাহা সফল হইবে—তার অতি দূর ও ক্ষীণ একটু আভাস ব্যতীত স্পষ্ট কোনও পরিকল্পনা ফুটিয়া উঠে নাই। এমনও হইতে

পারে, এই লীগ (League) বা সংঘ ইয়োরোপীয় বা ইয়োরোপীয় ভাবাপন্ন জাতিসমূহের একটা স্বার্থের সমবায় মাত্র। মারাত্মক আত্মবিগ্রহে নিজেরা কাটাকাটি করিয়া না মরিয়া আপোষে একটা ভাগ বাটারা করিয়া নিয়া, পরস্পরের সাহায্যে এই পৃথিবীর উপরে ইয়োরোপীয় প্রভুত্ব বজায় রাখিবে, আরও বিস্তার করিবে,—ইহাই হয়ত এই সমবায়ের মূল লক্ষ্য। বুর্জ্জোসস্‌রা যেমন দল বাঁধিয়া প্রলে-টারিয়েটদের উপরে প্রভুত্ব করিতেছে, ইহাও সেইরূপ বড় বড় সাদা জাতিদের একটা দলবাঁধা, পৃথিবীর কালো, হল্‌দে, কটা তামাটে আর যত অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জাতি আছে, তাহাদের উপরে চির প্রভুত্ব করিবার জন্য। কেবল যাহাদের একেবারে বাদ দেওয়া চলে না, শক্তিতে যাহারা সাদার সমানই হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের মাত্র সাদার দলে বাধ্য হইয়া রাখিতে হইতেছে।

যাহা হউক, উইলসন সাহেবের এই জাতীয় সংঘের কল্পনা এখনও ঠিক ক্রিয়াসিদ্ধ একটা স্বরূপ ধরিয়া উঠিতে পারিতেছে না। জাতিতে জাতিতে এখনও সেই প্রতিযোগিতার ভাব, সেই সাম্রাজ্যলিপ্সা, স্বার্থের হিসাবে সেই মিত্রভেদ ও সহায় সংগ্রহের চেষ্টা, মহামারাত্মক নূতন নূতন কৌশল অধিকারে সামরিক বিজ্ঞানের প্রবল উদ্যম, সমান রহিয়াছে,—বাড়িয়াছে বই কমে নাই। দেখিয়া মনে হয়, অনেকে আশঙ্কাও করেন, অচিরে আরও ভয়ঙ্কর এক লোকক্ষয়কর যুদ্ধ ইয়োরোপ ভরিয়া, পৃথিবী ভরিয়া, স্থলে জলে ও আকাশে সমান ভাবে আরম্ভ হইবে। তারপর এ পৃথিবীতে যারা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাদের মধ্যে এই বিভীষিকার শিক্ষার পরে যদি সেই নবযুগের আরম্ভ হয়।

তবে এই জাতীয় সংঘ বা (League of nationsএর) কল্পনাও লুপ্ত হয় নাই; এই ভাবে বিজিগীষু জাতি সমূহের মধ্যে স্থায়ী একটা সন্ধি স্থাপনার দিকেও সুবুদ্ধি রাষ্ট্রনায়ক অনেকের মন যে না আছে তা নয়।

ওদিকে প্রলেটারিয়েট্ বা শ্রমিকদের মধ্যেও অন্য ভাবের একটা

আন্তর্জাতিক মিলনের প্রবল উদ্যম দেখা দিয়াছে। প্রত্যেক 'জাতি' বা 'নেশনে'র যে শক্তি, তাহা অধুনা বুর্জ্জোয়স্‌দের আয়ত্ত। ষ্টেটই সব হইয়াছে বুর্জ্জোয়স্ ষ্টেট্,—অন্ততঃ প্রলেটারিয়েটরা তাই বলে। এই ষ্টেটের শক্তি যত বাড়িতেছে, যত তাহার অধিকারের বিস্তার হইতেছে, বুর্জ্জোয়স্‌দের বলও তত বাড়িতেছে, তত বেশী প্রলেটারিয়েটরা তাহাদের হাতে গিয়া পড়িতেছে। দেশবিদেশে যে প্রত্যেক নেশন বা ষ্টেট্ রাজ্য বিস্তার করিতে চায়, তাহার প্রধান লক্ষ্যই হইতেছে এই সব দেশে বুর্জ্জোয়স্ মহাজনদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিস্তার। প্রচুর ধনে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বড় বড় যে সব কারখানা চলিতেছে, প্রচুর দ্রব্য তাহাতে উৎপন্ন হয়। দেশের বাজারে তাহা চলিতে পারে না; বিদেশের বাজারে চালাইতে হইবে। এই বাজারে আবার অন্য সব জাতির বড় প্রতিযোগিতা আছে।—সুতরাং যে জাতি বিদেশে যত তার রাষ্ট্রীয় শক্তি বিস্তার করিতে পারিবে, তত বেশী এই প্রতিযোগিতার রোধে ব্যবসায়ের বাজারও তার আয়ত্ত হইবে। প্রত্যেক জাতি বা জাতির বুর্জ্জোয়স্ ষ্টেট্ যে এরূপ সাম্রাজ্য-লোলুপ বা imperialistic হইয়া উঠিয়াছে, nationalism যে imperialismএর ভাব ধরিয়াছে, তাহার নিদান হইল এই।

ইহাতে শ্রমিক জনসাধারণ দুই ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

এক একটি দেশের পক্ষে যাহা প্রয়োজন, আধুনিক সব উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সকলের অতি অল্প শ্রমেই তাহা উৎপাদন করা যাইতে পারে, এবং সেইরূপ একটা ব্যবস্থা হইলে কাহারও গায়ে কিছু লাগে না, সকলেই অতি আরামে ও সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। ধরুন, একটা দেশে বাজারের দামের হিসাবে এক কোটি টাকার কাপড় লাগে। হয়ত মাত্র একলক্ষ লোকে প্রত্যহ এক ঘণ্টা মাত্র কাজ করিলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই কাপড় জন্মাইতে পারে। বাকী সময় অন্য কিছু কাজ করিতে পারে,—অথবা বিদ্যালোচনা,

কলানুশীলন প্রভৃতি মানসিক উন্নতিকর কি চিত্তবিনোদক কাজকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতে পারে। কিন্তু এখন কি হইতেছে? কাপড়ের কারখানা সব বুর্জ্জোস্‌য়দের হাতে। তাঁহারা শতকোটি টাকার কাপড় বিদেশের বাজারে চালাইতে পারেন। তার জন্য দশলক্ষ শ্রমিককে প্রত্যহ দশঘণ্টা করিয়া খাটাইতেছেন, আর কোনও মতে অতি কষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন হয়, এইরূপ যৎসামান্য বেতন মাত্র তাহাদের দিতেছেন। প্রত্যেক শ্রমিকের বার্ষিক বেতন তিনশত টাকা করিয়া ধরিলেও ত্রিশকোটি টাকা তাহাতে খরচ হয়। কলকারখানার সংসৃষ্ট অন্য সব ব্যয় যদি আরও ত্রিশ কি চল্লিশ কোটি টাকা ধরা যায়, তবু বার্ষিক চল্লিশ কি ত্রিশকোটি টাকা বিদেশ হইতে বুর্জ্জোয়স্‌ মহাজনদের হাতে আসিতেছে। শ্রমিক জনসাধারণের কোনও উপকারই তাহাতে হইতেছে না। বরং বুর্জ্জোয়স্‌ মহাজনদের হাতে ব্যবসায়িক সঙ্গঠনের শক্তি ও সুযোগ আরও অনেক বেশী গিয়া পড়িতেছে। অন্য সব ব্যবসায়ের সম্বন্ধেও এইরূপ বলা যাইতে পারে। অনেক বড় বড় পণ্ডিত বহু তথ্যের প্রমাণে সূক্ষ্ম হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, প্রত্যেক দেশে যাহারা অলস থাকিতে চায় না, অভাবের চাপ না থাকিলেও আপনা হইতেই কাজ করিবে, মাত্র তাহারাও যদি প্রত্যহ ৩।৪ ঘণ্টা করিয়া খাটে, অশনবসনাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য এত বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে, যে পল্লী অঞ্চলে নদী বা পুষ্করিণীর জল বিনা মূল্যে যে ভাবে লোকে দরকার মত নিয়া ব্যবহার করে, এই সব দ্রব্যও প্রায় সেই ভাবে নিয়া ব্যবহার করিতে পারে।* প্রত্যেক দেশের ব্যবসায়িক শক্তি যদি এই ভাবে গঠিত হয়, কোনও দেশ যদি অন্য দেশের বাজার দখল করিয়া তার ধন লুঠিয়া আনিতে না পারে, কেবল মাত্র আপোষে প্রয়োজনানুরূপ একটা বিনিময়ের ব্যবস্থা মাত্র থাকে, তবে পৃথিবীর অবস্থাই অন্যরূপ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু তাহা হইতে পারিতেছে না।

* পিটার ক্রোপটকিন প্রণীত The Conquest of Bread এবং Fields, Factories & Workshops দ্রষ্টব্য।

কারণ, বুর্জ্জোয়স মহাজনরা দেশবিদেশের ধন আপনাদের হাতে আনিতে চায়, আর সেই ধনে নিজেদের ভোগাড়ম্বর যতদূর পারে বাড়াইতে চায়। রাষ্ট্রীয় শক্তি যতদিন তাহাদের হাতে আছে, আর এই শক্তি যতদিন তাহারা প্রত্যেক জাতির বর্ত্তমান স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া রাজ্য বিস্তারে প্রয়োগ করিতে পরিবে, ততদিন এই ভাবে তাহাদের ব্যবসায়িক স্বার্থের জন্য, ধনাগমের জন্য, শ্রমিক জনসাধাণের এই দুঃখের অবস্থায় থাকিতে হইবে। হইতেছেও তাই।

তার পর এই রাজ্য রক্ষা ও রাজ্য বিস্তারের জন্য, প্রতিযোগী অন্যান্য সব জাতির সঙ্গে প্রত্যেক ষ্টেট্‌কে যুদ্ধের আয়োজনে বহুলোক খাটাইতে হয়, মধ্যে মধ্যে বড় বড় যুদ্ধও করিতে হয়। দেশের যে ধন, যে পরিমান শ্রমশক্তি, যুদ্ধের আয়োজনে, যুদ্ধের জন্য অশেষ প্রকার অস্ত্রশস্ত্রাদি উপকরণ উৎপাদনে ব্যয়িত হইতেছে, তাহা যদি দরিদ্রের অশনবসনাদির উৎপাদনে, স্বাস্থ্যোন্নতি, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি লোক-হিতকর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিয়োগ করা হইত, কত মঙ্গল তাহাদের হইত। এক একটি যুদ্ধে আবার কত লোক মরে, বিকলাঙ্গ হয়, আরও কত দুঃখ দুর্গতি সকলের ঘটে। দীন দুঃখী জন সাধারণই ইহাদেব মধ্যে অনেক বেশী। সৈনিক ইহারা, সেনানুচর ইহারা, কুলিমজুর প্রভৃতি হাড়ভাঙ্গা যত খাটুনির লোক—সব ইহারা। যুদ্ধ হইতেছে বুর্জ্জোয়স্‌দের স্বার্থে, বুর্জ্জোয়স্ ষ্টেটের শক্তি বাড়াইবার জন্য. বুর্জ্জোয়স মহাজনের ব্যবসায়বাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রসারের জন্য। যত তাহা বাড়িবে, বাণিজ্যের প্রসারে যত ধন তাহাদের হাতে বেশী আসিবে, প্রলেটারিয়েটদের উপরে রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসায়িক প্রভুত্বের জোর তত বেশী তাঁহাদের হইবে। যত এমন হইবে, আরও বড় বড় যুদ্ধের আয়োজনে তাহাদের খাটিতে হইবে, যুদ্ধক্ষেত্রে মরিতে হইবে, অশেষ দুঃখ তাহাদের পরিবার পরিজন-বর্গের পাইতে হইবে। যুদ্ধের সাফল্যে লাভ যাহা কিছু সব বুর্জ্জোয়-সদের, তাহাদের কেবলই ক্ষতি। দুঃখ তাহাদের বাড়িবে বই কমিবে না, দাসত্বের শৃঙ্খল তাহাদের আরও ভারী আরও কঠোর

হইবে বই লঘু কি শিথিল হইবে না, অথচ তার জন্য আজ লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় তাহাদেরই বলি দেওয়া হইতেছে, ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় এই বলিতে আত্মদান করিতে আইনে তাহাদের বাধ্য করা হইতেছে। দেশের শক্তি বাড়িবে, জাতির গৌরব বাড়িবে, তার জন্য দেশবাসী সকলের দুঃখ পাইতে হইবে, প্রাণ দিতে হইবে,—দুঃখ পাওয়া, প্রাণ দেওয়া বড় পুণ্যের কথা, মানের কথা—ইত্যাদি কত বড় বড় বাগাড়ম্বরেই না তাহাদের ভুলান হইতেছে, ভুলাইয়া তাহাদের যে দেশপ্রীতি ও দেশাত্মমর্য্যাদাবোধ (partriotism ও sense of national honour) তাহাই তাঁহারা exploit অর্থাৎ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিয়োগ করিতেছেন। যে দেশে দরিদ্র জনসাধারণের সুখশান্তির কোনও স্থান নাই,—যে জাতির গৌরব কেবল ধনী মহাজনদের ঐশ্বর্য্যের ও প্রভুত্বের গৌরব, আর তাহারা তার সব উপকরণ যোগাইবার দাসমাত্র,—তার জন্য তাহাদের এমন একটা দরদ হইবে কেন? স্বাভাবিক যে দরদ আছে, তাহাও ক্রমে দূর হইয়া যাইবার কথা,—অন্ততঃ যদি এই সব ভাবের কথা তারা অবিরত শোনে। শুনিতেছেও বটে।

তারপর আরও কথা আছে। পাশ্চাত্য সব দেশে, সকল জাতির মধ্যে, সমান ভাবেই প্রায় এই ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সমাজের অভিব্যক্তি হইয়াছে। সব দেশেই বুর্জ্জোয়স সমান বুর্জ্জোয়স, প্রলেটারিয়েট্ সমান প্রলেটারিয়েট্, সব দেশেই ষ্টেট্ সমান ভাবে বুর্জ্জোয়স-প্রধান ষ্টেট্। বিভিন্ন ষ্টেটের মধ্যে সন্ধিবিগ্রহ যাহাই যখন ঘটুক, সব বুর্জ্জোয়সদের স্বার্থের খেলা, প্রলেটারিয়েটরা তাহাদের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। বর্ত্তমান অবস্থার যদি কোনও রূপ League of Nations বা অন্তর্জ্জাতিক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইবে মাত্র সব দেশের এই বুর্জ্জোয়স্‌দের বড় একটা শক্তিশালী সমবায়ের যন্ত্র, যাহার চাপে কোথাও প্রলেটারিয়েট্‌রা মাথা তুলিতে পারিবে না। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে স্বার্থের বিরোধ রহিয়াছে, তাহা কোনও দেশ বিশেষের পৃথক্ একটা বিরোধ নহে। এই বিরোধ হইতে সে সংগ্রাম

(class war) অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সব দেশের সকল শ্রমিকেরই সমান সংগ্রাম, সকলকেই সমান ভাবে তার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। কোনও এক দেশের শ্রমিকরা যদি পৃথক্ ভাবে মাত্র সেই দেশের বুর্জ্জোয়স্ বা ধনিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, অন্য সব দেশের বুর্জ্জোয়স ষ্টেটের শক্তি, তাদের বুর্জ্জোয়স ষ্টেটের শক্তির সঙ্গে মিলিয়া একযোগে তাহাদের দমন করিয়া ফেলিবে। সুতরাং এই সংগ্রামকে সফল করিতে হইলে, 'জাতীয়তা'র—Nationalityর—সকল গণ্ডী তাহাদের ভাঙ্গিতে হইবে, সকল বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। তাহারা যে বিভিন্ন জাতির লোক, জাতীয় স্বার্থে পরস্পরের প্রতিপক্ষ, এসব কথা ভুলিয়া সকল দেশের লোক লইয়া সমস্বার্থের বন্ধনে সমান এক প্রলেটারিয়েট্ সমাজ গড়িতে হইবে, যাহা তাহাদের সমান শত্রু সব দেশের বুর্জ্জোয়স্‌দের সঙ্গে একযোগে লড়িয়া ইহাদের শক্তিকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবে। গত পঞ্চাশ ষাট বৎসর যাবৎ এই ভাবেই তাহারা প্রস্তুত হইতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে তাহাদের যে international বা অন্তর্জ্জাতিক সম্মিলন হয়, তাহাতে সব দেশের শ্রমিক প্রতিনিধিরা যান, এবং কখন কোন্ অবস্থায় কিরূপ কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে, এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করিতে কোন্ দেশে কিরূপ আয়োজন করিতে হইবে, এবং তার জন্য পরস্পরের কিরূপ সহায়তা প্রয়োজন, ইত্যাদি বহু কথার আলোচনা এবং কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে মন্তব্য গৃহীত হয়। শ্রমিকদের এই সম্মিলন সাধারণতঃ The International, নামে পরিচিত।* সুতরাং স্পষ্ট আমরা দেখিতে পাইতেছি, এই শ্রমিক আন্দোলনে এবং শ্রমিকশক্তি গঠনে ক্রমে জাতীয়তার বা Nationalityর ভেদ উঠিয়া যাইতেছে, এবং সর্ব্বভৌমিক এক সমাজ গড়িবার দিকেই এই অন্তর্জ্জাতিক বা

* The International Working Men's Association বা অন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ। ইহাকেই সংক্ষেপে এখন 'The International' বলা হয়।

international শ্রমিক সমবায়ের গতি দেখা যাইতেছে। League of Nations বা জাতীয় সংঘ বিভিন্ন ষ্টেটের মধ্যে যে সমবায় গড়িবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা অপেক্ষা অন্তর্জ্জাতিক এই শ্রমিক সমবায়ের চেষ্টায় এই সার্ব্বভৌমিক সমাজের আদর্শ অনেক স্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, যদিও এ সমাজ একবৃত্তিক মাত্র এক সম্প্রদায়ের সমাজ, মিলনের ভিত্তি সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব বা মৈত্রী নয়, সমান শত্রু বলিয়া ইহারা যাহাদের মনে করে, তাহাদের সঙ্গের বিরোধ এবং সংগ্রামের প্রয়োজন। আর স্বগত স্বাভাবিক যে একটা বৈশিষ্ট প্রত্যেক জাতির মধ্যে আছে, তাহারও স্থান ইহার মধ্যে নাই। বুর্জ্জোয়সরাও যদি ইহাদের বিরুদ্ধে বুর্জ্জোয়স্ ভাবে দলবদ্ধ হইতে পারেন, ইটালীর নব্য নায়ক মুসোলিনীর 'ফ্যাসিষ্টি' (Fascisti) দলগঠনে যাহার সূচনা দেখা গিয়াছে, তাহা হইলে ইয়োরোপে বোধ হয় জাতীয়তা বা ন্যাশনালিটির ভেদ একেবারেই উঠিয়া যাইবে। সকল দেশের প্রলেটারিয়েট বা শ্রমিকরা সমান স্বার্থে মিলিয়া যেমন এক প্রলেটারিয়েট বা শ্রমিক সমাজ হইতেছে, তেমনই সকল দেশের বুর্জ্জোয়স্ বা ধনিকরাও তাহাদের সমান স্বার্থে মিলিয়া আর একটি বুর্জ্জোয়স্ বা ধনিকসমাজে পরিণত হইবেন। তারপর সমগ্র ইয়োরোপ পরস্পর বিরোধী এই দুই সমাজের একটা বিশাল সমরক্ষেত্রে পরিণত হইবে। সেই সংঘর্ষের পরিণাম কি হইবে, বিধাতাই জানেন।

তবে একটি কথা এ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে। প্রতিযোগিতা পরায়ণ ব্যক্তিত্বের—competitive individualityর—মূল যে নীতি ধরিয়া ইয়োরোপীয় সভ্যতার বিকাশ হইয়াছে, এবং তাহারই স্বাভাবিক পরিণতিতে পার্থিব স্বার্থে, পার্থিব শক্তিতে, এবং পার্থিব ভোগ্যাধিকারে, দেশে দেশে যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে ন্যাশনাল বা জাতিগত বিরোধ দেখা দিয়াছে,—আধুনিক বিস্তার বল, সংবাদ পত্রের বল, বিজ্ঞানের বল, আর যত কিছু রাষ্ট্রীয় ও

ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বল, যে ভাবে এই বিরোধকে পুষ্ট করিয়া, বিরোধজাত সংগ্রামকে ভীষণ মারাত্মক করিয়া তুলিয়াছে,—এবং তাহাতে এমন এক অসহনীয় ক্লেশকর অবস্থা সর্ব্বত্র প্রায় সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই আসিয়া পড়িয়াছে,—যে সকলেই অনুভব করিতেছেন, বর্ত্তমান অবস্থা আর বেশী কাল চলিতে পারে না। দরিদ্র সর্ব্বদাই দুঃখের চাপে পিষ্ট হইতেছে। কেহ কাজ পায় না; যে কাজ পায়, সেও সে কাজের দামে স্বচ্ছন্দে খাইতে পরিতে পায় না। কাজের অভাবে, কাজের অল্প মূল্যে, অশনবসনাদির দারুণ মহার্ঘতায় সর্ব্বত্র হাহাকার উঠিয়াছে। নিরুপায় হইয়া তাহারা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, প্রতিহিংসার উত্তেজনায় ধনীকে একেবারে নিপাত করিয়া ফেলিতেই চাহিতেছে। ধনীরও স্বস্তি নাই। ধনে ধনলিপ্সা, শক্তিতে শক্তিলিপ্সা, ভোগে ভোগলিপ্সা, কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে,—পৃথিবী লুঠিয়াও তার পরিতৃপ্তি কোথাও কাহারও ঘটিতেছে না! ইহা লইয়াও আবার ধনীতে ধনীতে অবিরত দারুণ একটা আড়াআড়ি কাড়াকাড়ি চলিতেছে। ওদিকে আবার দলবদ্ধ দরিদ্রের আক্রমণ হইতেও আত্মরক্ষা কিসের বলে কি ভাবে হইতে পারে, তার জন্যও সর্ব্বদা সোৎকণ্ঠ ও সতর্ক আয়োজনে তাঁহারা ব্যতিব্যস্ত। কোথাও কাহারও শান্তি নাই, স্বস্তির একটি নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই; সকলেই দল বাঁধিয়া অন্য সকলের পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইতেছে। কে কাহাকে কতখানি চাপিয়া, পিছনে ঠেলিয়া, কতখানি উপরে গিয়া উঠিবে, সম্মুখে আগাইয়া যাইবে, ছলে বলে কে কাহার কতখানি ঠকাইয়া কি কাড়িয়া নিবে, দেনা কিছু না দিয়া পাওনার বেশীও আদায় করিবে,—অবিরত কেবলই ইহারই কলহে, ইহারই সংগ্রামে, সকলে একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আবার নবীনে প্রবীনে, নারীপুরুষেও প্রবল একটা প্রতিপক্ষতা ও প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব সর্ব্বত্র দেখা দিয়াছে। ধর্ম্ম-নীতির বন্ধন, পরম্পরাগত সদাচারের প্রভাব শিথিল হইতেছে। ফলে পারিবারিক জীবন পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সামাজিক সকল কর্ম্মে,

সকল সম্বন্ধে, একটা deadlock, অতি অস্বস্তিকর একটা অচল অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইতেছে। ধীরচিত্তে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সব লক্ষ্য করিয়া দেখিবার ক্ষমতা যাঁহাদের আছে, সকলেই তাঁহারা অনুভব করিতেছেন, বুঝিতেছেন, সঙ্কট তার চরমে গিয়া উঠিয়াছে,—বর্ত্তমান সভ্যতা, বর্ত্তমান সমাজ, তার এই রীতি ও প্রকৃতি লইয়া আর চলিতে পারে না। সব মানুষ ইহার মধ্যে একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার অন্তর্নিহিত শক্তির ক্রিয়া একদিকে যতদুর যাইবার তাহা গিয়াছে, গিয়া যে অবস্থায় ইহাকে উপনীত করিয়াছে, সেখানে আর ইহা থাকিতে পারেনা, ফিরিতেই ইহাকে হইবে। এই যে সকলের পক্ষেই দারুণ দুঃসহ ক্লেশকর একটা অচল অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সকলেই 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়িয়াছে, এই সত্যেরই লক্ষণ ইহা। এখানে আর চলে না, ফিরিতেই হইবে। কিন্তু ফিরিয়া কোথায় যাইবে ?

প্রতিক্রিয়ার রীতি ও গতি যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাও বিপরীত আর এক চরমের দিকে। Competitive Individualism বা প্রতিযোগিতাপরায়ণ ব্যক্তিস্বাধিকারের চরমে আসিয়া বর্ত্তমান সমাজ উঠিয়াছে, প্রতিক্রিয়া তাকে এই অধিকারের লোপে একেবারে Communistic Socialism এর দিকে নিতে চাহিতেছে। ধনিক-প্রভুত্ব এই সমাজের প্রধান লক্ষণ হইয়াছে, প্রতিক্রিয়ার গতি এই প্রভুত্বকে একেবারে ধ্বংস করিয়া শ্রমিককে সমাজের একাধিপত্যে বসাইবার দিকে চলিয়াছে। ন্যাশনালিজম্ বা জাতীয়াত্মবোধ একান্ত জাতীয় স্বার্থপরায়ণ করিয়া প্রত্যেক জাতিকে অপর সব জাতির জাতশত্রু করিয়া তুলিয়াছে, এই প্রতিক্রিয়া রাষ্ট্রীয় ন্যাশ-নালিজমের সকল বৈশিষ্ট লোপ করিয়া ব্যবসায়িক ইণ্টারন্যাশ-নালিজমের (Industrial internationalism এর) ভিত্তির উপরে সার্ব্বভৌমিক এক শ্রমিক সমাজ গড়িয়া তুলিতে উদ্যত হইয়াছে।

ইহাও অন্যদিকে অতি এক চরমই বটে। প্রতিক্রিয়ার স্বভাবই

হইল এই যে এক চরম হইতে তাহা বিপরীত চরমেই যাইতে চায়। কিন্তু এ চরম অতি ঘোর এক বিপ্লবের চরম, যাহা কিছুর উপরে বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় সভ্যতা ও সমাজ দাঁড়াইয়াছে, যাহা কিছু লইয়া এই সভ্যতা ও সমাজ তার বর্ত্তমান এই স্বরূপে ও স্বধর্ম্মে বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহার কিছুই এই বিপ্লবে থাকিবে না, সব ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া পড়িবে। যে আদর্শের দিকে এই বিপ্লবের গতি সমাজকে নিতে চায়, ঠিক সেই আদর্শে বাস্তবিক কোনও মানবসমাজ গড়িয়া উঠিতে পারে কিনা, সে আদর্শ ধরিয়া দাঁড়াইতে পারে কিনা, তাহাও বিচারের বিষয়, পরীক্ষার বিষয়। বিচার সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানী যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই বলেন পারে না। পরীক্ষা তেমন কোথাও এখনও হয় নাই। তবে প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে এইরূপ একটা বিপ্লব যে অধুনা দুষ্পরিহার্য্য একথা সকলেই স্বীকার করেন।

কি উপায় হইবে? এই সঙ্কটের সমস্যা কি? ভাবিয়া বাস্তবিক কোনও কুলকিনারা কেহ পাইতেছেন না।

তবে বুর্জ্জোয়স্‌রাও চুপ করিয়া নাই। আত্মরক্ষায় তাঁহারাও সচেষ্ট হইয়াছেন, 'সাজ' 'সাজ' রব তাঁহাদের মধ্যেও উঠিয়াছে। এই প্রতিক্রিয়ার পথে তাঁহরা বাদী হইবেন, হইতেছেন। বিপ্লব সোজা একটা একটানা পথে চলিবে না, সহজেই প্রলেটারিয়েট সম্প্রদায় একেবারে 'কেল্লাফতে' করিয়া ফেলিতে পারিবে না। বড় সংঘর্ষ একটা হইবে। তারপর তার ঘাতপ্রতিঘাতে হয়ত দুই চরমের মধ্যবর্ত্তী একটা পথ দেখা দিবে। যদি দেয়, সেই পথই নূতন যুগের নূতন আশার পথ হইবে কিনা, তাই বা কে বলিতে পারে? যার যার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট বজায় রাখিয়াও, যে প্রেম, যে মৈত্রী, ভ্রাতৃত্বের যে সহযোগিতা, যে ত্যাগ, সে পথে মানবস্বভাবের প্রধান লক্ষণ, মানব সম্বন্ধের প্রধান ধর্ম্ম হইবে, তাহা যে কেবল এই সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সংঘর্ষ হইতেই আসিতে পারে না। সংঘর্ষ যতই ভীষণ, যত বড় সর্ব্বনাশের হেতুই হউক, কেবল তার ভয়, জোড়াতালি দেওয়া সাময়িক

একটা আপোষে লোককে বাধ্য করিতে পারিলেও, মানুষের স্বভাবকে এরূপ উচ্চ স্তরে তুলিয়া নিতে পারে না। তার জন্য উচ্চতর কোনও ধর্ম্মের প্রেরণা চাই। সে প্রেরণার উৎস যিনি, তিনিই জানেন, জগতের এই মহা সঙ্কটকালে সেই প্রেরণা তাঁহা হইতে আসিবে কিনা।

তবে তিনিই নাকি বলিয়াছেন,—

'যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানং অধর্ম্মস্য তদাত্মনং সৃজাম্যমহম্॥'

ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, জগতে যত দূর হইবার হইয়াছে। আত্মসৃজনের সময় কি তাঁহার আইসে নাই? কবে আর তবে আসিবে?

প্রতিক্রিয়া—রীতি ও গতি।

পাশ্চাত্য সমাজে ও রাষ্ট্রে বর্ত্তমান ধনিক প্রভুত্বের বিরুদ্ধে শ্রমিক জাগরণে যে প্রতিক্রিয়ায় আরম্ভ হইয়াছে, তার কারণ এবং মোট লক্ষণ ও মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে যথাসাধ্য একটা আলোচনা পূর্ব্ব প্রবন্ধে করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এ দেশে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ধরণে বড় বড় ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা স্থানে স্থানে হইতেছে বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজমের কোনও ছাপ সাধারণ সমাজের উপরে আসিয়া পড়ে নাই। এক কলকারখানাসম্পর্কিত বড় বড় ব্যবসায়ের কেন্দ্রে কোথাও কেহ গেলে, ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজমের কিছু আভাস পাইতে পারেন। দেশের ব্যবসায়বাণিজ্য এখনও প্রধানতঃ প্রাচীন সেই গিল্ডের (guildএর) ধরণে জাতিতে জাতিতে বিভক্ত গৃহস্থদের হাতেই রহিয়াছে, এবং তার তুলনায় এই সব ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যবসায় এখনও অতি নগণ্য। সাধারণ গার্হস্থ্যের নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে এক কাপড় ছাড়া আর কিছুই বড় কলকারখানার মধ্যে যায় নাই। কাপড়ও কতক পরিমাণে গৃহস্থের তাঁতে প্রস্তুত হয়। মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে চরকা ও খাদির যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা যদি সফল হয়, ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজমের মূলে হয়ত ঘা পড়িবে, পাশ্চাত্য এই পাপ আর এদেশে মাথা তুলিতে বোধ হয় পারিবে না। ইহাতে যদি বাধা পায়, সার্ব্বজনীন নিত্য ব্যবহার্য্য আর কোনও দ্রব্যের ব্যবসায়ের মধ্যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজমের প্রভাব প্রবেশ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। এক আধুনিক যে সব ব্যবসায়—যেমন খনি, রেল, বড় বড় লৌহশিল্প প্রভৃতি—বিপুল মূলধনের সমবায় ও উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী ছাড়া ভাল চলিতে পারে না, তাহাই মাত্র ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল পদ্ধতির আমলে থাকিবে। এসবও যদি আবার সরকারী কর্ত্তৃত্বে সরকারী মূলধনে প্রজাসাধারণের হিতার্থে মাত্র চালাইবার ব্যবস্থা হইতে পারে, এমন ক্ষতি কিছু দেশের কি সমাজের নাও হইতে পারে।

এসব আমাদের ভাবিবার কথা বটে। ঠিক যদি ভাবিতে পারি, ভাবিয়া ঠিক পথে যদি চলিতে পারি, ভবিষ্যতে বড় অমঙ্গলের ভাগী হইতে হইবে না। বড় একটা পরিবর্ত্তনের যুগ দেশে আসিয়াছে; পুরাতন বহু রীতিনীতি ও প্রতিষ্ঠান অচল হইয়া উঠিতেছে, ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সব দিকেই অধীর হইয়া মানুষ নূতন পথ খুঁজিতেছে। কিন্তু তার আপন পথটি যে কি, তাহা খুঁজিয়া পাইতেছে না। তাই পাশ্চাত্য যে পরধর্ম্ম আজ তার ঘাড়ে চাপিয়া রহিয়াছে, তাহারই প্রভাবে তাহারই পথে যত দূর সে পারে চলিতে চাহিতেছে। দেশে বড় একটা আর্থিক সঙ্কটও আসিয়াছে। আগে যে ভাবে যে সব কাজে লোকের চলিত, এখন আর তা চলে না। বাজার দর সব চড়িয়া গিয়াছে, প্রয়োজনও লোকের অনেক বাড়িয়াছে। কোথায় কি কাজ পাইবে, কি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিবে, তার জন্য পাগল হইয়া লোকে চারিদিকে ছুটিতেছে। কিন্তু কোথায় কাজ? কাজ যে মেলে না। ব্যবসায়বাণিজ্যের দ্রুত অভ্যুদয় এবং তাহাতে নূতন নূতন ধনোৎপাদন ও ধনাগম ব্যতীত কাজ ও কাজের মূল্য এত লোকের পক্ষে মিলিতে পারে না। অনেকেই মনে করেন, বড় বড় মূলধনের সমবায়ে বড় বড় ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই ইহা হইবে, এবং সেই দিকেই দেশের একটা ঝোঁক দেখা যাইতেছে। অনেকে ব্যবসায়ও এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশীয় লোকের মূলধনে দেশীয় মহাজনদের কর্ত্তৃত্বে এক একটি এমন কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হইলে সকলেই প্রায় মনে করেন, আর্থিক উন্নতির দিকে দেশ অনেকটা অগ্রসর হইল। কিন্তু এক একটি এমন ব্যবসায়ে যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজম রূপ নাগপাশের এক একটি পেঁচ দেশের গলায় বাঁধা পড়িতেছে, একথা কাহারও বড় মনে হয় না। না হইবার কারণও আছে। পাশ্চাত্য ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজমের বাহিরের যে ঐশ্বর্য্যের ও শক্তির আড়ম্বর, তাই আমারা দেখি; কিন্তু ভিতরে যে কি কুৎসিৎ বিকট একটা রাক্ষসী মূর্ত্তি তার করাল দন্তে

জনসমাজের অস্থিমাংস চর্ব্বণ করিতেছে, লোলরসনায় তার শোণিত পান করিতেছে, তাহা আমাদের চক্ষে বড় পড়ে না। আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্য অবশ্য এই মূর্ত্তির সকল বিভীষিকাকে প্রকাশ করিয়া দেখাইতেছে, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে সে সাহিত্যের সঙ্গে আমরা পরিচিত এখনও হই নাই। ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজমের সেই বহিরাড়ম্বর এতই মোহাচ্ছন্ন করিয়া আমাদের রাখিয়াছে যে ব্যবসায়বাণিজ্যের যে অভ্যুদয় আমাদের এখন চাই, তাহার অন্য পথও যে আছে, আর সে পথ যে ছোট ছোট গার্হস্থ্য ব্যবসায়ের পথ এবং সমবায় প্রয়োজন হইলে এই গৃহস্থদের ছোট ছোট সমবায়েও সে প্রয়োজনসিদ্ধ হইতে পারে, এ সব কথা আদবেই আমাদের মনে হয় না। প্রাচীন বহুজাতি সুখে স্বচ্ছন্দে এই পথে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। প্রাচীনটি ঠিক যেমন ছিল, তেমনটি এখন না চলিতে পারে। কিন্তু প্রাচীনের সেই নীতি তাহাতে অচল হয় না। নূতন এই যুগের নূতন অবস্থার সঙ্গে মানাইয়া নিয়া প্রাচীন সেই নীতির উপরেই নূতন প্রতিষ্ঠানাদি গড়িয়া নেওয়া যাইতে পারে। কি করিয়া তাহা নেওয়া যায়, তাহাই সমস্যার কথা, এবং এই সমস্যাকেই আমাদের সমাধান করিতে হইবে। আর সেই সমধান করিতে হইলে এই সব কথাও আমাদের ভাবিতে হইবে। আর সকলের আগে সতর্ক হইতে হইবে, ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজমের যে আবর্ত্তে পড়িয়া পাশ্চাত্য জগৎ এখন 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' ডাক ছাড়িয়াছে, অতি আগ্রহে হাত বাড়াইয়াও উদ্ধারের কোনও আশ্রয় ধরিতে পারিতেছে না, সেই আবর্ত্তে আমরা গিয়া না পড়ি।

এখনও পড়ি নাই। তবে পড়িতে হয়ত পারি, যদি না ভাবি, যদি না সতর্ক হই। একটা উলটপালট, বড় একটা ভাঙ্গাগড়া দেশে চলিতেছে। এ সময়ে বিশেষ সতর্ক হইয়া, হিসাব কিতাব করিয়া না চলিলে, বিষম একটা বিপাকে গিয়া আমরা পড়িতে পারি,—অনেক ভাল ভাঙ্গিয়া এমন সব মন্দও গড়িয়া ফেলিতে

পারি, যার তাল সামালাইতে শেষে আর পারিব না। সেই র‍্যাসনালিজমের প্রভাবে ধর্ম্মনীতি ও সদাচারের প্রতি অবজ্ঞা, সেই ডিমক্রাসীয় ভোটাভোটি আর দলাদলি, সেই ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালধরণে বড় বড় ব্যবসায়ের চেষ্টা, সেই শ্রমিক সমবায় ও ধর্ম্মঘট—সবই অল্প বিস্তর এদেশে দেখা গিয়াছে। তবে কোনটাই বড় বড় কতিপয় নগরের বাহিরে সাধারণ জনসমাজের মধ্যে তেমন খোঁটা গাড়িয়া চাপিয়া বসিতে পারে নাই। কারণ এসব ফসল ফলিবার মত ক্ষেত্র এখনও দেশে প্রস্তুত হয় নাই, আব হাওয়াও তেমন অনুকুল এখনও হইয়া উঠে নাই। ব্যক্তিত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নয়, আচারধর্ম্মের প্রতি নিষ্ঠায় ও তাহার অনুবর্ত্তিতায়, সমাজের মঙ্গলে ব্যক্তির স্বার্থসম্বরণে, এদেশের মানব চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট বরাবরই ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেশের শিক্ষা ও সাধনা এবং সকল প্রতিষ্ঠানের নীতি লোকচরিত্রকে এই ভাবেই গড়িয়া তুলিবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছে। এখনও এই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবের মধ্যেও সাধারণ জনসমাজভুক্ত লোকের মতিগতি, সংস্কার ও সাধনা, জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, জীবনযাত্রার রীতিপদ্ধতি, পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদি, মোটের উপর এই আদর্শকেই ধরিয়া রহিয়াছে, ইহারই বশে চলিতেছে। তাই ইয়োরোপে যেরূপ ক্ষেত্রে সামাজিক যে আবহাওয়ার মধ্যে, র‍্যাসনালিজম ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া যে সব ফল প্রসব করিয়াছে, আমাদের দেশে আপনা হইতে সহজে সেরূপ কিছু হইতে পারে না। যা হইতেছে, তা অনুকরণ; বিদেশের ফসল জোর করিয়া দেশের ক্ষেতে জন্মাইবার, স্বধর্ম্মের মর্ম্ম না বুঝিয়া পরধর্ম্মকে সমাজের উপর চাপাইবার, একটা প্রয়াস। আপন খোয়াইয়া পরের জঞ্জালে ঘর ভরিয়া ফেলা ছাড়া আর কোনও বড় লাভ ইহাতে হয় না। কিন্তু উপায় নাই। কতক পরিমাণে ইহা অপরিহার্য্য। বর্ত্তমান এই পাশ্চাত্য শাসন এবং সেই শাসনাধীন শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে আমদের নিজস্ব শিক্ষা সাধনা ও কর্ম্মপদ্ধতির

ধারা হইতে আমরা ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি। পাশ্চাত্য শক্তির ও সভ্যতার বহিরাড়ম্বরের মোহন ছটায় বড় একটা চিত্তবিভ্রমও আমাদের জন্মিয়াছে। যে পরিমাণে যেখানে যে সব সম্প্রদায়ে মধ্যে তাহা হইয়াছে, সেই পরিমাণে সেই সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই আত্মবিস্মৃতি, স্বধর্ম্মচ্যুতি এবং পরধর্ম্মানুকরণ-প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে।

আরও কথা আছে। ইয়োরোপের সভ্যতাকেই একরূপ বর্ত্তমান যুগসভ্যতা বলা যাইতে পারে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র, সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যেই, ইহার প্রভাব গিয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন বা পূর্ব্বতন অন্য যে সব সভ্যতা এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই, সে সবও যেন কোনও মতে ইহার এই উদ্দাম অভিযানের বেগ হইতে আত্মরক্ষা করিতেও পারিতেছে না, অবস্থা দেখিলে এমনই মনে হইবে। অনেক ভাঙ্গিতেছে ; ভাঙ্গিয়া নূতন যেখানে যা গড়িতেছে, প্রায়ই তা ইয়োরোপের নকল। যতদূর সাধ্য ইয়োরোপের মত হইয়া ইয়োরোপের সঙ্গে এক পংক্তিতে আসন পাওয়াটাই অনেকে পার্থিব ভাগ্যের পরাকাষ্ঠা বলিয়া মনে করেন। তারপর, ইয়োরোপের দারুণ রাক্ষসী বিজিগীষা হইতে রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য ও ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনেও এই নকল অনেক পরিমাণে প্রয়োজন হইতেছে। অনেকেই মনে করেন, যে পথে ইয়োরোপ এমন শক্তিমান্ হইয়াছে, যে সব অস্ত্রে যে সব কৌশলে সকলকে আক্রমণ করিতেছে, তাহাহইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে, তার বিরুদ্ধে, সেই অস্ত্র সেই কৌশলই প্রয়োগ করিতে হইবে। নতুবা এ পৃথিবীতে কেহ তিষ্ঠিতে পারিবেনা।

তাই রাষ্ট্রীয় জীবনে ইয়োরোপের ডিমক্রাসী, ব্যবসায়বাণিজ্যে ইয়োরোপের ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজম্ এবং সামরিক আয়োজনে ইয়োরোপের বৈজ্ঞানিক কৌশল, যাঁহারা যত দূর পারেন, নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। *

* ইহার প্রতিক্রিয়ার সূচনাও যে না হইয়াছে তা নয়। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ ও খাদির আন্দোলন তার একটা লক্ষণ। বর্ত্তমান জগতে

এ অবস্থায় বড় একটা ইয়োরোপীয় শক্তির শাসনাধীন, আমাদের এইদেশে, ইয়োরোপীয় শিক্ষায় যাঁহাদের মতি গতি ও আচারব্যবহার ইয়োরোপীয় ভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে এবং তাঁহাদের হইতে ক্রমে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে ইয়োরোপের অনুকরণ-প্রবৃত্তি বহুপরিমাণে প্রকট হইয়া উঠিবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নয়।

আমাদের সমাজে বড় যে একটা পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, বড় একটা বিপর্য্যয়ের সূচনা দেখা দিয়াছে, তাহারও কারণ আমাদের প্রাচীন সভ্যতার উপরে ইয়োরোপীয় সভ্যতার প্রচণ্ড অভিযান। যাহা ভাঙ্গিতেছে, এই অভিযানের আঘাতেই ভাঙ্গিতেছে, নূতন গড়িবার ঝোঁকও ইয়োরোপীয় সভ্যতার অনুকরণের দিকেই গিয়া পড়িয়াছে। একেবারে আপন খোয়াইয়া পরের জঞ্জালে না ঘর ভরিয়া ফেলি, তাই সতর্ক আমাদের হইতে হইবে, এবং সতর্ক হইতে হইলে, ইয়োরোপের ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজম, ডিমক্রাসী প্রভৃতির প্রকৃতি ও পরিণতি, এবং এ সবের প্রতিক্রিয়ার গতি কোন্ দিকে ইয়োরোপকে লইয়া যাইতেছে, সব কথাগুলি বিশেষ সূক্ষ্ম ভাবে আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন। আরও প্রয়োজন এই জন্য যে ইয়োরোপ যে সব নীতি ও প্রতিষ্ঠান অচল ও অনিষ্টকর বলিয়া বর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছে, করিতে পারিলে বাঁচে তাহাও আমরা অন্ধের ন্যায় অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি। আমাদের সভ্যতার মধ্যে এমন কিছু আছে কিনা, যাহা এই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনের মুখে নূতনকে গড়িবার আশ্রয় হইতে পারে, এ কথা কখনও মনেও আমাদের হয় না।

অবশ্যম্ভাবী এই পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্ত্তনের মধ্যে অনুকরণের প্রবৃত্তি ও চেষ্টা সত্ত্বেও, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজম তেমন মাথা

প্রায় সর্ব্বত্রই যে তাঁহার আদর্শের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইয়াছে, জগতের শ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া যে তাঁহাকে সকলে অভিবাদন করিতেছে, তার কারণ আপনার সৃষ্ট বিভীষিকায় ভীত ইয়োরোপও অনুভব করিতেছে, এই বিভীষিকা হইতে মুক্তির পথ ইহার মধ্যেই আছে।

তুলিয়া এদেশে দাঁড়াইতে পারে নাই। বুর্জোয়াস বলিতে ব্যবসায়িক ও রাষ্ট্রীয় যে শক্তিশালী এক সম্প্রদায়কে বুঝায়, সেরূপ কোনও সম্প্রদায়েরও অভ্যুদয় এদেশে এখনও হয় নাই। তবে বড় বড় সব ব্যবসায়ের কেন্দ্রে বহু শ্রমিকের সমাবেশ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ইয়োরোপীয় শ্রমিক সমবায়ের আদর্শে শ্রমিক সমবায়গঠনের চেষ্টা হইতেছে, এবং ধর্ম্মঘটও ইহারা মধ্যে মধ্যে করে। যে সব কথা বলিয়া এই সমবায়ের ও ধর্ম্মঘটের নায়কগণ ইহাদের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন, তাহাও ইয়োরোপীয় শ্রমিক নায়কবর্গের কথার পুনরুক্তি মাত্র। কিন্তু ইয়োরোপের এই সব শ্রমিক সমবায় কি সব লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে কি ভাবে এখন গড়া হইতেছে, কি রীতিতে কোন পথে তাহা চলিতেছে,—কেবল শ্রমিকদের কাজকর্ম্মের সুবিধা এবং অবস্থার উন্নতি নয়, কত বড় একটা সমাজবিপ্লবের দিকেই যে এই আন্দোলন ও আয়োজন অগ্রসর হইতেছে, তাহার ফলাফল কি হইবে ও হইতে পারে, এসব দিকে কি শ্রমিক কি তাহাদের নায়ক, কাহারও তেমন একটা দৃষ্টি আছে এমন মনে হয় না। গত যুদ্ধের পর হইতে এই কয় বৎসরে এই আন্দোলনের জোর অনেক বাড়িয়াছে। অতিদ্রুত সর্ব্বত্র ইহা প্রসার লাভ করিতেছে। শ্রমিক শক্তি সঙ্গঠন হইতে পুরাতনের স্থানে কি ভাবে নূতন কিরূপ সব সমাজপদ্ধতি সম্ভব হইতে পারে, বাস্তব চেষ্টা তার কোথায় কিরূপ হইতেছে, সেদিকেও সকল শ্রেণীর লোকের বিশেষ দৃষ্টি পড়িতেছে এবং বহু গ্রন্থও এসম্বন্ধে সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইতেছে। নূতন এই সাহিত্য এদেশে এখনও প্রচারিত হয় নাই। অতিদ্রুত কি যে এক ঘোর পরিবর্ত্তন ইয়োরোপের মধ্যে হইতেছে, কি ভাবে যে নূতন আসিয়া পুরাতনকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে,—সেই নূতনের প্রকৃতি কি, কোন পথে কোন লক্ষ্যের দিকে তাহা চলিতেছে, সঙ্গে সব টানিয়া নিতেছে,—এসব কথা আমদের কাছে এখনও একরূপ অজ্ঞাত। অথচ অতর্কিত ভাবে যে কোনও সময়ে এই বন্যা আমাদের দেশেও আসিয়া তার বিষম ঘুর্ণিপাকে আমাদের টানিয়া নিয়া ফেলিতে পারে।

ইয়োরোপ জানে, সতর্কও হইতেছে, হয়ত তাল সামলাইতে কিছু পারিবে। কিন্তু অমরা একেবারেই পারিব না।

এমন একটা বিপ্লব ঘটিবার মত অবস্থা আমাদের এখনও হয় নাই। তবে বাহির হইতে একটা স্রোত জোরে আসিয়া পড়িতে পারে। অথবা না বুঝিয়া কি ভুল বুঝিয়া কিম্বা সাময়িক অন্য কোন প্রয়োজনসিদ্ধির অনুরোধে, ইয়োরোপের অনুকরণে এইরূপ বিপ্লবে সূচনা আমরাও করিয়া ফেলিতে পারি। তাই এবিষয়ে অবহিত হওয়া আমাদের হইতে হইবে। হইতে হইলে বর্ত্তমান এই আন্দোলনের রীতিপদ্ধতির গতির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হওয়া আমাদের আবশ্যক।

এ সব বিবেচনা ছাড়িয়া দিলেও, এত বড় একটা বিপর্য্যয় যে বর্ত্তমান এই জগজ্জয়ী সভ্যতা ও সমাজের মধ্যে হইতেছে, এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টির প্রয়োজনেও তার সব তথ্য একটু ভাল করিয়া বোঝা আমাদের পক্ষে প্রয়োজন। পূর্ব্ব প্রবন্ধে কতকটা abstract বা সাধারণ ভাবে ইহার আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ব্যাপারগুলি যে ঠিক কি আকার ধরিয়া উঠিয়াছে, বাস্তব পক্ষে কি ভাবে চলিতেছে, তাহার একটা পরিস্ফুট চিত্র তাহা হইতে পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। এই প্রবন্ধে তাহাই দিবার চেষ্টা করিব। তাহাও মোট মোট ভাবেই দিতে হইবে। কারণ এ আন্দোলন এতই বৃহৎ, এতই ব্যাপক এবং এতই সব ডালপালা তার বাহির হইয়াছে, যে সব কথার বিশদ ও সূক্ষ্ম আলোচনা একটি প্রবন্ধের পরিসরের মধ্যে সম্ভব নয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই শ্রমিক আন্দোলন অতি ব্যাপক একটা সামাজিক বা সাম্প্রদায়িক সংগ্রামের (Social বা class warএর) আকারে পরিণত হইয়াছে। এখনও মোটের উপর উদ্যোগপর্ব্বই চলিতেছে; এই পর্ব্বই কালে যুদ্ধপর্ব্বে গিয়া দাঁড়াইবে। এই যুদ্ধ ইয়োরোপের ধনিক সমাজের বিরুদ্ধে শ্রমিক সমাজের যুদ্ধ। লক্ষ্য ধনিক সমাজকে বিপর্য্যস্ত করিয়া এমন এক শ্রমিকসমাজের প্রতিষ্ঠা

যার মধ্যে শ্রমিকে ধনিকে কোনও ভেদ থাকিবে না, সকলেই যার যার শক্তি মত কাজ করিবে, আর পার্থিব সম্পদ ভোগে সকলের সমান অধিকার থাকিবে। তবে এরূপ সমাজ ঠিক কি ভাবে গঠিত হইতে পারে, কি নিয়মে চলিতে পারে, কিসে ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, ইহার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়, এ সম্বন্ধে বিষম মতভেদ আছে। যাহা হউক, ক্রমে এই কথাগুলির আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

১। শ্রমিকসমবায়—

(Trade-Union)

আধুনিক ব্যবসায় বিজ্ঞান বা বার্ত্তাশাস্ত্রের * একটি মামুলি কথা এই যে ধনোৎপাদনের জন্য তিনটি সহায় বা অবলম্বন চাই, জমি † শ্রম আর মূল ধন – Land, Labour ও Capital। এই তিনিটিকে তাই ধনোৎপাদনের তিনটি requisite বা করণ নাম দেওয়া হয়।

* ব্যবসায়বাণিজ্যে ধনোৎপাদন ও ধনবিভাগ কোন্ অবস্থায় কি নিয়মে হয়, তাহার শাস্ত্রকে ইংরেজীতে সাধারণতঃ Economics বা Political Economy বলে। বাঙ্গলায় অনেকে 'অর্থনীতি' বা 'ধনবিজ্ঞান' এই নামে ইহার অনুবাদ করিয়া থাকেন। এদেশের প্রাচীন সাহিত্যে 'বৃত্তি' সম্বন্ধীয় বিষয় বা শাস্ত্র এই অর্থে 'বার্ত্তা' কথাটি পাওয়া যায়। কিন্তু Economics বলিতে এখন আমরা যাহা বুঝি, 'বার্ত্তা' শব্দে তাহার সম্পূর্ণ দ্যোতনা হয় কি না, বলা কঠিন।—তবে ব্যবহৃত হইলে সঙ্গে সঙ্গে এই দ্যোতনাও অবশ্য আসিবে। 'ব্যবসায়বিজ্ঞান' কথাটাও চলিতে পারে কিনা জানি না।

† কেবল জমি নয়, জল বায়ু প্রভৃতি নৈসর্গিক বহু বস্তুকেই আশ্রয় করিয়া, তাহাদের হইতে উপাদান ও সহায়তা নিয়া মানুষ কাজ করে। গোড়ায় এতদূর হয়ত লক্ষ্য না করিয়া, কেবল 'জমিকেই' ধনোৎপাদনের একমাত্র আশ্রয় ও আধার বলিয়া ধরা হয়। এখন পণ্ডিতরা বলিতেছেন, Land বা জমি নামটা ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহাতে বুঝিতে হইবে মৌলিক অর্থে কেবল জমি' নয়, অন্য যাহা কিছু নৈসর্গিক বস্তু বা শক্তি মানুষের কজে লাগে সব। Natural Agents এই প্রতিশব্দ দ্বারা তাই ইহার ব্যাখ্যা অনেকে করেন।

জমিতে আশ্রয় নিয়া লোকে কাজ করে, জমি হইতেই সব উপাদান আইসে। এই উপাদান সমূহকেই মানুষের শ্রম তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যে অর্থাৎ 'ধনে' পরিণত করে। সঞ্চিত কিছু ধনের সংস্থান না থাকিলেও কাজের সুবিধা হয় না, সুফলের ভাল বন্দোবস্ত করা যায় না, তার জন্য অপেক্ষা করাও সম্ভব হয় না। এই মূল ধন যত বেশী হইবে, তত সুশৃঙ্খলায় কাজের বন্দোবস্ত করিয়া অধিকতর ফল লাভ লোকে করিতে পারিবে।

উৎপাদনের দিক হইতে এই বিশ্লেষণের সার্ব্বভৌমিক একটা সার্থকতা ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ধনের বিভাগেও ইহার এইরূপ কোনও সার্থকতা আছে কি না? আধুনিক পাশ্চাত্য ব্যবসায়বিজ্ঞানাচার্য্যগণ বোধহয় মনে করেন, আছে,—এবং এ সম্বন্ধে যাহা কিছু আলোচনা, যুক্তিতর্ক ও সিদ্ধান্ত, সব এই ধারণার উপরেই তাঁহারা করিয়াছেন। তাহারা বলেন, উৎপাদনের এই যে তিনটি requisite বা 'করণ'—ব্যবসায়িক ভাবে ইহাদের প্রতিভূ বা অধিকারী স্বরূপ সমাজে তিনটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ও আছে, যথা জমির মালিক জমিদার, মূলধনের মালিক মহাজন আর শ্রমের মালিক শ্রমিক। এই ত্রিশক্তির সমবায়ে ব্যবসায় সব চলিতেছে, ধন উৎপাদিত হইতেছে, এবং উৎপাদিত ধন এই ত্রিশক্তির অধিকারী যাহারা তাহাদের মধ্যেই বিভক্ত হইতেছে। জমিদার যাহা পায়, তাহা *Rent বা খাজনা, শ্রমিক যাহা পায় তাহা বেতন বা Wages*, আর মহাজন যাহা পায় তাহা লাভ বা Profit। মহাজনরা তাঁহাদের মূলধন লইয়া অথবা সুদের অঙ্গীকারে অপরের নিকট হইতে মূলধন সংগ্রহ করিয়া ব্যবসায়ের বন্দোবস্ত করেন। নির্দ্দিষ্ট খাজনার চুক্তিতে জমিদারের কাছ হইতে জমি বা ঘর বাড়ী জমা বা ভাড়া নেন, আর নির্দ্দিষ্ট আগাম বেতনে কাজের জন্য যত প্রয়োজন মুজুর বা শ্রমিক রাখেন। জমির ও শ্রমের যা পাওনা, এই ভাবে নির্দ্দিষ্ট হারে আগাম বন্দোবস্তে তাহা দিয়া, ধন যাহা উৎপন্ন হয়, সব

মহাজনরা নিজেরা নেন। লোকসান যদি হয়, তাঁহাদেরই তাহা সহিয়া নিতে হয়*। এখন এই তিন পক্ষের মধ্যে পাওনা কার কি হইবে, কর্ম্মের ভাগ ও তার গুরুত্ব কি দায়িত্ব অনুসারে ন্যায্য পাওনা কার কি হওয়া উচিত, তাহা হিসাব করিয়া দিবে, এবং

* মহাজনদের এই যে function বা কর্ম্মের ভাগ, তাহার ও তাহার দরুণ তাঁহাদের পাওনারও অনেক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা হয়। সকলেই তাঁহারা ঠিক টাকার মালিক হিসাবে মহাজন বা capitalist নহেন। অনেকে বড় বড় যৌথকারবারের পরিচালক মাত্র। বেশীর ভাগ টাকাই share বা অংশ বেচিয়া তাঁহারা তুলিয়া নেন ; কখনও ব্যাঙ্ক হইতে সুদে ধারও করেন। ব্যবসায়ের স্থাপনা ও পরিচালনা (organisation ও management)ও একরূপ শ্রমশক্তি, যদিও সাধারণ বেতনভোগী শ্রমিকদের তুলনায় তাহার মর্য্যাদা অনেক উচ্চে। ইহার বিনিময়ে তাঁহাদের যে পাওনার ভাগ, তাহাকে এক হিসাবে wages বা বেতনও বলা যাইতে পারে, যদিও ইহা তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট হারে আগাম বন্দোবস্তে নেন না। টাকা যাহা খাটে, তার জন্য তাঁহাদের নিজেদের বা অপরের যে পাওনা, তাহা প্রকৃত পক্ষে সুদ বা interest। তবে সুদ সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট একটা হারে আগেই স্থির হয়। কিন্তু ব্যবসায়ে যাহারা টাকা খাটায়, অথবা অংশ বা share খরিদ করে, তাহারা কোনও সুদের চুক্তি আগে করে না। সুতরাং লোকসানের একটা আশঙ্কা তাহাদের আছে। এই জন্য বাজারে প্রচলিত যে সুদের হার, তার অপেক্ষা কিছু বেশী তাহাদের ন্যায্য পাওনা হয়। এই বেশীটুকু সম্ভাবিত ক্ষতির পূরণ বা compensation for risk বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে। মূলধনের অংশী যাহারা, তাহারা বার্ষিক যে টাকা পায়, তাহা সাধারণতঃ ডিভিডেণ্ড (dividend) বা লাভের ভাগ নামে পরিচিত। ইহার মধ্যে সুদ ও সম্ভাবিত ক্ষতিপূরণ, এই দুই দফা পাওনা আছে। ব্যবসায় পরিচলনার উচ্চ পারিশ্রমিক, সুদ আর সম্ভাবিত ক্ষতিপূরণ—এই তিনদফা বাদ দিলে, খাঁটি profit বা লাভ বলিয়া যে অবশিষ্ট আর কি থাকে, তাহা স্থির করা বড় যায় না। তাই এই Profitকে অনেকে এই তিন দফার বিশ্লেষণ করেন,—বলেন, Profit-interest+compensation for risk+remuneration for supterintendence। তত্ত্বালোচনার দিক হইতে এসব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সার্থকতা যাহাই থাক্, এই প্রসঙ্গে তেমন কোনও প্রয়োজন ইহার নাই। কৃষি ভিন্ন অন্য ব্যবসায়ে

সেই হিসাব মত সকলেই যাহাতে যার যে পাওনা তা পায় তাহা দেখিবে, না পাইলে তার প্রতিকার করিবে, এমন কোনও প্রমাণিক বিধিব্যবস্থা কি কর্তৃপক্ষ সকলের উপরে নাই। সুতরাং একমাত্র চাহিদা ও যোগানের নিয়মে—Law of Demand and Supplyএর স্বাভাবিক ক্রিয়ার ফলে—যার ভাগ্যে যা জুটিবে, তাই তাকে নিতে হইবে। সব হইতেছে একটা কেনা বেচার bargain বা ব্যবহার মাত্র। এই

'জমি' কি জমিদার পক্ষের শক্তি এবং দাবী কি পাওনার ব্যাপারটা এমন বড় একটা ব্যাপার কিছু নয়। এই সব ব্যবসায়ের মধ্যে একদিকে ব্যবসায়ের কর্ত্তা, অপরদিকে ইঁহাদের নিযুক্ত বেতমভোগী কর্ম্মী বা শ্রমিক, এই দুই পক্ষের কথাই বড় কথা।

পূর্ব্বে কর্ত্তারা প্রায়তঃ নিজেদের মূলধনেই ব্যবসায় করিতেন, তাই এই পক্ষের নাম হয় মহাজন বা capitalist। এখন মূলধন ঠিক ইঁহাদের নিজেদের সম্পত্তি না হইলেও, ইঁহাদের আয়ত্ত বটে। দেশের লোকে ইঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সব ব্যবসায়ের অংশ খরিদ করে, এবং দস্তুর মত ডিভিডেণ্ড পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে। এই সব অংশীদিগকে এই সব কারবারের একরূপ sleeping partner (নিষ্ক্রিয় সহযোগী (?)) বলা যাইতে পারে। ব্যবসায়ের বড় বড় কর্ত্তারা তাই, ঠিক স্বত্বাধিকারী না হইলেও, মূলধনেরও কর্ত্তাই বটেন। সুতরাং capitalist নাম ইঁহাদের প্রতি প্রয়োগ করিলে এমন অসঙ্গত প্রয়োগ কিছু হয় না, যদিও প্রকৃত capitalist বা মূলধনীদের হইতে ইঁহাদের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য আজ কাল অনেকে intrepreneur অর্থাৎ business-organiser বা ব্যবসায়-স্থাপক এই নাম ব্যবহার করিয়া থাকেন। নাম যাহাই হউক এবং ইঁহাদের পাওনার দাবী যত দিক হইতে যে ভাবেই দেখা হউক, মোটের উপর এই সত্যকে আমাদের বুঝিয়া নিতে হইবে যে, সকল ব্যবসায়ের প্রভু ইঁহারা, ব্যবসায়ের মূলধন কি প্রসূত ধন সব ইঁহাদের করায়ত্ত, আর যত কর্ম্মী বা শ্রমিক—সব নির্দ্দিষ্ট বেতনে ইঁহাদের নিযুক্ত লোক, ইঁহাদের ব্যবস্থামত বা আদেশ মত কাজ করে। এই বেতন বা wages যত কম দিয়া যত বেশী ইহাদের খাটাইয়া কাজ তাঁহারা আদায় করিয়া নিতে পারেন, প্রসূত ধন তত বাড়িবে এবং ততবেশী তাঁহাদের ভাগে পড়িবে। স্বভাবতঃই সেই চেষ্টাও সর্ব্বদা তাঁহারা করিয়া থাকেন। ব্যবসায়ের কর্ত্তা বা বুর্জ্জোয়াদের সঙ্গে বেতনভোগী শ্রমিক কর্ম্মী বা প্রলেটারিয়েটদের বড় একটা স্বার্থের বিরোধ ইহা হইতেই ঘটিয়াছে।

ব্যবহারে যে পক্ষের দিকে supply বা যোগান অপেক্ষা demand বা চাহিদার জোর বেশী হইবে, পাওয়া আপনা হইতেই সেই পক্ষে বেশী যাইবে। জমিদারের জমি অনেক আছে, জমা নিবার লোক কম; খাজনার হার কাজেই কম হইবে। আবার জমি কম, নিবার লোক বেশী হইলে খাজনা বাড়িবে। মূলধনী ব্যবসায় করিবে; মুজুর তার যত লাগিবে তার বেশী যদি আসে, বাছিয়া কম বেতনে সে লোক নিতে পারে; আর কম হইলে বেশী বেতনেই রাখিতে হয়।

সাধারণতঃ এই ভাবে চাহিদা ও যোগানের অনুপাতে এই দেনা-পাওনার একটা কিনারা হয় বটে, তবে ইহার মধ্যে আর একটি ব্যাপার আসিয়া এই নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারে। সেটি হইতেছে, দল বাঁধা। দল যাহারা বাঁধিতে পারে, এই bargain বা ব্যবহারের জোর সেই পক্ষের তত বেশী হয়। চাহিদা ও যোগানের মাত্রাও কিছু-কালের জন্য অন্ততঃ এই দলবাঁধার জোরে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। তবে সকল পক্ষ সমান জোরে দল বাঁধিতে পারিলে অন্য রকম একটা অবস্থা উপস্থিত হয়। দলে দলে যুঝিবার শক্তিই তখন বিভিন্ন দলের মধ্যে দেনাপাওনার প্রধান নিয়ামক হইয়া উঠে।

বর্ত্তমান যুগে ইয়োরোপে ব্যবসায়বাণিজ্যের রীতি যেরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ধন-বিভাগ এই নীতি ধরিয়াই চলিবার কথা। কিন্তু এই রীতিই মানব সমাজের পক্ষে চিরকালের একটা সার্ব্বভৌমিক রীতি নয়, সুতরাং ধনবিভাগের এই নীতিকেও সনাতন একটা নৈসর্গিক নীতি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। জমি, শ্রম ও মূলধন—উৎপাদনের পক্ষে এই তিনটি করণেরই প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই তিনটি করণের প্রতিভূ-স্বরূপ পৃথক তিনটি সম্প্রদায় যে হইতেই হইবে, আর ব্যবসায়িক সম্বন্ধ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ঠিক এই নিয়মেই স্থির হইবে, এমন কোনও কথা হইতে পারে না। জমি আছে, জমি নহিলে কাজও হয় না। কিন্তু জমির মালিক বলিয়া

সামাজিক বিশিষ্ট এক সম্প্রদায় সর্ব্বত্র থাকেনা। এরূপ অবস্থায় জমি যোগাইতেছেন বলিয়া উৎপাদিত ধন হইতে পাওনার একটা ভাগে ন্যায্য দাবীও কোনও সম্প্রদায় বিশেষের হয় না। এ দেশে জমির মালিক রাজা বা ষ্টেট্; পৃথিবীর আরও অনেক দেশে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল ও আছে। রাজা বা ষ্টেটের যে অধিকার, তাহাকে প্রজাসাধারণের সমবেত অধিকারই বলা যাইতে পারে। চাষবাসের জন্য জমি সকল প্রজা নেয় না, নিতেও পারে না। যারা নেয় বা নিতে পারে, তারা বিশিষ্ট একটা সুযোগ বা অধিকার পাইল। ইহার জন্য প্রজামণ্ডলীর প্রতিভূ স্বরূপ রাজা বা ষ্টেটকে জমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের একটা ভাগ তাহাদের দিতে হয়। দিবার ব্যবস্থাও সর্ব্বত্র আছে। এদেশে ইহাকে রাজস্ব অর্থাৎ রাজার বা ষ্টেটের স্বকীয় ভাগ বলে। আধুনিক পাশ্চাত্য Economics বা ব্যবসায়-বিজ্ঞান শাস্ত্রে যাহাকে জমিদারের পাওনা বা রেণ্ট (rent) বলে এবং তাহার হার নির্দ্ধারণ যে ভাবে যে নিয়মে হয়, এই রাজস্ব সেরূপ রেণ্ট (rent) নহে, এবং ইহার হার নির্দ্ধারণও সে ভাবে সেরূপ কোনও নিয়মে হয় না। এই রাজস্ব একরূপ Tax বা রাজকর *; এবং রাজার আইনে অন্যান্য সব Tax বা রাজকরের ন্যায় একটা হিসাব মত উহার হার স্থির হয়, ব্যবসায়িক চাহিদা ও যোগান বা demand ও supplyএর নিয়মে নয়।

* রাজসরকার বা ষ্টেটের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রত্যেক সমর্থ প্রজাকেই তার আয় হইতে কিছু না কিছু একটা অংশ দিতে হয়। ইহাই Tax বা রাজকর। আর রামের জমি নাই, কাজের জন্য জমি চাই।—শ্যামের জমি আছে, নিজে সে কোনও কাজে তা লাগায় না, বা লাগাইতে পারে না। রাম একটা চুক্তি করিয়া শ্যামের নিকট হইতে জমি নিল। কাজে তার যে লাভ হইবে, তার একটা অংশ সে শ্যামকে দিবে, ইহাই হইল চুক্তির আসল কথা। সাধারণতঃ চুক্তির পাওনাটা আগাম ধার্য্য হয়, এবং অবস্থা অনুসারে তার একটা হারও বাধিয়া যায়। এই নিয়মে জমির বাবদ জমিদারের যে পাওনা, তাহারই নাম রেণ্ট (rent)।

অনেক স্থলে আবার চাষী গৃহস্থ প্রজারাই প্রাচীন কাল হইতে পুরুষপরম্পরাক্রমে জমির মালিক। রাজসরকারের কোনও দাবী তাহার উপরে নাই। অন্যান্য প্রজার ন্যায় তাহারাও রাজকর কিছু দেয়, কিন্তু তাহা তাহাদের অধিকৃত জমির পরিমাণ কি উৎপাদনের উপরেই সর্ব্বদা ধার্য্য হয় না।

তারপর মূলধন ও শ্রমের বিভাগ লইয়া ধনিক ও শ্রমিক এই দুই সম্প্রদায়বিভাগের কথা। এই বিভাগটা বর্ত্তমান্ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল যুগে বড় একটা বিভাগ হইয়া উঠিয়াছে, এবং কৃষি ব্যতীত শিল্পবাণিজ্যাদি সকল ব্যবসায়ই অধুনা এই বিভাগের উপর দাঁড়াইয়াছে। আর ধন-বিভাগে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কার কি ন্যায্য দাবী, এবং সেই দাবীর পাওনা কি ভাবে কোন্ পক্ষ আদায় করিয়া নিতে পারে, তাহা লইয়া বড় গোলমাল চলিতেছে, রীতিমত একটা class-war বা সাম্প্রদায়িক সংগ্রামই আরম্ভ হইয়াছে। এখন যে প্রথায় কাজকর্ম্ম চলিতেছে, তাহাকে সাধারণতঃ wage system বা বেতনের প্রথা বলে। শ্রমিকরা নির্দ্দিষ্ট হারে বেতন পায়, কাজ করে। কাজে তারপর যাহা কিছু ধন উৎপন্ন হয়, সব ধনিক মালিকদের পাওনা হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বেতনের হার কত হইবে আর ধনিকরা কি পাইবেন, তাহা স্থির হয় চাহিদাযোগানের নিয়মে, আর দুই পক্ষের দল বাঁধা দাবীর জোরে। কিন্তু ধনিকে আর শ্রমিকে এইরূপ দুটি সাম্প্রদায়িক বিভাগ আর তাহা হইতে এইরূপ wage system বা বেতনপ্রথা ব্যতীতও ব্যবসায় বাণিজ্য চলিতে পারে। পূর্ব্বে ইয়োরোপেও তাই

আমাদের দেশে যে জমিদার সম্প্রদায় আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে রাজস্ব আদায়ের জন্য রাজ সরকারের প্রতিনিধি। সাক্ষাৎভাবে কর্ম্মচারী নিয়োগ না করিয়া, ইঁহাদের মধ্যবর্ত্তিতায় রাজসরকার প্রজাদের নিকট হইতে এই ভূমি-কর বা ভূমি-রাজস্ব আদায় করিয়া থাকেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ বাঙ্গলার জমিদারদের বংশানুক্রমিক পদ ও অধিকার কতকটা ইয়োরোপীয় জমিদার বা Landlordদের মত হইয়াছে।

চলিত, এখনও পৃথিবীর অনেকদেশে তাই চলে। প্রত্যেক ব্যবসায়ী স্বতন্ত্র ভাবে নিজের গৃহে থাকিয়া সপরিবারে নিজেই কাজকর্ম্ম সব করে, মূলধন যা লাগে নিজেই যোগায়। কাজ বেশী হইলে, বাহিরের দুই একজন লোক হয়ত রাখে;—কখনও বেতন দেয়, কখনও বা উৎপাদিত ধনের একটা বখরা দেয়। Apprentice বা শিক্ষানবীশ ভাবে কেহ আসিলে, খোরপোষ মাত্র দিলেও চলে। পরস্পরের সহায়তার জন্য সমব্যবসায়ীদের একটা দল বা সম্প্রদায়ও অনেক স্থলে হয়। এই সব সম্প্রদায়কে ইয়োরোপে পূর্ব্বে গিল্ড (guild) বলিত। ব্যবসায়ের এইরূপ ধরণেরই নাম হয় guild system। আমাদের দেশে এই সব সম্প্রদায় পৃথক্ এক একটা জাতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই ভাবে ব্যবসায় যেখানে চলে, সেখানে ধনিকে শ্রমিকে কোন সাম্প্রদায়িক ভেদ নাই। যে ধনিক, নিজেই সে শ্রমিক; সঙ্গে সহকারী বা শিক্ষানবীশ ভাবে যাহারা কাজ করে তাহারাও পৃথক্ কোনও শ্রেণীর লোক নয়। এ অবস্থায় ধনিকে শ্রমিকে ধনবিভাগের কোনও কথাই আসিতে পারে না। নিজের মূলধনে নিজের শ্রমে যে যাহা উৎপাদন করে, তার অধিকারী সে নিজে।

বর্ত্তমান ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল যুগে guild-system ভাঙ্গিয়া wage-systemএর প্রবর্ত্তন কি প্রকারে হইয়াছিল, স্বাধীন গৃহস্থ সব কি ভাবে গিয়া বড় বড় ধনী মহাজনদের কলকারখানার মুজুরী নিতে বাধ্য হইয়াছিল, পূর্ব্বেই তাহার বিস্তৃত দেওয়া হইয়াছে।

ধনী মহাজনরা তখন হইলেন সব ব্যবসায়বাণিজ্যের বড় বড় মালিক। আর আগেকার সেই যে সব ছোট ছোট গৃহস্থ মালিক, আপনাদের স্বাধীন ব্যবসায় ছাড়িয়া একেবারে রিক্ত ও গৃহহীন হইয়া তাহারা সকলে হইল এই সব বড় বড় মালিকদের বেতনভোগী মুজুর। মূলধনে ও শ্রমে এই বিভাগ ধরিয়া ধনিক এবং শ্রমিক এই দুইটি পৃথক্ সম্প্রদায়েরও সৃষ্টি হইল। ব্যবসায়ে উভয়েরই কর্ম্মের ভাগ তখন হইল পৃথক্ পৃথক্ এবং এই দ্বিবিধ কর্ম্মের

সমবায়ে যে ধনের উৎপাদন আরম্ভ হইল, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহার বিভাগ বা distributionএরও একটা সমস্যা দেখা দিল। পক্ষ হইল দুইটি, কিন্তু কার কর্ম্মের গুরুত্ব কত এবং তার জন্য উৎপাদিত ধনের কত ভাগ কোন পক্ষের ন্যায্য পাওনা হয়, এ সব হিসাব কিতাবের কথা কেহই ভাবেন না, ভাবিবার মত অবস্থাও তখন ছিল না। মহাজনরা ভাবিতেন,—ব্যবসায়ের মালিক আমরা; মুজুর রাখিয়া কাজ চালাইব; মুজুরী যাহা দিয়া পারি তাই দিব; আমাদের টাকা, আমাদের ব্যবসায়, যত কম খরচে বেশী লাভ করিতে পারি তাই আমরা দেখিব। মুজুররাও ভাবিত,—ব্যবসায় উহাদের, আমাদের নয়,—আমরা মুজুর, খাটিয়া খাইব,—আর ত উপায় কিছু নাই, মুজুরী যা জোটে তাই নিতে হইবে। মূলধনের ন্যায় শ্রমও যে ধনোৎপাদনের বড় একটি করণ বা requisite, ইহা না হইলে ধনই উৎপাদিত হয় না,—মহাজনরা মূলধন যোগাইতেছেন, তাহারা শ্রম যোগাইতেছে,—উভয়-পক্ষের সমবেত কর্ম্মের উপরেই ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, ব্যবসায় চলিতেছে, উভয়পক্ষেরই একটা অধিকার ইহাতে আছে,—উৎপাদিত ধন এই অধিকারহেতু তাহাদেরও ধন, কেবল মহাজনের নয়,—যে বেতন তাহারা পায় তাহা এই ধন, তাহাদেরই ন্যায্য পাওনার একটা অংশ—অবস্থার গতিকে কেবল আগাম চুক্তিতে একটা বাঁধা হারে তাহাদের নিতে হয় মাত্র,—শ্রম এবং শ্রম বেতনের এত সূক্ষ্ম-তত্ত্বের কথা তখন তাহারা কিছু বুঝিত না, মহাজনরাও বুঝিতেন না। ব্যবসায়-বিজ্ঞান শাস্ত্র যাঁহারা প্রণয়ণ করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রথমে এই কথার আলোচনা করিয়াছেন, এবং এই আলোচনা হইতেই ধনিক শ্রমিক এবং অন্যান্য সকলের দৃষ্টি এ সবদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ন্যায় শ্রমিকের শ্রমও যে মহাজনদের পক্ষে একটা কিনিয়া নিবার বস্তু; তাঁহারা ইহার ক্রেতা, শ্রমিকরা বিক্রেতা; ক্রয় বিক্রয়ে অন্যান্য সব বস্তুর বাজারদর যেমন চাহিদা যোগানের তুলনায় স্থির হয়, শ্রমের দর বা শ্রমিকের বেতনও

সেই ভাবেই হইবে, অন্য কোনও বিবেচনায় হইতে পারে না,—এইরূপ একটা ধারণা বহুদিন পর্য্যন্ত লোকের মধ্যে ছিল। এখনও যে একেবারে দূর হইয়াছে, তা বলা যায় না। ব্যবসায়-বিজ্ঞানের আচার্য্যগণ এই ধারণা লইয়াই এই প্রশ্নের আলোচনা তখন করিতেন।

কাজেও তাহাই হইত। শ্রমিকরা ব্যক্তিগত ভাবে আসিয়া মহাজনদের সঙ্গে কাজের চুক্তি করিয়া নিত। কাজে যত লোক লাগিতে পারে, তার অপেক্ষা অনেক বেশী লোক কাজ চাহিত। শ্রমের যা চাহিদা বা demand, তার অপেক্ষা তার যোগান বা supply হইত অনেক বেশী। সুতরাং শ্রমের দর হইত কম, অর্থাৎ অতি অল্প বেতনে অনেক বেশী সময় খাটিবার চুক্তি তাহাদের করিতে হইত। তা ছাড়া, কাজ তাহারা একটু আরামে ও নিরাপদ অবস্থায় করিতে পারে কিনা, পরিবার লইয়া স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থায় একটু স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে কি না, ছেলেপিলেরা মানুষ হইয়া উঠিতে পারে কিনা, এসব দিকেও মালিকদের কোনও লক্ষ্য ছিল না। এসব সম্বন্ধে যাহাই কিছু করিতে হউক, খরচ দরকার। না করিয়া পারিলে এ খরচ তাঁহারা করিতে যাইবেন কেন ? খরচ করার অর্থই শ্রমের দর বাড়াইয়া দেওয়া। চাহিদা অপেক্ষা শ্রমের যোগান এত বেশী, এই দরই বা কেন তাঁহারা বড়াইবেন ? শ্রমিকরা সপরিবারে রুগ্ন হইয়া পড়ুক, কি মরুক, তাঁহাদের ক্ষতি কিছু নাই। চাহিলেই নূতন বহু শ্রমিক আসিয়া জুটিবে।

ক্রমে শ্রমিকরা দেখিল, দল বাঁধিতে পারিলে তাহাদের সুবিধা হয়। চুক্তি করিয়াই অবশ্য তাহাদের কাজ নিতে হইবে; কিন্তু এই চুক্তি যদি তাহারা ব্যক্তিগত ভাবে জনে জনে না করিয়া, দল বাঁধিয়া দলগত ভাবে করিতে পারে, দল ছাড়িয়া এককভাবে কোনও শ্রমিক কোথাও কোনও কাজে যদি না যাইতে পারে; individval bargainএর বদলে collective bargainই যদি শ্রমিকনিয়োগের অপরিহার্য্য নিয়ম হয়; তবে সংখ্যায় তাহারা যতই বেশী হউক, অত

সহজে এরূপ অল্পবেতনে, এমন সব ক্লেশকর অবস্থার মধ্যে এত বেশী খাটাইবার চুক্তি মহাজনরা করিতে পারিবেন না।

নূতন চুক্তির বেলাতেই যে কেবল দলের জোর কাজে লাগিবে, তা নয়; পুরাতন কোনও চুক্তিতে যারা কাজ করিতেছে, তারাও এই দলের জোরে পুরাতন চুক্তিকে নিজেদের সুবিধার দিকে টানিয়া নূতন করিয়া নিতে পারে। দল বাঁধিয়া তারা মালিকদের বলিতে পারে, আমাদের বেতন বড় কম, তাহাতে চলে না, বাড়াইয়া দেও,—খাটনির সময় কিছু কমাইয়া দেও,—আরও এই এই সুবিধা আমাদের করিয়া দেও। তারা দাবী করিল, কিন্তু মালিকরা সে দাবী গ্রাহ্য করিলেন না। তখন? তখনও উপায় আছে। কাজ তারা না করিলে মালিকদের ব্যবসায় চলিবে না,—কাজ তারা ছাড়িয়া দিবে। ব্যবসায় অচল হইবে। সকলেই জানেন, এইরূপ নূতন কোন দাবী আদায়ে মালিক-পক্ষকে বাধ্য করিবার জন্য দলবদ্ধ শ্রমিকপক্ষের এই ভাবে কাজ ছাড়িয়া দিবার নাম ষ্ট্রাইক্ (strike) বা ধর্ম্মঘট। *

যাহা হউক, এই ভাবে এক এক স্থানে এক এক ব্যবসায়ের বা কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে সমবায় স্থাপনা ও ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইল। এই সব সমবায়ের নাম হইল—Trade-union। কিন্তু আরও কতক-গুলি শক্ত কথাও ইহার মধ্যে আছে। কাজ তারা দল বাঁধিয়া ছাড়িয়া

---

* ধর্ম্মবিধি অনুসারে কোনও ঘট স্থাপনা করিয়া সেই ঘট স্পর্শ করতঃ একযোগে সকলেই কোনও কাজ করিবে, এইরূপ শপথ গ্রহণ করিবার একটা রীতি এদেশে ছিল। তাই ইহাকে 'ধর্ম্মঘট' করা বলা হইত। অধুনা দলবদ্ধ-ভাবে শ্রমিকরা যে ভাবে কাজ ছাড়িয়া দেয়, সেই ভাবে কাজ ছাড়িয়া দেওয়া বা strike করা, বিশিষ্ট এই অর্থে এই কথাটার একটা প্রয়োগ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এরূপ কোনও অনুষ্ঠান অধুনা এই সব কার্য্যে কোথাও কখনও হয় কিনা জানি না। যাহা হউক, 'ধর্ম্ম' কি 'ঘট'—কিছুই ইহার মধ্যে না থাকিলেও ব্যাপারটাকে 'ধর্ম্মঘট'ই সর্ব্বদা আমরা বলিয়া থাকি। ইহার মূলে যে এইরূপ একটা অনুষ্ঠান ছিল, এ কথাও আমরা ভুলিয়া গিয়াছি।

দিতে পারে; কিন্তু দিয়া খাইবে কি? ধর্ম্মঘট করা মাত্র মালিকরা যে অমনই সকল দাবী মঞ্জুর করিয়া তাহাদের কাজে ডাকিয়া নিবেন, ইহা কিছু সম্ভব নয়। বাস্তবিক কোথাও কোনও মালিক তাহা করেন না। লোকসান তাঁহাদের হয়। কিন্তু অর্থের অভাব নাই,—সে লোকসান তাঁহারা কিছু কাল অন্ততঃ বরদাস্ত করিতে পারেন। তারপর দাবী তখনই মঞ্জুর করিলে শ্রমিকদের বড় আস্কারাও দেওয়া হয়। নিত্য তাহারা এইরূপ নূতন নূতন দাবী নিয়া ধর্ম্মঘট করিতে পারে; কত তাঁহারা ছাড়িয়া দিতে পারেন? যত দিবেন, ততই তাঁহাদের ক্ষতি। এই ক্ষতি অবশ্য পরে উৎপাদিত দ্রব্যের দাম চড়াইয়া কতক পূরণ করিয়া নিতে পারেন। কিন্তু তাহারও ত একটা সীমা আছে। কতই আর চড়ান যায়। দ্রব্য ত বাজারে চালাইতে হইবে? অত্যধিক চড়া দর হইলে তাহাই বা তেমন চলিবে কেন? কাজেই সাধারণতঃ কোথাও এমন বড় দেখা যায় না যে ধর্ম্মঘট করিবা মাত্র বা ধর্ম্মঘটের ভয় দেখান মাত্রই, মালিকরা অমনই শ্রমিকদের সব দাবী দিয়া তাহাদের সন্তুষ্ট করেন। এক যদি কখনও বুঝিতে পারেন, দাবী ন্যায্য, আজ না হয় কাল দিতেই হইবে, অথবা ধর্ম্মঘট বেশী দিন চলিলে সাধারণ জনসমাজকে বহু ক্ষতি বা অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে, তখন তাড়াতাড়ি একটা রফা তাঁহারা করিয়া ফেলেন। আজ কাল শ্রমিক সমবায় সমূহের এত যে জোর বাড়িয়াছে, তাহাতেও এরূপ একটা রফা সহজে সর্ব্বত্র হয় না। গোড়ায় ত হইতই না।

শ্রমিকরা যা রোজগার করে, কোনও মতে দিন গুজরান হওয়াই তাহাতে শক্ত। সঞ্চয় কাহারও কিছু বড় থাকে না। এ অবস্থায় ধর্ম্মঘট দুই চারি দিনের মধ্যে মিটিয়া না গেলে, সপরিবারে যে তাহাদের অশেষ ক্লেশে পড়িতে হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। মালিকরাও তা বোঝেন, এবং ধর্ম্মঘটী শ্রমিকরা অভাবের তাড়নায় যাহাতে বাধ্য হইয়া আবার কাজে আইসে, সে জন্য সহজে তাঁহারা কোনও আপোষও করিতে চান না। অনেক ধর্ম্মঘট আগে এইভাবে ব্যর্থ হইত; ব্যর্থ

হইলে তাহাতে শ্রমিকদের দুর্গতি বাড়িত বই কমিত না। তার পর একদল না হয় ধর্ম্মঘট করিল। কিন্তু মালিকরা যদি কাজে অন্য লোক নিতে পারেন, তাহা হইলেও ত সব মাটি হয়। যারা ধর্ম্মঘট করে, তারাই মারা যায়। এভাবেও যে আগে ধর্ম্মঘট অনেক ব্যর্থ না হইয়াছে, তা নয়। নূতন লোক যাহাতে না আসে, আসিলেও কাজ করিতে না পারে, ইহা লইয়া জবরদস্তী ও দাঙ্গাহাঙ্গামাও অনেক হইত।

এই সব অসুবিধা শ্রমিকরা ক্রমে বুঝিল। বুঝিয়া ইহার প্রতিকারে মন দিল। নিজেদের মধ্য হইতে কর বা ট্যাক্সের ন্যায় কড়া নিয়মে চাঁদা তুলিয়া প্রত্যেক সমবায় এক একটি 'ফাণ্ড' করিল, যাহাতে কিছুকাল অন্ততঃ কাজ ছাড়িয়াও তাহাদের চলিতে পারে। আবার নানারকম নিয়ম কানুনে প্রত্যেকটি দলের জোর এবং দলে দলে একটা মিত্রতার যোগ, এমন ভাবে বাড়াইতে লাগিল যে একদল কোথাও ধর্ম্মঘট করিলে অন্য কেহ আসিয়া তাহাদের কাজ না নিতে পারে। অনেক সমবায়ের তহবিলে এখন এত টাকা জমিয়াছে যে মাসাধিক কালও তাহারা ধর্ম্মঘট চালাইতে পারে। তা ছাড়া কোনও না কোন সমবায়ভুক্ত নহে এবং সেই সমবায়ের নিয়মকানুন মানিয়া চলে না, এমন শ্রমিকই আর কোথাও নাই। একটি সমবায় কোথাও ধর্ম্মঘট করিলে, অন্য কোনও সমবায়ের লোক তাহাদের কাজে ত আইসেই না,—বরং অন্য যত রকম উপায়ে একে অপরের সহয়াতা করা সম্ভব হয়, তাহারও ত্রুটি কিছু করে না। ইহার একটি উপায় হইতেছে sympathetic strike বা সহায়ক ধর্ম্মঘট। যেমন ধরুন, ট্রাম গাড়ীর লোকেরা সব তাদের কাজের সুবিধার জন্য ধর্ম্মঘট করিল। কর্ত্তৃপক্ষ সহজে মিটাইতে চান না। এদিকে ঠিকা গাড়ী আছে, ট্যাক্সি আছে, মোটর লরী আছে, তাদের মলিকরা আরও বেশী করিয়া যদি কাজের বন্দোবস্ত করেন, লোকের যাতায়াত এক রকম চলিয়া যায়। ট্রাম গাড়ীর ধর্ম্মঘট যতদিনে মেটে মিটুক, কাহারও তেমন মাথাব্যথা তার জন্য পড়ে না। কিন্তু

ক্রমে যদি ঠিকা গাড়ীর, ট্যাক্সির, আর মোটর লরীর লোকেরাও ধর্ম্মঘট করে, আর জোর করিয়া বলে, ট্রামগাড়ীর লোকদের ধর্ম্মঘট মিটুক, নহিলে আমরাও কাজ করিব না,—তবে যে কোনও বড় সহরের সকল শ্রেণীর লোকেরই এত বেশী অসুবিধা ঘটে, কাজকর্ম্ম সব এমনই ভাবে অচলের মত হইয়া উঠে, যে ট্রামগাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষ তাড়াতাড়ি ধর্ম্মঘট মিটাইয়া না ফেলিয়াই পারেন না। এই ভাবে নিজেদের সুবিধার জন্য নয়, অপর কোনও সমবায়ের ধর্ম্মঘটের জোর বাড়াইবার জন্য যে সব ধর্ম্মঘট হয়, তাহাকে sympathetic বা সহায়ক ধর্ম্মঘট বলে।

আমাদের পরিচিত অতি সাধারণ রকম একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। বাস্তবিক বহু বড় বড় ব্যবসায় এমনই ভাবে এখন পরস্পরের সঙ্গে সংস্পৃষ্ট, মালিকদেরও স্বার্থের এমন একটা যোগ আছে, আর সাধারণ জনসমাজও বহু সুখসুবিধা ও কাজকর্ম্মের জন্য এই সব ব্যবসায়ের উপরে এমনই ভাবে নির্ভর করে, যে এইরূপ sympathetic strike বা সহায়ক ধর্ম্মঘট দুই চারি দলের মধ্যে ঘটিলেও যেন একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড উপস্থিত হয়। তাড়াতাড়ি মিটাইয়া ফেলিতে না পারিলে কেবল যে মহাজনদেরই ব্যবসায়ের বিষম ক্ষতি হয় তা নয়, লোকের জীবন যাত্রাই একরূপ অচল হইয়া পড়ে। এরূপ একটা অবস্থা যদি ঘটান যায়, ধর্ম্মঘট তখন না মিটিয়াই পারে না।

গোড়ায় এক এক স্থানে এক এক ব্যবসায়ের লোকদের মধ্যে এক একটি সমবায় হয়। ক্রমে এই সমবায়নীতির প্রসারের সঙ্গে এক এক দেশে এক ব্যবসায় যেখানে যত আছে সকলগুলির শ্রমিকরাই এক একটি বড় সমবায় প্রতিষ্ঠা করিল। স্থানীয় বা local এক একটি trade union বা শ্রমিক সমবায়, national বা জাতীয় এক একটি সমবায়ে পরিণত হইল। তারপর পরস্পর সহায়তার জন্য, প্রয়োজন মত একযোগে সকলে কাজ করিতে পারে তার জন্য, সকলের সমান স্বার্থ যে সব তাহা যাহাতে সকলের সমবেত চেষ্টায় রক্ষিত হইতে পারে তার জন্য, ইহাদের মধ্যেও একটা সহযোগিতার

সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। প্রত্যেকের আভ্যন্তরিক শাসন স্বতন্ত্র রাখিয়াও বিভিন্ন সমবায়ের এইরূপ সহযোগিতার সম্বন্ধকে ইংরেজিতে সাধারণতঃ ফেডারেশন (federation) বলে। তাই এই সহযোগিতার সম্বন্ধে বদ্ধ বিভিন্ন সমবায়গুলির নাম হইল Labour Federation বা শ্রমিক ফেডারেশন। প্রত্যেক সমবায় বা ইউনিয়ন হইতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ মধ্যে মধ্যে একত্র হইয়া এই ফেডারেশনের সাধারণ নীতি (policy) ও কর্ম্মপদ্ধতি (programme of work) স্থির করেন, এবং তাহা যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় তাহার ব্যবস্থা করেন।

এক এক দেশে এইরূপ National Labour Union ও Labour Federation (জাতীয় শ্রমিক সমবায় ও শ্রমিক সহযোগ)*এর প্রতিষ্ঠা বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। এখন নায়কবর্গ চেষ্টা করিতেছেন, যাহাতে এই নিয়মে অন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সমবায় ও সহযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। একই ব্যবসায়ের যত শ্রমিক বিভিন্ন দেশে আছে, সকলেই তাহাতে এক সমবায়ভুক্ত হইবে, একই নিয়মে একযোগে কাজ করিবে,—এবং এইরূপ সব সমবায়ের সহযোগে ইয়োরোপব্যাপী এক লেবার ফেডারেশন বা শ্রমিক সহযোগ গঠিত হইবে।

এক এক দেশেই এইরূপ শ্রমিক সমবায় ও তাহাদের সহযোগের বল যে কত বড় হইতে পারে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। আর যদি এই সমবায় ও সহযোগ এক একটি দেশের ও জাতির গণ্ডী ছাড়াইয়া সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বজনীন হইয়া উঠিতে পারে,—সকল দেশেরই এক এক ব্যবসায়ের যত শ্রমিক সব যদি এক একটি সমবায়ভুক্ত হয়, আর এই সব সমবায় লইয়া সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে যদি একটি শ্রমিক সহযোগ বা ফেডারেশন গঠিত হইতে পারে এবং একযোগে একমতে সকলে কাজ করিতে পারে, তবে উচ্চতর সম্প্রদায় সমূহের

* পারিভাষিক ভাবে ফেডারেশন অর্থে 'সহযোগ' কথা বোধ হয় ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পক্ষে সে যে কি মহাসঙ্কটের একটা অবস্থাই ঘটিয়া উঠিবে, তাহা কল্পনা করিতেও ভয় হয়।

শ্রমিক নায়কগণ ইহাই চাহিতেছেন, এই চেষ্টাই করিতেছেন। উচ্চতর ধনিক সম্প্রদায়ের লোকেরাও অবশ্য অর্থবলে, রাষ্ট্রশক্তির বলে এবং আরও বহু কৌশলে ইহাকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টাও করিতেছেন। ফলে শেষে কি হইবে, ভগবান্ই জানেন।

২। সমবায়ের লক্ষ্য

(Trade-Unionism—Communism.)

গোড়ায় এই সব শ্রমিক সমবায়ের লক্ষ্য ছিল দল বাঁধা চুক্তির ব্যবহারে এবং ধর্ম্মঘটাদি উপায়ে বাধ্য করিয়া মালিকদের নিকট হইতে বেশী বেতনে অল্প খাটনি প্রভৃতি নানারকম কাজের সুবিধা আদায় করিয়া নেওয়া। এখনও ইংলণ্ড প্রভৃতি দুই একটি দেশে শ্রমিক-সমবায়ের লক্ষ্য প্রধানতঃ এইরূপই আছে। এই লক্ষ্যসাধনের দিকে শ্রমিকসমবায়ের যে কর্ম্মপ্রচেষ্টা তাহা সাধারণতঃ Trade-unionism নামে পরিচিত। প্রতিযোগিতামূলক ব্যক্তিত্বের যে সব অধিকার বর্ত্তমান সমাজে রহিয়াছে, তার মধ্যে প্রত্যেক মানবের পক্ষে স্বোপার্জ্জিত অথবা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি যথেচ্ছ ভোগ করিবার ও ব্যবহার করিবার অবাধ অধিকার অতি প্রধান একটি অধিকার। এই অধিকারের উপরেই আধুনিক পারিবারিক জীবন এবং বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে বহু সামাজিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তিগত বা পরিবারগত এই যে পৃথক সম্পত্তির অধিকার, যাহাকে Rights of Private, Property বলা হয়, বর্ত্তমান সমাজ-জীবনই যে তাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত একথাও অনেকে বলিয়া থাকেন। Trade-unionism বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা সম্পত্তি সম্বন্ধে ব্যক্তিত্বের এই অধিকারকে লোপ করিয়া বর্ত্তমান এই সমাজপদ্ধতিকেই ভাঙ্গিয়া অন্য আদর্শে

নূতন করিয়া গড়িয়া নিতে চায় না। ইহারই মধ্যে শ্রমিকদের অবস্থা যতদূর উন্নত করা যাইতে পারে, তাহার চেষ্টা করাই ইহার লক্ষ্য।

কিন্তু ফ্রান্স জর্ম্মাণী প্রভৃতি অন্যান্য দেশে এই মতের বিশেষ কোন প্রভাব নাই। শ্রমিক আন্দোলনের লক্ষ্য সেখানে অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যবসায়বাণিজ্যে ধনিকদের ধনগত স্বত্বস্বামিত্বের যাহা কিছু অধিকার আছে, সব তাহারা একেবারে লোপ করিয়া ফেলিতে চায়। করিয়া এমন একটা ব্যবস্থায় সব চালাইতে চায়, যাহাতে শ্রমের ফল সকলেই সমান ভাবে অথবা প্রয়োজন মত ভোগ করিতে পারে এবং কোনও ব্যক্তি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের কোনও বিশিষ্ট স্বত্ব (exclusive right) কোনও সম্পদ বা ব্যবসায়ের মধ্যে না থাকে। বর্ত্তমান সমাজপদ্ধতিকেই ভাঙ্গিয়া একেবারে নূতন এক আদর্শে নূতন করিয়া গড়িয়া ইহাতে নিতে হয়। এই আদর্শের মূল কথা দেশের যাহা কিছু সম্পদ সকলের উপরে সর্ব্বসাধারণের সমবেত স্বত্বাধিকার এবং তাহার ভোগে প্রয়োজন মত সকলেরই সমান অধিকার। ইঁহারা বলেন, এই নীতির ভিত্তিতে সমাজকে প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে, কঠোর ভাবে ব্যবসায়িক সকলকর্ম্ম এই নীতির অনুবর্ত্তী করিয়া রাখিতে না পারিলে, সামাজিক ধনবৈষম্য এবং সেই বৈষম্য হেতু দরিদ্রের দুঃখদুর্গতি স্থায়ী ভাবে দূর হইতে পারে না।

মূল এই যে নীতি বা আদর্শ তাহা সাধারণতঃ 'কমিউনিজম' (Communism) নামে পরিচিত। সমগ্র সমাজকে এই নীতির বন্ধনের মধ্যে আনিয়া চালাইবার সাধারণ যে পদ্ধতি তাহাকে 'সোসিয়ালিজম' Socialism বলে। *

* কমিউনিজম্ (Communism) ও সোসিয়ালিজম্ (Socialism) প্রভৃতি মতবাদের এই যে ইংরেজি নামগুলি, ইহাদের কোনও বাঙ্গলা অনুবাদ দিবার চেষ্টা করিব না। এদেশে এসব ব্যাপারই কখনও ছিলনা, কোনও নামও নাই। নূতন নামকরণও সহজ নয়, কথাগুলি তাহাতে আরও দুর্ব্বোধ্য হইবার সম্ভাবনা। বিদেশী বহুশব্দ আমরা ব্যবহার করি। এইগুলিও সেইরূপ ব্যবহার করিতে পারি

সোয়ালিজম্ ব্যতীত কমিউনিষ্ট আদর্শে আরও দুই এক রকম সমাজপদ্ধতির কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। এনার্কিজম্ (Anarchism) ও সিণ্ডিক্যালিজম্ (Syndicalism) তাহার মধ্যে প্রধান দুইটি মত। ক্রমে এই পদ্ধতিগুলির কথা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

৩। কমিউনিজম্

বর্ত্তমান এই যে সমাজজীবন চলিতেছে, তারমধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই আমরা দেখিতে পাই, যেভাবে যেরূপ কর্ম্মেই যে সম্পত্তি যে অর্জ্জন করে, তার অধিকারী সে নিজে। রাষ্ট্রীয় বিধি সর্ব্বত্রই তার এই অধিকারকে স্বীকার করে, তাহা রক্ষারও যথাপ্রয়োজন ব্যবস্থা করে। ইহার বলেই প্রত্যেকে তার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি যথেচ্ছ ভোগ করিতেছে, অথবা অন্য কর্ম্মে নিয়োগ করিতেছে। এই ভোগে বা নিয়োগে অন্যের ক্ষতি কিছু না হইলে, ইহাতে বাধা দিবার কি আপত্তি করিবার কোনও অধিকার কাহারও নাই। রাষ্ট্রশক্তিও ইহাতে কোনও বাধা দেয়না, বরং অন্যের কোনও বাধা হইতে ধনাধিকারীকে রক্ষাই করে।

এখন এই অধিকার বলিতে ঠিক কি বুঝায়? ইহার ব্যাপকতা কতদূর? ভোগের অধিকার আছে, দানের অধিকার আছে, যে কোনও কর্ম্মে নিয়োগ করিবার অধিকারও আছে। এই কর্ম্ম আরও সম্পত্তি অর্জ্জনের অনুকুল কর্ম্মও হইতে পারে—যেমন স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিয়া ধনের মালিক তাহা হইতে প্রচুর বার্ষিক আয়ের সংস্থান করিতে পারে, অথবা সুদে ধার দিয়া কিম্বা কোনও ব্যবসায়বাণিজ্যে খাটাইয়াও সে তাহা বৃদ্ধি করিতে পারে। তারপর মৃত্যুকালে সে ইহা যাহাকে ইচ্ছা দিয়া যাইতে পারে। কিন্তু যদি এইরূপ না দিয়া কেহ যায়, তখন সেই সম্পত্তির কি হইবে? স্ত্রীপুত্রাদি পরিবার লইয়াই তাহার এই সাংসারিক জীবন ছিল; তাহাদের লইয়া, তাহাদের সঙ্গে যেন এক-

হইয়াই, সম্পত্তি সে ভোগ করিত। সকলেই তাই করে। সুতরাং এই সম্পত্তির উপরে পরিবারেরও বড় একটা দাবী আছে। তাই অন্যরূপ ব্যবস্থা কেহ কিছু না করিলে সম্পত্তি তার পরিবারের উত্তরাধিকারে আইসে; এবং রাষ্ট্রবিধিও সর্ব্বত্রই প্রায় পরিবারের এই দাবী স্বীকার করিয়া নেয়। কেবল এই পরিবারবর্গের মধ্যে কি নিয়মে কাহার কি পরিমাণ পাওনা হইবে, ইহার সম্বন্ধে নানা দেশে ও নানা সমাজে ধর্ম্মবিধি ও লোকাচার অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রকম ব্যবস্থা আছে। স্বোপার্জ্জিত কি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত উভয়বিধ সম্পত্তির উপরেই লোকের স্বত্বস্বামিত্বের দাবী একরূপ সমান বলিলেই হয়। কেবল পার্থক্য এইটুকু যে স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি কেহ যেমন যাহাকে ইচ্ছা দান করিয়া যাইতে পারে, উত্তরাধিকৃত সম্পত্তি সাধারণতঃ সেরূপ পারে না। যে বিধি তাহার উত্তরাধিকারের দাবী মানিয়াছে, সেই বিধিই তাহার পরিবারের বা বংশধরদেরও উত্তরাধিকারের একটা দাবী মানিয়া নিয়াছে। এই ভাবে, স্থাবর কি অস্থাবর যেরূপই হউক, বৃহৎ এক একটি সম্পত্তিও বংশপরম্পরায় এক একটি পরিবারের অধিকারে থাকে, এবং সেই অধিকারের বলে বহু সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত কুলবংশের প্রতিষ্ঠাও পৃথিবীর সকল দেশে সকল সমাজে হইয়াছে।

এখন এই পরিবার বলিতে কি বুঝায়? একই পিতৃপুরুষ হইতে জাত যাহারা যতদিন এক সম্পত্তির অধিকারে এক গৃহে এক অন্নে বাস করে, তাহাদের সকলকেই আমরা এক এক পরিবার বলিয়া গণ্য করি। এদেশে এবং পৃথিবীর আরও কোনও কোনও দেশে দুই হইতে তিন চারি পুরুষ পর্য্যন্তও বহুলোক এইরূপ এক এক পরিবারভুক্ত থাকে। কিন্তু ইয়োরোপে সাধারণতঃ স্বামী স্ত্রী এবং তাহাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের লইয়া এক একটি পরিবার হয়। ভাই ভাই দূরের কথা, বিবাহিত কোনও পুত্রও পিতার সঙ্গে এক পরিবার হইয়া বাস করে না। প্রত্যেক বিবাহিত পুরুষ-গৃহকর্ত্তা এবং তাহার স্ত্রী

গৃহিণী। অবিবাহিত পুত্র পিতামাতার সংসারে থাকে, কিন্তু বিবাহ হওয়া মাত্র স্ত্রীকে লইয়া তাহার পৃথক্ এক সংসার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, এবং শিশু সন্তানসন্ততিদের লইয়া তাহার পৃথক্ এক পরিবার হয়। বিপত্নীক পিতা কি বিধবা মাতা পুত্রের সংসারে থাকিলে আশ্রিত প্রতিপাল্যের ন্যায় থাকে, গৃহে কোনও কর্ত্তৃত্ব তাহাদের থাকে না। অর্থাভাবে বা অন্য কারণে একান্ত অসহায় না হইলে পিতামাতাও কেহ পুত্রের সংসারে এরূপ অবস্থায় আসিয়া বড় থাকে না। এইরূপ সন্তান-সন্ততি সহ প্রত্যেকটি দম্পতি লইয়া এক একটি পরিবার হয় বলিয়া পরিবার বলিতে ইয়োরোপীয়েরা সাধারণতঃ ইহাই বুঝেন, এবং আমাদের দেশের ন্যায় পিতামাতা এবং একাধিক বিবাহিত ভ্রাতা প্রভৃতি লইয়া যেরূপ সব পরিবার দেখা যায়, তাহাকে তাঁহারা joint বা যৌথ পরিবার বলিয়া থাকেন; এবং আমরাও তাঁহাদের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া তাই বলি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের একক দম্পতির পরিবার যেমন, আমাদের একাধিক দম্পতির পরিবারও তেমনই পরিবার। দেশ ভেদে ও আচার ভেদে কেবল পরিবারিক যোজনার রীতি বিভিন্ন রকম হইয়াছে। যাহা হউক, যে ভাবে যাহাদের লইয়াই পারিবারিক যোজনা যে দেশে হউক, আর স্বোপার্জ্জিত বা উত্তরাধিকৃত যেরূপই হউক, সাধারণতঃ প্রত্যেক পরিবারই পৃথক্ এক একটি সম্পত্তির অধিকারী,—ইংরেজি কথায় বলা যাইতে পারে, exclusive rights of private property ভোগ করে। এক এক পরিবারের এই সম্পত্তির উপরে অন্য কোনও পরিবারের দাবী দাওয়া কিছু নাই; এবং প্রত্যেক পরিবার তার এই সম্পত্তি নিজেদের শ্রমে নিজেদের চেষ্টায় যতদূর পারে বৃদ্ধিও করিতে পারে।

অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে ইহার ব্যত্যয় বড় কোথাও দেখা যায় না। তবে অনেক স্থলে পল্লী অঞ্চলে চাষআবাদের যোগ্য ভূসম্পত্তি এক এক গোষ্ঠীর সমবেত অধিকারে থাকে। এরূপ স্থলে এই সম্পত্তির

সম্বন্ধে এইরূপ এক একটি গোষ্ঠীকে বৃহত্তর এক একটি পরিবারও বলা যাইতে পারে।

এই ভাবে পৃথক্ পৃথক্ সম্পত্তির অধিকারী বিভিন্ন পরিবার লইয়া এক এক দেশে এক একটি সমাজ প্রাচীন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বলিয়া থাকেন, ব্যক্তিগত বা পরিবার-গত পৃথক সম্পত্তির যে অধিকার, তাহার ভিত্তির উপরেই (on the basis of the rights of private property) এ পর্য্যন্ত মানব-সমাজ সব গড়িয়া উঠিয়াছে। অবশ্য আর্থিক বা economic অধিকার ও ব্যবহারের উপরে সমাজজীবন যতটা নির্ভর করে, তার সম্বন্ধে একথা সত্যই বলা যাইতে পারে।

ইয়োরোপায় সমাজ সম্বন্ধে আরও বলা যাইতে পারে এই যে তাহা এই সম্পত্তির অধিকারে আবার অতিশয় individualistic বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-পরায়ণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রত্যেক বয়স্ক পুরুষ ইয়োরোপে স্বতন্ত্র এবং বিবাহিত হইলে স্বতন্ত্র এক একটি ক্ষুদ্র পরিবারের কর্ত্তা। স্বামী স্ত্রী এবং একান্ত প্রতিপাল্য সন্তানসন্ততিদের ব্যতীত আর কাহারও স্থান তাহার মধ্যে নাই এবং কাহারও কোনও দাবীও তাহার অধিকৃত সম্পত্তির উপরে চলে না। তারপর প্রত্যেক এইরূপ পরিবার বা পরিবারের কর্ত্তার সঙ্গে অন্যান্য এইরূপ সব পরিবার বা পরিবারের কর্ত্তার সম্বন্ধ সাধারণতঃ প্রতিযোগিতার সম্বন্ধ। সম্পত্তি অর্জ্জনে এবং অর্জ্জিত বা উত্তরাধিকৃত সম্পত্তির বৃদ্ধিকল্পে, যে কোনও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে, এইরূপ যে কোনও পরিবারের সঙ্গে অপর যে কোনও পরিবারের অবাধ প্রতিযোগিতার অধিকার বর্ত্তমানে যুগে স্বীকৃত হইয়াছে। পৃথক্ সম্পত্তির অধিকার, এবং সেই অধিকারে আবার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও সকল ক্ষেত্রে সমান প্রতিযোগিতা (exclusive individualistic right of private property and unrestricted competition)—আর্থিক ব্যবহারে ইহাই ইয়োরোপীয় সমাজের মূল নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রত্যেক পরিবারে পৃথক্ পৃথক্ সম্পত্তির অধিকার থাকিলেও এরূপ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ও প্রতিযোগিতা (individuality ও competition) সকল সমাজে নাই। এক পিতা পিতামহ বা প্রপিতামহের সন্তানসন্ততি লইয়া এক একটি বৃহৎ পরিবার যেখানে হয়, সেখানে এরূপ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অবসরই বড় কম থাকে। তারপর এখনও বহু দেশে ও বহু সমাজে সম্প্রদায়ভেদে বৃত্তি ভেদ আছে, এবং সাম্প্রদায়িক ব্যবসায়াদিও অনেকটা পরস্পর সাহচর্য্যের নিয়মে চলে। এই সব সমাজে ইয়োরোপের ন্যায় সকল কর্ম্মে, ব্যবসায়িক সকল সম্বন্ধে, কেবল প্রতিযোগিতাই একমাত্র ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায় নাই।

বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় সমাজে যেরূপ ধন বৈষম্য এবং পরস্পর প্রতিপক্ষ ধনিক ও শ্রমিক এই দুই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে, পরিবারে পরিবারে পৃথক্ সম্পত্তির বা private propertyর অধিকার স্বত্বেও প্রাচীন আর কোনও সমাজে সেরূপ হয় নাই। অবশ্য গুণ-কর্ম্মাদিগত অন্যান্য স্বাভাবিক বৈষম্যের সঙ্গে ব্যক্তিগত, পরিবারগত কি সম্প্রদায়গত একটা ধনবৈষম্য চিরদিন সব সমাজেই বর্ত্তমান আছে। কিন্তু এই বৈষম্য এত ভয়ঙ্কর, দরিদ্রজনসাধারণের পক্ষে এত দুঃখকর কোথাও কখনও হয় নাই। কারণ ব্যবসায়-বাণিজ্যাদিসম্বন্ধীয় সামাজিক ব্যবহারে প্রতিযোগিতাপরায়ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারকে এরূপ প্রাধান্য কোথাও আর কেহ দেয় নাই।

পৃথক্ সম্পত্তির অধিকার অন্যান্য দেশের ন্যায় ইয়োরোপেও বরাবর আছে। পারিবারিক জীবনেও প্রত্যেক ব্যক্তির একটা স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ ইয়োরোপীয় সমাজ মানিয়া আসিয়াছে। কিন্তু বৃত্তির ক্ষেত্রে সকল শ্রেণীর এরূপ অবাধ প্রতিযোগিতার অধিকার ছিল না। ব্যক্তিগত পৃথক্ সম্পত্তি যার যত আছে, এই প্রতিযোগি-তার শক্তি তার তত বেশী হইবেই। আবার এই শক্তি বাড়াইবার জন্য স্বভাবতঃই সম্পত্তি সে আরও বাড়াইতে চেষ্টা করিবে। *সম্পত্তি যার যত বাড়িবে,* প্রতিযোগিতার বল কাজেই তার

তত বাড়িবে। ক্রমে এই ভাবে অতি বৃহৎ বৃহৎ সম্পত্তির বলে কতিপয় ধনী সকল ব্যবসায়বাণিজ্যও অধিকার করিয়া ফেলিবে, এবং দরিদ্র আর কোথাও কেহ তাহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না। ইয়োরোপে বর্ত্তমান ধনবৈষম্য এবং সর্ব্বত্র সকল ক্ষেত্রে ধনিকপ্রভুত্ব এই ভাবেই ত গড়িয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক এই অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, পৃথক্ সম্পত্তির অধিকার তত নয়, যত নাকি এই অধিকারে প্রতিযোগিতাপরায়ণ ব্যক্তিত্বের যোগ এবং মূলতঃ তাহা হইতেই ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজমের অভ্যুদয়। গত শতাব্দীর অধিক কাল এইসব ব্যাপারে যে পথে ইয়োরোপ চলিয়াছে, এবং প্রতিযোগিতা-পরায়ণ ব্যক্তিত্বের অধিকার সর্ব্বত্র তাহাতে যে ভাবে আপনাকে প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহাতে পৃথক্ সম্পত্তির অধিকারের সঙ্গে ইহার একটা অবিচ্ছেদ্য যোগ, অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধই আছে, এইরূপ ধারণা সাধারণতঃ লোকের মধ্যে জন্মিয়া গিয়াছে। সুতরাং অনেকে মনে করেন, ইহার প্রতিকার করিতে হইলে যেমন প্রতিযোগিতা, তেমনই পৃথক্ সম্পত্তির অধিকার দুইই লোপ করিতে হইবে। করিয়া সমগ্র সমাজকেই এমন এক ব্যবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, যাহাতে সকল ক্ষেত্রে সমান সহযোগিতার সম্বন্ধে সকলে কাজ কর্ম্ম করে, এবং ধন যাহা উৎপন্ন হয়, সকলেই সমান ভাবে বা প্রয়োজন মত তাহা ভোগ করিতে পারে। ইহারই নাম কমিউনিজম্ (Communism)।

প্রত্যেকে স্বতন্ত্র ভাবে ধন অর্জ্জন করিবে এবং অর্জ্জিত ধন ভোগদখল করিবে, ইহা হইল Individualism বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা। ইহার প্রভাবে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে স্বাভাবিক ও সাধারণ সম্বন্ধই হয় প্রতিযোগিতার সম্বন্ধ। সহযোগিতা ইহার মধ্যে যেখানে দেখা যায়, তাহা কোনও বিষয়ে সমান স্বার্থ আছে এমন কতকগুলি লোকের মিলন, এইরূপ সমস্বার্থবিশিষ্ট অপর কোনও দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতার বল বাড়াইবার জন্য। এই সহযোগের মধ্যেও ধন

অনেক সময়ে ব্যক্তিগত ভাবেই অর্জ্জন করা হয়, যেমন সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রমিকেরা করিয়া থাকে। সমবেত কর্ম্মে যেখানে ধন উৎপন্ন বা অর্জ্জিত হয়, সেখানেও পূর্ব্বের চুক্তি মত একটা ভাগ করিয়া দিয়া ব্যক্তিগত ভাবেই সকলে তাহা ভোগ দখল করে।

কমিউনিজম্ হইল, এই Individualism বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিপরীত একটা ব্যবস্থা। কমিউনিটী (community) বলিতে কোনও সম্প্রদায় বা সমাজকে বুঝায়। যাহা কিছু স্বার্থ, যাহা কিছু অধিকার, সবই সকলের সমান, সমবেত ভাবে সকলে কাজকর্ম্ম করিবে,—ভোগ্য যাহা কিছু পাওয়া যায়, সমবেত ভাবে ভোগদখল করিবে,—পৃথক্ ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও কোনও স্বার্থ বা অধিকার কিছু থাকিবে না, বিশিষ্ট ভাবে 'আমার' বলিয়া কেহ কিছু দাবী করিতে পারিবে না,—এইরূপ 'আমার' বলিয়া কিছু থাকিতে পারে, এমন কথা কেহ কখনও মনেও করিবে না,—এই ভাবে পৃথক্ ব্যক্তিত্বের বা individualityর সত্তা ও স্বত্বকে একেবারে কমিউনিটী বা সমাজের সত্তার ও স্বত্বের মধ্যে লোপ করিয়া দিয়া লোকে জীবনযাপন করিবে,—'কমিউনিজম্' ইহাই চায়। ব্যক্তিকে প্রধান করিয়া ব্যক্তির স্বার্থসর্ব্বস্ব জীবনযাত্রার যে পদ্ধতি, তাহা Individualism। আর তার বিপরীত—কোন কমিউনিটী বা সমাজকেই প্রধান করিয়া সমাজের স্বার্থসর্ব্বস্ব জীবনযাত্রার যে পদ্ধতি তাহাই হইল, Communism। তবে একটি কথা ইহার মধ্যে বুঝিতে হইবে। Individualism ও Communismএর মধ্যে এই যে ভেদ, তাহা প্রধানতঃ ধনসম্পদের ভোগ দখল লইয়া। Individualism চায়, সম্পদ ব্যক্তিগত ভাবে লোকে অর্জ্জন ও ভোগদখল করিবে,—Communism চায়, ইহা সমবেত ভাবে সকলে অর্জ্জন ও ভোগ দখল করিবে। সকলেই আমরা জানি, জীবনযাত্রার অন্যান্য বহু ব্যাপারে চরম Individualism বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদ ও সকল ব্যক্তির উপরে রাষ্ট্র বা সমাজ যেরূপই হউক, একটা সংঘশক্তিকে মানিয়া চলে। আমার

দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বল ও রূপগুণাদিতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে স্বাভাবিক যে ভেদ আছে, এবং ভেদ হেতু যে সব সুখসুবিধাও প্রত্যেক ব্যক্তির স্বকীয় অধিকারে আপনা হইতেই থাকিবে, কোনও কমিউনিজম্ তাহা সকলের পক্ষে সমান করিয়া দিতে পারে না। তবে কমিউনিজম্ ইহা অবশ্য চায় যে, এই ভেদ ধনসম্পদের ভোগ দখলে কোনও মতে কোনও ভেদ না জন্মাইতে না পারে এবং তার জন্য ব্যক্তিদের এই সব ভেদ ও বিশিষ্টতাকে চাপিয়া রাখিবার যত দূর প্রয়োজন হয় তাহাও রাখিতে হইবে। আর একটি কথা এই যে, এই কমিউনিজমের মধ্যে ব্যবসায়বাণিজ্যাদি ধনোৎপাদন বা ধনার্জ্জন সম্বন্ধীয় কোনও ব্যাপারের মধ্যেই প্রতিযোগিতা বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। সহযোগিতাই এই ক্ষেত্রে এবং ইহা হইতে অন্যান্য বহু ক্ষেত্রেও জীবনের প্রধান ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়।

পৃথক্ সম্পত্তির অধিকার এবং সেই অধিকারে লোকের জীবনযাত্রা বর্ত্তমান সব সমাজে যে ভাবে চলিতেছে, তাহা সর্ব্বদা আমরা দেখিতেছি, এবং এই অবস্থাটাও মোটামুটি বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে কমিউনিজমের আদর্শে সমাজ গঠিত হইলে, সে অবস্থাটা যে ঠিক কিরূপ হইবে, লোকের জীবনযাত্রা বাস্তবিক কি ভাবে চলিবে তাহার একটা পরিস্ফুট কল্পনা করিয়া নেওয়াও আমাদের পক্ষে বড় সহজ নয়। তবে আমাদের দেশে পারিবারিক জীবনের যে রীতি, অর্থাৎ যৌথ বা একান্নবর্ত্তী পরিবার যাহাকে বলে, তাহা যে আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইতে এই কমিনিউজমের কথা কিছু আমরা বুঝিতে পারিব। কারণ এই সব পরিবার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটি গণ্ডার মধ্যে, সম্পূর্ণ না হউক, বহু পরিমাণে কমিউনিজমের আদর্শেই গঠিত।

এক একটি পরিবারের স্থাবর কি অস্থাবর যাহা কিছু সম্পত্তি, যতদিন একত্র থাকে, সকলেরই তাহাতে সমান অধিকার। কেবল যখন পৃথক্ অন্নে সকলে ভাগ হয়, তখন সম্পত্তির ভাগ উত্তরাধিকারের

যে শাস্ত্রীয় বা আইনসঙ্গত ব্যবস্থা আছে তাহার অনুসারে হয়।— যতদিন সকলে এক পরিবার ভুক্ত থাকে, যেই যাহা অর্জ্জন করুক, যাহারই চেষ্টায় ও অর্জ্জিত অর্থে পারিবারিক সম্পত্তি বৃদ্ধি পাউক, সবই পরিবারের সমান সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয়। কোনও অংশ কেহ পৃথক্ ভাগে একেবারে নিজের বলিয়া দাবী করিতে পারে না। স্বত্বের অধিকার অপেক্ষা ভোগের অধিকারটাই পারিবারিকজীবনের অনেক বড় কথা। শাস্ত্রীয় বিধিতে বা আইনে স্বত্বের অধিকার যাহার যেমনই থাক্, ভাগের সময় সে কথা ওঠে। একত্র যতদিন সকলে থাকে, ভোগের বেলায় তাহার কোনও কথা কেহ ভাবে না। খাওয়াপরায় সকলেরই সমান ব্যবস্থা থাকে; বিবাহ-শ্রদ্ধাদি অনুষ্ঠানে যখন যাহার পক্ষে যেরূপ প্রয়োজন, সেইরূপ ব্যয় করা হয়। এইখানেই আমাদের পারিবারিক জীবনে কমিউনিষ্ট আদর্শের বিশেষত্ব প্রধান ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। পুরুষদের সম্বন্ধে স্বামিত্বে ও ভোগে সাধারণতঃ এই নিয়মই চলে। তবে নারীদেব সম্বন্ধে ব্যতিক্রম কিছু দেখা যায়। শ্বশুরকুল হইতে বসনভূষণাদি যাহা কিছু দেওয়া হয়, সকলকেই সমান ভাবে দেওয়া হয় বটে,—কিন্তু পিতৃকুল হইতে প্রদত্ত বসনভূষণ বা কোনও সম্পত্তির উপরে প্রত্যেক নারীর পৃথক্ একটা স্বত্বের দাবী আছে. ভোগও সে ইচ্ছামত করিতে পারে, যদিও অনেক স্থলে ভাল দেখায় না বলিয়া অনেকে তাহা করে না। *

* একটি সম্ভ্রান্ত পবিবারেব কথা জানি, নাম করা সঙ্গত হইবে না, যেখানে নারীদেবও পৃথক্ এই স্বত্বের ও ভোগেব অধিকাব চলে না। বহু বংশধর লইয়া অতি বৃহৎ এক পবিবার তিন চাবি পুরুষ যাবৎ একত্র আছেন। গৃহে অনেক বধূ। পিতৃকুল হইতে বসনভূষণাদি যেই যাহা লইয়া আসুক, কাহাবও নিজস্ব ভাবে নিজের দখলে তাহা থাকে না। সব এক সঙ্গে পারিবাবিক সমান সম্পত্তিব ন্যায় প্রবীণা কোনও গৃহিণীর হাতে থাকে। বধূরা বাহিবে কোথাও যাইবার সময় তিনি যাহাকে যাহা দেন, সে তাই পরিয়া যায়। কোনও বধূব পৃথক্ কোনও বাক্সপেটরা নাই। আটপৌরে কাপড়চোপড়ও সব একজনের হেফাজতে থাকে।

এখন বৃহৎ পরিবারের মধ্যে এই রীতি চলে কি করিয়া?

প্রথম কথা, সকলের মধ্যেই অতি ঘনিষ্ঠ একটা শোণিতসম্বন্ধ আছে। স্বাভাবিক মমতার টান যেখানে প্রবল, সকলেই অন্য সকলের সুখ চায় মুখ চায়, কাহাকেও অতিক্রম করিয়া বেশী কিছু ভোগ করিতে কাহারও প্রবৃত্তিই বড় হয় না; হইলেও সঙ্কোচ বোধ করে। চিত্তের স্বাভাবিক এই সব সংস্কার বা ভাব যাহাতে বাস্তব অভ্যাসে পরিণত হয়, এইরূপ কতকগুলি নিয়মেও বাল্যাবধি সকলে চলে। একা বেশী সুখে থাকিব, তার অপেক্ষা সকলে সমান সুখে থাকিব, দুঃখ হয় সকলেই সমান ভাবে সেই দুঃখ ভোগ করিব, এই ভাবটা—এক কথায় আত্মভোগ অপেক্ষা অপরের জন্য ত্যাগের দিকটাই ইহাতে প্রত্যেকের চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব হইয়া উঠে। পরিবার ঠিক রাখিতে হইলে এইরূপ নিয়মের অনুবর্ত্তিতা একান্ত আবশ্যক। এই সব নিয়মে চলিতে চলিতে ক্রমে এইগুলি সাধারণ সামাজিক আচারে বা প্রথায় পরিণত হইয়াছে। সামাজিক ব্যবহারে শাস্ত্রীয় ধর্ম্মবিধি অপেক্ষা এই সব আচারের প্রভাব অনেক সময় বেশী বই কম হয় না।

প্রত্যেক খোপে দুইখানা কি তিনখানা করিয়া কাপড় তিনি প্রত্যেক বধূকে দেন। সেই খোপের জন্য সেই কাপড় সেই বধূ ব্যবহার করে; ফের খোপে হয়ত অন্য কাপড় পায়। আগে যে ভূসম্পত্তি ছিল, তাহাতেই পরিবারের ব্যয় চলিয়া যাইত। অধুনা অনেকে চাকরী বাকরী করেন। কিন্তু কর্ম্মস্থলে নিজ নিজ স্ত্রীপুত্রদের সঙ্গে নিয়া রাখিবার রীতি নাই, পাছে পৃথক্ পৃথক্ একটা ভাব জন্মে এবং পরিবারের বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। শুনিয়াছি, স্বামীর নিকট হইতে যে সব চিঠিপত্র আসে, তাহা রাখিবার জন্যও কোনও বধূর পৃথক্ কোনও হাতবাক্স পর্য্যন্ত নাই। সকলের চিঠিপত্রই একটা বাক্সে থাকে। এতদিন খুব কড়াকড়ি ভাবেই এই সব নিয়ম চলিয়াছে। অধুনা দুই একজন দূরে চাকরী করেন বলিয়া সঙ্গে তাঁহাদের নিজেদের পরিবার নিয়া রাখিতেছেন। কিন্তু গৃহে যখন আসেন, গৃহের নিয়মেই চলেন। ইহা হইতে ক্রমে এই বন্ধন হয়ত টুটিয়া যাইতে পারে।

এই পরিবারের যে রীতি, তাহাকে একেবারে খাঁটি কমিউনিজম্ বলা যাইতে পারে।

লোকের চিত্ত ইহার অনুবর্ত্তী হইয়া পড়ে, ইহার পথ লঙ্ঘন করিতে সহজে লোকে পারে না। এই সব আচারই পরিবারের স্থিতিকে ধরিয়া রাখে, রক্ষা করে, তাই পারিবারিক ধর্ম্মই এই গুলি হইয়া উঠিয়াছে। সেই ভাবেই লোকে ইহার প্রভাব অনুভব করে, ইহার অনুগত হইয়া চলে। লঙ্ঘন যে করে, দশজনে তাহাকে ধিক্কার দেয়, ধর্ম্ম লঙ্ঘনকারীকে যেমন দিয়া থাকে। লোকলজ্জার খাতিরেও অনেকে এই সব আচার মানিয়া চলে, যথেচ্ছ আচরণের প্রবৃত্তি হইলেও তাহা দমন করিয়া রাখে। সামাজিক শাসনে এই লোকলজ্জার প্রভাব বড় কম নহে।

বড় একটি দৃষ্টান্ত ইহার এই স্থলে উল্লেখ করা হইতে পারে।

দাম্পত্যের আকর্ষণ সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল আকর্ষণ, এবং আপন সন্তান সন্ততির প্রতি মমতার সঙ্গেও অন্য কোনও প্রকার মমতার তুলনা হয় না। দম্পতি পরস্পরের সঙ্গ যত চায়,—আপন পুত্রকন্যাদের কোলে করিয়া, আদর সোহাগ করিয়া যত আনন্দ পায়,—এত আর কাহারও সঙ্গ চায় না, এত আনন্দও আর কাহাকে লইয়া পায় না। নিজের স্বামীর বা স্ত্রীর এবং সন্তান সন্ততির সুখস্বার্থের দিকে প্রত্যেক নারীর বা পুরুষের যতটা টান গিয়া পড়ে, এতটা আর কাহারও দিকে পড়িতে পারে না। অথচ স্বাভাবিক এই সব প্রবৃত্তি বা লিপ্সাকে সংযত রাখিতে না পারিলে, পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের যে সমতার উপরে এই সব বৃহৎ পরিবারের অস্তিত্বই নির্ভর করে, তাহা থাকে না,—প্রত্যেকটি দম্পতি ও তাহাদের সন্তানসন্ততি লইয়া বড় পরিবারের গণ্ডীর মধ্যে ছোট ছোট অনেকগুলি পরিবারের মত গড়িয়া উঠে। অধিকাংশ বস্তুর স্বত্বাধিকারে ও ভোগে ইহাদের মধ্যে সমতা ত কিছু থাকেই না, অনেক রকম পার্থক্যই বরং দেখা দেয়। আজকাল এইরূপ পরিবার অনেক স্থলে দেখা যায়, যেখানে অতি সাধারণ রকম মোটামুটি কতকগুলি খরচ সকলের জন্য সমান ভাবে হয়, কিন্তু বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন যাহার যাহা কিছু, সব প্রত্যেকে ইচ্ছামত নিজের

অর্থসামর্থ্য অনুসারে নিজে চালাইয়া নেয়। কমিউনিজম এর মর্ম্ম যে ইহার মধ্যে কিছুই থাকে না, ইহা বলাই বাহুল্য।

আমাদের প্রাচীন ধরণের পারিবারিক জীবনে কতকগুলি প্রথা আমরা দেখিতে পাই। প্রথম বয়সে স্বামী স্ত্রী যথেচ্ছ ভাবে যখন তখন পরস্পরের সঙ্গে মেলা মেশা দূরে থাক, আলাপও করিতে পারে না। অতি লজ্জার কথা বলিয়া সকলে ইহা মনে করে। প্রবীণ বয়সেও অনেক স্ত্রী একটু ঘোমটা না টানিয়া প্রকাশ্যে স্বামীর সম্মুখে বাহির হন না, মুখামুখি আলাপ করেন না। গুরুজনের সমক্ষে নিজের সন্তানসন্ততিদের কোলে করা, তাহাদের আদর করা, নাম ধরিয়া ডাকা, এসবও লজ্জার কথা। প্রথম বয়সের ত কথাই নাই, বড় হইলেও অনেকে ইহাতে সঙ্কোচ বোধ করেন। এক পরিবারে পাঁচ ভাই আছে, সকলেরই ছেলে পিলে হইয়াছে;—ভাইপো ভাইঝিদের ফেলিয়া কেবল নিজের ছেলেমেয়েদের লইয়া থাকা, তাহাদের নিয়া খাওয়া, সঙ্গে করিয়া বেড়ান, তাহাদের কোনও দ্রব্য কিনিয়া দেওয়া, অতি অসঙ্গত আচরণ বলিয়া গণ্য হয়। সকলেই তাহাতে লজ্জা বোধ করে। পুরুষদের কাছে ঘরের সকল ছেলেপিলেই সমান। বাপই বরং একটু তফাৎ তফাৎ থাকে, খুড়াজেঠাদের কাছেই ছেলেপিলেরা ঘেঁসে বেশী, আবদার করে বেশী। মাতা গর্ভধারিণী ও স্তন্যদাত্রী, অতি শৈশবে ছেলেপিলেদের পালনের দায়িত্ব প্রধানতঃ যার যার মাতার উপরেই পড়ে বটে; কিন্তু একটু বড় হইয়া উঠিলে, গৃহের সব ছেলে-পিলের খাওয়ান দাওয়ান নাওয়ান পরান প্রভৃতি কাজ সমান ভাবে নারীরা যিনি যখন পারেন, করেন। কেবল যার যার মা তার তার নাওয়ান খাওয়ান প্রভৃতি কাজগুলি করিলে মোটা খুব দোষের কথা, লজ্জার কথা, নিন্দার কথা হয়।

স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধে এবং নিজেদের সন্তান সন্ততির সম্বন্ধে এই যে একটা সঙ্কোচের রীতি, প্রাচীন কুসংস্কারমূলক আত্মগরী কতকগুলি কুপ্রথা বলিয়া অধুনা অনেকে বর্জ্জন করিতেছেন। কিন্তু কেন যে এই

সব প্রথা হইয়াছিল, বাস্তবিক ইহার কোনও সার্থকতা ছিল কিনা বা আছে কিনা, একথা আমরা কখনও ভাবিয়াও দেখিনা। স্বভাবতঃই অতি প্রবল দাম্পত্য প্রেম ও অপত্যস্নেহের আকর্ষণ এইরূপ একটা সংযমের বাধা না পাইলে প্রত্যেকটি দম্পতিকে আপন সন্তানসন্ততি সহ পৃথক্ এক একটা স্বার্থের কেন্দ্রে টানিয়া নিবেই, এবং তা যদি নেয়, তবে কমিউনিষ্ট আদর্শে পারিবারিক জীবন চলিতে পারে না। তাই ইহারই প্রয়োজনে এই সব প্রথা দেখা দিয়াছে। দাম্পত্য সম্বন্ধের ও অপত্যস্নেহের পূর্ণ সার্থকতা বড় কি কমিউনিষ্ট পরিবারের স্বার্থ বড়, এসব আলাদা কথা। কিন্তু কমিউনিষ্ট আদর্শে পারিবারিক জীবন যদি রাখিতে হয়, দাম্পত্য সম্বন্ধকে ও অপত্যস্নেহকে এইরূপ কোনও না কোনও রূপে কঠোর রশ্মির দ্বারা সংযত রাখিতেই হইবে।

নববিবাহিতা বালিকা বধূদের সম্বন্ধেও কতকগুলি সঙ্কোচের নিয়ম দেখা যায়। তাহারা গুরুজন কাহারও সঙ্গে কথা বলে না, নীরবে সকলের আদেশ মানিয়া চলে। বিভিন্ন পিতার গৃহ হইতে তাহারা আসিয়াছে। মতিগতি ও চালচলন ভিন্ন ভিন্ন রকম হইবারই কথা। কোনও ব্যবহারে কি কাজ কর্ম্মে, এমন কি কথায় পর্য্যন্ত, এই বিভিন্নতার ভাব প্রকাশ না পায়, কাহারও মধ্যে কোনও রূপ স্বাতন্ত্র্য না প্রশ্রয় পায়, পারিবারিক আনুগত্যে বাল্যাবধি ইহারা একেবারে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, তাই বিবাহের পর প্রথম কয়েক বৎসর এইরূপ কঠোরনিয়মের শাসনে তাহাদের চালাইবার রীতি হইয়াছে। কেবল একটা কঠোর ক্লেশকর শাসন বলিয়াই এই রীতিকে তাহারা অনুভব করে না; সকল পরিবারেই এই রীতি আছে। বধূত্বের একটা ধর্ম্ম বলিয়াই প্রত্যেক বালিকা এই রীতিকে গ্রহণ করে, মানিয়া চলিতে শেখে, এবং পিতৃগৃহে তাহাদের মাতাপিতামহী প্রভৃতি নারীদের কাছে এইরূপ শিক্ষাওতাহারা পায়।

কমিউনিজম্ চায়, ছোট বড় যেমন কমিউনিটী বা সমাজ যাহাদের লইয়াই হউক, অন্তর্ভুক্ত সকল ব্যক্তি তাহাদের ব্যক্তিত্বকে, ব্যক্তিত্বের

স্বতন্ত্র স্বার্থ,—স্বতন্ত্র কামনাকে, যে কোনও রকম আত্মতৃপ্তির কি আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে, একেবারে সংযত রাখিয়া সম্পূর্ণভাবে সেই কমিউনিটির অনুগত হইয়া চলিবে। এই আনুগত্যকে তাহার ধর্ম্ম বলিয়া অনুভব না করিলে কেহ কাহারও ব্যক্তিত্বকে একদিকে এমন করিয়া চাপিয়া রাখিতে পারে না; এই আনুগত্যও সহজ হয় না। আমাদের পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে যে কমিউনিজম আছে, তাহা বজায় রাখিবার জন্যই এই সব নিয়মের শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এবং এই শাসনানুবর্ত্তিতায় যাহাতে সকলে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, ধর্ম্ম বলিয়াই শ্রদ্ধায় ইহাকে গ্রহণ করে, বাল্যাবধি সকলের পারিবারিক শিক্ষাদীক্ষাও সেই ভাবে হইত। এই আদর্শে পরিবারকে স্থিত রাখিতে হইলে, ইহাই যে পারিবারিক ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়, এ কথা আমাদের সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে; আর এতটা প্রেমের প্রসারে এতখানি ত্যাগের সাধনা যাহার মধ্যে আছে, ব্যক্তিগত ধর্ম্মহিসাবেও তাহার মহিমা বড় কম নয়। কেবল আপন স্বার্থে, আপন সুখেই ব্যক্তিত্বের একটা চরিতার্থতা হইতে পারে, কিন্তু অপর পাঁচজনকেও আপন করিয়া নিয়া সেই স্বার্থ সেই সুখ সকলে মিলিয়া ভোগ করিতে যদি অভ্যস্ত আমরা হইতে পারি, জীবনের একটা চরিতার্থতা তাহাতে অনেক বেশী বই কম হইবে না।

স্বাভাবিক একটা মমতার টান এবং এইরূপ সব শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে ও নিয়মানুবর্ত্তিতায় আত্মসংযম ও আত্মত্যাগের অভ্যাস, কমিউনিষ্টিক্ পরিবারকে প্রধানতঃ তার আদর্শে ধরিয়া রাখে। তা ছাড়া, ইহাও দেখা যায়, প্রত্যেক এইরূপ পরিবারে একজন কর্ত্তা ও গৃহিণী থাকেন, সকলেই যাঁহাদের অনুগত হইয়া চলে, চলিতেই অভ্যস্ত হয়। তাঁহাদেরও পক্ষপাতশূন্য হইয়া সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করা চাই। যদি না পারেন, এই আনুগত্য বেশী দিন থাকে না। কর্ত্তা-গৃহিণীর চরিত্রে ও ব্যবহারে এই গুণ যতদিন থাকে এবং পরিজনবর্গ স্বেচ্ছায় ও সহজে এই সব নিয়ম যতদিন মানিয়া চলে,

ততদিনই এক একটি পরিবার তার এই ধর্ম্মে স্থির থাকে। ইহার ব্যতিক্রম যখনই ঘটে, নানারূপ বিবাদবিসম্বাদ ও অশান্তির কারণ দেখা দেয়, পরিবার ভাঙ্গিয়া যায়। ভাঙ্গিয়া অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ মমতার গণ্ডীর মধ্যে ছোট ছোট যে সব পরিবার হয়, তাহাও বহুদিন পর্য্যন্ত এইরূপ কমিউনিষ্টিক্ আদর্শেই চলে। ক্রমে আবার অতি বৃহৎ হইয়া তাহাও এই ভাবে ভাঙ্গিয়া নূতন কতগুলি পৃথক্ পরিবারের সৃষ্টি হয়। বরাবরই এইরূপ চলিয়া আসিতেছে; পরিবার এই নিয়মে রাখিবার একটা চেষ্টাও আছে। আবার মানবস্বভাবের স্বভাবিক দুর্ব্বলতা ও ত্রুটিবিচ্যুতি হেতু ভাঙ্গিবার কারণ যখন উপস্থিত হয়, ভাঙ্গে। যখন ভাঙ্গে, জোর করিয়া ধরিয়া কেহ বড় রাখে না; রাখিতে পারেও না। যে ভাবে হউক, জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতেই হইবে, এমন কোনও শাস্ত্রীয় বা সামাজিক বিধিও কিছু নাই।

কমিউনিজমের একটা আদর্শ অতি প্রাচীনকাল হইতেই এ পৃথিবীতে নানাদেশে আছে। অনেক পণ্ডিত এ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন, এবং এইনিয়মে ছোট ছোট অনেক সমাজ গড়িবার চেষ্টাও অনেক স্থলে হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিক মহামনীষী প্লেটো, যে একটা সমাজের আদর্শ কল্পনা করেন, তাহার কিছু আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি। * তাঁহার সেই কল্পিত সমাজের উচ্চতর দুই শ্রেণী আমাদের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অনুরূপ। সমাজের শাসন ও রক্ষণের ভার তাঁহার মতে ইঁহাদেরই হাতে থাকিবে। এই দুই শ্রেণীর জন্য তিনি কমিউনিজমের ব্যবস্থা করেন। ব্যক্তিগত বা পরিবারগত কোনও স্বার্থের বন্ধনে বদ্ধ না থাকিয়া সম্পূর্ণ ভাবে কমিউনিষ্ট আদর্শে জীবন যাপন করিয়া সমাজের কল্যাণে আত্মদান করিতে পারেন, তাই প্লেটো নির্দ্দেশ করেন, তাঁহার এই আদর্শ সমাজে উচ্চতর এই দুই শ্রেণীর কোনও ব্যক্তি বিবাহ করিবেন না, স্বতন্ত্র পরিবার কাহারও থাকিবে

* ১৮৮—৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

না। এই সমাজভুক্ত নারীরা সকল পুরুষেরই সমান ভোগ্যা থাকিবে, সন্তানসন্ততি যাহারা জন্মে, সকলেই সমাজের সমান সন্তান হইবে। কড়া এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে কে কাহার জনক তাহা কোনও মতে কেহ ধরিতেও না পারে।

প্লেটোর এই আদর্শ সমাজ বাস্তব আকারে কখনও দেখা দেয় নাই। তবে ইয়োরোপে পরবর্ত্তী বিভিন্ন যুগে কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্তও কমিউনিষ্ট আদর্শে ছোট ছোট সমাজ বা সংঘ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা অনেকে করেন। এই মতে চলিতে প্রস্তুত এইরূপ বহুলোককে লইয়া এক একটি পল্লী স্থাপনা করা হয়। কোনও একজন প্রধান ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বাধীনতায় সকলেই যে যেমন পারে, একটা নিয়মে কাজকর্ম্ম করিবে; উৎপাদিত যাহা কিছু দ্রব্য, সাধারণ একটা ভাণ্ডারে সব রাখা হইবে; তারপর কোথাও যার যেমন প্রয়োজন তদনুসারে, কোথাও বা যে যেমন কাজ করিয়াছে তার হিসাবে, সেই ভাণ্ডার হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি গ্রহণ করিবে; ইত্যাদি নানারকম নিয়মও করা হয়। কিন্তু সর্ব্বত্রই দেখা গিয়াছে, যখনই অধিবাসীরা সকলে বিবাহ করে এবং সন্তানাদি হয়, প্রায় সকলেই যার যার পরিবারের স্বার্থের টান এত টানে যে এই সব নিয়ম সহজে আর বজায় রাখা যায় না। অনেক নায়কই শেষে বুঝিতে পারেন, পৃথক্ পারিবারিক জীবন ও কমিউনিষ্ট সমাজ একত্র চলিতে পারে না। তাই কেহ কেহ প্লেটোর আদর্শে বিবাহ ও পারিবারিক জীবন একেবারে তুলিয়া দিয়াই কমিউনিষ্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন। স্বভাবতঃই যৌনব্যভিচার-জাত নানারূপ দুর্নীতির ফলে এই সব সমাজও নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আমাদের দেশের পারিবারিক জীবনে দাম্পত্য ব্যবহারের মধ্যে যে সব সঙ্কোচের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, তার সার্থকতার বিশেষত্ব ইহা হইতেও আমরা বেশ উপলব্ধি করিতে পারিব। যৌনসম্বন্ধে দাম্পত্যের পবিত্রতাকে রক্ষা করিয়া বাহিক অন্যান্য ব্যবহারে একটা

সঙ্কোচ ও সংযমের নিয়ম এদেশে করা হয়, যাহাব্যতীত কমিউনিষ্ট আদর্শ ক্ষুদ্র এক একটি পরিবারের গণ্ডীর মধ্যেও স্থির রাখা সম্ভব হয় না।

ব্যক্তিত্বের প্রভাব অধিকাংশ মানবের স্বভাবেই অতি প্রবল। কতক পরিমাণে ইহাকে সংযত রাখিতে না পারিলে, কোনও রূপ সমাজ-জীবনই সম্ভব হয় না। তবে ইয়োরোপীয় কমিউনিজম্ ইহাকে যতটা চাপিয়া রাখিতে, প্রায় এক রকম লোপ করিতেই যেমন চায়, আর কোনও সমাজপদ্ধতি তা চায় নাই। স্বাভাবিক মমতার টানে এবং কতকটা ধর্ম্মবুদ্ধিতে এক একটি পরিবারের গণ্ডীর মধ্যে এই কমিউনিজম্ কতক পরিমাণে চলিতে পারে। আমাদের দেশে এত সব কড়া নিয়মের এবং বাল্যাবধি এরূপ সব শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবের মধ্যেও সম্পূর্ণ কমিউনিষ্ট আদর্শে পারিবারিক জীবন বেশীদিন কোথাও চলিতে পারে নাই। অধুনা ব্যক্তিত্বপ্রধান ইয়োরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে কমিউনিষ্ট আদর্শ আমাদের পরিবারে আগে যেমন ছিল, তেমন অবশ্য নাই। যা আছে, তাও অনেক তাড়াতাড়ি এখন ভাঙ্গে। কিন্তু পূর্ব্বেও কোনও পরিবার দুই তিন পুরুষের বেশী একত্র বড় থাকিত না। দুই পুরুষে সহোদর ভ্রাতারাও ব্যক্তিত্বের স্বার্থে বিবাদ করিয়া পৃথক হইতেন, এমন দৃষ্টান্তও বড় কম নয়। তবু কমিউনিজম যদি চলে, এই নিয়মে ও ধর্ম্মে একই শোনিতজাত এক একটি পরিবারের মধ্যেই চলিতে পারে। বাহিরের বহু বিভিন্ন স্বার্থযুক্ত বিভিন্ন পরিবার লইয়া কোন কমিউনিষ্ট সমাজ গড়া ও তাহা চালান সম্ভব বলিয়াই মনে হয় না।

তবু বর্ত্তমান ইয়োরোপে শ্রমিক নায়কগণ অনেকে এক একটি দেশের সমগ্র সমাজকেই এই আদর্শে গড়িয়া নিতে ও চালাইতে চাহিতেছেন, এবং তাও চাহিতেছেন ষ্টেট্ বা রাষ্ট্রশক্তির কর্ত্তৃত্বাধীনতায়। ষ্টেট বা রাষ্ট্রশক্তি কর্ত্তৃত্বাধীনতায় এইরূপ যে সামাজিক আদর্শ তাহারই সাধারণ নাম সোসিয়ালিজম্ (Socialism)

৪। সোসিয়ালিজম্

(Socialism)

ব্যষ্টি ভাবে ও সমষ্টি ভাবে মানব-জীবনের যে তুইটা দিক আছে, ইহা আমরা সকলেই জানি এবং স্বীকারও করিয়া থাকি। এখন এই সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টির স্থান কি হইবে এবং ব্যষ্টির উপরে সমষ্টির প্রভুত্বই বা কত দূর ও কিরূপ হইতে পারে, হওয়া উচিত, তাহা লইয়া বহু সমস্যা প্রাচীন কাল হইতে এ পর্য্যন্ত সকল সমাজেই দেখা দিয়াছে এবং তাহার সমাধানেরও চেষ্টা হইয়াছে। ব্যষ্টির প্রকৃতিতে এমন একটা ভাব আছে, যাহাতে সমষ্টিকে অতিক্রম করিয়াও আপনার স্বার্থকে সে প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। আবার সমষ্টির ধর্ম্ম বা social policyও অনেক স্থলে ব্যষ্টির ব্যক্তিগত বৈশিষ্টকে যতদূর সম্ভব চাপিয়া রাখিতে চাহিয়াছে। ইহা লইয়া ব্যষ্টির অধিকারে ও সমষ্টিধর্ম্মের প্রভুত্বে একটা বিরোধও অনেক সময়ে দেখা দিয়াছে। ব্যষ্টির ব্যক্তিত্ব যেখানে বড় হইয়া উঠে, সমষ্টিধর্ম্মের উপরে আপনার অধিকারের মর্য্যাদা বেশী চায়,—সমষ্টি-ধর্ম্ম সেখানে শিথিল ও তুর্ব্বল হইয়া পড়ে, আপনার অধিকার পরিচালনা করিতে পারে না। আবার সমষ্টির প্রভুত্ব যেখানে অতি বড় হইয়া উঠে, ব্যষ্টির ন্যায্য অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে, ব্যষ্টির ব্যক্তিত্ব সহজে বিকাশ লাভ করিতে পারে না। ইহার একটিও মানবজীবনের পক্ষে মঙ্গলের অবস্থা নহে। উন্নত সব ব্যষ্টি লইয়াই উন্নত সমষ্টি হয়, আবার উন্নত সমষ্টির মধ্যেই উন্নত ব্যষ্টিজীবন সম্ভব হইতে পারে। মঙ্গলের জন্য ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ই উভয়ের উপর নির্ভর-শীল। ব্যষ্টির অধিকার ও সমষ্টির ধর্ম্ম উভয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য-চাই। ব্যষ্টির স্বার্থ সর্ব্বতোভাবে সমষ্টি-ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিবে, অথচ তার মধ্যে ব্যষ্টির ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট যে দিকে যতটা বিকাশ লাভ করিতে পারে, তাহারও যথাপ্রয়োজন অবসর থাকিবে, ইহাই এই সামঞ্জস্যের বড় কথা। এই সামঞ্জস্য যে সমাজে যতটা

আছে, সেই সমাজ তত শক্তিশালী, তত উন্নত হইবে। পূর্ব্বে এই গ্রন্থের প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা করা হইয়াছে, এবং ইহাও আমরা দেখিয়াছি, উন্নত মানববুদ্ধি এই সামঞ্জস্যের প্রয়োজনে সমষ্টিধর্ম্মের অনুবর্ত্তিতার সঙ্গে ব্যষ্টিধর্ম্মের কোনও বিরোধ দেখে না। বিরোধ যাহা কিছু দেখা যায়, ব্যষ্টির পার্থিব স্বার্থে এবং সমষ্টি-শক্তির অধিকারী যাঁহারা তাঁহাদের পার্থিব প্রভুত্বে। নহিলে ধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝায়, সেই দিক হইতে দেখিলে উভয়ের ধর্ম্ম পরস্পর সমঞ্জস, পরস্পরের সাপেক্ষ। একে অপরের বিরোধী নহে, নিরপেক্ষ নহে।

ইয়োরোপে এক সময়ে সমষ্টির প্রভুত্ব ব্যষ্টির অধিকারকে অতিশয় চাপিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টিশক্তির অধিকারী যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের হাতে এই শক্তির অব্যবহারও জনসাধারণের পক্ষে যারপরনাই পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। তাই সমষ্টির উপরে ব্যষ্টির ব্যক্তিত্বের দাবী লইয়া, সাম্প্রদায়িক কোনও বিশিষ্ট অধিকারের বিরুদ্ধে সর্ব্বসাধারণের সাম্যের দাবী লইয়া, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে অতি প্রবল এক জন-বিদ্রোহের অভ্যুদয় হয়। ইহার ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, সকল ক্ষেত্রে সমান প্রতিযোগিতাপরায়ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারই, বর্ত্তমান ইয়োরোপে প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং সমষ্টিজীবন তাহার অধীন হইয়া পড়িয়াছে; individualityর দাবী আগে এবং community বা societyর দাবী তার পরের কথা হইয়াছে। আর সেই যে কমিউনিটী বা সোসাইটী, তাহাও এক এক দেশের অধিবাসী ব্যষ্টিবর্গের কতকগুলি সমান অধিকার ও স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে স্বেচ্ছাকৃত একটা সমবায় মাত্র, এইরূপ একটা মতও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইহার স্বতন্ত্র একটা জীবন আছে, যাহার অখণ্ড এক অভিব্যক্তির ধারা সুদূর অতীত হইতে বহু শক্তি লইয়া বর্ত্তমানে আসিয়াছে, এবং বর্ত্তমান হইতে আরও শক্তি সঞ্চয় করিয়া ভবিষ্যতের দিকে যাইতেছে,—ব্যষ্টির একএকটি জীবন অখণ্ড

সেই সমষ্টি-জীবনের মধ্যে তারই অভিব্যক্তির ধর্ম্মের অধীন হইয়া জন্মিতেছে ও মরিতেছে,—এরূপ কোনও চিন্তার অবসরই ইহার মধ্যে থাকে না।

এরূপ অবস্থায় বর্ত্তমান ব্যষ্টিবর্গ বা বহু ব্যষ্টির স্বার্থের উপরে সমষ্টির পৃথক কোনও বড় স্বার্থ থাকিতে পারে, একথা সহজে কাহারও মনে হইবার কথা নয়। এই সব ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্যই ষ্টেট্‌রূপ একটা সমষ্টি-শক্তির প্রয়োজন মাত্র হয়। সেই ষ্টেটের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য প্রত্যেক ব্যষ্টির পক্ষে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগের প্রয়োজনও হইতে পারে এবং তার জন্য তাহাকে প্রস্তুতও থাকিতে হইবে। তা ছাড়া সমষ্টি-শক্তির আর কোনও স্বরূপ, সমষ্টিগত মঙ্গলের আর কোনও সার্থকতা আছে, তারজন্যও ব্যষ্টিকে তার স্বার্থ অনেক ত্যাগ করিয়া চলিতে হইতে পারে, এই ত্যাগের একটা দাবীই ব্যষ্টির উপরে সমষ্টিধর্ম্মের আছে, এসব কথা কেহ বড় স্বীকারই করেন না। সমষ্টি ধর্ম্মের এই দাবীকে স্বীকার না করিলে এবং জীবন তাহার নীতির পথে পরিচালিত না হইলে সমষ্টির মঙ্গলে ব্যষ্টির ব্যক্তিত্বের স্বার্থ-সঙ্কোচের একটা অভ্যাসই কাহারও মধ্যে জন্মে না, চরিত্রও সেইরূপ সাধনায় এরূপ আদর্শে গড়িয়া উঠে না। ব্যক্তিত্বের অধিকার যেই যত দাবী করুক, শক্তিতে ও জন্মগত ভাগ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বহু পার্থক্য আছে। মোটের উপর শক্তিমান্ ও ভাগ্যবান্ যাঁহাদের বলা যাইতে পারে, তাঁহাদের তুলনায় দুর্ব্বল ও দীনভাগ্য লোকের সংখ্যাও অনেক বেশী। জনসাধারণ বলিতে ইহাদেরই একরূপ বুঝায়। শক্তিমান্ ও ভাগ্যবান্ যাঁহারা, সমাজধর্ম্মের অনুরোধে ত্যাগের ও সংযমের পথে তাঁহাদের জীবনের গতি পরিচালিত না হইলে, দুর্ব্বল ও দীনভাগ্য জনগণের পক্ষে সুখস্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করা অতি কঠিন হইয়া পড়ে। এইরূপ কোনও পথে না চলিয়া সকলেই যদি যার যার শক্তিমত কেবল স্বার্থ ই খোঁজে,—কোথায় কিসে ধনাগম হইবে; তারই চেষ্টায় সকল শক্তি নিয়োগ করে,—তবে সকল ধন এবং

ধনসুলভ পার্থিব সকল সৌভাগ্য, শক্তিমান্ যাঁহারা, জন্মগত উন্নত ভাগ্যের সুযোগ যাঁহারা অতি বেশী পান, তাঁহাদের হাতেই গিয়া জমে। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও দীনভাগ্য যাহারা, তাহারা কোথাও ইঁহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। শক্তিমানের ও ভাগ্যবানের প্রবল ও সর্ব্বগ্রাসী ব্যক্তিত্বের স্বার্থ সমগ্র সমাজের উপরে অপ্রতিহত বিক্রমে প্রভুত্ব করে। সকলের সকল স্বার্থ তাহাদেরই এই স্বার্থের কঠোর কবলে গিয়া পড়ে। কমিউনিটী বা সমাজের উপরে ব্যক্তিত্বের অধিকারকে এত বড় করিয়া তোলায় বর্ত্তমান ইয়োরোপে এমনই এক অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখন আবার ইহার প্রতিক্রিয়ায় ঠিক বিপরীত এক ভাব দেখা দিতেছে। কমিউনিটী বা সমাজকে অতি বড় করিয়া, এই সমাজের বা সকলের সমান ও সমবেত স্বার্থই যাহাতে প্রধান থাকে, তার জন্য ব্যক্তিত্বের সকল স্বার্থ সকল অধিকারকে একেবারে চাপিয়া রাখিবার, ব্যক্তিত্বকেই একেবারে সমাজের মধ্যে লোপ করিয়া দিবার, চেষ্টা হইতেছে। সোসিয়ালিজমের লক্ষ্যই ইহা।

মূলতঃ সোসিয়ালিজম ও কমিউনিজম্ এই দুইটি কথার অর্থে যে এমন কোনও পার্থক্য আছে, তা নয়। কমিউনিটী ও সোসাইটী বলিতে মোটের উপর প্রায় একই বস্তু বুঝায়,—কেবল কমিউনিটী কথাটার মূলে সামান্য ধর্ম্মের অর্থাৎ সকলের পক্ষেই যাহা common বা সমান তাহার ভাবটাই প্রধান রহিয়াছে ; আর সোসাইটী কথাটার মূলে সকলের মধ্যে যে সহযোগের ধর্ম্ম ব্যতীত সমাজই হয় না, সেই ভাবটার দিকেই জোর গিয়া বেশী পড়িয়াছে। সামান্য-ধর্ম্মের দিক দিয়াই হউক, কি সহযোগিতার ধর্ম্মের দিক দিয়াই হউক, কমিউনিজম্ ও সোসিয়ালিজম্ দুই-ই চাহিতেছে, সমাজের স্বার্থের মধ্যে ব্যক্তিত্বের স্বার্থকে একেবারে লোপ করিয়া দিয়া এমন এক অবস্থা আনিতে, যাহাতে সমবেত ভাবে সকলের স্বার্থ সমান থাকে, এবং প্রতিযোগিতার কোনও অবসর না পাইয়া একমাত্র সহযোগিতার ধর্ম্মেই সকলে সকল কাজ কর্ম্ম করে।

মূল অর্থে ও শেষ লক্ষ্যে দুইটি কথার মধ্যে যাহাই সমতা থাক, ব্যবহারিক প্রয়োগে একটা বিভেদ দেখা দিয়াছে। কমিউনিজম্ বলিতে সাধারণতঃ যাবতীয় ভোগ্য বস্তুর সমবেত স্বত্বাধিকারের ও সমান ভোগাধিকারের মূল নীতিকে বুঝায় এবং সোসিয়ালিজম্ বলিতে রাষ্ট্র শক্তির আশ্রয়ে এক একটি দেশের সমগ্র সমাজকেই সেই নীতির পদ্ধতির মধ্যে আনা বুঝায়। কমিউনিজমের আদর্শ নূতন কিছু নহে। প্রাচীনকাল হইতে বরাবরই এই আদর্শের কথা এবং সমাজে ইহার প্রচলন কোনও ভাবে কিছু হইতে পারে কিনা, সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতরা তাহার আলোচনা করিয়াছেন, এবং সমাজসংস্কারাভিলাষী কর্ম্মীরাও বাস্তব জীবনে ইহার সাফল্য কতদূর হইতে পারে, তার পরীক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন। এক পারিবারিক জীবনে আংশিক ভাবে ইহার যে প্রতিষ্ঠা স্থানে স্থানে দেখা গিয়াছে, তা ছাড়া, সাধারণ জনসমাজের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র কেন্দ্রেই ইহার পরীক্ষা যাহা হইবার হইয়াছে। কিন্তু সমগ্র সমাজকে এই আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, প্রকৃত সোসিয়ালিজম বলিতে যাহা বুঝায় তাহার প্রবর্ত্তনের কোনও প্রয়াস, এযাবৎ কোথাও দেখা যায় নাই। ইহা নূতন এক সামাজিক আদর্শ, নূতন এক প্রচেষ্টা, যাহা আধুনিক ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইয়োরোপের ধনিক প্রভুত্বের বিরুদ্ধে শ্রমিক বিদ্রোহের বিশেষ একটা লক্ষ্যরূপে দেখা দিয়াছিল। তারপর ধন বৈষম্যের পীড়ন ও ধনিকপ্রভুত্বের দাসত্ব-হইতে সমগ্র সমাজকে মুক্ত করিবার ও মুক্ত রাখিবার উপযোগী একমাত্র উপায় বলিয়াই অনেকে এই আদর্শকে গ্রহণ করিয়াছেন: এবং সম্পূর্ণ না হউক কতক পরিমাণে এই আদর্শের উপযোগী বিধিব্যবস্থার প্রণয়ণে, কোনও কোনও ব্যবসায়বাণিজ্যের উপরে রাষ্ট্রশক্তির একটা নিয়ন্তৃত্ব যে অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, রাষ্ট্র-নায়কগণ প্রায় সকলেই ইহা স্বীকার করেন।

পূর্ব্বেই অনেক স্থলে বলিয়াছি, ফরাসীবিপ্লবের পর ক্রমে ইয়োরোপে প্রজা সাধারণের সমান রাষ্ট্রীয় অধিকার (equality of

political rights) স্বীকৃত হয়, এবং ষ্টেট্‌ও প্রায় সব দেশে এই অধিকার অনুসারে বহু পরিমাণে ডিমক্রাটিক বা গণতান্ত্রিক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় অধিকারের সমতা সত্ত্বেও সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, অতি ভয়ঙ্কর বৈষম্যই বরং দেখা দিয়াছে। সামাজিক সাম্য ব্যতীত এই রাষ্ট্রীয় সাম্য একেবারেই নিরর্থক। এই সামাজিক বৈষম্যের মূল কারণ হইতেছে ধন বৈষম্য, এবং এই ধন বৈষম্য দূর না করিতে পারিলে সামাজিক বৈষম্যও দূর হইতে পারে না। কিন্তু কিসে তাহা হইতে পারে? এক, যার অধিকারে যত ধন সম্পদ আছে, সব বাজেয়াপ্ত করিয়া নিয়া ষ্টেট্ সেই ধন সম্পদ সকলকে সমান ভাগ করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? দৈহিক ও মানসিক শক্তিতে ও চরিত্রের গুণে মানুষে মানুষে অশেষ বৈষম্য রহিয়াছে, এসব ত বাজেয়প্ত করিয়া নিয়া কোনও ষ্টেট্ সকলকে সমান ভাগ করিয়া দিতে পারেন না। প্রাপ্ত ধন, এইসব শক্তির ও গুণের তারতম্যে, আধিক্যে বা অভাবে, যে যেমন ব্যবহার করিবে, ফল তার তেমনই হইবে। কেহ বৃদ্ধি করিবে, কেহ ফেলিয়া রাখিবে, কেহ বা দুইদিনেই সব উড়াইয়া দিবে। আবার যে বৈষম্য, সেই বৈষম্যই দেখা দিবে।

আর কি উপায় তবে হইতে পারে? হাঁ, ধন সম্পদ সব ষ্টেট্‌কে বাজেয়াপ্ত করিয়াই নিতে হইবে, কিন্তু তারপর পৃথক্ স্বত্বস্বামিত্বের অধিকারে আবার তাহা লোকের মধ্যে সমান ভাগ করিয়া দিলেও চলিবে না। সম্পদ্ সব ষ্টেটের হাতেই থাকিবে, ষ্টেট্ই প্রয়োজন মত ব্যবস্থা করিয়া ব্যবসায়বাণিজ্য সব চালাইবেন, ষ্টেটের নির্দ্দেশে লোক সব খাটিবে, উৎপন্ন দ্রব্যাদি সব ষ্টেটের ভাণ্ডারে স্থানে স্থানে সংগৃহীত থাকিবে এবং একটা নিয়ম অনুসারে প্রজারা সব প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়া ভোগ করিবে। এই ভাবে ভোগ্য যাহার যাহা লাগে, সে তাহা পাইবে, কিন্তু পৃথক্ সম্পত্তি বলিয়া কাহারও কিছু থাকিবে না, পৃথক্‌ভাবে নিজের স্বত্বাধিকারে কেহ কোনও ব্যবসায়ও করিতে পারিবে না।

পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কোনও ব্যক্তি নহে, পৃথক্ ভাবে বহু ব্যক্তির কোনও সমবায় বা সম্প্রদায়ও নহে, ষ্টেট্ই দেশের সকল ধন-সম্পদের একমাত্র অধিকারী, সকল ব্যবসায়বাণিজ্যের একমাত্র প্রভু ও পরিচালক, ধন বিভাগের একমাত্র নিয়ন্তা ও কর্ত্তা থাকিবে, ইহাই হইল সোসিয়ালিজমের মোট কথা। এই সোসিয়ালিজমের প্রতিষ্ঠা যদি সমাজে হয়, ব্যক্তিগত পৃথক্ সম্পত্তির এবং ব্যক্তিগত পৃথক্ পৃথক্ ব্যবসায়ে সেই সম্পত্তি বৃদ্ধি করিবার অধিকার যদি কাহারও না থাকে, তবে শক্তিতে ও বুদ্ধিতে যেই যত বড় হউক, ধনগত কোনও বৈষম্য লোকের মধ্যে জন্মিতে পারিবে না,—দরিদ্রের সকল দুঃখ দূর হইবে, সকলেই সমান সুখভোগে এ পৃথিবীতে থাকিবে। মানুষের যে সাম্যের অধিকার, তাহা যেমন তার রাষ্ট্রীয় জীবনে তেমনই সামাজিক জীবনেও সার্থক হইবে।

এখন কথা হইতেছে, বিভিন্ন সব ব্যক্তি নিজেদের বুদ্ধি বলে, শ্রমে ও যত্নে যে সম্পদ অর্জ্জন বা অধিকার করিয়াছে, তাহার ভোগ-দখলে, ইচ্ছামত দানে বা অন্যরূপ ব্যবহারে ন্যায্য একটা দাবী তাহাদের আছে কিনা এবং ষ্টেট্ সেই দাবার অধিকারে তাহাদের বঞ্চিত করিতে পারেন কিনা।

স্থাবর ভূসম্পত্তি এবং অস্থাবর ব্যবসায়িক মূলধন—এই দ্বিবিধ সম্পত্তিই ধনোৎপাদনে ও সম্পদ বৃদ্ধিকল্পে লোকে প্রয়োগ করিতে পারে, এবং এ সম্বন্ধে আলোচনা যাহা কিছু, তাহা এই দ্বিবিধ সম্পদের অধিকার ও ব্যবহার সম্বন্ধেই হইয়া থাকে। ভূসম্পত্তি বা জমির উপরে ব্যক্তিগত ভাবে স্থায়ী একটা স্বত্বাধিকার অল্পবিস্তর প্রায় সকল দেশেই আছে,—এবং বংশানুক্রমিক ভাবেই এই স্বত্বাধিকার প্রায় সর্ব্বত্রই চলে। জমির উপরে এই স্বত্বাধিকার যাঁহাদের আছে এবং এই অধিকারে যাঁহারা জমিদার, তাঁহারা যে অন্য সকলের তুলনায় আর্থিক অবস্থায় বিশেষ ভাগ্যবান্ এবং পার্থিব উন্নতি লাভের অনুকূল সুযোগ যে তাঁহাদের হাতে অনেক বেশী আছে, একথা সকলকেই স্বীকার

করিতে হইবে। কিন্তু জমির উপরে এই বিশিষ্ট অধিকার, এই exclusive right, কিসে তাঁহাদের হইল? জমি কেহ সৃষ্টি করে নাই, শ্রমে অর্জ্জনও করে নাই। ইহা প্রকৃতির দান, দেশের সন্তান সকলেরই ইহার উপরে ন্যায়তঃ সমান অধিকার আছে। গোড়াতে অপেক্ষাকৃত বর্ব্বর যুগে যখন সুনীতির শৃঙ্খলা সমাজে স্থাপিত হয় নাই, 'জোর যার মুল্লুক তার' এই নিয়মে বাহুবলেই দুর্দ্দান্ত কেহ কেহ প্রচুর জমি দখল করিয়া নিয়াছিল, বাহুবলেই সেই দখল স্থায়ী ও বংশানুক্রমিক হইয়াছিল। জমির উপরে যে মালেকান স্বত্ব, তাহার মূলে রহিয়াছে অধিকাংশ স্থলেই এই জবরদস্তী। দানে কি বিক্রয়ে কি উত্তরাধিকারে— যে ভাবেই যে জমি এখন যাহার হাতে থাকুক, সকল স্বত্বই আদিম এই জবরদস্তী হইতে প্রসূত। ন্যায়সঙ্গত কোনও স্বত্বের দাবী কোনও জমির উপরে ব্যক্তিবিশেষ কাহারও থাকিতে পারে না। প্রকৃতির দান জমির উপরে দেশের লোক সকলেরই সমান অধিকার থাকিবে,— ধনোৎপাদনে জমি হইতে যে সব সহায়তা ও সুযোগ আইসে, তাহাও প্রাকৃতিক সহায়তা, প্রাকৃতিক সুযোগ, এবং দেশের সব লোক সমান ভাবেই তাহা ভোগ করিবে। জমি সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে এই যে দাবী, সোসিয়ালিজমের কথা বাদ দিয়া, সাধারণ ভাবেও তাহার বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত আপত্তির কোনও কারণ বড় দেখা যায় না। এক বলা যাইতে পারে, বহু বাদা জমি অনেকে বহু অর্থব্যয়ে ও শ্রমে আবাদ করিয়া নিয়া দখল করিয়াছেন,—এই সব জমিকে একরূপ ইঁহাদের অর্জ্জিত সম্পদই বলা যাইতে পারে। কিন্তু জমি ছিল, তার উপরেই না তাঁহারা তাঁহাদের অর্থ ও শ্রম প্রয়োগ করিয়াছেন? এই অর্থ ও শ্রমের বিনিময়ে তাঁহারা যাহা পাইতে পারেন তাহা চুকাইয়া দিলে, জমির উপরে আর কি ন্যায্য দাবী তাঁহাদের থাকিতে পারে?—সুতরাং সব জমি যদি প্রজাসাধারণের পক্ষে ষ্টেট গ্রহণ করেন, এবং সকলের সুবিধা যাহাতে হয়, এমন ভাবে তাহার প্রয়োগ কি বিলি ব্যবস্থা করেন, কোনও আপত্তি

তাহাতে চলে না। পূর্ব্বেই একস্থলে বলিয়াছি, আমাদের দেশে অতি প্রাচানকাল হইতেই ষ্টেট্ বা রাজা সকল ভূ-সম্পত্তির মালিক এবং রাজার এক নামও তাই ভূ-স্বামী। জমিদার যাঁহারা, তাঁহারা ভূমি-রাজস্ব আদায়ের জন্য রাজার বা ষ্টেটের প্রতিনিধি মাত্র। কিন্তু ইয়োরোপের বহু অঞ্চলে ভূ-সম্পত্তির মালিক জমিদারবর্গ। রাজার বা ষ্টেটের কোনও দাবী দাওয়া তাহার উপরে নাই। পূর্ব্বতন ফিউডাল (feudal) যুগে রাজার সঙ্গে জমিদারদের যাহা কিছু সম্বন্ধই থাক্, সে সব এখন আর নাই। ভূমির উপরে রাজার কোনও 'রাজস্ব' নাই, যাহা কিছু আছে তাহা 'জমিদারস্ব'। অধুনা সোসিয়ালিজমের বড় একটা দাবী এই, যে জমি সব ষ্টেটের বা নেশনের সম্পত্তি হউক। ইহাকেই nationalisation of land অর্থাৎ ব্যক্তিগত সকল ভূসম্পত্তিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা বলে। খনিজ সম্পত্তিও জমির ন্যায় প্রকৃতির দান, তাহাও এইরূপে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার কথা ইঁহারা বলেন, তবে খনি সব ব্যক্তিগত মূলধনে ও শ্রমে লোকের কাজে আসিয়াছে। জমি সম্বন্ধেও কতক পরিমাণে একথা বলা যাইতে পারে। অনেকে—যাঁহারা একেবারে চরম সোসিয়ালিষ্ট নহেন—তাঁহারা বলেন জমি ও খনি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইলে ইহাদের বর্ত্তমান মালিকদের ইহার বিনিময়ে কিছু মূল্য দেওয়া উচিত।

যে ভাবেই হউক, জমি ও খনি প্রভৃতি প্রাকৃতিক যাহা কিছু সম্পদ, সব ষ্টেটের হাতে আনিয়া জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা (policy of nationalisation of land and other natural wealth or agents of production) অনেকেই এখন ন্যায়সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। যদি তা হয়, তার পর কি হইবে? জমির চাষ আবাদ প্রভৃতি কাজকর্ম্ম কি ভাবে চলিবে? কি ভাবে চলিলে ভাল হয়? সোসিয়ালিজম অবশ্য চায়, সাক্ষাৎ ভাবে ষ্টেটের কর্ত্তৃত্বে জমির চাষ আবাদ চলিবে, উৎপন্ন শস্যফলাদি ষ্টেটের হাতে থাকিবে, ষ্টেটের

কর্ম্মচারীরাই তাহা লোকের মধ্যে একটা ব্যবস্থামত ভাগ করিয়া দিবেন। ন্যায়সঙ্গত বলিয়া জমির nationalisation বা জাতীয় সম্পদে পরিণতি যাঁহারা চান, অথচ পূরা সোসিয়ালিষ্ট নহেন, তাঁহারা বলেন,—চাষ আবাদের জন্য স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে জমি সব প্রজার মধ্যেই বিলি করিয়া দেওয়া হইবে, এবং প্রজারা নিজের কর্তৃত্বে চাষ আবাদ করিবে, নিজেরাই তার ফল ভোগ করিবে,—কেবল ষ্টেটকে তার একটা অংশ দিবে, যেমন নাকি আমাদের দেশে রাজস্ব দিবার নিয়ম আছে। ইহার কোন্ ব্যবস্থা অধিকতর সুফল প্রসব করিবে, সকল দিক হইতে সমাজের পক্ষে অধিক কল্যাণকর হইবে, সে সব পৃথক্ কথা। তবে এসব ব্যবস্থা পরে যাহাই হউক কি হওয়া সমীচীন হউক, মোটের উপর একথা বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে জমি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ যাহা কিছু দেশে আছে, সব সর্ব্বসাধারণের সমান সম্পত্তিরূপে জাতীয় শক্তির প্রতিভূ ষ্টেটের সত্বাধিকারে আসিবে বা আনা হউক—সোসিয়ালিজেমের এই যে দাবী, তার বিরুদ্ধে ন্যায়ের কি যুক্তির দিক হইতে আপত্তির কারণ বড় কিছু নাই। কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে পুরুষপরম্পরাক্রমে বহুকাল যাবৎ যে জমি যাঁহারা ভোগ দখল করিতেছেন, তাহার উৎপাদিকা শক্তি যাঁহাদের ধনে ও যত্নে বৃদ্ধি পাইয়াছে, পারিপার্শ্বিক অবস্থাদির বহু উন্নতিতে জমির কদর যাঁহারা এত বাড়াইয়াছেন যে বহু মূল্য দিয়াও লোকে তাহা পাইতে চায়, পাইলে অনেকে ভাগ্য মনে করে, ক্ষতিপূরণ বা মূল্য বাবদ তাঁহাদের ন্যায্য পাওনা যাহা হয়, তাহা ষ্টেটের দেওয়া উচিত *।

* মালিকের অর্থে ও যত্নে যেখানে জমির কদর ও মূল্য বাড়ে, সেইখানেই এই কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু বড় বড় নগরে বা ব্যবসায়িক কেন্দ্রে জমির মূল্য অনেক সময়ে বাড়ে যাহার জন্য মালিকের কোনও কৃতিত্ব নাই। বাড়ে, তাহার কারণ স্থানীয় ব্যবসায়বাণিজ্যের উন্নতি, রাষ্ট্রীয় শক্তির নূতন সংস্থান, আব-হাওয়ার পরিবর্ত্তন প্রভৃতি হেতু বহু লোক সেখানে গিয়া বাস করিতে চায়। জমির মূল্য এই সব স্থানে কখনও কখনও অত্যধিক বাড়িয়া উঠে, যেমন

যাহা হউক, জমি প্রভৃতির স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে মূল নীতি কি হইবে, তার সম্বন্ধে সোসিয়ালিষ্ট ও প্রাচীন সমাজপন্থী উভয় পক্ষের মধ্যে মতভেদ বড় একটা কিছু নাই, যাহা আছে তাহা কি ব্যবস্থায় পরে লোকে এই সব প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে খাটাইবে ও তাহার ফলভোগ করিবে, তাহা লইয়া। সমাজপদ্ধতির গুরু কোনও পরিবর্ত্তনও কেবল স্বত্বাধিকারের এই পরিবর্ত্তনে অর্থাৎ কেবল এই সব সম্পদের nationalisationএ হয় না,—যদি না কাজকর্ম্মের ও ফলভোগাদির ব্যবস্থাও সব সোসিয়ালিষ্ট আদর্শে করা হয়। তবে সোসিয়ালিষ্টরা ইহাই চান বটে।

তার পর মূলধনের কথা। সোসিয়ালিষ্টরা বলেন, যেমন জমিতে তেমনই যাবতীয় ব্যবসায়িক মূলধনে বা capitalএও ব্যক্তিগত কোনও স্বত্বাধিকার থাকিবে না, সব সমবেত ভাবে সর্ব্বসাধারণের স্বত্বাধিকারে আসিবে। ব্যবসায়িক সব মূলধন যদি সকলের সমবেত স্বত্বাধিকারে আইসে, ব্যবসায়বাণিজ্য সব কাজেই আসিবে, এবং তাহার সব কাজকর্ম্মের ও ফলভোগের ব্যবস্থাও সমবেত শক্তির কর্ত্তৃত্বে এবং সমবেত ভাবেই হইবে,—তাহাই হইতে পারে। যাহা হউক, জমি ত প্রাকৃতিক নিয়মেই সকলের সমান। তবে জমিতেও মূলধন লাগে, কৃষিও ব্যবসায়। তাহার কথা কিছু পৃথক্ করিয়া না ধরিলেও চলে। মোটের উপর যত কিছু ব্যবসায়, এবং ব্যবসায়ে মূলধন যাহা কিছু খাটে, সবই সর্ব্বসাধারণের সমবেত অধিকারে আসিবে, সমবেত কর্ত্তৃত্বে কাজকর্ম্ম সব চলিবে, সমবেত

কলিকাতায় অধুনা হইয়াছে। এই বর্দ্ধিত মূল্য সাধারণতঃ মালিকরাই পাইয়া থাকেন। ইংরাজিতে ইহাকে unearned increment অর্থাৎ অনর্জ্জিত বা অযত্নলব্ধ আয়বৃদ্ধি বলে। সোসিয়ালিষ্ট নীতি অনুসারে এই সব জমি সরকারে বাজেয়াপ্ত হউক কি না হউক, অনেকেই বলেন, এই unearned incrementএর উপরে মালিকের কোনও ন্যায্য দাবী নাই। স্থানীয় জনসমাজের পক্ষে স্থানীয় রাষ্ট্রশক্তি বা মিউনিসিপালিটীর হাতে তাহা আসা উচিত।

ভাবে সকলেই সকল ব্যবসায়ের ফল ভোগ করিবে,—অধিকারে, কর্ম্ম-পরিচালনায়, কি ভোগে প্রতিযোগিতাপরায়ণ ব্যক্তিত্বের কোনও আমল, কোনও দাবী দাওয়া, থাকিবে না। ইহাই সোসিয়ালিজমের আসল কথা, মূল কথা—Quintessence of Socialism; বিখ্যাত জর্ম্মণ সোসিয়ালিষ্ট শাফেল (Schaeffle) তাঁহার 'Quintessence of Socialism' গ্রন্থে তাই বলিয়াছেন,—

"The Alpha and Omega of Socialism is the transmutation of private competitive capital into united collective capital.

ইনি আধুনিক সেসিয়ালিজমের প্রধান গুরু—কার্ল মার্কসের বড় একজন শিষ্য এবং কার্ল মার্কসের নির্দ্দিষ্ট সোসিয়ালিষ্ট পদ্ধতির একটি নামও হইয়াছে Collectivism.

কিন্তু ইহা কি হইতে পারে? ব্যক্তিগত কর্তৃত্বাধীন সব ব্যবসায়িক সম্পদ কি সকলের সমবেত অধিকারে আসিতে পারে? কি প্রকারেই বা ইহার যথোপযুক্ত ব্যবহার চলিতে পারে?—পারে, ষ্টেট্ যদি ব্যক্তিগত সব সত্ত্বাধিকার লোপ করিয়া যাবতীয় মূলধন নিজের হাতে বাজেয়াপ্ত করিয়া নেন এবং পরে নিজের কর্তৃত্বে নিজের কর্ম্মচারীদের দ্বারা ব্যবসায় বাণিজ্য সব পরিচালনার ব্যবস্থা করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সোসিয়ালিজম্ ইহাই চায়, এই লক্ষ্যসাধনের পক্ষে ইহাই সেসিয়ালিজমের পন্থা।

কিন্তু যে সব যুক্তি দেখাইয়া যে দাবীতে ষ্টেট্ ভূমিসংক্রান্ত সব প্রাকৃতিক সম্পদ সর্ব্বসাধারণের পক্ষে নিজের হাতে নিতে পারেন, ব্যবসায়িক মূলধনও তাহাতে পারেন কিনা? এই ধন ব্যক্তিগত ভাবেই নিজ নিজ শ্রমে লোকে অর্জ্জন করিয়াছে, নিজ নিজ শ্রমে বর্দ্ধিতও করিয়াছে। ইহা হইতে এই ধনের উপরে ব্যক্তিগত যে ন্যাব্য অধিকার

* Communism and Socialism in their History and Theory—by T. D. Woolsey, chap vi. P. 105

আছে, ষ্টেট্ তাহা হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করিতে পারেন কিনা ? এই আপত্তির উত্তরে কার্ল মার্কস্ ব্যবসায়িক মূলধনের উদ্ভব সম্বন্ধে নূতন এক মতবাদ বা theoryর অবতারণা করিয়াছেন। তাহার নাম Theory of Surplus Value of Labour। ইহার সংক্ষিপ্ত কথা হইতেছে এই।—জমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বস্তুর উপরে ন্যায়তঃ সকলেরই সমান অধিকার আছে। লোকের শ্রমে এই সব বস্তু বা করণ হইতেই যাবতীয় ব্যবহার্য্য ধন উৎপন্ন হইয়াছে। প্রত্যেকের শ্রম যে ধন সংগ্রহ বা উৎপাদন করিতে পারে, সাধারণতঃ সব তাহা তাহার জীবিকার প্রয়োজনে লাগে না, কতকাংশ উদ্বৃত্ত থাকে। কতক বা জমি প্রভৃতির উপরে অন্যায় অধিকারের বলে, কতক বা অন্য বহুবিধ অন্যায় সামাজিক ব্যবস্থার ফলে, শক্তিমান্ ব্যক্তিরা শ্রমিক-দের বঞ্চিত করিয়া এই উদ্বৃত্ত অংশ আত্মসাৎ করিয়াছেন, এবং তাহাই তাঁহারা ব্যবসায়ে খাটাইয়া আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন। ক্রমে এই ভাবে বৃহৎ বৃহৎ মূলধন শক্তিমান্ ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গোড়ায় যে সব অন্যায় অধিকার সমাজ উপেক্ষা করিয়াছে, বা করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহারই ফলে যাবতীয় মূলধন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য সব শক্তিমান্ ধনিকসম্প্রদায়ের হস্তগত হইয়া পড়িয়াছে। ব্যক্তিগত মূলধন এবং সেই মূলধনের বলে ধনিকসম্প্রদায়ের উদ্ভবের নিদানই হইল এই। অন্যায় বলে ধনিকরা এই সব অধিকারলাভ করিয়া-ছিলেন, অন্যায় ভাবে এতকাল বংশ পরম্পরায় ইহার যত সুবিধা ভোগ করিয়াছেন, কোনও রূপ শ্রমব্যতীত বহু লোক এই সব অধিকারে প্রচুর বার্ষিক আয়ের মালিক হইয়া ভোগ বিলাসে তাহা ব্যয় করিতেছেন। অজস্র ব্যয় করিয়াও যেন ফুরাইতে পারিতেছেন না, এতই বিপুল এক একজন উত্তরাধিকারীরও এই আয়। অথচ প্রাণান্ত শ্রম করিয়াও শ্রমিক জনসাধারণ নিতান্ত প্রয়োজনীয় অন্নপানীয় ও বাসগৃহ পর্য্যন্তও পাইতেছে না। প্রাচীন কালে ইহাদেরই শ্রমের surplus value বা উদ্বৃত্তাংশ ছলে বলে আত্মসাৎ করিয়া ধনিক সম্প্রদায়

ধনের মালিক হইয়াছিলেন। যুগের পর যুগে এই ভাবেই তাঁহারা তাঁহাদের ধন বৃদ্ধি করিয়াছেন, এবং এখনও করিতেছেন। শ্রমিকরা বরাবরই তাহাদের শ্রমজাত ধনের পূর্ণাধিকারে বঞ্চিত রহিয়াছে, এখনও রহিতেছে। সুতরাং জনসমাজের সমবেত শক্তির প্রতিভূ যে ষ্টেট্, তাহার ন্যায্য এ অধিকার আছে, যে ধনিকদের সকল ব্যবসায়িক মূলধন ও ব্যবসায়ের সকল কর্ত্তৃত্ব নিজের হাতে নিতে পারেন, এবং এই ভাবে সকলের সমবেত অধিকারে তাহা রাখিয়া সমবেত কর্ত্তৃত্বে তাহার নিয়োগ ও পরিচালনাও করিতে পারেন।

কিন্তু একটি কথা ইহার মধ্যে ভাবিবার আছে। শ্রমিকদের শ্রমজাত ধনের উদ্বৃত্তাংশ বা surplus value যে সর্ব্বত্রই শক্তিমান্ অপর কোনও সম্প্রদায় ছলে বলে আত্মসাৎ করিয়া মূলধনের সৃষ্টি করিয়াছেন, এমন ত নাও হইতে পারে। বুদ্ধিমান্ ও মিতব্যয়ী শ্রমিকরাও অনেকে এই উদ্বৃত্তাংশ নিজেরা সঞ্চয় করিয়া মূলধন রূপে ব্যবহার করিতে পারে, এবং ক্রমে ব্যবসায়িক যোগ্যতায় সেই মূলধন বাড়িয়া এক একজন শ্রমিকই বড় বড় এক একজন ধনিক হইয়া উঠিতে পারে। এমন যে হয় ও হইয়াছে, তাহার বহু দৃষ্টান্ত সকল সমাজেই আছে। বর্ত্তমান ইয়োরোপেরও বহু এমন ব্যক্তি কর্ম্ম-কুশলতার গুণে আপন শ্রমজাত ধনেরই বলে বড় বড় মূলধনের ও ব্যবসায়ের মালিক হইয়া উঠিয়াছেন। ইঁহাদের স্বকীয় শ্রমে অর্জ্জিত স্বকীয় কর্ম্মকুশলতায় বর্দ্ধিত ধন কি বলিয়া ষ্টেট্ কাড়িয়া নিতে পারেন? তারপর ইঁহারা ইহাদের ধন স্বীয় সন্তানসন্ততিদেরও দিয়া যাইতে পারেন। কেবল নিজের সুখ নিজের গৌরবের জন্য নয়, সন্তানসন্ততিরা সুখে থাকিবে, বংশের পদগৌরব বাড়িবে, এই সব বিবেচনায়ও অনেকে ধনসঞ্চয় ও ধনবৃদ্ধি করেন। সন্তানসন্ততি এই ভাবে যে পৈতৃক ধন উত্তরাধিকার করে, তাহা কেবলই সব ঠকান ধন নহে। কি বলিয়া কোন ন্যায়সঙ্গত যুক্তিতে ষ্টেট্ এই উত্তরাধিকৃত ধনই বা গ্রহণ করিতে

পারেন ? ইহার কোনও সদুত্তর কার্ল্ মার্কস দিতে পারিয়াছেন বলিয়া জানি না। তারপর কেবল ধনই ত নয়, পিতৃপুরুষ হইতে বংশধরেরা দৈহিক রূপ, স্বাস্থ্য, বল, বহু মানসিক শক্তি ও গুণ উত্তরাধিকার করে। লোকসমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠার পক্ষে এসবের গুরুত্ব উত্তরাধিকৃত ধনের গুরুত্ব অপেক্ষা বেশী বই কম নয়। ধন কাড়িয়া নিতে পারিলেও, এ সব ত কোনও ষ্টেট্ কাহারও নিকট হইতে কাড়িয়া নিতে পারেন না ? তবে হাঁ, ইহাদের সার্থকতার বহু পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন বটে।

যাহা হউক, কার্ল্ মার্কসের surplus value of labour সম্বন্ধীয় এই যে theory, তাহা বিশেষ যুক্তিসহ না হইলেও, সোসিয়ালিষ্টরা ষ্টেটকেই সকল মূলধনের ও ব্যবসায়ের মালিক করিতে চাহিতেছেন বটে। তাঁহারা বলেন, আর্থিক অবস্থার বৈষম্য দূর করিয়া জনসমাজকে সমান সুখে রাখিবার পক্ষে ইহাই প্রয়োজন। তাহার উপরে আর কোনও যুক্তি থাকে ভাল, না থাকে নাই।

কিন্তু কেমন করিয়া তাহা হইতে পারে ? পারে, যদি ষ্টেটের সকল শক্তি, শ্রমিক জনসাধারণের বা প্রলেটারিয়েটবর্গের আয়ত্ত হয়। সোসিয়ালিষ্ট নায়কবর্গ সর্ব্বত্রই তাই চেষ্টা করিতেছেন, জাতীয় পার্লামেন্টগুলিতে যাহাতে সোসিয়ালিষ্ট মতানুবর্ত্তী শ্রমিক প্রতিনিধির সংখ্যাই বেশী হয়। সকলেই জানেন, পূর্ব্বেও দুই এক স্থলে বলিয়াছি, আধুনিক সব ডিমক্রাসীতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে সকলেরই সমান এক এক ভোট, এবং প্রলেটারিয়েট জনগণের সংখ্যা প্রত্যেক electorateএ বা নির্ব্বাচনমণ্ডলীতে এত বেশী যে তাহাদের সব ভোটের তুলনায় উচ্চতর যত সম্প্রদায়ের ভোট একেবারেই নগণ্য। ইঁহাদের অর্থ ও প্রতিপত্তির প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া প্রলেটারিয়েটরা নিজেদের স্বার্থে যদি দল বাঁধিতে পারে, তাহাদেরই মনোমত ও মতানুবর্ত্তী প্রতিনিধিতে ব্যবস্থাপরিষৎ বা পার্লামেন্ট সব প্রায় পূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। তখন ষ্টেটের সকল শক্তির উপরে তাহাদেরই কর্ত্তৃত্ব প্রধান হইবে, এবং এই

কর্ত্তৃত্বের বলে তাহারা যে সোসিয়ালিষ্ট পদ্ধতি দেশে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে না, এমন কথা বলা যায় না। *

অন্য একদিক হইতে অবস্থা আবার সব ইহারই অনুকূল হইয়া উঠিতেছে। কার্ল মার্কস্ বলেন, ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজমের স্বাভাবিক পরিণতিও এই দিকেই হইতেছে। ইহা যে কেবল বাঞ্ছনীয় তা নয়, ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজম্ আপনার আভ্যন্তরিক নীতির ক্রিয়ার ফলে আপনার পাশে আপনিই বাঁধা পড়িতেছে। লোকে ইহা সাধ করিয়া চাক্ কি না চাক্, জানত ভাবে এইরূপ কোনও চেষ্টা করুক কি না করুক, ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজমের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিই হইতেছে সোসিয়ালিজমের দিকে। কেহ ইহাকে রোধ করিয়া রাখিতে পারিবে না।

কেন ? কিসে ?

বক্তিগত ব্যবসায় এখন আর বড় চলে না, সব যৌথ মূলধনের অধিকারী সমবায়ের (Joint-stock companyর) হাতে গিয়া পড়িতেছে। ইহাদের মধ্যেও বড়র সঙ্গে প্রতিযোগিতার সংগ্রামে টিঁকিতে না পারিয়া ছোটগুলি উঠিয়া যাইতেছে ; সবই বড় বড় যৌথ মূলধনের কর্ত্তা বড় বড় সমবায়ের হাতে গিয়া পড়িতেছে। পরস্পর প্রতিযোগিতার পরিবর্ত্তে এই সমবায় গুলি আবার সমান স্বার্থে অতি ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেছে এবং তাহার ফলে এক এক দেশের একই বিধ ব্যবসায় সব আমেরিকার

*……The first step in the revolution by the working class is to raise the Proletariat to the position of a ruling class to win the battle of democracy. The proletariat will use its political supremacy to wrest by degrees all capital from the Bourgeoisie, to centralise all instruments of production in the hands of the State i.e. of the Proletariat organised as the ruling class.

[Communist Manifesto, Karl Marx.]

ট্রাষ্টের ন্যায় অতি বৃহৎ এক একটি সমবায়ের আয়ত্ত হইয়া পড়িতেছে *। এই সব সমবায়ের মধ্যেও আবার একটা সহযোগের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতেছে, এবং সমবায়গুলি রাষ্ট্রীয় ষ্টেটের মধ্যে প্রায় এক একটি ব্যবসায়িক ষ্টেটের আকারই ধারণ করিতেছে। ইহার ফলে দেশের বিচ্ছিন্ন সব মূলধন এবং পৃথক্ সব ব্যবসায় এক এক কেন্দ্রে আসিয়া জমিতেছে। দেশের যাবতীয় মূলধনের এবং ব্যবসায়ের অতি বৃহৎ এক একটা সর্ব্বগ্রাসী ও সর্ব্বব্যাপা সমবায় হইতেছে †। ওদিকে এই সব ব্যবসায়ের কেন্দ্রে দেশের যত শ্রমিক, তাহারাও আসিয়া জমায়েত হইতেছে। তাহাদের মধ্যেও এইরূপই এক একটি বৃহৎ সমবায় হইতেছে। একদিকে মূলধনের সমবায়, অপর দিকে শ্রমিকের সমবায়, সমান ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যবসায় পদ্ধতির স্বাভাবিক পরিণতিতেই এই ভাবে প্রতিযোগিতার লোপ পাইবে, সমান স্বার্থ যাহাদের যেখানে আছে, সেইখানে তাহাদের সহযোগিতাই প্রধান ধর্ম্ম হইয়া উঠিবে, এবং তাহা হইতে একদিকে এইরূপ মূলধনের সমবায় এবং অপরদিকে শ্রমিক সমবায় গঠিত হইবে। ষ্টেট্ সব ডিমক্রাটিক। সংখ্যা বলে এই সব ষ্টেট অনায়াসে শ্রমিকসমবায়ের আয়ত্ত হইতে পারে। তখন সমবেত এই মূলধন সহজেই তাহারা ষ্টেটের হাতে নিতে পারে এবং সহজেই সকল ব্যবসায় সহযোগিতার ধর্ম্মে পরিচালনা করিতে পারে। ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজমের মধ্যে যাহা এখন ব্যক্তিগত ধন বা individual capital, তাহা তখন সমবেত সামাজিক ধনে বা social capitalএ পরিণত হইবে; capitalism বা মহাজনপ্রভুত্বের যুগ উঠিয়া যাইবে; socialism বা সমবেত শ্রমিকপ্রভুত্বের যুগ আরম্ভ হইবে।

ভাল, নূতন এই যুগ আসিল, ব্যক্তিগত অধিকারে কোনও ধন-সম্পদ কোথাও আর কাহারও রহিল না। ব্যক্তিগত সব ব্যবসায়

* ৩৭৫—৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† কার্লমার্কস ইহাকে Law of Concentration of Capital বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

উঠিয়া গেল; কে কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবে, তার সম্বন্ধে কাহারও কোনও স্বাতন্ত্র্যের, মানুষে মানুষে কোনও প্রতিযোগিতার প্রয়োজন ও অবসর সবই লোপ পাইল। এই সব সম্বন্ধীয় যাহা কিছু ব্যাপার, যত কিছু কাজকর্ম্ম, সব ষ্টেটের কর্ত্তৃত্বে সমবেত অধিকারে আসিল। এখন, এই অবস্থায় ব্যবসায়াদি কাজকর্ম্ম কি ভাবে পরিচালিত হইবে, কি ভাবে লোকের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে? ব্যক্তিগতভাবে, পারিবারিক সম্বন্ধে এবং তাহা হইতে সাধারণ সামাজিক ব্যবহারে মানুষের জীবন কিরূপ সব নীতিপদ্ধতির পথে চলিবে, কি আকার ধারণ করিবে?

এ সম্বন্ধে সোসিয়ালিষ্টদের মধ্যে নানা মুনির নানা মত আছে। তবে কাল মার্কস (Karl-Marx) এর মতানুসারে তাহার প্রধান শিষ্যেরা Collectivism নামে যে জীবনপদ্ধতির (programme of lifeএর) কল্পনা করিয়াছেন, তাহাই একরূপ শ্রেষ্ঠপদ্ধতি বলিয়া আধুনিক সোসিয়ালিষ্টরা গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার মোট একটা চুম্বক দিবার চেষ্টা করিব।

অধিকার যাহা কিছু হইতে পারে, তাহা যে সর্ব্ববিষয়ে এই সমাজে নারীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সকল মানবেরই সমান থাকিবে, একথা বলাই বাহুল্য। এই সমান অধিকারে সকলের সমান ভোটে রাষ্ট্রীয় পার্লামেণ্ট গঠিত হইবে। কেবল রাষ্ট্রীয় শক্তির বা political authorityর নয়, সামাজিক সর্ব্ববিধ শক্তিরই প্রভু হইবেন এই পার্লামেণ্ট। ইহারই নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের তত্ত্বাবধানে যাবতীয় ব্যবসায়বাণিজ্যাদি কাজকর্ম্ম চলিবে। কে কি কাজ করিবে বা করিতে পারে, ইঁহারাই তাহা স্থির করিয়া দিবেন। ধন বা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যাহা কিছু উৎপন্ন হইবে তাহা স্থানে স্থানে ষ্টেটের ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকিবে। ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরা তাহা রক্ষা করিবেন, এবং নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা মত যে যাহা পাইতে পারে, তাহাকে তাহা দিবেন।

এ অবস্থায় ব্যবসায়িক বিনিময় (exchange) কিছু থাকে না।

সুতরাং মুদ্রার বা টাকা কড়িরও কোনও প্রয়োজন হয় না; তাহা কিছু থাকিবেও না। কাজকর্ম্ম যে যাহা করিবে তাহার একটা নিদর্শন পত্র তাকে দেওয়া হইবে, এবং তাহার বদলে সাধারণ ভাণ্ডার হইতে সে যাহা পাইতে পারে নিবে। এই নিদর্শনপত্রের নাম labour ticket বা শ্রম-পত্র। এখন এই শ্রমপত্র কি ভাবে কি হিসাবে লোককে দেওয়া যাইতে পারে? কে কিরূপ কাজ করিল এবং কত সময় কাজ করিল, অর্থাৎ শ্রমের গুণ ও পরিমাণ (quality ও quantity), শ্রমের মুল্য নিরূপণে এই দুইটা কথাই ভাবিতে হয়। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থার মধ্যে গুণের হিসাবে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রূপ কর্ম্মের একটা তুলনা করিয়া নিবার উপায় কি? গুণ এবং গুণের প্রকৃতি ও মাত্রা এত অশেষ রকমের আছে যে কোনওরূপ নির্দ্দিষ্ট মানদণ্ডে তাহার আপেক্ষিক মূল্য স্থির করা আদৌ সম্ভবপর হয় না। সুতরাং একমাত্র সময়ের বা শ্রমের পরিমাণের হিসাবেই তাহার মূল্য স্থির করিতে হইবে। সোসিয়ালিষ্ট নায়করাও ইহা বুঝিয়াছেন, এবং সেই হিসাবেই শ্রমের মূল্য নির্দ্ধারণের একটা ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়াছেন। যেমন ধরুন, এক এক ঘণ্টাকেই শ্রমের এক একটা নিম্নতম মান বা standard করা হইল। ভারবহা, মাটিকাটা, হালচষা, হিসাব রাখা, কারখানার কাজ দেখা, জিনিশপত্র গড়া, রোগীর চিকিৎসা, বিচার ও বিবাদ নিষ্পত্তি, শিক্ষাদান ইত্যাদি, কাজ যাহার যেমনই হউক, যে যত ঘণ্টা কাজ করিবে, তৎখানি টিকিট পাইবে। সুকুমারকলা ও কাব্যদর্শনাদি সাহিত্যের অনুশীলন প্রভৃতি কর্ম্মের কোনও মূল্যই ইঁহারা ধরেন না। এ সব খাইতে পরিতে কাহারও লাগে না। অবসর সময়ে যাহার খুসী এ সব লইয়া চিত্তবিনোদন করিতে পারে,—তার জন্য ষ্টেট্ তাহাদের কিছু বেতন দিতে বাধ্য নন। কিন্তু বিজ্ঞানানুশীলন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, এ সব কাজ? ব্যবসাবাণিজ্যের জন্যও ত এ সবের বড় প্রয়োজন আছে। মাথাও অনেক খাটাইতে হয়। ঘণ্টা হিসাবে এই সব কর্ম্মের মূল্য নিরূপণ

কি সত্যই চলিতে পারে ? পারুক না পারুক, অন্য কোনও উপায়ও ত কিছু সোসিয়ালিষ্ট মতে হইতে পারে না।

প্রত্যেক টিকিটে কোন দ্রব্য কি পরিমাণে পাওয়া যাইবে, তাহারও একটা নিরিখ থাকিবে, এবং সেই টিকিট দিয়া যে দ্রব্য যাহার যত চাই এবং প্রাপ্য হইতে পারে, সাধারণ ভাণ্ডার হইতে নিবে। এই টিকিটের বিনিময়ে যে যত ভোগ্য পাইতে পারে, ইচ্ছামত তাহার ভোগে কোনও বাধা নাই। কেহ যদি সব টিকিট খরচ না করিয়া জমাইয়া রাখে, তাহাও রাখিতে পারে। মৃত্যুকালে উইল করিয়া পুত্রকন্যাদেরও দিয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই টিকিট এই ভাবে যার হাতে যতই আসিয়া জুটুক, তাহার বিনিময়ে প্রাপ্য যে ধন, তাহা সে ভোগমাত্র করিতে পারে, বৃদ্ধিকল্পে কোনও রূপ ব্যবসায়ে তাহা খাটাইতে পারিবে না। সকলেই অবশ্য কাজ কর্ম্ম করিতে একরূপ বাধ্যই থাকিবে। কিন্তু এমনও ত হইতে পারে যে প্রয়োজনীয় কাজে সকলকেই নিয়োগ করা সম্ভব হইবে না। এখনও যেমন কাজ নাই বলিয়া অনেককে বেকার থাকিতে হয়, তখনও সেইরূপ একটা অবস্থা হইতে পারে। তবে এখন ইহারা খাইতে পায় না, যদি না ভিক্ষার দান কিছু জোটে, অথবা চুরী ডাকাতি না করে। তখন সাধারণ ভাণ্ডার হইতে ইহাদেরও খোরপোষের যেরূপ হয় একটা ব্যবস্থা থাকিবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দাম্পত্য ধর্ম্মের নিষ্ঠা এবং পারিবারিক জীবনের স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে মিল রাখিয়া কমিউনিষ্ট সমাজ তেমন চলিতে পারে না। তারপর সোসিয়ালিষ্ট ষ্টেটে ব্যবসায়িক কাজকর্ম্ম এবং ধনাধিকার সম্বন্ধে এমন কতকগুলি কঠোর নিয়মে লোককে বাধ্য হইয়া চলিতে হয়, যে পারিবারিক জীবন তার বিশিষ্ট ধর্ম্মে গড়িয়া উঠিবার অবসরই বড় পায় না। ইহার উপর, এই ভাবে ধনার্জ্জনে ও ধনাধিকারে মানবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অতি কঠোর সব বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিবার যতই প্রয়োজন হউক, সোসিয়ালিজম্ আবার ইহাও চায়, যে এই সীমার মধ্যে অন্যান্য যত কাজকর্ম্মে এবং বিষয়সম্ভোগে

নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলেই অবাধে নিজের ইচ্ছামত চলিবে। এসম্বন্ধে প্রাচীন কোনও ধর্ম্মের বা আচারপদ্ধতির কোনও বন্ধন সোসিয়ালিজম্ মানিতে প্রস্তুত নয়। প্রাচীন এই সব নীতি ও রীতি প্রাচীন সব সমাজের সঙ্গেই এক সূত্রে জড়িত, তাহারই সঙ্গে গড়িয়া উঠিয়াছে; তাহারই আশ্রয় হইয়া, অথবা তাহাকেই আশ্রয় করিয়া, রহিয়াছে। সেই সমাজই যদি লোপ পাইল, এ সবও সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই লোপ পাইবে। পাইতে না চায়, লোপ করিয়া দিতে হইবে। থাকিলে ইহাদের প্রভাব নূতন এই সমাজকে ক্রমে পুরাতনের দিকে টানিয়া নিতে পারে। নূতনের মধ্যেই অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে পুরাতন আবার মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে। নারী পুরুষের যে সম্বন্ধ এবং দাম্পত্য ধর্ম্মের যে সব নীতির উপরে পারিবারিক জীবন গড়িয়া উঠে ও উঠিতে পারে, তাহাই যে সমাজ লোপ করিয়া ফেলিতে চায়, সে সমাজে বিবাহ, দাম্পত্যধর্ম্ম এবং সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক জীবনও ক্রমে সব লুপ্ত না হইয়াই পারে না। একদিকে যেমন বিবাহ ও পারিবারিক জীবন সোসিয়ালিজমের পক্ষে অনুকূল নহে, তেমনই অপর দিকে আবার সোসিয়ালিষ্ট নীতিপদ্ধতিও দাম্পত্যধর্ম্ম এবং পারিবারিক জীবনের পক্ষে অনুকূল নহে। সোসিয়ালিষ্ট নায়কগণ তাহা বুঝেন, এবং পারিবারিক জীবনের পক্ষপাতীও তাঁহারা নহেন। তবে এ সব বিষয়ে নরনারীর স্বাধীনতার পথে তাঁহারা বাদী হইতে চান না। যাহাদের ইচ্ছা হয়, বিবাহ করিতে পারে। করিয়া যতদিন খুসী একনিষ্ঠ দাম্পত্যের সম্বন্ধে একত্র বাস করিতে পারে। কিন্তু তাঁহারা জানেন, যে এ অবস্থায় বিবাহ করিয়া দাম্পত্য ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া বেশী লোক চলিবে না, এবং তাহা তাঁহাদের অভিপ্রেতও নয় বটে।

এখন নরনারী সকলেই যদি সমান ভাবে জীবিকার জন্য কাজকর্ম্ম করে, দাম্পত্য ধর্ম্ম ও পারিবারিক জীবন যদি একেবারে উঠিয়া যায় বা অতিশয় শিথিল হইয়া পড়ে, তবে শিশুসন্তানদের পালন ও শিক্ষার কি উপায় হইবে? কে তাহাদের ভার গ্রহণ করিবে? বার্দ্ধক্যে বা রোগে

যারা কাজে অক্ষম হইয়া পড়িবে, তাহাদেরই বা প্রতিপালন কে করিবে? ছেলেপিলেদের যেখানে পিতামাতার উপরে কোন দাবী নাই, পিতামাতারও ছেলেপিলেদের উপরে কোনও দাবী সেখানে থাকিতে পারে না।

এ সম্বন্ধে সোসিয়ালিষ্ট পদ্ধতির ব্যবস্থা এই, যে দেশের যত শিশু ও বালকবালিকা সব ষ্টেটের হাতে থাকিবে, স্থানে স্থানে সাধারণ নার্সারী (public nursery) বা শিশু-পালনাগার এবং বোর্ডিংস্কুলের মত সাধারণ বিদ্যালয় (public residential schools and colleges) থাকিবে। ষ্টেটের নিযুক্ত ধাত্রীরা এবং শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীরা ইহাদের লালনপালন ও শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন। শিক্ষার ব্যবস্থাও এইরূপ হইবে যে এক পদার্থবিজ্ঞান ও সোসিয়ালিষ্ট নীতিমূলক সাহিত্য ব্যতীত আর কিছু কেহ না শিখিতে পারে। এই ভাবে শৈশব, বাল্য ও কৈশোর সকলের কাটিবে। তারপর যৌবনে যখন কাজকর্ম্মের যোগ্য মানুষ হইবে, তখন নারী পুরুষ সকলে ষ্টেটের ব্যবস্থিত ব্যবসায়াদির মধ্যে কাজকর্ম্ম করিবে, এবং অবসর সময় যার যে পথে ভাল লাগে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিবে। এইরূপ একটা অবস্থা সোসিয়ালিষ্ট ষ্টেটে অবশম্ভাবী ত বটেই,—তা ছাড়া, সোসিয়ালিষ্টরা ইহা বাঞ্ছনীয়ই মনে করেন। শৈশবাবধি বালকবালিকারা যদি এই ভাবে প্রতিপালিত হয় ও শিক্ষা লাভ করে, পারিবারিক সম্বন্ধের কোনও আকর্ষণ, কোনও মমতা, তাহাদের মধ্যে জন্মিতে পারিবে না। একেবারে খাঁটি সোসিয়ালিষ্ট ধাতুর মানুষ হইয়া সকলে উঠিবে।

তারপর বুড়া বুড়ীদের কথা। পারিবারিক জীবন যদি উঠিয়া যায়, পিতা মাতার সঙ্গে সন্তানসন্ততির স্বাভাবিক স্নেহমমতার সম্বন্ধ যদি না থাকে, বার্দ্ধক্যে বা রোগে কোন পিতার বা মাতার সন্তানের উপরে কি দাবী দাওয়া থাকিতে পারে? কে কাহার জনকজননী, তাহার পরিচয় একটা থাকাই এ অবস্থায় সর্ব্বদা সম্ভব হয় না। সুতরাং যত দিন সমর্থ থাকিবে, সকলেই কাজ করিবে, তারপর বার্দ্ধক্যে বা রোগে

অক্ষম হইলে ষ্টেটই তাহাদের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিবেন। তাহাদের জন্যও সরকারী সব গৃহ বা আশ্রম থাকিবে; সেইখানে সরকারী কর্ম্মচারীদের তত্ত্বাবধানে তাহাদের ব্যবস্থা মত খাইয়া পড়িয়া তাহারা জীবনযাপন করিবে।

রাজকর বা tax বলিয়া সোসিয়ালিষ্ট ষ্টেটের কোনও আয় থাকিতে পারে না। যাহা কিছু আয়, সব ব্যবসায়বাণিজ্যাদি কাজ-কর্ম্ম হইতেই আসিবে। এই আয় হইতে ভবিষ্যতে ব্যবসায়াদি চালাইবার জন্য প্রয়োজনীয় মুলধন বাবদ বড় এক ভাগ পৃথক্ করিয়া রাখিতে হইবে। তারপর যাহা থাকে তাহা—(১) বালক বালিকাদের লালনপালনে ও শিক্ষাদানে (২) রুগ্ন ও বৃদ্ধদের প্রতিপালনে (৩) ষ্টেটরক্ষা ও পরিচালনার প্রয়োজনে এবং (৪) সাধারণ ব্যবসায়িক কর্ম্মে নিযুক্ত শ্রমিকগণের বেতনে যথা-প্রয়োজন ব্যয় করা হইবে। সোসিয়ালিষ্টরা মনে করেন, ধন যাহা ভাবে এইরূপ ব্যবস্থায় উৎপন্ন হইবে, সব ব্যয় সচ্ছন্দে তাহাতে চলিয়া যাইতে পারে।

কিন্তু এত বড় গুরু দায়িত্ব লইয়া, এই ভাবে সব কাজের বিলি-ব্যবস্থা করিয়া এই ষ্টেট্ কাহারা চালাইবে? কেবল ত ব্যবসায়বাণিজ্য চালান নয়, ধনভাগ করিয়া দেওয়া নয়, যথাযোগ্য লোক বাছিয়া নিয়াও কাজের ভার দিতে হইবে! স্বর্গ হইতে দেবতারা ত সব নামিয়া আসিবেন না! সাধারণ সব মানুষের হাতেই এই সব দায়িত্বের ভার থাকিবে। তাহারা ঠিক মত সব চালাইতে পারিবে ত? শক্তির অপব্যবহার করিবে না ত? লোক বাছিতে ভুল করিবে না ত? যদি করে, তখন কি হইবে? ষ্টেটের হাতে অধুনা যে সব কর্ম্মের ভার রহিয়াছে, তাহাই আশানুরূপ ভাবে চলে না। সোসিয়ালিষ্ট সমাজের এত কাজ চলিবে কি? অযোগ্য লোকের হাতে গুরু দায়িত্বের কাজ পড়িয়া তাহাদের শৈথিল্যে বা অক্ষমতায় বড় এক একটা অমঙ্গল যদি ঘটে? ভাবিবার কথা বটে।

এইরূপ একটা সমাজ বা রাষ্ট্র একেবারে অদ্ভুত, অস্বাভাবিক ও অসম্ভব একটা কল্পনা বলিয়াই লোকের মনে হইবে। মানব-জীবনের যত কিছু আদর্শ এ যাবৎ মানবসমাজে উত্তম, সুনীতি-সঙ্গত ও কল্যাণকর বলিয়া সর্ব্বত্র সকলে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার কিছুই ইহার মধ্যে থাকে না। স্বাভাবিক যে সব স্নেহমমতা ও শ্রদ্ধা-ভক্তির আকর্ষণে মানুষ মানুষের সঙ্গে মিলিয়া থাকে এবং থাকিয়া সুখী ও পরিতৃপ্ত হয়, জীবনের একটা পরম চরিতার্থতাই যাহাতে অনুভব করে, কিছুরই বিকাশের বা ক্রিয়ার কোনও অবসর এ অবস্থায় কেহ পাইতে পারে না। অনেকেরই মনে হইবে, যদি এমন একটা অবস্থা সম্ভবই হয়, এইরূপ কঠোর ও নীরস একটানা এক ঘানির যন্ত্রে বাঁধা জীবনযাপন করা অপেক্ষা একদিনে সব মরিয়া যাওয়াও বুঝি ভাল!

কিন্তু কাল মার্কস ও তাঁহার শিষ্যেরা এরূপ মনে করেন না। তাঁহারা বলেন, আভ্যন্তরিক আর্থিক অবস্থার ও ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনে সমাজ যখন এই আকার ধারণ করিবে, লোকের মতি গতি ও বুদ্ধি ইহারই অনুকুল হইয়া উঠিবে এবং এই আদর্শ ই লোকে উত্তম বলিয়া গ্রহণ করিবে, এই নীতিতেই অভ্যস্ত সকলে হইয়া উঠিবে।

সামাজিক অভিব্যক্তি সম্বন্ধে কাল মার্কসের মত এইরূপ। যুগে যুগে সমাজ কি আকার ধারণ করিবে, মানবের জীবনযাত্রার রীতিপদ্ধতি, সব কিরূপে হইবে, তাহা একমাত্র তাহার অভ্যান্তরিক বৈষয়িক অবস্থার (material conditionsএর) উপরেই নির্ভর করে। এই বৈষয়িক অবস্থার স্বরূপতা ব্যবসায়িক বা বৃত্তিসম্বন্ধীয় কর্ম্মপদ্ধতির, বা economic systemsএর আকারে দেখা দেয়। রাষ্ট্রীয় বিধি ব্যবস্থা, ধর্ম্মনীতি, চিন্তার গতি, তত্ত্ববিদ্যার সিদ্ধান্ত, সব ইহারই ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া, ইহারই আদর্শানুরূপ ধারায়, পরিচালিত হয়। ব্যক্তিগত বৈষয়িক স্বত্বাধিকারের ভিত্তির উপরে প্রাচীন সব সমাজের ব্যবসায়িক কর্ম্ম-পদ্ধতি (econmic systems) গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং সামাজিক

জীবনের নীতিপদ্ধতিও সব তাহারই অনুরূপ হইয়াছিল। প্রাচীন সেই সব সমাজের রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম্মনীতি, চরিত্রের আদর্শ, এমন কি চিন্তার ও বিদ্যার বিশিষ্ট প্রকৃতি পর্য্যন্ত এই নীতিপদ্ধতিরই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। এখন বৈষয়িক অধিকারে ও ব্যবস্থায় সমাজ যখন সোসিয়ালিষ্ট স্বরূপতাই ধারণ করিতেছে, নীতিপদ্ধতিরও তদনুরূপ পরিবর্ত্তন অবশ্যই ঘটিয়া উঠিবে। রাষ্ট্রনীতি ইহারই অনুসরণ করিবে। চরিত্রের আদর্শ ইহারই অনুরূপ হইবে। লোকের মতি গতি ও চিন্তা ইহারই পথে পরিচালিত হইবে। বিদ্যার সব সাধনা ইহারই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করিবে। শিক্ষার দীক্ষার প্রভাবে এবং কর্ম্মের অভ্যাসে এই পথই সকলের সহজ ও সচ্ছন্দ জীবনের পথ হইবে, এবং এই অবস্থাকেই সুসঙ্গত স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া সকলে অনুভব করিবে। এখন লোকের মন রহিয়াছে একেবারে পুরাতনের পথে; তাই এই নূতনকে একেবারে অদ্ভুত ও অসম্ভব বলিয়া তাহারা মনে করে। যখন এই নূতন সত্য হইবে, মন এই নূতনের পথেই যাইবে,—নূতনকেই সত্য বলিয়া, জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, বলিয়া সকলে গ্রহণ করিবে।

কিন্তু করিবে কি? এই নূতন কি বাস্তবিকই কখনও সত্য হইতে পারে? মানব সমাজ, সমাজনীতি, মানবের ধর্ম্ম, মানবের চিন্তা, তত্ত্ববিদ্যার সিদ্ধান্ত, সবই কি কেবল সাময়িক বৈষয়িক অবস্থা ও তদনুযায়ী ব্যবসায়িক কর্ম্মপদ্ধতির উপরেই নির্ভর করে? বৈষয়িক অবস্থা ও ব্যবস্থা যখন যেরূপই হউক, তাহাই কি মানবজীবনের সর্ব্বস্ব? ইহা ব্যতীত, ইহার উপরে কি ব্যষ্টিভাবে ও সমষ্টিভাবে মানবের কোনও সনাতন ধর্ম্ম নাই, যাহাকে ধরিয়া মানবজীবন ধ্রুব এক লক্ষ্যের দিকে যুগে যুগে অভিব্যক্ত হইতেছে, যাহাতে তাহার পরম চরিতার্থতা লাভ হইবে, যাহার কাছে সাময়িক আর্থিক অবস্থা ও বৈষয়িক ব্যবস্থা একেবারেই একটা অতি তুচ্ছ অসার বস্তু?

এই সত্যকে অস্বীকার করিয়াই সোসিয়ালিষ্টরা যত প্রমাদ করিয়াছেন। মানুষ সব সমান এবং একমাত্র আর্থিক অবস্থার ও

বিষয় ভোগের সমতাতেই সেই সাম্যের দাবী সার্থক হইবে, ইহাই সত্য বলিয়া ধরিয়া নিয়া, ইহার প্রয়োজনে, মানবধর্ম্ম, মানবের অধিকার ও সুখের আশ্রয় বলিতে আর কিছু বুঝায়, স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি সমূহের যে স্ফূর্ত্তি ও চরিতার্থতার তৃপ্তি মানুষ চায় এবং যাহা ব্যতীত জীবন তার একেবারে পঙ্গু হইয়া পড়ে, সব সোসিয়ালিষ্ট-নায়কবর্গ বলি দিতে চাহিতেছেন। সম্পদ ভোগে ও কর্ম্মে ব্যক্তিগত ন্যায্য অধিকার বজায় রাখিয়াও, এমন ব্যবস্থাও যে হইতে পারে, যাহাতে বিশেষ কোনও এক সম্প্রদায় অত্যধিক পার্থিব শক্তি অধিকার করিয়া অপর সকল সম্প্রদায়কে একেবারে চাপিয়া রাখিতে পারে না,—মানুষে মানুষে স্বাভাবিক যে বৈষম্য আছে, সেই বৈষম্যকে স্বীকার করিয়া নিয়াও, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এমন একটা শক্তির ও অধিকারের সামঞ্জস্য মানবসমাজে সম্ভব হইতে পারে, যাহাতে গুণকর্ম্মে বড় যারা তাহাদের সঙ্গে ছোটরা ঠিক সমান না হইলেও যথা-যোগ্য স্থানে স্বস্তিতে ও সুখে স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে,—অস্বাভাবিক সাম্যের মোহে বিভ্রান্ত সোসিয়ালিষ্টরা তাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। পরে দেখিব, স্বাভাবিক এই বৈষম্য ও বিষম অধিকারে শ্রেণীবিভাগ সত্ত্বেও হিন্দুসমাজপদ্ধতিতে এই সামঞ্জস্য (এই balance of the varied social interests and forces) রক্ষিত হইয়াছিল। তাই অতি ধনী এবং ধনবলে ব্যবসায়িক কি রাষ্ট্রীয় সকল শক্তির অধিকারী হইয়া কোনও এক সম্প্রদায় অপর সকল সম্প্রদায়কে এরূপ দুর্গতির অবস্থায় আনিয়া ফেলিতে পারে নাই। তাই সোসিয়ালিজমের মত এত বড় একটা সমাজবিপ্লবের কোনও কল্পনাও এদেশে কখনও হয় নাই। কিন্তু নবীন র‍্যাসনালিষ্টিক্ ইয়োরোপ ধর্ম্মাশ্রিত প্রাচীন হিন্দুসমাজ-নীতির মধ্যে সামাজিক সমস্যার কোনও সমাধানের সূত্র খুঁজিবেন, এরূপ আশা করা যায় না। তা যায় না; কিন্তু সোসিয়ালিষ্ট-ইয়োরোপকে ঠিক র‍্যাসনালিষ্ট বলা যায় কি? র‍্যাসনালিজমের

সাম্যবাদ সোসিয়ালিষ্টরা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার—যাহা র‍্যাসনালিজমের সব চেয়ে বড় কথা, মূল কথা, সাম্যবাদ যাহারই একটা বিশেষ দিক মাত্র—সাম্যের খাতিরে সেই স্বাধীনতার অধিকারকেই তাঁহারা এত দূর চাপিয়া রাখিতে চান, যাহা শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের অধীন প্রাচীন কোনও সমাজেও কেহ কখনও চায় নাই। আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি, সোসিয়ালিজমের এই গতি, এই প্রচেষ্টা, র‍্যাসনালিজমের একটা প্রতিক্রিয়ার ফল। তবে ইহার মধ্যে একটি কথা আমাদের বুঝিতে হইবে এই যে র‍্যাসনালিষ্ট মতানুযায়ী ব্যক্তিত্বের যে সব অধিকার বর্ত্তমান এই ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল যুগের এবং তাহাতে যে ধন বৈষম্যের ও ধনিকপ্রভুত্বের সৃষ্টি করিয়াছে, এই প্রতিক্রিয়া তাহারই বিরুদ্ধে মাত্র প্রকাশ পাইয়াছে। তাই সোসায়ালিজম চায়, ধনার্জ্জনে ও ধনাধিকারে সকলকে সোসিয়ালিষ্ট পদ্ধতির অনুবর্ত্তী হইয়া থাকিতে হইবে, আর এই পদ্ধতির বিরুদ্ধ কোনও মত প্রচার করিয়া ইহার ক্ষতি কেহ কিছু করিতে পারিবে না, সুতরাং দেশের সাহিত্য ও শিক্ষা কেবল মাত্র ইহারই মতানুবর্ত্তী হইয়া চলিবে,—অর্থাৎ এই পদ্ধতিকে প্রতিষ্ঠা করিতে এবং ইহার শক্তিকে অব্যাহত রাখিতে যতদিকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারকে যতটা খর্ব্ব করিয়া রাখিবার প্রয়োজন হয়, তাহা অবশ্যই করিতে হইবে। তা ছাড়া, অন্যান্য বিষয়ে অর্থাৎ এই সীমার মধ্যে থাকিয়া পার্থিব বিষয়াদির সম্ভোগে, কিছু পূর্ব্বেও বলিয়াছি, নরনারীনির্ব্বিশেষে বয়ঃপ্রাপ্ত মানব মাত্রই একেবারে র‍্যাসনালিষ্ট আদর্শেই চলিতে পারে। ধর্ম্ম (religion) সম্বন্ধেও, যেমন র‍্যাসনালিজম, তেমন সোসিয়ালিজমও, সমান নাস্তিক্য মতবাদী। র‍্যাসনালিজম বরং এ সম্বন্ধে মানবের একটা স্বাধীনতার অধিকারকে স্বীকার করেন। কেহ যদি আপন বুদ্ধিতে ভাল বুঝিয়া স্বেচ্ছায় প্রাচীন কোনও শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মমতের অনুসরণ করে, করিতে পারে। কিন্তু সোসিয়ালিজম ধর্ম্মকে একেবারে লোপ করিয়া ফেলিতেই চায়।

কেন ?

যে কমিউনিজম্ সোসিয়ালিজমের প্রধান লক্ষ্য, মূল লক্ষ্য বলিলেও হয়, তাহার সঙ্গে ধর্ম্মের বাস্তবিক কোনও বিরোধ নাই। কোনও কোনও ধর্ম্মপ্রাণ খৃষ্টীয় যাজক খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের নীতির উপরেও একরূপ সোসিয়ালিষ্ট বা কমিউনিষ্ট সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাস্তবিক যে কমিউনিজম্ সোসিয়ালিষ্টরা চাহেন, তাহা ধর্ম্মবিশ্বাসীর এই প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে যতটা সম্ভব হইতে পারে, ষ্টেটের শাসনে তাহা পারে না। কিন্তু তবু আধুনিক সোসিয়ালিজম্ যে নাস্তিকী বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া উঠিয়াছে, তাহার বড় একটি কারণ এই যে, নাস্তিক র‍্যাসনালিজম্ প্রথম হইতেই লোকের ধর্ম্মবিশ্বাসকে ক্ষীণ করিয়া ফেলিয়াছে। তারপর ধর্ম্ম বলিতে ইয়োরোপে সাধারণতঃ চার্চ্চ-শাসিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মকেই বুঝায়। এই চার্চ্চ প্রাচীন সমাজপদ্ধতিরই একটি অঙ্গ এবং তাহার বড় একটি আশ্রয়ও বটে। প্রাচীন রাষ্ট্র-পদ্ধতির সঙ্গেও চার্চ্চ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং চার্চ্চের শিক্ষা ও শাসন জন সাধারণকে প্রাচীন সমাজ পদ্ধতির ও রাষ্ট্র পদ্ধতির অনুগত করিয়া রাখিতে চায়। তাই সোসিয়ালিষ্টরা মনে করেন, চার্চ্চকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সকল প্রভাবকে লোপ করিয়া ফেলিতে না পারিলে, প্রাচীন সমাজকে ও রাষ্ট্রকে ভাঙ্গিয়া নূতন সোসিয়ালিস্ট পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। *

---

* "The decay of religious life, the decay of religious faith, proceeding from the efforts of the early rationalists to take as much of the supernatural as was possible from the Scriptures—these causes acted in the church, and in the minds of its teachers and preachers, until many from among the people began to think that the church was only the police of the state, set up to keep the lower classes in order."

[Communism and Socialism in their History and Theory, T. D. Woolsey, Chap VII—sec II, p. 249.]

র‍্যাসনালিষ্ট মত স্বভাবতঃই শিক্ষিত ও উন্নতশীল উচ্চতর সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরাই আগে গ্রহণ করেন এবং তাহার প্রভাবে তাঁহাদের মধ্যেই আগে ধর্ম্মবিশ্বাস ও শ্রদ্ধায় ধর্ম্মনীতির অনুসরণ ও

"The hope of a satisfying success of the socialistic revolution is a visionary Utopia, as long, as we neglect to root out the superstition in a God, by a general and thorough enlightenment of the people."

[Quoted from the works of Boruttau, a German Socialist, in Communism & Socialism in their History and Theory by T. D. Woolsey, ch. VII—sec II, p. 247.]

"It is a new view of the world, which in the department of religion expresses itself as atheism ; in that of politics, as republicanism, in that of economy as communism." (ibid)

"Socialism, as it is apparent, is through and through irreligious and hostile to the church. Socialists pronounce the church to be a police institution in the hands of capital and that it cheats the proletarian by 'bills of exchange in Heaven'. It deserves to perish." [Schaffle's Quintessence of Sociatlism, quoted in Communism and Socialism in their History and Theory, T. D. Woolsey—chap VI, sec II, pp. 223-24.]

ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলের দিকে লক্ষ্য করিয়া টি. ডি, উলসী সাহেব নিজে এক স্থলে বলিয়াছেন—

"Thus, because the earth is an empty temple and Christ has left his throne there is nothing of value save what the man of toil can cluch and handle. The material world alone survives the ruins of faith and is all the more precious. So the social leaders teach, so the follwers believe, that the good time coming is to be a relief of material inequalities and discomforts with some elevation of the taste and intellegence of the proletarait, but expect nothing from the powers of religion."

[Communism and Socialism in their History and Theory T. D. Woolsey—chap VI, sec II, p. 267.]

ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি সম্পাদনের প্রবৃত্তি লোপ পায়। সমাজনেতৃত্ব ও রাষ্ট্রশাসনের কর্ত্তৃত্ব ইঁহাদেরই হাতে। বর্ত্তমান সমাজপদ্ধতি ও রাষ্ট্রপদ্ধতি বজায় না থাকিলে এই নেতৃত্ব ও কর্ত্তৃত্ব ইঁহাদের থাকে না। জনসাধারণকে এই পদ্ধতির অনুগত রাখিবার পক্ষে ধর্ম্ম ও চার্চ্চের বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠা যে অত্যাবশ্যক, ইহা তাঁহারা বুঝেন এবং তাই নিজেরা বিশ্বাস হারাইয়াও ইহার এই প্রতিষ্ঠাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চান। কাহারও পারমার্থিক কল্যাণের জন্য নয়, কেবল শ্রমিক জনসাধারণকে নিজেদের প্রভুত্বের অধীনতায় চাপিয়া রাখিবার জন্যই সমাজনায়ক ও রাষ্ট্রনায়কগণ ধর্ম্মের ও চার্চ্চের পোষকতা করেন, এইরূপ ধারণাও তাই ইহাদের মধ্যে জন্মিয়াছে, এবং সোসিয়ালিষ্ট নায়কবর্গও এই সব কথা প্রচার করিয়া এই ধারণা তাহাদের চিত্তে আরও বদ্ধমূল করিয়াছেন,—এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহা ধর্ম্মের বিরুদ্ধে এবং উচ্চতর শ্রেণীর বিরুদ্ধে নূতন একটা বিদ্বেষেরও হেতু হইয়াছে। *

ফ্রান্স ও জার্ম্মাণী এই দুইটি দেশই সোসিয়ালিজম্ প্রভৃতি মতের বড় দুইটি কেন্দ্র। র‍্যাসনলিজমের আদিপীঠ ফ্রান্সে যে এই নাস্তিকী বুদ্ধির প্রভাব অতিশয় বেশী হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। কেহ কেহ বলেন, প্রসিদ্ধ জর্ম্মান দার্শনিক হেগেলের প্রচারিত বৈদান্তিক অদ্বৈত-বাদ (Pantheistic doctrines of Hegelian Philosophy), জর্ম্মাণীর শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ধর্ম্ম বিশ্বাসের ভিত্তিকে

* "Nor was it unnatural for the working class to think that the rulers and the upper class considered religion as the tie to hold the country together and the restraining force to keep them quiet, without putting faith in it themselves. So thinking, the working class could not but become disbelieving and despise the upper class for its hypocricy.

[Communism and Socialism in their History and Theory chap. VII, sec II, p. 249.]

একেবারে শিথিল করিয়া ফেলিবার প্রধান হেতু হইয়াছে। ইওরোপে প্রচলিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সঙ্গে বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ ঠিক মিলিয়া চলিতে বোধ হয় পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া বেদান্ত দর্শন নাস্তিকতারই সৃষ্টি করিবে, ইহা কেমন কথা! ভারতীয় হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে বেদান্তদর্শন ও তাহার ব্রহ্মবাদের প্রভাবই সর্ব্বপ্রধান। বৈদান্তিক ও ব্রহ্মবাদী হিন্দু ত নাস্তিক হইতে পারে নাই। বরং বহু দেবদেবীর পূজামূলক তান্ত্রিক যে উপাসনাপদ্ধতি বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের প্রধান উপাসনাপদ্ধতি হইয়াছে, তাহা এই বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদের ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই সব সাধনার মধ্য দিয়া ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হওয়াই এই পদ্ধতির লক্ষ্য। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম কি এই ব্রহ্মবাদের সঙ্গে আপনাকে মিলাইয়া নিতে পারিত না? কিন্তু পারে নাই। কারণ যেরূপ সাধক ও গুরু এই সব তত্ত্ব প্রচারের অধিকারী, যেরূপ শিষ্য ইহা শ্রবণের ও মননের অধিকারী, সেরূপ গুরু কি শিষ্য জর্ম্মাণ ভূমিতে আবির্ভূত হন নাই; ইঁহাদের আবির্ভাবের অনুকুল ক্ষেত্রও জর্ম্মাণীতে প্রস্তুত হয় নাই। তাই এই অমৃতে সেখানে বিষ উঠিয়াছে—যদি হেগেলের দর্শন সত্যই জর্ম্মাণ নাস্তিকতার কারণ হয়।

যাহা হউক, পাশ্চাত্যে র‍্যাসনালিষ্ট কি ভারতীয় বৈদান্তিক বা Pantheistic, যে মতের প্রভাবেই হউক, জর্ম্মান শিক্ষিত সমাজের নাস্তিকতাই কার্ল মার্কসের সোসিয়ালিজম্‌কে যে এই নাস্তিক ভাবে ভাবাপন্ন করিয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে। ফ্রান্সের ত কথাই নাই।

সোসিয়লিষ্ট ষ্টেটের কল্পনা ধীরবুদ্ধি ও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রের কাছেই অসম্ভব একটা কল্পনা বলিয়া মনে হইবে। যদি এ কল্পনা বাস্তবতায় কোথাও পরিণত হয়, তাহা যে জনসমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে না, ইহাও ধীরবুদ্ধি ও চিন্তাশীল সকলে স্বীকার করিবেন। অতিগৃধ্নু ও অত্যাচারী উচ্চতর শ্রেণীর বিরুদ্ধে ন্যায্য সুখভোগে বঞ্চিত ও

উৎপীড়িত জনসাধারণের প্রচণ্ড একটা বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার উত্তেজনা ব্যতীত কোনও ন্যায়ধর্ম্ম যে ইহার মূলে নাই, একথাও অস্বীকার করা যায় না। সোসিয়ালিষ্ট নায়করাও তাহা অস্বীকারও বড় করেন না।

সোসিয়ালিজম্ সম্ভব কি না, মানব জীবনের পক্ষে কল্যাণকর কি না, ইহার কোনও পরীক্ষাও এ পর্য্যন্ত হয় নাই।

এক রুষিয়ার বোলশেভিক্ নায়কগণ সেই দেশে ইহার প্রতিষ্ঠার একটা চেষ্টা করিয়াছেন। গত যুদ্ধের শেষভাগে রুষিয়ায় যে বড় একটা রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে, তাহা সকলেই জানেন। এই বিপ্লবের মধ্যে লেনিন্ ও ট্রট্স্কী প্রমুখ সোসিয়ালিষ্ট নায়কগণ রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করেন। দুইটি দল তখন দেশে হয়,—একদলের নাম হয় বোল্শেভিক্ বা মেজরিটীর দল, অপর দলের নাম হয় মেন্শেভিক বা মাইনরিটীর দল। লেনিন ও ট্রট্স্কী প্রমুখ নায়কগণ এই বোলশেভিক দলের নায়ক ছিলেন। অশেষ রকম বলে, ছলে ও কূটকৌশলে মেন্শেভিক দলকে পরাভূত করিয়া, বোলশেভিক দলই দেশের প্রভু হইয়া উঠেন, এবং এই প্রভুশক্তির যথেচ্ছব্যবহারে চার্চ্চ ও যাজক-সম্প্রদায়, এবং শিক্ষিত ও উচ্চতর অন্যান্য সকল সম্প্রদায়কে একেবারে উচ্ছেদ করিয়া ফেলিয়া স্থানে স্থানে শ্রমিকবর্গের কমিটির হাতে শাসনভার ন্যস্ত করেন। এই সব কমিটির নামই সোভিয়েট (Soviet.) কার্ল মার্কসের সোসিয়ালিষ্ট পদ্ধতির আদর্শেই এই সোভিয়েট শাসনতন্ত্র রচিত হয়, এবং সৈন্যবলে ও আরও যত রকম জোর জবরদস্তী হইতে পারে, তাহার সাহায্যে দেশের সর্ব্বসাধারণকে এই শাসনে বাধ্য করা হয়। সুতরাং রুষ বোলশেভিজম্ আর কিছুই নয়, বড় একটা বিপ্লবের বিশৃঙ্খলার মধ্যে অসাধারণ শক্তিমান্ কতিপয় নায়কের নেতৃত্বাধীন বিশিষ্ট এক দলের চেষ্টায় দেশে সোসিয়ালিষ্ট শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। এই নায়কদের মধ্যে লেনিনই ছিলেন শক্তিতে ও প্রতিভায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কাজেই এই শাসন লেনিনেরই একরূপ একাধিকৃত বা autocratic শাসন হইয়া উঠে। এই দলের নায়ক

কাজেই রুষিয়ার এই সোসিয়ালিজম্ বোলশেভিজম্ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। দেশের জনমতকে সোসিয়ালিষ্ট আদর্শের অনুকূল করিয়া, ক্রমে সেই জনমতের প্রভাবে দেশের পার্লামেণ্ট দখল করিয়া, পার্লামেণ্টের আইনে এই পদ্ধতিকে প্রতিষ্ঠা করিবার দিকেই সাধারণতঃ সোসিয়ালিষ্টের লক্ষ্য। কিন্তু রুষিয়ায় এরূপ কোনও অবসর ঘটে নাই; এরূপ কোনও পার্লামেণ্ট বা কৌন্সিলও ছিল না। বিপ্লবের সুযোগে দেশের সামরিক শক্তি দখল করিয়া অতি শক্তিমান্ সোসিয়ালিষ্ট নায়ক লেনিন ও তাঁহার সহযোগিগণ, সেই শক্তির বলে প্রতিদ্বন্দ্বী যাহারা যে ভাবে হইতে পারে নির্ম্মম ভাবে সকলের উচ্ছেদ সাধন করিয়া, সোসিয়ালিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এই শাসনের বলে সোসিয়ালিষ্ট নীতি যতটা যেখানে চলিতে পারে, তাই মাত্র চলিতেছে। অনুকূল জনমত স্বেচ্ছায় এই পদ্ধতিকে গ্রহণ করে নাই, এ অবস্থায় করিতে পারেও না। তাই প্রকৃতপক্ষে সোসিয়ালিষ্ট সমাজ বলিতে যাহা বুঝায়, ঠিক তেমন একটা বস্তু রুষ দেশে স্থায়ী কোনও ভিত্তির উপরে বসিতে পারে নাই। রক্তবর্ণ চিহ্নধারী বলিয়া রুষিয়ার এই বোলশেভিক সেনার নাম হইয়াছে, রক্তসেনা বা Red army. এই বিপ্লবকেও অনেকে 'রক্ত বিপ্লব' বা The Red Revolution বলিয়া থাকেন। বহু রক্তপাতে এই বিপ্লবের লক্ষ্য সাধন করা হইয়াছে এবং নূতন এই পদ্ধতিকে রক্ষা করিতেও বহু রক্তপাতের প্রয়োজন হইয়াছে। ইহাতেও এই নামের কতকটা সার্থকতা হইয়াছে, বলিতে হইবে।

রুষিয়ার বোলশেভিক শাসন সম্বন্ধে অনেক কথাই শোনা যায়। কেহ কেহ বলেন, ইহার কঠোর ও নির্ম্মম যথেচ্ছাচার রুষবাসী প্রজাবৃন্দকে দুর্ব্বিসহ একটা দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, লোকের সকল রকম স্বাধীনতা ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা একেবারে লুপ্ত হইয়াছে; ব্যবসায়-বাণিজ্য সব বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে, অশন বসন ও বাসস্থানাদির

অভাবে অগণ্য লোক পথে পথে ফিরিতেছে, যেখানে সেখানে পড়িয়া মরিতেছে। তার উপরে আবার বোলশেভিক্ মতের সমর্থন যাঁহারা করেন না. কোনওরূপ বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করেন বলিয়া সন্দেহও যাঁহাদের উপরে হয়, তাঁহাদের দমনের জন্য যে সব উপায় অবলম্বন করা হয়, তার তুলনায় পূর্ব্বকার 'জার' (Czar) আমলের পীড়নও অনেক ভাল ছিল। অন্য অনেকে আবার বলেন, ও সব বাজে কথা; বোলশেভিক বিপ্লববাদকে, বোলশেভিক শাসনকে, জগতের কাছে হেয় করিবার উদ্দেশ্যে এ সব শত্রুপক্ষের মিথ্যা কলঙ্কপ্রচার। বোলশেভিক আমলে দুঃখী প্রজাবর্গ যেরূপ সুখে শান্তিতে আছে, এরূপ পূর্ব্বে কেহ কখনও আর রুষিয়ায় ছিল না, অন্যান্য অনেক দেশেও নাই।

অবশ্য বর্ত্তমান সোভিয়েট শাসন দেশের মধ্যে শান্তির শৃঙ্খলা রক্ষায় অসমর্থ অথবা দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে অতি কঠোর একটা যথেচ্ছ পীড়নের যন্ত্র নাও হইতে পারে: জনসাধারণের সুখস্বচ্ছন্দতার দিকে হয়ত ইহার সর্তক একটা দৃষ্টি এবং আন্তরিক প্রয়াসও আছে। এ সম্বন্ধে যাহা কিছু নিন্দাবাদ শোনা যায়, তাহা অতিরঞ্জিত বা বহুপরিমাণে কল্পিতও হইতে পারে। কিন্তু কয়েকটি কঠোর সত্যকেও অস্বীকার করা যায় না। বোলশেভিক্ শাসনের নায়ক এবং বোলশেভিক্-বাদের প্রচারকদের উক্তি হইতেই তাহার প্রমাণ হয়। সেই সত্যগুলি এই—

(১) কোনও রুষ পার্লামেণ্টে বৈধ বা constitutional পন্থায় গৃহীত আইনের বলে নয়, প্রচণ্ড একটা রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে অস্ত্রবলে এবং আরও বহু প্রকার জবরদস্তা চালে বোলশোভিক নায়কগণ রুষ সমাজের উচ্চতর ও শিক্ষিত সম্প্রদায় সমূহকে একেবারে উচ্ছেদ করিয়া দেশে কমিউনিষ্ট বা সোসিয়ালিষ্ট-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে রক্তপাতের ও লোকের স্বাধীন মত প্রকাশের সকল সুযোগ বন্ধ করিবার প্রয়োজন যখন যেরূপ হইয়াছে, যে ভাবেই হউক, তাহা করিতে ইহারা এইটুকুও দ্বিধা কখনও করেন নাই। কতক হত্যায়,

কতক অনুরূপ তাড়নায়, কতক বা দেশ ত্যাগে, রুষিয়া হইতে পূর্ব্বতন রুষ পণ্ডিতমণ্ডলী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় (the intellectuals or the intelle-gentsia) একরূপ লুপ্ত হইয়াছে।

(২) খৃষ্টীয় ধর্ম্মকে ও ধর্ম্মমণ্ডলীর যাজকবৃন্দকেও এইরূপ বল-প্রয়োগে বিধ্বস্ত করা হইয়াছে। রুষিয়ার ধর্ম্মমন্দির (churches) এবং মঠ (monasteries) গুলি কোনটা শ্রমিকদের শিল্পকারখানায়, কোনটা সৈনিকদের প্রমোদাগারে, কোনওটা বা সাধারণ 'রেস্তরাঁ'য় বা হোটেলে পরিণত করা হইয়াছে।

দেশের সব লোক একাকার এক শ্রমিক সমাজভুক্ত হইবে, উচ্চ নীচ পদপর্য্যায়ে কোনও শ্রেণীবিভাগ থাকিবে না—ইহাই সোসিয়ালিষ্ট-দের বড় একটা লক্ষ্য। বাদী হইলে উচ্চতর সম্প্রদায়কে, যে ভাবে হউক, একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াও এই লক্ষ্যসাধনের চেষ্টা তাঁহারা করিতে পারেন। তারপর পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সোসিয়ালিষ্টরা কেবল যে নাস্তিক তাহা নহেন, ইয়োরোপায় খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ও ধর্ম্মমণ্ডলীকে তাঁহাদের শত্রুপক্ষ বুর্জ্জোয়স শক্তির বড় একটা সহায় ও মিত্র বলিয়াও মনে করেন। সুতরাং ধর্ম্মমণ্ডলীকেও উচ্ছেদ করিয়া ধর্ম্মের সকল প্রতিষ্ঠানকে একেবারে পদদলিত করিয়া ফেলিবার এরূপ আগ্রহও তাঁহাদের হইতে পারে। কিন্তু সকলের বড় কথা এই যে এত করিয়াও যে কমিউনিষ্টিক সমাজ বা সোসিয়ালিজম তাঁহাদের মূল লক্ষ্য, রুষ বোলশেভিজম্ তাহার প্রতিষ্ঠা দেশে করিতে পারিতেছেন না। রুষিয়া কৃষিপ্রধান দেশ। বহু কঠোর শাসনেও কৃষকবর্গকে তাঁহারা সোসিয়ালিজমের আমলে আনিতে পারেন নাই; তাহাদের অধিকৃত ক্ষেত্রে এবং শ্রমজাত ধনে ব্যক্তিগত স্বত্বস্বামিত্বের দাবী স্বীকার করিয়া নিতে বাধ্য হইতেছেন। অন্যান্য ব্যবসায়েও private capital বা ব্যক্তিগত মূলধনের অধিকার ক্রমে অনেক স্থলে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। নহিলে দেশের ব্যবসায়বাণিজ্য কিছুই চলে না, অন্নাভাবে এবং ব্যবসায়িক বিশৃঙ্খলায় দেশ উৎসন্ন যায়। তবে

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সোভিয়েট্ শাসন চলিতেছে, দেশের শান্তি রক্ষার পক্ষে, রাষ্ট্রীয় স্থিতির পক্ষে, হয়ত ভালই চলিতেছে। সুতরাং civic ও political অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দিক হইতে বোলশেভিক্ বিপ্লবের একটা সাফল্যকে যদিও স্বীকার করিয়া নেওয়া যায়, মূল লক্ষ্য সোসিয়ালিজমের দিক হইতে এ বিপ্লব ব্যর্থ হইয়াছে বলিতেই হইবে।

(ষ্টেট সোসিয়ালিজম্)

এই গেল খাঁটি সোসিয়ালিজমের কথা। সোসিয়ালিজমের আদর্শই এই। আর এক রকম মত আছে, তাহা 'ষ্টেট সোসিয়ালিজম্' (State-Socialism) নামে পরিচিত। সকল ব্যবসায়বাণিজ্যাদি পরিচালনায় ধনীর যে অবাধ অধিকার রহিয়াছে, শ্রমিক নিয়োগ ও চুক্তির ব্যবহার প্রভৃতি ব্যবসায়িক সকল কাজকর্ম্ম যে একেবারে 'চাহিদা যোগানের', কড়ানিয়মের অনুসারে চলে, এবং তাহারই ফলে যে দরিদ্র ও দুর্ব্বল শ্রমিক, প্রবল ধনী মহাজনের সঙ্গে যুঝিয়া আপনাদের স্বার্থ রক্ষা করিতে না পারিয়া, যারপরনাই দুর্গতির অবস্থায় গিয়া পড়িয়াছে, এ কথা পূর্ব্বে বহু আলোচনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ষ্টেটের বিধিব্যবস্থা ব্যতীত এই দুর্গতি হইতে ইহাদের রক্ষা করিবার আর কোনও উপায় অধুনা নাই। বহু পূর্ব্বেই সহৃদয় জননায়কগণ ষ্টেটের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন, এবং তাহারই ফলে নানারূপ Factory Laws বা ব্যবসায়িক আইন করিয়া ইংলণ্ডপ্রমুখ অনেক দেশেরই ষ্টেট্ শ্রমিকদের স্বার্থসংরক্ষণ ও দুর্গতিপ্রশমনের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ইহাও যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতেছে না। তাই অনেকে বলেন, ভূ-সম্পত্তি প্রভৃতির স্বত্বাধিকার এবং বৃহৎ মূলধনসাপেক্ষ বড় বড় যে সব ব্যবসায় এখন জমিদার ও বড় বড় মহাজন সমিতির (joint stock company বা

corporation এর) হাতে রহিয়াছে, তাহা সব প্রজাসাধারণের পক্ষে ষ্টেটের নিজের হাতে গ্রহণ করা উচিত। ব্যক্তিগত স্বত্বে অধিকৃত সব জমি, অনধিকৃত বড় বড় পতিত জমির আবাদ ও বিলিব্যবস্থা (land-dewolopment), খনির কাজ, রেলওয়ে প্রভৃতির পরিচালনা, এই ভাবে অবিলম্বেং জমিদার ও মহাজন-সমিতির হাত হইতে ষ্টেটের স্বকীয় অধিকারে গ্রহণ কবা উচিত। ক্রমে অন্যান্য বড় ব্যবসায়ও ষ্টেট, যখন যাহা সুব্যবস্থায় চালাইতে পারেন, নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারেন। যতদূর সম্ভব কম বেতন দিয়া বেশী খাটাইয়া নিব, লাভের অঙ্ক যত বাড়াইতে পারি সেই চেষ্টা করিব, মহাজনদের ন্যায় এরূপ অভিপ্রায় বা চেষ্টা ষ্টেটের থাকিতে পারে না। আগে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিক যাহারা কাজকর্ম্ম করিবে, তাহাদের সুখ স্বচ্ছন্দতা, তারপর লাভের কথা। লাভ কিছু থাকে ভাল, না থাকে নাই। যাহা থাকিবে, তাহাও ষ্টেটের সম্পত্তি হইবে এবং সেই পরিমাণে দরিদ্রের কর ভার লঘু হইবে। না হয়, বহু লোকহিতকব কর্ম্মের স্থাপনা এই অর্থে ষ্টেট্ করিতে পারিবেন। ভূমিরাজস্বও সব ষ্টেটের হাতে আসিবে, অন্যবিধ কর তাহাতেও অনেক কমিবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত সর্ব্ববিধ ব্যবসায় একেবারে লোপ না করিয়া, শ্রমিক জনসাধারণের কল্যাণকল্পে ভূ সম্পত্তি ও বৃহৎ মূলধন সাপেক্ষ বড় বড় ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ এবং যথাসম্ভব তাহাদের পরিচালনার ভার ষ্টেটের স্বকীয় অধিকারে গ্রহণ—ইহারই সাধারণ নাম 'ষ্টেট্-সোসিয়ালিজম্'। ইহা ব্যতীত, অনেকে বলেন, অতি ধনী যাঁহারা তাঁহাদের নিকট হইতে নানারূপ বড় বড় কর আদায় করিয়া দরিদ্রের কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে তাহা ব্যয় করিবার ব্যবস্থা করিলেও ষ্টেট্-সোসিয়ালিজমের লক্ষ্য অনেকটা সাধিত হইবে। ব্যবসায় বাণিজ্যের মধ্য দিয়াই হউক, অথবা অন্য যে উপায়েই হউক, দুর্ব্বল ও দরিদ্র শ্রমিক জনসাধারণকে ধনীর প্রতিযোগিতাসঙ্কুল কেবল নিজেদের ভাগ্যের উপরে ফেলিয়া না রাখিয়া, তাহাদের স্বার্থরক্ষা ও সুখস্বচ্ছন্দতার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যোন্নতি,

সুশিক্ষার প্রবর্ত্তনে তাহাদের মনঃশক্তির বিকাশ ও চরিত্রের উন্নয়ন যে সমাজশক্তির বড় একটি ধর্ম্ম, ইহা বলাই বাহুল্য। ষ্টেট্ ব্যতীত সমাজ-শক্তির প্রতিভূ বর্ত্তমান্ ইয়োরোপে আর কিছু নাই। সুতরাং ষ্টেটকেই এখন এই ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। কিন্তু ষ্টেট্ এই ক্ষেত্রে যাহা কিছু করিতে পারেন আইনের বলে লোককে বাধ্য করিয়া। উন্নত-ধর্ম্মবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া স্বেচ্ছায় না করিলে ধনবান্ ও শক্তিমান্ ব্যক্তিবর্গকে এতখানি পার্থিব স্বার্থত্যাগে কেবল আইনের বলে বাধ্য করা কত দূর সম্ভব হইতে পারে, জানিনা। যাহা হউক, নীতির বিচারের দিক হইতে খাঁটি সোসিয়ালিজমের বিরুদ্ধে যতই আপত্তির কারণ থাক, ষ্টেট্-সোসিয়ালিজমের বিরুদ্ধে আপত্তির কারণ তেমন কিছু পাওয়া যায় না। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ অনেকেই এই ষ্টেট্-সোসিয়ালিজমের প্রতি এখন আকৃষ্ট হইতেছেন এবং রাষ্ট্রীয পদ্ধতিতে ইহার নীতি যেখানে যতদূর সম্ভব গ্রহণ করিতেও চেষ্টা করিতেছেন। সোসিয়ালিজমের সঙ্গে প্রাচীন সমাজপদ্ধতির মাঝামাঝি একটা রফা প্রয়োজন, নহিলে বিপ্লব হইতে সমাজকে রক্ষা করা যায় না, এইরূপ বুঝিয়াও হয়ত অনেকে এই মতের অনুবর্ত্তী হইতেছেন। কিন্তু সোসিয়ালিষ্ট নায়কগণ এ রফা চাহেন না,—ষ্টেট-সোসিয়ালিজমের বিরোধী তাঁহারা। তাঁহারা বলেন, খাঁটি সোসিয়ালিজমের গতিরোধ করিবার জন্য ইহা বুর্জ্জোয়িসদের একটা ছল মাত্র। যাহা হউক, সোসিয়ালিজম্ বলিয়া যাহা কিছু মানবসমাজে চলিতে পারে, তাহা এই ষ্টেট-সোসিয়ালিজম্।

অনেকে বলিয়া থাকেন, আগের দিনই বেশ ছিল। বিজ্ঞান আর কলকারখানাই পৃথিবীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে। কিন্তু কথাটা বড় ভুল। বিদ্যা লোকের সর্ব্বনাশ করে না। করে তার অপপ্রয়োগ; এ ক্ষেত্রে তাহাই করিয়াছে। মানুষ কেবল হাতে যে সময়ে যত কাজ করিতে পারে, যন্ত্রের সাহায্যে তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প সময়ে অনেক বেশী কাজ করিতে পারে। অনেক কাজ আছে, যাহা, যেরূপই

হউক, কোন যন্ত্র ব্যতীত হয়ই না। যন্ত্র মানুষের কাজের বড় সহায়, তাই অতি প্রাচীন কাল হইতেই যন্ত্রের ব্যবহার মানুষ করিয়া আসিয়াছে। কিছু কাটিতে কি মাটি খুঁড়িতে দা কুড়াল ছুরী খন্তা কোদালি লাগে; চাষের কাজে লাঙ্গল মই কাস্তে লাগে; ধান ভানিতে ডাল ভাঙ্গিতে ঢেঁকী লাগে, যাঁতা লাগে; সূতা কাটিতে চরকা লাগে, কাপড় বুনিতে তাঁত লাগে, কাপড় সেলাই করিতে সূঁচ লাগে। এ সবই যন্ত্র, যদিও অতি সহজ ও আদিম যন্ত্র। এসব তৈয়ারী করিতে বা কিনিয়া নিতে পয়সাও লাগে। যার পয়সা নাই সে পারে না। বিদ্যা ও বিজ্ঞানের উন্নতিতে যে সব উন্নত যন্ত্রের আবিষ্কার আধুনিক যুগে হইয়াছে, তাহাকে সাধারণতঃ আমরা 'কল' বলি। জলীয় বাষ্প, তৈলবাষ্প তাড়িত শক্তি প্রভৃতির সাহায্যেও এই সব যন্ত্র চালাইবার প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। হাত অপেক্ষা এই সব শক্তির সাহায্যে বড় বড় কল চালাইয়া কাজ করাও অনেক সহজ। অনেক অল্প শ্রমে অনেক বেশী কাজ হয়। মানবের উন্নতবুদ্ধি ও উন্নত বিদ্যা হইতে প্রসূত শ্রমলাঘবকর এই সব উন্নত প্রণালী, মানবের অন্যবিধ সুখস্বচ্ছন্দতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যত বেশী অবলম্বন করা সম্ভব, তাহা করায় মানবসমাজের মঙ্গল বই অমঙ্গল হইতে পারে না। অমঙ্গল যে ঘটে ও ঘটিয়াছে, তাহার কারণ এই সব উন্নত প্রণালী ধনিক সম্প্রদায়ের আয়ত্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহারা কেবল তাঁহাদেরই স্বার্থে সব নিয়োগ করিতেছেন, দরিদ্র জনসাধারণ এসব উন্নতির ফলভোগী হইতে পারিতেছে না। উন্নত বিদ্যাবুদ্ধি, সমবায় গঠন, কর্ম্মস্থাপনার শক্তি এবং বহু ধন ব্যতীত এসব উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী ব্যবসায়ে কেহ প্রয়োগ করিতে পারে না। দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে কেবল ধনের নয়, এই সব গুণেরও বড় অভাব। তাই স্বতন্ত্র ভাবে বা সমবেত ভাবে নিজেদের চেষ্টায় তাহারা উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোনও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিয়া পরিচালনা করিতে পারে নাই, পারাও সম্ভব

নয়। সামান্য প্রয়াস যেখানে যাহা কিছু হইয়াছে, সফল বড় হয় নাই। *

সুতরাং শ্রমিক জনসাধারণের হিতার্থে একমাত্র ষ্টেটই এইরূপ বড় বড় ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিতে পারেন, এবং ষ্টেটেরই তাহা করা উচিত। নতুবা ব্যবসায়ে উন্নতবিজ্ঞানের প্রয়োগে দরিদ্রের শ্রমলাঘবও হয় না, সুখস্বচ্ছন্দতাও কিছু বাড়ে না। শ্রমলাঘবতা কেবল বেকারের দলই বাড়াইয়া তোলে; উৎপন্ন ধন ধনীর ভাণ্ডারে যায়, দরিদ্রকে তার ব্যবসায়িক দাসত্বে বাঁধিবার সুযোগ আরও বাড়াইয়া দেয়।

* ধনীর কারখানায় কেবল মুজুরী না করিয়া শ্রমিকরা নিজেদের চেষ্টায় ব্যবসায় বণিজ্য করিয়া অবস্থার উন্নতি করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে ব্যবসায়-স্থাপনার নূতন এক উপায় কিছুকাল পূর্ব্বে (উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে) উদ্ভাবিত হয়। ইহা সাধারণতঃ co-operation or co-operative system অর্থাৎ সমবায় নীতি বা প্রথা নামে পরিচিত। শ্রমিকরা যতজনে সম্ভব একত্র মিলিয়া নিজেদের মধ্যে কিছু কিছু করিয়া টাকা তুলিয়া তাহার দ্বারা নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদনের বা সরবরাহের ব্যবস্থা করিবে। যত বেশী লোক এই ভাবে সমবেত হইতে পারিবে, যত বেশী মূলধন হইবে, ব্যবসায়ও অবশ্য তত বড় হইবে; তারপর একটা বন্দোবস্ত করিয়া নিজেরাই কাজ করিবে। মূল ধনের অংশ সকলের সমান থাকিবে, সামান্য ব্যতিক্রম কিছু অনুমোদিত হইলেও অধিকার সকলের সমান থাকিবে। নিজেদের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি তাহারা এই সব কারখানা বা দোকান হইতে নগদ মূল্যে কিনিয়া নিবে, আর কোথাও হইতে কিনিবে না। লাভ যাহা হয়, যে যে পরিমাণে জিনিশ কিনিবে, সেই অনুসারে ভাগ হইবে, ইত্যাদি। মূলধনী, কর্ম্মী ও খরিদদার সকল পক্ষের এইরূপ সমবায় বা co-operation হেতু এইরূপ প্রণালীর নাম হইয়াছে, co-op rative system বা সমবায় প্রথা। কিন্তু এক co-operative stores অর্থাৎ কেনাবেচার দোকান ব্যতীত বড় রকম কোনও উৎপাদনের কাজে এই চেষ্টা সফল হয় নাই। কারণ এরূপ ভাবের কোনও ব্যবসায় স্থাপনা ও পরিচালনার মত যোগ্যতা সাধারণ শ্রমিকদের নাই। অধিক মূলধন সংগ্রহ হইতে পারে, এত বড় কোনও সমবায়ও সহজে তাহারা গঠন করিতে পারে না।

কিন্তু তাই বলিয়া আবার সব রকম ব্যবসায়ই ষ্টেটের নিজের হাতে নিলে চলিবে না। তাহাতে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সমাজে স্বতন্ত্র গৃহস্থজীবন, তাহার সুখ স্বচ্ছন্দতা ও মধুর বৈচিত্র—সব একেবারে লোপ পায়; চরম সোসিয়ালিজমের মত একটা অবস্থাই আসিয়া দাঁড়ায়। তাই ষ্টেট-সোসিয়ালিজমের পক্ষপাতী যাঁহারা, তাঁহারা এমন সব ব্যবসায়ই মাত্র ষ্টেটের হাতে আনিতে চান, যাহা ব্যক্তিগত ভাবে সাধারণ গৃহস্থেরা করিতে পারে না, অথচ আধুনিক যুগ-সভ্যতায় যাহার প্রয়োজন সর্ব্বত্রই সকলের হইয়াছে। রেলওয়ে, খনি, কঠিন ও জটিল সব কল নির্ম্মাণ প্রভৃতির কাজকর্ম্ম ইহাদের মধ্যে পড়ে। *

এই স্থলে, প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে ইংলণ্ডের শ্রমিক দল এইরূপ ষ্টেট-সোসিয়ালিজমেরই পক্ষপাতী; খাঁটি সোসিয়ালিজম বলিতে যাহা বুঝায় তাহা তাঁহারা চাহেন না।

যাহা হউক, ষ্টেট-সোসিয়ালিজম যদি চলে, ইয়োরোপীয় বর্ত্তমান সামাজিক সঙ্কটসমস্যার অনেকটা সমাধান হইতে পারে বলিয়া ভরসা হয়। কিন্তু ইহার প্রয়োজন বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়কগণ যেরূপ অনুভব করিয়াছেন, স্বার্থান্ধ ধনিক কি বিদ্বেষাবিষ্ট শ্রমিক কোনও পক্ষই তেমন বুঝিতেছেন না। তাই ইহার প্রবর্ত্তনে সামাজিক শান্তির সম্ভাবনা যে খুব বেশী তা মনে হয় না।

* আমাদের দেশেও আমরা দেখিতে পাই, রেলওয়ে সব প্রথম কিছুকাল এক এক কোম্পানীর হাতে থাকে, শেষে রাজ সরকার বা ষ্টেট তাহা নিজের হাতে গ্রহণ করেন। ইহার প্রথম পত্তন কিছু কঠিন কাজ, এবং তাহা অভিজ্ঞ ব্যবসায়িক সমিতির হাতে থাকিলেই ভাল হয়। তাঁহারা যে ধন ও শ্রম ইহাতে প্রয়োগ করেন, তাহার উপযুক্ত লাভ উঠিয়া গেলে ষ্টেট্ সব আপন অধিকারে গ্রহণ করিতে পারেন; প্রথম বন্দোবস্তই এইরূপ হয়। এই যে প্রথা, ইহাও ষ্টেট্-সোসিয়ালিজম নীতির অনুগত।

৬। এনার্কিজম্ (অরাজক সমাজ-তন্ত্র)

সোসিয়ালিষ্ট পদ্ধতির মধ্যে বুদ্ধির প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তি যাহার যতই থাক, 'আমার' বলিয়া পার্থিব সম্পদ কেহ কিছু দাবী করিতে পারে না। আপন স্ত্রী পুত্র পরিজনাদিকে পার্থিব ভাগ্যে উন্নত করিবার কোনও অধিকারও কাহারও কিছু থাকে না। নিজের শক্তি ও রুচি অনুসারে জীবনের পথ বাছিয়া নিয়া সেই পথে চলিবার, আকাঙ্ক্ষিত উন্নতি লাভে ধন্য ও পরিতৃপ্ত হইবার, কোনও অবসর কেহ পায় না, সেদিকে আগ্রহও কাহারও কিছু থাকে না। ষ্টেটের হাতে এক একটি যন্ত্রের ন্যায় সকলকে কাজ কর্ম্ম করিতে হয়, এবং সেই ষ্টেটেরই কড়া নিয়মে ভোগ্য যাহার যাহা জোটে তাহাই তাহাকে বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হয়। আর্থিক সমতার প্রতিষ্ঠা যতই সম্ভব হউক, মানবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উন্নত কোনও অধিকার এ অবস্থায় কিছুই একরূপ থাকে না। বর্ত্তমান এই সমাজপদ্ধতির মধ্যে অতি দীনহীন ব্যক্তিও 'আমি একজন' বলিয়া আপন ব্যক্তিত্বের যেটুকু মহিমা অনুভব করিতে পারে, 'আমার' বলিয়া অতি যৎসামান্যও যাহা কিছু দাবী করিতে পারে, সোসিয়ালিষ্ট পদ্ধতির মধ্যে অতি উন্নতবুদ্ধি ও শক্তিমান্ ব্যক্তিরাও তাহা পারেন না। ষ্টেটের হাতে এত বেশী ক্ষমতা গিয়া পড়ে, যে তাহার পরিচালক কর্ম্মচারীবৃন্দ, ষ্টেট্ বলিতেই যাহাদের বুঝায় তাঁহারা, এই ক্ষমতার অপব্যবহারে লোকের উপরে বহু পীড়নের অবসর পাইতে পারেন। তারপর ষ্টেটের হাতে বর্ত্তমানে শাসন রক্ষণাদি সংস্পৃষ্ট যে সব কর্ম্মের ভার রহিয়াছে, তাহাই যে সব যথোচিত ভাবে নির্ব্বাহ হইতেছে, এ কথা সাহস করিয়া কেহই বলিতে পারেন না। অবিরত কত ত্রুটিবিচ্যুতি ও অভাব-অভিযোগের কথা শোনা যায়। ইহার উপর আবার যদি ব্যবসায়-বাণিজ্যাদি প্রভৃতি অন্যান্য যে সব কাজ ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র অধিকারে এখন আছে, তাহাও যদি ষ্টেট্ নিজের হাতে গ্রহণ করেন, তবে সুশৃঙ্খলায় তাহা চালাইবার সামর্থ্য ষ্টেটের কোথা হইতে আসিবে? তাই

কমিউনিষ্টদের মধ্যে অন্য একদল আছেন, যাহারা সোসিয়ালিজমের একেবারে বিরোধী। ইঁহারা ষ্টেট বলিয়া কোনও রূপ প্রভুশক্তিকেই সমাজের উপরে রাখিতে চান না। সমাজের উপরে ষ্টেট রূপ কোনও Archy বা রাজ অর্থাৎ রাজশক্তির শাসন থাকিবেনা, তাই এই মতবাদের নামই হইয়াছে 'এনার্কিজম' (Anarchism) বা অরাজক সমাজবাদ *।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিলেই তাহা লইয়া বিবাদবিসম্বাদ হয়, তাহার রক্ষণাবেক্ষণের আবশ্যকতা হয়। প্রবল কেহ দুর্ব্বলের ধন কাড়িয়া নিতে না পারে, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হয়। কোনও না কোনও রূপ archy বা রাজশাসন ব্যতীত এসব চলে না। তাই এনার্কিষ্টরা সাধারণতঃ সকলেই প্রায় কমিউনিষ্ট ; কমিউনিজম ব্যতীত এনার্কিজম চলে না। এই মতকে কেহ কেহ এনার্কিষ্ট-কমিউনিজমও বলিয়া থাকেন। সোসিয়ালিষ্টরা সমাজে কমিউনিষ্ট নীতির প্রতিষ্ঠা করিতে চান, সকল মানুষকে রাষ্ট্রীয় প্রভুশক্তির বলে বাধ্য করিয়া। আর এনার্কিষ্টরা ভরসা করেন, ষ্টেটকে তুলিয়া দিতে পারিলে ষ্টেট-সম্বন্ধীয় পরম্পরাগত যে সব সংস্কার (traditional ideas) লোকের চিত্তকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা দূর করিয়া ফেলিতে পারিলে, আপনা হইতেই এমন এক অবস্থা আসিবে, অথবা আনা সহজ হইবে, যাহাতে সকলেই, যদৃচ্ছাক্রমে চলিয়াও, নির্ব্বিবাদে থাকিতে পারিবে ; এবং কাজকর্ম্ম স্বেচ্ছায় যে যাহাই করুক তাহাতেই সকল অভাব সকলের দূর হইবে।

মানবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যে আদর্শ ইয়োরোপীয় র‍্যাস-নালিষ্টিক্ মতে গৃহীত হয়, যে কোনও রূপ রাষ্ট্রশক্তির আইনে ও শাসনে তাহা কিছু কিছু ক্ষুণ্ণ হইবেই। তবে একেবারেই কোনও শাসন-দণ্ড না থাকিলে চলে না তাই অগত্যা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক মতে গঠিত একটা রাষ্ট্রশক্তিকে স্বীকার করিয়া নিতে র‍্যাসানালিষ্ট মতবাদীগণ

---

* ২৫৪ ও ২৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রস্তুত হন। তাঁহাদের নীতিসঙ্গত এই রাষ্ট্রশক্তি হইতে পারে, সকল স্বাধীন মানবের স্বেচ্ছাকৃত চুক্তিতে গঠিত একটা পদ্ধতি এবং তাহার শাসন গণ্ডীর একটা সীমাও তাহারা নির্দ্দেশ করিয়া দিবে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বাধীনতকে খর্ব্ব করিয়া এই পদ্ধতির প্রভুত্ব যতটুকু স্বেচ্ছায় সকলে স্বীকার করিয়া নিবে, ততটুকুই মাত্র প্রভুত্ব এই পদ্ধতি পরিচালনা করিতে পারে। বিখ্যাত ফরাসী চিন্তানায়ক রুষো (Rousseaou) তাঁহার "Social Contract" নামক গ্রন্থে ইহাও প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন, মানবের মধ্যে প্রথম সমাজবন্ধন ও সমাজশক্তির স্থাপনা এই ভাবেই হইয়াছিল। শক্তিমান্ লোকেরা অন্যায় বলে শেষে তাহার উপর আপনাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তাহাই কালে বহু লোকপীড়নের কারণ হইয়াছে। প্রথম প্রথম এই মত অনেকেই আদরে গ্রহণ করেন এবং রাজশক্তি মাত্রকেই প্রজাবর্গের সঙ্গে একটা চুক্তির ব্যবহারপ্রসূত শক্তি বলিয়া ধরিয়া নেন। কিন্তু ক্রমে অনেকেই বুঝিতে পারেন, এভাবে সকল লোকের সম্মত কোনরূপ একটা চুক্তিতে কোনও রাষ্ট্রীয় শক্তি গঠিত হয় নাই, এবং তাহা হইতেও পারে না। রাষ্ট্রীয় শক্তি সর্ব্বত্রই অবস্থা অনুসারে যেখানে যেমন সম্ভব, তেমনই ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। অন্যায় কিছু থাকিলে তাহার সংস্কার সম্ভব। অত্যধিক পীড়ক হইলে, জন-বিদ্রোহে তাহাকে ধ্বংসও করা যায়। আবার সেই ধ্বংসের পর সমাজব্যাপী যে বিপ্লব আইসে, অশেষ দুঃখের পর সেই বিপ্লবের মধ্য হইতে অসাধারণ শক্তিমান্ কোনও নায়ককে কেন্দ্র করিয়া নূতন একরকম রাষ্ট্রশক্তিও গড়িয়া উঠিতে পারে। কিন্তু দেশের সব লোককে একত্র করিয়া শান্ত ভাবে তাহাদের মতামত আলোচনার পর সর্ব্বসম্মত কোনও চুক্তিতে কোনও শাসনপদ্ধতির প্রতিষ্ঠার কল্পনা একেবারেই একটা স্বপ্ন-কুহেলিকা মাত্র। যাহা হউক, যে ভাবেই যে ষ্টেট্ হইয়া থাক্, ষ্টেট্ খন না হইলে চলে না, তখন বর্ত্তমান সব ষ্টেট্‌গুলিকে যতদূর সম্ভব গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা সর্ব্বত্র হয়, এবং এই

চেষ্টা বহু পরিমাণে সফলও হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে পাশ্চত্য অঞ্চলে অধিকাংশ ষ্টেটই অল্পবিস্তর গণতান্ত্রিক আকার ধারণ করিয়াছে। এই সংস্কারের পর ষ্টেট্ সব জনসাধারণের মতেই চলিবে, জনসাধারণের হিতার্থেই তাহার সকল কর্ম্মশক্তি নিয়োজিত হইবে,—আর ষ্টেটকে বজায় রাখিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার প্রজারা যতটা ভোগ করিতে পারে, সকলেই সমান ভাবে তাহা করিতে পারিবে,—এইরূপ ভরসাও অনেকে করেন। কিন্তু তারপর শতাব্দী কালও গত হয় নাই, ইহারই মধ্যে দেখা যাইতেছে, নামে গণতান্ত্রিক হইলেও কি প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে কি শাসন-পরিচালনায়, জনসাধারণের মত বলিতে যাহা বুঝায়, কার্য্যতঃ তাহা কিছুই চলে না। সকল ক্ষমতা ধনিকসম্প্রদায়ের অর্থপুষ্ট সুগঠিত একটি একটি দলের শক্তিমান্ নায়কবর্গের হাতে গিয়া পড়িয়াছে এবং দরিদ্র জনসাধারণের প্রকৃত মঙ্গলামঙ্গলের দিকে দৃষ্টি তেমন না রাখিয়া, এই ধনিক সম্প্রদায়ের ব্যবসায়বাণিজ্যের স্বার্থবৃদ্ধি কল্পেই প্রধান ভাবে ইহা প্রযুক্ত হইতেছে। পূর্ব্বে বহু আলোচনা এ সম্বন্ধে করা হইয়াছে। ইয়োরোপ ও আমেরিকার সমাজে ও রাষ্ট্রে ধনিক-প্রভুত্ব যে কিরূপ দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং দরিদ্র জনসাধারণ যে কত দিকে কি ভাবে এই প্রভুত্বের কঠোর নির্ম্মম চাপে পিষ্ট হইতেছে, পাঠকবর্গ সকলেই তাহা অবগত আছেন। সমষ্টি শক্তির নিয়ন্ত্রণে বা কর্ম্মপদ্ধতি নিরূপণে ইহাদের মতামতের কোনও মূল্যই নাই। তারপর আর্থিক দাসত্বের অতি দুর্গতিতে যাহাদের জীবনযাপন করিতে হয়, তাহাদের পক্ষে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কোনও কথা নিষ্ঠুর একটা বিদ্রূপ বই আর কিছু হইতে পারে না।

তারপর প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্য-নীতির ও শাসন-পদ্ধতির আদর্শে ইয়োরোপের সব ষ্টেট্ এক একটি শক্তিকেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া তাহারই শাসনাধীন হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। মধ্যযুগে সমাজে ও রাষ্ট্রে যে ফিউডাল পদ্ধতি (feudal system) দেখা দিয়াছিল, তাহাতে

এক একটি দেশে রাজার মোটামুটি একটা প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া নিয়া বহু ভূস্বামী ছোট ছোট প্রদেশগুলি নিজেদের কর্ত্তৃত্বেই শাসন করিতেন, আবার স্থানে স্থানে বহু নগরে নাগরিকবর্গের একরূপ স্বায়ত্তশাসনও প্রচলিত হইয়াছিল। স্থানীয় শাসক বা শাসকমণ্ডলী স্থানীয় বিশেষ বিশেষ অবস্থা ও রীতি নীতি অনুসারে শাসনের ব্যবস্থা করিতেন। ক্রমে নানা কারণে রাজাদের শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় স্থানীয় বিভিন্ন কেন্দ্রের বিচিত্র শাসন পদ্ধতি সব লোপ পাইল, সকল শক্তি রাজায়ত্ত একই কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া নূতন এক আকার ধরিয়া সমগ্র দেশের উপরে আপন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিল। একই শাসন চক্রে এক একটি দেশ এই ভাবে বাঁধা পড়িল। ইংরাজিতে এইরূপ শাসনপদ্ধতি সাধারণতঃ centralised administration (কেন্দ্রায়ত্ত শাসন) নামে পরিচিত। ইয়োরোপায় চার্চ্চ বা ধর্ম্মমণ্ডলী (ক্যাথলিক বা প্রটেষ্টাণ্ট যেরূপই হউক) পূর্ব্ব হইতেই বড় এক একটি centralised organisation বা কেন্দ্রায়ত্ত শক্তিচক্র ছিল। ক্রমে ষ্টেটগুলিও এইরূপ centralised organisation বা কেন্দ্রায়ত্ত শক্তিচক্র হইয়া উঠিল। রোমক চার্চ্চের বিরুদ্ধে প্রটেষ্টাণ্ট বিদ্রোহের পর চার্চ্চগুলিও যখন সব ষ্টেটের অধীন হইয়া পড়িল, তখন এই সব centralised stateই এক এক দেশে একরূপ সর্ব্ব শক্তিমান্ হইয়া দাঁড়াইল।

মধ্য যুগের ভূস্বামীদের শাসন বিশেষ সুশাসন ছিল না। তাহার কারণ উন্নত সভ্যতায় লোকচরিত্রে যে নিয়মসংযমের প্রভাব এবং তাহার ফলে সমাজে যে শান্তির শৃঙ্খলা দেখা যায়, সেরূপ অবস্থা ইয়োরোপে তখনও ঘটে নাই। ভূস্বামীরা অতি উগ্র ও উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন এবং সাধারণ জনসমাজেও উন্নতবুদ্ধির বিকাশ কি উন্নত আচারনিয়মের প্রবর্ত্তন হয় নাই। এ অবস্থায় কোনও রূপ রাষ্ট্রেই সুশাসন বা শান্তির শৃঙ্খলা ঘটে না। কিন্তু ইহার মধ্যেও বিভিন্ন অঞ্চলের প্রজাবর্গ বহু এমন স্বাতন্ত্র্যের অধিকার ভোগ করিত, স্থানীয়

অবস্থাঅনুসারে নিজেদের ব্যক্তিগত কি সম্প্রদায়গত সব প্রয়োজনীয় কাজকর্ম্মের বিধিব্যবস্থা নিজেরা সব বুঝিয়া করিয়া নিবার এমন অবসর পাইত, যাহা কোনও কেন্দ্রায়ত্ত রাষ্ট্রচক্রে (centralised stateএ) সম্ভব হয় না। রাষ্ট্রশক্তির সংহতির বল এই সব কেন্দ্রায়ত্ত রাষ্ট্রচক্রে অনেক বাড়ে বটে, কিন্তু এই বল সাম্রাজ্যবিস্তারের পক্ষে যত উপযোগীই হউক, প্রজাসাধারণের সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধানের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক নাও হইতে পারে। বিদেশীর বিজিগীষা হইতে দেশরক্ষা সম্বন্ধেও একথা বলা যাইতে পারে, যে দেশের লোক মানুষের মত স্বধর্ম্মে ও আত্মশক্তিতে স্থির থাকিতে চায়, তার মর্য্যাদা বোঝে, বিদেশী তাহাদের যুদ্ধে কখনও জয় করিতে পারিলেও দীর্ঘকাল শাসনাধীন অবস্থায় রাখিতে পারে না। তারপর সর্ব্ববিষয়ে centralised বা কেন্দ্রায়ত্ত না হইলে রাষ্ট্রীয় শক্তি ত একটা থাকেই ; দেশরক্ষার পক্ষে এ শক্তিও কার্য্যকরী হইতে পারে, যদি প্রজার চরিত্রে মনুষ্যোচিত তেজোবীর্য্য থাকে। কিন্তু কেন্দ্রায়ত্ত রাষ্ট্রে আইনের বন্ধনে একই শাসনের যন্ত্রে সমগ্র দেশ এমন ভাবে বাঁধা পড়ে যে কোথাও কোনও বিষয়ে কোনও স্বাতন্ত্র্যের সুযোগ কেহ বড় পায় না, এবং এই স্বাতন্ত্র্য ব্যতীত ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত কিম্বা স্থানগত যে বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্য মানবসমাজে স্বাভাবিক তাহা বজায় থাকে না, ফুটিতেও পারে না।

বড় কোনও organisation বা শক্তি-চক্রের প্রকৃতিগত বড় দোষই এই যে মানুষ যারা তার শৃঙ্খলাধীনতার মধ্যে পড়ে, তারা একেবারে সেই চক্রের উপরে নির্ভরশীল কলের পুতুলের মত হইয়া যায়। চক্রের পরিচালক যাঁহারা, চক্রের সব কল কাঠি যাঁহাদের হাতে, সেই চক্রকেই তাঁহারা এত বড় করিয়া দেখেন যে তার কর্ম্মশৃঙ্খলা, তার কঠোর নিয়মকানুন, তার শক্তির মহিমা স্থির রাখিবার প্রয়োজনে নির্ম্মম ভাবে মানুষের সুখদুঃখকে, সকল স্বচ্ছন্দতার অধিকারকে অবজ্ঞা করিয়া চলেন। চক্র যে মানুষের সুখ সুবিধার জন্য, মানুষ তাঁর

শাসকের জন্য নয়, একথা তাঁহারা অনেক সময় ভুলিয়া যান। এই চক্র যত বড় হইবে, যত তার শক্তি-কেন্দ্র সাধারণ জনগণের কর্ম্মভূমি হইতে দূরে বা উপরে সরিয়া যাইবে,—জনগণের সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ, মমতার সম্বন্ধ তত লোপ পাইবে, সকল ব্যবহার নিতান্ত প্রাণহীন একটা যন্ত্রের ক্রিয়ার মত হইবে। ধনবান্ ও শক্তিমান্ যাঁহারা, তাঁহারা এই যন্ত্রের উপরে আপনাদের প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া ইচ্ছা অনুসারে কি রুচি অরুচির হিসাবে ইহার ক্রিয়াকে নিজেদের সুখসুবিধার দিকে অনেকখানি টানিয়া রাখিতে পারেন, কিন্তু গরীবের পক্ষে এরূপ কোন সুযোগ কখনও ঘটে না। যন্ত্র তার কড়া 'রুটিনে' যখন যা দিবে, তাই তাকে নিতে হইবে। যা দিবে না, হাজার চাহিলেও তা সে পাইবে না।

দশের হিতকর অনেক এমন কাজ আছে, কোনও না কোনও রূপ শক্তি-চক্র রচনা না করিলে তাহা হয় না। কিন্তু ছোট ছোট কেন্দ্রে জনসাধারণ, স্থানীয় বিচক্ষণ ও সদাশয় ব্যক্তিদের নেতৃত্বে নিজেরা ছোট ছোট শক্তিচক্র রচনা করিয়া যত এইরূপ সব কাজের ব্যবস্থা করিয়া নিতে পারিবে, স্বাভাবিক শক্তির সহজ স্ফূর্ত্তিতে জীবনযাত্রা তাহাদের তত স্বায়ত্ত ও স্বচ্ছন্দ হইবে, আপন আপন বিশিষ্ট ধর্ম্মে স্থির থাকিয়া তাহারই পথে বিশিষ্ট ও নিয়ত অভিব্যক্তির সিদ্ধিলাভে জীবন তাহাদের তত সফল ও আনন্দময় হইবে। স্বাস্থ্যোন্নতি, দূরপথের সুগমতা সাধন, দূরদেশের সঙ্গে বার্ত্তার বিনিময়, জ্ঞানপ্রচার ও দেশরক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থায় এবং তৎসংসৃষ্ট আরও কোনও কোনও অতি প্রয়োজনীয় ব্যব্যসায়িক অনুষ্ঠানে ও প্রতিষ্ঠানে উন্নত বিজ্ঞানের প্রয়োগ বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে একেবারে অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং বৃহত্তর organisation বা শক্তি চক্রের সহায়তা ব্যতীত এ প্রয়োগ একেবারেই সম্ভব হয় না। এই সব ক্ষেত্রে যেখানে যত বড় প্রয়োজন এইরূপ শক্তি-চক্র রচনা করিয়াই বিজ্ঞানের প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু সে প্রয়োগ ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়

বিশেষের ব্যবসায়িক স্বার্থে না হইয়া যতদূর সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে হইতে পারে, তাহারও চেষ্টা করিতে হইবে *। আর Social policy বা সমাজধর্ম্মের বড় লক্ষ্য এদিকেও থাকা চাই, যে ব্যবসায়িক কি রাষ্ট্রীয় যে কোনও ক্ষেত্রেই হউক, এইরূপ বৃহত্তর শক্তি-চক্র ব্যতীত যে সব কর্ম্ম স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে, তাহা সব ইহা হইতে মুক্ত থাকে।

আধুনিক সব centralised বা কেন্দ্রায়ত্ত রাষ্ট্রমণ্ডলের শাসন-পদ্ধতি অতি বৃহৎ ও অমিত ক্ষমতাশালী এক একটি শক্তিচক্র বা organisation. কেবল শাসনসংক্রান্ত ব্যপার নয়, সাধারণ হিতকর আরও বহু ব্যপার সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে এই সব ষ্টেটের আয়ত্তির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। ষ্টেট শাসন করে, অন্য যাহা কিছু কর্ম্ম সব নির্ব্বাহ করে, আইনের বলে প্রজাকে বাধ্য করিয়া। আইন যে স্বেচ্ছায় মানিবে না, বিহিত দণ্ডের ভাগী সে হইবে। এই দণ্ড বা compulsion ষ্টেট-প্রভুত্বের প্রধান আশ্রয়, তাই প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রীয়শাসন বা Governmentএর একটি নামই হইয়াছিল দণ্ড বা দণ্ডনীতি। দুষ্টের দমনে সমাজরক্ষায় দণ্ডের একটা আবশ্যকতা আছে। কিন্তু দণ্ডের প্রয়োগ ব্যতীত ধর্ম্মের পথে ধর্ম্মানুগত আত্মশক্তির স্বচ্ছন্দ গতিতে মানুষ যত বেশী চলিতে পারিবে, তত মঙ্গলের ভাগী সে হইবে, তত তার জীবন মনুষ্যত্বের মহিমায় ধন্য হইবে। তাই ষ্টেটের যে সাম্রাজ্য বা comprehensive authority, তার মধ্যে যত বেশী স্থানীয় বা সাম্প্রদায়িক স্বারাজ্যের বা local and communal independenceএর অবসর থাকিবে, তত সে দেশের অবস্থা জনগণের পক্ষে সুখের হইবে। যে কাজ ষ্টেটের প্রভুত্ব ব্যতীত একেবারেই চলে না, তাহাকেই একটা absolute minimum বা চরম সঙ্কোচের মাত্রা ধরিয়া নিয়া তাহারই মধ্যে মাত্র ষ্টেটের এই সাম্রাজিক প্রভুত্ব কঠোর নিয়মে বাঁধিয়া রাখিতে

* ষ্টেট্ সোসিয়ালিজম—৫২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

না পারিলে সমাজ বড় বেশী state-ridden বা দণ্ডভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে, স্বায়ত্ত শক্তির সজীব সচ্ছন্দ লীলা জনসাধারণের জীবনে বড় প্রকাশ পায় না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, আধুনিক ডিমক্রাটিক সব ষ্টেটে কেন তাহা হইবে? শাসনপদ্ধতি যেরূপই হউক, মানবজীবনের উপরে যতদূরই তাহার অধিকার প্রসারিত হউক, সকলের মতেই হয়। রাষ্ট্রীয় বিধি ব্যবস্থা, বিধি ব্যবস্থার প্রয়োগ, যাহা কিছু হয়, জনগণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের কর্ত্তৃত্বেই হয়, এবং তাহার জন্য প্রতিনিধিরা সর্ব্বদাই জনগণের কাছে দায়ী থাকেন। তাহারা যাহা চায় না, তাহাদের দুঃখ যাহাতে হয়, এমন কিছু করিলে জনগণ তাঁহাদের দূর করিয়া দিয়া নূতন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিতে পারে। কিন্তু theory বা মতবাদের দিক হইতে এসব কথার যতই যুক্তিসঙ্গতি থাক, যতই সত্য বলিয়া মনে হউক, বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে—কি প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে, কি শাসন নীতি ও শাসনপদ্ধতি নিরূপণে, কি তাহার পরিচালনায়—জনসাধারণের সত্যকার কোনও মতামত যে কতদূর চলে, স্বাধীনভাবে নিজেদের একটা মত স্থির করিয়া নিবার শক্তিই যে তাহাদের কতদূর আছে, সুযোগ তাহারা কতটুকু পায়, নূতন করিয়া আবার তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। প্রকৃত প্রভু ধনিকসম্প্রদায়ের ব্যবসায়িক স্বার্থ বজায় রাখিয়া জনসাধারণের হিতকর অনেক কাজ এই সব ষ্টেট করিয়া থাকেন। কিন্তু সে সব ষ্টেটই তাহাদের জন্য করেন, নিজেরা নিজেদের ইচ্ছামত কিছু করিয়া নিতে পারেনা, সেরূপ কোনও শিক্ষা ও সাধনা তাহাদের ঘটে না, অবসরও কিছু পায় না। আর হাজার হইলেও ডিমক্রাটিক শাসন মেজরিটীর শাসন মাত্র; মাইনরিটী যত বড়ই হউক, তাহাদের কোনও মতামত তার মধ্যে চলে না।

পূর্ব্বে ষ্টেট সোসিয়ালিজমের কথা আমরা বলিয়াছি। বর্ত্তমান যুগে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রয়োগে বহু এমন সাধারণ হিতকর

কাজ করিতে হয়, যাহা দরিদ্র জনসাধারণ স্বতন্ত্রভাবে নিজেরা করিতে পারে না, এবং তাহার জন্য যেরূপ অর্থব্যয়, বৃহৎ সমবায় গঠন, সুদক্ষ শক্তিচক্র রচনার আবশ্যক হয়, তাহাও কেবল ইহাদের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নয়। তাই এই সব কাজের ভার ইহাদের পক্ষে ষ্টেটকেই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া এমন কথা হইতে পারে না যে ব্যবসায়িক এবং দেশের হিতকর সর্ব্ববিধ কাজই ষ্টেট করিবেন এবং জনসাধারণ স্বাধীনভাবে স্বকীয় শক্তিতে কিছুই করিবার অবকাশ পাইবে না। তারপর পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দণ্ডবলই সকল কর্ম্মে ষ্টেটের প্রধান বল, এবং ষ্টেটের এই দণ্ড পরিচালনার কর্ত্তৃত্ব উচ্চতর শ্রেণীর শক্তিমান্ নায়কদের হাতে গিয়া পড়ে। স্বার্থের খাতিরেই হউক কি ভুল করিয়াই হউক, ইহার অপপ্রয়োগ তাহারা করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন; দরিদ্র জনগণের উপরে বহু পীড়ন তাহাতে ঘটে।

এই গেল ষ্টেটের কথা। তারপর চার্চ্চ। ইয়োরোপায় সমাজ-জীবনের উপরে একদিকে যেমন ষ্টেটের, অপর দিকে তেমন চার্চ্চের প্রভুত্বও বড় কম নয়। প্রাচীন রোমক চার্চ্চ যে কত বড় একটা centralised organisation বা কেন্দ্রায়ত্ত শক্তিচক্র ছিল, পূর্ব্বেই তাহা বলিয়াছি। পশ্চিম ইয়োরোপে যেমন রোমক চার্চ্চ, প্রাচ্য ইয়োরোপে রুষগ্রীক অঞ্চলে তেমনই প্রাচ্য বা গ্রীক চার্চ্চ আর একটি বড় শক্তি-চক্র হইয়া উঠিয়াছিল। প্রটেষ্টাণ্ট অঞ্চলের ষ্টেট চার্চ্চগুলিও এইরূপ বড় এক একটা শক্তি-চক্র হইয়া দাঁড়ায়। র‍্যাসনালিষ্টিক মতের প্রভাবে চার্চ্চের শাসন অনেকটা শিথিল হইলেও, আস্তিক খৃষ্টানদের ধর্ম্মবুদ্ধির ও ধর্ম্মনীতির উপরে চার্চ্চসমূহের প্রভুত্ব এখনও বড় কম নয়, এবং ধর্ম্মজীবনে চার্চ্চের শাসন ষ্টেটের সঙ্গে যুক্ত হইয়া অনেকপরিমাণে ষ্টেটেরই দণ্ডনীতি ধরিয়া চলে। ইহাও মানবের মানবত্বের স্বচ্ছন্দগতির ও পরিণতির পথে, তার চরিতার্থতার আনন্দভোগে, বড় একটা বাধা হইয়া রহিয়াছে।

অন্যরূপ সব পূর্ব্বতন গবর্ণমেণ্টের ত কথাই নাই, আধুনিক ডিমক্রাটিক গবর্ণমেণ্টগুলিও কি ভাবে যে জনসমাজের সকল রূপ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারের উপরে চাপিয়া বসিয়াছে, কি ভাবে যে তার সকল প্রভুত্ব শক্তিমান্ ব্যক্তিবর্গের করায়ত্ত হইয়া জনসাধারণের পক্ষে নানারূপ দুঃখের ও পীড়নের কারণ হইতেছে, মানবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পথে গবর্মেণ্টের দণ্ডনীতি যে কত বড় একটা বাধা, এবং কতদিকে তাহাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া রাখিতে পারে, ইত্যাদি সব অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই নব্য ইয়োরোপে এনার্কিষ্ট দলের আবির্ভাব হইয়াছে। ইঁহারা বলেন, গবর্ণমেণ্টরূপ দণ্ডধারী এক একটি প্রভুশক্তি হইতে জনসমাজের হিত অপেক্ষা অহিত যখন এত বেশী হয়, মানবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও যখন তাহাতে এত বেশী ব্যাহত হয়, তখন ইহা না থাকাই ভাল। স্বচ্ছন্দ ভাবে আপন ইচ্ছামত লোকে চলিতে পারিলে, কাজকর্ম্ম সব অবস্থানুসারে নিজেদের ব্যবস্থা মত নিজেরা করিতে পারিলে, মানুষ অনেক বেশী সুখে শান্তিতে এ পৃথিবীতে থাকিতে পারিবে। অপরের জন্য নিজের উদ্দাম প্রবৃত্তিকে কোথায় কতটুকু সংযত রাখিতে হইবে, স্বার্থকে কোথায় কতটা সঙ্কুচিত করিতে হইবে, আপনিই সে তাহা বুঝিবে, বুঝিয়া আপনিই তা সে করিবে। Centralised বা কেন্দ্রায়ত্ত বড় বড় ষ্টেটের ত কথাই নাই, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যে কোনও প্রতিষ্ঠান বা শক্তিচক্র দণ্ডনীতিকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়ায়, দণ্ডনীতি প্রয়োগে লোকশাসন করিতে চায়, তাহারই বিরোধী ইঁহারা,—তাহাকেই একেবারে লোপ করিয়া ফেলিতে চান।

এনার্কিজিমের মোট তত্ত্ব এই, এবং মূল এই লক্ষ্য সম্বন্ধেও সকল্ এনার্কিষ্টই একমত। তবে এই এনার্কিজমের স্বরূপ কি হইবে, ইহার নীতির ধর্ম্ম কি, সমাজ-জীবন এ অবস্থায় কি ভাবে চলিবে, কি উপায়ে এই অবস্থা সমাজে আনা যাইতে পারে, এসব সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে।

(আস্তিক এনার্কিজম্—টলষ্টয়।)

আস্তিক খৃষ্টান এবং নাস্তিক বিপ্লববাদী—মোটের উপর বড় এই দুই ভাগে এনার্কিষ্টদের বিভক্ত করা যায়। খৃষ্টীয় প্রেম মৈত্রী ত্যাগ ও তিতিক্ষা ধর্ম্মের উপরে আস্তিক খৃষ্টান তাঁহার আদর্শ এনার্কিষ্ট সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে চান। ইহার প্রেরণাও এই ধর্ম্মের নীতি হইতে আসিয়াছে। প্রেমময় এক ভগবানের সন্তান, প্রেম ও ত্যাগ ধর্ম্মের অবতার যিশুখৃষ্টের শিষ্য, মানব সকলেই ভাই ভাই, প্রেমের টানেই মিলিয়া মিশিয়া এ পৃথিবীতে বাস করিবে। এই প্রেমই সকলকে ত্যাগী করিবে, তিতিক্ষাপরায়ণ করিবে। শক্তিতে বড় কি ছোট যে যেমনই হউক, সমান সুখে সকলে থাকিবে; ত্রুটি বিচ্যুতি যাহাই যাহার হউক, দুর্ব্বৃত্ততা যেই যাহা কিছু কখনও করুক, ক্ষমায় ও প্রেমের প্রভাবে তাহাকে সংশোধন করিতে হইবে, সুপথে আনিতে হইবে। আপনি বুঝিয়া স্বেচ্ছায় যখন লোকে দোষত্রুটি সব বর্জ্জন করে, তখনই সত্য তাহার চরিত্রের উন্নতি হয়। প্রেমে ও ক্ষমায়ই ইহা সম্ভব; কঠোর দণ্ডের শাসনে নয়। সে শাসন লোকের স্বভাবকে আরও কঠোর করিয়া তোলে, দুর্ব্বৃত্তির পথে আরও শক্ত হইয়া সে দাঁড়াইতে চায়। শাসন যত নির্ম্মম যত কঠোর হইবে, সমাজে দুর্ব্বৃত্তের সংখ্যা ও দুর্ব্বৃত্তির মাত্রা তত বাড়িবে বই কমিবে না। কি ষ্টেটে কি চার্চ্চে, উচ্চতর শাসক সম্প্রদায়ের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা গিয়া পড়িয়াছে, না পড়িয়াই পারে না। প্রভুত্বলিপ্সা ভোগলিপ্সা ও ঐশ্বর্য্যলিপ্সার চরিতার্থতার জন্য এই ক্ষমতা বলে যতদিকে সম্ভব দরিদ্র জনগণকে তাঁহারা আইনের অশেষ বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন, দণ্ডনীতির কঠোর চাপে চাপিয়া রাখিতেছেন। আইনের এই সব বন্ধন, শাসনের এই চাপ. মানবের প্রাণে সহজ ধর্ম্মের স্বাভাবিক স্ফুর্ত্তিকে চাপিয়া রাখিয়াছে, দুর্নীতির পথে তাহাকে পরিচালিত করিতেছে। দুর্নীতি যত বাড়িতেছে,—আইনের বন্ধন, দণ্ডের চাপও তত বাড়িতেছে; অশেষ পাপ, অশেষ দুর্গতি সমাজে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। আবার এই

প্রভুত্বলিপ্সা ও ঐশ্বর্য্যলিপ্সা, প্রমত্ত ও বলদৃপ্ত শাসকসম্প্রদায়ের চিত্তে দেশবিদেশে সাম্রাজ্যবিস্তারের অতি দুর্দ্দম একটা লিপ্সাকেও জাগাইয়া তুলিতেছে। ইহারই প্ররোচনায় মহামার সংগ্রাম মধ্যে মধ্যে ঘটে। সংগ্রামে ও অবিরত সংগ্রামের আয়োজনে দরিদ্রের কঠোর শ্রমজাত বহু ধন ও অসংখ্য প্রাণ অতি নির্ম্মম ভাবে ইঁহারা বলি দেন; সকল দেশেরই দরিদ্র প্রজাবর্গের দুর্গতির একশেষ ইহাতে হয়। তারপর বড় একটি একটি যুদ্ধে অবাধ নরহত্যায় ও আরও কত রকম নিষ্ঠুর অত্যাচারে মানুষ যে পশুবৎ আচরণ করে, তাহার ফলে মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশু প্রকৃতিই তাহারা লাভ করে।

এই সব বন্ধন এবং এইরূপ এই সব পাপ ও দুঃখদুগতি হইতে মানুষকে মুক্ত করিতে হইবে; পশুত্বের অভিভাব হইতে মনুষ্যত্বকে উদ্ধার করিতে হইবে। যে ষ্টেট্ই এইরূপ সকল বন্ধন, সকল চাপ, সকল পাপ ও দুঃখ দুর্গতির মূল, সেই ষ্টেট্‌কেই লোপ করিতে হইবে, অন্যথা মানবের মুক্তির কোনও উপায় নাই। চার্চ্চ সব ষ্টেটের সঙ্গেই যুক্ত। ষ্টেটের যত বড় সহায়ই চার্চ্চ হউক, ষ্টেট্ ব্যতীতও আবার চার্চ্চ দাঁড়াইতে পারে না। যে দণ্ড তাহার প্রধান আশ্রয় ষ্টেটের মধ্যবর্ত্তিতায়ই সেই দণ্ড চার্চ্চকে প্রয়োগ করিতে হয়। ষ্টেট্ লুপ্ত হইলে, চার্চ্চ কাজেই লুপ্ত হইবে। খৃষ্টানকে তাহার ধর্ম্মপথে রাখিতে, ধর্ম্মের পথে চালাইতে, কোনও চার্চ্চেরই প্রয়োজন হয় না। চার্চ্চের শাসনেই বরং খৃষ্টান তার সত্যধর্ম্মকে হারাইয়াছে, মুক্ত হইলেই ফিরিয়া পাইবে।

ইহাই খৃষ্টান এনার্কিজিমের মোট কথা। সর্ব্বজন বরেণ্য মহাপ্রাণ রুষ-মনীষী টলষ্টয় এই এনার্কিষ্ট ধর্ম্মের প্রধান গুরু। কয়েক বৎসর হইল ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন। আধুনিক এই ডিমক্রাটিক যুগেই, ইয়োরোপায় সব ষ্টেট্ ও চার্চ্চের শাসনে ভোগলিপ্সু দুর্নীতি-পরায়ণ অভিজাত ও ধনিক সম্প্রদায়ের প্রভুত্বে, সাম্রাজ্যলিপ্সু প্রতিদ্বন্দ্বী জাতি সমূহের অবিরত স্বার্থের সংঘর্ষে, অশেষবিধ দুঃখদুর্গতি

ও পাপ যে সাধারণ জনসমাজের মধ্যে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, তাহার তীব্র বেদনা প্রাণে অনুভব করিয়া, বহু দৃষ্টান্তের প্রমাণে ও যুক্তিতর্কের বিচারে তিনি শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, ষ্টেটরূপ শক্তি-চক্র মাত্রই বহু পাপের ও দুঃখের সৃষ্টি এই পৃথিবীতে করিয়াছে। ষ্টেটের এই পাপশাসন হইতে মুক্ত, খৃষ্টীয় প্রেম ও মৈত্রীর বন্ধনে মাত্র সম্বদ্ধ, সমাজেই মানব সুখে শান্তিতে স্বচ্ছন্দভাবে জীবন যাপন করিতে পারে। ছোট বড় সকলেই মিলিয়া মিশিয়া আনন্দে এই সমাজে কাজ করিবে, সমান ভাবে খাইয়া পরিয়া সুখে থাকিবে। এই সমাজ হইবে নাগরিক বিলাসব্যসন-বর্জ্জিত সরল ও অনাড়ম্বর গ্রাম্য চাষীর সমাজ। এরূপ সমাজে কাহারও বড় বেশী কিছু লাগে না। যাহা লাগে, সকলের পক্ষেই এই অবস্থায় তাহা সুলভ হইবে। প্রেম ও মৈত্রীই জীবনের মূলনীতি হইবে; সকলকেই এই নীতি ত্যাগী ও তিতিক্ষু করিয়া তুলিবে। বিবাদ বিসম্বাদ কেন হইবে? বাধ্যতা কাহারও কিছুতে নাই। কেবল মাত্র সহজ বুদ্ধি ও ধর্ম্মের প্রেরণাতেই সামাজিক দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সকলে পালন করিবে। ইহাই আদর্শ 'র‍্যসনাল' (Rational) অর্থাৎ ন্যায়সঙ্গত বা ধর্ম্মসঙ্গত জীবন। এই জীবন এই অবস্থায় আপনিই অভিব্যক্ত হইবে।

কিন্তু হইবে কি? তাহাই ত সমস্যা! ইহার পরীক্ষা কোথাও হয় নাই। টলষ্টয় নিজেও করিয়া দেখাইতে পারেন নাই যে তাঁহার এই আদর্শ 'র‍্যাসনাল' জীবন বর্ত্তমান এই মানবসমাজে সম্ভব।

তবে তিনি বলেন, এই জীবনকে মানবসমাজে সম্ভব করিতে হইলে আগে গবর্মেণ্টকে লোপ করিতে হইবে। কি প্রকারে তাহা হইতে পারে? গবর্মেণ্টের যাহা কিছু রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম, প্রজাবর্গের সহায়তাতে বা সহযোগিতায় তাহা নিষ্পন্ন হয়। এই সহায়তা যদি তাহারা না করে, গবর্মেণ্ট একেবারে অচল হইয়া পড়িবে। শাসন-পাশ মুক্ত শান্তিময় প্রেমের সমাজ প্রতিষ্ঠা করিব এই লক্ষ্য স্থির করিয়া, প্রজাবর্গ যদি গবর্মেণ্টের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতা বা

কো-অপারেশন (co-operation) বর্জ্জন করে, তবে অবিলম্বেই গবর্ণমেণ্ট অচল হইয়া পড়িবে, এবং আকাঙ্ক্ষিত সমাজ আপনিই তার স্বরূপ ধরিয়া দেখা দিবে। টলষ্টয় আরও বলেন, ভক্ত ও নিষ্ঠবান্ খৃষ্টান যাহারা, তাহারা হিংসামূলক বা চণ্ড কোনরূপ কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারে না; সুতরাং তাহাদের এই নন্-কো-অপারেশন (non-co-operation) হওয়া চাই একেবারে অহিংস ও শান্ত (non-violent). বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান ভারতে মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত Non-violent Non-co-operation বা অহিংস অসহযোগ নীতির প্রেরণা আসিয়াছে রুষ মনীষী টলষ্টয় হইতে। তবে লক্ষ্য সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, টলষ্টয় এই নীতিপ্রয়োগে সর্ব্ববিধ সামাজিক পাপের মূল গবর্মেণ্ট মাত্রকেই একেবারে অচল ও লোপ করিয়া ফেলিতে চান; আর মহাত্মা গান্ধী বর্ত্তমান বিদেশী বৃটিশরাজকে লোপ করিয়া তাহার স্থানে ভারতবাসীর স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিতে চান। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর এই স্বরাজের স্বরূপ যে কি, তাহা কখনও তিনি স্পষ্টভাবে খুলিয়া বলেন নাই। টলষ্টয়ের যে এনার্কিজিম, তাহাকেও এক হিসাবে 'স্বরাজ' যে না বলা যায় তা নয়।—প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, স্বাধীন; কেবল প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্মে পরস্পরের সঙ্গে সকলে যুক্ত; কোনও অবস্থাতেই কেহ কাহাকে হিংসা করিবে না, দ্বেষ করিবেনা, বলপ্রয়োগে কাহাকেও দমন করিতে চাহিবে না,—প্রেমময় শান্ত উপায়ে সুপথে আনিতে চেষ্টা করিবে। টলষ্টয়ের অরাজক সামাজিক আদর্শ এই। বহু উক্তি হইতে মহাত্মা গান্ধীর স্বরাজের আদর্শও প্রায় এইরূপই একটা কিছু বলিয়া মনে হইবে না কি?

টলষ্টয়ের এই খৃষ্টীয় এনার্কিজম্ একেবারে কবির অবাস্তব স্বপ্নের খেয়াল, অথবা কঠিন হইলেও কার্য্যকরী কোনও পদ্ধতির কল্পনা, এ সম্বন্ধে যেই যাহা বলুন, ধর্ম্মবিরুদ্ধ কি সুনীতি বিরুদ্ধ কোন প্রয়াস বলিয়া ইহার নিন্দা কেহ করিতে

পারেন না। অনেকে ইহাকে Philosophical Anarchism বা জ্ঞানী সাধুর 'অরাজক বাদও' বলিয়া থাকেন। এনার্কিজমের সঙ্গে বোমা পিস্তল প্রভৃতির সাহায্যে গুপ্তহত্যার যে একটা সংস্রব লোকের সাধারণ ধারণায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে, যাহাতে এই এনার্কিজম্ নামটাই একটা বিভীষিকার নাম হইয়াছে, তাহার বিন্দু বিসর্গও কিছু ইহার মধ্যে নাই। চরম এক এনার্কিষ্ট মতের গুপ্তসমিতি ইয়োরোপের নানা দেশে আছে, যাহারা রাজা রাজপুরুষ বা অন্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের হত্যাসাধনে ক্রমে গবমের্ণ্টের শক্তিকে বিধ্বস্ত করিয়া লোকসমাজে এনার্কিজম্ আনিতে চায়। রুষিয়ার নিহিলিষ্ট দলও এই জাতীয় এক সম্প্রদায় ছিলেন। তবে ইঁহাদের সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বতন 'জার' (Czar) আমলের কু-শাসনে প্রজাবর্গ নানারকমে এত উৎপাড়িত হইত, এবং ইহার বিরুদ্ধে বৈধ কোনও আন্দোলন কঠোর দণ্ডে এমনই ভাবে দমন করা হইত, যে কতকটা প্রতিহিংসার উত্তেজনায়, কতকটা বা প্রতিকারকল্পে আর কোনও সাধু উপায়ের পথ না পাইয়া, এই দল গুপ্ত হত্যার সহায়তায় জার-শাসনকে বিপন্ন ও বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করেন। তবে এই সব হত্যাকারী গুপ্তসমিতিভুক্ত এনার্কিষ্টদের তেমন কোনও প্রতিষ্ঠা ইয়োরোপে হয় নাই। কিছু কাল পূর্ব্বে ইহাদের এই চেষ্টার কথা যেরূপ শোনা যাইত, এখন আর তা বড় যায় না। সম্ভবতঃ কতক গবর্মেণ্টের সতর্কতায়, কতক বা বিরুদ্ধ লোকমতের প্রভাবে এবং কতক বা আপনাদের চেষ্টার ব্যর্থতা বুঝিতে পারায়, ক্রমে এই সব দল লোপ পাইতেছে। ইহারা লোপ পাইতেছে, কিন্তু ইহাদের ক্রূরকর্ম্মের ফলে এনার্কিজম নামটাই একটা বিভীষিকার নাম হইয়া পড়িয়াছে। মানবজাতির সুখশান্তিতে পরিপূর্ণ আদর্শ কোনও সমাজপদ্ধতির চিত্রও ইহারা মানবের চিন্তার কি কল্পনার সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারে নাই। টলষ্টয় একটা চিত্র ধরিয়াছেন। কিন্তু তাহা বর্ত্তমান সভ্যতার একটা প্রতিক্রিয়ার চিত্র। যুগের পর যুগ ক্রমাভিব্যক্তির ফলে মানবের উন্নতবুদ্ধি, উন্নতবিদ্যা ও বিজ্ঞান সমষ্টি-

জীবনের বিবিধক্ষেত্রে পরস্পরসাপেক্ষে যে সব প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে, অতি জটিল ও দুশ্চেছ্য সব সম্বন্ধে সকলকে বাঁধিয়া আশ্চর্য্য যে এক পরিণতি নব্যসমাজকে দান করিয়াছে, টলষ্টয় তাহা হইতে মানবকে বিচ্ছিন্ন করিয়া কতকটা আদিম যুগের সরল গ্রাম্য-জীবনে ফিরাইয়া নিতে চান। সেই গ্রাম্য-জীবনে চাষী হইয়া সকলে থাকিবে এবং অন্যান্য যাহা নিতান্ত প্রয়োজন তাহা সহজভাবে নিজেরা প্রস্তুত করিয়া নিবে। টলষ্টয় রুষদেশে উচ্চপদস্থ একজন ভূস্বামী ছিলেন। শেষ জীবনে নিজেও তাঁহার পদগৌরব ও ঐশ্বর্য্যবিলাস সব ত্যাগ করিয়া আদিম চাষীর বেশে গ্রাম্য চাষীদের মধ্যে গিয়া বাস করেন। টলষ্টয়ের এই ত্যাগ-প্রয়াণকে কতকটা প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় রাজাদের বানপ্রস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বনের ন্যায় বলা যাইতে পারে। কিন্তু সমগ্র জনসমাজ চিরদিনের মত এইরূপ বানপ্রস্থী হইতে পারে না। মানবের জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে সংসার-চক্রের ক্রমাভিব্যক্তি যে দিকে হইতেছে, তাহারও গতিকে এভাবে ফিরাইয়া দিতে, ফলকে একেবারে আদিম বীজে পরিণত করিতে, কেহ পারে না।

(নাস্তিক এনার্কিজম্—ক্রোপটকিন্)

পূর্ব্বে নাস্তিক এনার্কিজমের দলের কথা উল্লেখ করিয়াছি। উচ্চতর ধনিক সম্প্রদায় ও তাঁহাদের আয়ত্ত বর্ত্তমান ষ্টেট ও চার্চ্চের বিরুদ্ধে এবং শ্রমিক জনগণের পক্ষে যে কমিউনিষ্ট আন্দোলন চলিতেছে, সোসিয়ালিজম্ যেন তাহার একটা দিক্, এই এনার্কিজম্ তেমন তাহার অপর একটা দিক্। সোসিয়ালিষ্টদের নাস্তিকতার তত্ত্ব পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। যে ভাবে ও যে সব কারণে তাঁহারা নাস্তিক, সেই ভাবে ও সেই সব কারণে ইঁহারাও নাস্তিক। উভয়েরই লক্ষ্য কমিউনিজিম্। তবে এই লক্ষ্য সাধনের জন্য সোসিয়া-লিষ্টরা চাহিতেছেন, ষ্টেটের প্রভুত্বাধিকার এখন যাহা আছে, তাহা

আরও অনেক বাড়াইয়া মানবজীবনকে একরূপ সম্পূর্ণ ভাবেই তার আমলের মধ্যে আনিতে,—আর এনার্কিষ্টরা চাহিতেছেন, তাহাকে একেবারে লোপ করিয়া ফেলিতে। সোসিয়ালিষ্টরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, ব্যবসায়বাণিজ্যাদির ক্ষেত্রে আধুনিক ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজমের (Industrialism এর) স্বাভাবিক পরিণতিই হইতেছে, সোসিয়ালিজমের দিকে,—এনার্কিষ্টরাও আবার অনুরূপ বহু প্রমাণে দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন, বর্ত্তমান যুগসভ্যতা মানবের কর্ম্ম-জীবনকে এমন এক পরিণতি দান করিতেছে, যাহাতে এনার্কিজমই ভাবী সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা হইয়া উঠিবে, অন্ততঃ ষ্টেটের শাসনাধীন না হইতে স্বচ্ছন্দ এক শাসনমুক্ত অবস্থায় উপনীত হওয়া তার পক্ষে অতি সহজ হইয়া উঠিবে।

যে অর্থে সাধারণতঃ সোসিয়ালিজম্ নামটার ব্যবহারিক প্রয়োগ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহারই সঙ্গে এনার্কিজম্ মতের এই পার্থক্য দেখান হইল। কিন্তু মূলতঃ সোসিয়ালিজম্ বলিতে, সকলের আর্থিক অবস্থার যে সমতা, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বা competitionএর স্থলে যে সহযোগিতার বা associationএর প্রাধান্য, স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত স্বার্থকে সকলের সমবেত বা সামাজিক স্বার্থের অধীন ও অঙ্গীভূত করিয়া নেওয়া, ব্যক্তিগত সম্পদকে সমবেত বা সামাজিক সম্পদে পরিণত করা প্রভৃতি যাহা কিছু বুঝায়, কমিউনিষ্ট এনার্কিষ্টরাও তাহাই চান। সুতরাং এক হিসাবে ইহাকেও সোসিয়ালিজম বলা যাইতে পারে। কমিউনিষ্ট এনার্কিজম মতের প্রধান ব্যাখ্যাতা ও শ্রেষ্ঠ প্রচারক পিটার ক্রোপট্কিন (Peter Kropotkin) তাই ইহাকে 'No-Government system of Socialism' এই নামও দিয়াছেন। আর ইহার তুলনায় ব্যবহারিক যে প্রয়োগ Socialismএর হইয়াছে, তাহাকে 'All-government system of Socialism' বলা যাইতে পারে। যদিও State-Socialism (ষ্টেট সোসিয়ালিজম) বলিতে পৃথক একটা পদ্ধতি বুঝায়। এই মতের তত্ত্ব ও লক্ষ্য সম্বন্ধে পিটার ক্রোপটকিনের দুইটি উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"Anarchy, the No-Government system of socialism, has a double origin. It is an outgrowth of the two great movements of thought in the economical and political fields which characterise our century (the 19th century) and especially its second part. In common with all Socialists, the Anarchists hold that the private ownership of land, capital and machinery has had its time; that it is condemned to disappear; and that all requisites of production must, and will, become the common property of society, and managed in common by the producers of wealth. And, in common with all advanced representatives of political Radicalism, they maintain that the ideal of the political organisation of society is a condition of things where the functions of government are reduced to a minimum, and the individual recovers his full initiative and action for satisfying, by means of free groups and federations—freely constituted—all the infinitely varied needs of the human being. As regards Socialism, most of the Anarchists arrive at its ultimate conclusion, that is, at a complete negation of the wage-system and at communism. And with reference to political organisation, giving a further development to the above-mentioned part of the Radical programme, they arrive at the concluson that the ultimate aim of society is the reduction of the functions of government to

nil—that is to a society without government, to An-archy."

[Anarchist Communism, Freedom Pamphlet Series, by Peter Kropotkin, p I.]

ইহার মোট চুম্বক এই—

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে ব্যবসায়িক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের আদর্শ কি হইবে তার সম্বন্ধে বড় দুইটি প্রবল আন্দোলনে মানবের চিন্তা আত্মপ্রকাশ করিতেছে। একটি সোসিয়ালিজম্ আর একটি রাষ্ট্রীয় 'র‍্যাডিক্যালিজম' বা আমূল সংস্কারপ্রচেষ্টা। এনার্কিজম, যাহাকে রাষ্ট্রশাসন-মুক্ত সোসিয়ালিজম এই নামও দেওয়া যাইতে পারে, তাহা এই দুইটি চিন্তাস্রোতেরই উত্তর পরিণাম। অন্যান্য সোসিয়ালিজমের ন্যায় এনার্কিজমও চাহিতেছে,—ভূসম্পত্তি, ব্যবসায়িক মূলধন এবং কলের যন্ত্র প্রভৃতি উৎপাদনের যত কিছু করণ, সব ব্যক্তিগত অধিকার হইতে সকলের সমবেত অধিকারে আসিবে এবং সকলের সমবেত শ্রমে ব্যবসায়িক কাজ কর্ম্ম সব চলিবে। আবার রাষ্ট্রীয় চরম সংস্কার প্রয়াসীরা চাহিতেছেন, রাষ্ট্রশক্তির বর্ত্তমান অধিকার যতদূর সম্ভব সঙ্কুচিত করিয়া সমাজকে এমন এক অবস্থায় আনিতে হইবে, যাহাতে লোকে ব্যক্তিগত কর্ম্মশক্তি প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ পায় এবং কোনওরূপ শাসনে বাধ্য না হইয়া স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দভাবে পরস্পরের সহযোগী হইয়া সমবায় গঠন করিয়া নিজেদের যত কিছু প্রয়োজন সব নিজেরাই নির্ব্বাহ করিতে পারে। ইঁহারা চাহিতেছেন, রাষ্ট্রশক্তির অধিকারকে একটা minimum বা চরম সঙ্কোচের সীমায় আনিতে; আর এনার্কিষ্টরা চাহিতেছেন, এই চরম সঙ্কোচের সীমাকে—এই minimumকে—একেবারে শূন্যে পরিণত করিতে।

এই পুস্তিকার আর এক স্থলে (২২ পৃষ্ঠায়) তিনি আবার বলিতেছেন, "We are communists. But our communism is not that of either the Phalanstery or the

Authoratian school : it is Anarchist Communism, Communism without government, free Communism. It is a synthesis of the two chief aims prosecuted by humanity since the dawn of its history—economical freedom and polilitical freedom.

অর্থাৎ—আমরা কমিউনিষ্ট বটি, কিন্তু আমাদের এই কমিউনিষ্ট সাধারণ সোসিয়ালিষ্টদের ন্যায় কোনও রূপ দলপতির বা রাষ্ট্রশক্তির প্রভুত্বাধীন কমিউনিজম নয়। ইহা স্বাধীন ও শাসন-মুক্ত কমিউনিজম। রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসায়িক যে স্বাধীনতা সেই পুরাকাল হইতেই মানবের বড় দুইটি লক্ষ্য রহিয়াছে, আমাদের এই আদর্শে তাহার মিলন ঘটিয়াছে। এই আদর্শে মানব রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসায়িক স্বাধীনতা উভয়ই লাভ করিবে।

সুতরাং এনার্কিষ্ট বা অরাজক সমাজের যে আদর্শ ইঁহারা দেখাইতে চান, সভ্যতার ক্রমাভিব্যক্তির ফলে মানব যে উন্নত জীবনের অধিকারী হইয়াছে, তাহার সঙ্গে ইহার বিরোধ কিছু নাই ; বরং সেই আদর্শ এই অভিব্যক্তির আরও একটা উন্নততর স্তরের অবস্থাকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। টলষ্টয়ের আদর্শ সম্বন্ধে যে সব আপত্তির কারণ লোকের থাকিতে পারে, ইহার বিরুদ্ধে অন্ততঃ সেরূপ কোনও আপত্তির কারণ নাই।

ক্রোপটকিন বলেন, গবর্মেণ্ট ও তার সব আইন কতকটা আধুনিক যুগের বস্তু। অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ সব পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধে মিলিয়া এই পৃথিবীতে বাস করিতেছে। পরস্পরের সহযোগিতাই সামাজিক সম্বন্ধের মূল কথা। এই সহযোগিতা একদিকে যেমন ব্যক্তিগত সমবেত জীবনে সকলেরই বহু হিতসাধন করে, অন্যদিকে আবার ইহার জন্য সকলকেই অনেক স্বার্থ ত্যাগ করিতে হয়, অনেক বিষয়ে সংযত হইয়া চলিতে হয়। এই সহযোগিতা কিভাবে চলিবে, অপরের জন্য কোথায়, কাহাকে কি স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে, সংযম কোন্ কোন্ বিষয়ে

কিরূপ প্রয়োজন ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক রীতিনীতি দেখা দেয়, এবং সকলেই এসব মানিয়া চলিতে অভ্যস্ত হয়। কেহ না মানিলে কি মানিতে না চাহিলে লোকমতের প্রভাবই তাহাকে বশীভূত করিতে পারে। অগত্যা সকলে তাহাকে বর্জ্জন করে। তখন সে নিরুপায় হইয়া পড়ে; লোকমতের বশ্যতা স্বীকার না করিয়াই পারে না। ক্রোপটকিন বলেন, প্রাচীনকালে এই সব রীতিনীতি বা আচারকে আশ্রয় করিয়াই প্রথম সমাজজীবন গড়িয়া ওঠে; সামাজিক সব প্রতিষ্ঠান আচারের অনুবর্ত্তী হইয়াই চলে; কোনও রূপ শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম (religion) বা রাষ্ট্রী শাসনের অপেক্ষা কিছু রাখে না। বস্তুতঃ এইরূপ কোনও শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম বা রাষ্ট্রীয় বিধির প্রবর্ত্তনের আগেই এইসব আচারধর্ম্মই সমাজের আশ্রয় ও ধাবক হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য অতি বৃহৎ ও ব্যাপক কোনও সমাজ এ অবস্থায় সম্ভব হয় না, হয় ছোট ছোট গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের ছোট ছোট সব সমাজ, এবং তাহাই হইত। মানবের সুখশান্তির ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। ছোট ছোট সব সমাজ, ছোট বড় ভেদ নাই, সকলেই সকলের আপন জন, মিলিয়া মিশিয়া আনন্দে সকলে কাজকর্ম্ম করে, সুখশান্তির সব ব্যবস্থা করে,—সুখশান্তি যাহা কিছু ঘটে, সকলেই সমান ভাবে তাহা ভোগ করে। পাশাপাশি আরও অনেক এইরূপ সমাজ রহিয়াছে, সকলেই এই ভাবে চলিতেছে। কেহ কাহারও ধন সম্পদ কাড়িয়া নেয় না, কেহ কাহারও উপরে প্রভুত্ব বিস্তারও করিতে চায় না।

সাধারণ জনগণের সুখস্বচ্ছন্দতার দিক দিয়া দেখিলে ইহা অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় সমাজপদ্ধতি আর কিছু হইতে পারে না, এবং প্রাচীনকালে এইরূপ সব সমাজ এই ভাবেই মানবের মধ্যে হইয়াছিল, এই ভাবেই চলিতেছিল। কিন্তু চতুর ও শক্তিমান্ এমন লোক সর্ব্বত্রই আছে, যাহারা অতি লোভী, অপরের শ্রমজাত ধন বলে কাড়িয়া কি কৌশলে ঠকাইয়া নিতে চায়, বলদর্পে কি বিদ্যাবুদ্ধির অভিমানে অন্যের উপরে প্রভুত্ব করিতে চায়। ইহাদের মধ্য হইতেই ক্রমে যোদ্ধা ও যাজক

সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়। যোদ্ধারা বাহুবলে এইরূপ স্বতন্ত্র সমাজগুলিকে আপনাদের শাসনাধীন করে, এবং যাজকরাও ধর্ম্মের একটা বুজরুকি করিয়া মিথ্যা সব শাস্ত্রবিধি গড়িয়া, সরল জনগণকে ভুলাইয়া আপনাদের বশীভূত করিয়া ফেলে। এই ভাবেই সব ষ্টেট্ ও চার্চ্চ হইয়াছে, এবং পরস্পরের সহায়তায় আপনাদের কঠোর প্রভুত্বের পাশে জনসমাজকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। এই প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য, আরও বাড়াইবার জন্য, নানারকম আইনকানুন করিতেও ইহারা আরম্ভ করে। ইহাদের এই প্রভুত্বের প্রথম যুগে যতটা সম্ভব বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের মধ্যে প্রচলিত আচারধর্ম্মের দিকে কতকটা লক্ষ্য রাখিয়াই আইনকানুন ইহারা করিত। শাস্ত্রবিধিও যতটা সম্ভব আচারধর্ম্মেরই পথ ধরিয়া চলিত। কেবল সেই আচার-ধর্ম্মের উপরে এমন সব নূতন বিধিব্যবস্থা চাপান হইত, যাহাতে ইহাদের প্রভুত্ব নির্ব্বিবাদে সকলে মানিয়া নেয়, বিরুদ্ধে কোথাও মাথা তুলিয়া কেহ না দাঁড়ায়। অতি কঠোর শাসনে এরূপ বিরুদ্ধ ভাব কি চেষ্টাও সর্ব্বত্র দমন করা হইত। যাজক ও যোদ্ধৃ ভূ-স্বামী সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব এই ভাবে ক্রমে বাড়িয়া ওঠে, এবং তাহাদের স্বার্থমূলক একটা শাসনপদ্ধতিও জনসমাজের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফরাসী বিপ্লবের পর এই পদ্ধতি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে, এবং যাজক ও যোদ্ধৃ ভূ স্বামীদের হাত হইতে এই প্রভুত্ব বুর্জ্জোয়স্ বা শিক্ষিত ও ধনী ব্যবসায়িক ভদ্রসম্প্রদায়ের হাতে আসিয়া পড়ে। জনগণ এখন ইহাদের অধীন হইয়া পড়িয়াছে, এবং ইহাদের আয়ত্ত পার্লামেণ্ট সমূহের যত আইন—সব ইহাদেরই এই প্রভুত্ব ও অন্যান্য স্বার্থ বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যেই করা হইতেছে। বর্ত্তমান এই পার্লামেণ্টীয় শাসন যুগের আরও একটি বিশেষত্ব এই যে কেবল আইন করিয়া, আইনের বলেই সামাজিক যাবতীয় কর্ম্ম রাষ্ট্রনায়কবর্গ নির্ব্বাহ করিতে চান। পূর্ব্বে আচারধর্ম্মের স্বতন্ত্র অধিকার যতটা সম্ভব বজায় রাখিয়া, যতটা সম্ভব তার মধ্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া,

রাষ্ট্রপ্রভুরা যেরূপ চলিতেন, এখন আর তা বড় চলেন না। লোকেরও গতিগতি অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে; স্বাতন্ত্র্য ও স্বাবলম্বনের বল হারাইয়া যত কিছু অভাব অভিযোগ হইতে পারে, সকলের জন্য লোকে কেবলই আইন চায়। আইন ছাড়া নিজেরাও যে অনেক কাজ নিজেরা করিয়া নিতে পারে, আগে তাই-ই নিত, এ কথাও লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। *

কেবল কাজ কর্ম্মের ব্যবস্থার জন্য নয়, লোককে আইনের পথে রাখিতেও অনেক আইন করিতে হয়। দণ্ডবিধি বিচারবিধি প্রভৃতি অতি বিপুল ও জটিল সব শাস্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। এই সব আইনের জটিল চক্রে যে একবার গিয়া পড়িবে, অথবা দুর্ভাগ্য যাহাকে টানিয়া নিবে, তাহার লাঞ্ছনার আর পার থাকে না; প্রায় সর্ব্বস্বান্ত

---

* In the existing States a fresh law is looked apon as a remedy for evil. Instead of themselves altering what is bad, people begin by demanding a law to alter it. If the road between two villages is impassable, the peasant says,—"There should be a law about parish roads" If a park-keeper takes advantage of the want of spirit in those who follow him with servile observance and insults one of them, the insulted man says, "There should be a law to enjoin more politeness upon park-keepers. If there is a stagnation in agriculture or commerce, the husbandman, cattle-breeder, corn speculatar argues, "It is protective legislation that we require." Down to the old clothesman there is not one who does not want a law to protect his own little trade.

[Law & Authority, Feedom Pamphlet Series, Peter Kropotkin. p. 1.]

ড্যালয় (Dalloy) নামক একজন ফরাসী ব্যবস্থাবিশারদ ও ব্যবস্থা সঙ্কলকও একস্থলে লিখিয়াছেন, "When ignorance reigns in society and disorders in the minds of men legislation is expected to do everything and each fresh law being a fresh miscalculation, men are continually led to demand from it what can only proceed from themselves, from their own education and own morality."

না হইয়া অনেকেই আর বাহির হইয়া আসিতে পারে না। যে ক্ষতির প্রতিকারের আশায় সাধ করিয়া লোকে যায়, প্রতিকারে সেই ক্ষতির দশগুণ ক্ষতি তাহাকে স্বীকার করিতে হয়।

আবার যত আইন হইতেছে, আইনের পাশে সমাজকে যত অষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা হইতেছে, লোকের বুদ্ধি ও মতিগতিও সব কেবল আইনেরই অনুগত হইয়া পড়িতেছে। আইনের কাছে কোন্ কার্য্যে কে কত দায়ী, কিসে আইনে ধরা পড়িবে কিসে পড়িবে না, এই কথাই লোকে বেশী ভাবে, সেই ভাবেই চলিতে চায়। নিজের সহজ ধর্ম্ম কি, সামাজিক কর্ত্তব্য কি, এ সব কথা কাহারও বড় মনে হয় না; সে ভাবে চলিবার প্রবৃত্তি লোপ পায়, অভ্যাসও শিথিল হইয়া যায়। আইন বাঁচাইয়া, আইনে ধরা না পড়িতে হয় এই দিকে সতর্ক থাকিয়া, উচ্চশিক্ষিত পদস্থ লোকেরাও স্বার্থসাধনে কি ভোগলিপ্সার চরিতার্থতা-সম্পাদনে দ্বিধা কিছু বড় করেন না। ইতর দুর্ব্বৃত্তদের ত কথাই নাই। যত আইন হইতেছে, আইন এড়াইয়া দুর্ব্বৃত্তার অদ্ভুত সব কৌশলও তত ইহারা আবিষ্কার করিতেছে। এত আইন, এত পুলিশ, এত বিচারালয়ের মধ্যেও অধুনা যেরূপ অতি ভয়ঙ্কর সব দুষ্কৃতি ও কূট-কৌশলের খেলা সমাজে চলিতেছে, পূর্ব্বে এরূপ কখনও ছিল বলিয়া কেহ মনে করেন না। ক্রোপটকিন বলেন, এই শাসন কেবল ব্যক্তিগত সম্পদের অবাধ অধিকারকে আর ধনিক সম্প্রদায়ের ব্যবসায়িক প্রভুত্বকেই রক্ষা করিতেছে, অন্যথা আর সকল দিকেই ইহার যত কিছু চেষ্টা সব ব্যর্থ হইয়াছে, লোক সমাজে বহু অনিষ্ট বই ইষ্ট কিছু সাধন করিতেছে না।

তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে ফরাসী বিপ্লবের পর এই যে গণতন্ত্র বা গণপ্রতিভূ-তন্ত্র শাসনের (Representative government এর) অভ্যুদয় হইয়াছে, অন্যভাবে লোকসমাজের বড় একটা কল্যাণ তাহাতে ঘটিয়াছে। রাজদরবারের অবাধ প্রভুত্ব লোপ পাইয়াছে; রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে জনসাধারণও একটা সাড়া দিতে

শিখিয়াছে। কিন্তু একাজ তার হইয়া গিয়াছে। ভাবী কমিউনিষ্ট যে সমাজ আসিতেছে; তাহাও এই গণতন্ত্র-শাসনকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইবে, এইরূপ ভাবিলে কি এই ভাবে চলিলে, বড় একটা প্রমাদ করা হইবে। আর্থিক ও ব্যবসায়িক জীবন যখন সমাজে যেরূপ থাকে, রাষ্ট্রীয় সব প্রতিষ্ঠানাদিও তদনুযায়ী হইয়া দাঁড়ায়। ব্যক্তিগত সম্পদের (private propertyর) উপরেই বর্ত্তমান আর্থিক ও ব্যবসায়িক জীবন আশ্রিত হইয়া আছে। ইহাকে যদি বদলাইয়া ফেলিতে হয়, আধুনিক রাষ্ট্রশক্তির ভিত্তিকে ও আইনের শাসনকেও তেমনই বদলাইয়া ফেলিতে হইবে। পূর্ব্বে ষ্টেটের হাতে যে সব কর্ম্মের অধিকার ছিল, ষ্টেটেরই ন্যায্য অধিকার বলিয়া যাহা গণ্য হইত, ক্রমে সে সব এখন স্বাধীনভাবে গঠিত স্বতন্ত্র সব জনসমিতির হাতে যাইতেছে, ষ্টেটের অধিকারের সীমা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে ষ্টেটের আইনের শাসনাধিকার বাড়াইবার দিকে নয়, একেবারে তাহাকে লোপ করিবার দিকেই যে এই পরিবর্ত্তনের গতি চলিতেছে, ইহা হইতে তাহারই স্পষ্ট ইঙ্গিত আমরা আমরা পাইতেছি। *

---

* Represenlative government has accomplished its historic mission. It has given mortal blow to court-rule, and by its debates it has awakened public interest in public questions. But to see in it the government of the future socialist society is to commit a grave error. Each economical phase of life has its corresponding political phase, and it is impossible to touch the very basis of the present economic life—private property—without a corresponding change in the basis of the political organisation. Life already shows in which direction the change will be made. Not in increasing the powers of the state, but in resorting to free organisation and free federation in all those branches which are now considered as attributes of the State.

[Anarchist Communism, Kropotkin, p. 28-9.]

তাই কার্লমার্ক্সের (Karl Marxএর) দলের সোসিয়ালিষ্টরা যে ষ্টেটের শাসনাধিকার আরও বাড়াইয়া তাহারই উপরে সোসিয়ালিষ্ট সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছেন, তাহা হইবার নহে। মানব তাহার কর্ম্মক্ষেত্রকে ষ্টেটের শাসনপাশ হইতে ক্রমে মুক্ত করিয়া নিতেই চাহিতেছে; তার কর্ম্ম প্রচেষ্টা সব সেইভাবে সেই দিকেই প্রযুক্ত হইতেছে। কল্যাণকর বহু প্রতিষ্ঠান তাহাতে গড়িয়া উঠিয়াছে; অতি নিপুণ শৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইতেছে।

কত বিজ্ঞান পরিষৎ, শিক্ষায়তন, কত চিকিৎসালয়, অনাথাশ্রম; লোকহিতকর আরও কতশত রকম প্রতিষ্ঠান ও সভাসমিতি আমরা এখন দেখিতে পাই, যাহা গবর্মেণ্টের কর্ত্তৃত্ব কি আইন-শাসনের বাহিরে স্বতন্ত্র সব organisation বা কর্ম্মমণ্ডলীর হাতে রহিয়াছে। এ সব free association; বহু লোকে স্বেচ্ছায় মিলিয়া নিজেরাই নিয়ম কানুন করিয়া এই সব মণ্ডলী গড়িয়া তুলিয়াছে, স্বেচ্ছায় নিয়ম কানুন সব মানিয়া কাজকর্ম্ম পরিচালনা করিতেছে। বহু অর্থ নিজেদের চেষ্টায় সংগৃহীত হইতেছে, তাহার সংরক্ষন কি যথাপ্রয়োজন ব্যয়ের বিধিব্যবস্থা সব নিজেরাই করিয়া নিতেছে। নিয়ম কেহ ভাঙ্গিলে, অর্থের অপব্যবহার কেহ করিলে, নিজেরাই তাহার যথোচিত প্রতিবিধান করিতেছে। আইনের দণ্ড প্রয়োজন বড় হয় না, ধিক্কার কি বহিষ্কারের গ্লানিই অপরাধনিবারণ কি অপরাধীর দমনের পক্ষে যথেষ্ট হয়। আধুনিক বড় বড় সব ব্যবসায়ও এইরূপ free associationবা স্বতন্ত্র মণ্ডলীর কর্ত্তৃত্বে চলিতেছে। কেবল একটি দেশের মধ্যেই যে ইহাদের কর্ম্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা নয়,—বিভিন্ন দেশের মণ্ডলীর মধ্যে বড় বড সব সহযোগ বা free federationও গড়িয়া উঠিয়াছে; অতি সুশৃঙ্খলভাবে কাজকর্ম্ম সব নির্ব্বাহ হইতেছে। ইহার মধ্যে রেলওয়ে ও তাহার সঙ্গে সংযুক্ত ষ্টীমার-সার্ভিস সমূহের ব্যবস্থা বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। কেবল একদেশের বিভিন্ন কোম্পানীর নয়, বিভিন্ন দেশেরও ভিন্ন ভিন্ন

কোম্পানীর সব রেলওয়ে ও ষ্টীমার-সার্ভিস আশ্চর্য্য এক নিয়মশৃঙ্খলায় পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার সম্বন্ধ রাখিয়া চলিতেছে। একখানি টিকিট করিয়া কত দেশ বিদেশ—কখনও জলপথে কখনও স্থলপথে—লোকে ঘুরিয়া আসিতেছে,—সব যেন একজনের বা একদলের ব্যবস্থা করা পথ। কত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কোম্পানী যে এই দীর্ঘপথের বিভিন্ন অংশের মালিক, ইহা অনুভব করিবারই অবসর কেহ বড় পায় না। অতি বৃহৎ ও জটিল এই যে international railway and steamer-service federation—(অন্তর্জ্জাতিক রেলওয়ে ও ষ্টীমার কোম্পানীর সহযোগ)—ইহা একটি স্বাধীন সমবায়; কোনও গবর্মেণ্টের উপরে কোনওরূপ কর্ম্মব্যবস্থার জন্য ইহা নির্ভর করে না। আরও একটি নাম করা যাইতে পারে, international banking federation বা অন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের সহযোগ। দেশ বিদেশের সঙ্গে বিপুল যে বাণিজ্য বর্ত্তমান জগতে চলিতেছে, তার সব দেনাপাওনার নিকাশ এই সব ব্যাঙ্কের সাহায্যেই হয়।

কেহ বলিতে পারেন, গবর্মেণ্টের আইনের বল এই সব মণ্ডলীর পশ্চাতে রহিয়াছে, ইহাদের সব অধিকার (rights and privileges) ইহারা ভোগ করে গবর্মেণ্টের অনুমোদনে; গবর্মেণ্টের আইন এই সব অধিকারকে রক্ষা করে; কর্ম্মশৃঙ্খলা কেহ লঙ্ঘন করিলে, তাহার পথে কেহ বাধা দিলে, গবর্মেণ্টই অপরাধীর দণ্ড বিধান করিয়া তাহার স্থিতির পক্ষে সহায়তা করে।

হাঁ, করে। গবর্মেণ্ট আছে বলিয়াই করে। যদি না থাকিত, এইটুকু সহায়তার অভাবে এসব কাজ পণ্ড হইত না। এত বড় বড় এই যে সব free association ও free federation, এসব গঠন করিবার ও পরিচালনা করিবার শক্তি গবর্মেণ্টের নিকট হইতে কোথাও কেহ পায় নাই। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে বহু উন্নত কর্ম্মানুশীলনে ক্রমে এই শক্তি আপনা হইতেই মানবের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে শক্তি এত বড় বড় সমবায় গঠন করিয়া এত বড় বড় সব কর্ম্মের

সুশৃঙ্খলা ও পরিচালনা করিতে পারে, সেই শক্তিই ইহাদের রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে। ওদিকে সামাজিক জীবনের উন্নতির সঙ্গে লোকের বুদ্ধিও এমন উন্নত হইয়াছে, সামাজিক কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের বোধও এমন বিকাশ লাভ করিয়াছে, যে সাধারণতঃ এই সব নিয়মশৃঙ্খলা স্বেচ্ছায়ই সকলে মানিয়া চলে, চলিতে অভ্যস্ত হইয়া হইয়া উঠে। যাহারা লঙ্ঘন করে কি বাদী হইয়া দাঁড়াইতে চায়, তাহাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। অন্য সকলের ধিক্কারে যদি ইহারা লজ্জা না পায়, সংযত না হয়,—তবে ইহাদের সঙ্গে সকল সংস্রব সকলে বর্জ্জন করিতে পারে, নিরুপায় তখন বশ্যতা স্বীকার ইহারা না করিয়াই পারিবে না।

যাহা হউক, এই সব স্বতন্ত্র মণ্ডলী ও মণ্ডলী-সহযোগের কর্ম্মক্ষেত্র যতদিকে যতই প্রসার লাভ করুক, এই সব কাজকর্ম্ম যতই সুশৃঙ্খল ভাবেই তাহারা সম্পাদন করিতে সমর্থ হউক, ইহার বাহিরে আরও এমন অনেক কাজ আছে যাহা গবমেণ্টই পরিচালনা করিতেছেন, গবমেণ্টই পরিচালনা করিতে পারেন। কতক আইনের শাসন ব্যতীত হয় না, কতক গবমেণ্ট ব্যতীত অন্য কোনও রূপ স্বতন্ত্র মণ্ডলী কি শক্তিচক্রের সাধ্যাতীত বা অধিকারবহির্ভূত, অন্ততঃ মানবজীবনের বর্ত্তমান অবস্থায়। চোরডাকাতের উপদ্রব আছে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা আছে। এমন দুঃসাহসী ও দুর্দ্দান্ত লোক অনেক আছে, যাহারা কেবল দুষ্প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্যই লোকের উপরে কত অত্যাচার করে। লোকনিন্দার ভয় ইহারা করে না। বর্জ্জন করিতে চাহিলেও সকলের বর্জ্জিত ইহারা হয় না; বহুলোককে নানা উপায়ে বাধ্য করিয়া দলে রাখিতে পারে। এই যে সব free association বা স্বাধীন মণ্ডলীর কথা হইল, তার মধ্যেও এমন দুর্জ্জয় লোক মধ্যে মধ্যে দেখা দেয়, যাহারা সকল নিয়মকানুন পদদলিত করিয়াও সেই মণ্ডলীর মধ্যে শক্ত হইয়া থাকে, বড় এক একটা দল বাঁধিয়া যাহা খুশী করে। মণ্ডলী ছাড়িয়া যায়, তবু ইহাদের বহিষ্কৃত করিতে কেহ পারে না।

কোনও না কোনও রূপ গবর্মেণ্ট ও আইনের দণ্ড ব্যতীত এই সব উৎপাত ও অত্যাচারের দমন আর কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তারপর প্রবল বিদেশীর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধ-বিগ্রহও করিতে হয়। তাহাই বা গবর্মেণ্ট ব্যতীত আর কে করিতে পারে?

ইহার উত্তরও ক্রোপটকিনপ্রমুখ এনার্কিষ্টরা দিয়াছেন। কমিউনিষ্ট সমাজের গোড়ার কথাই এই যে ব্যক্তিগত সম্পদ কাহারও কিছু থাকিবে না। সুতরাং চুরীডাকাতী, কি সম্পত্তি লইয়া কোনওরূপ বিবাদ বিসম্বাদ, প্রতারণা কি দাঙ্গা হাঙ্গামা—কিছুরই কোনও সম্ভাবনা এ অবস্থায় ঘটিতে পারে না। অন্য যত রকম অপরাধ লোকে করে, সকলেরই মূলে রহিয়াছে দারিদ্র্য ও অভাব। এই সমাজে দারিদ্র্য ও অভাব কাহারও কিছু থাকিবেনা। কারণ দেশের সকল সম্পদ, যত কিছু ভোগ্য, ছোট বড় সকলেই সমান ভাগে বা প্রয়োজন-মত ভোগ করিবে। অভাব যদি কাহারও কিছু না থাকিল, দারিদ্র্য যদি দূর হইল, সকলেই যদি যথাপ্রয়োজন ভোগ্যলাভে সুখে স্বচ্ছন্দে রহিল,—অন্যায় কার্য্যে কোনও প্রবৃত্তিই আর লোকের থাকিবেনা, সকল পাপ, সকল দুষ্কৃতি লোক সমাজ হইতে দূর হইবে; দুষ্টের দমনে দণ্ডের কোনও ব্যবস্থার প্রয়োজনই হইবে না। কিন্তু এইখানে ইঁহারা বড় একটা ভুল ধারণা করিয়াছেন বলিতে হইবে। দারিদ্র্য ও অভাব বহু পাপের উত্তেজক কারণ সন্দেহ নাই। কিন্তু সকল পাপের প্রকৃত মূল কারণ হইতেছে মানবচিত্তে কামক্রোধাদি রিপুর প্রভাব। অভাব ও দারিদ্র্যের তাড়না কোনও কোনও রিপুকে কিছু বেশী উত্তিক্ত করিয়া কখনও কখনও তোলে বটে; কিন্তু অভাব ও দারিদ্র্য ইহাদের সৃষ্টি করে না, এবং কোনও দারিদ্র্য ও অভাব যেখানে নাই, সেখানেও মানুষ অতি গুরু সব দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকে, কেবল এই সব উদ্দাম রিপুরই বশে। ভোগ করিবে না, ভোগের জন্য অত প্রয়োজন হইবে না, জানিয়াও বহু ধনা অবিরত

পরের ধন লিপ্সা করে, ছলে বলে আত্মসাৎ করিতে চায়। প্রচণ্ড ক্রোধের উত্তেজনায় মানুষ মানুষকে হিংসা করে। দরিদ্র অপেক্ষা ধনীর মধ্যেই এই অপরাধ অধিক দেখা যায়। গৃহে প্রেমময়ী সুন্দরী স্ত্রী রহিয়াছে, তবু বহু লোক ছলে বলে পরস্ত্রীহরণ করে, অরক্ষিতা কুলকন্যাকে ধর্ষণ করে। এসব দুর্ব্বৃত্তিও দরিদ্রের মধ্যে তত বেশী দেখা যায় না, যত অনেক বেশী ধনীর মধ্যেই দেখা যায়। তা ছাড়া, বলদর্পে, প্রভুত্বের মোহে, ঈর্ষাদ্বেষের তাড়নায়, (মদ মোহ মাৎসর্য্যের বশে) অবিরত কত যে অন্যায় মানুষ মানুষের উপরে করিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অনেক এইরূপ অপরাধ লোকমতের প্রভাবে—অগত্যা বর্জ্জন-বহিষ্কারাদি সামাজিক শাসনেও—দমিত হয়, কিন্তু সব হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অতি দুঃসাহসী ও দুর্জ্জয় এমন লোক আছে, যাহারা লোকমতকে গ্রাহ্য করে না, বর্জ্জন ও বহিষ্কারের সকল চেষ্টা তাহাদের বিরুদ্ধে বিফল হয়।

তবে এনার্কিষ্টরা বলেন, লোকের স্বাধীন সব সমিতি (free associations) বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যেই যদি এত বড় বড় সব কাজ এরূপ দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতে পারিতেছে, এনার্কিজমের দিকে আরও অগ্রসর হইলে লোকস্থিতির জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন ক্রমে সবই করিতে পারিবে। লোকের দোষ ত্রুটি, অপরের সম্বন্ধে অপরাধ একেবারে দূর না হইতে পারে। কিন্তু এখনও এত সব আইন কানুন ও শাসনের মধ্যে এত যে গুরু অপরাধ লোকে করিতেছে, তাহাতেও ত সমাজ একরূপ টিকিয়া আছে। তখনই বা থাকিবে না কেন? অপরাধের সংখ্যা তখন অনেক কম হইবে, এই ভরসাও করা যায়।

তারপর যুদ্ধবিগ্রহের কথা। এনার্কিষ্টরা বলেন, এক একটি দেশে খণ্ড ভাবে এনার্কিজম্ চলিতে পারে না। সমগ্র জগৎকেই সমানভাবে এনার্কিজমের দিকে লইয়া যাইতে হইবে। যে বিপ্লব

মানবসমাজে এনার্কিজম্ আনিবে, সে বিপ্লব জগৎব্যাপী বিপ্লব হইবে, কোথাও কোনও দেশে কোনও জাতির মধ্যেই কোনও গবর্মেণ্ট থাকিবে না। মানবসমাজ হইতেই গবর্মেণ্টরূপ দণ্ডাশ্রিত শক্তি-চক্র লোপ পাইবে ; স্বেচ্ছায় গঠিত স্বাধীন সব সমিতি বা মণ্ডলীই যাবতীয় সামাজিক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবে। ইহাই এনার্কিজমের লক্ষ্য। লক্ষ্য যখন সিদ্ধ হইবে, যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রয়োজনই তখন চলিয়া যাইবে, আয়োজনের কথা কোথাও কাহাকে ভাবিতে হইবে না।

এইরূপ এনার্কিষ্ট বা অরাজক জগতে যেমন ব্যক্তিগত পৃথক্ সম্পত্তির অধিকার, তেমনই ব্যক্তিগত পৃথক্ পরিবার, কিছুই চলিতে পারে না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ত ইঁহারা রাখিতেই চান না ; ব্যক্তিগত পৃথক্ পরিবারও এমন বাঞ্ছনীয় কিছু বলিয়া মনে করেন না। পরিবারের স্বার্থ, পরিবারের দায়িত্ব, মানুষকে কমিউনিষ্ট জীবনের আদর্শ হইতে প্রত্যাবৃত্ত করে বলিয়া ইহার লোপই বরং ইঁহারা কামনা করেন। এসম্বন্ধে সাধারণ সোসিয়ালিষ্টদের সঙ্গে ইহাদের মতের পার্থক্য বড় কিছু নাই। ইঁহারা আরও বলেন, অশন বসন এবং গর্ভজাত সন্তান-পালনের প্রয়োজনেই নারীকে আইনসঙ্গত একটা বিবাহের চুক্তিতে স্বামীর অনুগত ও আশ্রিত থাকিতে হয়, এবং তাহা হইতেই এক একজন পুরুষের কর্ত্তৃত্বাধীন এক একটি পৃথক পরিবারের উদ্ভব হয়। কিন্তু নরনারী ও বালবৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিই খাইয়া পরিয়া সুখে থাকিতে পারে এমন অবস্থা যে সমাজে সম্ভব, সে সমাজে নারী কেন এইরূপ একটা আশ্রয়ের প্রয়োজনে বৈবাহিক সম্বন্ধে পুরুষের সঙ্গে বদ্ধ হইবে ? সুতরাং বিবাহ ও পরিবারিক জীবন আপনা হইতেই লুপ্ত হইবে। নর নারীর যৌন সম্বন্ধ কেবল রুচি ও প্রবৃত্তির অনুসারেই যাহা ঘটিবার ঘটিবে, এবং নূতন মানব যাহারা সমাজে জন্ম গ্রহণ করে, অন্য সকলের ন্যায় তাহারাও সমাজকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইবে।

কিন্তু যতই মানব এভাবে জন্ম গ্রহণ করুক, যতই তাহাদের সংখ্যা বাড়ুক, খাইয়া পরিয়া সুখে থাকিবার মত পর্য্যাপ্ত অশন বসন ও বাস

গৃহাদি সকলের এ অবস্থায় জুটিবে কিনা? ক্রোপট্‌কিন বলেন, জুটিবে। উন্নত বুদ্ধিবিদ্যার ও শ্রমশক্তির প্রয়োগে মানব এই বসুন্ধরা হইতে অফুরন্ত ধন আহরণ করিতে পারে। তাঁহার অতি প্রসিদ্ধ কয়েকখানি গ্রন্থে * অতি বিশদভাবে তিনি দেখাইয়াছেন, অধুনা যে উন্নত-বিদ্যা ও বুদ্ধির অধিকারী মানব হইয়াছে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে যে ভাবে সে আয়ত্ত করিয়াছে, এবং তাহার সাহায্যে বিবিধ কর্ম্মক্ষেত্রে শ্রমশক্তি যে ভাবে সে প্রয়োগ করিতে শিখিয়াছে, তাহাতেই ইহা সম্ভব হইতে পারে। তাহা যে হইতেছে না, তাহার কারণ এই বিদ্যাবুদ্ধি, এই বিজ্ঞান এবং এই শ্রমশক্তি এখন ধনী মহাজনদের স্বার্থের অধীন হইয়া চলিতেছে, কেবল তাহাদেরই স্বার্থকে পুষ্ট করিতেছে। রাষ্ট্রশাসন তাঁহাদেরই শক্তির আশ্রয়, ব্যবসায়বাণিজ্য সব তাঁহাদেরই প্রভূত অর্থাগমের উপায়। ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর ও ভোগবিলাসের অশেষ সম্ভার সংগ্রহে এই অর্থ তাঁহারা জলের মত ব্যয় করিতেছেন। আধুনিক সব অতি জটিল ও বিশাল রাষ্ট্রচক্রের সঙ্গঠনে পরিরক্ষণে ও পরিবর্দ্ধনে, সাম্রাজিক সমরসজ্জায় লক্ষ লক্ষ সৈনিক পালনে, বহুমূল্য অস্ত্রশস্ত্রের আয়োজনে, দুর্ভেদ্য সব দুর্গের সংস্থানে, জল স্থল ব্যোমচারী বৈজ্ঞানিক বহুবিধ যানের নির্ম্মাণে, সামরিক আরও কত রকম প্রয়োজনে, যত ধন, যত শক্তি, অযথা কেবল লোকহত্যার জন্যই ব্যয়িত হইতেছে, শুধু তাহারই অন্যরূপ প্রয়োগে অশন বসনাদি নিত্য ব্যবহার্য্য ধন এত উৎপন্ন করা যায়, যাহাতে এক একটি দেশের অধিকাংশ লোকই হয়ত প্রচুর খাইয়া পরিয়া স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারে। ধনী প্রমোদবিহার করিবেন, কত বিশাল উদ্যান মালীরা তার জন্য সাজাইয়া রাখিতেছে। আনন্দে কখনও বন্ধুজন সহ পদচারণা করিবেন, সুরম্য তরুশ্রেণী-শোভিত কত মুক্ত ক্ষেত্র তার জন্য প্রাসাদের চারিধারে বিস্তৃত রহিয়াছে।

---

* The Conquest of Bread, Field Factory and Workshop, ইত্যাদি। এই গ্রন্থের ৪৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আরামে তাঁহারা মোটর বিহার করিবেন, অতি প্রশস্ত
দূর দূর—কতদূর চলিয়া গিয়াছে। যে পরিমাণ [illegible]
আবদ্ধ রহিয়াছে, লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের [illegible] [illegible] [illegible]
অশেষ বিলাসসম্ভারে সজ্জিত দশজন ধনীর বিশাল সৌধের ব্যয়ে
গ্রামে দশ সহস্র দরিদ্রের স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ নির্ম্মিত হইতে পারিত। প্রাণান্ত শ্রমে যাহারা নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহারা হয়ত সপরিবারে আলোক-বাতায়নবিহীন অতি সঙ্কীর্ণ সব মলিন গৃহে বাস করিয়া অশেষ রোগে দুঃখে অকাল মৃত্যুর কবলিত হইয়াছে! অন্য সব বড় বড় বিলাসের ত কথাই নাই, সম্ভ্রান্ত কোনও ধনী মহিলা এক রাত্রির—মাত্র এক রাত্রির—নাচভোজের জন্য যে পরিচ্ছদ অঙ্গে ধারণ করেন, তাহারই উপকরণ সংগ্রহে, কারুশিল্পের শোভাসম্পাদনে, নিপুণ সংযোজনে, হয়ত বহু সহস্র শ্রমিকের শ্রম ক্ষয়িত হইয়াছে!

যদি ব্যক্তিগত স্বত্বস্বামিত্বে সম্পত্তি সঞ্চয়ের ব্যবস্থা না থাকিত, ধনী যদি সেই অধিকারে বিপুলসম্পত্তির অধিকারী হইয়া ভোগসুখে এই ভাবে তাহা ব্যয় করিবার সুযোগ না পাইতেন, ধন বলে যদি তাঁহারা অগণিত দরিদ্রের শ্রমশক্তি নিয়োগের কর্ত্তা না হইতেন, আর কেবল নিজেদেরই ইষ্ট সাধনে তাহা নিয়োগ না করিতে পারিতেন, বহু যুগের সঞ্চিত দেশের সকল সম্পদ এবং পুরুষপরম্পরায় বহুলোকের বহুসাধনায় লব্ধ দেশবাসীর সকল বুদ্ধি বিদ্যা ও শ্রমশক্তি যদি সমবেত ভাবে সকলের সমান কল্যাণকর সব কর্ম্মে প্রয়োগ করা সম্ভব হইত, তবে অনেক অল্পশ্রমক্লেশেই প্রয়োজনীয় ধন এত বেশী উৎপন্ন ও সংগ্রহ করা যাইত, যে কোথাও কাহারও কোনও অভাব কিছুতে থাকিত না। কেবল যে অশন বসন ও বাসভবনেই এই ধন নিঃশেষ হইয়া যাইত, তা নয়,—লোকের জ্ঞানানুশীলনী ও চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সমূহের যথোচিত চরিতার্থতা হইতে পারে; তাহার বহু আয়োজনও এঅবস্থায় সম্ভব হইত।

হাঁ, এ সবই সম্ভব হইত। কিন্তু কাজ যদি লোকে না করে?

সকলকেই ত খাওয়াইয়া পরাইয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে, সুখেও রাখিতে হইবে। উপরে কোনও শাসন নাই, অভাবের তাড়না নাই, প্রয়োজনের কোনও বাধ্যবাধকতা নাই,—কাজের তাগিদ যদি লোকের না হয়? বেশীর ভাগ লোকই যদি অলস ভাবে বসিয়া থাকিতে চায়? তখন কি হইবে? বিদ্যাবুদ্ধির অধিকার ও বিজ্ঞানের অনুশীলন, যত লোকের মধ্যেই যত থাক, সকলে যদি কাজ না করে, সাধিয়া ত পৃথিবী অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইবেন না, দর্ব্বী ভরিয়া ভরিয়া লোকের মুখে অন্নের গ্রাস তুলিয়া দিবেন না! তখন কি হইবে?

উত্তরে ক্রোপটকিন বলেন, কাজ যে লোকে করে, কাহারও শাসনে কি কেবল নিজের অভাবের তাড়নায় বাধ্য হইয়া করে না। কাজ লোকে না করিয়া পারে না, তাই করে। সামর্থ্যের অধিক কাজ—over-workই—লোকের পক্ষে ক্লেশকর, বিরক্তিজনক। কেবল মনিবের হুকুমে তার ধনবল পুষ্ট করিতে, কি ধনীর বিলাসসম্ভার যোগাইতে, দরিদ্রকে বাধ্য হইয়া কড়া রুটিনে যখন দিবারাত্র পরিশ্রম করিতে হয়, তখনই কাজ তার ক্লেশকর হইয়া উঠে। কিন্তু সহজভাবে স্বেচ্ছায় সকলের কল্যাণে যে কাজ লোকে করে, তাহাতে কখনও বিরাগ কাহারও জন্মেনা। মানুষের দেহে যে জীবনী শক্তি সঞ্চিত হয়, কাজেই তাহা লোকে ব্যয় করে, করিয়াই সুস্থ ও আনন্দিত থাকে, জীবনের সাফল্য অনুভব করে। দৈহিক ও মানসিক যে শক্তি প্রকৃতি মানবকে দিয়াছেন, বহির্জ্জগতে সেই শক্তির প্রয়োগে প্রকৃতিই লোককে প্রেরিত করেন, কাজ তাই মানুষ না করিয়াই পারে না। *

* Over-work is repulsive to human nature—not work; over-work for supplying the few with luxury—not work for the wellbeing of all. Work is a physiological necessity, a necessity of spending accumulated bodily energy, a necessity which is health and life itself.

[Anarchist Communism, Kropotkin, p. 31.]

ঠিক কথা। কাজ লোকে প্রকৃতির এই প্রেরণাতেই করে। বহু লোক দেখিতে দেখা যায়, লাভের কোনও ব্যবসায়ে নয়, কেবল লোক-হিতব্রতেই আনন্দে অবিরত শ্রম করিতেছেন। কবির যত কিছু কাব্য-রচনা, পণ্ডিতের যত কিছু বিদ্যালোচনা, উচ্চপ্রতিভার যত কিছু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বানুসন্ধান, উচ্চশক্তির যত কিছু মহৎকর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, সব এই ভাবে স্বতঃপ্রেরণাতেই এ জগতে সম্ভব হইয়াছে। ভিতরে এই কর্ম্মশক্তির প্রেরণা যাহাদের মধ্যে বেশ আছে, ভালকাজের সুযোগ না জুটিলে, বহু কুকাজেও তাহারা এই শক্তি প্রয়োগ করে, কারণ কিছু না কিছু একটা কাজ না করিয়া চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া তাহারা থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহাদের মধ্যে আবার এমন লোকও অনেক আছে, যাহারা মন্দ কাজ করে প্রধানতঃ কুপ্রবৃত্তির তাড়নায়। সুযোগ জুটিলেও ভাল কাজ তাহারা করিবে না, করিতে পারে না, মন্দ কাজেরই পথ খুঁজিয়া নিবে। নিয়মিত কোনও পদ্ধতিতেও অনেকে ইহারা কোনও কাজ করিতে পারে না। আলুথালু ভাবে যখন যাহা খুসী করে। আবার একেবারে জড়ভাবাপন্ন বহুলোকও এমন আছে, নিতান্ত ক্ষুধার তাড়না ব্যতীত তাহারা নড়িতেও চায় না। এই সব উচ্ছৃঙ্খল বা অলস লোকের সংখ্যা এ পৃথিবীতে বড় কমও নহে।

তবে ক্রোপট্‌কিন বলেন, লোকমত বহুপরিমাণে কর্ত্তব্যপালনে ইহাদের বাধ্য করিতে পারিবে। আশানুরূপ ভাবে নাও যদি পারে, তবু স্বেচ্ছায় যাহারা আধুনিক উন্নত সব ব্যবস্থায় কাজ করিবে, তাহাদেরই শ্রমে এত ধন উৎপন্ন হইবে যে এই সব অলস অকর্ম্মণ্য ও উচ্ছৃঙ্খল লোকদেরও অন্নের অভাব হইবে না। বর্ত্তমান এই সমাজে বর্ত্তমান এই ব্যবসায়পদ্ধতির মধ্যেও বহু এমন লোকের প্রতিপালনের দায়িত্বও ত সমাজকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এনার্কিষ্ট সমাজে ধন যখন আরও প্রচুর হইবে, এ দায়িত্বপালন আরও সহজ হইবারই কথা।

বিনাব্যয়ে বা অল্প ব্যয়ে বহু প্রয়োজন সকলেরই সিদ্ধ হইতে পারে, এমন কত কর্ম্মস্থাপনা আজ কাল হইয়াছে ও আরও হইতেছে, আমরা দেখিতে পাই। কত চিকিৎসালয়ে বিনাব্যয়ে যে কেহ গিয়া সুচিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করিতেছে; অবৈতনিক কত বিদ্যালয়ে দরিদ্র কত বালকবালিকা শিক্ষা লাভ করিতেছে। বৃহৎ সব নাগরিক রাজপথে এক কপর্দ্দকও মিউনিসিপাল কর না দিয়া দীন দরিদ্র সকলেই ইচ্ছামত যাতায়াত করিতেছে। বহু অর্থে কত লাইব্রারী, মিউজিয়াম, চিত্রশালা, পশুশালা, সর্ব্বত্র স্থাপিত হইয়াছে। একটি পয়সাও না দিয়া ধনী দরিদ্র সকলেই সে সব প্রয়োজনমত ব্যবহার করে। লোকসেবার কত প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, অকাতরে কত লোকের কত দুঃখ ক্লেশ তাহাতে দূর হইতেছে। নগরে নগরে প্রত্যেক গৃহস্থই প্রয়োজন মত কলের জল পাইতেছে, কতই আর ট্যাক্স তার জন্য দরিদ্রকে দিতে হয়? কত রাস্তার ভিখারী—কোনও ট্যাক্স যে দেয় না—সেও যত প্রয়োজন এইজল ব্যবহার করিতেছে। রেলওয়ের সব কোম্পানী যে মাসিক বা ত্রৈমাসিক টিকিট্ দিতেছেন, অতি অল্পখরচে হাজার হাজার লোক প্রতিদিন তাহাতে যথেচ্ছ যাতায়াতের সুযোগ পাইতেছে। এই যে সব ব্যবস্থা, ইহা ষ্টেটের ব্যবস্থা নয়,—ষ্টেট্ হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে গঠিত ও পরিচালিত সব কর্ম্মমণ্ডলীর ব্যবস্থা। *

বর্ত্তমান অবস্থায়, ধনীর স্বকীয় অধিকারে এত যে ধন রহিয়াছে, তার মধ্যেও, এত যদি সম্ভব হইতে পারে,—তখন, এই অধিকার যখন লুপ্ত হইবে, অন্যরূপ অবস্থা আসিবে, উন্নত কর্ম্মশৃঙ্খলায় বহুলোকের সমবেত শ্রমে অশনবসনাদিও এত প্রচুর কেন জন্মিবে না যে সকলেই প্রয়োজন মত তাহা নিয়া ব্যবহার করিতে পারে, অভাব কখনও না হয়?

---

* নাগরিক মিউনিসিপালিটীগুলি ষ্টেটের কোনও বিভাগ নয়; স্বতন্ত্র সব মণ্ডলী। এদেশের মিউনিসিপালিটীর উপরে গবমেণ্টের যে আরম্ভির প্রভাব আছে, ইয়োরোপে ও আমেরিকায় তাহা নাই।

পল্লী অঞ্চলে পুকুরের জল, অনেক গাছের ফল, বাগানের শাক-পাতা, বিলের মাছ, চড়ের নল খাগড়া, বনের বেত, যেমন প্রচুর জন্মে, সকলেই যথা প্রয়োজন নিয়া ব্যবহার করে,—অশন বসন বাসনকোসন ও গৃহের উপকরণ সব এই অবস্থায় তেমনই প্রচুর হইবে, তেমনই যথা-প্রয়োজন লোকে নিয়া ব্যবহার করিতে পারিবে।

তবে কেহ যদি প্রয়োজনের অধিক খরচ করে, কি বেশী নিয়া জমাইয়া রাখে ? অথবা অযথা নষ্ট করে ?

কেন করিবে ? অশনবসনাদি নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য কার কত লাগে একটা সীমা তার আছে।—চাউল যত ইচ্ছা পাই বলিয়া আমি প্রত্যহ দশসের চাউল আনিয়া একরাশি ভাত রাঁধিয়া খাইব না। কাপড় যদি আমার বৎসরে আটখানা লাগে, আশিখানা কাপড় আনিয়া অনর্থক আমি ঘর বোঝাই করিব না। বেশী আনিয়া জমাইয়াই বা কেন রাখিব ? কোনও বস্তু লোকে বেশী আনিয়া জমাইয়া রাখে ভাবী অভাবের আশঙ্কায়। যাহা যখনই দরকার পাইবে, তাহা কেহই জমাইয়া রাখে না, রাখিতে চায়ও না। পুকুরের জল কলসী কলসী ভরিয়া আনিয়া কেহ ঘরে জমাইয়া রাখে না ; যখন যেরূপ প্রয়োজন হয় তুলিয়া আনে। খাদ্যাদিও যদি এমন প্রচুর ও সুলভ হয়, তাহাই বা কেন লোকে ঘরে আনিয়া জমাইয়া রাখিবে ? অযথা কিছু নষ্ট করিবার প্রবৃত্তিই লোকের হইবে না। যদি কখনও কাহারও হয়, আর দশজনে তাহাকে সংযত রাখিতে পারিবে।

একটি বড় আপত্তি এনার্কিজমের বিরুদ্ধে অনেক করিতে পারেন, করিয়াও থাকেন। সমাজের উপরে কোনও প্রভুশক্তি ও তাহার আইন কানুন কিছু না থাকিলে, শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম ও ধর্ম্মবিধি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইলে, কেবলই স্বেচ্ছানুসারে চলিবার অবাধ অধিকার সকলে পাইলে, সামাজিক সুনীতির প্রতিষ্ঠা (public morality) বজায় থাকিবে না, ইহাই এই আপত্তির কথা।

ইহার উত্তরে ক্রোপটকিন বলেন, সামাজিক সুনীতি—যাহা ব্যতীত কোনও সমাজই সম্ভব হয় না, তাহা শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম বা রাষ্ট্রশক্তির অপেক্ষা কিছু রাখে না, মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্মেই সমাজজীবনের অভিব্যক্তির সঙ্গে তাহা দেখা দেয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম বা রাষ্ট্রশক্তির অভ্যুদয়ের আগেই মানবের মধ্যে সমাজজীবনের অভিব্যক্তি আরম্ভ হয়। সামাজিক জীবনের প্রয়োজনে স্বভাবের ধর্ম্মেই অপরিহার্য্য কতকগুলি সুনীতি আপনিই দেখা দেয়, মানিয়া চলিতে লোকে অভ্যস্ত হয়,—সমাজ তাহাতেই রক্ষিত হয়। শাস্ত্রীয় ধর্ম্মাধর্ম্মের হিসাব, কিসে বহুলোকের মঙ্গল হইবে বা নিজের উচ্চতর সুখলাভ হইবে এইরূপ কোনও **utilitarian** বা হিতবাদের হিসাব, সুনীতির পথে লোককে রাখিতে পারে না, তাহাকে তাহার কর্ত্তব্যপালন করাইতেও পারে না। * পূর্ব্বকালে শাস্ত্রীয় ধর্ম্মের শিক্ষা সুনীতির

---

* "Suppose a child is drowning in the river and three men stand on the bank of the river : the religious moralist, the utilitarian, and the plain man of the people. The religious man is supposed, first, to say to himself, that to save the child would bring him happiness in this or another life, and then saves the child ; but if does so, he is merely a good reckoner, and no more. Then comes the utilitarian, who is supposed to reason thus : "The enjoyment of life may be of the higher and lower description. To save the child would assure me higher enjoyment. Therefore let me jump into the river." But admitting there was a man who ever reasoned in this way, again he would be a mere reckoner, and society would do better not to rely upon him : who knows what sophism may pass one day through his head ? And here is the third man. He does not calcalate much. But he has grown in the habit of always feeling the joys of those who surround him and feeling happy when others are happy ; of suffering, deeply suffering, when others suffer. To act accordingly is his nature. He hears the cry of the mother, sees the child

পথে লোককে রাখিতে অনেক সাহায্য করিত সন্দেহ নাই। কিন্তু সে ধর্ম্মবিশ্বাসই লোকের লোপ পাইয়াছে ; সে শিক্ষারও প্রভাব কিছু আর নাই। সকলের উপরে আছে এখন কেবল এক রাষ্ট্রীয় আইনের শাসন। কিন্তু সামাজিক সুনীতি আইনের দণ্ড কখনও মানিয়া চলে না। আইনের দণ্ড বরং সুনীতিকে ধ্বংসকরে, দুর্নীতির পথই প্রশস্ত করিয়া দেয়।

struggling in the river, and jumps in to the river like a good dog, and saves the child, thanks to the energy of his feelings. And when the mother thanks him, he answers, "Why! I could not do otherwise than I did". That is the real morality.

[Anarchist Communism, Kropotkin p, 35.]

হাঁ, ইহাই morality বা প্রকৃত সুনীতির ধর্ম্ম এবং মানব চিত্তের সৎপ্রবৃত্তি-সমূহই ইহার মূল উৎস। আবার সৎপ্রবৃত্তির দীনতা ও কু-প্রবৃত্তির প্রাবল্যও অনেকের মধ্যে দেখা যায়। এই দীনতা দূর হয়, কু-প্রবৃত্তি সব দমিত থাকে, সৎপ্রবৃত্তি গুলি পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তাহার পথে চলিতে মানুষ অভ্যস্ত হয়, এজন্য বিশিষ্ট একটা শিক্ষা ও কর্ম্মানুশীলনের প্রয়োজন। এই শিক্ষাই মানবকে দেওয়া, এই অনুশীলনের পদ্ধতি নির্দ্দেশ করা ভাগবত ধর্ম্মশাস্ত্রের বড় একটি লক্ষ্য। তবে ভাগবত ধর্ম্মনিষ্ঠার সঙ্গে এই শিক্ষা ও অনুশীলনকে ভাগবত ধর্ম্মশাস্ত্র যুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। কারণ এই নিষ্ঠাও মানবের স্বভাবজ ধর্ম্ম এবং ইহার মূলে মানবচিত্তের এমন একটি বৃত্তি রহিয়াছে যাহাকে অন্যান্য সব সদ্‌বৃত্তির প্রাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে। এই নিষ্ঠা যাহাদের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ হইয়া উঠে, তাহাদের পক্ষে এই শিক্ষা ও অনুশীলনের ফলে সুনীতির পথে চলা অতি সহজ হয়। ইহ-পরকালের সুখের কথা অবশ্য ভাগবত ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া থাকেন। কিন্তু সে সুখ যে এই ধর্ম্মনিষ্ঠ চরিত্রে সুনীতির পথেই লভ্য একথাও শাস্ত্র বলেন। প্রকৃত ভাগবত-ধর্ম্মনিষ্ঠ কেহ এই সুখ কামনা করিয়া, সুখের হিসাব করিয়া, কাজ করেন না ; কাজে সুখ তাঁহার আপনি ঘটে। এই যে সহজ ধার্ম্মিক তৃতীয় ব্যক্তির (the man of the people এর) কথা ক্রোপট্‌কিন্ উল্লেখ করিয়াছেন, কেহ জিজ্ঞাসা

বড় কোনও ধর্ম্মপদ্ধতি বা রাষ্ট্রশক্তির আশ্রয় ব্যতীত ব্যাপক কোনও বড় সমাজ সম্ভব বড় হয় না। ক্রোপটকিনও তাহা অস্বীকার করেন না। তিনি বলেন, এনার্কিষ্ট জগতের লক্ষণই হইবে ছোট ছোট সব free commune বা স্বতন্ত্র একটি গ্রাম্য বা নাগরিক সমাজের ন্যায় জনমণ্ডলী। যে সব আচারনিয়ম বা customs তাহাদের মধ্যে দেখা দেয় ও সর্ব্বসম্মতি ক্রমে সদাচার বলিয়া গৃহীত হয়, এই সব commune রক্ষার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। বিভিন্ন এই সব communeএর মধ্যে প্রয়োজন মত একটা সহযোগিতার সম্বন্ধ আপনি গড়িয়া উঠিবে, আপনিই চলিবে, তার জন্যও কোনও রাষ্ট্রীয় শাসনবন্ধনের আবশ্যকতা কিছু হইবে না। রাষ্ট্রীয় শাসন এবং শাস্ত্রীয় ধর্ম্মের আভির্ভাবের পূর্ব্বে আদিম সব মানবসমাজের আকার যেরূপ ছিল, আকারে এই সব communeও কতকটা সেইরূপ হইবে; তবে প্রকৃতিতে উন্নত সভ্যতার পরিণত সকল গুণই ইহাদের মধ্যে অবশ্য থাকিবে।

করিলে, সে অমনই বলিবে, হাঁ, কৃতার্থ হইয়াছি আমি, এ আনন্দের তুলনা নাই। আনন্দের হিসাব সে আগে করে নাই, কিন্তু আনন্দের ভাগী হইয়াছে। সরল ধর্ম্মপ্রাণ সাধুচরিত্র কেহই এরূপ হিসাব করেনা; কিন্তু এইরূপ আনন্দের ভাগী সর্ব্বদাই হয়। এই ভাবে সদবৃত্তিসমূহের উন্মেষে এবং সদভ্যাসে সুনীতির পথকে জীবনের সহজ পথ করিয়া না তুলিয়া, কেবল ইহ পরকালের সুখের হিসাব করিয়া চলিতে যে ধর্ম্মশাস্ত্র লোককে শিক্ষা দেয়, সে শাস্ত্র সত্যধর্ম্মের শাস্ত্র নহে; শাস্ত্রকার মানবস্বভাবকে, তার ধর্ম্মের তত্ত্বকেই, ভুল বুঝিয়াছেন। Religious moralistএর যে লক্ষণ ক্রোপট্কিন নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও ভুল লক্ষণ। ঐ তৃতীয় ব্যক্তির (the man of the peopleএর) কোনও ভাগবত ধর্ম্মের শিক্ষাদীক্ষা তেমন কিছু হয়ত নাও থাকিতে পারে। কিন্তু প্রকৃত religious moralist যে, সেও ঠিক এই অবস্থায় তাহারই মত ভাবে তাহারই মত কাজ করিবে। বালকের মাকে হয়ত বলিবে, "আমি কে মা? ভগবানই তোমার সন্তানকে রক্ষা করিলেন, ধন্যবাদ তাঁকে দেও।"—এই স্থলে উভয়ের মধ্যে তফাৎ মাত্র এই।

কিন্তু এখনও ইহা কল্পনা মাত্র। বাস্তব জীবনে ইহার পরীক্ষা কোথাও হয় নাই। এরূপ একটা অবস্থা আসবেই চলিতেই পারে কিনা; কেহই বলিতে পারেন না। অন্য সব আপত্তি যতই খণ্ডন করা যাউক, কয়েকটি বড় আপত্তি সহজে খণ্ডন করা যায় না। যে সব অবস্থা ইয়োরোপে এনার্কিজমের প্রতিষ্ঠাকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে বা তুলিতেছে বলিয়া ইঁহারা মনে করেন, জগতের অন্যান্য বহু দেশে সেরূপ কোনও অবস্থা এখনও ঘটে নাই। সুতরাং সমগ্র জগৎকে একেবারে এনার্কিষ্ট করিয়া ফেলার কল্পনা যতই ইঁহারা করুন, সম্ভব কখনও হইবে না। এইরূপ বাহিরের কোনও রাজ্যের সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত সামরিক শক্তি যদি অরাজক ও অরক্ষিত ইয়োরোপকে আক্রমণ করিয়া কমিউনগুলির উপরে আপন রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে, রক্ষার কি মুক্তির কোনও উপায় তখন কোথা হইতে আসিবে?

তারপর অতি দুর্বৃত্ত ও দুর্দ্ধর্ষ লোকেরা যদি কামক্রোধাদি প্রবল রিপুর বশে নিরীহ নরনারীর উপরে অত্যাচার করে, আর কেবল লোকমতের প্রভাবই যদি তাহাদের দমনের পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তবে ইহাদের রক্ষার উপায় কি?

প্রভুত্বপ্রিয়তা বহু মানবের স্বভাবে অতি প্রবল ও দুর্দ্দমনীয় একটা বৃত্তি। এইরূপ লোকেরা যদি দল বাঁধে, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে, কুচকাওয়াজে সামরিক কৌশল আয়ত্ত করে, এবং তারপর দেশের উপরে সেই সামরিক বলে আপনাদের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে, কে কি উপায়ে তাহার প্রতিরোধ করিতে পারে? ইহা একটা ক্রীড়া, অবসর সময়ে চিত্তবিনোদনের একটা অবলম্বন, এইরূপ কত ছুঁতা দেখাইয়াও এরূপ আয়োজন লোকে করিতে পারে। আর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার এসব অধিকারে হস্তক্ষেপই বা কে কাহার করিতে পারে? যাহার যাহা ইচ্ছা সকলেই করিতে পারে, জোর করিয়া কাহারও কোনও কার্য্যে বাধা কেহই দিতে পারে না। আপনা হইতেই অতি মন্দ বা অপরের অনিষ্টকর কাজ কেহ কিছু করিবে না এই ত মাত্র

ভরসা। বাধা দিবার কোনও অধিকারও কাহারও নাই; কোনও ব্যবস্থাও কিছু তার জন্য নাই। সুতরাং এইরূপ লোকের এই প্রয়াস হইতে সমাজকে রক্ষা কে করিবে? এইরূপ আরও বহু ছলে কি বলে বহুলোক ব্যক্তিগত অধিকারে সম্পত্তি সঞ্চয় ও বৃদ্ধি করিতে থাকিলে, তাহারই বা প্রতিকারের উপায় কি? এই সব আপত্তির কোনও সদুত্তর কেহ দিতে পারিয়াছেন বলিয়া জানি না।

এনার্কিজম যদি সম্ভব হইত, কোনওরূপ শাসনের বাধ্যতা ব্যতীত কেবল সহজ ধর্ম্মের প্রভাবেই যদি মানবসমাজকে সুনীতির পথে ও মঙ্গলে স্থির রাখা যাইত, তবে তাহা অপেক্ষা উন্নততর ও অধিকতর বাঞ্ছনীয় কোনও অবস্থা যে আর হইতে পারে না, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ একটা পরিণতির দিকেই যে মানবজীবন অগ্রসর হইতেছে, ইহাও আমরা ভরসা করিতে পারি। যে ভগবদংশে জীবভাবে জীব জন্মিয়াছে, সেই ভগবৎ সারূপ্য লাভ করিবার দিকেই তাহার জীবন অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে, তত্ত্বদর্শী ঋষির এই বাক্য যদি সত্য হয়, তবে এই ভরসাই আমাদিগকে করিতে হইবে। কিন্তু অভিব্যক্তির সেই স্তরে উঠিতে, আরও কত যুগ যে সাধারণ মানবকে তাহার মায়ামোহাদি আবেষ্টনীর বন্ধনের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইবে, তাহা আজও কেহ হিসাব করিয়া বলিতে পারেন না। পাশ্চাত্য এনার্কিষ্টরা দুদিনেই যে সব উপায়ে এই অবস্থা ঘটাইতে চাহিতেছেন, তাহা হইবার নহে। তারপথ উন্নত এনার্কিজমের মাঙ্গল্য-মহিমার কীর্ত্তন ইঁহারা যতই করুন, ইহাদের সকল প্রচেষ্টার মূলে রহিয়াছে, তীব্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। উচ্চতর সম্প্রদায়সমূহের উন্নত বুদ্ধিবিদ্যাসুলভ উচ্চতর অধিকারকে বলে বিলুপ্ত করিয়া, সম্প্রদায়-গুলিকেই বিধ্বস্ত করিয়া, তবে ইঁহারা এই এনার্কিজমকে প্রতিষ্ঠা করিতে চান। এই বিদ্বেষের যোগ বর্ত্তমান সমাজের ভিত্তিকে ভাঙ্গিবার পক্ষে যতই প্রভাবশাল হউক, সহজ প্রেমের কি সহজ সুবুদ্ধির নূতন ভিত্তি গড়িয়া এনার্কিজমের মঙ্গল তার উপরে প্রতিষ্ঠা করিতে

পারিবে, এরূপ ভরসা করা যায় না। বিদ্বেষ সমান শত্রুর বিরুদ্ধে কোনও সংগ্রামে বহু লোককে যুক্ত করিতে পারে। কিন্তু সংগ্রামের যখন অবসান হয়, শত্রু যখন পরাভূত হয়, বিদ্বেষ নিজেদের মধ্যে দেখা দেয়, নূতন সংগ্রাম নিজেদের মধ্যে আরম্ভ হয়। সেই সংগ্রামের ফলে সমাজ কি এক ঘোর দুর্গতির অবস্থায় উপনীত হইবে, কাহার কিরূপ কঠোর প্রভুত্বের পাশে বাঁধা পড়িবে, কেহই তাহা বলিতে পারে না। প্রাচীন যে আদিম একরূপ এনার্কিষ্ট সমাজের কথা ক্রোপট্‌কিন বলিয়াছেন, সে সব সমাজও যে কোনও গোষ্ঠীপতি বা দলপতির প্রভুত্ব একেবারেই মানিয়া চলিত না, তাহা বলা যায় না। যাহাই হউক, সেরূপ সমাজের দিন চলিয়া গিয়াছে। তবে রাষ্ট্রীয় শক্তি ও শাস্ত্রীয় ধর্ম্মের শাসনাশ্রিত সমাজের মধ্যেও আদর্শ একরূপ এনার্কিজম – কমিউনিষ্ট এনার্কিজম—দেখা গিয়াছিল প্রাচীন ভারতে মুনির তপোবনে। তপোবনের চিত্র প্রাচীন সাহিত্যে যাহা পাওয়া যায়, তাহা যদি সত্য কোনও অবস্থার চিত্র হয়, plain living ও high thinkingএর যে আদর্শের প্রশংসা পাশ্চত্য সুধীরাও করিয়া থাকেন, তাহারই পরাকাষ্ঠা লাভ হইয়াছিল—তপোবনবাসীদের জীবনে। বনের ফলমূল ও বনে পালিত গো-দুগ্ধাদি ছিল তাঁহাদের অশন, বননির্ঝরিণী বা বনবাহিনী স্রোতঃস্বিনীর নির্ম্মল সলিল ছিল তাঁহাদের পানীয়, বনবৃক্ষের বল্কল বসন, বন-কুশাস্তরণ আসন শয়ন, আর বনের তৃণপর্ণ গৃহোপকরণ। বনেই এ সব প্রচুর মিলিত, কিছুই কাহারও পৃথক্ সম্পত্তিরূপে অধিকার করিয়া রাখিতে হইত না; প্রয়োজনমত সকলে সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। বিদ্যানুশীলন ও ধর্ম্মানুশীলনই মাত্র ছিল ইঁহার জীবনের ব্রত,—ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সুসংযত চরিত্রের গুণে অতি শান্তিময় জীবন ইঁহারা যাপন করিতেন। কোনও আইন আদালত ইঁহাদের মধ্যে ছিল না। নিজেদের কোন বিবাদবিসম্বাদ লইয়া রাজকীয় কোনও ধর্ম্মাধিকরণে কখনও ইঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন, এমন কোনও

দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় না। তবে পারিপার্শ্বিক সাধারণ সমাজের উপরে রাজশাসনের একটা অত্যাবশ্যকতা ইঁহাদের পক্ষেও ছিল, এবং তার জন্য রাজদ্বারেও মধ্যে মধ্যে ইঁহাদের উপস্থিত হইতে হইত। বন্য এমন দুর্দ্দান্ত লোকও তখন মধ্যে মধ্যে ছিল, যাহারা রাজ-শাসনাধিকৃত সাধারণ সমাজের বাহিরে ও দূরে অবস্থিত এই সব তপোবনের অধিবাসীদের উপরে অত্যাচার করিত। নিজেরা পারিতেন না, ইহাদের এই অত্যাচার দমনের জন্য রাজশক্তির সহায়তা কখনও কখনও ইঁহারা প্রার্থনা করিতেন। রাজারাও এই দস্যুরাক্ষসাদিকে দমন করিয়া আসিতেন,—কিন্তু তপোবনে স্থায়ী কোনও শাসনবিধি স্থাপনের চেষ্টা কখনও করিতেন না।

টলষ্টয় বা ক্রোপটকিন এনার্কিজমের যে আদর্শের কথা কল্পনা করিয়াছেন, এই ভাবে, এই অবস্থায়, এই সামার মধ্যে এক প্রাচীন ভারতেই তাহা বোধ হয় সম্ভব হইয়াছিল। বর্ত্তমান এই জগতে যদি এনার্কিজম কিছু সম্ভব হয়, তবে সাধারণ জনসমাজের মধ্যে এইরূপ উন্নতধা উন্নতধর্ম্মী ত্যাগী ও শান্তশীল মানবের—মানব প্রকৃতির অতি উন্নত স্তরে যাঁহারা আরোহণ করিয়াছেন তাঁহাদেরই—এইরূপ সব আশ্রমে সম্ভব হইতে পারে, এবং তাঁহাদের আশ্রমিক জীবনচর্চ্চায় কোনও হস্তক্ষেপ না করিয়া, প্রয়োজন মত কেবল রক্ষার ব্যবস্থাও সামাজিক শাসনশক্তিকে করিতে হইবে। নহিলে এমন দস্যু-রাক্ষস সর্ব্বত্রই আছে, যাহাদের অত্যাচার হইতে ইঁহাদের এই সব আশ্রম রক্ষাও সম্ভব হয় না।

এনার্কিষ্ট কমিউনিজমের তত্ত্ব বুঝিতে হইলে ক্রোপটকিনের গ্রন্থগুলিই আলোচনা করিতে হয়। কারণ এই তত্ত্বের যেরূপ বিশদ আলোচনা তিনি করিয়াছেন, ভাবী এনার্কিষ্ট সমাজের যেরূপ একটা চিত্র দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এরূপ আর কোনও নায়কই করিতে পারেন নাই। কিন্তু এনার্কিষ্ট মতের আদি প্রবর্ত্তক ও প্রচারক ছিলেন, আর একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় রুষ (Russian aristocrat) মাইকেল

বাকুনিন। ক্রোপটকিন ছিলেন ইঁহার একজন প্রধান শিষ্য। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জর্ম্মানী ও ফরাসী অঞ্চলে যার পর নাই নির্ভীক উদ্যমে বাকুনিন এনার্কিষ্ট মত প্রচার করেন, এবং ইহার জন্য নানা দেশের কারাগারে বহুকাল কঠোর রাজদণ্ডও তাঁহাকে ভোগ করিতে হয়। যে সব গ্রন্থ তিনি প্রচার করেন, তার মধ্যে God and the State—(ঈশ্বর ও রাষ্ট্র) নামক গ্রন্থই সমধিক প্রসিদ্ধ। ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং রাষ্ট্রশক্তিতে বিশ্বাস, মানুষের স্বাধীনতার পথে প্রধান দুইটি বাধা হইয়া মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে, ইহাই তিনি এই গ্রন্থে প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। *

---

* কি ভাবে যে তিনি তাঁহার মত প্রচার করিয়াছেন তাহার নমুনাস্বরূপ এই গ্রন্থ হইতে একটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

'The state is not society, it is only an historical form of it as brutal as it is abstract It was born historically in all countries of the marriage of violence, rapine, and pillage, in a word war and conquest, with the gods successively created by the theological fantasy of nations. It has been from its origin, and it remains, still at present, the divine sanction of brutal force and triumphant inequality.

The state is authority; it is force, it is the ostentation and infatuation of force, it does not insinuate itself; it does not seek to convert. ...... Even when it commands what is good, it hinders and spoils it, just because it commands it, and because every command provokes and excites the legitimate revolts of liberty; and because the good from the moment that it is commanded, becomes evil from the point of view of true morality, of human morality (doubtless not of divine) from the point of view of human respect and of liberty. Liberty, morality, and the human dignity of man consists precisely in this, that the does good, not because it is commanded, but because he conceives it, wills it and loves it. [Bertrand Russel প্রণীত Roads to Freedom হইতে পুনরুদ্ধৃত, ৬৩ ও ৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

ব্যাকুনিন সোসিয়ালিষ্ট নায়ক কার্লমার্ক্সের সমসাময়িক ছিলেন,—এবং ইঁহার প্রবর্ত্তিত শ্রমিক আন্দোলনেও যোগদান করেন। কিন্তু মার্ক্সের রাষ্ট্রায়ত্ত সোসিয়ালিজম এবং বাকুনিনের অরাজক সোসিয়ালিজম বা এনার্কিজম—দুইয়ের লক্ষ্য ও গতি এমনই বিভিন্ন ও বিপরীত দুইদিকে যে ইঁহাদের মধ্যে বিষম বিরোধ উপস্থিত হইল। বিরোধে বাকুনিনের দলই পরাভূত হইল, এবং অন্তর্জ্জাতিক যে শ্রমিক সমবায়—(The International Working Men's

ইহার মধ্যে অতি উচ্চ দুইটি সত্য রহিয়াছে। (১) ষ্টেট্ই সমাজ নয়। (২) মানুষ যে সাধু পথে চলে, কেবল কোনও প্রভুর হুকুমে বা আইনের ভয়ে চলে না, স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া চলে।

ষ্টেট্ই সমাজ নয় সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া সমাজের মধ্যে ষ্টেটরূপ একটা শক্তির অস্তিত্বকেই বা একেবারে লোপ করিয়া ফেলিবার প্রয়োজন কি হইতে পারে? সমাজকে একেবারে গ্রাস না করিয়া, সমাজধর্ম্মের অধীন হইয়া, যদি ষ্টেট চলে, সমাজ যদি ষ্টেটের অতীত ও উপরের এক বস্তু থাকে, তবে বহু ব্যাপারে সমাজরক্ষার বড় সহায়ই ষ্টেট্ হইতে পারে, অনুগত দাস যেমন প্রভুর রক্ষার পক্ষে সহায় হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে অবতরণিকায় এবং ৫ম প্রবন্ধে বহু আলোচনা করা হইয়াছে।

কোনও প্রভুশক্তির ঘোষিত আদেশ বা আইন যে মানুষকে সুনীতির পথে চালাইতে পারে না, একথাও সত্য। কিন্তু সৎশাস্ত্রবিহিত বা সদাচারানুগত কোনও ধর্ম্মনীতির প্রভাব প্রকৃত পক্ষে এরূপ আদেশও নহে, আইনও নহে। সৎপথ বুঝিয়া নিবার ও সেই পথে চলিবার পক্ষে অতি প্রিয় ও হিতৈষী বন্ধুর ন্যায় বড় সহায়ই বটে। এই সহায়তা ব্যতীত কেবল নিজের বুদ্ধি বা প্রবৃত্তিকে সম্বল করিয়া চলিলে বেশীর ভাগ লোকই ভুল পথে—কুপথেও চলিতে পারে। ধর্ম্মনীতি যদি তার স্বধর্ম্মে স্থির থাকে, সুবুদ্ধি কেহ তার সঙ্গে বিরোধ করে না, করিতে চায়ই না। স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই সে ইহার পথে চলে, চলিয়াই সুখে ও মঙ্গলে থাকে। তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার ভোগে ইহাকে একটা বাধা বলিয়াই সে অনুভব করে না। আর বাস্তবিক তাহা বাধা নয়ও।

পূর্ব্বে ৪র্থ প্রবন্ধ ও পরবর্ত্তী ১১শ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

Association)—তখন গড়িয়া উঠে, তাহা মার্ক্সের মতানুযায়ী সোসিয়ালিষ্ট হইয়া দাঁড়ায়।

বাকুনিনের পূর্ব্বেও ফরাসী প্রুধোঁ (Proudhon) এবং ইংরেজ জর্জ্জ স্যাণ্ড (George Sand) নামক দুইজন পণ্ডিত বর্ত্তমান সম্পদধিকার, ব্যবসায় পদ্ধতি এবং তৎসংসৃষ্ট রাষ্ট্রপদ্ধতির দোষ দেখাইয়া এনার্কিজমের সমর্থন করিয়া পুস্তক লেখেন। ইঁহাদের প্রভাবই বাকুনিনকে প্রধানতঃ এনার্কিষ্ট মতাবলম্বী করিয়া তোলে। কিন্তু ইঁহারা এসম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়নই করেন, এনার্কিষ্ট আন্দোলনের প্রবর্ত্তন বা এরূপ কোনও দলগঠনের চেষ্টা করেন না।

এখন কথা হইতেছে, কি উপায়ে কিরূপ কর্ম্মপদ্ধতির অবলম্বনে ইঁহারা রাষ্ট্রশক্তিকে লোপ করিয়া অরাজক অবস্থা ঘটাইতে চান? পূর্ব্ব প্রবন্ধে Political বা Parliamentary Action এবং Direct Action, এই দ্বিবিধ কর্ম্মপদ্ধতির কথা আলোচনা করিয়াছি। সোসিয়ালিষ্টরা যে প্রথমোক্ত পদ্ধতি অবলম্বনেই আপনাদের ইষ্ট-সিদ্ধি করিতে চান, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।—টলষ্টয়ের পদ্ধতি হইতেছে,—Non-violent Non-co-operation ; অন্য কথায় Non-action ও Non-resistance। * আর বাকুনিন ও তাঁহার শিষ্য ক্রোপটকিনপ্রমুখ এনার্কিষ্টদের কর্ম্মপদ্ধতি হইতেছে, Direct Action. রাষ্ট্রশাসনকেই যাঁহারা লোপ করিতে চান, তাঁহারা যে রাষ্ট্রীয় বা Political কোনও পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন না, ইহা বলাই বাহুল্য। রাষ্ট্রপদ্ধতির বা গবর্মেণ্টের ধারক ও রক্ষক যাঁহারা,

* রাজশক্তির সহায়তামূলক কোনও কাজই করিব না, আর ইহার জন্য যতই অত্যাচার হউক, কোনও বাধা তাহাতে দিব না, নীরবে শান্তভাবে সব সহিয়া যাইব, ইহাই এই Non-action ও non-resistanceএর আসল কথা। ইহারই অন্য নাম Non-violent Non-cooperation। অত্যাচারে বাধা দিতে গেলেই শান্ত ও অহিংস (non-violent) থাকা সম্ভব হয় না। মহাত্মা গান্ধিও অনেক সময় এই non-resistanceএর কথা বলিয়া থাকেন।

যে কোনও ডাইরেক্ট বা সরাসরি উপায়ে তাঁহাদের বিধ্বস্ত করিতে পরিলেই আকাঙ্ক্ষিত এই এনার্কিজম্ আপনিই দেখা দিবে, এই কথাই ইঁহারা বলেন। অবস্থার পরিবর্ত্তনে যথাসময়ে আপনিই ইঁহাদের শক্তি লোপ পাইবে, অথবা লোপ করা সহজ হইবে, এরূপ কোনও বিবেচনার কি ভরসার অপেক্ষা না করিয়া, অবিলম্বেই এই সব উপায় অবলম্বন করা চাই, এইরূপ সব কথা অতি তীব্রভাবে ইঁহারা প্রচার করেন। সাম্প্রদায়িক সংগ্রামে শত্রুপক্ষ উচ্চতর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অতি তীব্র একটা বিদ্বেষের ভাবও যে ইঁহাদের মধ্যে আছে, কিছু পূর্ব্বে একথা বলিয়া বলিয়াছি। এই সব কারণ হইতেই হত্যাকারী গুপ্তসমিতি সমূহের উদ্ভব হয়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহাদের প্রভাব এখন একরূপ লোপ পাইয়াছে। সিণ্ডিক্যালিষ্ট Syndicalist দল direct actionএর যে সব প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহারই পক্ষপাতী ইঁহারা হইয়া উঠিয়াছেন।

৬। সিণ্ডিক্যালিজম্—(Syndicalism)

এখন এই সিণ্ডিক্যালিজম্ আবার কি? ফরাসী দেশে অতি শক্তিশালী একটি শ্রমিকমণ্ডলী আছে। ব্যক্তিগত পৃথক্ সম্পত্তি মূলক বর্ত্তমান সমাজপদ্ধতি এবং সেই পদ্ধতির রক্ষক বর্ত্তমান এই রাষ্ট্রপদ্ধতি উভয়ই এক সঙ্গে ও সমান ভাবে বিদ্ধস্ত হইয়া যায়, এমন এক মহাবিপ্লব ঘটানই ইহার লক্ষ্য বলিয়া স্পষ্ট ভাবেই ইহার নায়কগণ ঘোষণা করেন। এই আন্দোলনই সিণ্ডিক্যালিজম্ নামে পরিচিত। কিন্তু এই নাম কেন হইল? ইহার তাৎপর্য্য কি? পূর্ব্বে এই বৃহৎ প্রবন্ধের ১ ও ২ সংখ্যক পরিচ্ছেদে trade-union বা শ্রমিক সমিতিসমূহের সঙ্গঠন ও ক্রমিক পরিণতির কথা আলোচনা করিয়াছি, এবং ইংলণ্ডে trade-unionism বলিতে কি বুঝায় তাহাও বলিয়াছি। ফরাসী দেশে এই সব trade-union বা শ্রমিকসমিতির নাম *Syndicat*—ইংরাজিতে Syndicate

(সিণ্ডিকেট)। ইংলণ্ডীয় trade-unionismএর লক্ষ্য ব্যক্তিগত অধিকারকে ও বর্ত্তমান ব্যবসায়পদ্ধতিকে বজায় রাখিয়া তার মধ্যে যত দূর সম্ভব শ্রমিকদের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া নেওয়া। কিন্তু ফরাসী শ্রমিক মণ্ডলী চাহিতেছেন, কমিউনিষ্ট রীতিতে এই সব trade-union ব labour-sydicateএর হাতে একেবারে সব ব্যবসায়ের সমবেত স্বত্ব-স্বামিত্ব এবং পরিচালনার কর্ত্তৃত্ব আনিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেট্‌কেও লোপ করিয়া ফেলিতে। এক একটি ব্যবসায়ের যত রকম অঙ্গ বা বিভাগ নানা দেশে আছে, যত রকম কারখানা তার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের সংস্রবে যত শ্রমিক কাজ করিতেছে, দেশজাতিনির্ব্বিশেষে সকলেই একটি বৃহৎ মণ্ডলী বা সিণ্ডিকেট ভুক্ত হইবে, তারপর একযোগে ব্যাপক এক ধর্ম্মঘট বা general strike করিয়া মূলধনী মালিকদের সকল কর্ত্তৃত্বকে অচল করিয়া ফেলিবে। তখন ব্যবসায় এই মণ্ডলী বা সিণ্ডিকেটের আয়ত্ত হইবে। এই ভাবে যত কিছু ব্যবসায়, সব বৃহৎ এক একটি শ্রমিকমণ্ডলী বা লেবর-সিণ্ডিকেটের হস্তগত করা হইবে। প্রত্যেকটি সিণ্ডিকেট স্বীয় ব্যবসায়ের কাজকর্ম্ম সব নিজেরা একটা ব্যবস্থা মত করিবে, এবং পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক অন্যান্য ব্যবহারও নিজেদের নির্দ্দেশ মত স্থির হইবে। বিভিন্ন সব সিণ্ডিকেট তখন পরস্পরের সঙ্গে যার যার কর্ম্মক্ষেত্রে উৎপাদিত দ্রব্যাদির বিনিময়ের এবং অন্যান্য সামাজিক ব্যবহারের একটা বন্দোবস্ত করিয়া নিবে। মোট সমাজই হইবে এই সব মণ্ডলী বা সিণ্ডিকেটের একটা সমবায়। দেশে দেশে বিভিন্ন নেশন বা জাতি কিছু নাই, ন্যাশনাল কোনও স্বার্থও কোথাও কোনও দেশের নাই, সমগ্রজগৎ—অন্ততঃ জগতের সমগ্র সভ্যসমাজ—হইবে কেবল এই সব সিণ্ডিকেটের সমবায় মাত্র। ইহার মধ্যে রাষ্ট্রীয় কোনও শক্তির স্থান হইতে পারে না। নেশন নাই, নেশন ভাবে রাষ্ট্রীয় কোনও কর্ম্মও নাই। ন্যাশনাল গবর্মেণ্ট বলিয়া একটা বস্তু কি ধরিয়া কোন কর্ম্মের জন্য আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিবে, কার বলে

আপনার অস্তিত্বই বা রক্ষা করিবে? সুতরাং কোনও গবমেণ্ট তখন থাকিবে না, থাকিতে পারেও না। কিন্তু এখন ত দেশে দেশে গবমে´ণ্ট আছে। এই সব গবমে´ণ্ট থাকিতে সিণ্ডিক্যালিষ্ট সমাজের আবির্ভাবও হইতে পারে না। সুতরাং যে general strike বা সর্ব্ব-ব্যাপী ধর্ম্মঘট ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক কর্ত্তাদের শক্তিকে বিধ্বস্ত করিবে, সেই ধর্ম্মঘটের প্রয়োগেই রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্ত্তাদের শক্তিকেও এক সঙ্গে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতে হইবে। *

একদিকে বুর্জ্জোয়স বা ধনিক এবং অন্যদিকে প্রলেটারিয়েট বা শ্রমিক, এই যে প্রধান দুই সম্প্রদায়ে, অধুনা এই ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল যুগে ইয়োরোপীয় সমাজ বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, ইহাদের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী, সুতরাং উভয়ে উভয়ের প্রতিপক্ষ ও শত্রু, এবং উভয়ের মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িক সংগ্রামই (class-war) এ অবস্থায় স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য, এই ভাবটাই—এই idea of class warই—যে কি ভাবে শ্রমিক আন্দোলনের সকল উত্তেজনাকে জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছে, পুষ্ট করিয়া তুলিতেছে, পূর্ব্ব প্রবন্ধে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। সিণ্ডিক্যালিষ্টরা এই class warকে—এই সাম্প্রদায়িক সংগ্রামকে—তাহাদের সকল প্রচেষ্টার মূল কথা বলিয়া ধরিয়া নিয়াছেন, এবং রাষ্ট্রীয় কোনও উপায়ের মধ্যে না গিয়া

* আবার আরও এক মতের লোক আছেন, যাঁহারা প্রত্যেকটি ব্যবসায় সেই ব্যবসায়ের শ্রমিকদের সমবায়ের হাতেই আনিতে চান, কিন্তু গবমেণ্টকে একেবারে লোপ করিয়া ফেলিতে চান না। এই পর্য্যন্ত তাঁহারা বলেন, কোনও ব্যবসায়ের মধ্যে অর্থাৎ এই সমবায়ের কোনও কাজকর্ম্মের মধ্যে গবমে´ণ্টের কোনও হাত থাকিবে না। এই সব সমবায় সম্বন্ধে পূর্ব্বতন যুগের গিল্ড (guild) নামের পক্ষপাতী ইঁহারা; এই মতেরও তাই নাম হইয়াছে, গিল্ড সোসিয়ালিজম (Guild-Socialism)। গবমে´ণ্ট থাকলে দেশ ভেদে পৃথক এক একটা নেশনের ভেদও থাকিবে, সুতরাং গিল্ড-সোসিয়ালিজম্ প্রত্যেক নেশনের পক্ষে পৃথক্ এক একটা ন্যাশনাল ব্যাপারই হইতে পারে।

(তার মধ্যে যাইতেও তাঁহারা পারেন না) ব্যবসায়িক উপায় যাহা কিছু হইতে পারে, তাহার সাহায্যেই এই সংগ্রাম তাঁহারা চালাইতে চান। * ধর্ম্মঘট (strike), বয়কট (boycott), সাবোটেজ (sabotage)—প্রভৃতি হইতেছে, প্রধান এই সব ব্যবসায়িক উপায় বা অস্ত্র। বলা বাহুল্য এ সবই ডাইরেক্ট এক্সনের (direct actionএর) অস্ত্র। এই সব উপায় অবিলম্বে যেখানে যত দূর সম্ভব অবলম্বন করিতে হইবে। আপাততঃ কতকটা খণ্ড বা বিচ্ছিন্ন ভাবেই এই সংগ্রাম চলিবে। তা চলুক,—সংগ্রামে শ্রমিকদের মধ্যে একটা উৎসাহ উদ্যমের ভাব জাগ্রত থাকিবে, সংহতির দৃঢ়তা বাড়িবে, কর্ম্মশক্তি পরিপুষ্ট হইবে ; ক্রমে general strike বা সর্ব্বব্যাপী ধর্ম্মঘটরূপ চরম সেই অমোঘ অস্ত্রপ্রয়োগে চরম সিদ্ধিলাভের যোগ্য তাহারা হইয়া উঠিবে।

কিন্তু হইবে কি ?—এরূপ একটা general strike বা সর্ব্বতঃ-ব্যাপী ধর্ম্মঘট কি সম্ভব কখনও হইতে পারে ? হইলেও সর্ব্বত্র যে একটা বিশৃঙ্খলার বিপ্লব সমাজে উপস্থিত হইবে, তাহার ফল ভোগ কি শ্রমিকরাই করিবে না ? গবর্মেণ্ট ত সব রহিয়াছেই, দমন যদি করিতে নাও পারে, এমন একটা ধর্ম্মঘট যদি সম্ভব হইয়াও উঠে, তবে তার আশঙ্কার সূচনা মাত্র ধনিক সম্প্রদায় আত্মরক্ষার ব্যবস্থা যত সহজে করিয়া নিতে পারিবেন, তার পক্ষে যত সম্বল তাঁহাদের আছে, দরিদ্র শ্রমিকদের তাহা নাই, সেরূপ কোনও ব্যবস্থা তাহারা তত সহজে করিয়া নিতে পারিবে না।

বস্তুতঃ এরূপ একটা সর্ব্বব্যাপী ধর্ম্মঘটকে এনার্কিষ্ট নায়করাও যে একটা সম্ভব্য সিদ্ধি বলিয়া মনে করেন তা নয়। এই তত্ত্বের প্রধান গুরু (philosopher of Syndicalism) সোরেল

* The essential doctrine of syndicalism is class war to be conducted by industrial rather than political methods.

[Roads to Freedom, Bertrand Russel. p. 78.]

(Sorrel) পর্য্যন্ত মনে করেন, ইহা একটা myth বা অবাস্তব কল্পনা মাত্র। তা হউক myth বা অবাস্তব কল্পনা,—এই কল্পনাই সংগ্রামের সকল রস যোগাইতেছে, উৎসাহ উদ্যমকে জাগ্রত রাখিতেছে, আকাঙ্ক্ষিত কর্ম্মের পথে লোককে অগ্রসর করিয়া নিতেছে। সিদ্ধি শেষে যত দিনে যে ভাবেই ঘটুক, সাধনার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। সোরেলই এই কথা বলেন।

ধর্ম্মঘট হইতেছে কাজ ছাড়িয়া দেওয়া,—'বয়কট' সামাজিক সকল সংস্রব বর্জ্জন করা,—আর সাবোটেজ (Sabotage) হইতেছে, কাজের মধ্যে থাকিয়াই কাজ নষ্ট করা। ধর্ম্মঘট ও তাহার রীতি-প্রকৃতি ও ফলাফল সম্বন্ধে পূর্ব্বে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। বয়কট কি তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে সাবোটেজ অদ্ভুত একটা নূতন উপায়। তার সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা প্রয়োজন।

কাজ করিতে করিতে কলের অতি প্রয়োজনীয় কোনও অংশ (some vital parts of a machine) এমনভাবে নষ্ট করিয়া ফেলা যায়,—যাহাতে কলটি একেবারেই অচল হইয়া পড়ে এবং মেরামত করিয়া নিতে বহু সময় ও অর্থের আবশ্যক হয়। আবার সাধারণ অস্ত্র ও যন্ত্রাদিও সব কাজ করিতে করিতে ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়। দৈবাৎ ঘটিয়াছে; কি বলা যায়? আর বলিলেই বা শোনে কে? দলবাঁধা সকল শ্রমিকের অনুমোদনেই যে এইরূপ ঘটিয়াছে।

অতি অল্প সময়ে যাহাতে অনেক অধিক দ্রব্য উৎপন্ন হয় সেইরূপ বন্দোবস্তই সব কারখানার কর্ত্তারা করিয়া থাকেন; সমাপ্তির একটা বাঁধা মাত্রা (a fixed standard of finish) এই সব দ্রব্যের হইলেই তাহা যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। অতি সুন্দর বা অতি মজবুত এসব দ্রব্য অনেক সময়ে হয় না,—তবু বাজারে বেশ চলিয়া যায়, লাভও বেশ হয়। কিন্তু শ্রমিকরা মতলব করিয়া, অনাবশ্যক নিপুণতার সঙ্গে অতি আস্তে আস্তে কাজ করিয়া বহু সময়ে অতি অল্প দ্রব্য

উৎপাদনে মালিকের অনেক ক্ষতি করিতে পারে,—যদিও জিনিসগুলি অনেক ভাল হইবার কথা। এখানেই বা মালিক কি বলিবেন? শ্রমিকরা ত তাহাদের কর্ত্তব্য আরও ভাল ভাবেই সম্পাদন করিতেছে।

বড় দোকানে দোকানে মালিকরা অনেক সময় কৃত্রিম দ্রব্য আসল বলিয়া, মন্দ দ্রব্য ভাল বলিয়া, লোকসানী মাল নিখুঁত বলিয়া, কম দরের মালে বেশী দর ধরিয়া দিয়া, চালাইয়া থাকেন। দোকানে যাহারা কাজ করে, তাহারা খরিদ্দার কেহ আসিলে এই সব ক্রটি তাহাদের দেখাইয়া দিতে পারে। খরিদ্দার তখন মাল কিনিবে না, ফিরিয়া যাইবে। মাল ত বিকাইলই না, আরও দোকানের এমন বদনাম রটিয়া গেল যে দোকান রক্ষা করাই দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। মালিকরা কিছু আর সর্ব্বদা সকল দোকানে বসিয়া থাকিতে পারেন না। আর থাকিলেই বা তিনি কি করিবেন? খরিদ্দারকে কি জবাব দিয়া সন্তুষ্ট করিবেন? পারেন, এক কর্ম্মচারীদের দূর করিয়া দিতে। কিন্তু নূতন কর্ম্মচারী যাহারা আসিবে, তাহারাও ত এইরূপ আচরণই করিবে।

এই সব উপায়েরই সাধারণ নাম সাবোটেজ (Sabotage)। সাধারণ সব ব্যবসায়ে এইরূপ সাবোটেজ মালিকের যতই ক্ষতির কারণ হউক, জনসমাজের বিশেষ ক্ষতি এমন হয় না,—কোন কোনও স্থলে উপকারই বরং হয়। কিন্তু রেলওয়ে ব্যবসায়ের মধ্যে একরূপ সাবোটেজের চেষ্টা হইয়া থাকে, যাহা অতি সাঙ্ঘাতিক। শত শত ট্রেন অবিরত যাতায়াত করিতেছে, কর্ম্মচারীবর্গের অতি সতর্ক তত্ত্বাবধানতার ফলেই দুর্ঘটনা বেশী ঘটে না। ষ্টেশনে পৌছিবার বা ষ্টেশন হইতে ছাড়িবার, পথে চলিবার কতকগুলি বাঁধা নিয়ম আছে; সাধারণতঃ সেই সব নিয়মেই ট্রেন সব থামে, ছাড়ে ও পথে চলে। কিন্তু আকস্মিক দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য ইহার একটু ব্যতিক্রম অনেক সময়ে করিতে হয়। যখন যেমন প্রয়োজন কর্ম্মচারীই বুঝিয়া তাহা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি কেবল কড়া নিয়মের রুটিনেই

ইঁহারা চলেন ; বহু দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। একখানা ট্রেণ ১০-৩৫ মিনিটে কোনও ষ্টেশন হইতে ছাড়িবে ; কিন্তু আর একখানি ট্রেণ হয়ত তখন আসিবে ও পাশের আর এক লাইনে যাইবে ; কিন্তু দৈবাৎ কোনও গোলমালে এই লাইনেই আসিয়া পড়িল। সেখানাও থামান হইল না, এখানাও ছাড়া হইল, ফলে ঘটিল এক সঙ্ঘর্ষ !—অথচ সামান্য একটু চেষ্টায়, নিয়মে বলে নাই এমন একটু কাজ করিলেই, এই সংঘর্ষ নিবারণ করা যাইত। কিন্তু সাবোটেজ-অবলম্বী কর্ম্মচারীরা তাহা করিবেন না। এইরূপ ভাবে এবং আরও কত ছলকৌশলে মধ্য পথে দ্রুতগামী দুইটি ট্রেণের মধ্যেও অতি ভীষণ সব সংঘর্ষ ঘটান যায়। 'সাবোটেজের' সময় ইহাতেও কর্ম্মচারীরা কুণ্ঠিত হন না। সমর্থনে বলিয়া থাকেন, মালিকদের সঙ্গে সংগ্রামে তাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন,—সংগ্রামের প্রয়োজনে যে অস্ত্র যেখানে লাগিবে প্রয়োগ করিতেই হইবে। লোকহত্যা হয়, উপায় কি ? সংগ্রামে সর্ব্বত্রই কত এরূপ লোকহত্যা হইতেছে। কাহারও প্রতি কোনও করুণার অবসর সংগ্রামের মধ্যে নাই।

সোসিয়ালিজম্ এনার্কিজম ও সিণ্ডিক্যালিজম্—এই তিনটি প্রস্তাবিত পদ্ধতিরই লক্ষ্য ব্যক্তিগত বা পরিবারগত যে পৃথক্ সম্পত্তির অধিকার এবং অধিকারের সঙ্গে বৃত্তিগত ও ধনগত যে পদপর্য্যায় ও শ্রেণাভেদ বর্ত্তমান সমাজের বিশিষ্ট লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা লোপ করিয়া ফেলা। তারপর, সোসিয়ালিষ্ট অর্থাৎ কার্লমার্ক্সের মতাবলম্বী কলেক্টিভিষ্টরা (the Collectivists) চাহিতেছেন, দেশের সকল সম্পদ দেশবাসী সকলের সমান অধিকারে অর্থাৎ দেশবাসীর সমবেত শক্তির প্রতিভূ স্বরূপ ষ্টেটের অধিকারে আসুক ; এনার্কিষ্টরা চাহিতেছেন, সম্পদ আদবে কাহারও অধিকারেই থাকিবে না, মুক্তভাবে যত্র তত্র প্রচুর উৎপন্ন হইবে, সকলেই প্রয়োজন মত নিয়া ব্যবহার করিবে। আর সিণ্ডিক্যালিষ্টরা চাহিতেছেন, ইহা এক এক মণ্ডলীভুক্ত

শ্রমিকদের অধিকারে থাকিবে।* যে ব্যবসায়ে যে শ্রমিকমণ্ডলী কাজ করিবে, তাহাতে উৎপন্ন যাহা কিছু দ্রব্য, তাহাও সব সেই মণ্ডলীর সমবেত অধিকারে থাকিবে। অন্য যাহা কিছু দ্রব্য প্রয়োজন হইতে পারে, অপর কোনও মণ্ডলীর নিকট হইতে বিনিময়ের নিয়মে তাহা সংগৃহীত হইবে। সুতরাং প্রত্যেক লোককেই এইরূপ কোনও না কোনও মণ্ডলীর মধ্যে থাকিতে হইবে, তার নিয়মে চলিতে হইবে, নতুবা দেহরক্ষার উপায় অশনবসনাদিই আর কোথাও কোনও প্রকারে তাহার জুটিতে পারে না। কোনও গবর্মেণ্ট চান না, তাই ইঁহারা এনার্কিষ্টও বটেন। কিন্তু সাধারণ এনার্কিষ্টরা যেমন সর্ব্বতোভাবে সকলরূপ বন্ধন হইতে মানবকে মুক্ত করিয়া ফেলিতে চান, সিণ্ডি-ক্যালিষ্টরা তাহা চান না। বিভিন্ন শ্রমিকমণ্ডলীর সুদৃঢ় একটা সংহতির আবশ্যকতা তাহারা মানেন, এবং এই সংহতির বলেই তাঁহাদের আকা-ঙ্ক্ষিত সমাজপদ্ধতিকে তাঁহারা কেবল প্রতিষ্ঠা করিতেই চান না, রক্ষা ও পরিচালনা করিতেও চান। কেহ কেহ তাই ইহাকে Organised Anarchy বা 'সংঘায়ত্ত অরাজকতা' এই নামও দিয়াছেন।

* "While Collectivism would substitute ownership by everybody, Anarchism ownership by nobody and Syndicalism aims at ownership by organised Labour."

[Roads to Freedom, Bertrand Russel, p. 82.]

ৰ্যাসন্যালিজম্‌ ও ধর্ম্মনীতি।।

র্যাসনালিষ্ট মতের প্রভাব ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে ব্যবসায়িক জীবনে এবং তাহার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংসৃষ্ট রাষ্ট্রীয় জীবনে যে সব অবস্থার সৃষ্টি ইয়োরোপায় সমাজে করিয়াছে, তাহারই প্রতি-ক্রিয়ায় দরিদ্র শ্রমিক জনসাধারণের মধ্যে যে সব আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধে তাহার সম্বন্ধে মোটা-মুটি একটা আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই আন্দোলন অতি ব্যাপক হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়া অতি বৃহৎ এক সাহিত্যেরও সৃষ্টি হইয়াছে। প্রতিযোগিতাপরায়ণ স্বাধীন ব্যক্তিত্বের যে অধিকারকে মানবের জন্মগত অলঙ্ঘনীয় অধিকার বলিয়া র্যাসনালিষ্ট মতনায়কগণ প্রচার করেন, তাহারই স্বাভাবিক পরণতি যে এক এক জাতির মধ্যে বিভিন্ন দল বা সম্প্রদায়কে এবং সমগ্র পাশ্চাত্য অঞ্চলে বিভিন্ন জাতিকে পর্য্যন্ত অত্যধিক স্বার্থপরায়ণ ও পরস্পরের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তুলিয়াছে, পূর্ব্বে ৯ম প্রবন্ধে (৪৩২—৪৩৪ পৃষ্ঠায়) তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এই প্রতি-দ্বন্দ্বিতা যে কি ঘোর সব অমঙ্গল প্রসব করিতে পারে, গত মহাযুদ্ধে তাহা বিশেষ ভাবেই প্রকট হইয়াছে: কারণ মহামার এই ঘোর যুদ্ধের মূল নিদান হইতেছে, জাতিতে জাতিতে সাম্রাজ্যলিপ্সায় এই প্রতি-দ্বন্দ্বিতা। তাই গত যুদ্ধের পর প্রতিক্রিয়ামূলক এই শ্রমিক আন্দোলন আরও ঘোরতর হইয়া উঠিয়াছে। রুষিয়ার বোলশেভিক বিপ্লবও বাস্তব ক্ষেত্রে, যেরূপই হউক, একটা সিদ্ধির গৌরব দিয়া ইহার বল অনেক বাড়াইয়া তুলিয়াছে। এই বিপ্লবের পর গত কয়েক বৎসরে ইহারই কথায়: নানাদিক হইতে ইহারই আলোচনায়, ইয়োরোপীয় চিন্তা ও ইয়োরোপীয় সাহিত্য ভরপূর হইয়া উঠিয়াছে। সোসিয়ালিষ্ট আন্দোলন পূর্ব্ব হইতেই অবশ্য বেশ জোরে চলিতেছিল, কিন্তু সমাজের মধ্যে

কার্য্যকরী একটা বাস্তব মূর্ত্তিতে তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিবার যে চেষ্টা, তাহা এই যুদ্ধের পরই আরম্ভ হইয়াছে। এই সব পদ্ধতির বা বাস্তব মূর্ত্তির স্বরূপ কি হইতে পারে, গত প্রবন্ধে তাহার একটা চিত্র দিবার চেষ্টা করিয়াছি। প্রবন্ধ যতই দীর্ঘ হউক, এই সব চিত্র যে অতি সাধারণ এক একটা outline sketch বা মোটামুটি রেখাটানা চিত্রই হইয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য।

এই আন্দোলন ও এই প্রচেষ্টা বড় একটা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ইয়োরোপে ঘটাইতে হয়ত পারে; কিন্তু ইহার কোনও একটি কল্পিত চিত্র যে সমাজের বাস্তব মূর্ত্তি হইয়া উঠিবে, বা উঠিতে পারে, এরূপ মনে করা যায় না। লক্ষ্য সম্বন্ধে নায়কবর্গ সকলে একমত নহেন, এবং প্রধানতঃ তিনটি পৃথক মতে পৃথক তিনটি দলও ইঁহাদের মধ্যে হইয়াছে, যথা কলেক্টিভিজম্ (Collectivism) বা All-government Socialism, এনার্কিজম্ বা No government Socialism, এবং সিণ্ডিক্যালিজম্ বা Organised Labour-Socialism। এই অনৈক্য বড় একটা বিপ্লব ঘটিবার পথে আশু গুরু একটা বাধা বলিয়াও অনেকে মনে করেন। ইহার উপর আবার কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধেও বড় একটা মতের অনৈক্য আছে। কলেক্টিভিষ্ট মতের সোসিয়ালিষ্টরা পার্লামেণ্ট ও আইনের পথে লক্ষ্য-সিদ্ধি করিতে চান, এবং এনার্কিষ্ট ও সিণ্ডিক্যালিষ্টরা চান ধর্ম্মঘট, বয়কট্, স্যাবোটেজ প্রভৃতি ডাইরেক্ট পন্থার (direct actionএর) বলে। দলে সমধিক প্রবল হইলেও পার্লামেণ্ট ও আইনের পথে সোসিয়ালিষ্টরা যে কোথাও বড় বেশী অগ্রসর হইতে পারিতেছেন, তাহা বলা যায় না। তবে বিবিধ ডাইরেক্ট পন্থার জোর সর্ব্বত্রই বেশ, বাড়িয়া উঠিতেছে, এবং ইহার সহায়তা নিতেও সোসিয়ালিষ্টরা সর্ব্বদা প্রস্তুত। এই সব ডাইরেক্ট পন্থার ফলে দেশে বড় একটা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, ক্রমে তাহা রাষ্ট্রবিপ্লবের আকারও ধারণ করিতে পারে, এবং সেই সুযোগে পার্লামেণ্ট ও রাষ্ট্রশাসনের অন্তান্ত যন্ত্র সোসিয়ালিষ্টরা

অধিকার করিয়া ফেলিতে পারেন। সে দিকে যাহা কিছু লক্ষ্য সোসিয়ালিষ্টদেরই আছে এবং তাঁহাদেরই থাকিতে পারে। এনার্কিষ্ট ও সিণ্ডিক্যালিষ্টরা কেবল বিপ্লবই ঘটাইতে চান, এবং ভরসা করেন, বিপ্লবের পর তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষিত অবস্থা আপনিই ঘটিবে। কিন্তু সম্ভব হইলেও, তাহা ঘটিয়া উঠিবার আগেই যে সোসিয়ালিষ্টরা গবর্মেণ্টের শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া তাহার বলে তাঁহাদের পদ্ধতি সমাজের উপরে চাপাইবার চেষ্টা করিতে পারেন, যেমন রুষিয়ার বোল্‌শেভিকরা করিয়াছেন, একথা তাঁহারা তেমন ভাবেন কিনা বলিতে পারি না। তারপর এই নীতি ও লক্ষ্যের পার্থক্যের কথা চিন্তাশীল নায়করা যতই ভাবুন, যতই এসব ধরিয়া চলিতে কি দল বাঁধিতে চেষ্টা করুন, সাধারণ যে শ্রমিকবর্গ তাঁহাদের দলের আসল বল—তাহারা যে এসব কথা বেশী ভাবে, তেমন বেশী বোঝে সেরূপ মনে হয় না। ধনিকসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তীব্র একটা বিদ্বেষের উত্তেজনাই কেবল তাহাদের মধ্যে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহারা মনেকরে,পার্লামেণ্টের আইনে কি ধর্ম্মঘটাদি উপায়ে, যে ভাবেই হউক, তাহাদের শত্রুপক্ষ এই ধনিক সম্প্রদায়কে ধ্বংস বা দমন করিয়া ফেলিতে পারিলেই তাহারা সমাজের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইবে, এবং পরম সুখে জীবনযাপন করিতে পারিবে। এতটাই ঠিক স্পষ্টভাবে ভাবে কিনা,বোঝে কিনা, তাও বলা যায় না। বহু দুঃখ তাহারা পাইতেছে এবং এই দুঃখের হেতু বলিয়া যাহাদের তাহারা মনে করে, তাহাদের সঙ্গে এই যে একটা বিরোধে তাহাদের উদ্রিক্ত করিয়া তোলা হইয়াছে, তাহার মাদক উত্তেজনাই মাত্র হয়ত এই বিরোধে তাহাদের পরিচালিত করিতেছে। যে দিকে যেরূপ কর্ম্মেই হউক, এইরূপ একটা মাদক উত্তেজনা যখন জনগণের চিত্তকে অভিভূত করিয়া ফেলে, কর্ম্মের যুক্তিসঙ্গতি কিছু আছে কিনা, ভবিষ্যতের ভালমন্দ কিসে কি হইবে, এ সব কিছু হিসাব তাহাদের থাকে না। এই উত্তেজনা যে পথে যে দিকে তাহাদের লইয়া যায়, সেই দিকে সেই পথেই তাহারা চলে। ফরাসী বিপ্লব এই ভাবে

ঘটিয়াছিল; বোল্‌শেভিক বিপ্লবও এই ভাবে ঘটিয়াছে। তা ছাড়া ধর্ম্মের অন্ধ মাদক উত্তেজনা (religious fanaticism) জনগনকে প্রমত্ত ও ক্ষিপ্তপ্রায় করিয়া কত যে অত্যহিত মানবসমাজে করিয়াছে, এখনও করিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাই মনে হয়, এই সব আন্দোলন যদি বাস্তব কোনও বিপ্লবে পরিণত হয়, তবে সেই বিপ্লবের নায়ক সোসিয়ালিষ্টরাই হইবেন, এবং এবং সেই বিপ্লবের যাহা কিছু শক্তি প্রধানতঃ তাঁহাদেরই হাতে গিয়া পড়িবে। দল হিসাবেও অধুনা সোসিয়ালিষ্ট দলই অতি প্রবল, এবং The International Workingmen's Ascoiation অথবা The International নামে পরিচিত যে শ্রমিকসমিতিই শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান মুখপাত্র হইয়াছে, তাহাও সোসিয়ালিষ্ট মতাবলম্বী। রুষিয়ার বোলশেভিক বিপ্লবও সোসিয়ালিষ্ট দলের প্রভাবকে অনেক বাড়াইয়া দিয়াছে।

যাহাহউক, বিপ্লবের সম্ভবানা যেদিক হইতে যেরূপ কিছু থাক্ কি নাই থাক্, এই তিন মতের কোনও পদ্ধতিই বাস্তবমূর্ত্তিতে সমাজে কখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করুক কি নাই করুক, পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহারে মানব কিরূপ নীতি অনুসারে চলিলে সমাজস্থিতি সম্ভব হয়, সামাজিক জীবনে সকলে মঙ্গলের ভাগী হয়, সমাজের নৈসর্গিক ধর্ম্মনীতিই বা কি, এসব সম্বন্ধে অনেক তথ্য, বহু সত্যের আভাস, এই সব আন্দোলনের তত্ত্বালোচনা হইতে আমরা পাই। কেবল একটা প্রতিক্রিয়ার ফল বলিয়াই ইহাকে উপেক্ষা করা যায় না। প্রতিক্রিয়ার ফল ইহা ত বটেই, এবং যে নীতিপদ্ধতির প্রতিক্রিয়া ইহা, তাহাও যেমন সকল সঙ্গতির সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে, প্রতিক্রিয়াও যে তাই যাইবে, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু যতই ভুলত্রুটি ইহার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, লক্ষ্যের আদর্শ যতই অস্বাভাবিক কি অসমীচীন, কার্য্য-প্রণালী যতই অসঙ্গত কি ন্যায়বির্গহিত, এবং তাহার প্রেরণা যতই বিদ্বেষদুষ্ট বলিয়া আমাদের মনে হউক, মানবসমাজের ভবিষ্যৎ কোন্ দিকে,

মঙ্গলের পথ তার কি,—বড় যে সব ভুল করিয়া বর্ত্তমান ইয়োরোপায় সভ্যতাই আজ এই বিষম সঙ্কটে আসিয়া উপনীত হইয়াছে, সমগ্র জগৎকেও সেই সঙ্কটে আনিয়া ফেলিয়াছে, তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় কি,—বহু দিকে বহু ভাবে এই আন্দোলন তাহা নির্দ্দেশ করিতেছে। শিখিবার ও বুঝিয়া চলিবার বহু তথ্য, বহু সূত্র, ইহার মধ্যে সকলেই পাইবেন।

উচ্চতর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যত বড়ই তীব্র একটা বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার উত্তেজনা এই আন্দোলনের মধ্যে প্রকাশ পাউক, ইহাও আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে, যে এই আন্দোলনের মূলে রহিয়াছে শ্রমিক জনগণের দুঃখে অতি জাগ্রত একটা বেদনা, এবং সামাজিক যে সব অন্যায় ইহাদিগকে দারুণ এই দুঃখের অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে, এই বেদনাই তাহার কর্ত্তাদের বিরুদ্ধে এই বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার ভাবকে উদ্রিক্ত করিয়াছে। দুঃখার প্রতি করুণার ব্যথাই দুঃখদাতার বিরুদ্ধে রোষের উত্তেজনা জাগাইয়া তোলে। এক হাতে যেমন লোকে তখন দুঃখীকে শান্তি দিতে চায়, অপর হস্তে তেমনই অত্যাচারীর দণ্ড বিধান করিতে উদ্যত হয়। দক্ষিণে বরাভয়করা বামে অসিমুণ্ড-ধরা, জাগ্রত জগৎশক্তির মূর্ত্তিই এই ভাবে এদেশে কল্পিত হইয়াছে। তারপর সমগ্র এই আন্দোলনের এক লক্ষ্য হইতেছে, শক্তিমানের অন্যায় বা অসঙ্গত প্রভুত্বে দুর্ব্বল জনসাধারণ যে এত দুঃখ পায়, তাহার সকল মূলকে একেবারে উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়া সকলেই যাহাতে সমান সুখে এ পৃথিবীতে বাস করিতে পারে, এমন এক নীতি-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করা। *

* এই আন্দোলনের নায়ক যাঁহারা, তাঁহারাও উচ্চতর সম্প্রদায়েরই লোক। সোসিয়ালিষ্ট নায়ক কার্ল মার্কস ও তাঁহার সহযোগী ও শিষ্যগণ বুর্জ্জোয়াস সম্প্রদায়ভুক্ত; এনার্কিষ্ট নায়ক টলষ্টয়, বাকুনিন ও ক্রোপট্কিন, অভিজাত ভূস্বামি-বংশীয়। সিণ্ডিক্যালিষ্ট নায়করাই কেবল খাঁটি শ্রমিকসম্প্রদায়ের মধ্যে হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন।

এইখানেই ইঁহাদের বড় একটি ভুল এই যে ইঁহারা মনে করেন, ধনসাম্য হইতেই এই সুখের সাম্য মানবসমাজে সম্ভব হইবে। অবশ্য অবিরত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়াও পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছে না, কাজ করিয়া যে খাইবে এমন একটু সুযোগ কোথাও মিলিতেছে না, বহুলোকের পক্ষে এমন একটা অবস্থা না থাকে, সকলেই খাইয়া পড়িয়া স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিতে পারে, সমাজের এমন একটা অবস্থা যে নিতান্তই বাঞ্ছনীয়, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু তার জন্য সকল ধন কড়ানিয়মে সমান ভাবে সকলকে ভাগ করিয়া দিবার প্রয়োজন হয় না; এবং এই সমতা রক্ষার জন্য সম্পত্তির উপরে পারিবারিক বা ব্যক্তিগত অধিকারকেও একেবারে লোপ করিয়া ফেলিবার দরকার হয় না। তারপর লোকের সুখ কেবল প্রচুর অশনবসনের উপরেই নির্ভর করে না, এবং কেবল একই রকমের অশনবসনাদি মাত্র সমান ভাবে সকলের মধ্যে বিতরিত হইলে সুখ-দুঃখের সমস্যাও একেবারে মিটিয়া যায় না। দেহরক্ষার উপযোগী অন্নবস্ত্র অবশ্য সকলেরই চাই। কিন্তু তার উপরেও রুচি অনুসারে বহু আকাঙ্ক্ষার ও বহু চিত্তবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোকে এত ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বা উপকরণ এমন ভাবে চায়, যে তাহার আয়োজন ও যথাযোগ্য পাত্রে বিতরণের ব্যবস্থা বাহিরের কোনও শক্তির পক্ষে সম্ভব নহে। রুচি প্রবৃত্তি ও শক্তি অনুসারে নিজেরাই সকলে এ সব সংগ্রহ করিয়া নেয়। যাহারা এ সব যোগায়, তাহারাও লোকের রুচি-প্রবৃত্তির দাবী বুঝিয়া নিজেরাই যোগায়, যোগাইয়া তাহার বিনিময়-মূল্যে নিজেদেরও আকাঙ্ক্ষিত ভোগ্য সংগ্রহ করে। তবে ইহার মধ্যে দেখিতে হইবে, যে কোনও ভোগ্য সম্বন্ধেই হউক, শক্তিমান্ ব্যক্তিদের অতিলোভ এত বেশী না চায়, এত বেশী না নেয় বা নিতে পারে, যাহাতে বহু লোক তাহাদের ন্যায্যভোগে বঞ্চিত হইবে। ইহারই একটা প্রয়োজন অনুভব করিয়া, অধুনা কেহ কেহ—যাঁহারা ঠিক খাঁটি সোসিয়ালিষ্টও নহেন, এনার্কিষ্টও নহেন—এমন কেহ কেহ

বলিতেছেন,—ব্যক্তিগত পৃথক্ সম্পত্তির অধিকার হইতে মানবকে একেবারে বঞ্চিত করা সম্ভব নহে, বাঞ্ছনীয়ও নহে; তবে এমন একটা ব্যবস্থা সমাজে হওয়া আবশ্যক যে কাহাকেও অত্যধিক অভাবের ক্লেশে জীবনবহন করিতে না হয়, আবার অত্যধিক বিলাসব্যসনেও সামাজিক সম্পদ কেহ অপব্যয় না করিতে পারে। স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া মোটামুটি একটা স্বচ্ছন্দ ভাবে থাকিতে ন্যূন পক্ষে মানুষের যাহা লাগে, যাহা নহিলে নয়, তাহাকে জীবনযাত্রার একটা নিম্নতম মাত্রা (minimum standard of living) বলিয়া ধরিয়া নিতে হইবে, আর বিলাসভোগে লোকে ঊর্দ্ধসংখ্যায় কত ব্যয় করিতে পারিবে, ব্যয় করিবার জন্য কত ধন আপন অধিকারে রাখিতে পারিবে, তাহারও একটা মাত্রা অর্থাৎ maximum standard of livingও ধরিয়া নিতে হইবে। তারপর বিধিব্যবস্থা এমন করিতে হইবে, যাহাতে এই উচ্চতম জীবিকার মাত্রার (maximum standardএর) উপরে কেহ না যাইতে পারে, আর অতি দীনহীন কি রুগ্ন দুর্ব্বল ব্যক্তিরাও নিম্নতম মাত্রা বা minimum standandএর কমে কখনও না পড়ে। সমাজে মোটের উপর কত ধন উৎপাদিত হইতে পারে, তাহার একটা সীমা আছে। বিলাসভোগে ও তার জন্য ধনের অধিকারে ধনীকে একটা সঙ্কোচের সীমার মধ্যে না রাখিতে পারিলে, অন্য সব লোককে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য এই মিনিমাম্ বা অপরিহার্য্য ন্যূন মাত্রা দেওয়া যায় না। তাই এই মিনিমামের সঙ্গে ম্যাক্সিমামেরও একটা মাত্রা রাখার আবশ্যকতা হয়।

এমন একটা ব্যবস্থা সম্ভব হইলে যে অতি উত্তম কথাই হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এ ব্যবস্থা কে করিবে? এই ব্যবস্থা অনুসারে সমাজ-জীবন ঠিক চলে, তাহাই বা দেখিবে কে?

ষ্টেট্? ডিমক্রাটিক ষ্টেট্? জনগণের মতায়ত্ত খাঁটি ডিমক্রাটিক ষ্টেট্?—এমন একটা ষ্টেট্ যদি সম্ভবও হয়, ধনী ও শক্তিমান্‌কে তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, এরূপ একটা maximum মাত্রার মধ্যে

বাধ্য করিয়া ধরিয়া রাখা কি সম্ভব ? বিধি ব্যবস্থা যতই যেমন থাক্, এড়াইবার অশেষরূপ কৌশলও লোকে বাহির করিয়া নিতে পারে, এড়াইবার মতলব যদি থাকে। এই সব লইয়া ধনীর সঙ্গে, শক্তিমান্ পদস্থ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে, অবিরত একটা কলহ করিয়া কি কোন্‌ও ষ্টেট্ কখনও চলিতে পারে ?

কিন্তু রাষ্ট্রীয় বাধ্যতার প্রয়োজন কি ? সমাজের কল্যাণে ইহাই প্রয়োজন, এইরূপ বুঝিয়া স্বেচ্ছায় কি এই সঙ্কোচের সীমার মধ্যে ধনীরা আপনাদের আনিতে পারেন না ? আমরা এত চাই না, সত্যকার সুখের জন্য এত প্রয়োজন নাই, ইহার বেশী আমরা নিব না, পাইলেও ছাড়িয়া দিব,—সকলেই সুখে থাক, সকলের সব দুঃখক্লেশ দূর হউক,—এমন একটা ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া মানুষ কি এই ত্যাগ করিতে পারে না ? আপনার অতিসুখের কতক অন্ততঃ অন্যকে ভাগ করিয়া দিতে পারে না ? হাঁ, পারে। না পারিলে আর সে মানুষ কিসের ? সকলে না পারুক, অনেকেই পারে। এবং এই অনেকে যারা পারে, তাহাদের এই মহত্ত্বের প্রভাব, এমনই এক নৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করে, জীবনের দৃষ্টান্ত এমনই এক আদর্শের স্থাপনা করে, যে অন্য সকলেও কতক পরিমাণে অন্ততঃ এই ভাবের স্পর্শে ইহাদের এই আদর্শের অনুবর্ত্তন করিয়া চলে। কিন্তু ত্যাগের ও সংযমের এই প্রেরণা ষ্টেটের আইন হইতে কাহারও মধ্যে আইসে না, বা মেজরিটীর ভোট মানবচরিত্রকে এরূপ উন্নত স্তরে তুলিয়া নিতে পারে না। পারে ধর্ম্ম, ষ্টেট্ নয়। ধর্ম্মের—সাম্প্রদায়িক কোনও ধর্ম্মপদ্ধতি (sectarian religious system) বা চার্চ্চ বলিতে সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝি, তার নয়,—সত্যকার সনাতন ও শাশ্বত যে ধর্ম্ম, মানবজীবনের ধারক যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মের ভিত্তিতে যে সমাজ-জীবন প্রতিষ্ঠিত, সেই সমাজে আপনা হইতেই এইরূপ একটা অবস্থা দেখা দেয়, এই ত্যাগ ও সংযম সাধুজীবনের আদর্শ বলিয়া সাধারণতঃ আদৃত ও অনুসৃত হয়। জীবনযাত্রার একটা ম্যাক্সিমাম ও

মিনিমাম্ মাত্রা রাষ্ট্রীয় বিধিতে বাঁধিয়া দিবার, রাষ্ট্রদণ্ডে রক্ষা করিবার, প্রয়োজন সেখানে হয় না। ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মানুগ লোকমত ও লোক-ব্যবহারই এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করে, যাহাতে কেবল ধনার্জ্জন ও ধনসঞ্চয়ই মাত্র উচ্চতর বিদ্যাবুদ্ধি ও শক্তির অধিকারী সকল লোকের সর্ব্বপ্রধান কাম্য হয় না। আর ধন যেই যত অর্জ্জন ও সঞ্চয় করুক, কেবল আত্মভোগে মাত্র ব্যয় না করিয়া, তাহাতে একটা সীমার মধ্যে থাকিয়া, এমন সব কর্ম্মের বা উৎসবের অনুষ্ঠানই বেশী করিবে, যাহা বহু লোকের পক্ষে বহু সুখের ও আনন্দের কারণ হইবে। আবার বলি, এ অবস্থা কোনও ষ্টেট্ শত সহস্র আইনে কোনও দেশে আনিতে পারে না। পারে, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুগত লোকমত ও লোক-ব্যবহার।

সোসিয়ালিষ্ট, এনার্কিষ্ট প্রভৃতি আন্দোলনের আর একটি বড় ভুল হইয়াছে, এইখানে। ধর্ম্ম যে মানবজীবনের কত বড় একটি সত্য,—যাহাতে মানবজীবন আশ্রিত ও যাহার নিয়মে ইহার নিয়ন্ত্রিত, তাহাই যে ধর্ম্ম,—জীবনের সকল মঙ্গলের আদি উৎস ও চির ধারকই যে ধর্ম্ম,—একথা ইঁহারা স্বীকারই করিতে চান না। ধর্ম্ম বলিতে মাত্র ভাগবত কোনও শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম বা religionকে মাত্র ইঁহারা বোঝেন, এবং মনে করেন, তাহা বড় একটা ফাঁকি বা বুজরুকির উপরে গড়া একটা প্রতিষ্ঠান মাত্র, মানবের বিচারশীল বুদ্ধি যুক্তির দিক হইতে যাহার কোনও কথার সমর্থন করিতে পারে না। যাজক ও উচ্চতর শাসক-সম্প্রদায়ের স্বার্থপর প্রভুত্বকে শান্তভাবে ও সন্তুষ্ট চিত্তে জনসমাজ যাহাতে মানিয়া চলে, নিজেদের মানবোচিত অধিকারের দাবী ভুলিয়া সর্ব্বদা কেবল ইহাদেরই মহিমা কীর্ত্তন করে আর ভোগসুখের সকল উপাদান যোগায়, তাই বহুছলে তাহাদের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করিয়া এই প্রতিষ্ঠানকে তাহাদের উপরে চাপাইয়া রাখা হইয়াছে। সুতরাং মানবের মুক্তির পক্ষে, আত্মাধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃত সুখলাভের পক্ষে, ইহা নিতান্ত আবশ্যক, যে ধর্ম্মরূপ এই মহাছলের আয়তনকে একেবারে

ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। ধর্ম্মের সম্বন্ধে এরূপ একটা বিরুদ্ধ মত যে পোষণ করেন, তার জন্য ইঁহাদের এমন দোষও বড় কিছু দেওয়া শক্ত। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গেই ইয়োরোপে চার্চ্চের অভ্যুদয় হয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যাহা কিছু ব্যাপার এমনই ভাবে চার্চ্চের সঙ্গে যুক্ত ও চার্চ্চের অধিকৃত হইয়া পড়ে এবং চার্চ্চের সঙ্গে ধর্ম্মের অতি নিবিড় ও অঙ্গাঙ্গী এমন একটা সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া যায়, যে চার্চ্চ ছাড়া ধর্ম্মের স্বতন্ত্র একটা বিশিষ্ট স্বরূপ যে কি হইতে পারে, তাহার ধারণাও ইয়োরোপে অনেকে করিতে পারেন না। ইয়োরোপীয় যে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম বা ক্রিশ্চিয়ানিটী (Christianity), তাহা একরূপ 'চার্চ্চিয়ানিটী'তে (Churchianityতে) পরিণত হয়। এই 'চার্চ্চিয়ানিটী' রূপে ধর্ম্মের যে কিরূপ বিকার ইয়োরোপে ঘটে, ধর্ম্ম যে কিরূপ একটা শক্তিচক্রের শাসনদণ্ড মাত্র হইয়া দাঁড়ায় এবং ধর্ম্মকে এই শক্তিচক্রের প্রভুত্ব হইতে মুক্ত করিবার যাহা কিছু চেষ্টা সবই যে কি ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে, পূর্ব্বে এসব কথার বহু আলোচনা করিয়াছি। র‍্যাসনালিষ্ট যুগ হইতে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে সব আন্দোলন ইয়োরোপে দেখা দিয়াছে, তাহারও মূল কারণ হইতেছে এই। সোসিয়ালিজম ও এনার্কিজমের এই যে ধর্ম্মবিদ্রোহ, তাহাও প্রকৃত পক্ষে এই 'চার্চ্চিয়ানিটী'র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। আপন স্বরূপে ধর্ম্ম যদি ইয়োরোপে কোথাও আত্মপ্রকাশ করিবার অবসর পাইত, তবে র‍্যাসনালিষ্টদের সম্বন্ধে যাহাই বলা যাউক, ইঁহারাও যে ধর্ম্মের বিদ্রোহী হইতেন, ধর্ম্মকে একেবারে লোপ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন, তাহা নাও হইতে পারে। কারণ, প্রবলের স্বার্থপর প্রভুত্ব হইতে মুক্ত জনসাধারণের সুখে পরিপূর্ণ যেরূপ সমাজ সোসিয়ালিজম্ ও এনার্কিজমের লক্ষ্য, ইয়োরোপীয় চার্চ্চ যতই হউক, প্রকৃত ধর্ম্ম তাহার বিরোধী ত হইতে পারেই না, বরং ধর্ম্মই এরূপ আদর্শে সমাজকে যত সহজে তুলিয়া নিতে ও স্থিত রাখিতে পারে; আর কিছুতেই তেমন পারে না। পূর্ব্বে ইহাও আমরা দেখিয়াছি, টলষ্টয়ের এনার্কিজম্ এবং খৃষ্টীয় একরূপ

সোসিয়ালিজম আছে, যাহা ধর্ম্মকে ধরিয়াই আপন আপন প্রতিষ্ঠা চাহিয়াছে।

ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য এবং ব্যক্তিগত ও দলগত প্রতিযোগিতাই র‍্যাসনালিষ্ট যুগের পর ইয়োরোপীয় জীবনের প্রধান লক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে। ডারুইনিজম (Darwinism) অর্থাৎ ডারুইন প্রবর্ত্তিত ইভোলিউশন বা অভিব্যক্তি বাদ ইহাকেই মানবজীবনের স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া ধরিয়া নিয়াছে। ব্যক্তি একা একা পারে না, তাই দল বাঁধিয়া অপর সব ব্যক্তি বা দলের সঙ্গে এই প্রতিযোগিতাব সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। এই জীবন-সংগ্রামই (struggle for existenceই) জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং এই সংগ্রামে যে জীবদল, জীবগোষ্ঠী বা জীবজাতি জয় লাভ কবিতে পারিবে, তাহারাই উন্নত হইয়া এ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে,—আর যাহাবা পারিবে না, তাহাবা লুপ্ত হইবে। ইহাকেই ডারুইন ও তাহাব মতানুবর্ত্তিগণ Survival of the Fittest বা যোগ্যতমেব জীবনপ্রতিষ্ঠা নীতি নামে অভিহিত করিয়াছেন, এবং বিজ্ঞানসিদ্ধ নৈসর্গিক নীতি বলিয়াই ইহা গৃহীত হয়। র‍্যাসনালিজম দার্শনিক চিন্তার একটা দিক হইতে প্রতিযোগিতাপরায়ণ ব্যক্তিত্বের যে নীতিকে স্বাভাবিক ও সত্য বলিয়া সমর্থন কবেন, ডারুইনিজম্ বিজ্ঞানেব দিক হইতেও তাহাকে নৈসর্গিক সত্য বলিয়া ঘোষণা করেন। এই দুই দিকের জোর পাইয়া প্রতিযোগিতার সংগ্রাম ইয়োরোপীয় জীবনে সকল সাধনার মূলমন্ত্র ও সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। কেবল বিভিন্ন জাতিতে নয়, এক এক জাতিব মধ্যে বিভিন্ন দলে বা সম্প্রদায়ে এই সংগ্রামই সকলের বড় কথা হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু সোসিয়ালিষ্ট ও এনার্কিষ্টরা ইহার প্রতিবাদে বলিতেছেন, প্রতিযোগিতা নয় সহযোগিতা,—mutual struggle নয়, mutual aid মানব জীবনের নৈসর্গিক নীতি *। এই নীতির প্রভাবেই সমাজ

* ৩৬৫—৩৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গড়িয়াছে, এবং এই নীতির ধর্ম্মেই সমাজের স্থিতি সম্ভব। এই কথায় বড় একটা সত্যকেই যে ইঁহারা নির্দ্দেশ করিতেছেন, একথা বলাই বাহুল্য। 'পূর্ব্বে প্রথম কয়েকটি প্রবন্ধে ন্যাশানিজম বা স্বৈরার্থিক সঙ্ঘাতরূপে সমাজের যে স্বরূপ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহার পর এই সত্যের প্রমাণ সম্বন্ধে অধিক আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। এদেশের 'সমাজ' এবং ইয়োরোপের 'সোসাইটী,' এই দুইটি কথার মৌলিক অর্থও এই সত্যেরই সাক্ষ্য দিতেছে। অস্বাভাবিক এই প্রতিযোগিতার প্রাধান্যই বর্ত্তমান সমাজে যত দুঃখের ও অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে, এবং তাই ইঁহারা চান, এই প্রতিযোগিতাকে এবং তার সকল সম্ভাবনাকে একেবারে লোপ করিয়া সম্পূর্ণ ও অক্ষুন্ন সহযোগিতার নীতির উপরেই সমাজজীবনকে প্রতিষ্ঠা করিতে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার এই প্রতিযোগিতার বড একটা হেতু হইতে পারে, তাই তাহাকেও কোনও আমল ইঁহাবা দিতে চান না। এই সহযোগিতাকেই সমাজজীবনের একমাত্র আশ্রয় করিতে চান, তাই এই সব পদ্ধতিরও সাধারণ নাম হইয়াছে, সোসিয়ালিজম। প্রতিযোগিতার পরিবর্ত্তে পরস্পর সহযোগিতা,নির্ম্মম সংগ্রামের পরিবর্ত্তে পরস্পরের মমত্বমূলক সহাযতা,mutual competition ও struggle-এর পরিবর্ত্তে spirit of association and mutual aidই, জীব-সংহতির মূল ধর্ম্ম এবং সেই ধর্ম্মই এই সংহতির সকল নীতি ও সকল ক্রিয়ার মূল আশ্রয় হইবে, এই পর্য্যন্ত অতি উচ্চ একটি সত্যের নির্দ্দেশ ইহারা করিতেছেন, এবং ভবিষ্যৎ মানব সমাজের নূতন নীতি পদ্ধতির কথা যাহারাই যে ভাবে চিন্তা করুন, এই নির্দ্দেশকে অবজ্ঞা কেহই করিতে পারেন না। কিন্তু মানুষ একদিকে যেমন সামাজিক জীব, সামাজিক সহযোগিতা একদিকে যেমন তার অপরিহার্য্য বড় একটি ধর্ম্ম, অপরদিকে তেমনই আবার সে এক এক জন ব্যক্তিও বটে। তাহার এই ব্যক্তির বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা সে চায়, আপন বলিয়া অনেক কিছু ধরিতে ও পাইতে চায়, এবং ইহাতে অপরের সঙ্গে কখনও

কখনও প্রতিযোগিতার প্রয়োজন যদি কিছু হয়, তাহাতেও তাহার অপ্রতিবাধ্য অধিকার আছে। সুতরাং তাহার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এই সামাজিকতার, ব্যক্তিগত বিশিষ্ট অধিকার ভোগের সঙ্গে সামাজিক সামান্য-ধর্ম্মানুবর্ত্তিতার, একটা সামঞ্জস্য আবশ্যক, এবং এই সামঞ্জস্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সমাজ-ধর্ম্ম যত যেখানে চলিতে পারিবে, সেই সমাজই তত উন্নত, তত বেশী মঙ্গলে স্থিত হইবে। কিন্তু মানবের ব্যক্তিত্বের এই দিকটাকে সোসিয়ালিষ্ট ও এনার্কিষ্টরা—এক কথায় ইয়োরোপীয় কমিউনিষ্টরা—একেবারেই প্রায় অস্বীকার করিয়া কেবল তাহার সামাজিকতার দিকটার উপরেই জোর দিয়াছেন; এবং ব্যক্তিত্বের বিশিষ্ট সব অধিকারকে যত দূর সম্ভব লুপ্ত করিয়া সামাজিক সহযোগিতার ও সমভোগিতার অর্থাৎ কমিউনিজমের অতি কঠোর একটা সর্ব্বগত নিয়মে সমান ভাবে সকলকে তাঁহারা বাধ্য করিয়া রাখিতে চান। কেহ বলিতে পারেন, এই বাধ্যতা কেবল সম্পদসম্বন্ধীয় সকল ব্যাপারে মাত্র,—ইহার বাহিরে কর্ম্মের ও ভোগের আর যত কিছু অবসর আছে, সর্ব্বত্রই মানব নিজের ইচ্ছা মত চলিতে পারে, কোনও বাধা তাহাতে নাই। কিন্তু স্বকীয় শ্রমলব্ধ ধন আপন বলিয়া দাবী করিতে পারা, প্রিয়জনের সঙ্গে ইচ্ছামত তাহা ভোগ করিতে পারা, ইচ্ছামত কাহাকেও তাহা দান করিতে পারা, তাহার উপরে নিজের বংশগৌরব প্রতিষ্ঠা করিতে পারা, নিজের সাংসারিক কাজকর্ম্মের উপরে একটা কর্ত্তৃত্ব অনুভব করিতে পারা, এ সব যে মানবজীবনের কত বড় বড় অধিকার, এবং এই সব অধিকারে বঞ্চিত থাকিয়া সোসিয়ালিষ্ট সহযোগিতার ও সমভোগিতার নিয়মে বাধ্য হইয়া চলিতে হইলে, আরও কতদিকে যে মানবত্ব ক্ষুণ্ন হইয়া পড়ে, জীবনের সুখ ও চরিতার্থতার কত পথ যে রুদ্ধ হইয়া যায়, সহজেই সকলে আমরা তাহা বুঝিতে পারি, এবং ইহার আলোচনাও পূর্ব্বে অনেক করা হইয়াছে। তারপর এইরূপ একটা সহযোগিতার ও সমভোগিতার নিয়মে সকলকে বাধ্য করিয়া রাখিলে

সামাজিক সব কর্ম্ম নির্ব্বাহ করাও যে কিরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠে, তাহাও পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি। র‍্যাসনালিষ্টরা একদিকে ব্যক্তিত্বকেই যেমন অতি বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন, ইঁহারা আবার তাহার প্রতিক্রিয়ায় সামাজিকতাকে অতি বড় করিয়া তুলিয়াছেন। তাহারাও যেমন ব্যক্তিত্ব ও সামাজিকতার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য কোথায় কি ভাবে হইতে পারে, তাহা দেখেন নাই, ইঁহারাও তেমন দেখিতেছেন না। তাঁহারা যেমন একদিকে বড় একটা ভুল করিয়া সমাজকে দারুণ একটা দুঃখের অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছেন,—ইঁহারাও অপরদিকে তেমনই বড় একটা ভুল পথে চলিতেছেন, এবং এই ভুল পথে যদি সমাজকে টানিয়া নিতে পারেন, তাহাও অতি দুঃখের বই সুখের কোনও অবস্থা সৃষ্টি করিবে না। সম্পদ অর্জ্জনে ও সম্পদভোগে ব্যক্তিগত অধিকার পাইলে মানুষ যে কেবল নিজের স্বার্থের কথাই ভাবিবে, অপরের সঙ্গে কেবল প্রতিযোগিতা করিয়াই চলিবে,—অপর সকলের সুখ দুঃখের জন্য কোনও দরদ তার থাকিবে না, কেবল নিজের সুখই চাহিবে,—আর দশজনকে তাহার দেয় যাহা আছে তাহা না দিয়া নিজে কত নিতে পারে অবিরত কেবল সেই চেষ্টাই করিবে,—live and let live জীবনে এই নীতির অনুসরণ না করিয়া, fair field and no favour এই নীতি ধরিয়াই সর্ব্ববিষয়ে চলিবে,—মানবের স্বভাব সম্বন্ধে এইরূপ একটা ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই ইঁহারা এই অধিকারকে একেবারে লোপ করিতে চান। এই প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও র‍্যাসনালিষ্ট মতের প্রভাব যে ইঁহাদের চিন্তার উপরে কত বেশী রহিয়াছে, ইহা হইতে তাহা বুঝা যায়। (কেবল ইহাই নয়, নাস্তিকতায়, সম্পদাধিকারে এই বাধা মানিয়া অন্য সকল বিষয়ে যে স্বেচ্ছাচারের পোষকতা ইঁহারা করেন, তাহাতেও র‍্যাসনালিষ্ট মতের প্রভাবই ইহাদের মধ্যে দেখা যায়।)

এই প্রভাব হইতে যদি মুক্ত ইঁহারা হইতে পারিতেন, বর্ত্তমান

সমাজব্যাধির প্রতিকারের উপায় তাঁহারা হয়ত অন্য পথে খুঁজিতেন। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে সমাজের খাতিরে এমন করিয়া চাপিয়া, একেবারে লুপ্ত না হউক, এত বেশী খর্ব্ব করিয়া ফেলিতে চাহিতেন না।

ব্যক্তিত্ব ও সামাজিকতার মধ্যে যে সামঞ্জস্যের স্থাপনা সকলের মঙ্গলের পক্ষে একান্ত আবশ্যক, ইয়োরোপের বাহিরে অন্য বহু দেশে বহু সমাজে প্রাচীনকাল হইতেই সেই সামঞ্জস্য অল্প বিস্তর রক্ষিত হইয়া চলিতেছে, এবং ইয়োরোপে যে সব সামাজিক সঙ্কট দেখা দিয়াছে, এরূপ কোনও বড় সঙ্কটও সে সব সমাজে দেখা দেয় নাই। আজ কাল যে কিছু কিছু দেখা দিতেছে, তাহার কারণ ইয়োরোপীয় র‍্যাসনালিষ্ট ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল নীতির প্রভাব কিছু কিছু গিয়া এই সব সমাজের উপরে পড়িয়াছে। সাধারণতঃ এই সামঞ্জস্যের মধ্যেও প্রাচীন কোনও কোনও সমাজে কোথাও কোথাও কমিউনিষ্ট নীতির প্রাধান্যও যে না দেখা গিয়াছে, তা নয়। স্থান বিশেষে ও অবস্থা-বিশেষে, দুর্ব্বল ও দরিদ্রের মঙ্গলের জন্য যেখানে এইরূপ নীতির আবশ্যকতা যতটা হইয়াছে, আপনিই দেখা দিয়াছে,—যতটা চলিতে পারে, আচারধর্ম্মের নিয়মে আপনিই চলিয়াছে। আমাদের দেশের পারিবারিক জীবনে যে একরূপ কমিউনিজম ছিল, কি সীমার মধ্যে কিরূপ ভাবে তাহা চলিত, পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি; তাহা ছাড়া, এই ভারতেই প্রাচীন যে সব গ্রাম্য সমাজ ছিল, অনেক স্থলেই জমি কেহ নিজের বলিয়া দাবী করিয়া নিজের অধিকারে রাখিতে পারিত না; এখনকার মত মালিকানা স্বত্বে জমির খরিদবিক্রয়ও চলিত না। চাষের ও পশুচারণের ভূমি সাধারণতঃ এক এক গোষ্ঠীর বা গ্রামবাসী সকলের সমবেত অধিকারে থাকিত; প্রয়োজন মত যে যাহা পারিত, চাষবাস করিত, পশুচারণ ক্ষেত্রে সকলেরই গৃহপালিত পশু সমানভাবে চরিত। চাষের জমি পৃথক্ ভাবে বিলিব্যবস্থার প্রয়োজন হইলে, মধ্যে মধ্যে গ্রামবাসী গৃহস্থেরা সকলে সমবেত হইয়া তাহা করিয়া নিত। কোথাও কোথাও জমির উপরে চাষী

গৃহস্থের একটা অধিকার স্বীকৃত হইত, যতদিন সে বা তাহার বংশধরেরা জমিতে থাকিয়া জমির চাষবাস করিবে। কিন্তু সেই জমি যে কোনও মূল্যে ইচ্ছামত যাহাকে খুসী বিক্রয় করিয়া সে ছাড়িয়া যাইতে পারিত না। সে ছাড়িয়া দিতে চাহিলে, সেই জমি তখন কি ভাবে কার হাতে যাইবে, এবং সেই বা কত মূল্য তার বাবদ পাইবে, এ সব কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে অন্যান্য গৃহস্থদের সম্মতিক্রমে স্থির হইত। জমি সম্বন্ধে ইহাও একরূপ সোসিয়ালিজম্ বা কমিউনিজম্; এবং এইরূপ সোসিয়ালিজম্ অবস্থা বিশেষে এইরূপ একটা সীমার মধ্যে চলিতে পারে এবং লোকের বহু উপকারও তাহাতে হয়।

আবার জমি সব গৃহস্থদের পৃথক্ পৃথক্ অধিকারে আছে—এই অবস্থায় এখনও এদেশে বহু অঞ্চলে দেখা যায়,গৃহস্থেরা সকলেই সকলের জমিতে একটা পালা মত কাজ করে; নহিলে একা কেহ পারিয়া ওঠে না, ফসলের অনেক ক্ষতি হইয়া যায়। তা ছাড়া, শিল্পব্যবসায়ী যে সব গোষ্ঠী বা জাতি আছে, তাহাদের মধ্যেও বহুকর্ম্মে পরস্পরের মধ্যে একটা সহযোগিতা দেখা যায়। সকলেই আবার নিজ নিজ ব্যবসায়ের কর্ত্তা, এবং যে প্রতিযোগিতা এই কর্ত্তৃত্বের স্বার্থে মধ্যে মধ্যে তাহারা করে, তাহা কাহারও পক্ষে অতি ক্ষতিজনক কখনও হয় না। *সমব্যবসায়ী অন্য সকলকে মারিয়া নিজেই একেশ্বর হইব,* এমন একটা ভাবই ইহাদের মধ্যে নাই। এরূপ গোষ্ঠিগত বা সম্প্রদায়গত গার্হস্থ্য ধরণের ব্যবসায়ে তাহা হয় না। সমজাতীয় বা সমসামাজিক—সহজ কথায় জাত-ভাই বলিয়া গৃহস্থদের মধ্যে এমন একটা মমতার যোগ থাকে, যে কেহ কাহাকে দারুণ দুঃখে ফেলিয়া সুখে থাকিতে পারে না। *

এ সব ঠিক সোসিয়ালিজম্ না হইলেও স্বাভাবিক অতি ঘনিষ্ঠ একটা এসোসিয়েসন (association) বা সহযোগিতা বটে। মানব-স্বভাবের সহজ ধর্ম্মে, স্বাভাবিক মমতার ও বান্ধবতার টানে, এই সব

* ৩৬৮—৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সহযোগিতা গড়িয়া উঠিয়াছে; লোকপরম্পরাগত আচারনিয়মে স্থিত আছে, পরিচালিত হইতেছে। এই সব আচারনিয়মই ধর্ম্মের একটি অঙ্গ, এবং ধর্ম্মবুদ্ধিতেই এই সব আচারনিয়ম ইহারা পালন করিয়া চলে। ঠিক সোসিয়ালিজম্ না হইলেও, সোসিয়ালিজমের উদ্দেশ্য ইহাতেও যথেষ্ট সিদ্ধ হইতেছে।

এই সব গ্রাম্য সমাজ (village community) এবং বৃহত্তর বহু সম্প্রদায় বা tribeও রাষ্ট্রীয় আইনকানুন এবং সেই আইন কানুনের অনুযায়ী রাজশাসনের উপরে অতি কমই নির্ভর করিত। সমাজ-রক্ষার এবং সামাজিক কাজকর্ম্মের ব্যবস্থা নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজন মত করিয়া নিত। রাজারাও কেন্দ্রায়ত্ত কোনও শাসন-চক্রের অত্যধিক প্রভুত্ব ইহাদের উপরে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেন না। ইহারা রাজদ্বারে যাইত, যখন নিজেদের চেষ্টায় আত্মরক্ষা কি শান্তিরক্ষা একেবারে অসাধ্য হইত; আর রাজারাও ইহাদের জীবন-যাত্রার উপরে হস্তক্ষেপ করিতেন, যখন বড় কোনও অন্যায় কি অনাচারে বহুলোকের দুঃখ ঘটিত, দেশের বা সমাজের মোট শান্তির শৃঙ্খলা ব্যাহত হইবার উপক্রম হইত। জনসাধারণের স্বায়ত্ত ও স্বচ্ছন্দ যে জীবনযাত্রা এনার্কিষ্টরা প্রধানতঃ কামনা করেন, ষ্টেটকে একেবারে লোপ না করিয়া তার শাসনপ্রভুত্বের ক্ষেত্রকে যে minimum বা চরম সঙ্কোচের সীমার মধ্যে আনিলেও যাহা সম্ভব হইতে পারে, এই ভাবে প্রাচীন ভারতীয় সমাজে এবং আরও বহু সমাজে তাহা সম্ভব হইয়াছিল।

কিন্তু আধুনিক ইয়োরোপায় সোসিয়ালিষ্ট ও এনার্কিষ্টরা এই সব অবস্থার কথা তেমন কিছু জানেন, জানিলেও ইহার মধ্যে সমাজ-সমস্যার সমাধানের মাঙ্গলিক কোনও সূত্র আছে কিনা তাহা আদবেই ভাবিয়াছেন, এরূপ মনে হয় না। সম্ভবতঃ তাঁহারা মনে করেন, ইয়োরোপ যে পথে যে ভাবে যে দিকে অগ্রসর হইয়াছে ও হইতেছে, ভবিষ্যৎ সমাজের নীতি তাহার মধ্যে রহিয়াছে, তাহারই মধ্যে খুঁজিয়া বাহির

করিতে হইবে, অথবা আপনা হইতেই তাহার মধ্যে প্রকাশিত হইতেছে। এই নীতি, তাঁহারা মনে করেন, সার্ব্বভৌমিক একটা কমিউনিজমের নীতি এবং তাহারই বন্ধনে, যে ভাবেই হউক, সমাজকে যত শাত্র সম্ভব বাঁধিয়া ফেলিতে হইবে।

এখন, যে কমিউনিষ্ট নীতির বন্ধনে সমাজকে একটা নূতন আদর্শে তাঁহারা গড়িয়া নিতে চান, সেই নীতির আশ্রয় হইবে কি? সোসিয়ালিষ্টরা বলেন, সকলের সমবেত শক্তির আধার ষ্টেট্; আর এনার্কিষ্টরা বলেন, সকল বন্ধনমুক্ত জনগণের সহজ সুবুদ্ধি। মানবের সমষ্টিজীবন ষ্টেট্রূপেই অভিব্যক্ত হইয়া উঠে, ষ্টেটের শক্তিকেই আশ্রয় করিয়া পরিচালিত হয়,—সকলের সমান স্বার্থ রক্ষা করিবার প্রয়োজনে উপরে যে একটা প্রভুশক্তি কিছু চাই, সেই শক্তি ষ্টেট্ ভিন্ন আর কিছু হইতেই পারে না, প্রাচীনকাল হইতেই পাশ্চাত্য চিন্তা যে প্রধানতঃ এই মতের অনুবর্ত্তন করিয়াছে, পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি। সুতরাং সোসিয়ালিষ্টরা যে গণতান্ত্রিক ষ্টেট্‌কেই তাঁহাদের কমিউনিষ্ট সমাজের একমাত্র ধারক ও রক্ষক বলিয়া গণ্য করিবেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নয়। কিন্তু ষ্টেটের প্রভুত্ব অধুনা যে সব ক্ষেত্রে বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাই কত কুফল প্রসব করিতেছে, ইহার উপর সামাজিক কমিউনিজম্ পর্য্যন্ত যদি ষ্টেটের আয়ত্ত হয়, তবে তাহা যে মানবত্বকে একেবারেই পঙ্গু করিয়া ফেলিবে, সকলের পক্ষেই কত যে দুঃখের ও দুর্গতির কারণ হইবে, বহু যুক্তির ও দৃষ্টান্তের প্রমাণে ইহা প্রতিপন্ন করিয়া এনার্কিষ্টরা আবার বলিতেছেন, কমিউনিজম্ চাই বটে, কিন্তু ষ্টেটের কোনও অধিকার তাহার উপরে থাকিবে না। ষ্টেট্‌রূপ একটা বাধ্যতামূলক শক্তিরই আবশ্যকতা কিছু মানবজীবনে নাই।

কিন্তু ষ্টেট্ ছাড়া উচ্চতর আর কিছু যে মানব সমাজের ধারক ও রক্ষক হইতে পারে, এ কথা তাঁহারা মানেন না। সুতরাং মুক্ত বা free মানবের সহজ সুবুদ্ধি ব্যতীত আর কিছুরেই

তাঁহারা কমিউনিষ্ট সমাজের আশ্রয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না।

কিন্তু সকলরূপ নিয়মের বাধ্যতা হইতে মুক্ত হইয়া কেবল আপন আপন বুদ্ধির নির্দ্দেশে ও ভাবের বশে ইচ্ছামত সকলে চলিতে পারিলেই কি সার্ব্বভৌমিক এই কমিউনিজমের অবস্থা সমাজে সম্ভব হইবে? যার যেমন শক্তি আছে, সকলেই সেই অনুসারে কাজ করিবে,—কাজে সকলে সকলের সহায় হইয়া চলিবে, আর কাজের ফল কিছু আমার বলিয়া কেহ দাবী করিবে না, সকলেই সমান ভাবে তাহা ভোগ করিবে,—সংক্ষেপে ইহাই কমিউনিজমের মূল কথা। শক্তিমানের পক্ষে কত বড় ত্যাগের প্রয়োজন যে ইহাতে হয়, তাহা না বলিলেও চলে। আইনের বল এই ত্যাগে লোককে বাধ্য করিতে পারে না। সাধারণ মানব-স্বভাব এখনও এরূপ উন্নত স্তরে আরোহণ করে নাই যে সহজ ভাবেই শক্তিমান্ সকলে এত বড় স্বার্থ ত্যাগ করিয়া চলিবে। প্রমত্ত জনগণের একটা বিপ্লব বর্ত্তমান সব ধনীকে তাঁহাদের অধিকৃত সম্পদ হইতে বঞ্চিত করিতে পারে, রাষ্ট্রপদ্ধতিকেও বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিতে পারে,কিন্তু আবার যে নূতন এক দল শক্তিমান্ মানবের হাতে সম্পদ গিয়া জমিবে না এবং তাহাদের কর্ত্তৃত্বে নূতন একটা রাষ্ট্র-পদ্ধতিও গড়িয়া উঠিবে না, এমন কথা অতি বিশ্বাসী এনার্কিষ্টও কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন না। কারণ মানুষ ত সব সেই সব মানুষই আছে; তেমন জোর থাকিলে বিপ্লবে সামাজিক শক্তির সংস্থানকে বদলাইয়া ফেলা যতই সম্ভব হউক, মানুষের স্বভাবকে এমন করিয়া বদলাইয়া ফেলা যায় না, যে আজ যে আপনটাই এত বড় করিয়া দেখিতেছে, কালই সে আপন বলিয়া যাহা কিছু পাইতে পারে, পরের জন্য ত্যাগ করিবে, আপন ভুলিয়া কেবল পরের জন্যই খাটিবে। এই ত্যাগের প্রেরণা মানবস্বভাবের অতি উন্নত প্রেরণা। এই প্রেরণা যেখানে আছে, পরের জন্যই সর্ব্বস্ব লোকে ত্যাগ করে, পরের জন্যই খাটিয়া মরে। কিন্তু এই প্রেরণা কয় জনের মধ্যে দেখা

যায়? উন্নত শক্তি যাহার যাহার কিছু আছে, সেই এইরূপ ত্যাগী হইবে, এত বড় ভরসা কে করিতে পারে? অতি ঘনিষ্ঠ স্বজনের জন্য এই ত্যাগের ভাব যেখানে যতটুকু আছে, অথবা পরম্পরাগত কৌলিক বা সম্প্রদায়িক আচার নিয়ম এই ত্যাগকে যেখানে যতটুকু লোকচরিত্রের সাধারণ অভ্যাসে পরিণত করিতে পারে, সেইখানে ততটুকুই মাত্র কমিউনিষ্ট রীতি সম্ভব হয়। সমগ্র সমাজ এইরূপ উচ্চতর ত্যাগের মহিমায় কমিউনিষ্ট হইয়া উঠিতে পারে না।

যাহা হউক, বাধ্যতামূলক সার্ব্বভৌমিক কমিউনিজম প্রভৃতি নীতি সম্বন্ধে যতই আপত্তির কারণ থাক, মোটের উপর মানবের সামাজিক জীবনযাত্রার রীতিসম্বন্ধে যে আদর্শের কল্পনা এনার্কিষ্টরা করিয়াছেন, সম্পূর্ণ না হউক, যতদূর সম্ভব সেইরূপ আদর্শের দিকেই অগ্রসর হইতে পারিলে, ষ্টেটের প্রভুত্বের চাপ ও আইনের শাসন হইতে যত বেশী সম্ভব মুক্ত থাকিয়া নিজেদের সব কাজকর্ম্ম স্বচ্ছন্দভাবে নিজেরা বুঝিয়া করিবার অবসর পাইলে, মানবজীবনের সুখশান্তি যে অনেক বৃদ্ধি পায়, মঙ্গল যে অনেক বেশী পাকা ভিত্তিতে দাঁড়ায়, একথা কেহই বড় অস্বীকার করিতে পারেন না। ব্যক্তিগত বা পরিবারগত পৃথক্ সম্পত্তির অধিকার থাকিলেই তাহা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ক্যাপিট্যালিজম (industrial capitalism) বা ধনিক প্রভুত্বের সৃষ্টি করিবে,—আর রাজশাসন থাকিলেই তাহা কেবল এই এই ধনিক প্রভুত্বের বশীভূত হইবে ও দরিদ্র জনসাধারণকে তার স্বার্থে কেবল চাপিয়া রাখিবে, দুঃখ দিবে—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যদি তাঁহারা সার্ব্বভৌমিক একটা কমিউনিজমের নিয়মে সকলকে টানিয়া আনিতে, এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজশাসনকে একেবারে লোপ করিয়া ফেলিতে না চাহিতেন, তবে বলিতে হইবে আধুনিক জগতে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত একটা সমাজজীবনের কল্পনা তাঁহারাই করিয়াছেন। 'এনার্কিষ্ট কমিউনিজম্' এই নামটায় যেটুকু বুঝায় তাহা বাদ দিতে পারিলে, মোটের উপর আর যাহা থাকে, তাহা বাস্তবিকই সকলে আদরে ও শ্রদ্ধায় গ্রহণ

করিতে পারেন। কিন্তু এই যাহা থাকে, এই যাহা লইয়া আদর্শ একটা সমাজজীবন হইতে পারে, তাহারও ত একটা নীতিপদ্ধতি চাই। লোকের নিরপেক্ষ সহজবুদ্ধি ও মুক্ত ইচ্ছাই মাত্র সেই পদ্ধতির ভিত্তি হইতে পারে না। পারে, সকলের ব্যক্তিগত বুদ্ধির ও ইচ্ছার উপরে এমন একটা কিছু, যাহা সেই বুদ্ধিকে সত্যের পথ, মঙ্গলের পথ, দেখাইবে, ইচ্ছাকে তাহার অনুবর্ত্তী করিয়া তুলিবে। এই কিছুই মোহান্ধ ও মায়াপাশবদ্ধ জীবের উপরে মোহাতীত ও নিত্যমুক্ত শিবের বুদ্ধি, রিপুজিত প্রবৃত্তিমার্গী জীবের ইচ্ছার উপরে রিপুঞ্জয় শিবের নিবৃত্তির পথপ্রদর্শক ইচ্ছা। এই বুদ্ধি, এই ইচ্ছাই, লোকস্থিতির মঙ্গলময় ধারক ধর্ম্মরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। ঋষিরা তাহার তত্ত্ব দর্শন করিয়াছেন যুগে যুগে জ্ঞানী আচার্য্যগণ লোকসমাজে তাহার ব্যাখ্যা ও প্রচার করিয়াছেন। পরম্পরাগত আচার বা লোকব্যবহার তাহাই সদাচার বা সদ্ব্যবহার যাহা মূলতঃ এই ধর্ম্মেরই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে,—আর রাষ্ট্রশাসন তাহাই সুশাসন, যাহা এই নীতির বিরোধী যাহা কিছু হইতে পারে, দণ্ডপ্রয়োগে তাহাকে দমন করিয়া ইহারই পথে চলিতে সমাজকে সহায়তা করিয়াছে।

কিন্তু পাশ্চাত্য র‍্যাসনালিষ্টরা ধর্ম্ম বলিয়া এইরূপ একটা কিছু আছে, এবং মানবের বুদ্ধির উপরে তাহার এইরূপ কোনও অধিকার থাকিতে পারে, এই কথাই স্বীকার করিতে চান না। ধর্ম্ম এমন ভাবেই চার্চ্চের দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে, ধর্ম্মানুগত্য যে মানবস্বভাবেরই বড় একটি গুণ, তার ব্যক্তিত্বের মহিমাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া বরং পূর্ণতাই দান করে, ইহা বুঝিবার অবসর তাঁহাদের ঘটে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সোসিয়ালিষ্ট ও এনার্কিষ্টদের চিন্তার ধারা এ সম্বন্ধে র‍্যাসনালিষ্টদের চিন্তার ধারা ধরিয়াই চলিয়াছে।

সোসিয়ালিষ্টরা তবু বহু বিষয়ে ষ্টেটের একটা বন্ধন মানিতে চান, কিন্তু এনার্কিষ্টরা তাহাও চান না। সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ বন্ধন-মুক্তি—র‍্যাসনালিজমের পরমার্থই যাহা—তাহা এনার্কিষ্ট মতে বড

বেশী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, এত বেশী আর কোনও মতে করে নাই। অন্য দিকে আবার ইহাও বলা যাইতে পারে, সাধারণ র‍্যাসনালিষ্টরা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ষ্টেটের একটা 'শাসন-কর্তৃত্ব মানিতে যতই প্রস্তুত হউন, ধর্ম্মনীতির ক্ষেত্রে তাঁহারা একেবারেই এনার্কিষ্ট; 'ধর্ম্মরাজের' কোনও নিয়ম, কোনও আইনই মানিতে চান না।

'ধর্ম্মরাজের' অধিকারে এই এনার্কিষ্ট মতের প্রভাব কি ফল প্রসব করিয়াছে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভাবে ইয়োরোপায় জীবনকে কোন্ পথে কোন্ দিকে লইয়া যাইতেছে, তাহাই বর্ত্তমান এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়, যদিও প্রসঙ্গক্রমে অন্য দিকে অনেক দূর গিয়া পড়িয়াছি। যাহাহউক, এনার্কিষ্ট মতের মধ্যে অতি উচ্চ সত্য ও মঙ্গলের নির্দ্দেশ যাহা আছে, ধর্ম্মকে অস্বীকার করিয়া লোকসমাজে তাহার প্রতিষ্ঠা সম্ভব কিনা, তাহাও এই আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারিব।

মানুষের ব্যক্তিত্বের মহিমাকে যতই বড় করিয়া ধরা হউক্, কেবল নিজের ব্যক্তিত্ব লইয়া একা কেহ এ পৃথিবীতে বাস করে না। সে সামাজিক জীব এবং যে সমাজের মধ্যে সে জন্মিয়াছে এবং যার আশ্রয়ে সে জীবনযাপন করিতেছে, বহু মঙ্গলের ভাগী যাহা হইতে হইতেছে, সেই সমাজের প্রতিও বহু কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব তার আছে। এই সব কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব কি এবং তার জন্য কখন কি করিতে হইবে, কিসেই বা কখন কি ভাবে বিরত থাকিতে হইবে, তার সম্বন্ধে বহু বিধিনিষেধও সর্ব্বত্র দেখা যায়। যাহারা স্বেচ্ছায় এ সব মানিয়া চলিবে না, অথবা এসবের বিরুদ্ধতা করিয়া চলিবে, তাহাদের এই সব বিধিনিষেধের বশবর্ত্তী করিয়া রাখিবার একটা অধিকারও সমাজশক্তির না থাকিলে চলে না। এই সব বিধিনিষেধ কিসের বা কাহার কর্ত্তৃত্বে স্থির হইবে, সমাজশক্তির নিয়ন্তৃত্ব কে করিবে, কি ভাবে চলিবে, ব্যষ্টিজীবনের উপরে ন্যায়তঃ কত দূর তাহার

অধিকার যাইতে পারে, এ সব সম্বন্ধে মতভেদ যাহাই থাকুক, মোটের উপর সমাজশক্তি যে একটা আছে এবং ব্যষ্টিজীবনের উপরে এইরূপ অধিকারও যে তাহার আছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এনার্কিষ্টরা যে কোনও রূপ প্রভুশক্তিকে বা দণ্ডনীতিকে মানিতে চান না, তবু লোকমতের প্রভাব এবং বর্জ্জনরূপ একটা দণ্ডেরও প্রয়োজন স্বীকার করেন। মানবের ব্যষ্টিজীবন ও সমষ্টি-জীবনের স্বরূপ কি, পরস্পর সম্বন্ধ কি, কি ভাবে কিরূপ নিয়মে এই সম্বন্ধের ধর্ম্ম মানিয়া লোককে চলিতে হয়, এসব বিষয়ে বহু আলোচনা পূর্ব্বে (১ম, ৪র্থ ও ৫ম প্রবন্ধে) করা হইয়াছে। এবং এই সব প্রবন্ধে মোটের উপর ইহাই দেখান হইয়াছে, যে মানবের ব্যষ্টিজীবন বৃহত্তর সমষ্টি জীবনের অধীন এবং ব্যষ্টির ধর্ম্মবুদ্ধি সমষ্টির বা সমষ্টিধর্ম্মের এই অধীনতাকে অস্বীকার করে না, এবং ইহাতে তাহার ব্যক্তির মহিমা কিছু ক্ষুণ্ণ হয় বলিয়াও অনুভব করে না; বরং উভয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের সত্যই দেখিতে পায়।

তবে র‍্যাসনালিষ্টরা ব্যষ্টিজীবনকে এবং ব্যক্তিত্বের অধিকারকেই বড় বলিয়া ধরিয়া নিয়া তাহারই উপরে তাঁহাদের নীতিপদ্ধতিকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। এসম্বন্ধে তাই তাঁহাদের প্রথম কথা, সকলের বড় কথাই এই যে, প্রত্যেক মানবই সর্ব্বথা তাহার নিজের ইচ্ছামত চলিতে পারে, যতক্ষণ না অপরের সমান এই অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে। (Every man has the perfect liberty to act as he pleases, so long as he does not interfere with the equal liberty of others.) অন্যের সমান অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিলে তাহাকে বাধা দিতে হইবে, তাই সকলের সম্মত বা সকলের মতে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত একটা শাসন-শক্তি সকলের উপরে থাকা আবশ্যক। ইহাই social authority, এবং democratic state অথবা civic corporation ব্যতীত এইরূপ social authority বা সামাজিক শাসন-শক্তি আর কিছুই তাঁহাদের মতে হইতে পারে না।

কিন্তু ক্রমে ইহাও তাঁহারা স্বীকার করেন, কেবল এই টুকুতেই চলে না। সকলের সমান স্বার্থমূলক আরও বহু ব্যাপার আছে, যাহাও এই সমাজ-শক্তির হাতে থাকা আবশ্যক। আবার এই শক্তির অস্তিত্বও রক্ষা করিতে হইবে, এবং শক্তি যাহাতে তাহার কর্ম্মের ভাগ সুচারু রূপে সম্পাদন করিতে পরে, তাহারও যথাযথ ব্যবস্থা চাই।

এই সব প্রয়োজনে বহু বিধিনিষেধ এই শক্তিস্থাপনা হইতে মানবের ব্যক্তিগত জীবনের উপরে আসিবে এবং ইচ্ছায় হউক কি কি অনিচ্ছায় হউক সকলকেই এ সব বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হইবে। তবে ইহা অবশ্য দেখিতে হইবে, ব্যষ্টিজীবনের স্বাধীনতার উপরে অযথা কোনও অন্যায় প্রভুত্ব সমাজশক্তি না করে। ব্যষ্টিভাবে কার ভাল মন্দ কিসে হইবে, প্রত্যেক ব্যষ্টিই নিজে তাহা বুঝিয়া স্থির করিয়া নিবে, অপর কাহারও অথবা মোট সমাজের যদি কোনও স্বার্থহানি তাহাতে না হয়, তবে ব্যষ্টির ভাল কি মন্দ হইবে, এ সব বিবেচনায় ব্যষ্টির কোনও কার্য্যের উপরে সমাজশক্তির কোনও কোনও কর্ত্তৃত্ব থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। এই সব বিষয়ে ব্যষ্টির স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কেবল সামাজিক স্বার্থ লইয়া যে সব কার্য্য, তাহারই উপরে যদি সামাজশক্তির কর্ত্তৃত্বের সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকে, তবে ততটুকু মাত্র সমাজশক্তির অধীনতা মানিয়া চলিতে ব্যষ্টির পক্ষে আপত্তির কোনও কারণ হইতে পারে না। তাই ব্যষ্টি অধিকার ও সমষ্টির প্রভুত্বের মধ্যে ন্যায্য একটা সীমা রেখা কি হইতে পারে, তার সম্বন্ধে জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন—To individuality should belong the part of life in which it is chiefly the individual that is interested and to Society the part which chiefly interests Society,

কিন্তু সমাজের স্বার্থ ও ব্যষ্টির স্বার্থ উভয়কে পৃথক্ করিয়া একটা সীমা রেখা কোথায় টানা যায়? তবে ইঁহাদের কথা হইতে এইটুকু বোঝা যায় যে civic ও political duties ও responsibilities,

অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ও নাগরিক ভাবে যে সব কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব প্রত্যেককে পালন করিতে হইবে, নহিলে state বা civic corporation চলে না, সেই সব বিষয়ে মানব সমাজশক্তিকে মনিয়া চলিবে. ব্যক্তিত্বকে যতটা প্রয়োজন তার বিধিনিষেধের অধীন করিয়া রাখিবে। আর তার নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে এমন যাহা কিছু কাজকর্ম্ম ও চারিত্র ব্যবহারাদি, সে সব সম্বন্ধে সে ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে চলিবে, নিজের বুদ্ধির বিচারে যাহা তার ভাল মনে হয় করিবে। সমাজশক্তির কোনও কর্তৃত্বের অধিকার এ সব বিষয়ে কাহারও ব্যক্তির উপরে থাকিবে না। * অবশ্য ইহাও আমাদিকে স্বীকার করিতেই হইবে, যে ডিমক্রাটিক ষ্টেট্ ও ডিমক্রাটিক সিভিক কর্পোরেশন (civic corporation) ব্যতীত সমাজশক্তির আর কোনও রূপ আধার বা ধারক যদি নাই থাকে, তবে ব্যক্তিগত জীবনের কাজকর্ম্ম ও চারিত্রব্যবহারাদিকে ইহার প্রভাব হইতে এইভাবে মুক্ত রাখাও আবশ্যক।

কিন্তু এই সীমার মধ্যে সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাই মাত্র পালন করিতে বাধ্য থাকিয়া, আর কোনও নীতির ধর্ম্ম না মানিয়া ব্যক্তিগত জীবনে সর্ব্বদা সকলে নিজের ইচ্ছামত চলিলে, বহু ব্যষ্টির পক্ষে এবং মোট সমাজের পক্ষে তাহা ভাল হইবে কি না? ভাল যে পুরাপুরি হইবে না, হইতে পারে না, র‍্যাসনালিষ্টরাও তাহা অস্বীকার করেন না। তবে তাঁহারা বলেন, এসব ব্যাপারে সমাজের কর্তৃত্ব থাকিলে ব্যষ্টির ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ট অনেক বেশী হইবে। ব্যষ্টির স্বাধীনতারূপ যে সনাতন অধিকার, তাহার উপরে অনেক অন্যায় বাধা আসিয়া পড়িবে; ব্যক্তিত্বের শক্তি ও প্রতিভা পূর্ণভাবে বিকাশলাভ করিতে পারিবে না, তার মহিমা ক্ষুণ্ণ হইবে। ব্যষ্টি মানব এই স্বাধীনতার অপব্যবহারে স্বেচ্ছাচারী হইয়া অসঙ্গত আচরণ কিছু করিলে ক্ষতি হইবে তাহার নিজের। সমাজের যেটুকু

---

* ২৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ক্ষতি বা অসুবিধা হয় তাহা সামান্য, সমাজ তাহা সহিয়া নিতে পারে। কিন্তু সমাজের হাতে ইহার কর্ত্তৃত্ব থাকিলে ব্যষ্টির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে যে ক্ষতি হইবে, তাহা অনেক বড়। সুতরাং ব্যষ্টি জীবনের স্বাধীনতার যে মর্য্যাদা, স্বাধীনতায় যে সব উচ্চতর সব মঙ্গলের সম্ভাবনা রহিয়াছে, তার খাতিরে এটুকু ক্ষতি সমাজকে স্বীকার করিয়া নিতেই হইবে। *

সমাজশাসন হইতে মুক্ত ব্যক্তিগত এই স্বাধীনতার অধিকার বলিতে মোটামুটি কি বুঝায় কিছু পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ইহার একদিকের বড় একটি কথা হইতেছে, বৈষয়িক যাবতীয় কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে সামাজিক কোনও প্রথা কি নিয়ম কানুনের বশ্যতা স্বীকার না করিয়া সকলেই নিজের ইচ্ছামত চলিবে। সকলেই সকল কর্ম্মে সকলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া অবশ্য চলিতে পারে, কিন্তু বলে কোনও অবৈধ বাধা কেহ কাহারও পথে উপস্থিত করিতে পারিবে না। *করিলে তাহাই মাত্র* সমাজশক্তি দমন করিতে পারে, আর কিছুতে কোনওরূপ নিয়মের বাধ্যতায় কাহাকেও আনিতে পারে না। আর একদিকের আরও বড় কথা হইতেছে এই যে ধর্ম্মনীতি বলিতে সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝি, যাহার বড় একটা প্রভাব সর্ব্বত্রই লোকসমাজের উপরে আছে, সাধারণতঃ সর্ব্বত্রই লোকে যাহা মানিয়া চলে, চলাটা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে, এবং কেহ না করিলে সে সর্ব্বদাই নিন্দিত, কখনও বর্জ্জিত এবং কখনও বা রাজদণ্ডেও দণ্ডিত হয়, সেই ধর্ম্মনীতির এইরূপ কোনও অধিকার ব্যষ্টিজীবনের উপরে থাকিবে না, রাষ্ট্রীয় কোনও আইনের বাধ্যতাও এই ক্ষেত্রে কাহারও উপরে প্রযুক্ত হইবে না। এইসব বিষয়ে সকলেই যার যাহা ভাল লাগে, যে যাহা ভাল বুঝে, সেই ভাবে চলিবে।

---

* ২৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এখন প্রথমোক্ত যেই দিকে, যে নীতি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষার্দ্ধ পর্য্যন্ত ইয়োরোপে চলিয়াছে, তাহার ফল যে দরিদ্র জনগণের পক্ষে কত দুঃখের সৃষ্টি করিয়া মোট সমাজকেই কিরূপ সঙ্কটের অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। কোনও না কোনও সোসিয়ালিষ্ট পদ্ধতিতে ব্যক্তিত্বের অধিকারকে বহুদিকে বহুপরিমাণে সঙ্কুচিত করিয়া নেওয়া ব্যতীত ইহার প্রতিকারের কোনও পথই কেহ দেখিতে পাইতেছেন না। সুতরাং এই দিকে ব্যক্তিত্বের এই স্বাধীনতার অধিকারে সমাজের ক্ষতি অতি সামান্য, সমাজ তাহা উপেক্ষা করিতে পারে, এ কথা আর বলা যায় না।

এখন দ্বিতীয় এই দিকের কথা। ধর্ম্মনীতির সকল অধিকারকে অস্বীকার করিয়া, কেবল নিজের যাহা ভাল লাগে, নিজে যাহা ভাল বোঝে, সর্ব্বদা সেই ভাবে যদি মানুষ চলে, তবে তাহারই বা ফল কি হইতে পারে, এবং যাহা হয়, অতি লঘু ক্ষতি বলিয়া ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতার খাতিরে সমাজ তাহাই বা উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারে কিনা? কেবল তাই নয়। ধর্ম্মনীতির অনুবর্ত্তিতা, আর তাহাকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করিয়া কেবল নিজের ইচ্ছামত চলা, ইহার কোন্ পথে ব্যষ্টিভাবেই বা মানব অধিকতর মঙ্গলের ভাগী হইবে? ব্যক্তিত্বের যে বিকাশে মানব মাত্রেরই কাম্য, অপ্রতিবাধ্য অধিকারও বটে, পরমাত্মার অভিমুখে জীবাত্মার প্রসার বলিয়াই তত্ত্বদর্শীরা যাহার সংজ্ঞা দিয়াছেন, ধর্ম্মনীতি তাহার পথে বাধা না বড় সহায়? কেবল স্বাধীনতাই ত জীবনের চরম লক্ষ্য নয়, আত্ম-প্রসারে ক্রমে সমগ্র মানবমণ্ডলীর সঙ্গে এবং তারপর সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে আপনার একটা একতা ও মিল (unity ও harmony) স্থাপনায় জীবের যে পরমার্থ লাভ এই চরম লক্ষ্য, ধর্ম্মনীতি যদি সেই দিকেই মানবকে অগ্রসর করিয়া দেয়, আর এই স্বাধীনতা যদি জীবকে তাহার বন্ধনের মধ্যে আরও গুটাইয়া আনে, তবে এই

স্বাধীনতা এমন কি যে তার খাতিরে এত বড় মঙ্গলকে বর্জ্জন করিয়া, এই অমঙ্গলকে বরণ করিয়া নিতেই হইবে? তারপর সকলের বড় কথা হইতেছে এই যে,—

"সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্ত স্বভাববান্"

বলিয়া সত্যাশ্রয়ী জীব যে আত্মমহিমা অনুভব করে, যে মহিমার প্রভাবে বাস্তবিকই সে নিজের বুদ্ধিতে ভাল না বুঝিলে, অথবা চিত্তে ভাল বলিয়া অনুভব করিলে, কেবল বাধ্য হইয়া বা গতানুগতিক ভাবে, ভাল কোনও পথে চলিতে পারে না, প্রকৃত 'র‍্যাসনাল' বা প্রজ্ঞাবান্ মানবের এই যে উচ্চতম স্বাধীনতার অধিকার, ধর্ম্মনীতির পথে চলিতে ইহা স্বভাবতঃই তাহাকে প্রবৃত্ত কি নিবৃত্ত করে? জীবনের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের দিক হইতে, এ সব কথা কিছু নাই ধরিলাম। পার্থিব ভাগ্যে যে সিদ্ধিলাভে, পার্থিব যে সব সুখভোগে মানব জীবনের যে চরিতার্থকে পরম চরিতার্থতা বলিয়া র‍্যাসনালিষ্টরা মনে করেন, তাহাই বা ধর্ম্মনীতির পথে পথে অথবা স্বেচ্ছাচারের পথে--বাস্তব পক্ষে কোন্ পথে লোকের সিদ্ধ হইতে পারে?

এ সব ভাবিবার কথা।—কেবল ইহাই নয়, ভাবিবার আরও কথা আছে। প্রথম যুগের র‍্যাসনালিষ্টরা মানুষের অধিকারের দাবী বা rightsএর কথাই বড় করিয়া ধরিয়াছেন, জীবনের এই দিকটার উপরেই জোর বেশী দিয়াছেন, এবং এই সব অধিকারকে রক্ষা করাই সমাজের পক্ষে প্রধান বা একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু মানুষ যে কেবল তার অধিকার ভোগ করিয়াই চলিতে পারে না, অপরের প্রতি, সমাজের প্রতি, বহু কর্ত্তব্য ও দায়িত্বও তাহার আছে, এইসব কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব পালন সে না করিলে মনুষ্যত্বেরই যোগ্য সে হয় না, এই সব অধিকার ভোগেও তার দাবী কিছু থাকিতে পারে না,—যে সমাজ তার সব অধিকারকে রক্ষা করিবে, সেই সমাজেরই অস্তিত্ব ও কর্ম্মক্ষমতা নির্ভর করে, তার পক্ষে এই সব দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালনের উপর,—এই সব কথা

তাঁহারা বড় ভাবেন নাই. এ সব সম্বন্ধে কোনও কথাও কিছু বড় বলেন নাই।

ইটালীর নবযুগের প্রবর্ত্তক মহামতি মাট্‌সিনিই প্রথমে তাঁহার Duties of Man নামক বিখ্যাত গ্রন্থে এই দিকে র‍্যাসনালিষ্ট ইয়োরোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আগে ছিল, Rights of manই বড় কথা; মাট্‌সিনিই প্রথমে দেখান, না তা নয়, Duties of man আরও বড় কথা। মানুষ যদি কিছু rights বা অধিকার ভোগ করিতে প্রত্যাশা করে, তবে আগে তাহাকে তার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব যাহা কিছু আছে, তাহা পালন করিতে হইবে। চিন্তায় ও বুদ্ধিতে ম্যাটসিনির সমসাময়িক ইয়োরোপ র‍্যাসনালিষ্ট ছিল,—এখনও তাই আছে। চিন্তায় ও বুদ্ধিতে ম্যাটসিনি নিজেও র‍্যাসনালিষ্ট ছিলেন,—মানব-জীবনের এই কর্ত্তব্যের দিকটা তিনি র‍্যাসনালিজমএর দিকহইতেই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন, এবং ইয়োরোপের উন্নতচিন্তাও তদবধি এই দিকটার একটা প্রাধান্য স্বীকার করিতেছেন। যে ষ্টেট্ ও সিভিক কর্পোরেশনকে জাতীয় সংহতি ও সামাজিক কর্ম্মশক্তির আশ্রয় ও আধার বলিয়া র‍্যাসনালিষ্টরা মানিয়া নিয়াছেন, তাহার অস্তিত্ব সম্ভব হয়, কর্ম্মক্ষম তাহা থাকিতে পারে, স্বেচ্ছায় যদি মানুষ তাহার নিয়ম কানুন সব মানিয়া চলে, তৎসংক্রান্ত যত কিছু কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব—(অর্থাৎ political ও civic duties ও responsibilities বলিতে যাহা কিছু বুঝায়)—সব যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই পালন করে। তা যদি না করি, কেবল দণ্ডের বলেই বিহিত কোনও কর্ম্ম যথোচিত ভাবে এই সব শক্তি নির্ব্বাহ করিতে ত পারেই না,—আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করাও একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে।

উচ্চতর যে সব ভাবের প্রেরণা, যে সুবুদ্ধি, এবং লোকচরিত্রে যে সব সদ্‌গুণের বিকাশ ও সদভ্যাসের প্রভাব ব্যতীত এইরূপ মতিগতিই লোকের হয় না, সে সবই বা কোথা হইতে আসিবে? ধর্ম্মনীতির সকল নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করিয়া লোকে যদি কেবল নিজের যখন

যাহা ভাল লাগে তাই করে, নিজের ইচ্ছামতই সর্ব্বদা চলে, নিজের কিসে সুখ হইবে তাই কেবল খোঁজে, তবে তাহাদের চরিত্রে এই সব political ও civic virtues—রাষ্ট্রীয় ও নাগরিক ধর্ম্মের গুণই বিকাশ লাভ করিতে পারে কি?

এই গ্রন্থের প্রথম অংশে ১ম, ৪র্থ ও ৫ম প্রবন্ধে ব্যষ্টির ও সমষ্টির ধর্ম্ম, এই ধর্ম্মের স্বরূপ ইত্যাদি সম্বন্ধে যে-সব আলোচনা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই সব কথার উত্তর মোটামুটি পাওয়া যাইবে।

তবে সমষ্টির মঙ্গলে ব্যষ্টিজীবনের উপরে সমষ্টিধর্ম্মের যে অধিকার আছে, প্রধান ভাবে সেই দিক হইতেই এইসব আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই ধর্ম্ম কেবল সমষ্টিরই ধর্ম্ম নহে, সমষ্টিকেই কেবল মঙ্গলে ধারণ করিয়া রাখেনা, ইহা ব্যষ্টিরও ধর্ম্ম, ব্যষ্টিকেও তার নিজস্ব মঙ্গলে ধারণ করিয়া রাখে। সমষ্টির জন্যই কেবল ব্যষ্টি জন্মে নাই,—সমষ্টির প্রতি কতকগুলি কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব পালন করিতে পারিলেই,—সমষ্টির কাছে সে সব ঋণের দায়ে দায়ী, সেই ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলেই, সমষ্টি ধর্ম্মের আনুগত্য করিয়া যাইতে পারিলেই, যে তার সকল ইষ্ট-সিদ্ধি হইল, কিছুই আর বাকী রহিলনা, এমন হইতে পারে না। তার নিজের একটা সত্তা আছে, সেই সত্তারও আত্মসিদ্ধি একটা চাই। এই সত্তার সত্যকে যাহা ধারণ করিয়া আছে, এই আত্মসিদ্ধির পথে যাহা তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহাই ব্যষ্টির পক্ষে ধর্ম্ম। একদিকে যেমন সাংসারিক জীবভাবে বহুকামনার পরিতৃপ্তি, অন্যদিকে তেমনই 'নিত্যমুক্ত স্বভাববান্ সচ্চিদানন্দস্বরূপ' শিবত্বের অভিব্যক্তি, দুই-ই এই আত্মসিদ্ধির পক্ষে তাহার আবশ্যক। এদেশের ভাষায় ইহার একটির নাম 'ভুক্তি,' অপরটির নাম 'মুক্তি'। মায়ার বন্ধনে বাঁধিয়া জীবকে যিনি ভুক্তি-মুখ করিয়াছেন, যিনিই আবার ভুক্তিপরায়ণ জীবকে তার বন্ধন মোচন করিয়া মুক্তির দিকে লইয়া যান, ব্রহ্মময়ী সেই মহামায়া তাই 'ভুক্তি-মুক্তিপ্রদায়নী' এই বিশেষণে অভিহিতা হইয়াছেন। ভুক্তিমুক্তিরূপ এই আত্মসিদ্ধিকে ভারতীয় প্রাচীন-

জ্ঞানীরা 'ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ' রূপ 'চতুর্বর্গসিদ্ধি' এই নামও দিয়াছেন। সকলের আগে ধর্ম্ম। ধর্ম্মে স্থির থাকিয়া ধর্ম্মবিহিত পথে অর্থ উপার্জ্জন লোকে করিবে, সেই অর্থে বিষয়সম্ভোগাদিতে 'কাম' অর্থাৎ বিষয়বাসনার পরিতৃপ্তি লাভ করিবে, তারপর সেই ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মপথে এই কামনার তৃপ্তি মানবকে নিবৃত্তি-মুখ করিবে, এবং তাহা হইতেই শেষে তার মোক্ষ লাভ হইবে। ব্যষ্টিভাবে মানব-জীবনে যাহা কিছু কাম্য বা অভীষ্ট হইতে পারে, এই চতুর্ব্বর্গের মধ্যেই যে সব তাহা রহিয়াছে, ইহার বাহিরে আর কিছুই থাকিতে পারে না, সহজেই আমরা তাহা বুঝিতে পারি। 'চতুর্ব্বর্গ' এই একটি কথাব মধ্যে যেমন ভাবে ব্যাষ্টিজীবনের সকল সার্থকতার সঙ্কেত রহিয়াছে, এমন আর কোনও ভাষার কোনও কথার মধ্যে আছে কিনা জানি না।

এই চতুর্ব্বর্গের মধ্যে ধর্ম্ম আদিবর্গ, এবং অপর তিন বর্গের মূল আশ্রয় ও সিদ্ধির অনুকুল সাধনার পথপ্রদর্শক। অর্থকামভোগে যে সিদ্ধি মোক্ষের দিকে মানবকে লইয়া যাইতে পারে, সে সিদ্ধি ধর্ম্মেব পথেই সাধনীয। এই যে ধর্ম্ম, তাহা একদিকে যেমন ব্যষ্টির হিতার্থে ব্যষ্টিব ধর্ম্ম, অপব দিকে তেমনই সমষ্টির হিতার্থে সমষ্টির ধর্ম্ম। একই ধর্ম্ম একদিকে ব্যষ্টিকে রক্ষা করিয়া অপর দিকে সমষ্টিকেও রক্ষা কবিতেছে। উভয়ের মধ্যে নিত্য এক যোগসূত্র ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টিকে যুক্ত কবিযা বাখিয়াছে। আত্মধর্ম্মপরায়ণ ব্যষ্টি তাই আপনা হইতেই সমষ্টির ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হয়, এবং এই যোগসূত্র যাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, উভয় ধর্ম্মের মধ্যে এই একত্বের বা সামঞ্জস্যের সত্যও তাঁহারা দেখিতে পান।

"বিদ্বভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্ম্মস্তন্নিবোধত"॥

অর্থাৎ, বেদবিৎ পণ্ডিতদের পরিজ্ঞাত, রাগদ্বেষমুক্ত সাধুদের সেবিত এবং শ্রেয়ঃ বলিয়া হৃদয়ে অনুভূত যে ধর্ম্ম, তাহার কথা আপনারা শ্রবণ করুন।

মনুসংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভেই এই শ্লোকটি আছে। এই উক্তি করিয়াই ভগবান্ মনুর আদেশে মহর্ষি ভৃগু সমবেত ঋষিবৃন্দের সম্মুখে ধর্ম্মব্যাখ্যা আরম্ভ করেন।

পরবর্ত্তী পঞ্চম শ্লোকে আবার ভৃগু বলিতেছেন,

"বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাং।
আচারশ্চৈব সাধুনামাত্মনস্তুষ্টিরেবচ॥"

অর্থাৎ অখিল বেদ, বেদবিদ্‌গণের স্মৃতি ও শীল *, সাধুদের আচার এবং আত্মতুষ্টি, এই সবই ধর্ম্মের মূল বা প্রমাণ স্বরূপ।

পরে দ্বাদশ শ্লোকে আবার তিনি বলিতেছেন,

"বেদঃস্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥"

অর্থাৎ বেদ, স্মৃতি, সদাচার এবং আত্মপ্রসাদ, এই চারিটিকে ধর্ম্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ বলিয়া ঋষিরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ধর্ম্ম ও ব্রহ্মপ্রতিপাদক চিরন্তন যে সব সত্য আপ্তবাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে, সাধারণ বুদ্ধিমূলক যুক্তিতর্কের অতীত যাহা, এবং শ্রদ্ধায় গ্রহণ করিয়া এই সব আপ্তবাক্যেরই প্রদর্শিত পথে সাধনার ফলে যাহা লোকে অনুভব করিতে পারে, তাহাই বেদ বা আগম। এই দেশে বিশিষ্ট যে শাস্ত্রে এই সব কথা সঙ্কলিত হইয়াছে, সেই শাস্ত্রও বেদ নামে পরিচিত। কিন্তু তাই বলিয়া একথা মনে করা ঠিক হইবে না যে বেদ কেবল এই ভারতেই মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, এবং বিশিষ্ট এই শাস্ত্রের বাহিরে এই সব সত্য আর কোথাও পাওয়া যাইবে না। পৃথিবীর সকল দেশের, সকল জাতির মধ্যেই আপ্ত ঋষির (অর্থাৎ prophetএর) আবির্ভাব হইয়াছে এবং

* ব্রহ্মণ্যতা, দেবপিতৃভক্তা, সৌম্যতা, অপরোতাপিতা, অনসূয়তা, মৃদুতা, অপারুষ্য, মৈত্রতা, প্রিয়বাদত্ব, কৃতজ্ঞতা, শরণ্যতা, কারুণ্য, প্রশান্তি—ঋষি হারীত মানব চরিত্রের এই ত্রয়োদশ গুণকে 'শীল' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

এইরূপ-সব সত্য তাঁহাদের মুখেও প্রকাশিত হইয়াছে। এই সব সত্যকে অবলম্বন করিয়াই বিভিন্ন ধর্ম্ম বা religionএর অভ্যুদয় হইয়াছে, এবং এই সব ধর্ম্মের যে সব Scriptures বা আদি শাস্ত্র—যেমন বাইবেল কোরাণ আবেস্তা প্রভৃতি—সে সবও এই হিসাবে বেদ বা আগম *। তবে একথাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে যেমন আমাদের বেদশাস্ত্র, তেমন অন্যান্য দেশের 'বেদশাস্ত্র' বা Scriptures সঙ্কলিত হইয়াছে এই সব আদি আপ্ত ঋষিদের আবির্ভাবের অনেক পরে, এবং তাহার পরেও এই সব সঙ্কলনের অনেক সংস্করণ হইয়াছে।—ভুলেই হউক, কি অন্য যে কোনও কারণেই হউক, এই সব সঙ্কলনে ও সংস্করণে এমন অনেক কথা হয়ত সন্নিবেশিত হইয়াছে, যাহা ঠিক আপ্ত বাক্য নয়, অথবা আপ্ত বাক্যের সত্যের জ্যোতিঃ যাহাতে কিছু মলিন ও বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে।

"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

এই যে শ্লোক যুধিষ্ঠিরের মুখে উক্ত হইয়াছিল, ইহার একটি তাৎপর্য্যও এই।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও জ্ঞানীর অনুসন্ধিৎসা যে জলের মধ্য হইতে খাঁটি দুগ্ধ টুকু বাহির করিয়া না নিতে পারে, তা নয়।

যুধিষ্ঠিরই তাহার সূত্র দেখাইয়াছেন এই শ্লোকটির শেষ চরণে—

'মহাজনো যেন গতঃ পন্থা।'

শীল ও সদাচারের পথই এই পথ।

তারপর স্মৃতির কথা। পুরুষপরম্পরাক্রমে বেদানুগত যে সব সুনীতির পথে লোকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, এবং এই ভাবে লোকস্থিতিকে ধারণ করিয়া রাখিতেছে বলিয়া বিশেষভাবে

* ৭৮—৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যাহা ধর্ম্মপদবাচ্য হইয়াছে, সেই সব স্মরণ করিয়া যে শাস্ত্রপদ্ধতি ঋষিরা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহারই সাধারণ নাম স্মৃতি। ধর্ম্মবিধির নির্দ্দেশ ও বিবৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ইহার মধ্যে আছে বলিয়া এই স্মৃতির আর একটি নাম এদেশে হইয়াছে 'ধর্ম্মশাস্ত্র'।

যুগে যুগে অবস্থার পরিবর্ত্তনে জীবননীতিও পরিবর্ত্তিত হয়। যে পরিণাম বা Evolution বিশ্বসংসারের নিত্যধর্ম্ম, এই পরিবর্ত্তন মানব-জীবনে তাহারই একটা বিশেষ ভাব। মূল কতকগুলি নীতির সত্যে আশ্রিত থাকিয়া, তাহার নিয়ন্ত্রিত পথেই এই পরিণাম বা পরিবর্ত্তন হইতেছে। বিভিন্ন যুগে স্মৃতির বিধিও এই কারণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, পুরাতন বিধির, পুরাতন সব নীতির নির্দ্দেশের স্থলে তাই বহু নূতন বিধি ও নূতন নীতির নির্দ্দেশ বিভিন্ন যুগের স্মৃতিতে দেখা যায়। স্মৃতি যদি জাগ্রতধর্ম্মের শাস্ত্র হয়, কঠোর ভাবে ছাঁদাবাঁধা একটা 'অচলায়তন' হইয়া তাহা থাকিতে পারে না। এদেশের স্মৃতিও তাহা থাকে নাই। প্রাচীন কল্পোক্ত ধর্ম্মসূত্র, মনুসংহিতা, অত্রিবিষ্ণু হারীতাদি পরবর্ত্তী ঋষিদের প্রণীত অষ্টাদশ সংহিতা এবং রঘুনন্দনাদি প্রণীত নব্যস্মৃতি যাঁহারা তুলনা করিয়া দেখিবেন, সকলেই এই সত্যের প্রমাণ পাইবেন।

যেমন বেদ বা আপ্ত বাক্য, তেমনই স্মৃতি বলিতে যেরূপ সব ধর্ম্ম-শাস্ত্রকে বুঝায়, সে সবও যেমন এ দেশে তেমন অন্যান্য দেশেও আছে। কোনও ধর্ম্ম বা religionকে আশ্রয় করিয়া যে সব সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বত্রই এইরূপ শাস্ত্র আছে। য়িহুদিদের ট্যালমাড (Talmud), মুশলমানদের এজমা কেয়াস প্রভৃতি গ্রন্থ এবং খৃষ্টানদের 'ক্যানন ল' (Canon Law) এই সব শাস্ত্রের মধ্যে।

তারপর আত্মপ্রসাদের কথা।—পূর্ব্বোক্ত তিনটি শ্লোকে তিনটি কথা দ্বারা মহর্ষি ভৃগু এই মহাসত্যকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—'হৃদয়ে-নাভ্যনুজ্ঞাতঃ', 'আত্মনস্তুষ্টিঃ', ও 'স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ'।

নিজের চিত্তে শ্রেয় বা ভাল বলিয়া ইহাকে অনুভব করা চাই, আত্মতুষ্টি ইহাতে হওয়া চাই। এই কথাটির উপরে আরও জোর দিয়া আবার তিনি বলিতেছেন, 'স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনম্'। অর্থাৎ যাহা ধর্ম্ম তাহা নিজেরই অতি প্রিয় হইবে, নিজের অতি ভাল লাগিবে।

মূলসত্তায় মানব 'সচ্চিদানন্দস্বরূপ নিত্যমুক্ত স্বভাববান্'। সৎস্বরূপে যাহা সে সত্য বলিয়া অনুভব করিবে না, চিৎস্বরূপে যাহা ভাল বলিয়া না জানিবে বা বুঝিবে, আর আনন্দস্বরূপে যাহা তাহার প্রীতিকর না হইবে, তাহা সে ধর্ম্ম বলিয়া শ্রদ্ধায় গ্রহণ করিতে পারে না। 'নিত্য মুক্ত স্বভাববান্' সে, ধর্ম্মেরপথে তাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই চলিতে হইবে। নতুবা সে পথ তার দাসত্বের পথই হইতে পারে; মুক্তস্বভাব-মানবোচিত ধর্ম্মের পথ নহে।

খাঁটি র‍্যাসনালিজমের কথাই ইহা। মূলসত্তায় মানুষ যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ও নিত্যমুক্তস্বভাববান্, ইংরিজেতে তাহারই মোট অর্থ হইতেছে, man is a rational being। কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য ও মূল তত্ত্ব যেমন ঐ তুইটি বিশেষণে ব্যক্ত হইয়াছে, কেবল rational being কথাটায় তাহা হয় নাই। Man has been made in the image of God—বাইবেলের এই কথাটিতেই বরং এই সত্য অনেক বেশী ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা বোধিসিদ্ধ ঋষির কথা,—কেবল বুদ্ধিজীবী মানুষের কথা নয়।

যাহা হউক, আত্মাপ্রতীতি ও আত্মপ্রীতি ধর্ম্মের বড় একটি প্রমাণ বা লক্ষণ হইলেও ইয়োরোপীয় র‍্যাসনালিষ্টদের ন্যায় ইহাকেই একমাত্র প্রমাণ বা লক্ষণ বলিয়া মনুসংহিতা বা মানবধর্ম্মশাস্ত্র গ্রহণ করেন নাই।

কিন্তু মানুষ যদি সত্য সত্যই সচ্চিদান্দস্বরূপ ও নিত্য মুক্ত স্বভাববান্, স্বয়ং ভগবানেরই প্রতিকৃতি, তবে তাহারই চিত্তে প্রতিভাত ধর্ম্মের উপরে আবার বেদাদি প্রদর্শিত ধর্ম্মের প্রমাণের কি আবশ্যকতা আছে? তাহার কি অধিকারই বা মানবের সেই নিজস্ব ধর্ম্মের উপরে থাকিতে পারে?

এইখানে একটি বড় সত্যকে আমাদের ভুলিলে চলিবে না। বেদ স্মৃতি ও সদাচারে যাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং মানবের আত্মচিত্তে যাহা প্রতীত বা অনুভূত হয়, দুই-ই এক মহাধর্ম্মের দুইটি দিক মাত্র। উভয়ে উভয়ের সাপেক্ষ ও সমঞ্জস—একটি অন্যটির বিরোধী হইতে পারে না। জীবাত্মা যে পরমাত্মার অংশ, জীবের অন্তরে অন্তরে স্বয়ং যে ভগবান শিব বিরাজ করিতেছেন, আগমোক্ত এই সত্যই তাহার প্রমাণ। এই সত্যেই সে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ও নিত্য মুক্ত স্বভাববান্। এই সত্যের সমগ্রতায় যাহা কিছু বুঝায়, সব মানুষকে বুঝিয়া নিতে হইবে। একটা দিক্ মাত্র ধরিয়া নিয়া কেবল তাহারই ভাবে যাহা খুসী তাই করিতে চাহিলে চলিবে কেন?

যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছেন, তিনিই ইহার ধারকশক্তি বা ধর্ম্ম হইয়া ইহাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। জীবসংঘাতে ইহাই জীবধর্ম্ম, মানবসংঘাতে ইহাই মানবধর্ম্ম। ইংরেজি কথায় বলা যাইতে পারে ইহাই Cosmic Order এর মধ্যে Moral Order, অথবা Moral Order রূপে Cosmic Order এর বিশিষ্ট একটা ভাব বা দিক *। এই মানবধর্ম্ম বা Moral Order সমষ্টির দিক্ হইতে বেদ স্মৃতি ও সদাচার বলিতে যাহা বুঝায়, তাহারই স্বরূপে মানব সমাজে ব্যক্ত হইয়াছে।

আবার প্রত্যেক মানব ক্ষুদ্রভাবে এই Cosmic Order বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরই প্রতিরূপ ক্ষুদ্র এক একটি ব্রহ্মাণ্ড। পরমাত্মার জীবাত্মারূপে প্রকাশ যে মানব, মানবতার মূলসত্তায় সে যে ব্রহ্ম-স্ফুলিঙ্গ, এই সত্যই তাহাকে জীবাত্মার পূর্ণস্বভাবে ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপতা দিয়াছে §। সুতরাং বিশ্বের এই Moral Order বা মানব ধর্ম্মও সূক্ষ্মভাবে প্রত্যেক মানবের মধ্যে রহিয়াছে। সহজ যে ধর্ম্মবুদ্ধি মানবের মধ্যে রহিয়াছে, ইংরেজিতে যাহাকে moral

* ৩য় প্রবন্ধ, ৯৮—১০২, এবং ৫ম প্রবন্ধ, ২০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

§ ৫ম প্রবন্ধ—১৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

faculty, intuitive moral sense অথবা conscience বলা হয়, যাহার প্রভাবে ভাল মন্দ সে অনুভব করে, তাহার মূলই হইতেছে মানবের অন্তরে এই Moral Order বা মানবধর্ম্মের প্রতিরূপ। ঋষি ও মহাজনগণ যে সব ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন, বেদ স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে এবং অন্যান্য বহু ধর্ম্মগ্রন্থে যাহা সঙ্কলিত আছে, তাহা যখন আমরা পড়ি বা আচার্য্যদের মুখে শুনি, অথবা সাধুজীবনের সদাচারের সংস্পর্শে আসি, অন্তরে অন্তরে আমরা অনুভব করি, হাঁ, ইহাই সত্য, ইহাই ধর্ম্ম, ইহাই সাধু জীবনের আদর্শ। সমস্ত চিত্ত অতি আগ্রহে ইহার দিকে উদ্বেলিত হইয়া উঠে, ইহাকেই আপন ধর্ম্ম বলিয়া আমরা ধরিয়া নিতে চাই, ইহারই তত্ত্বের সঙ্গে আপন অন্তর্প্রবৃত্তিকে মিলাইয়া—যেন এক করিয়া দিতে চাই। কারণ এই ধর্ম্মই আমার অন্তরে গিয়া আমার ধর্ম্ম হইয়াছে, এক তারে ইহা তাহার সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে। একটিতে ঘা পড়িলে আর একটিও সমান সুরে বাজিয়া উঠে। সমান সত্তায় বহিপ্র্রকৃতির সঙ্গে অন্তপ্র্রকৃতির একটা সমতার যোগ আছে বলিয়াই বাহিরের স্পর্শে অন্তর হইতে একটা সাড়া বাজিয়া উঠে, বাহিরের রস অন্তর গ্রহণ করে। ক্রমে সমান সুরে বাজিয়া বাজিয়া, সমান রসে রসিক হইয়া, অন্তর যখন আত্মপ্রসারে বাহিরের সঙ্গে সমান হইয়া মিশিয়া যায়, মানুষ তখন পূর্ণতা লাভ করে; সে যে ক্ষুদ্র ও সসীম, আর বাহির যে বিরাট্‌ ও অসীম, এই ভেদ আর তাহার থাকে না। তবে এই পূর্ণতা বহুজন্মের সাধনাসাপেক্ষ। ইহার দিকেই মানবের জীবনযাত্রা পরিচালিত হইতেছে,—যাত্রার শেষ তখন হইবে, যখন এই পূর্ণতাতে মানব উপনীত হইবে। ইহার পূর্ব্বে প্রত্যেক জন্মে ও জীবনে যতটা সে এইদিকে অগ্রসর হইতে পারিবে, বিশ্বরসের সঙ্গে আত্মরসের, বিশ্বধর্ম্মের সঙ্গে আত্মধর্ম্মের, সমতার ভাব অনুভব করিতে পারিবে, যত তার সঙ্গে আপনাকে মিলাইয়া মানাইয়া চলিতে পারিবে, তত তার সেই জন্ম ও জন্মে জীবনের যাত্রা সার্থক হইবে।

বেদ স্মৃতি ও সদাচারে বাহিরে ধর্ম্মের যে স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে সাধারণতঃ ধর্ম্মনীতি * এই নাম তাহাকে আমরা দিতে পারি। এই ধর্ম্মনীতি আর আমার অন্তরে ধর্ম্মের যে স্বরূপ রাহিয়াছে, উভয়ের মধ্যে সমতার বা নিবিড় একটা যোগসূত্রের এই যে সত্য, তাহা যদি আমরা অনুভব করিতে পারি, তবে সেই প্রচলিত ধর্ম্মনীতির সঙ্গে বিরোধ ত আমরা করিবই না, আগ্রহে আপনা হইতেই বরং তাহার পথে চলিতে চাহিব, এবং তাহার জন্য পার্থিব স্বার্থ কি পার্থিব ভোগসুখ যদি বহু ত্যাগ করিতে হয়, দৈহিক ক্লেশ যদি অনেক সহ্য করিতে হয়, অনায়াসে তাহা করিতে পারিব, এবং তাহাতে অতি আনন্দ বই

* এই ধর্ম্মনীতি ইংরেজিতে সাধারণতঃ Ethical বা Moral Law নামে পরিচিত। ইহার যে তত্ত্বশাস্ত্র, তাহারও সাধারণ নাম Ethics বা Moral Philosophy। Religion হইতে Moralityকে, Theology হইতে Ethicsকে পৃথক্ কিছু একটা বলিয়া পাশ্চাত্য বিদ্যায় ধরা হয় এবং আমরাও ইহার অনুকরণে অনেক সময়ে Religion ও Moralityর পার্থক্য বুঝাইতে 'ধর্ম্ম' ও 'নীতি' এই দুইটি কথা ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু এদেশে প্রাচীন সাহিত্যে Religion ও Moralityর মধ্যে এরূপ কোনও পার্থক্য দেখা যায় না। বাস্তবিক Religion বলিতে এবং Morality বলিতে যাহা কিছু আমরা বুঝি, সবই এক ধর্ম্মেরই ভাববৈচিত্র মাত্র, এবং তাই এক 'ধর্ম্ম' নামই ব্যবহৃত হইতেছে। Ethics বা Moral Philosophy বলিয়া পৃথক্ কোনও শাস্ত্রও এদেশে নাই। Ethics এর ভিত্তি সম্বন্ধে সাধারণতঃ তিনটি বিশিষ্ট মত ইয়োরোপে দেখা যায়। কেহ বলেন, আপ্তবাক্য বা spiritual revelation, কেহ বলেন লোকহিত (the greatest good of thc greatest number) সম্বন্ধে বুদ্ধির নির্দ্দেশ, কেহ বলেন আত্মপ্রতীতি বা intuition, ইহার মূল। কিন্তু এই তিনের মধ্যেই আংশিকভাবে সত্য রহিয়াছে। আপ্তবাক্য ও আত্মপ্রতীতির মধ্যে যে যোগসূত্রের কথা আলোচিত হইয়াছে তাহাতে দেখান হইয়াছে যে ধর্ম্ম আপ্তবাক্যে প্রকাশিত হয়, তাহাই আত্মপ্রতীতিতে গৃহীত হয়। তাহাই যে লোকহিতকর, ইহাও বুদ্ধিমান্ লোকে বুঝিতে পারে।

কোনও দুঃখ কখনও অনুভব করিব না। স্বেচ্ছায় মানুষ আত্মত্যাগে যতই কঠোর ব্রত গ্রহণ করুক, তাহাতে আনন্দ বই দুঃখ কিছু সে বোধ করে না। দুঃখ বোধ করে তখন, যখন বাহির হইতে কঠোর কোনও নিয়মের শাসন তার উপরে চাপাইয়া দেওয়া হয়, মন চায় না এমন কোনও পথে বাধ্য করিয়া কোনও প্রভুশক্তি তাহাকে চালায়। ধর্ম্মনীতি যদি সত্য ধর্ম্মের নীতি হয়, আর তাহার সঙ্গে আত্ম-ধর্ম্মের সম্বন্ধের সত্য মানবের চিত্তে জাগ্রত থাকে, তবে তাহার প্রভাব বাহির হইতে চাপান কোনও শাসন, তাহার পথ বাধ্যতার কোনও পথ হইতে পারে না।

তবে ধর্ম্মনীতি অনেক সময় বিকৃত হইতে পারে, আর এই সম্বন্ধের সত্যও সর্ব্বদা মানবের চিত্তে জাগ্রত থাকে না। ইহা লইয়া যত কিছু অনর্থ ও গোলযোগ এই সব স্থলেই ঘটিয়া থাকে।

উন্নতবুদ্ধি, উচ্চ সংস্কারের অধিকার এবং সুশিক্ষায় ও শমদমাদি ধর্ম্মের সাধনায় উন্নত চরিত্রবান্—অর্থাৎ পূর্ব্বে ব্রহ্মণ্যতা প্রভৃতি যে ত্রয়োদশ শীলের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাই যাহাদের চরিত্রের লক্ষণ হইয়াছে—এমন সব ব্যক্তির হাতে যদি ধর্ম্মের নিয়ন্তৃত্ব থাকে, তবে ধর্ম্মের কোনও বিকার সহজে ঘটিতে পারে না। কিন্তু সর্ব্বদা এরূপ থাকে না, অযোগ্য লোকের হাতে এই নিয়ন্তৃত্ব গিয়া পড়ে। কখনও বা ভুল বুঝিয়া, কখনও বা নিজেদের এই উচ্চপদ-প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে, কখনও বা শক্তিশালী কোনও সম্প্রদায়বিশেষের অনুগ্রহজীবী হইয়া তাঁহাদের ও তাঁহাদের সঙ্গে নিজেদেরও স্বার্থবুদ্ধি কল্পে, এমন অনেক নীতির প্রবর্ত্তন ইঁহারা করেন যাহা সত্য ধর্ম্মের নীতি নহে; এবং কতক নানা কৌশলে লোকের চিত্তকে বিভ্রান্ত করিয়া, কতক বা শাসনে বাধ্য করিয়া, তাহার পথে জনসমাজকে পরিচালিত করিতে চান। সাধারণতঃ এই ভাবেই ধর্ম্মনীতি বিকৃত ও তাহার সত্যহইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। কখনও মানবজীবনের নূতন কোনও পরিণতিতে, অবস্থার পরিবর্ত্তনে পুরাতন বহু নীতি অচল হইয়া পড়ে; পুরাতনের পরিবর্ত্তন

এবং নূতনের প্রবর্ত্তন আবশ্যক হয়। ধর্ম্মনীতির ধারক যাঁহারা, তাঁহারা অনেক সময়ে উচ্চতর জ্ঞানদৃষ্টির অভাবে নূতন অবস্থার সঙ্গে মানাইয়া চলিতে পারেন না, পুরাতনকেই ধরিয়া রাখিতে চান। ইহাও ধর্ম্মের একরূপ বিকারেরই লক্ষণ।

এই বিকার যখন বড় বেশী হইয়া উঠে, ইহার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে আত্ম-প্রতীত ধর্ম্মের মিল রাখিয়া লোকে চলিতে পারে না; তাহার পথে পদে পদে বরং কঠোর বাধা বলিয়াই অনুভব করে। লোকমত তখন ইহার বিরুদ্ধে জাগ্রত হইয়া উঠে, এবং এই বিকারব্যাধির প্রতিকারকল্পে ধর্ম্মনীতির সংস্কারের প্রয়োজন হয়। যথাযোগ্যকালে ধর্ম্মবিৎ ও ধর্ম্মশীল যোগ্য নায়কদের আবির্ভাবে যুগে যুগে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মনীতির এই সংস্কার ঘটিয়াছে। সংস্কারই ইঁহারা করিয়াছেন, অসত্যের অভিভাব হইতে সত্যকে, অপধর্ম্মের চাপ হইতে ধর্ম্মকে ইঁহারা উদ্ধার করিয়াছেন। সেই সত্য কেবলই অসত্য, ধর্ম্ম কেবলই অপধর্ম্ম, এইরূপ মনে করিয়া একেবারে তাহাকে লোপ করিয়া ফেলিতে অথবা মানবজীবনকে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিতে চাহেন নাই, ইয়োরোপীয় র‍্যাসনালিষ্ট ও সোসিয়ালিষ্টরা যেমন চাহিতেছেন।

তারপর দ্বিতীয় কথা, প্রতিষ্ঠিত বা প্রচলিত ধর্ম্মনীতির সঙ্গে আত্মধর্ম্মের সম্বন্ধের সত্য সর্ব্বদা লোকে অনুভব করিতে পারে না। বহু লোকই যে পারে না, একটু সূক্ষ্মদৃষ্টি আছে, এমন সকলের কাছেই ইহা এমন একটা প্রত্যক্ষ সত্য যে কোনও প্রমাণ দ্বারা ইহা বুঝাইবার প্রয়োজন বড় হয় না। তবে কেন পারে না, এ সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন সকলের মনেই উঠিতে পারে। মূলসত্তায় জীব সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম-স্বরূপ বটে, কিন্তু এই স্বরূপতা মায়ার আবারণে আবৃত। এই আবরণ যে জীবে যত ঘন, ব্রহ্মজ্যোতি তাহাতে তত ম্লান, তত অস্ফুট। এই আবরণই—অন্যকথায় প্রকৃতিসম্ভব সত্বরজঃ তমো গুণের অভিভাবই—জীবকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ করিয়া রাখিয়াছে, পৃথক্‌

একটা ভাব বা ভাগ তাহাকে দিয়াছে *। সুতরাং জীবের জীবত্বের ধর্ম্ম বা স্বভাবই হইল এই। তামস ভাবে এই আবারণ অতি ঘন—ঘনতম; কোনও দিকেই তাহার তেমন কোন জ্ঞান কি আত্মোন্নতিকর ক্রিয়া-শীলতা প্রকাশ পায় না। রাজসভাব জীবকে উদ্দাম প্রবৃত্তিমার্গে অতি চঞ্চল ও ক্রিয়াশীল করিয়া তোলে, যাহা প্রেয় তাহাকেই শ্রেয় মনে করিয়া অতি আগ্রহে তাহার দিকে সে ধাবিত হয়। সাত্ত্বিক ভাবে তাহার বুদ্ধি ও মতি নিবৃত্তিমার্গী হয়। এবং তাহা হইতে ক্রমে এই আবরণকে ভেদ করিয়া জীব সচ্চিদানন্দস্বরূপে পূর্ণ পরিণতি বা অভিব্যক্তি লাভ করে। রাজসভাবে 'প্রেয়'র মধ্যেই জীব 'শ্রেয়'কে খোঁজে, খুঁজিয়া যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, না পায়,—প্রেয় যখন আর প্রেয় থাকে না, অতি অপ্রিয় ও দুঃখের কারণ হইয়া উঠে,—তখনই সাত্ত্বিকভাব তাহার মধ্যে জাগ্রত হয়,—রজোগুণাত্মক যাহা কিছু ক্রিয়াশীলতা, এই সাত্ত্বিক ভাবেরই অনুগত হইয়া, তাহারই পথে চলে। পূর্ব্বে দুই এক স্থলে আচার্য্য হাক্সলি কর্ত্তৃক বিখ্যাত natural man ও ethical man এর কথা বলা হইয়াছে §। সাত্ত্বিক ভাব ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই, তামস ও রাজস ভাবই প্রধান হইয়া রহিয়াছে, এইরূপ স্বভাবই natural manএর স্বভাব। আর তামস ভাবকে দূর করিয়া রাজস ভাবকে আপন বশে রাখিয়া, সাত্ত্বিক ভাবই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে, এইরূপ স্বভাবই ethical manএর স্বভাব। এই স্বভাবেই ধর্ম্মনীতি অর্থাৎ মানবসমাজে প্রকাশিত বা প্রতিষ্ঠিত Moral Orderএর সঙ্গে আত্মধর্ম্মের সমতা বা যোগসূত্র মানুষ স্পষ্টভাবে অনুভব করিতে পারে। আর তামস ও রাজস গুণের প্রাধান্যে natural manএর যে স্বভাব, তাহাতেই সহজে পারে না। বরং তামস-জড়তা এই অনুভূতিকে একেবারে চাপিয়া রাখে, রাজস-প্রবৃত্তি বিপরীত

* ১৯০—৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

§ ১৬০—৬১ পৃষ্ঠা, ১৯৮—২০৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পথেই বুদ্ধি ও মতিকে পরিচালিত করিতে চায়। এখনও যে এজগতে তামস ও রাজস ভাবই অধিকাংশ লোকের মধ্যে প্রবল, মায়ার আবরণই অন্তরস্থিত ব্রহ্মজ্যোতিতে বড় বেশী চাপিয়া ও ঢাকিয়া রাখিয়াছে, এই সত্যকে আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু কেন ব্রহ্মস্বরূপ শিবরূপ জীব মায়ার এমন আবরক জালে জড়িত হন, এই রহস্যের ভেদ কেহ করিতে পারেন নাই। শিবের ইচ্ছাই এই, মহাযোগিনী মহামায়ার লীলাই এই, এই ভাবেই শিব জীব হইয়াছেন, ইহার উপরে মানবের বুদ্ধি ত পারেই নাই, বোধিও কোনও তত্ত্ব এসম্বন্ধে পায় নাই। তবে ইহার উপরে আর তত্ত্বই বা কি থাকিতে পারে? ব্রহ্মস্ফুলিঙ্গ মায়ার জালে জড়িত হইয়াই, শুদ্ধ সত্ত্ব পুরুষ প্রকৃতিতে আবিষ্ট হইয়াই জীব হয়।

কিন্তু জীব ত বহুকাল জন্মিয়াছে। জন্মের পর কত জন্ম তার গত হইয়াছে। এই জালের বন্ধন হইতে মুক্তির পথেও বহু জীব বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে, ব্রহ্মজ্যোতিও অনেকের মধ্যে অনেক পরিমাণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সকলের মধ্যে সমান ভাবে ফোটে নাই কেন? সকলেই সমান ভাবে এই মুক্তির পথে অগ্রসর হয় নাই কেন? ইহাও জীবজীবনের আর একটি বড় রহস্য। জীবনযাত্রা সকল জীবের একই ভাবে একই সময়ে আরম্ভ হয় নাই। যে ভাব লইয়া যে দিকেই সে যাত্রা করুক, যথাসময়ে সকলেই এই আবরণের জাল হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মজ্যোতিতে পরা স্থিতি লাভ করিবে। যে যত পুরাতন যাত্রী, সে তত আগে গিয়াছে,—নূতন যাত্রী পিছনে রহিয়াছে। পথ ভিন্ন ভিন্ন, পথযাত্রায় দূরত্বের মানও ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু সকল পথ একই সেই ব্রহ্ম-মহালয়ের অভিমুখে গিয়াছে; পথের মধ্যে যাত্রী যেখানেই যে থাক্, সেই মহালয়ে গিয়া একদিন উপনীত হইবেই। উচ্চ নীচ ক্রমে মানুষে মানুষে,মানুষের জাতিতে জাতিতে, একই জাতির মধ্যে সমাজের স্তরে স্তরে। যে ভেদ বা বৈষম্য দেখা যায়, তাহার তত্ত্ব

এই। এই ভেদ absolute বা নিরপেক্ষ ভাবে চিরন্তন ভেদ নহে, সাময়িক ভাবে আপেক্ষিক ভেদ মাত্র। কিন্তু সাময়িক ও আপেক্ষিক হইলেও, যতদিন আছে, ততদিন সত্য; এবং এই সত্যকে স্বীকার করিয়াই আমাদের চলিতে হইবে।

যাহা হউক, ধর্ম্মনীতির সঙ্গে আত্মপ্রতীতির ও আত্মতুষ্টির এই যোগ বহু লোকের মধ্যেই সত্য হইয়া উঠে নাই বলিয়াই যে আপন আপন তামস ও রাজস প্রবৃত্তি অনুসারেই সকলে চলিবে, শেষে যতদিনে যে ভাবে যার পক্ষে এই যোগ সত্য হয় হউক, এই ভাবেও মানুষকে একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। ভগবদভিপ্রায়ও সেরূপ নয়। তা যদি হইত, আত্মপ্রতীতির ও আত্মতুষ্টির বাহিরে বেদ স্মৃতি ও সদাচার রূপে ধর্ম্মনীতির একটা বহিঃপ্রকাশ ও বহিঃপ্রতিষ্ঠাও লোকসমাজে হইত না। প্রবৃত্তিমুখ মানুষকে নিবৃত্তিমুখ করিয়া সমষ্টিভাবে লোকস্থিতি রক্ষার জন্য এবং ব্যষ্টিভাবেও মানবের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য ভগবদিচ্ছায়ই ইহা হইয়াছে।

ধর্ম্মের নীতি কি, কোন্ শাস্ত্র, কোন্ অবস্থায়, কোন্ কার্য্যে কিরূপ আচরণ নীতিসঙ্গত বলিয়াছেন এবং কেনই বা তাহা নীতি-সঙ্গত, সর্ব্বদা সকল কার্য্যে এত সব হিসাবকিতাব করিয়া লোকে চলিতে পারে না। সাধারণ লোকের ত কথাই নাই, অতি জ্ঞানী যাঁহারা তাঁহাদের পক্ষেও প্রত্যেক কার্য্যে এরূপ সব বিচার করিয়া চলা সম্ভব হয় না। আবার আত্মপ্রতীতির সঙ্গে প্রচলিত ধর্ম্মনীতির মিল আছে কিনা, কোথায় কতটা আছে, সকল কার্য্যে এসব ভাবিয়া তবে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিবার অবসরও মানুষের হয় না। পরম্পরাগত লোকপ্রবাদে ও আচারব্যবহারের নিয়মে (in traditions and customs) ধর্ম্মানুগত জীবনযাত্রার একটা আদর্শের ধারা পড়িয়া যায়। প্রচলিত ধর্ম্মের পথ বলিতে সাধারণতঃ এই ধারাকেই বুঝায়। ধর্ম্মানুগ লোকশিক্ষা এবং নায়ক স্থানীয় প্রধান ব্যক্তিগণের জীবনের দৃষ্টান্ত এই আদর্শকে সর্ব্বদা লোকের সমক্ষে জাগ্রত রাখে এবং

ইহার অনুকূল এমন একটা সাধারণ মনোভাবেরও (moral বা mental atmosphere এরও*) সৃষ্টি করে, যাহাতে সহজেই লোকের চিত্ত ইহার অনুবর্ত্তী হইয়া দাঁড়ায়। সাধারণ অবস্থা যদি এইরূপ হয়, এবং বাল্যাবধি এই অবস্থার ধারা ধরিয়া চলিতে যদি লোকে অভ্যস্ত হয়, ধর্ম্মের পথ সাধারণ জীবনের সহজ পথ হইয়া উঠে; পদে পদে লোককে ভাবিতে হয় না, কোনও বিচার কি পরীক্ষা করিয়া নিতে হয় না, ইহা ধর্ম্ম উহা অধর্ম্ম, ইহা কর্ত্তব্য উহা অকর্ত্তব্য। অপর কাহাকেও সর্ব্বদা আসিয়া উপদেশ দিতে হয় না, ইহা তোমার ধর্ম্ম, উহা অধর্ম্ম,—ইহা কর, উহা করিও না।—বাস্তবিক যাহা করা উচিত সহজে আপনা হইতেই তাহা লোকে না করিলে, *চিত্তপ্রবৃত্তি স্বতঃই এইদিকে* মানুষকে পরিচালিত না করিলে, *কেবল কাহারও উপদেশে তাহা কেহ* করিতে পারে না। নিয়ত এইরূপ উপদেশ বরং বিরক্তিকরই হইয়া উঠে, বাহিরের একটা শাসনপ্রভাবের মতই আপনার বিবেকবুদ্ধির স্বাধীনতার উপরে আসিয়া পড়ে,—চিত্তকে তাহার বিদ্রোহী করিয়া তোলে। আবার নিজে যদি কেবলই নিজের বুদ্ধিতে সব বুঝিয়া নিতে চায়, বুঝিতে বুঝিতেই তার সময় চলিয়া যাইবে, কাজ কিছু করা হইবে না। অধিকাংশ কর্ত্তব্যই এতখানি বুঝিয়া নিবার অবসর মানুষকে দেয় না। দিলেও বুদ্ধি অনেক কু-তর্কের (sophistryর) সৃষ্টি করিয়া কর্ত্তব্যে তাহাকে বিরত করিতে পারে, ভুল পথেও নিয়া যাইতে পারে। আবার প্রবল কোনও কামলিপ্সা বা স্বার্থপ্রবৃত্তিও বুদ্ধিকে এমন বিকৃত, চিত্তকে এমন অভিভূত, করিয়া অনেক সময় ফেলে, যে তাহাকেই আপন ধর্ম্ম বলিয়া লোকে ধরিয়া নিতে পারে, নিয়াও থাকে।

সুতরাং এই সবের অপেক্ষা না রাখিয়া ধর্ম্মনীতির লক্ষ্যই এইরূপ হওয়া চাই, কিসে মানুষের জীবন আপনা হইতেই এই আদর্শের ধারার মধ্যে আসিয়া পড়ে।

কিছু পূর্ব্বে জীব-স্বভাবের যে তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, তাহা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, সু-প্রবৃত্তি সমূহের বীজ বা

সংস্কাররূপে ধর্ম্ম এবং কু-প্রবৃত্তি সমূহের বীজ বা সংস্কাররূপে অধর্ম্ম (অথবা জীবাত্মার উপরে মায়ামোহাদির যে অধ্যাসকে অধর্ম্ম আমরা বলিতে পারি)—দুই-ই মানুষের অন্তরে এই স্বভাবের মধ্যে রহিয়াছে। অন্য কথায় বলা যাইতে পারে, মানবের অন্তরস্থিত যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, তাহা হইতেই প্রাক্তন কর্ম্মফলে এই সব সংস্কারের উদ্ভব হইয়াছে। ধর্ম্মের বা ধর্ম্মোদ্ভব সু-প্রবৃত্তিসমূহের সংস্কার যাহাদের মধ্যে অতি প্রবল ও জাগ্রত, উচ্চতর বুদ্ধি ও মতিগতির প্রভাবে ধর্ম্মানুগ চরিত্রের বিকাশ সহজেই তাঁহাদের মধ্যে হয়। কিন্তু মানবজীবনের বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়া খুব বেশী লোকই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, কেহই একথা ভরসা করিয়া বলিতে পারেন না। কিছু বেশী কি কম, কোনও দিকে কিছু বেশী কি কোনও দিকে কিছু কম, যে রকমেরই হউক, উভয়বিধ সংস্কার এবং তাহাদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্বের ভাবই অধিকাংশ লোকের মধ্যে দেখা যায়। এখন দেখিতে হইবে কিসে এই অধর্ম্মের বা কু-প্রবৃত্তির সংস্কারগুলি ক্রমে ক্ষীণ হইয়া লোপ পায়,—আর ধর্ম্মের বা সু-প্রবৃত্তির সংস্কারগুলি জাগ্রত হইয়া উঠে, কর্ম্মের জীবন্ত নীতি হইয়া দাঁড়ায় এবং এই দ্বন্দ্বে ধর্ম্মের দিকটাই সাধারণতঃ জয়ী হইয়া চলে।

বাল্যাবধি ধর্ম্মকেই লোকে ভাল বলিয়া বুঝিতে শেখে আর মতিগতি সেই দিকে আকৃষ্ট হয়, এমন একটা শিক্ষাদীক্ষার প্রবর্ত্তন যদি লোকসমাজে হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে যদি এমন একটা নীতিপদ্ধতির প্রতিষ্ঠা হয় যাহাতে কর্ম্মজীবনে লোকে ধর্ম্মপথে চলিতেই অভ্যস্ত হইয়া উঠে, এক কথায় ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মানুশীলনের কার্য্যকরী একটা পদ্ধতি সমাজে যদি সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া দাঁড়ায়, তবেই ইহা সম্ভব। ইহারই ফলে ক্রমে সাধারণভাবে সমাজের মধ্যে এমন একটা ধর্ম্মানুগ মনোভাবের (moral বা mental atmosphereএর) সৃষ্টি হয়, যাহার প্রভাবে স্বতঃই সর্ব্বদা এই দিকে মানুষের বুদ্ধি পরিচালিত ও চিত্ত প্রেরিত হইবে।

সাধারণতঃ ধর্ম্মের সেই আদর্শের ধারার মধ্যে জীবন আসিয়া পড়ে, আপনা হইতেই এই ধারা ধরিয়া চলে, সঙ্গে এই আদর্শের ধারার প্রতিষ্ঠাও সমাজে অতি গভীর ব্যাপক হইয়া দাঁড়ায়।

বিদ্যানুশীলন, বিবিধ জ্ঞানবিজ্ঞানের তত্ত্বানুসন্ধান ও ব্যবহারিক প্রয়োগ, রসচর্চ্চা (Æsthetic culture), শিল্পসাধনা, ব্যবসায়বণিজ্যাদির পরিচালনা, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বহু ব্যবহার প্রভৃতি এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা ঠিক ধর্ম্মনীতির বিশিষ্ট অধিকারের মধ্যে আইসে না, এবং ধর্ম্ম-নীতিও অনেক স্থলে এ সব ক্ষেত্রে মানবের স্বাতন্ত্র্যের উপরে কোনও হস্তক্ষেপ করেন না। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি, মতিগতি ও চরিত্রের নীতি আপনাহইতেই যদি এই ভাবে ধর্ম্মানুগত হইয়া উঠে, ধর্ম্মই যদি তাহার জীবনের সকল কর্ম্মের, সকল সুখশান্তি ও আনন্দের প্রধান আশ্রয় হইয়া দাঁড়ায়, এ সব ক্ষেত্রেও তাহার কর্ম্মের ধারা ধর্ম্মকে লঙ্ঘন বড় করে না, আপন হইতেই এমন আদর্শ ধরিয়া চলে, এমন সব রীতিনীতি তাহা হইতে গড়িয়া ওঠে, যাহা কেবল ব্যক্তিগত খেয়ালের তৃপ্তি কি স্বার্থের সিদ্ধির দিকে নয়, লোকসমাজের মঙ্গলের দিকেই সকল প্রচেষ্টাকে, সকল ব্যবহারকে, সাধারণতঃ পরিচালিত করে। বাধ্যতা কেহ কিছুতে অনুভব করে না, লোকের মন আপনা হইতেই এই দিকে প্রেরিত হয়, কর্ম্মের আনন্দ তাহাকে এই পথে এই লক্ষ্যের দিকে লইয়া যায়। এই সব রীতিনীতি এই সব ক্ষেত্রে তখন ঠিক ধর্ম্মনীতির মতই হইয়া দাড়ায়; সহজে কেহ লঙ্ঘন করিতে চাহে না। ধর্ম্মশাস্ত্রও কখনও কখনও শেষে এই সব রীতিনীতিকে আপন অঙ্গভুক্ত করিয়া নেন। মানুষের সকল মনকে এই ভাবে ধর্ম্মানুগত করিয়া তোলা, কর্ম্মজীবনকে, সকল ব্যবহারকে ধর্ম্মের অভ্যাসে স্থির করিয়া নেওয়াই ধর্ম্মনীতির 'স্বধর্ম্ম'। এই 'স্বধর্ম্ম' ধর্ম্মনীতি যে যে সমাজে যত পালন

করিতে পারিয়াছে, তাহার প্রতিষ্ঠা সেখানে তত সার্থক হইয়াছে।

মানুষ ইহার ফলে ধর্ম্মনীতির মূঢ় দাস, তাহার চক্রের প্রাণহীন এক একটি যন্ত্রের মত হইয়া পড়ে, তাহার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের মহিমা আত্ম-বিকাশ লাভ করিবার কোনও অবসর পায় না, ইত্যাদি বহু আপত্তির কথা অনেকে উত্থাপন করিতে পারেন, করিয়াও থাকেন। কিন্তু মানবস্বভাবেরই মূল যে সব সত্যের উপরে যে সব যুক্তির ধারা ধরিয়া এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হইবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহার পর আর এই সব আপত্তি চলে কি? সাধারণ মানবতা (Humanity) হইতে কোনও মানবের ব্যক্তিত্ব একেবারে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র একটা সত্তা নয়। এই যে মানবতার ধর্ম্ম (বা Moral order)—যাহা মানবতাকে তাহার সমগ্রতায় ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহাও ব্যক্তিত্বের ধর্ম্ম হইতে একেবারে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র একটা বস্তু নহে। মোহজাত এই ভেদ বুদ্ধির অপসারণে সমগ্র মানবতা বা মানবসমষ্টির মধ্যে স্বীয় ব্যক্তিত্বের, মানব ধর্ম্মের সঙ্গে আপন ব্যক্তিত্ব-ধর্ম্মের, একত্ব ও সমতা অনুভব করিতে পারা, করিয়া সেই ধর্ম্মের সাধনার ফলে আত্মপ্রসারে সমগ্র মানবতার মধ্যে ব্যক্তিত্বকে, মানবতার ধর্ম্মে ব্যক্তিত্বের ধর্ম্মকে, মিলাইয়া এক করিয়া দিতে পারাই ব্যক্তিত্বের সর্ব্বোচ্চ মহিমা, এবং এই পথই তাহার পথ। ব্যক্তি অন্ধভাবে মূক পশুর ন্যায় এই পথের অনুসরণ করিবে, ইহাও সত্য কোনও ধর্ম্মনীতির লক্ষ্য নহে। ধর্ম্ম কি, অনেকেই তাহা আপনা হইতে বুঝিতে পারে না, বুঝিবার অবসর অনেকের হয় না, প্রবৃত্তির বশে ভুল বুঝিয়া ভুল পথেও অনেকে চলিতে পারে। এইরূপ শিক্ষার ও সাধনার অভ্যাসে ধর্ম্মের পথে চলিয়া তবে অনুভব করে, ইহাই ধর্ম্মের পথ, সুখের পথ, মঙ্গলের পথ। তখন আনন্দে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই এই পথে চলে, ক্রমে উচ্চতর বুদ্ধির উ[illegible]। জ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিতে পায়, যুক্তির বিচারেও ধরিতে পারে, আত্মপ্রতীত ধর্ম্মের পথও এই পথ।

কিন্তু ধর্ম্মের আচার্য্য ও নিয়ন্তৃগণ সর্ব্বত্র ঠিক এই পথে চলেন নাই। ইহা কর, ঈশ্বর এইরূপ আদেশ করিয়াছেন, শাস্ত্র এই বিধি দিয়াছেন, ইহাই তোমার ধর্ম্ম; যদি না কর, পরলোকে নিরয়গামী হইবে, ইহলোকেও এই দণ্ডের ভাগী হইবে, এই ভাবে হুকুমের জোরে, কেবল ধমক দিয়া, ভয় দেখাইয়া, সমগ্র সমাজকেই অনেকে ইহারা ধর্ম্মের একটা কঠোর শাসনে বাঁধিয়া রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। অন্তরের ধর্ম্ম অন্তর হইতে আপনি ফুটিয়া উঠিয়া বাহিরের ধর্ম্মনীতির সঙ্গে আনন্দে কি ভাবে গিয়া মিলিবে, সেরূপ কোনও বিধি-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন ও অবস্থার সৃষ্টি না করিয়া এইরূপ একটা শাসনই কঠোর ভাবে তাহার উপরে চাপাইয়া রাখিতে চাহিয়াছেন। এ চাপে ধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াই উঠিতে পারে না। আত্মধর্ম্মের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মনীতির যোগসূত্র স্বভাবতঃই অনেকে কেন যে ধরিতে পারে না, পূর্ব্বে তাহা দেখিয়াছি। মানুষের সৃষ্ট এইরূপ অবস্থাও তাহার পথে আর একটি বড় অন্তরায়। অজ্ঞতা এবং অজ্ঞতাজনিত ভয় ও মানসিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি যতদিন থাকিবে, ততদিন নিরুপায় ভাবে এই শাসনের চাপ মাথায় বহিয়া লোকে চলিতে পারে। কিন্তু জ্ঞানের আলোকে চক্ষু মুখ একটু ফুটিয়া উঠিলে আর তাহা সম্ভব হইবে না। বিকৃত কি ভ্রান্ত পথানুবর্ত্তী হইলে ত কথাই নাই, নীতি যদি মোটের উপর অবিকৃত ও সত্যানুসারীও হয়, প্রয়োগের এই বিকার, সত্যের এই অপপ্রয়োগ, লোকের চিত্তকে ইহা হইতে বিমুখ করিয়া তুলিবে, বুদ্ধিও বহু কু-তর্কের সৃষ্টি করিয়া বিপথগামী হইবে। মানুষ সব চঞ্চল হইয়া উঠিবে, শাসনকে আর সহিতে পারিবে না, সমস্ত মতিগতি ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহপ্রবণ হইয়া দাঁড়াইবে,—সুযোগ পাইলেই বিদ্রোহী হইবে,—শাসনের এই শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে গিয়া সকল সুনীতির সীমা লঙ্ঘন করিবে, উদ্দাম স্বেচ্ছাচারে একেবারে প্রমত্ত হইয়া উঠিবে। দুর্নীতির পথে অশেষ অমঙ্গল দেখা দিলেও, সমাজবন্ধন একেবারে ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইলেও,

কোনও ধর্ম্ম কি কোনও শক্তিশালী হইবে না আত্মহিতকর কি সমাজস্থিতির অনুকূল কোনও নিয়মসংযমের বশে সহজে ইহাদের আনিতে পারে।

হুকুম-শাসনেরও একটা প্রয়োজন অবস্থাবিশেষে আছে। অতি অজ্ঞ ও অবোধ লোকদের সকল কাজেই হুকুম-শাসনে চালাইতে হয়। মনে এমন দুষ্ট নয় অথচ আচরণে অতি চঞ্চল ও দুরন্ত এক রকমের লোক আছে, শাসনের রশ্মি ছাড়া যাহাদের ভাল পথে বড় রাখা যায় না; অথচ না রাখিতে পারিলে তাহাদেরও ভাল হয় না, আর দশজনও তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণে বহু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাধারণতঃ ইহারা বালকের ন্যায়। বালকদের পক্ষে যেমন হুকুম-শাসনের দরকার অনেক স্থলে হয়, নহিলে নিজেদের ও অপরের বহু বিপদ তাহারা ঘটাইতে পারে,—ইহাদের পক্ষেও সেইরূপ দরকার হয়। তবে প্রথমে হুকুম-শাসনের জোরে ভাল পথে চলিবার অভ্যাস একবার জন্মাইতে পারিলে, শেষে এই অভ্যাসই তাহাদের ভাল পথে অনেকটা রাখিতে পারে, হুকুম-শাসনের প্রয়োজন সর্ব্বদা বড় হয় না। হয়ত জীবন ভরিয়াও ভাল পথের ভালটা ইহারা বুঝিতে পারে না; তবু অভ্যাসের বশে, কতক বা হুকুম-শাসনে, ভাল পথে যদি ইহাদের রাখা যায়, সকলের পক্ষেই তাহাতে ভাল হয়। আবার এমন লোকও আছে, অধর্ম্মের সংস্কারই যাহাদের অন্তরে অতি প্রবল ও জাগ্রত, ধর্ম্মের সংস্কার অতি ক্ষীণ ও দুর্ব্বল। বুদ্ধিতে ইহারা হয়ত হীন নহে; কিন্তু সে বুদ্ধি কেবল পাপের কৌশলই ইহাদের দেখায়; চিত্তের প্রবৃত্তি পাপের পথেই প্রেরিত করে; শক্তি যাহা কিছু আছে পাপপ্রবৃত্তির চরিতার্থতায় ইহারা নিয়োগ করে। সহস্র সুশিক্ষার চেষ্টা ইহাদের বুদ্ধিকে কি মতিগতিকে ধর্ম্মের দিকে আনিতে পারে না। কর্ম্মের অভ্যাস সুনীতির পথে কিছুতেই পরিচালিত হয় না। এইরূপ লোকের সংখ্যা যে কোনও সমাজে অতি বেশী তাহা বলা যায় না। কিন্তু যাহা আছে, তাহাতে বহু অনিষ্ট লোকসমাজের হয়।

হুকুম ইহাদের উপরে চলে না, কারণ কোনও হুকুম ইহারা মানে না। ইহাদের দুর্ব্বৃত্ততা হইতে লোকসমাজকে রক্ষার জন্য কঠোর শাসনেরই প্রয়োজন প্রায়শঃ হয়। ধর্ম্মনীতিকেও এজন্য রাজদণ্ডের সহায়তা নিতে হয়; সামাজিক ধিক্কার কি বহিষ্কার গ্রাহ্যই ইহারা করে না। দুষ্টের দমন তাই রাজধর্ম্মের বড় একটি অঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু দমনের যোগ্য দুষ্টের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ ধর্ম্মনীতিই করে এবং ইহাদের শাসনের অনুজ্ঞা রাজশক্তির উপরে ধর্ম্মনীতি হইতে আইসে। আর এই অনুজ্ঞাই রাজশক্তিকে এই অধিকার দেয়। শাসনে যে ইহারা একেবারে দমিত থাকে, লোকের অনিষ্ট কবিতে পারে না, তা নয়। তবে শাসনের অভাবে বা শৈথিল্যে যতটা পারে, দক্ষ শাসনে ততটা পারে না। মন্দের মধ্যেই সেই-টুকুই ভাল। এই ভালই বা সমাজ কেন উপেক্ষা করিবে?

স্বভাবতঃই এরূপ দুর্ব্বৃত্ত নয়, আবার একেবারে অজ্ঞ কি বর্ব্বর ও দুর্দ্দমও নয়, এরূপ লোকও অনেক আছে,—হুকুম শাসনে তারা ভাল পথে চলে, অন্যথা চলে না। ইহাদের পক্ষেও হুকুম-শাসনের প্রয়োজন হয়।

কেহ বলিতে পারেন, না বুঝিয়া কি ভুল বুঝিয়া, কি বুঝিয়াও দুষ্প্রবৃত্তির বশে, যদি লোকে এমন কুপথে চলে ত চলুক, দুঃখের ভাগী হয় নিজ নিজ কর্ম্মের ফলে নিজেরাই হইবে,—এই দুঃখই কালে তাহাদের শিখাইবে, এ পথ ভাল পথ নহে। তখন ভাল পথ কাজেই তাহারা খুঁজিয়া নিবে। বাহিরের সমাজ কেন হুকুম-শাসনে জোর করিয়া তাহাদের ভাল পথে রাখিতে চাহিবে, মানুষের স্বাধিকরে হস্তক্ষেপ করিবে? কিন্তু সমাজ ত এইরূপ করিয়াই আসিতেছে। করিয়া মোটের উপর মানুষের ভাল বই মন্দও কিছু করে নাই। মানুষকে সকল দুঃখ হইতে বিপদ হইতে রক্ষা করাই সমাজের ধর্ম্ম। দুঃখ কি বিপদ অধর্ম্মের পথে মানুষের যত বেশী ঘটিতে পারে, আর কিছুতে তত পারে কি? এই সব হুকুম-শাসনের উপায়কে

অনেকে বন্ধন বলিয়া থাকেন। হাঁ, এ সব বন্ধন সত্য, কিন্তু মায়া-মোহাদির যে সব বন্ধন মানুষের মনকে এমন ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়া এত দুঃখ তাহাকে দিতেছে, তার অপেক্ষাও কি এ সব বন্ধন বেশী কঠোর, বেশী দুঃখকর? বাহিরের সব বন্ধন বরং লোকে ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু অন্তরের এই সব বন্ধন ছেঁড়া ত এমন সহজ কথা নয়। ধর্ম্মনীতির এই শাসনের বন্ধন বরং উল্টা টানে স্বভাবের এই সব বন্ধনকে শিথিল করিয়া দিয়া প্রকৃত মুক্তির পথে অগ্রসর হইতেই মানুষকে সহায়তা করে। এত সব কেহ স্বীকার করুন কি না করুন, সমাজের নিজের মঙ্গলে, ইহাদের কু-কর্ম্মের ফল হইতে আর দশজনকে রক্ষা করিবার প্রয়োজনেও, যে অন্ততঃ এইরূপ একটা শাসনের অধিকার সমাজের থাকিবে,ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। * তবে হুকুম-শাসনের উপায় অধম উপায় মাত্র। নিতান্ত যে অবস্থায় যতটুকু নহিলে নয়, সেই অবস্থায় ততটুকুর বেশী এই সব উপায় অবলম্বন করা কোথাও কোনও সমাজশক্তির পক্ষে সমীচীন হইতে পারে না।

ইয়োরোপীয় চার্চ্চ যে বহু পরিমাণে এইরূপ অসমীচীন পথে চলিয়াছেন, এবং তাহাই যে ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধে র‍্যাসনালিষ্ট বিদ্রোহের বড় একটি কারণ, একথা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। বেদ স্মৃতি ও সদাচারের সকল অধিকার হইতে মুক্ত থাকিয়া সর্ব্বদা 'মানব স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ' যাহা তাহাই মাত্র করিবে, তাহার মানবত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকারই তাহা এবং তাহাতেই তাহার পরমার্থ লাভ হইবে, এইরূপ মতই র‍্যাসনালিষ্টরা প্রচার করিয়াছেন। আপনার 'হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতঃ' যাহা, তাহা ভিন্ন মানুষের কর্ত্তব্যের (dutyর) ও আর কোনও প্রমাণ তাঁহারা স্বীকার করিতে চাহেন না।

র‍্যাসনালিষ্টরা ব্যক্তিত্বের যে সব অধিকারের কথা প্রচার করেন, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রধানতঃ রাষ্ট্রনীতিতে ও ব্যবসায়নীতিতে তাহার

* ৮৩ ও ১৫১-৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এতদিন হইয়াছে। ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে সাধারণতঃ লোকে প্রচলিত আদর্শের ধারাই অনুবর্ত্তন করিয়া চলিয়াছে,—তাহার উপরে শ্রেয় মনে করিয়া ব্যক্তিত্বের প্রেয়কেই বড় করিয়া তুলিতে চাহে নাই। অর্থাৎ ব্যক্তিগত চরিত্র, স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ, পারিবারিক জীবনের স্থিতি প্রভৃতি বিষয়ে শাস্ত্রবিহিত নীতি ও পরম্পরাগত সদাচারের রীতিকে অবজ্ঞা করিয়া একেবারে স্বাধীনভাবে যার যার অভিরুচিমত চলিতে তেমন কোনও আগ্রহ কি উদ্যম সাধারণ জনসমাজের মধ্যে দেখা দেয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি দিতেছে। মানবজীবনের উপরে ইহার ফল কি দাঁড়াইতেছে, কালে আরও কি দাঁড়াইবে, প্রধান একটি দৃষ্টান্তের আলোচনা হইতেই তাহা আমরা বুঝিতে পারিব।

নারী পুরুষের যৌন সম্বন্ধেরও সামাজিক সম্বন্ধের আদর্শের উপরে সমাজস্থিতি যত বেশী নির্ভর করে, এত যে আর কিছুর উপরেই করে না, ইহা ধীরবুদ্ধি সকলেই স্বীকার করিবেন। পারিবারিক বা সাংসারিক জীবনেই এই আদর্শের প্রতিষ্ঠা প্রধানভাবে দেখা যায়। দাম্পত্য-সম্বন্ধে মিলিত নারী ও পুরুষ এবং তাহাদের প্রতিপাল্য সন্তানসন্ততি লইয়া মুল এক একটি পরিবার বা সংসার হয়। নিসর্গের বিধানে নারীকেই সন্তান গর্ভে ধারণ করিতে হয়, এবং স্তন্যদানে পালন করিতে হয়। একটির পর একটি করিয়া এই ভাবে বহু সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়া তাহাদের লালনপালনের দায়িত্ব নারীকে নিতে হয়। আবার মানবশিশু স্তন্যত্যাগের পর অমনই নিজের শক্তিতে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। বহু বৎসর তাহার লালনপালনের ভার অপর কাহারও গ্রহণ করা আবশ্যক। নিজের মাতা বা তাঁহার অভাবে মাতৃস্থানীয়া অপর কোনও নারীই যে এই ভার-গ্রহণের যোগ্যতমা পাত্রী ইহা বলাই বাহুল্য। স্বাভাবিক স্নেহের বশে আনন্দে এই ভার মাতারা সকলে গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং ইহার জন্য দৈহিক ও মানসিক কোনও ক্লেশকেই ক্লেশ বলিয়া মনে করেন না। এই স্নেহের প্রেরণা মাতার অন্তর্নিহিত

স্বাভাবিক ধর্ম্মেরই প্রেরণা এবং অসহায় মানবশিশুকে মাতার স্নেহ-কোমল আশ্রয়ে রক্ষা করিয়া ইহাই লোকস্থিতিকে রক্ষা করিতেছে। যত স্বস্তিতে ও শান্তিতে নিশ্চিন্ত ভাবে তিনি মাতৃত্বের এই দায়িত্ব ও ধর্ম্ম পালন করিতে পারিবেন, সন্তানের পক্ষে ও সাধারণ লোক-স্থিতির পক্ষে ততই তাহা মঙ্গলকর হইবে। নারীর নিজের পক্ষেও তাহা সুখের বই দুঃখের কোনও অবস্থা হইতে পারে না। এই স্বস্তি, শান্তি ও নিশ্চিন্ততা নারীর পক্ষে সম্ভব হইতে পারে, কর্ম্মক্ষম কোনও পুরুষ যদি তাহার ও তাহার গর্ভজাত সন্তানদের ভরণপোষণ ও রক্ষণা-বেক্ষণের ভার গ্রহণ করে; এবং এই ভার গ্রহণেরও যোগ্যতম পাত্র সেই সব সন্তানদের পিতা। যেমন মাতার অন্তরে,তেমনই পিতার অন্তরেও স্বাভাবিক একটা অপত্যস্নেহের প্রেরণা আছে, এবং এই প্রেরণার বশে খাওয়াইয়া পরাইয়া আপন আপন সন্তানদের সুখে রাখিবার জন্য পিতারাও বহু শ্রমক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকেন, আপদ বিপদ হইতে তাহাদের রক্ষার জন্য অনায়াসে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারেন। এই ভাবে পিতা ও মাতা উভয়ের সমবেত স্নেহে ও যত্নে মানবশিশু মানুষ হইয়া উঠিতেছে। পিতা সাধারণতঃ বাহিরের কাজকর্ম্মে অর্থো-পার্জ্জন করেন এবং মাতা গৃহে থাকিয়া সন্তানপালন ও গৃহস্থালীর অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। সন্তান-পালন গৃহে থাকিয়াই করিতে হয় এবং গৃহস্থালীর বেশীর ভাগ কাজই এই সম্পর্কিত কাজ। স্বামী ও অন্যান্য পরিজনগণের আহারবিরামাদির সুব্যবস্থা প্রভৃতি আর যাহা কিছু কাজ হইতে পারে, এক সঙ্গে নারীর পক্ষেই করা সুবিধা বলিয়া গৃহকর্ম্ম বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, সব নারীর হাতেই আসিয়া পড়িয়াছে। দাম্পত্যসম্বন্ধে মিলিত নারী-পুরুষের মধ্যে সাংসারিক কর্ম্মের এইরূপ একটা ভাগ আপনা হইতেই ঘটিয়াছে এবং উভয় পক্ষই বহু সুবিধা তাহাতে ভোগ করিতেছে। বৈষয়িক কর্ম্মে অধিকাংশ পুরুষকেই বাহিরে এত ব্যাপৃত থাকিতে হয়, এত পরিশ্রম অনেক সময়ে করিতে হয়, যে তাহার পর আবার গৃহে কোনও শৃঙ্খলা মত নিজেদের ও

প্রতিপাল্য অপর কোনও ব্যক্তির আহারাদির ও আরামবিরামের ব্যবস্থা তাহারা করিয়া নিতে পারে না। নারীদের হাতে এই সব কার্য্যের ভার থাকায় অবসরকালে গৃহে ফিরিয়া অনায়াস-লব্ধ স্বচ্ছন্দ আহার-বিশ্রাম কেবল নয়, আরও বহুবিধ তৃপ্তি ও আনন্দ তাহারা ভোগ করিতে পায়। গৃহিণীর অভাবে বেতনভোগী দাসদাসীর উপরে যেখানে নির্ভর করিতে হয়, সেখানে কোনওরূপ শৃঙ্খলামত এই সব স্বচ্ছন্দতা ও আনন্দ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। অধুনা বড় বড় সব নগরে হোটেলাদির বহু ব্যবস্থা হইয়াছে; তাহাতে বাঁধা একটা নিয়মে আহারাদি-সম্বন্ধীয় কতক গুলি প্রয়োজন লোকের সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু পারিবারিক জীবনের অন্য কোনও আনন্দলাভের সম্ভাবনা সেখানে কিছু নাই। সুতরাং বৈষয়িক কর্ম্মে ধনার্জ্জনের কর্ত্তা বলিয়া পুরুষের জীবন যতই শ্লাঘ্য বলিয়া মনে হউক, গৃহে এই ধনসুলভ যাবতীয় সুখের জন্য ও ধনসাধ্য যাবতায ধর্ম্মপালনের সফলতার জন্য, নারীর উপরে তাহাকে নির্ভর করিতেই হইবে। নতুবা এই ধনার্জ্জন তাহার পক্ষে বলদের ন্যায় বৃথা ভার বহন মাত্র হইয়া পড়ে।

তারপর নারাব কথা; পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাংসারিক জীবনে নারীর প্রধান দায়িত্ব, প্রধান ধর্ম্ম—মাতৃত্বের দারিত্ব, মাতৃত্বের ধর্ম্ম, এবং এই ধর্ম্ম সে যথাযোগ্য ভাবে পালন করিতে পারে না, যদি না কোনও পুরুষ তাহার ও তাহার সন্তানদের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করে। এক একটি সন্তান যখন তাহাকে গর্ভে ধারণ করিতে হয়, এবং স্তন্যদানাদি কর্ম্মে অতি সাবধানে পালন করিতে হয়, বাহিরের কোনও কঠোর শ্রমসাধ্য কাজ সে করিতে পারে না। অন্ততঃ এই সময়ের জন্য পুরুষ কাহারও রক্ষণাবেক্ষণাদির উপরে নির্ভর তাহাকে করিতেই হইবে। যে সব বৈষয়িক কর্ম্মে মানুষ ধনার্জ্জন এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজ রক্ষার উপযোগী রাষ্ট্রীয়,নাগরিক ও ব্যবসায়িক (political, civic and economic) কর্ম্মাদিও নির্ব্বাহ করে, অনেক স্থলেই তাহাতে যেমন কঠোর দৈহিক ও মানসিক শ্রমের প্রয়োজন

হয়, তেমনই অক্ষুণ্ণ একটা ধারাবাহিকতা (steady and unbroken continuity) রক্ষা করিয়াও চলিতে হয়। অন্য সময় পারিলেও, পূর্ণগর্ভা ও নবপ্রসূতি নারীর পক্ষের এই সব কর্ম্মের সকল দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। তাই সামাজিক সুব্যবস্থা (social economy) সাধারণতঃ পুরুষের উপরে এই সব কর্ম্মের ভার রাখিয়া গৃহকেই নারীর প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, এবং এই ক্ষেত্রে নারী যাহাতে স্বস্থ ভাবে তাহার কর্ম্মের ভাগ নির্ব্বাহ করিতে পারে, তার জন্য তাহার ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও পুরুষের উপরে অর্পিত হইয়াছে। সামাজিক এই সুব্যবস্থা (social economy) সমাজধর্ম্ম বা social policyরই একটি অঙ্গ।

এক একটি নারী ও পুরুষ এই ধর্ম্মে যার যার বিহিতকর্ম্মের ভাগ সম্পাদন করিয়া একত্র মিলিয়া থাকিতে পারিলেই পূর্ণ এক একটি পরিবার বা সংসারকেন্দ্র হয়, এবং সন্তানসন্ততিরাও তাহার মধ্যে পিতা মাতা উভয়ের সমবেত স্নেহযত্নে সুখে মানুষ হইয়া উঠে। একা পুরুষ কি একা নারী—নিজ নিজ শ্রমে জীবন ধারণ করিতে পারে বটে, কিন্তু গৃহস্থ ও গৃহিণীরূপে উভয়ের এইরূপ মিলন ব্যতীত এবং মিলন-প্রসূত সন্তানসন্ততির প্রতিপালনের ভার যথাযোগ্যভাগে আনন্দে উভয় পক্ষেরই গ্রহণ ব্যতীত সংসার হয় না। সন্তানসন্ততিরাও সমাজের বুকে ভাসিয়া বেড়ায়, আপন বলিয়া স্নেহের আশ্রয় কোথাও পায় না, যথোচিত ভাবে মানুষ হইয়াও উঠিতে পারে না। মানবের বংশানুক্রমিক জীবনধারা এ অবস্থায় সুব্যবস্থিত ভাবে চলে না, এবং কোনও সমাজও তাহার বিশিষ্ট কোনও ধর্ম্মে সুস্থিত থাকে না। অনেক ধর্ম্মশাস্ত্র তাই দাম্পত্যবন্ধনে সাংসারিক জীবনে মিলিত নর-নারীকেই পূর্ণ মানব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নতুবা কি পুরুষ কি নারী প্রত্যেকেই অর্দ্ধেক, পূর্ণ কেহই নহে। এদেশের পুরাণে একটি আখ্যায়িকা আছে,—লোক-পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার দেহের একার্দ্ধ হইতে স্বায়ম্ভুব মনুকে এবং অপরার্দ্ধ হইতে শতরূপাকে সৃষ্টি করেন,

এবং ইহাদের মিলন হইতেই জীবসৃষ্টি আরম্ভ হয়। সমগ্র জীবসংঘাতে তাঁহারই যে মূর্ত্তি অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহারই একার্দ্ধ পুং-বর্গ এবং অপরার্দ্ধ স্ত্রী-বর্গ। স্বয়ম্ভুব মনু ও শতরূপা উভয়ার্দ্ধেরই আদিবীজ। মানবতায় এই পার্থিব জীব-জীবন পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, এবং এক একটি সংসারে সংসারধর্ম্মে মিলিত পুরুষ ও স্ত্রী ব্রহ্মার দেহার্দ্ধভাগী স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপারই প্রতিরূপ; এবং এই মিলনে দুই অর্দ্ধের যোগে একত্বের পূর্ণতার উপরেই সংসারের স্থিতি নির্ভর করে। ব্যষ্টিভাবে যাহা সংসার-স্থিতি, সমষ্টি ভাবে তাহাই সমাজ-স্থিতি, এবং উভয়বিধ স্থিতিই, স্ত্রীপুরুষ উভয় পক্ষের অন্তরঙ্গ মিলনে, পরস্পরের সাপেক্ষতায় ও সহায়তায়, যার যার ধর্ম্ম পালনের ও কর্ম্মের ভাগ সম্পাদনের উপরে নির্ভর করে।

এই সব কারণে দাম্পত্যমিলনের স্থায়িত্ব বা যত দূর সম্ভব স্থিরতার একটা গুরু প্রয়োজন সর্ব্বত্র অনুভূত হইয়াছে, এবং সমাজ-জীবনের উন্নতির সঙ্গে ইহার যথোচিত বিধিব্যবস্থাও সকল সমাজের ধর্ম্মনীতির মধ্যে দেখা দিয়াছে। বাহির হইতে ধর্ম্ম যেমন দাম্পত্যজীবনের এইরূপ একটা আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, দম্পতির অন্তর হইতে দাম্পত্যপ্রেমও তেমন দম্পতিকে এই আদর্শের অনুবর্ত্তী করিয়া তুলিয়াছে। সামাজিক ধর্ম্ম বা moral orderএর অঙ্গীয় যে দাম্পত্যধর্ম্ম, দাম্পত্য এই প্রেম দম্পতির অন্তরে তাহারই প্রতিরূপ, অথবা অন্তরস্থিত সেই ধর্ম্মের ধারক ও আশ্রয়। সন্তানসন্ততির জন্মের পর অপত্যস্নেহ ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়া এই প্রেমকে আরও গাঢ় ও মধুর, দাম্পত্যের সম্বন্ধকে আরও ঘনিষ্ঠ করিয়া তোলে। সন্তানসন্ততি-পরিবৃত পরিণতবয়স্ক দম্পতির মধ্যে স্নেহপ্রীতির সম্বন্ধে মমত্বের যোগ যত গভীর দেখা যায়, যত আপন তাহারা হইয়া পড়ে, এরূপ একটা মমত্বের যোগ, আপন আপন ভাব, কোনও অবস্থায় দুইটি মানবের মধ্যে প্রকাশ পায় না। উভয়ের মধ্যে সকল বিষয়ে ভাবের কি চিন্তার কি কর্ম্মের সমতা সর্ব্বদা থাকে না, বিষমতাহেতু কলহও

মধ্যে মধ্যে ঘটে। কিন্তু এই মমতার যোগ তাহাতে তাকে নাড়ে প্রাণে প্রাণে উভয়ের মধ্যে যে বাঁধন পড়িয়া গিয়াছে, তাহা ছিন্ন করিবার প্রবৃত্তিও কাহারও হয় না। অবশ্য স্বাভাবিক ও স্বচ্ছ অবস্থায়, দাম্পত্যপ্রেমের প্রেরণায় দাম্পত্যধর্ম্ম যাঁহারা আনন্দে পালন করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের দাম্পত্যজীবনেই এই সব লক্ষণ দেখা যাইবে। ইহার অভাব বা বিপরীত ভাব যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা বহু প্রতিকুল কারণজাত বিকারের লক্ষণ, স্বাভাবিকতার বা স্বস্থতার লক্ষণ নহে।

মানবের অন্তরে যে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুগ চিত্তবৃত্তির প্রেরণা রহিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও কেন যে ধর্ম্মনীতির একটা প্রতিষ্ঠা সমাজে প্রয়োজন হয়, কিছু পূর্ব্বে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। অন্যান্য বিষয়ে যেমন, দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধেও তেমনই ধর্ম্মনীতির একটা আদর্শের ধারা সমাজে প্রবর্ত্তিত হয়, এবং দাম্পত্য জীবনও যাহাতে এই আদর্শের ধারার মধ্যে আসিয়া পড়ে, সহজে ইহার পথে চলিতে অভ্যস্ত হয়, তাহারও যথোচিত ব্যবস্থা লোকসমাজে থাকা একান্ত আবশ্যক। অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা ইহার প্রয়োজন বরং অনেক বেশী; কারণ ইহার উপরে সংসারধর্ম্মের সুস্থিতি এবং তাহা হইতে সমাজের সুস্থিতি যত নির্ভর করে, এত বোধ হয় আর কিছুর উপরেই করে না, আর এই সম্বন্ধে মানবের ভোগপ্রবৃত্তি যত তাহাকে বিপথে লইয়া যাইতে পারে, এতও বোধ হয় আর কিছুতে পারে না।

যৌনসম্বন্ধ দাম্পত্যসম্বন্ধের মধ্যে অতি প্রধান একটি ভাব। ইহাই মানবে মানবে অন্য যত রকম সম্বন্ধ হইতে পারে, তাহা হইতে দাম্পত্যসম্বন্ধকে বিশিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহার ঘনিষ্ঠতাকেও এত বেশী গাঢ় করিয়া তুলিয়াছে। যৌন-লালসা মানবস্বভাবের অতি প্রবল একটি লালসা। একদিকে যেমন ইহা নরনারীকে যৌন-সম্বন্ধে মিলিত করিয়া সৃষ্টিধারা রক্ষা করিতেছে, অন্যদিকে আবার অসংযত যথেচ্ছাচারে প্রশ্রয় পাইলে ইহা হইতে যে সব কদাচার ও

দুর্নীতি দেখা দেয়, তাহাতে সংসারস্থিতি দূরে থাক্, সমাজস্থিতিও রক্ষা পায় না।

যৌন-সম্বন্ধে মিলিত নরনারী একটা নিয়ম-সংযমের মধ্যে থাকিয়া, সংসারধর্ম্ম পালন করিতে পারে, তাহাদের এই মিলন কেবল যৌন-লালসার সাময়িক একটা তৃপ্তির হেতু না হইয়া, স্থায়ী ভাবে পূর্ণ মানবতার সকল ধর্ম্মপালনের সহায় হইতে পারে, দাম্পত্য জীবনের লক্ষ্যই ইহা এবং এই ভাবেই ধর্ম্মনীতি দাম্পত্যজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছে।

স্বজনগণের অনুমোদিত ধর্ম্মবিহিত একটা অনুষ্ঠানেই সর্ব্বত্র নরনারীকে দাম্পত্যসম্বন্ধে প্রথম মিলিত করা হয়। বৈবাহিক এই মিলন যে কেবল ব্যক্তিগত সুখসুবিধার একটা বন্দোবস্ত নয়, সামাজিক ভাবেও ইহার বড় একটা গুরুত্ব আছে, সমাজধর্ম্মের সঙ্গে ইহার একটা ধর্ম্মের যোগ আছে, এই প্রথা তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে। এই গুরুত্ব, এই যোগের তাৎপর্য্য, যাহাতে নবপরিণীত দম্পতি অনুভব করিতে পারে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বিবাহ-পদ্ধতি সর্ব্বত্র প্রণীত হইয়াছে *।

দাম্পত্যমিলনের পক্ষে এইরূপ একটা অনুষ্ঠানপদ্ধতির অত্যাবশ্যকতা এমনই ভাবে সকল সমাজে স্বীকৃত হইয়াছে, যে ইহা ব্যতীত যৌন সম্বন্ধে কোন নরনারী মিলিত হইলে তাহাকে বৈধ বা ধর্ম্ম-সঙ্গত মিলন বলিয়া কোথাও কেহ স্বীকার করিতে চায় না, পাপ বলিয়াই সকলে ঘৃণা করে, এবং এইরূপ সম্বন্ধে মিলিত নরনারী বা তাহাদের সন্তানসন্ততিদেরও কোনও স্থান শিষ্ট সমাজে হয় না। যাহারা মিলিত হয়, নিজেরাও তাহারা ইহার গ্লানি বড় তীব্র ভাবে অনুভব করে। করে যে, কেবল সামাজিক লাঞ্ছনাই তাহার কারণ নহে, অন্তরের ধর্ম্মই ব্যথা দিয়া এই সত্য তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম করায়—ইহা পাপ, ইহা

* Civil marriageএর যে একটা প্রথা আছে, তাহা সাধারণ নিয়ম নহে, একটা ব্যতিরেক মাত্র।

কদাচার। সামাজিক কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া, ধর্ম্মের পথেও অনেক সাধুকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়। কিন্তু সে লাঞ্ছনায় আনন্দ বই কোনও আত্মগ্লানি কেহ কখনও কখনও অনুভব করেন না।

এই ভাবে এই সব কারণে বিবাহ প্রথা সকল সমাজের ধর্ম্মনীতিতেই স্থায়ী একটা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, এবং এই প্রতিষ্ঠানকে মানিয়া চলিবার দিকেই সাধারণতঃ লোকের মতিগতি সর্ব্বত্র দেখা যায়। তাহা যাইত না, যদি না ইহার মাঙ্গল্য আপন আপন অন্তরের ধর্ম্মেই সকলে অনুভব করিত। যেমন এই প্রথাকে লোকে মানিয়া চলে, তেমনই দাম্পত্যজীবনে পরস্পরের সম্বন্ধে যে সুনীতির আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বদা লোকে মানিয়া চলিতে পারুক না পারুক, মানিয়া চলাই ধর্ম্মসঙ্গত আচরণ বলিয়া স্বীকার করে। কতক পরিমাণে এতৎ সম্বন্ধীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি সমাজ উপেক্ষা করিয়া চলিলেও, সংসার-স্থিতি ও সমাজ-স্থিতির পক্ষে যে সব নীতি অত্যাবশ্যক তাহা কেহ লঙ্ঘন করিলে, উপেক্ষা করিতে পারে না, করেও না। সামাজিক শাসনে বা রাজদণ্ডে ইহাদের দমনের ব্যবস্থাও সর্ব্বত্র দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, স্বামীর পক্ষে দাম্পত্য ধর্ম্মের বড় একটি কর্ত্তব্য এই, যে স্ত্রীকে ও তাঁহার গর্ভজাত সন্তানসন্ততিকে গৃহে রাখিয়া তিনি প্রতিপালন করিবেন। যদি কোনও স্বামী সামর্থ্য সত্ত্বেও তাহা না করেন, এবং সামাজিক শাসন যদি তাঁহাকে এই কর্ত্তব্যপালনে বাধ্য করিতে না পারে, রাজশাসন করে। গৃহে যদি স্ত্রীর উপরে তিনি কোনও অত্যাচার করেন, স্ত্রী তাঁহার গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্তানসন্ততি সহ অন্যত্র গিয়া থাকিতে পারেন, এবং সেখানেও তাঁহার প্রতিপালনের জন্য অর্থের যাহা আবশ্যক হইতে পারে, স্বামীকেই দিতে হয়। সাধুশীলা স্ত্রীকে ত্যাগ করিলেও তাঁহার প্রতিপালনের দায়িত্ব কোনও স্বামী ত্যাগ করিতে পারেন না। স্বামীর পক্ষে এই দায়িত্ব আছে।

কিন্তু স্ত্রীর পক্ষে এরূপ কোনও দায়িত্ব থাকিতে পারে, এরূপ একটা ইঙ্গিতও কোনও ধর্ম্মনীতির মধ্যে দেখা যায় না। স্ত্রীর নিজস্ব কোনও ধনসম্পত্তি স্বেচ্ছায় না দিলে কোনও স্বামী তাহা দাবী করিয়া নিতে পারেন না, এইরূপ নিয়মই বরং অধিকাংশ সমাজে দেখা যায়।

দাম্পত্যধর্ম্মের আর একটি বড় কথা দাম্পত্য-যৌনসম্বন্ধের একনিষ্ঠতা। এই একনিষ্ঠতার উপরে দাম্পত্যজীবনের স্থিরতা ও সংসারস্থিতি যে কত বেশী নির্ভর করে, তাহা বলিয়া কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। দাম্পত্যধর্ম্মের পবিত্রতার আদর্শই হইয়াছে যৌনসম্বন্ধে এই একনিষ্ঠতা। কিন্তু এসম্বন্ধে আবার পুংধর্ম্মের ও স্ত্রীধর্ম্মের আদর্শের মধ্যে একটা পার্থক্যের ভাব সর্ব্বত্রই দেখা যায়। অনেক সমাজেই পুরুষের পক্ষে একাধিক পত্নী গ্রহণের রীতি আছে, এবং ইহাকে তেমন একটা সুপ্রথা বলিয়া গণ্য না করিলেও বড় একটা অস্বাভাবিক কুপ্রথা বা অধর্ম্ম বলিয়াও কেহ মনে করেন না। কিন্তু নারীর পক্ষে একাধিক পতিগ্রহণের দৃষ্টান্ত অতি বিরল, এবং দুই এক স্থলে দৃষ্টান্ত যাহা পাওয়া যায়, তাহাকেও অতি অস্বাভাবিক (abnormal) একটা কুপ্রথা বলিয়াই সকলে মনে করেন।

তারপর ব্যভিচারের কথা। এইরূপ ব্যভিচার পুরুষের পক্ষে সর্ব্বত্রই অবশ্য নিন্দনীয়, কিন্তু একেবারে অমার্জ্জনীয় বা দণ্ডের যোগ্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না, যদি না অপর কাহারও ধর্ম্মপত্নী বা অপ্রাপ্তবয়স্কা অনূঢ়া কন্যার সঙ্গে এই ব্যভিচার তাহার ঘটে। কিন্তু স্ত্রীর পক্ষে এই ব্যভিচার চরম পাপ এবং অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়াই সকল সমাজে গণ্য হইয়াছে। ইয়োরোপায় খৃষ্টীয় সমাজে পুরুষ কি নারী কেহই এক স্ত্রী বা স্বামী বর্ত্তমানে অপর কোনও স্ত্রী কি স্বামীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধে যুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু ডাইভোর্স বা বিবাহসম্বন্ধ-খণ্ডনের যোগ্য অপরাধের গণনায় একটা তারতম্য আছে। যেমন ইংলণ্ডের আইনে এই আছে, যে স্ত্রীর পক্ষে

কেবল যৌনব্যভিচারই যথেষ্ট অপরাধ। কিন্তু পুরুষের পক্ষে যৌনব্যভিচার কেবল নয়, তার সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার ও স্ত্রী ত্যাগ ইহার একটি অপরাধও প্রমাণিত না হইলে; কোনও স্ত্রী বিবাহবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন না *। নারীর পক্ষে বৈবাহিক সম্বন্ধে ও যৌন সম্বন্ধে এই একনিষ্ঠতা সাধারণতঃ সতীত্ব ধর্ম্ম নামে পরিচিত। স্ত্রীর পক্ষে ইহা অলঙ্ঘনীয় ধর্ম্ম হইবে এবং পুরুষের পক্ষে হইবে না, এইরূপ বিধিকে অনেকেই অন্যায় ও অবিচারপ্রসূত বিধি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সংসারস্থিতির দিক হইতে যদি আমরা ইহার আলোচনা করি, তবে এরূপ অন্যায় কি অবিচার-প্রসূত বলিয়া ইহা মনে হইবে না। স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানসন্ততিবর্গের প্রতিপালনের ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার পিতাকে গ্রহণ করিতে হয়। অপত্য-স্নেহের প্রেরণায় এবং স্বাভাবিক একটা দায়িত্বের বোধেই সাধারণতঃ সকল পিতা স্বেচ্ছায় ও আনন্দে এই সব কর্ত্তব্যপালন করিয়া থাকেন। না করিলে সমাজশক্তি তাঁহাকে ইহাতে বাধ্য করিতে পারে, বাধ্য করিয়াও থাকে। কিন্তু এই সব সন্তান যে তাঁহারই ঔরসজাত, এসম্বন্ধে কোনও নিশ্চয়তা না থাকিলে অপত্যস্নেহের প্রেরণা কি দায়িত্বের বোধ কিছুরই সম্ভাবনা থাকে না, এবং স্ত্রীর পক্ষে পুরুষ-বিশেষের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধের কি যৌন সম্বন্ধের একনিষ্ঠতা ব্যতীত এরূপ কোনও নিশ্চয়তাও সম্ভব নহে। তা যদি না সম্ভব হয়, তবে কোন নারীর গর্ভজাত সন্তানদের পিতৃত্ব ও প্রতিপালনের দায়িত্ব কোনও পুরুষ স্বীকার করিতে পারে না, এবং সমাজশক্তিও ন্যায়তঃ কাহাকেও এই দায়িত্ব পালনে বাধ্য করিতে পারেন না। পরস্পরের সম্বন্ধে স্বামী ও স্ত্রী এবং উভয়ের সমান সন্তানসন্ততিদের লইয়া কোনও সংসার এ অবস্থায় হইতে পারে না, এবং পিতৃপরিবার কি পিতৃবংশের কোনও পরিচয়ও কাহারও হয় না।

* এতদিন আইন এইরূপই ছিল। সম্প্রতি যৌন ব্যভিচার উভয়ের পক্ষেই ডাইভোর্সের সমান হেতু হইবে, এইরূপ আইন হইবার কথা হইতেছে।

সন্তানগণের প্রতিপালনের সকল দায়িত্ব এ অবস্থায় উপরেই গিয়া পড়িবে। সন্তান গর্ভে ধারণ ও [illegible] তাহাদের লালন পালন ত আছেই, তাহার [illegible] কাজকর্ম্মে ধনসংগ্রহও নারীকে নিজের শ্রমে করিতে হইবে। পুরুষ যথেচ্ছ ভাবে সন্তানের জনক হইয়াও তাহাদের প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের সকল দায়িত্ব হইতে মুক্ত থাকিবে! ইহাকে ন্যায়-সঙ্গত সুব্যবস্থা বলিয়া কেহ স্বীকার করিতে পারেন না। নারী জীবনের সুখস্বচ্ছন্দতাও ইহাতে অনেক কমিবে বই কিছু বাড়িবে না।

নারীকে এত বড় কঠিন দায়িত্ব হইতে মুক্ত রাখিবার মাত্র দুইটি উপায় হইতে পারে। এক তাহার ভ্রাতারা তাহার সন্তানগণের পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু স্নেহে কি দায়িত্ববোধে মাতুল কখনও পিতার সমান হয় না। আর, সমাজের সমান সন্তান বলিয়া নারীগণের গর্ভজাত সকল বালকবালিকার প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষাদানের ভার সমাজ গ্রহণ করিতে পারেন, যেমন নাকি সোসিয়ালিষ্ট ও এনার্কিষ্টরা কল্পনা করিতেছেন। কিন্তু এরূপ একটা অবস্থা সমাজের পক্ষে এবং ব্যক্তিগত ভাবেও মানবজীবনের—বিশেষ শিশুজীবনের পক্ষে, সুখের কি মঙ্গলের অবস্থা হইবে, ধীরবুদ্ধি ও চিন্তাশীল কেহই বড় একরূপ মনে করিতে পারেন না। পূর্ব্বে সোসিয়ালিজমের প্রসঙ্গে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তারপর আর কোনও আলোচনাও এ সম্বন্ধে নিষ্প্রয়োজন।

স্বামী, স্ত্রী ও তাঁহাদের সমান সন্তানসন্ততিদের লইয়া একটি সংসার হইবে, এবং এই সংসারে উভয়েই উভয়ের ন্যায্য কর্ম্মের ভাগ ধর্ম্ম বলিয়া পালন করিবে। এরূপ থাকিবে, ইহাই যে স্বাভাবিক অবস্থা, ইহাই যে moral order বা মানবধর্ম্মের অনুগত ব্যবস্থা, তাহার আর একটি বড় প্রমাণ—পৃথিবীর সকল সমাজেই মোটামুটি এইরূপ আদর্শেই সংসারজীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, এই আদর্শেই বরাবর স্থির রহিয়াছে,

এবং এই আদর্শ ব্যতীত সংসারজীবনের আর কোনও আদর্শই হইতে পারে না। সুতরাং ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে, যে গৃহিণী ও জননী রূপে সাংসারিক জীবনে নারীর শ্রেষ্ঠ ও অলঙ্ঘনীয় ধর্ম্ম বৈবাহিক ও যৌন সম্বন্ধে একনিষ্ঠতা, সাধারণতঃ যাহা সতীত্ব ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত। সমাজজীবনের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে অভিব্যক্ত সামাজিক ধর্ম্মনীতির মধ্যে সর্ব্বত্র এই নির্দ্দেশই আমরা দেখিতে পাই। নারীর স্বভাবেও সাধারণতঃ এই ধর্ম্মের বীজ বা সংস্কার রহিয়াছে, এবং তাহারই প্রভাবে বাস্তবজীবনে নারী চরিত্রের বিশেষত্ব সহজেই এই আদর্শে বিকাশ লাভ করে।

কিন্তু সতীত্ব-ধর্ম্মের আদর্শ সকল দেশে মাত্রায় ঠিক সমান নহে। হিন্দুসমাজে অধুনা স্ত্রীর পক্ষে এই একনিষ্ঠতার নীতি এরূপ একটা চরমে উঠিয়াছে, যে বিধবা কি পতিবর্জ্জিতা নারীরও পত্যন্তর গ্রহণ সাধারণতঃ অনুমোদিত হয় না। বিবাহবন্ধনই হিন্দুসমাজে অচ্ছেদ্য বন্ধন বলিয়া সাধারণতঃ গণ্য হয়। তবে পুরুষের পক্ষে একাধিক পত্নী-গ্রহণ অধর্ম্ম বা অবৈধ নয় বলিয়া, তাহাদের পক্ষে কোন অবস্থাতেই তেমন অসুবিধা কিছু হয় না। কিন্তু নারীর একবার বিবাহ হইয়া গেলে আর বিবাহ হয় না, কারণ একাধিক পতিগ্রহণ তাহার পক্ষে বিহিত নহে। কিন্তু অন্যান্য সমাজে বৈবাহিক সম্বন্ধ দুশ্ছেদ্য হইলেও একেবারে অচ্ছেদ্য বন্ধন নহে। এক পক্ষের মৃত্যু হইলে বিবাহ বন্ধন আর থাকে না। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ডাইভোর্স বা বিবাহবন্ধন খণ্ডনের ব্যবস্থাও আছে। সুতরাং বিধবা অথবা ডাইভোর্সের পর বিবাহ বন্ধন-হইতে বিমুক্তা নারী আবার বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু সকল অবস্থাতেই, যখন যে পুরুষের বিবাহিতা পত্নী সে, তাহাকে ব্যতীত পুরুষান্তরের সঙ্গে কোনওরূপ যৌনসম্বন্ধ তাহার পক্ষে অধর্ম্ম ও অবিধি। সতীত্ব ধর্ম্মের আদর্শ এই সব সমাজে এইরূপ। যেরূপ আদর্শেরই হউক, নারীর পক্ষে যৌনসম্বন্ধের একনিষ্ঠতা বা সতীত্ব অপরিহার্য্য ধর্ম্ম বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন।

ইহার কিছু ব্যতিক্রমও যে কোথাও কোথাও না দেখা যায়, তাহা নয়। কিন্তু তাহা হয় আদিম অবস্থার লক্ষণ, নয় বিকারের লক্ষণ; অথবা বিশেষ কোনও অবস্থার প্রভাবে দুই একটা ব্যতিরেকের দৃষ্টান্ত, সকল সাধারণ নিয়মের মধ্যেই ব্যতিরেক যেমন দেখা যায়। *

স্বামীর প্রতি আন্তরিক একটা প্রেম ও শ্রদ্ধা ব্যতীত সতীত্বের কোনও অর্থ নাই, রীতি মানিয়া কেবল দৈহিক পবিত্রতা রক্ষাতেই সতীত্বধর্ম্ম পালিত হয় না, এইরূপ একটা কথা অধুনা অনেকে বলিয়া থাকেন। স্বামীর প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধা যে সতীত্বধর্ম্মের প্রধান আশ্রয় এবং চরিত্রের বহু গুণ ব্যতীত স্ত্রীর এই প্রেম ও শ্রদ্ধাও যে কোনও স্বামী সহজে আকর্ষণ করিতে পারেন না, ইহা সত্য। কিন্তু এই পবিত্রতা ব্যতীত যখন সংসারধর্ম্মই থাকে না, সন্তানসন্ততিরও মঙ্গল হয় না, তখন যে কোনও অবস্থাতেই ইহা রক্ষা করিয়া নারীকে চলিতে হইবে। তাই মনের গতি যেরূপই হউক, অন্ততঃ দৈহিক এই পবিত্রতাই সতীত্ব-ধর্ম্মের অলঙ্ঘনীয় সীমা বলিয়া সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে।

দাম্পত্য-প্রেমের অভাবে পুরুষ কি নারী কাহারও পক্ষেই সংসারজীবন সুখের হয় না, এবং বিবাহিত দম্পতির মধ্যে এইরূপ প্রেমের অভাব যে অনেক স্থলে না দেখা যায়, তাহা নয়। প্রাগ্

---

* শ্বেতকেতুর আখ্যানের কথা কেহ কেহ এই প্রসঙ্গে তুলিয়া থাকেন এবং বলিয়া থাকেন, পূর্ব্বে হিন্দুসমাজে সতীত্ব অলঙ্ঘনীয় নারীধর্ম্ম ছিল না। শ্বেত-কেতুর আখ্যানে সত্য যদি কিছু থাকেও, তবে বলিতে হইবে, কতকটা ইহা আদিম একটা অবস্থার লক্ষণ, নারীপুরুষের যৌন সম্বন্ধে সামাজিক ধর্ম্মনীতি যখনও ঠিক অভিব্যক্ত হইয়া উঠে নাই। অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে, এই ধর্ম্মের যে সত্য, ঋষিরূপে তাহার দ্রষ্টা হইয়াছিলেন শ্বেতকেতু। ক্ষেত্রজ পুত্রও বৈধ পুত্ররূপে গৃহীত হইত; মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও পাণ্ডবগণ সকলেই এইরূপ ক্ষেত্রজ পুত্র। ঔরস পুত্রের সম্ভাবনা নাই, এরূপ অবস্থায় স্বামী বা স্বামিস্থানীয় অভিভাবকের নিয়োগেই মাত্র এইরূপ হইত। কিন্তু এই প্রথাও সুনীতিসঙ্গত নয় বলিয়া শেষে উঠিয়া যায়।

বৈবাহিক (pre-nuptial) প্রেমের প্রেরণায় ও অন্যান্য বিবেচনায় স্বেচ্ছায় স্বামিস্ত্রী নির্ব্বাচন করিয়া নিবার প্রথা যেখানে আছে, সেখানেও অনেক দৃষ্টান্ত এরূপ দেখা যায়, দম্পতি ভুল বুঝিয়াছিল, ভুল হিসাব করিয়াছিল ; প্রেম যাহা ছিল, তাহা আর নাই ; মনের মিল কিছুতেই হয় না, বনিবনাও করিয়া থাকিতে পারে না, সংসারজীবন একেবারেই সুখের হয় না। কিন্তু এ সব অবস্থাতেও এই সম্বন্ধবিচ্ছেদ সহজে কোনও সমাজ বড় অনুমোদন করে না। পরস্পরের প্রতি অতি বিরক্ত ও বিদ্বিষ্ট দম্পতি একত্র এক সংসারে থাকিতে পারে না। এ অবস্থায় বাধ্য করিয়াও কেহ কোথাও বড় এক সঙ্গে ইহাদের রাখে না। কিন্তু পৃথক্ ভাবে বাস করিলেই বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয় না। স্বামীকে স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব এবং স্ত্রীকেও সতীত্ব ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে হয়।

দাম্পত্য প্রেম মানবজীবনের অতি প্রধান একটি আনন্দের উৎস এবং ইহাতে বঞ্চিত হওয়া ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে বড় একটি দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাও আমরা বলিতে পারি না, যে এই আনন্দ ব্যতীত মানবজীবন একেবারেই ব্যর্থ হইয়া যায়, এবং অন্যান্য সকল ধর্ম্ম, সকল হিতাহিত বিবেচনা ত্যাগ করিয়া মানবকে কেবল দাম্পত্য প্রেমের সার্থকতাই খুঁজিতে হইবে। জন্মগত দৈহিক ও মানসিক বহু বিকৃতি,—জন্মের পর রোগ, শোক, দারিদ্র্য, কত সাধনার ব্যর্থতা, আরও কত দুঃখদুর্ভাগ্য, মানবকে বহন করিতে হয়। এ সব অপরিহার্য্য দুর্ভাগ্য, প্রতিকারের উপায় নাই, কাজেই সহিতে হয়। কিন্তু দাম্পত্য প্রেমের অভাবকেও কি একেবারে পরিহার্য্য বা প্রতিকারসাপেক্ষ দুর্ভাগ্য বলা যায় ? বিবাহ হইল ; কিন্তু দেখা গেল, যে প্রেম হইল না কি রহিল না, আশানুরূপ সুখ ঘটিল না,—অথবা মনে হইল, প্রেমের পাত্র বা পাত্রী অপর কেহ। অমনই পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন এই পাত্র বা পাত্রীর সঙ্গে উভয়েই গিয়া যুক্ত হইল, অথবা নূতন পাত্র বা পাত্রীর অনুসন্ধানে

আরম্ভ করিল। কিন্তু নূতন এই যোগও প্রেমের কি সুখের যোগ নাও হইতে পারে; এবং অনুসন্ধানে মনোমত নূতন পাত্র বা পাত্রী না মিলিতেও পারে। রামের হয়ত কোন পাত্রী মিলিল রামা, আর শ্যামার কোনও পাত্রী মিলিল শ্যাম,—কিন্তু এই রামা বা শ্যাম রাম বা শ্যামাকে পছন্দ নাও করিতে পারে। সারাটি জীবনই হয়ত বহু এইরূপ যোগে ও বিয়োগে, অথবা ব্যর্থ এই অনুসন্ধানে কাটিয়া যাইতে পারে। অবিরত এইরূপ যোগ বিয়োগ যেখানে ঘটে, প্রত্যেক যোগে সেখানে সন্তানসন্ততিও জন্মিতে পারে। ইহাদের কি হইবে? পিতামাতার যদি সংসারের কোনও স্থিরতা না থাকে, কোথায় ইহাদের একটা আশ্রয় হইতে পারে? বৈবাহিক সম্বন্ধ যে অচ্ছেদ্য বা দুশ্চেছদ্য একটা ধর্ম্মবিহিত পবিত্র সম্বন্ধ বলিয়া সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে, ইহাকে অবিবেচক সমাজ-নায়কদের একটা খামখেয়ালী নিয়ম বলিয়াও একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ব্যক্তিগত ধর্ম্মবুদ্ধিও সাধারণতঃ ইহার এই গুরুত্বকে মানিয়া চলে। দুঃখ যদি পাইতে হয়, উচ্চতর ধর্ম্মের অনুরোধে সেই দুঃখকেও অন্যান্য বহু অপরিহার্য্য দুর্ভাগ্যের ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ সকলেই শান্ত চিত্তে শিরে ধরিয়া নেন। সমষ্টির মঙ্গলে ব্যষ্টির কাছে এই ত্যাগের দাবী সমষ্টিধর্ম্মের আছে,—এবং এই অবস্থায় এই ত্যাগই ব্যষ্টির পক্ষে বড় ধর্ম্ম।

সর্ব্বদা এই তত্ত্ব সকলে বুঝুক কি না বুঝুক, এই ধর্ম্মকে যত মানিয়া চলিতে লোকে অভ্যস্ত হইবে, ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে মানবের জীবন তত মঙ্গলের পথে থাকিবে এবং হাজার দুঃখের মধ্যেও ধর্ম্ম-পালনে যে আত্মতুষ্টি মানুষ লাভ করে, জীবনের কৃতার্থতার পক্ষে তাহার মূল্য পার্থিব কোনও সুখভোগ অপেক্ষা অনেক বড় বই ছোট নহে।

বিবাহিত জীবনের এই ধর্ম্মপালন যে কেবল নারীরাই করেন, তাঁহাদেরই করিতে হয়, তা নয়। একদিকে যেমন অনেক দুশ্চরিত্র স্বামীর বহু অত্যাচার সহ্য করিয়াও সাধুশীলা নারী সতীত্বধর্ম্মে স্থির থাকেন,

অন্য দিকে আবার ইহাও দেখা যায়, সঙ্কীর্ণচিত্তা স্বার্থপরায়ণা হিংসা-দ্বেষদুষ্টা ও কলহ-দুর্দ্দান্তা অতি দুঃশীলা স্ত্রীর সকল দুর্ব্ব্যবহার, নীরবে সহ্য করিয়াও বহু স্বামী যত্নে তাঁহাকে কেবল প্রতিপালনই করেন না, অশেষরকমে আবার তাঁহার মন যোগাইয়াও চলেন। এক যৌনব্যাভিচার ব্যতীত আর সকল ত্রুটি, সকল অপরাধ, স্বামীরা সাধারণতঃ ক্ষমা বা উপেক্ষা করিয়া চলেন। আর এই ব্যভিচারও স্বামী নিজে যদি উপেক্ষা করেন, সমাজ বড় কিছু বলে না, যতক্ষণ না নারী স্বামীর গৃহ ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যভাবে অন্য পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করে। অবস্থা-বিশেষে উভয় পক্ষেরই এই ক্ষমা,উপেক্ষা ও সহিষ্ণুতার উপরে দাম্পত্য-সম্বন্ধের স্থিরতা ও সংসারস্থিতি নির্ভর করে।

এই গেল ধর্ম্মের ও সামাজিক ব্যবহারের দিক্ হইতে সুব্যবস্থার কথা। বিজ্ঞানের দিক্ হইতেও ইহার একটা বিচার আছে। কিসে দৈহিক ও মানসিক শক্তিতে উন্নততর সন্তান জন্মগ্রহণ করে, জীব-বংশধারা হীন না হইয়া উচ্চতর গুণের অধিকারী হয়, এ সম্বন্ধে বহু গবেষণার ফলে নূতন এক বিজ্ঞানের সৃষ্টি পাশ্চাত্যজগতে হইয়াছে; এই বিজ্ঞানের নাম Eugenics। বাঙ্গলায় 'সৌজাত্য' বা 'সুপ্রজনন' বিজ্ঞান নামে ইহার অনুবাদ অনেকে করেন। যৌন-সম্বন্ধে যথেচ্ছাচার অথবা বৈবাহিক সুনীতির সংযম, ইহার কোন পথে 'সৌজাত্য' বা 'সুপ্রজননের' সিদ্ধিতে মানববংশ উন্নত হইতে পারে, এসম্বন্ধে এই বিজ্ঞান কি বলেন, তাহাও আমরা অবজ্ঞা করিতে পারি না। বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নহে,—তবে যত দূর জানা যায়, ধর্ম্ম ও এই বিজ্ঞান মানববংশের উন্নতির পক্ষে একই পথ নির্দ্দেশ করিতেছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের মুল ভিত্তিই হইতেছে, Evolution অথবা ক্রমবিকাশ বা ক্রমাভিব্যক্তি বাদ। ইহার তত্ত্ব হইতেই বা কি নির্দ্দেশ আমরা পাই ?

অনেক জীব দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের মধ্যে পুং-স্ত্রী ভেদ নাই, বংশবৃদ্ধির জন্য যোনসম্বন্ধের প্রয়োজন হয় না, এক একটা

জীবের দেহ হইতে স্বাভাবিক ধর্ম্মেই ঐরূপ আরও জীবের সৃষ্টি হয় *। ক্রমবিকাশের নিয়মে জীব-জগতে ক্রমে পুং-স্ত্রী ভেদ ঘটিয়াছে এবং প্রজননে কর্ম্মের ভাগ (বা function) উভয়ের পৃথক্ হইয়াছে। মানবজীবন এই ক্রমবিকাশের ধারায় ইতর জন্তু অপেক্ষা অনেক উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিয়াছে,—কেবল জীব-জননে নহে, জীবপালনেও পুং-স্ত্রীর কর্ম্মের ভাগ (বা function) পৃথক্ হইয়াছে, এবং এই পৃথক্ কর্ম্মভাগ বা function যথোচিত ভাবে সম্পাদন করিবার মত বুদ্ধি ও চিত্তবৃত্তিও তাহাদের মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সমাজ-ধর্ম্মেও কর্ম্মের ভাগে এবং পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যে নীতির ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠা তদনুরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথক্ হইলেও কাহারও কর্ম্মের ভাগ অপরের কর্ম্মভাগ হইতে নিরপেক্ষ হইয়া চলিতে পারে না এবং ইহাদের পরস্পরসাপেক্ষ সমবায়ই সর্ব্ববিধ সংসারিক ও সামাজিক কর্ম্মকে তাহার পূর্ণাঙ্গতা দান করে, এবং কর্ম্মের সিদ্ধিও ইহার উপরে নির্ভর করে। এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া চলা নৈসর্গিক ধর্ম্মকেই লঙ্ঘন করিয়া চলা, এবং নৈসর্গিক ধর্ম্ম লঙ্ঘনে ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে মানব কখনও মঙ্গলের ভাগী হইতে পারে না। নিসর্গ-দেবতা তাঁহার ধর্ম্মের এই বিদ্রোহকে কখনও ক্ষমা করেন না; তাঁহার অমোঘ বিধানে এই পাপের যোগ্য দণ্ড মানবকে পাইতেই হইবে।

ব্যক্তিগত ভাবে পুরুষ ও নারীর পরস্পরের প্রতি নির্ভরতার তত্ত্ব যদি এই নিয়মের মানে আমরা তুল করিয়া দেখি, দেখিতে পাইব নারীর উপরে পুরুষের নির্ভরতা অপেক্ষা পুরুষের উপরে নারীর নির্ভরতার প্রয়োজন এক হিসাবে অনেক বেশী। কিন্তু ইহাকে নারীর

* অতি পুরাকালে অন্য কোনও কল্পে ইহাই হয়ত জীববৃদ্ধি ও জীবধারা-রক্ষার সাধারণ নিয়ম ছিল,—স্বায়ম্ভুব মনুতে ও শতরূপায় (৬৪০।৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) লোক-পিতামহ ব্রহ্মা তখনও আপন দেহকে পুং-স্ত্রীরূপ দুই ভাগে বিভক্ত করেন নাই। এই সব জীব হয়ত তাহারই কিছু অবশেষ বর্ত্তমান এই কল্পে দৃষ্টান্ত স্বরূপ রহিয়া গিয়াছে।

সেরূপ অবসরই তাহাদের হয় না। কারখানার কঠোর কাজকর্ম্মের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিতে বাধ্য হওয়ায়, নারীসুলভ কোমলতা হারাইয়া ইহাদের চিত্তও সাধারণতঃ অতি কঠোর ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। পারিবারিক জীবনের সুখস্বচ্ছন্দতা এই শ্রেণীর লোকেরা একেবারেই ভোগ করিতে পারে না, এবং ইহাদের সন্তানসন্ততিরাও মাতার স্নেহে যত্নে যথাযোগ্য ভাবে লালিত পালিত হইতে না পারায় যে বহু দুঃখ পাইতেছে ও দুর্নীতির প্রভাবের মধ্যে আসিতেছে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। ইহার প্রতিকারেরও তেমন কোনও উপায় কেহ এই অবস্থার মধ্যে দেখিতেছেন না।

কেবল মুজুরশ্রেণীর নারীরাই যে পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে মুজুরী করিতে বাধ্য হইতেছে, তা নয়। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যবসায়পদ্ধতি সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষেই জীবনযাত্রা এমন কঠোর করিয়া তুলিয়াছে, এবং অতি শ্রমেও এমন অল্প আয়ে এমন অবস্থায় বড় বড় সব ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সহরে অধিকাংশ লোককে জীবনযাপন করিতে হয়, যে ভদ্রবংশীয় বহু শিক্ষিত লোকের পক্ষেও পরিবার প্রতিপালনের ও গৃহস্থালীর দায়িত্ব গ্রহণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইঁহারা ব্যারাকে থাকেন, হোটেলে খান, রুগ্ন হইলে হাঁসপাতালে যান, এবং কেরানীগিরি প্রভৃতি কাজে উপার্জ্জন যাহা করেন, এইভাবে নিজেদের এক রকম করিয়া দিন গুজরান মাত্র হয়। অনেকেই বিবাহ করেন না; যাঁহারা করেন, তাঁহাদেরও নিজের আয়ে চলে না। সুতরাং স্বামীর অভাবে বা স্বামী সত্ত্বেও ভদ্রবংশীয়া বহু নারীকেও অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়। এই সব সহরে পুরুষদেরই মত কেরানীগিরি প্রভৃতি কাজ ছাড়া এত নারীর পক্ষে জীবিকা অর্জ্জনের আর কোনও উপায় হইতে পারে না, এবং বহু নারীও তাই পুরুষদের সঙ্গে এই সব কাজই করিতেছেন। দোকানের বেচাকেনা ও যাচাই (canvassing) প্রভৃতি কাজে পুরুষ অপেক্ষা নারীরাই বেশী আদরে গৃহীত হন, কারণ মালিকরা মনে করেন, খরিদ্দার

তাহাতে বেশী আকৃষ্ট হইবে! কেরানীগিরি প্রভৃতি অনেক কাজেও কিছুকাল যাবৎ পুরুষ অপেক্ষা নারীদের আদর বেশী হইতেছে। ইহা হইতে নারী ও পুরুষের মধ্যে চাকরীর একটা প্রতিযোগিতাও দেখা দিয়াছে। নারীদের এই প্রতিযোগিতায় পুরুষরা তাঁহাদের জীবিকার ক্ষেত্র হইতে ক্রমে বহিষ্কৃত হইতেছেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে বেকারের সংখ্যাও তাই তাহাতে অনেক বাড়িয়া যাইতেছে। ইহাও কঠিন একটা সামাজিক সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামিপুত্র লাভে গৃহধর্ম্মে স্থিত হইতে না পারিয়া, তাহাদের অভাবে গৃহধর্ম্মে স্থিত থাকিতে না পারিয়া, অথবা তাহাদের অক্ষমতায় গৃহকর্ম্মের অবসরে কিছু অর্থোপার্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়া, যে ভাবে যে কারণেই হউক, নারীদের যে বাহিরে কাজকর্ম্ম করিতে হয়, ইহাকে কতকটা আপদ্ধর্ম্মের ব্যবস্থা বলিতে হইবে, সকল সুব্যবস্থিত সমাজের মধ্যেই যাহার কিছু না কিছু প্রয়োজন আছে। নারীর যোগ্য এইরূপ কর্ম্মেরও অনেক অবসর সমাজের মধ্যে সাধারণতঃ থাকে এবং পূর্ব্বে তাহার উল্লেখও করা হইয়াছে। কিন্তু যত বেশী নারীকে এই আপদ্ধর্ম্মের প্রয়োজনে পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে, তত নারীপুরুষের স্বাভাবিক সম্বন্ধের শৃঙ্খলা ব্যাহত হইবে, এবং আপদ্ধর্ম্মই সমাজের প্রধান ধর্ম্ম হইয়া উঠিবে।

যাহা হউক, কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্তও নারীরা সাধারণতঃ ইহাকে আপদ্ধর্ম্ম বলিয়াই মনে করিয়াছেন; যোগ্য স্বামীর সঙ্গে দাম্পত্যসম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া গৃহধর্ম্মে স্থিত হইবার দিকেও একটা আগ্রহ তাঁহাদের ছিল। কিন্তু পুরুষোচিত সব কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমান ভাবে এতকাল এই যে সব কাজকর্ম্ম তাঁহারা করিতেছিলেন, তাহার ফলে মনোভাবেরও একটা পরিবর্ত্তন তাহাদের মধ্যে হইতেছিল। পুরুষজীবনে ও নারীজীবনে নৈসর্গিক যে একটা ভেদ রহিয়াছে, এবং এই ভেদে তাহাদের কর্ম্মের ভাগও যে বিভিন্ন, এই সত্যও তাহারা ক্রমে বিস্মৃত হইতে

থাকেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কর্ম্মের ভাগ বিভিন্ন হইলেও এক পক্ষ অপর পক্ষ হইতে একেবারে স্বতন্ত্র নহেন, উভয়ের জীবনের সিদ্ধি পরস্পর সাপেক্ষ, এবং অর্দ্ধার্দ্ধ ভাবে উভয়ের সম্মিলিত জীবনে পরিপূর্ণ সংসারজীবন ও সমাজজীবন হয়, আর এই মিলনের ও সহযোগের নিবিড়তার উপরেই এই জীবনের স্থিতি ও উন্নতি নির্ভর করে। কর্ম্মক্ষেত্রে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সংগ্রামে অসিয়া এই সত্যের অনুভূতিও তাহাদের চিত্ত হইতে বিলুপ্ত হইতে থাকে। ইহার পরিবর্ত্তে, নারী ও পুরুষ পরস্পরের প্রতিপক্ষ, প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে তাহার স্বার্থরক্ষা করিয়া চলিতে হইবে, এবং সর্ব্ব বিষয়ে সমান অধিকার ভোগী না হইলে তাহা সম্ভব নহে, এইরূপ একটা বিপরীত ভাবই তাহাদের মনে জাগ্রত হইতে থাকে। পুরুষ-জাতি এতদিন নারীকে আপনাদের স্বার্থে চাপিয়া রাখিয়াছে, অন্যায় প্রভুত্ব তাহাদের উপরে করিয়াছে, এখন নারী জাতিকেও দল বাঁধিয়া পুরুষের সঙ্গে লড়াই করিতে হইবে, আপনাদের অধিকার সব তাহাদের নিকট হইতে আদায় করিয়া নিতে হইবে, নহিলে নারী-জাতির মঙ্গল হইবে না, এইরূপ একটা সামাজিক দ্বন্দ্বের ভাবও পুরুষের বিরুদ্ধে নারীর মধ্যে প্রকাশ পায়। সর্ব্ববিধ বৃত্তিতে প্রবেশাধিকার, রাষ্ট্রীয় শাসনে সমান ভোট, সমান স্থান, ইত্যাদি সব আন্দোলনের নিদান হইল এই। সঙ্গে সঙ্গে অধিক বয়স পর্য্যন্ত পত্নীত্ব ও মাতৃত্বের দায়িত্ব হইতে মুক্ত এবং তাহার আনন্দ ভোগে বঞ্চিত থাকায়, সংসার-ধর্ম্মের প্রতিও একটা বিতৃষ্ণা এই সব নারীর মনে জাগিয়া উঠে। সংসারধর্ম্মে গৃহিণীর ও জননীর পক্ষে স্বামীরূপ কোন পুরুষের উপরে কিছু নির্ভরতা এবং এই নির্ভরতা হেতু স্বামীর প্রতি যে একটা আনুগত্য ও অপরিহার্য্য, তাহা অপেক্ষা স্বতন্ত্র ভাবে নিজের শ্রমে অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্বচ্ছন্দে যে নিজের ইচ্ছামত বিচরণ করিতেছেন, তাহাকেই তাঁহারা অধিকতর কাম্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় নারীদের সঙ্গে সমান ভাবে সমান সব ক্ষেত্রে কাজ

করিয়া, বৈষয়িক ব্যাপারে সর্ব্বদা তাহাদের সংসর্গে আসায়, ক্রমে এই সব ভাব যে পুরুষদের মধ্যেও সংক্রামিত হইতেছে, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থায় আর একটি পরিবর্ত্তনও মনোভাবের এই পরিবর্ত্তনের অনেক সহায়তা কারিয়াছে। ব্যবসায়বণিজ্যের বর্ত্তমান পরিণতিতে বহু বৃহৎ বৃহৎ নগরের অভ্যুত্থান হইয়াছে, এবং অসংখ্য লোক জীবিকা অর্জনের প্রয়োজনে এই সব নগরে সমবেত হইয়াছে। এই সব নগরে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে স্বতন্ত্রভাবে গৃহস্থালী করিয়া বসবাস করিবার মত স্থান ত অধিকাংশ লোকের পক্ষে হয়ই না; কাজকর্ম্মের রীতিতে অবসরও ঘটে না। দরিদ্র কুলী মুজুরীদের ত কথাই নাই, অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন যাঁহারা তাঁহারাও পৃথক্ গৃহস্থালী প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না। বড় বড় বাড়ীর furnished flat (আসবাব পত্রে সুসজ্জিত অংশ) ভাড়া করিয়া তাঁহারা থাকেন। আহারাদির ব্যবস্থা বড় বড় সব হোটেলে বা রেস্তরাঁয় সাধারণতঃ হয়। দৈনিক আহারের ত কথাই নাই, বিবাহাদি উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে বড় বড় ভোজ যাহা কিছু, তাহার ব্যবস্থাও এখন আর বাড়ীতে কাহারও হয় না, সব হোটেলে হয়। মূল্যের অনুরূপ আহার্য্যের ব্যবস্থা এমন পরিপাটিভাবে ও সুশৃঙ্খলায় এই সব হোটেলে করা হয়, যে কেহ কোনওরূপ অসুবিধা তাহাতে বোধ করেন না; ইহার আয়াজনের দায়িত্ব হইতে মুক্ত থাকিতে পারিয়া বরং অতি আরামই সকলে বোধ করেন। আর এ সব আয়োজন করেই বা কে? সেরূপ অবসর যে নারীদেরও নাই। অতি সুব্যবস্থিত বড় বড় সব হাঁসপাতাল সর্ব্বত্র হইয়াছে, ব্যারাম পীড়া হইলে সকলেই প্রায় সেখানে যান, চিকিৎসা ও শুশ্রূষাদি গৃহ অপেক্ষা সেখানে অনেক ভালও হয়। গৃহে ইহার ভার গ্রহণ করিবার অবসরই বা কোথায় কাহার আছে? ইহার উপর আবার অসংখ্য থিয়েটার, সিনেমা, মিউজিক হল্ ইত্যাদি অতি মনোরম ও চিত্তাকর্ষক প্রমোদের ব্যবস্থাও কত যে এখন হইয়াছে,

বলিয়া শেষ করা যায় না। আবার বিভিন্ন দলের লোকের অনেক ক্লাব বা আড্ডাও আছে; সেখানেও বহু চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা থাকে। ইহাও অবশ্য বলিতে হইবে, যে সর্ব্বত্রই অনেক লাইব্রেরী ও রিডিং রুমও আছে, সেখানেও যে কেহ কেহ না যান, তা নয়। এখন নগরবাসীদের জীবন এ অবস্থায় কি ভাবে কাটে? ৮।৯ ঘণ্টা কাল বিভিন্ন আফিসে, দোকানে বা কারখানায় ইঁহাদের কাজ করিতে হয়। আহারের সময় হোটেলে বা রেস্তরাঁতে গিয়া সকলে আহার করিয়া আসেন; সন্ধ্যায় চিত্তবিনোদনের জন্য যার যেমন অভিরুচি সেইরূপ কোনও প্রমোদালয়ে যান।

ছেলে মেয়েরা স্কুল কলেজের বোর্ডিংএ থাকিয়াই মানুষ হইয়া উঠে, গৃহের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ অতি অল্প। একেবারে শিশু যাহারা, ধনীর গৃহে তাহারা বেতনভোগিনী ধাত্রীর হস্তে সমর্পিত হয়। দরিদ্র গৃহে পিতামাতার কাজকর্ম্ম ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার উপরে অনেকটা ভার বোঝার মতই তাহারা হইয়া পড়ে। সন্তানপালনে এই অসুবিধা হেতু বিবাহে ও সন্তানোৎপাদনে একটা বিমুখতার ভাবও নারীপুরুষ সকলের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে।

পারিবারিক সম্বন্ধ অবশ্য একটা থাকে। কিন্তু পারিবারিক জীবন বলিতে, সংসার ধর্ম্ম বলিতে, যাহা বুঝায়, তাহা এরূপ অবস্থায় থাকা না থাকায় সমানই হইয়া পড়ে। সংসারধর্ম্মের বিশেষত্ব কোথায়, তাহার স্থিতিনিবৃত্তি কাহাকে বলে, তাহার সুখ শান্তি ও আনন্দ যে কি, তাহা বুঝিবার কি জানিবার অবসর কাহারও বড় হয় না, তাহার প্রতি তেমন একটা আকর্ষণ জন্মে না, ইহার কোনও নীতির মর্য্যাদা মানিয়া চলিতেও কেহ শিখে না। মোট কথা, মানুষের জীবন ঘর ছাড়িয়া একেবারে বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে; সকল প্রয়োজন সকল আনন্দ বাহির তাহাকে যোগাইতেছে। ঘরে তাহার কিছুই নাই; ঘরই একরূপ নাই বলিলে হয়। এই ভাবে হুহু করিয়া এক টানা একটা বন্যার স্রোতের ন্যায় দিনের পর দিন মানুষের জীবন কাটিয়া যাইতেছে। সোসিয়ালিষ্টরা

মানব জীবনের ভাবী যে চিত্র কল্পনা করিয়াছেন, বাস্তবিক তাহারই একটা ছায়াপাত আধুনিক পাশ্চাত্য নাগরিক জীবনে পড়িয়াছে। ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজমের প্রভাবে পারিবারিক জীবনের এই পরিণতি লক্ষ্য করিয়াই তাঁহারা হয়ত এই কল্পনা করিয়াছেন, এবং এই কল্পনা বাস্তবতায় পরিণত হইবার দিকেই যেন চলিয়াছে।

এইরূপ সব নগরে ইয়োরোপখণ্ড ঘন বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। রেল-ষ্টীমারে যাতায়াতের সুগমতা হেতু যেমন নগরের সঙ্গে নগরের, তেমন পল্লী অঞ্চলের সঙ্গেও সকল নগরের অতি ঘনিষ্ঠ একটা সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। বহু লোক কতক ব্যবসায়বাণিজ্যাদির প্রয়োজনে, কতক বা প্রমোদ-কৌতূহলে, অধিকাংশ সময় নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। হোটেলে ক্লাবে বাস এবং রোগে হাঁসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত স্থায়ী কোনও গৃহপ্রতিষ্ঠা ইঁহাদের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নহে। পল্লী অঞ্চলের অধিবাসী যাঁহারা ধনী, অধিকাংশ সময় তাঁহারা নগরে নগরেই প্রমোদ ভ্রমণে অতিবাহিত করেন। নাগরিক কোলাহল ও একটানা প্রমোদের ক্লান্তি হইতে কখনও একটু বিরামলাভ করিবার জন্যই মাত্র শান্ত স্নিগ্ধ পল্লী-গৃহে আশ্রয় নেন। চাষবাস প্রভৃতি কর্ম্মে জীবনের বৃত্তি যাঁহাদের পল্লী অঞ্চলে রহিয়াছে, অবসর যখন ঘটে, তাঁহারাও প্রমোদের জন্য নগরে গিয়া বাস করেন। সুতরাং নাগরিক জীবনের এই সব প্রভাব পল্লী অঞ্চলের গৃহস্থজীবনেও সংক্রামিত হইতেছে।

যেমন রাষ্ট্রীয় জীবনে ও ব্যবসায়িক জীবনে, তেমনই ধর্ম্মনৈতিক জীবনেও ব্যষ্টিভাবে স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকল মানবের স্বাধীনতার ও সাম্যের গৌরবের কথা র‍্যাসনালিষ্টরা প্রথম হইতেই প্রচার করেন। তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল না হইলে, তত্ত্বের কোনও কথাই বাস্তব জীবনের নীতি কি রীতিতে পরিণত হয় না। অনুকূল বহু অবস্থার সহায়তা পাইয়া ব্যবসায়িক জীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রথম হইতেই র‍্যাসনালিষ্ট নীতি অনুসৃত হয়, এবং রীতিও তদনুরূপ হইয়া উঠে। কিন্তু ধর্ম্মনৈতিক জীবনে—প্রধানতঃ সংসারধর্ম্মে—নারী

পুরুষের সম্বন্ধ পরম্পরাগত প্রাচীন নীতি ও রীতি ধরিয়াই চলিয়াছে। কিন্তু এই স্বাধীনতার ও সাম্যের গৌরবের কথা সকলেই বরাবরই শুনিতেছে; এদিকে রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসায়িক জীবনে যে সব পরিবর্ত্তন ইতিমধ্যে ঘটিয়াছে, তাহার ফলে পারিপার্শ্বিক সব অবস্থাও ইহার অনুকূল হইয়া উঠিয়াছে। তাই এখন ধর্ম্মনৈতিক জীবনে—বিশেষভাবে সংসারধর্ম্মে—এই স্বাধীনতার ও সাম্যের এবং স্বাধীনতা ও সাম্যের অধিকারে সমান প্রতিযোগিতার, নীতি বাস্তব জীবনে আপন প্রভাব বিস্তার করিতেছে, এবং প্রতিষ্ঠিত ও পরম্পরাগত ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধে প্রবল একটা বিদ্রোহে নারীপুরুষকে সমান ভাবে উদ্যত করিয়া তুলিয়াছে। সকলক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বৈবাহিক ও যৌনসম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সঙ্গে সঙ্গে সংসারধর্ম্মের ও পারিবারিক বন্ধনের অবসান—যেন ইহারই একটা সূচনা পাশ্চাত্য সমাজজীবনে দেখা দিয়াছে! ধীরবুদ্ধি ও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। চার্চ্চ প্রতিকারের কোনও পথ দেখিতেছেন না। ধর্ম্মের ভয় লোকে করে না; চার্চ্চের প্রচারিত খৃষ্টীয় নীতিতেও লোকের আস্থা কিছু নাই। চার্চ্চ নিজেও এই অবস্থার জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী। ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের আকর্ষণে স্বতঃই লোকের মতিগতিকে তাহার পথানুবর্ত্তী না করিয়া, কেবল হুকুমে শাসনে ভয় দেখাইয়া বাধ্য করিয়া লোককে একটা নীতিপদ্ধতির মধ্যে রাখিতে চাহিলে, স্বভাবতঃ সুন্দর ও মধুর হইলেও, তাহা বিষবৎ তিক্ত হইয়া উঠে। বিদ্রোহ একদিন না একদিন এ অবস্থায় অবশ্যম্ভাবী।

তবু এতদিন এক রকম যাইতেছিল। গত মহাযুদ্ধের সময় বয়স্ক ও কর্ম্মক্ষম পুরুষদের এত অত্যধিক সংখ্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান হয়, যে দেশের মধ্যে পুরুষোচিত কর্ম্মাদি নির্ব্বাহের জন্য নারীদেরই সর্ব্বত্র নিয়োগ করিবার প্রয়োজন হয়, এবং নারীরাও বেশ যোগ্যতার সহিতই এই সব কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। ইহার পর পুরুষের সঙ্গে সকলক্ষেত্রে

সমান অধিকারের দাবী, সকল বিষয়ের স্বাধীনতার আগ্রহ এবং প্রচলিত আচার নিয়ম অবজ্ঞা করিয়া চলিবার প্রবৃত্তি অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছে *। এইরূপ সব ভাবে, আদর্শে ও চালচলনের ধরনে, modern woman বা নব্যনারী একটু প্রাচীনবয়স্ক সকলের কাছেই একটা বিভীষিকার বস্তু হইয়া উঠিয়াছেন। নব্যনারী কেবল নহেন, নব্য নারী ও পুরুষ উভয়েই সকল সদাচারের রীতি লঙ্ঘন করিয়া পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহারে এমন উচ্ছৃঙ্খল ভাবে এখন চলেন, এখন অশিষ্ট সব কথাবার্ত্তা বলেন, অভি-ভাবকের সকল অনুশাসন এমনই অবজ্ঞা করেন, যে সমাজে কোনওরূপ সুনীতির শৃঙ্খলা রক্ষা করা অতি দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ণ কলির লক্ষণ বলিয়া এদেশের শাস্ত্রকারগণ যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সবই তাহা পাশ্চাত্য সমাজে অধুনা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসায়িক জীবনে প্রায় শতাব্দীকালের মধ্যে যে ঘোর পরিবর্ত্তন ইউরোপীয় সমাজে ঘটিয়াছে, তাহার প্রতিক্রিয়ার গতি ও রীতির কথা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মনৈতিক জীবনে এই পরিবর্ত্তন সবে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার বিষময় ফল যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহার প্রতিক্রিয়া আবার কোনপথে সমাজকে নিয়া যাইবে, কে জানে? তাহার সময় এখনও আইসে নাই।

নারীর অধিকার সম্বন্ধে আর একটি দাবীর কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন।

প্রতিভায়, বিদ্যায় ও কর্ম্মকুশলতায় পুরুষ অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহেন, এমন বহু নারীর দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে আছে।

---

* এদেশের রাজপুত নারীরা হাতে অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধও অনেক সময়ে করিয়াছেন। কিন্তু পুরুষের সঙ্গে এরূপ সামাজিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোনও ভাবও তাঁহাদের মধ্যে দেখা দেয় নাই। এই সব বীরনারীরা স্বামীর সঙ্গে অনেকে বরং সহমৃতাই হইয়াছেন; নারীধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য জহরব্রতেও অনায়াসে আত্মদান করিয়াছেন।

রাজকর্ম্ম ও যুদ্ধবিগ্রহাদি পর্য্যন্ত বহু নারী অতি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়াছেন। পুরুষোচিত অন্যান্য সাধারণ যে সব কাজ আছে, তার সম্বন্ধে ত কথাই নাই। সুযোগ পাইলে কি হাতে পড়িলে বহু নারী বেশ নিপুন ভাবেই সে সব সম্পাদন করিতে পারেন। এইরূপ প্রতিভা, শক্তি ও যোগ্যতা যখন তাঁহাদের আছে, কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার সার্থকতা কোনও অবসর না পাইয়া কেবল সন্তানপালনে ও গৃহকর্ম্মেই জীবন তাঁহারা অতিবাহিত করিবেন, ইহাকে ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা কি প্রকারে বলা যায়? এইরূপ দাবীর ও আপত্তির উত্তরে দুই চারিটি কথা বলিতে চাই। সন্তানপালন ও গৃহস্থালীরক্ষা যে নারীর কর্ম্মের ভাগ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সাধারণ সংসারিক জীবনের কথা। সাধারণ এই সাংসারিক জীবনের উপরে অসাধারণ এক সংসারাতীত জীবনও আছে, যেখানে নারী-পুরুষ ভেদে এরূপ কোনও কর্ম্মবিভাগের নিয়ম চলে না। অনন্য-সাধারণ প্রতিভা, শক্তি ও আধ্যাত্মিক গুণের অধিকারী হইয়া, নারী কি পুরুষ যাঁহারাই এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন, সাধারণ এই সংসারাতীত জীবন তাঁহাদেরই জীবন। মহত্তর যে সব কর্ম্ম সাধনের জন্য তাঁহারা আসেন, সাধারণ সংসারধর্ম্ম যদি তাহার পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, ছাড়াইয়া তার উপরে তাঁহারা উঠিয়া যান। যদি না হয়, এই ধর্ম্মে স্থির থাকিয়াও নিয়ত সেই মহত্তর কর্ম্মে তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করেন। গৃহিনী ও জননীরূপে স্বীয় অপরিহার্য্য ধর্ম্ম পালন করিয়াও বিদ্যানু-শালনে, কবিত্বে, আধ্যাত্মিক সাধনায়, কি রাজকার্য্যাদি পরিচালনায়, অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, এরূপ নারীর দৃষ্টান্তও ইতিহাসে বিরল নহে। তবে সাংসারিক দায়িত্ব অতি ভারী হইলে, অসুবিধা কিছু হয়। কিন্তু প্রকৃতি দেবী নিজেই তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা একটি প্রমাণিত সত্য যে এইরূপ প্রতিভাশালিনী এবং এই সব কর্ম্মে অত্যধিক অভিনিবিষ্টা নারী যাঁহারা, সন্তান তাঁহাদের অতি অল্পই জন্মে। অসাধারণ এই সব শক্তি যাঁহাদের প্রকৃতি দেবী

দিয়াছেন, এই ভাবে সেই সব শক্তির সার্থকতার অবসরও তাঁহাদের তিনি দেন। (কেবল তাই নয়, ইহাও দেখা যায়, বিদ্যার ও চিন্তার রাজ্যে মানসিক শক্তির পরিচালনা যাঁহারা বেশী করেন, সন্তানোৎপাদিকা শক্তি তাঁহাদের কমিয়া যায়। তাঁহাদের তুলনায় গৃহকর্ম্মাদি দৈহিক শ্রম বেশী করিতে হয় এইরূপ নারীদের সন্তান মোটের উপর অনেক বেশী হয়।) এই গেল আসাধারণ অবস্থার কথা, সর্ব্বদাই যাহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিরেকের অবস্থা। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় সাধারণ নিয়মেই মানুষকে চলিতে হইবে। সাধারণ এই অবস্থায়ও প্রয়োজন হইলে অনেক নারী পুরুষোচিত বহু কাজ করিতে পারেন, আপদ্ধর্ম্মে এইরূপ করিতেও হয়। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা যে নারীকে করিতেই হইবে, এমন কথা হইতে পারে না। দরকার হইলে নারী দারোগাগিরি করিতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া মাতৃধর্ম্ম ও গৃহিণীধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নারীকে গিয়া দারোগাগিরিই করিতে হইবে, আর তাই না করিতে পারিলে নারীজন্ম তাঁহার ব্যর্থ হইবে, ইহা বাতুলের কথা। নারীর স্বাভাবিক ও সাধারণ জীবন (normal life) হইতেছে গৃহিণীর ও জননীর জীবন। এই জীবনের বিহিত ধর্ম্ম পালনে লোকসমাজের যত মঙ্গল তাঁহারা সাধন করিতে পারেন, দারোগাগিরি কি কেরাণীগিরি কি ঐরূপ অন্যান্য সব কর্ম্মে তাহা পারেন না। নিজেদের জীবনেরই বা কি সার্থকতা তাহাতে ঘটিতে পারে? পুরুষ যথেষ্ট রহিয়াছে, লোকের অভাবে এই সব কর্ম্ম যে নির্ব্বাহ হইবে না, সেরূপ আশঙ্কারও কোন কারণ নাই। নারী কি করিবে, এই সব কর্ম্মে তাহার কতদূর কি অধিকার থাকিবে, এসব সম্বন্ধে আইনের বাধা কি ব্যবস্থা কিছুরই প্রয়োজন হয় না। ধর্ম্মে যদি সমাজ স্থির থাকে, নারী কি পুরুষ যার যার কর্ম্মের ভাগ আপন হইতেই সকলে নির্ব্বাহ করিবে; একে অন্যের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেই চাহিবে না। যদি কখনও করে, বন্ধুর ন্যায় কোনও অভাব পূরণের জন্যই করিবে, প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে কোনও

অধিকারের দাবী লইয়া নহে। গুণকর্ম্মবিভাগে সকল উন্নতসমাজেই সাধারণতঃ যে শ্রেণী বিভাগ দেখা যায়, সেই সব শ্রেণীর মধ্যেও স্বাভাবিক সম্বন্ধ সহযোগিতার ও পরস্পর নির্ভরশালতার সম্বন্ধ। ইহার পরিবর্ত্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব বা অধিকার লইয়া বিরোধ যদি দেখা দেয়, বুঝিতে হইবে, তাহা একটা অস্বাভাবিক অবস্থা, অকল্যাণকর ব্যাধির লক্ষণ। শ্রেণীতে শ্রেণীতে সহযোগিতার ও নির্ভরশীলতার যে সম্বন্ধ, নারীপুরুষে সহযোগিতার ও নির্ভরশালতার সম্বন্ধ তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ, একেবারেই অপরিহার্য্য। শ্রেণীতে শ্রেণীতে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিরোধ লইয়া সমাজ যদিও কোনও মতে কষ্টে কিছুকাল চলিতে পারে, নারী ও পুরুষ পরস্পর প্রতিদ্বন্দী ও বিরোধী দুই দল হইয়া দাঁড়াইলে, গৃহে গৃহে স্বামী স্ত্রীতে, মাতাপুত্রে, পিতায় কন্যায় রাষ্ট্রীয় সামাজিক কি ব্যবসায়িক কর্ম্মাধিকার লইয়া একটা লড়াই বাধিয়া গেলে, সংসার ও সমাজ দুইদিনও চলিতে পারে না। গৃহস্থ জীবনই সে অবস্থায় সম্ভব হয় না। সমাজ-ধ্বংসের পূর্ব্ববর্ত্তী অতি উৎকট এক ব্যাধি বলিয়াই ইহাকে গণ্য করিতে হইবে।

এই ব্যাধিতেই ইয়োরোপীয় সমাজ অধুনা আক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাধি অতি সংক্রামকও বটে; পৃথিবী অন্যান্য দেশেও ইহার প্রভাব গিয়া পড়িতেছে। ফল কি হইবে, প্রতিকারের পথ কিছু দেখা দিবে কি না, ভগবানই জানেন।

কেবল নারীপুরুষের সম্বন্ধ বলিয়া নয়, জীবনের বহু ব্যাপারে বহু ব্যাবহারেই এইরূপ এক একটা আদর্শের ধারা বা রীতি সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়া যায়, লোকেও সাধারণতঃ অভ্যাস বশে, কতকটা গতানুগতিক ভাবে, তাহার পথে চলে। এইরূপ যে সব আদর্শের ধারা বা রীতি, ইংরেজীতে সাধারণতঃ তাহাকে Convention বলে; এদেশের ভাষায় লোকাচার বলা যাইতে পারে। শাস্ত্রের আদেশের বা উপদেশের সঙ্গে এই সব লোকাচারের সর্ব্বদা যে

একটা মিল থাকে, তাহা বলা যায় না। তবে ব্যক্তিগত জীবনের অনেক আচরণে এবং সাধারণ সামাজিক ব্যবহারে এই সব লোকাচার বা Conventionএর প্রভাব শাস্ত্রবিহিত কোনও নীতি অপেক্ষা কম নহে। সমাজের ধর্ম্ম বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার মধ্যেও ইহার বড় একটা স্থান আছে। কি ভাবে সমাজধর্ম্মের মধ্যে এই সব Convention বা লোকাচার দেখা দেয়, প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তিতও হয়, পূর্ব্বে তাহার বহু আলোচনা করা হইয়াছে। শাস্ত্র বিধিতে বা এইরূপ সব আচারে ধর্ম্মের আদর্শরূপে যাহা কিছু দেখা দেয়, অভ্যাসই তাহার পথে চলিবার পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায়। অভ্যাসবশে চলিয়া ক্রমে লোকে ইহার মাঙ্গল্য অনুভব করে, এবং এই অনুভূতিই যে সেই অভ্যাসকে আরও দৃঢ়মূল করিয়া তোলে, ইহাও কিছু পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। বস্তুতঃ এইরূপ সব Convention বা লোকাচার এবং তাহার এইরূপ প্রভাব ব্যতীত সাধারণ লোকের পক্ষে ধর্ম্মপথে চলা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে। কিন্তু কেবল অভ্যাস বশে কি গতানুগতিক ভাবে লোকাচার বা Convention ধরিয়া চলা মনুষ্যত্ব-বিকাশের পরিপন্থী, ইহার সকল বন্ধন হইতে মুক্ত থাকিয়া মানুষ সর্ব্বদা তাহার নিজের রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে চলিবে, তাহার বুদ্ধি ও বিবেক (reason and conscience) ভাল বলিয়া যাহা নির্দ্দেশ করে, তাহাই মাত্র করিবে, ইহাতেই তাহার মনুষ্যত্বের গৌরব থাকিবে, ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়া অনেকে সকল Convention বা লোকাচারকে একেবারে অবজ্ঞা করিয়া চলিতে মানুষকে উপদেশ দিয়া থাকেন। আধুনিক সাহিত্যে এই মত বিশেষ জোরেই প্রচারিত হইতেছে, এবং conventional morality বা লোকাচারের গতানুগতিক ধর্ম্ম একটা বিদ্রূপের বিষয় হইয়া উঠিতেছে; আর ইহা লঙ্ঘন করিয়া চলিতে পারাও মানুষের পক্ষে বড় একটা বাহাদুরী বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহা সাধারণ র‍্যাসনালিজমেরই কথা,

এবং ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধে যে র‍্যাসনালিষ্ট বিদ্রোহ প্রকট হইয়াছে, তাহারই একটা ভাব। বেদস্মৃতি-সদাচাররূপ ধর্ম্ম ও তাহার অনুবর্ত্তনেরপ্রয়োজনীয়তা উপলক্ষে পূর্ব্বে যে সব কথা বলা হইয়াছে, এসম্বন্ধে তাহার উপরে নূতন আর বক্তব্য বড় কিছু নাই।

অসাধারণ বুদ্ধি, শক্তি ও আধ্যাত্মিক প্রেরণার অধিকারী যাঁহারা, তাঁহাদের সম্বন্ধে কথা আলাদা। কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে প্রচলিত আদর্শের পথে চলাই কল্যাণের পথ, এবং অভ্যাসই সর্ব্বাপেক্ষা সহজে তাহাদের এই পথে স্থির রাখিতে পারে। ইহাদের পক্ষে অভ্যস্ত এই পথ ছাড়িয়া দেওয়ার অর্থ ই যাহার যাহা খুসী তাহাই করা ; আর এই খুসীতে ভাল অপেক্ষা মন্দই লোকে বেশী করিবে, সকল সুনীতির সংযম ত্যাগ করিয়া উদ্দাম স্বেচ্ছাচারেই আত্মসমর্পণ করিবে। জনে জনের পক্ষে নীতি ভিন্ন ভিন্ন হইয়া উঠিবে, এবং ইহার সংঘর্ষে বহু অশান্তিও লোকসমাজে দেখা দিবে। সমাজ ইহার ফলে কোনও নীতির আদর্শে মঙ্গলের পথে স্থিত থাকিতে পারে না, ধ্বংসের পথেই অগ্রসর হয়। বুদ্ধির দোহাই, বিবেকের দোহাই, অনেক স্থলেই ভুল একটা দোহাই। স্বার্থের প্রবৃত্তিকে, রম্য বাসনাকে, চিত্তবৃত্তির যে কোনও উদ্দাম উচ্ছ্বাসকে, লোকে বিবেকের নির্দ্দেশ বলিয়া ভুল বুঝিতে পারে ; বুদ্ধিও অনেক সময় এই মোহেরই অনুগামী হইয়া থাকে। তারপর ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও ব্যক্তিগত বিবেকই ত বড় কথা নয়। ব্যক্তির উপরে সমাজের একটা বিবেক আছে, বুদ্ধিও আছে। সামাজিক ধর্ম্মনীতিতে, লোকমতে এবং লোকাচারের প্রতি শ্রদ্ধার আগ্রহে ইহা প্রকাশ পায়। ব্যক্তিগত বুদ্ধিকে ও বিবেককেও ইহার অনুগত হইয়া চলিতে হয়, যদি সেই ব্যক্তি সমাজের মধ্যে সামাজিক মঙ্গলের ভাগী হইয়া থাকিতে চায়। সমাজ হইতে কেবল সুখ সুবিধাই সব আদায় করিয়া নিব, আর তাহাকে কিছু দিব না, বুদ্ধি কি বিবেক যাহার দোহাই যিনি দিন কিছুরই ন্যায়-সঙ্গত দাবী ইহা হইতে পারে না।

ষ্টেটের সব আইন আমার ভাল লাগুক কি না লাগুক, আমার বুদ্ধির বা বিবেকের অনুমত হউক কি না হউক, সে আইন আমাকে মানিয়া চলিতে হইবে, যদি সেই ষ্টেটের আশ্রয়ে গৃহস্থপ্রজারূপে আমি বাস করিতে চাই। সামাজিক ধর্ম্ম, সামাজিক আচারনিয়ম প্রভৃতির অনুবর্ত্তনের প্রয়োজনসম্বন্ধেও ঠিক ঐ একই কথা বলা যাইতে পারে। ষ্টেটের পুলিশ আছে, আদালত আছে,—আইন যে ভাঙ্গে, তাহাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করে। সমাজও বর্জ্জন-বহিষ্কারে তাহার ধর্ম্মবিদ্রোহীকে লাঞ্ছিত করে। কিন্তু প্রজাসাধারণ আইন মানিয়া চলিতে অভ্যস্ত না হইয়া উঠিলে, কেবল দণ্ডের বলে যেমন কোনও ষ্টেট আপনার বিধি ব্যবস্থায় স্থির থাকিতে পারে না, ভাঙ্গিয়া পড়ে; তেমন সামাজিক ধর্ম্মও মানিয়া চলিতে যদি লোকে অভ্যস্ত না হইয়া উঠে, স্বেচ্ছাচারের বিদ্রোহ যদি প্রবল হইয়া দাঁড়ায়, কেবল বর্জ্জন-বহিষ্কারের বলেই কোনও সমাজ আপন ধর্ম্মে স্থির থাকিতে পারে না, বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে।

তাই যাহা কিছু লইয়া সমাজধর্ম্ম, সাধারণ conventionই হউক কি উচ্চতর কোনও চরিত্রনীতির প্রতিষ্ঠাই হউক, তাহাকে মানিয়া চলিবার দিকেই লোকমতকে ও লোকচরিত্রকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, ভাঙ্গিবার দিকে নয়। সমাজের মহাজন যাঁহারা, চরিত্রমাহাত্ম্যে সাধারণতঃ এইরূপ সব আচারনিয়মের অতীত হইলেও, সমাজের মঙ্গলে, লোকস্থিতির প্রয়োজনে, লোকাচার বা convention লঙ্ঘন করিয়া তাঁহারা চলেন না, যদি সত্যই এ সব বিকৃত ধর্ম্মের কদাচার না হয়। কারণ তাঁহারা জানেন,

> "যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
> স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥"
>
> [গীতা—৩-২১]

ইহাতে কোনওরূপ বন্ধনে তাঁহাদের উন্নত ও মুমুক্ষু আত্মা বদ্ধ হইল, ইহাও মনে করিবার কারণ নাই,—কারণ,

"সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্ বিদ্বাংস্তথাঽশক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥"

[গীতা,—৩-২৫]

লোকাচার মানিয়া চলিলে ছোট হইলাম, মনুষ্যত্ব হারাইলাম, ইহা সঙ্কীর্ণচেতার কথা। মহান্ ও উদার যাঁহারা, লোকসংগ্রহের প্রয়োজনে ইহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া তাঁহারা অনুভব করেন, এবং আনন্দে তাহা পালন করেন।

তবে লোকাচার যদি কদাচার হয়, নীতি যদি কুনীতি হয়, তখন? কিন্তু জনে জনে কি ইহার বিচার করিয়া নিয়া ঠিকপথ ধরিতে পারে? ধর্ম্মের যখন এরূপ বিকার ঘটে, সাধারণ লোকের পক্ষে তখন—

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সম্মুখে এরূপ মহাজন কেহ তখন না থাকিলেও, মহাজনের অনুমত ও অনসৃত পথ কি, চাহিলে তাহা খুঁজিয়া নিতে অনেকেই পারে; যাহারা পারেনা, তাহাদেরও দেখাইয়া দিতে পারে।

অনেকেই আমরা মনে করি, সকল নিয়মের, সামাজিক সকল বিধিনিষেধের, অতীত হইয়া যথেচ্ছ ভাবে চলিতে পারিলে,—আকাঙ্ক্ষিত ভোগ্য যাহা কিছু স্বচ্ছন্দে প্রাণ ভরিয়া সব ভোগ করিতে পাইলে,—ব্যক্তিগত জীবনে অন্ততঃ মানব পরম সুখের অধিকারী হইবে। কিন্তু ইহাও বড় ভুল ধারণা। সুনীতির পথে, নিয়মের সংযমের মধ্যে, পার্থিব এই জীবনের ভোগেও যত বেশী কৃতার্থতা মানুষ লাভ করিতে পারে, যথেচ্ছাচারে তাহা পারে না। সংযমীর আর যথেচ্ছাচারীর জীবনের তুলনা করিলেই এই সত্য সকলে অনুভব করিবেন। যাহাহউক, এইরূপ সুখের মোহ যদিও কিছু থাকে এবং সেই মোহে সকল সুনীতির শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া সকলে বাহির হয়, প্রবলের বড় যথেচ্ছাচার অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলের ছোট ছোট সকল যথেচ্ছ ভোগের প্রয়াসকে এমনই ভাবে দলিয়া মলিয়া চলিবে, যে এরূপ কোনও সুখের

আশায় ধরিবার মত কোনও বস্তু, কোনও অবসর কি শক্তি কিছুই তার থাকিবে না।

ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সর্ব্বগ্রাহী ধনীর অবাধ প্রতিযোগিতায় দরিদ্রের দশা যেরূপ হইয়াছে, সামাজিক অন্য যত কিছু সুখভোগের প্রয়াসেও তাহাই হইবে।

হিন্দুসমাজ ও তাহার বিশিষ্টতা।

সমাজজীবনে কি আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং এই আদর্শে কিরূপ পরিণতি তাহাকে দান করিয়াছে, মানবের মঙ্গলস্থাপনায় সেই আদর্শে সেই পরিণতি কতদূর সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, মানবসভ্যতা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, যে কোনও জাতির মধ্যেই হউক, তাহার মূল্যনিরূপণে এই সব বিষয়ের পরীক্ষা ও বিচার আমাদিগকে করিতে হইবে। কারণ এই সভ্যতার বিশিষ্ট গুণ যাহা, শক্তি যাহা, মহিমা যাহা, সমাজজীবনেই তাহা প্রধানতঃ মূর্ত্ত হইয়া দাঁড়ায়।

এই বিশ্বজগৎ—ভগবৎসত্তার ব্যক্ত রূপ এই নিসর্গ (Immanent Nature)—তাহার এক মহাধর্ম্মে ধৃত, আশ্রিত। মানবজীবন এই বিশ্বজগতে তাহারই একটি বিশিষ্ট ভাব এবং মানবধর্ম্মও নৈসর্গিক সেই ধর্ম্মের বিশিষ্ট একটি প্রকাশ। এই ধর্ম্মের সনাতন ও শাশ্বত যে সব নীতি, কোনও সমাজের নীতির আদর্শ যত তাহার অনুবর্ত্তী হইবে, জীবন যত তাহার পথে সেই মহাধর্ম্মের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে, মঙ্গলের ভাগীও সেই সমাজ যে তত বেশী হইবে, ইহা বলা অতি সাধারণ একটি সত্যেরই উল্লেখ করা মাত্র। হিন্দু-সমাজ এই মহাধর্ম্মের আদর্শ ধরিয়া তাহারই সেই সব সনাতন ও শাশ্বত নীতির পথে কতদূর চলিতে পারিয়াছে, ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে হিন্দুর জীবন কি বিশিষ্ট প্রকৃতি ধরিয়া তাহার প্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং বিশিষ্ট কি সব মঙ্গলের ভাগীই বা তাহার ফলে হইয়াছে, সামাজিক ধর্ম্মস্থাপনায় ভারতীয় হিন্দু সভ্যতার মূল্য নিরূপণ অন্যান্য সভ্যতার তুলনায় তাহারই প্রমাণে আমাদের হইবে।

হিন্দুসমাজের এই সব বিশিষ্টতার তত্ত্বকে বুঝিবার, বিশেষ ভাবে তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিবার, প্রয়াসই 'হিন্দুসমাজ-বিজ্ঞান' নামক এই গ্রন্থের মূল লক্ষ্য। এই বিশিষ্টতার তাৎপর্য্য বুঝিতে, ইহার মূল্য

নিরূপণ করিতে, তুলনামূলক যে আলোচনা ও বিচার আবশ্যক, আধুনিক ইয়োরোপীয় সমাজকেই সেই তুলনার প্রধান উপলক্ষ্য বলিয়া আমি গ্রহণ করিয়াছি, এবং কেন করিয়াছি, পূর্ব্বে অনেক স্থলেই, বিশেষ ভাবে অবতরণিকার শেষভাগে এবং ৪৪৮-৫৪ পৃষ্ঠায়, তাহার কারণ বিবৃত করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আর দুই একটি কথা মাত্র প্রসঙ্গক্রমেএইস্থলে বলা যাইতে পারে।

প্রাচীনতর অন্য যত সমাজের অভিব্যক্তি এই জগতে হইয়াছে, সবই আপ্তবাক্য, স্মৃতি ও পরম্পরাগত সদাচার প্রভৃতিতে মূর্ত্ত কোনও না কোনও ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই তাহার বিশিষ্ট স্বরূপতা লাভ করিয়াছে। এই সব ধর্ম্ম দেশকালপাত্রভেদে নৈসর্গিক সেই মহাধর্ম্মেরই বিভিন্ন রূপ। যে দেশে যে যুগে মানবস্বভাবের যে অবস্থায় যেরূপ প্রয়োজন হইয়াছে, সেই ভাবেই এইসব ধর্ম্ম ঋষির দৃষ্টিতে, জ্ঞানীর জ্ঞানে, আচার্য্যের উপদেশে, জনগণের সহজ বুদ্ধিপ্রসূত লোকাচারে, বিচিত্র অঙ্গে মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিয়াছে *। হিন্দুর সমাজ-ধর্ম্মও এই ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে, সুতরাং ইহাদের সঙ্গে প্রকৃত কোনও বিরোধ হিন্দুসমাজের নাই। পার্থক্য যাহা দেখা যায়, কতক তাহা দেশকালপাত্র-গত পার্থক্যহেতু বহিরঙ্গের পার্থক্য, আর কতক পরিণতির মাত্রায় পার্থক্য।

কিন্তু আধুনিক ইয়োরোপীয় র‍্যাসনালিজম্ নৈসর্গিক এই মহধার্ম্মের অস্তিত্বকেই একেবারে অস্বীকার করিয়া, স্বতন্ত্র ও প্রতিযোগিতাপরায়ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারকে জীবননীতির একমাত্র নিয়ামক বলিয়া ধরিয়া নিয়া, সমাজকে তাহারই অনুবর্ত্তী করিয়া রাখিতে চাহিয়াছে। ধর্ম্ম নয়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র (democratic State) তাই ইয়োরোপীয়

* ৫ম প্রবন্ধ ও ৬১৬-১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সমাজ প্রধানতঃ ষ্টেট্‌রূপ যে মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকাশ পায়, তাহাও এইরূপ কোনও না কোনও ধর্ম্মের ভিত্তিতে আশ্রিত ছিল। তাহাকে অস্বীকার করিয়া, তাহারা নিরপেক্ষ হইয়া, চলে নাই।

সমাজের প্রধান ভিত্তি ও আশ্রয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; এবং সমাজ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংহতির (democratic Nationalityর) মূর্ত্তিতে পরিণত হইতেছে। সামাজিক যত কিছু সম্বন্ধ, সমাজজীবনের যত কিছু ব্যাপার, সবই ইহার রাষ্ট্রসমিতির বা পার্লামেণ্টের ভোটের আমলে গিয়া পড়িতেছে, এবং পূর্ব্বতন ধর্ম্মের ও আচারনীতির (Religion and Customs এর) অধিকার লোপ পাইতেছে। হিন্দুসমাজ ও প্রাচীন অন্য সব সমাজের আদর্শে এবং আধুনিক ইয়োরোপীয় সমাজের আদর্শে এই যে পার্থক্য, ইহা কেবল প্রকাশের একটা বৈচিত্র নহে, তাহার মাত্রার বা স্তরের ভেদও নহে,—মূল ধর্ম্মেরই ভেদ, যাহাকে বিরোধই বলা যাইতে পারে,—একেকে ধরিলে অন্যকে যাহাতে ছাড়িতে হয়।

ন্যাসনালিষ্ট ইয়োরোপের ব্যক্তিত্বপ্রধান এই সভ্যতা ও তাহার ডিমক্রাটিক ন্যাসনালিটীর আদর্শ নানা কারণে আধুনিক জগতের চিন্তা-রাজ্যে ও বাস্তব জীবনের উপরে এমনই এক আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, যে সকলেই প্রায় ইহাকে সভ্যতার ও সমাজজীবনের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এবং আপন আপন ধর্ম্মকে বর্জ্জন করিয়া, যাহার যতদূর সাধ্য, ইহারই অনুবর্ত্তন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। হিন্দুসমাজের উপরেও এই প্রভাব অত্যধিক পরিমাণে আসিয়া পড়িয়াছে ; এবং ঠিক ইয়োরোপীয় আদর্শে হিন্দুসমাজকে নূতন করিয়া ভাঙ্গিয়া গড়া সম্ভব হউক কি না হউক, তাহার আপন বিশিষ্ট স্বরূপ ও তাহার ধর্ম্ম যে এই প্রভাবে দ্রুত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, এই সত্যকে আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। ভাঙ্গিয়া ইয়োরোপীয় সভ্যতায় আত্মবিলোপ, অথবা আপন স্বরূপে, আপন ধর্ম্মে স্থিতি লাভ, ইহার কোন্‌টি তাহার পক্ষে শ্রেয়, তাহা আমাদের ধীরভাবে ভাবিবার ও তুলনামূলক তথ্যের ও যুক্তির প্রমাণে বিচার করিয়া দেখিবার বিষয় বটে। কেবল আমাদের পক্ষেই বা বলি কেন, পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন যত সমাজের স্বধর্ম্মের ভিত্তি ইয়োরোপীয়

সভ্যতার প্রভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, সকলেরই এই সব কথা ভাবিবার ও এইভাবে বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। আপন সভ্যতার উদ্দাম অগ্রগতির প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রলেটারিয়েট বিদ্রোহে ও কমিউনিষ্ট বিপ্লবে নূতন যে সব বিভীষিকার সূচনা ইয়োরোপে দেখা দিয়াছে, তাহার ফলে কিছু কিছু চমক যে লোকের না লাগিয়াছে, ধীরবুদ্ধি ও চিন্তাশীল প্রবীণ ব্যক্তিদের দৃষ্টিও যে এইসব দিকে কিছু কিছু আকৃষ্ট না হইতেছে, তাহা বলা যায় না। আধুনিক ইয়োরোপের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের সঙ্গে যাঁহারা সুপরিচিত, আধুনিক রাষ্ট্রীয় সাহিত্য যাঁহারা বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, অন্ততঃ এই কথাটি সকলেরই মনে হইবে, ন্যাসনালিষ্ট ইয়োরোপের জীবননীতির আদর্শ যদি এতই শ্রেষ্ঠ আদর্শ এবং সেই আদর্শে গঠিত ডিমক্রাটিক সব ষ্টেট্ ও ন্যাসনালিটীই যদি সমাজধর্ম্মের ও সমাজজীবনের শ্রেষ্ঠ পরিণতি, তবে তার মধ্যে দুঃখভারাক্রান্ত জনগণের বিদ্রোহে এত বড় একটা সমাজবিপ্লবের সূচনা দেখা দিয়াছে কেন।

এই আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে দ্বিধা এ অবস্থায় অবশ্যম্ভাবী, এবং ইহা অনুকরণীয় কি বর্জ্জনীয়, এসব কথাও লোকের মনে হইবে। যদি বর্জ্জনীয় বলিয়া মনে হয়, আপন আপন সমাজকে, ইহার প্রভাব হইতে রক্ষাও করিতে হইবে। এদিকে মনই কাহারও যাইবে না, যদি না সেই মন আগে ইয়োরোপীয় সভ্যতার মোহপাশ-হইতে মুক্ত হয়। ইহার জন্য সকলের আগে প্রয়োজন আপন সমাজধর্ম্মের বৈশিষ্টের তত্ত্বকে বুঝিয়া নেওয়া এবং তাহা নিতেও হইবে ইয়োরোপীয় সামাজিক আদর্শের সঙ্গে তুলনায়।

কেবল ভারতীয় হিন্দুর পক্ষে নয়, প্রাচীন অন্যান্য সকল সমাজের পক্ষেই তুলনায় এইরূপ আলোচনার ও বিচারের সময় আসিয়াছে। তবে প্রাচীন এই সব সমাজ বার্দ্ধক্যের ভারে ও বহু ব্যাধিতে জীর্ণ ও অতি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। নবজীবন সঞ্চারে বহু জীর্ণতার সংস্কার ইহাদের মধ্যে আবশ্যক। কিন্তু এই জীবনসঞ্চার, জীর্ণতার

সংস্কার, যার যার ধর্ম্মে স্থির থাকিয়া, ধর্ম্মের নিয়মেই সকলকে করিতে হইবে, এবং তাহার অবসরও সর্ব্বত্র আছে। আছে, ছিল, এবং ছিল বলিয়াই কালোপযোগী নবজীবনসঞ্চারের ও সংস্কারের বলে এইসব সমাজ এখনও জীবন্ত রহিয়াছে। এখনই মরিতেছে পরধর্ম্মের অন্ধ অনুকরণে। ব্যাধিগ্রস্ত স্বধর্ম্মের যথাপ্রয়োজন সংস্কারে নবশক্তিতে জাগিয়া উঠিতে পারা সকল সমাজেরই জীবনের লক্ষণ, এবং এই সংস্কারেই সমাজ জীবিত থাকে। কিন্তু স্বধর্ম্মত্যাগে পরধর্ম্মের ঐকান্তিক অনুচিকীর্ষা সংস্কার নহে; মারাত্মক ব্যাধি।

যাহাহউক, তুলনামূলক এই যে বিচার 'হিন্দুসমাজবিজ্ঞানে'র লক্ষ্য, সেই বিচারে আগে আমাদের দেখিতে হইবে ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে মানবজীবনের নৈসর্গিক মহাধর্ম্ম কি। তারপর দেখিতে হইবে, আধুনিক ইয়োরোপীয় ও প্রাচীন ভারতীয়—কোন্ সভ্যতা সমাজজীবনকে সেই মহাধর্ম্মের সত্যে স্থির রাখিতে পারিয়াছে, এবং মানবের মঙ্গলসাধনায় অধিকতর সফল হইয়াছে।

অবতরণিকার শেষ অংশে এই প্রস্তাবনা করিয়াই এই গ্রন্থ আমি আরম্ভ করিয়াছি। প্রথম কয়েকটি প্রবন্ধে মানবের সেই মহাধর্ম্ম ও তাহার নীতির আদর্শ কি, তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। তারপর ষষ্ঠ হইতে একাদশ সংখ্যক আরও ছয়টি প্রবন্ধে সমাজজীবনে ইয়োরোপায় সভ্যতার পরিণতির কথা যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি। এই আলোচনায় বোধহয় ইহাও দেখাইতে পারিয়াছি, যে মানব মহাধর্ম্মের যে সত্য, তাহার পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ইয়োরোপীয় সভ্যতা যে আদর্শ ধরিয়া মানবজীবনকে যে পথে পরিচালিত করিয়াছে, তাহা মঙ্গলের পথ নহে; এবং ইহার প্রতিক্রিয়ায় নূতন যে সব আদর্শের কল্পনা ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে, সে সবও সেই সত্যের পথ নহে, এবং মানবের অমঙ্গল বই মঙ্গল তাহাতেও কিছু হইবে না।

সমাজজীবনে ইয়োরোপীয় সভ্যতার আধুনিক পরিণতি ও তাহার প্রতিক্রিয়া প্রভৃতির তত্ত্ববিবৃতি ও আলোচনা এইগ্রন্থের

পক্ষে হয়ত কিছু বেশী ভারী হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইহার মহিমা সম্বন্ধে যে মোহ জগৎকে এবং জগতের সঙ্গে ভারতবাসী আমাদিগকেও যে ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা কতক পরিমাণে অন্ততঃ অপনোদিত না হইলে সামাজিক ধর্ম্মস্থাপনায় ভারতীয় হিন্দুসভ্যতার বৈশিষ্ট ও তাহার মূল্য কি, সহজে তাহা আমরা ধরিতে পারিব না। তাই একটু বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম ভাবেই এই আলোচনার প্রয়োজন হইয়াছে।

হিন্দু সমাজের এই বৈশিষ্টসম্বন্ধে অবতরণিকায় অনেক কথারই অবতারণা করা হইয়াছে। তারপর মানবজীবনের নৈসর্গিক মহাধর্ম্ম কি তার সম্বন্ধে এবং নব্য ইয়োরোপের র‍্যাসনালিষ্ট নীতি ও তাহার ফলাফল সম্বন্ধে, পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধগুলিতে সে সব আলোচনা করা হইয়াছে, প্রসঙ্গক্রমে তার মধ্যেও এই বৈশিষ্টের অনেক তত্ত্বের ও তথ্যের কথা আসিয়া পড়িয়াছে।

এই ভারতভূমিতে, হিন্দু নামে পরিচিত বিচিত্র এক মানবমণ্ডলী যে ধর্ম্মে তাহার এই বিশিষ্টস্বরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে, নৈসর্গিক সেই মানব মহাধর্ম্মের সত্যই যে তাহার মূল ভিত্তি, পূর্ব্বোক্ত আলোচনার পর ইহা আর নূতন করিয়া কাহাকেও বলিতে হইবে না। তবে এই সত্য কি ভাবে কতটা তার এই স্বরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, কি প্রকৃতিতে কি আকার ধরিয়া তাহার ফলে ইহা অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে, কি সব গুণে কি মঙ্গলের ভাগী তাহাতে হইয়াছে, হিন্দুজীবনে বিশিষ্ট কি চরিত্রের আদর্শ তাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা অবশ্য বলিবার আছে। কিন্তু এই গ্রন্থে তাহার আর অবসর হইল না। যথাসম্ভব সংক্ষেপে সাধারণ ভাবে এই সম্বন্ধে কয়েকটি মাত্র কথা বলিয়া আপাততঃ ইহার উপসংহার আমাকে করিতে হইবে। যদি পারি, ভগবান্ যদি সে সুযোগ দেন, অপর কোনও গ্রন্থে এইসব কথার বিস্তৃত আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

১। হিন্দুজীবন—সমাজ ও ধর্ম্ম

সমষ্টিভাবে হিন্দুজীবনের বৈশিষ্ট সম্বন্ধে, প্রথম কথা, সব চেয়ে বড় কথা এই, যে ষ্টেটরূপ কোন রাষ্ট্রীয় শক্তির আশ্রয়ে, 'নেশন' রূপ কোনও রাষ্ট্রীয় মূর্ত্তি ধরিয়া ইহা গড়িয়া উঠে নাই। রাষ্ট্রনীতি বা politics নহে, তাহার অতীত—super-political—ধর্ম্ম ইহার ভিত্তি; ইহার সংহতির বন্ধন ও আশ্রয়; তাই poliitical life ও nationality (রাষ্ট্রীয় জীবন ও রাষ্ট্রীয় জাতীয়তা) বলিতে অধুনা আমরা যাহা বুঝি, তাহা এ দেশে দেখা দেয় নাই। দিয়াছিল রাষ্ট্রনিরপেক্ষ, রাষ্ট্রাতীত ধর্ম্মাশ্রিত সামাজিক জীবন। জর্ম্মণ রাষ্ট্র-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ব্লুণ্টস্‌লি (Bluntschli) সাহেব People বলিয়া যেরূপ মানবসমষ্টির সংজ্ঞা দিয়াছেন, হিন্দুসমাজ মোটেব উপরে সেইরূপ একটা বস্তু। সমান যে Civilisation (*Kultur*) তিনি এই সমষ্টির আশ্রয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাকেই অথবা সমাজনিয়ন্তৃরূপে তাহারই কার্য্যকরী শক্তির পদ্ধতিকে ইহার এই ধর্ম্ম বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি। *

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই ধর্ম্মই সেই মানব মহাধর্ম্ম, ভারতের বেদে ও স্মৃতিতে, সাধুগণের শীলে, দেশকালপাত্রবৈচিত্র্য-গত বিচিত্র সব লোকাচারে, † দেশের বিশিষ্ট অবস্থায় বিশিষ্ট এক বিচিত্র মূর্ত্তিতে যাহা

---

* অবতরণিক ৩৭ ও ৩৮ পৃষ্ঠা।

† এই লোকাচারের মধ্যে সদাচার ও কদাচার দুই অবশ্য দেখা দিয়াছে, সর্ব্বত্রই দিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, সদাচারই ধর্ম্ম, আর কদাচার তাহার বিকার মাত্র। এই বিকার যখন প্রবল হইয়া লোকের অমঙ্গলের হেতু হইয়াছে, তাহার সংস্কারও তখন ঘটিয়াছে। বেদে নাই, স্মৃতিতে নাই, এমন বহু রীতিনীতি কেবল নয়, প্রতিষ্ঠান বা Institutionও গড়িয়া উঠিয়াছে,—পরম্পরাক্রমে লোকসমাজের মধ্যে চলিয়াছে।—লোকপরম্পরাগত এই সব প্রতিষ্ঠানও লোকাচারের অন্তর্ভুক্ত।

অভিব্যক্ত হইয়াছে, এবং আত্মহৃদয়ে প্রেয় বলিয়া অনুভব করিয়া যাহার শ্রেয়ের পথে প্রধানতঃ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই লোকে চলিয়াছে, চলিয়া সেই পথে চলিতেই অভ্যস্ত হইয়াছে। * আর তাই যাহাতে হয়, আচার্য্যগণ সেই ভাবেই লোকশিক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

অবতরণিকায় এবং ইয়োরোপে র‍্যাসনালিজম্ নামক ষষ্ঠ প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি, ইয়োরোপীয় সব ষ্টেট, কেমন করিয়া ক্রমে secular (ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ) এবং democratic (গণতান্ত্রিক) হইয়া উঠিয়াছে। এই সব ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক সব ষ্টেটও আবার কি ভাবে যে কেমন centralised (কেন্দ্রায়ত্ত) অতি বৃহৎ এক একটি শক্তিচক্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং সামাজিক বহুবিধ কর্ম্মও যে কিভাবে তাহাদের আয়ত্তিতে আসিয়া পড়িয়াছে, 'প্রতিক্রিয়া—রীতি ও গতি' নামক দশম প্রবন্ধের এনার্কিজম নামক পরিচ্ছেদে তাহা বিবৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে এবং পরবর্ত্তী একাদশ প্রবন্ধের প্রথম অংশে ইহাও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি, এইরূপ সব ষ্টেটের আইনের শাসন, সমাজজীবনের উপরে তাহার একরূপ সর্ব্বগ্রাহী প্রভুত্ব, এই প্রভুত্বের উপরে সমাজের একান্ত নির্ভরশীলতা, মানবের পক্ষে সুখের ও মঙ্গলের হেতু হয় নাই, বরং বহু দুঃখের ও অমঙ্গলেরই সৃষ্টি করিয়াছে, এবং ধর্ম্মনিরপেক্ষ ষ্টেট বা রাষ্ট্রশক্তি নহে, রাষ্ট্রাতীত ধর্ম্মই সমাজের মঙ্গলের আশ্রয়, সত্যকার ধারক শক্তি, জীবননীতির মূল নিয়ন্তা। যত বেশী রাষ্ট্রশক্তির শাসনপাশ হইতে মুক্ত থাকিয়া স্বচ্ছন্দগতিতে এই ধর্ম্মের পথে মানবের জীবনচক্র পরিচালিত হইবে, তত যে সকল শ্রেণীর মানবই সুখী ও মঙ্গলের ভাগী বেশী হইবে, ইহাও এই প্রসঙ্গে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এই ধর্ম্ম কি এবং সমাজের ধারক ও নিয়ামক শক্তি বা Social Policyরূপে ইহার মূর্ত্তি কি আকারে কি কি ভাবে সাধারণতঃ গড়িয়া উঠে, পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চম প্রবন্ধে তাহারও মোটামুটি একটা আলোচনা করিয়াছি।

* ১১৬—২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শাস্ত্রীয় ধর্ম্মপদ্ধতি (Religion and Church), রাষ্ট্রীয় শাসনপদ্ধতি বা দণ্ডনীতি (State) এবং আচারব্যবহারের রীতি (Customs), ত্রিবিধ এই factor বা মূল-করণের পরস্পর-সাপেক্ষ সমবায়েই যে সাধারণতঃ এই Social Policy বা সমষ্টির ধর্ম্ম মূর্ত্ত হইয়া দাঁড়ায়, ইহাও এই আলোচনায় দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এই তিনেরই মূল হইতেছে এক সেই ধর্ম্ম বা (*Dharma* or Cosmic Moral order) *, মনু সংহিতার মতে বেদে স্মৃতিতে ও সদাচারে যাহার বহিঃস্বরূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই হিসাবে দণ্ডনীতি সাধারণতঃ ধর্ম্মনীতিরই অন্তর্ভুক্ত, এবং এদেশে ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যেই দণ্ডনীতি ও রাজধর্ম্মও বড় একটা স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহাই Politics, যাহাকে সাধারণতঃ আমরা এখন রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি এই নাম দিয়া থাকি। কিন্তু আধুনিক ইয়োরোপীয় secular Politicsএর প্রভাবে এই রাষ্ট্রনীতিকে ধর্ম্মনীতি-হইতে একেবারে স্বতন্ত্র একটা বস্তু বলিয়া আমরাও মনে করি। ব্যক্তিগত ভাবে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবন (spiritul ও moral life) বলিতে সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝি, তাহারই নীতি মাত্র এই মনোভাবে ধর্ম্মনীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এবং ব্যক্তিগত বুদ্ধি কি বিবেক যে নামেই ব্যক্ত করি, 'স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ' যাহা, আত্মতুষ্টি যাহাতে হয়, তাহার উপরে বেদ স্মৃতি কি সদাচার (Religion কি Customs) কিছুকেই এই ধর্ম্মনীতির কোনও প্রমাণ বলিয়া সহজে আমরা মানিতে

---

* এই Cosmic Moral order ব্যতীত ইংরেজীতে এমন কোনও নাম আর নাই, যাহাদ্বারা এই 'ধর্ম্ম' কথাটার তাৎপর্য্য ঠিক বুঝান যাইতে পারে। Religion শব্দটা বিশেষ যে অর্থে এখন প্রযুক্ত হয়, এই ধর্ম্মের অর্থ তাহা নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা কেহ 'Law' এই কথাটাই ব্যবহার করেন, কেহ বা ইংরেজী অক্ষরে 'Dharma' নামই এখন গ্রহণ করিতেছেন। Religionও হয় না, Law এই নামেও ঠিক হয় না। যে ভাষাতেই হউক, ধর্ম্মের 'ধর্ম্ম' (Dharma) এই নামই ঠিক নাম। (১৪৯ ও ১৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

চাহিনা। আর এদিকে সমষ্টি জীবনের যাহা কিছু স্বার্থ বা মঙ্গলের হেতু interests of public or communal life বলিতে যাহা কিছু বুঝায়—সবই secular politics বা ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতিক বিষয় বলিয়া আমরা ধরিয়া নিয়াছি, এবং তাহাই সমষ্টি জীবনের, একমাত্র না হউক, প্রধান আকর্ষণের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা মনে করি, সুদৃঢ় একটা রাষ্ট্রীয় সংহতিতে ধরিয়া রাখিতে না পারিলে, জীবন্ত ও শক্তিশালী কোনও সমষ্টি-জীবনই সম্ভব হয় না, সুতরাং সেই লক্ষ্যই হইবে সমষ্টির কর্ম্মপ্রচেষ্টার প্রধান লক্ষ্য, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রই হইবে সমষ্টির প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র, আর সামাজিক অন্যান্য সকল স্বার্থকেই মূল এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থের অনুবর্ত্তী করিয়া আমাদের রাখিতে হইবে। সমষ্টি-জীবনকেই দৃঢ়সংহত একটা রাষ্ট্রীয় জীবনের মূর্ত্তি দান করিতে হইবে; আর সেই রাষ্ট্রীয় জীবন হইবে, একেবারে secular ও democratic—ধর্ম্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক—রাষ্ট্রীয় জীবন। Secular democratic State—ধর্ম্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র—সত্য সত্যই যদি মঙ্গলের পথে সমষ্টিজীবনের একমাত্র বা সর্ব্বপ্রধান ধারক ও রক্ষক হয়, তবে তাহাই অবশ্য করিতে হইবে। কিন্তু তাহা যদি না হয়? তাহা যে নয়, ধর্ম্মনিরপেক্ষ ষ্টেট্ নহে, ষ্টেটের অতীত ধর্ম্ম—নৈসর্গিক মানব মহাধর্ম্ম বা Cosmic Moral order এরই মূর্ত্তিরূপে বিভিন্ন দেশের ও সমাজের বেদে স্মৃতিতে ও সদাচারে যাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে —ষ্টেট নহে, সেই ধর্ম্মই যে ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবের অখণ্ড এক সমগ্রতায় মানবজীবনের মঙ্গলময় ধারক ও নিয়ামক, ষ্টেটেরও ধারক ও নিয়ামক, পূর্ব্বেই তাহা আমরা দেখিয়াছি। ইহাও দেখান হইয়াছে, রাষ্ট্রশাসন ও দণ্ডনীতির অধিকার—ষ্টেট-প্রভুত্বের সীমা – যত সঙ্কুচিত হইবে, যত বেশী মানুষ এই ধর্ম্মের নিয়মে তাহার নৈসর্গিক বিশিষ্টতায় ধারায় জীবনযাত্রা পরিচালনা করিবার স্বচ্ছন্দ অবসর পাইবে, স্বধর্ম্মে তাহার জীবনের শক্তি তত বেশী স্ফূর্ত্ত হইয়া উঠিবে, তত বেশী মঙ্গলের ভাগী সে হইবে।

সেই সব প্রমাণে এই সত্যকে যদি আমরা স্বীকার করিয়া নিই, মানবজীবনে Politics বা রাষ্ট্রনীতির স্থান অতি নগণ্য হইয়া পড়ে। দেশকালপাত্রগত বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, রাষ্ট্রশাসন-পদ্ধতি গণ-তান্ত্রিক, অভিজাত-তান্ত্রিক, ধর্ম্মতান্ত্রিক কি রাজতান্ত্রিক (Democratic, Aristocratic, Theocratic কি Monarchic), যেখানেই যেরূপ আকার ধরিয়াই উঠুক না কেন, এমন বেশী কিছু তাহাতে আসে যায় না। কারণ এই শাসন এ অবস্থায় ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করে না; যোগ্য নায়কবর্গের নেতৃত্বে তাহার পথে তাহারই নীতির অধীন হইয়া সাধারণতঃ চলে।

আধুনিক ডিমক্রাসীর দাবীর জোরও এই সত্যকে স্বীকার করিলে অনেক কমিয়া যায়। একরূপ থাকে না বলিলেও হয়। পূর্ব্বে অনেক স্থলেই বলিয়াছি, সেই দাবীর মূল হইতেছে, মানবের জীবননীতি সম্বন্ধে ইয়োরোপায় র‍্যাসনালিজমের আদর্শ। মানুষ সব এই আদর্শে স্বতন্ত্র ও সমান, অথচ এই সব স্বতন্ত্র ও সমান মানুষকে বহু সমান স্বার্থে মিলিয়া এক সমাজভুক্ত হইয়া থাকিতে হইবে, এবং সেই সমাজকে রক্ষাও করিতে হইবে। কিন্তু কি প্রকারে তাহা হইতে পারে? প্রত্যেক মানুষের স্বীয় বুদ্ধির প্রমাণ ব্যতীত আর কোনও প্রমাণে সিদ্ধ কোনও ধর্ম্মের কোনও প্রভুত্ব র‍্যাসনালিজম্ মানে না; প্রাচীন কোনও আইন কানুন কি আচার-নিয়মের কোনও অধিকারও স্বীকার করে না। সুতরাং সকলের সমান সম্মতিতে গঠিত ও পরিচালিত কোনও শক্তিচক্র-ব্যতীত সামাজিক স্বার্থসংরক্ষণের অধিকারী আর কেহ বা কিছুই হইতে পারে না। সমাজসংহতির ধারক ও সামাজিক স্বার্থের সংরক্ষক এই শক্তিচক্রই ডিমক্রাটিক ষ্টেট বা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। অন্য যত রকম শক্তিচক্র বা organisation ডিমক্রাটিক নীতিতে গঠিত ও পরিচালিত করা সম্ভব হউক, ষ্টেটের মধ্যে থাকিয়া ষ্টেটের উপরে নির্ভর করিয়াই তাহাকে চলিতে হইবে; নতুবা

কার্য্যতঃ তাহার কোনও কর্তৃত্ব কাহারও উপরে চলিতে পারে না।

ব্যক্তিগতভাবে মানুষের কোনও অধিকারে হস্তক্ষেপ না করিয়া কেবল জনগণের সমান স্বার্থ ও সমান মঙ্গলের বিষয় যাহা কিছু তাহার সংরক্ষণাদি কল্পে এবং সামাজিক জীবনের স্থিতি ও উন্নতি কল্পে যাহা কিছু করিতে হয়, জনগণের প্রতিভূস্বরূপ, তাহাদের সমবেত ইচ্ছার ও কর্ম্মশক্তির যন্ত্রস্বরূপ, এই গবর্মেণ্টই করিবেন। জনগণের প্রতিনিধিসভার ভোটে যে সব আইন হইবে, তদনুসারেই এই সব কাজকর্ম্ম চলিবে, এবং সে সব সম্পাদনের ভার থাকিবে, ইঁহাদের বিশ্বস্ত ও ইঁহাদেরই কাছে দায়ী কর্ম্মচারীবর্গের (Executive officers of Government এর) হাতে। বলাবাহুল্য, ইঁহাদের এই ভোটে পাশ করা আইন ব্যতীত আর কিছুরই কোনও বিধি-ব্যবস্থা সমাজের উপরে এ অবস্থায় চলিতে পারে না, এবং সমাজস্থিতিই নির্ভর করে একেবারেই এই সব আইনের উপরে।

এখন এই সব আইনের scope বা অধিকারের সীমা কত দূর যাইতে পারে? এক ব্যক্তিগত জীবনের কোনও অধিকারের উপরে এই সব আইন কোনও হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না, এই একটা কথা আছে। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের পৃথক অধিকার ও সামাজিক সমবেত অধিকার—এই দুইয়ের মধ্যে ঠিক একটি সীমা রেখা কেহই বড় টানিয়া দিতে পারেন নাই, দেওয়াও সহজ নহে। আধুনিক বহু ডিমক্রাটিক ষ্টেট্ পূর্ব্বে যে সব সীমার মধ্যে থাকিতে চেষ্টা করিতেন, আর এখন তাহা পারিতেছেন না, লোকরক্ষার প্রয়োজনে নিষিদ্ধ ক্ষেত্রেও অনধিকার প্রবেশ করিতে বাধ্য হইতেছেন; এবং ক্রমে যে ব্যক্তিগত সব অধিকারকেই একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিতে পারেন, তাহারও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। ডিমক্রাসীর ভোট তাহা করিলে, বিপ্লবে সেই ডিমক্রাসীকেই ভাঙ্গিয়া ফেলা ছাড়া আর কোনও উপায়ও নাই।

দেশশাসনের জন্য বিধিব্যবস্থার প্রণয়ন বা ব্যবস্থাপন এবং সেই সব বিধিব্যবস্থা অনুসারে শাসন (Legislation ও Administration) —এই দুইটিকে গবমেণ্টের প্রধান দুইটি function বা কর্ম্মের ভাগ বলিয়া পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে legislative function বা ব্যবস্থাপন রূপ কর্ম্মের ভাগের গুরুত্বই অনেক বড়, কারণ সামাজিক মঙ্গলামঙ্গল তাহার উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করে, শাসন তাহার নির্দ্দেশেই পরিচালিত হয়। গণ-তান্ত্রিক পার্লামেণ্ট বা প্রতিনিধি-সভাও তাই সাক্ষাৎ ও প্রধান ভাবে বিধিব্যবস্থা-প্রণয়ণের কাজ করেন এবং শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে সাধারণতঃ হস্তক্ষেপ করেন না। এই মাত্র কেবল দেখেন, শাসন তাঁহাদের মনোমত ও বিশ্বস্ত লোকের হাতে থাকে এবং তাঁহাদের প্রণীত আইন অনুসারে চলে। এই Legislation বা ব্যবস্থাপনাও আবার দুই রকম। এক সামাজিক (social), অপর শাসনসংক্রান্ত বা (administrative.)

প্রচলিত যে ধর্ম্মনীতি এবং পরম্পরাগত যে আচারপদ্ধতির উপরে সমাজস্থিতি নির্ভর করিয়া আসিতেছে, ব্যক্তিগত বা সাম্প্রদায়িক ভাবে যে সব অধিকার মানুষ ইহাতে ভোগ করিতেছে, সামাজিক ব্যবস্থাপনায় মোটের উপর তাহার মর্য্যাদাকে স্বীকার করিয়া নিয়া, তাহারই ধারা ধরিয়া, এ যাবৎ সকল গবর্মেণ্টই প্রায় চলিয়াছেন। নিতান্ত অসঙ্গত কি অহিতকর বলিয়া না বুঝিলে আইনের বলে তাহা রদবদল বড় করেন নাই। সামাজিক ধর্ম্মের সংস্কারে এবং লোকাচারসম্মত বিশিষ্ট অধিকারাদির (অর্থাৎ customary rights and privileges প্রভৃতির) পরিবর্ত্তনে, রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থাদির প্রয়োগ যখন যে অবস্থায় যতটুকু মাত্র আবশ্যক হইতে পারে, ধীর-বুদ্ধি ও বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়কগণ তাহা বুঝিয়া তদনুরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। ইহার সমীচীনতাও সকলে মানিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ ভাবে সামাজিক জীবনের ধর্ম্ম ও অধিকারাদির নিরূপণে, কি

কর্ম্মপদ্ধতির আদর্শ প্রবর্ত্তনে, এক কথায় সামাজিক ব্যবস্থাপনে, গবমেণ্টের অবাধ প্রভুত্ব (unlimited legislative authority) কোথাও স্বীকৃত হয় নাই। ডিমক্রাটিক সব পার্লামেণ্টও এ যাবৎ এই সব ব্যবস্থাপ্রণয়ণে সাধারণতঃ এই সীমার মধ্যে রহিয়াছে। কিন্তু আধুনিক সোসিয়ালিজমের প্রভাবে এই বাধা ক্রমেই লোপ পাইতেছে। ধর্ম্ম কি আচারনিয়মের সকল অধিকারকে একেবারে অস্বীকার করিয়া, সেই অধিকার-প্রসূত সকল প্রতিষ্ঠানকে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়া, ডিমক্রাটিক সব পার্লামেণ্ট যে সমগ্র সমাজকে সম্পূর্ণ ভাবে তাহার ভোটের আমলে আনিতে উদ্যত হইয়াছে, পূর্ব্বেই তাহা আমরা দেখিয়াছি। এই ভোটও প্রলেটারিয়েট সম্প্রদায়ের ভোট; কারণ সংখ্যায় তাহারাই অনেক বেশী। ডিমক্রাসীকে মানিলে, সমাজের উপরে তাহার এই অধিকারকেও মানিতে হইবে। ব্যক্তিগত অধিকার ও সামাজিক অধিকারের মধ্যে বর্ত্তমান যে সীমা রেখা রহিয়াছে, তাহা লোপ করিয়া দিয়া এই ভোট বা ভোটের আইন যদি একাকার এক সোসিয়ালিষ্ট সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, তাহাতেই বা কি বলিয়া কে বাদী হইতে পারে? ধর্ম্মপদ্ধতি ও আচারপদ্ধতির কোনও নির্দ্দেশ এখন আর চলে না। ব্যক্তিগত অধিকার কোন্ ক্ষেত্রে কত দূর থাকিবে, থাকা উচিত, এই ভোট ব্যতীত কে তাহা নির্ণয় করিয়া দিবে? কিসের প্রমাণেই তাহা আর নির্ণীত হইবে?

র‍্যাসনালিষ্ট মতবাদ প্রসূত যে নীতির উপরে ডিমক্রাসীর এই ব্যবস্থাপনার অধিকার (legislative authority) প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে মানিলে এই অধিকারকেও মানিতে হইবে, এবং ইহাকে কোনও সীমার মধ্যে বাঁধিয়া রাখিতে কেহ পারে না। কিন্তু এ অধিকারকে মানা যায় না। না মানিলে সে নীতিকেও মানা যায় না, আধুনিক ডিমক্রাসীর মূল ভিত্তিই ভাঙ্গিয়া পড়ে। ডিমক্রাসীর সব চেয়ে বড় দাবী যে সামাজিক ব্যবস্থাপনার উপরে একাধিপত্য, তাহার কোনই মূল্য আর থাকে না।

তা যদি না থাকে, তবে ধর্ম্মকেই সামাজিক ব্যবস্থাপনার মূল প্রভু বলিয়া আমাদের মানিয়া নিতে হইবে। আর রাষ্ট্রনিরপেক্ষ ধর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব যে সমাজে যত প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, রাষ্ট্রশক্তির ব্যবস্থাপনার অধিকার (legislative authority) তত সেখানে সঙ্কুচিত হইবে; যাহা থাকিবে তাহাও ধর্ম্মনীতির অনুগত হইয়া চলিবে।

পূর্ব্বে ইহাও আমরা দেখিয়াছি, এক একটি মানবসমষ্টি বা সমাজ এই ধর্ম্মে নৈসর্গিক ধারায় অভিব্যক্ত জীবন্ত এক একটি অর্গানিজম্ বা শরীরধর্ম্মী বস্তু। ডিমক্রাসীর ভোটে ইহা গড়ে নাই, তার দলাদলির ভোটে চলিতেও পারে না। যে ধর্ম্মে ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে, আর চলিতে পারে, ডিমক্রাসীর ভোটে তাহা নির্দ্ধারিত কি নিয়ন্তৃত হইবার বস্তু নহে। যে সব মহাজনগণের উচ্চতর জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি ও চরিত্রগুণের মধ্য দিয়া এই ধর্ম্ম বিকাশ লাভ করে, ডিম-ক্রাসীর দলাদলি ভোট তাঁহাদের বাছিয়া নিতেও পারে না। ধর্ম্ম নিজেই তাঁহার সেবক ও সহায়কে বাছিয়া নেন। তারপর সমাজকে এইরূপ অর্গানিজম্ বলিয়া মানিলে, গুণকর্ম্মাদির বিভাগে (character capacity ও function এর differentiationএ) অধিকার ভেদে একটা শ্রেণীবিভাগও মানিতে হয়। ইহা মানিলে সামাজিক কোনও কর্ম্মে সকলের সমান অধিকারের দাবীও মানা যায় না। মোট কথা, ধর্ম্ম কখনও ডিমক্রাটিক হইতে পারে না; ধর্ম্মানুগত কোন সমাজেও আধুনিক এই ডিমক্রাসী চলে না *। ধর্ম্ম সামাজিক

* মুশলমান ধর্ম্ম ও সমাজকে অনেকে ডিমক্রাটিক ধর্ম্ম ও সমাজ বলিয়া থাকেন। কিন্তু কথাটা ঠিক কি? মুশলমান ধর্ম্মনীতিতে সব মুশলমানই সমান। বাস্তব জীবনে যাহাই হউক না কেন, তত্ত্বতঃ কোনও অধিকার ভেদ এই ধর্ম্ম স্বীকার করেন না। কিন্তু ডিমক্রাসীর ভিত্তি কেবল সাম্য নহে, সর্ব্বধর্ম্ম-নিরপেক্ষ ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও বটে। মুশলমান এরূপ স্বাধীন নহেন। যে ধর্ম্মের তিনি অধীন, সে ধর্ম্ম তাঁহার ভোটে নিরূপিত হয় নাই। যে সমাজে যে রাষ্ট্রে তিনি বাস করেন, সেই সমাজ সেই রাষ্ট্র যে কোরাণসরিয়তের বিধিতে চলিতেছে, সে

ব্যবহারে অনেকটা সমতার অধিকার মানুষকে দিতে পারে, কিন্তু আপনার স্বরূপ নির্ণয়ে কোনও অধিকার কাহাকেও দিতে পারে না। ধর্ম্ম স্ব-প্রকাশ, ইহার স্বভাবেরই বিপরীত তাহা।

আধুনিক ডিমক্রাসীর কথাই আমি বলিতেছি, প্রাচীন ডিমক্রাসীর কথা নয়। প্রাচীন কালেও নানা দেশে স্থানে স্থানে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় একরূপ গণতান্ত্রিক শাসন চলিত। প্রাচীন ভারতের পল্লী-শাসনপদ্ধতিও অনেক স্থলে এইরূপ গণতান্ত্রিক ছিল। তা ছাড়া, কোনও কোনও সম্প্রদায় বা tribeএর মধ্যেও রাষ্ট্রশাসন গণতান্ত্রিক রীতিতে চলিত। গুণকর্ম্মাদির ভেদে শ্রেণীভেদ ব্যক্ত হইয়া দাঁড়ায় নাই, অনেকটা এইরূপ সমস্বভাব ও সমাবস্থাপন্ন

কোরাণ সরিয়ৎ জনসাধারণের ভোটে পাশ হয় নাই। মুশলমান বিশ্বাস করেন, এ সব কতক ভগবদ্‌বাণী, ভাগবত বিধি, হজরৎ মহম্মদের নিকটে ব্যক্ত হইয়াছিল, এবং কতক পরবর্ত্তী জ্ঞানী ও ধর্ম্মপরায়ণগণ আচার্য্যগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইঁহারা কেহ মুশলমান জনসাধারণের ভোটে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি নহেন। এখনও কাজি উলেমা প্রভৃতি ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতগণ সরিয়ৎ-অনুমত বা শাস্ত্রীয় বিধিসঙ্গত বলিয়া যাহা নির্দ্দেশ করিবেন, মুশলমান সমাজকে তাহার অনুসারেই চলিতে হয়। রাষ্ট্র শাসনও সেই বিধি অনুসারে চলে। সুতরাং ধর্ম্ম ত নয়ই, হইতেও পারে না, মুশলমান সমাজও ডিমক্রাটিক সমাজ নহে। সামাজিক ব্যবহারে ও সাধারণ কর্ম্মে সমান অধিকার সকল শিষ্যকে ধর্ম্ম দিতে পারেন, কিন্তু প্রভু সেই ধর্ম্মকে নিরূপণ করিবার কোনও অধিকার সকলকে দেন না। যে অধিকার আধুনিক ডিমক্রাসী দাবী করে। জনসাধারণের সম্মতি সুন্নি খলিফাদের প্রভুত্বের মূল ভিত্তি বলিয়া একটা কথা আছে। কিন্তু প্রথম খলিফাত্রয় আবুবেকর, ওমর ও ওসমান সম্বন্ধে যাহাই বলা যাউক, আর কাহারও প্রভুত্ব এই সম্মতিতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সিয়া মুশলমানরা এই theory বা মতও মানেন না। তাঁহারা বলেন, হজরৎ মহম্মদের বংশধর ব্যতীত ধর্ম্মতঃ খলিফাপদের দাবী আর কাহারও কিছু থাকিতে পারেনা। মুশলমান রাজারাও ডিমক্রাটিক পার্লামেণ্টের ভোট নিয়া ব্যবস্থাপ্রণয়ণ কি শাসন করেন না। কাজি উলেমাদের কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত সরিয়ৎ অনুসারেই সাধারণতঃ চলেন।

গৃহস্থদের লইয়া ছোট ছোট স্বতন্ত্র সম্প্রদায় অনেক দেশেই প্রাচীন কালে ছিল, এখনও যে কোথাও নাই, তা নয়। রাষ্ট্রশাসন সহজেই ইহাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক আকারে গড়িয়া উঠে।

যাহাহউক, আধুনিক ডিমক্রাসী মানবজীবন সম্বন্ধে র‍্যাসনালিষ্ট যে সব নীতির দোহাই দিয়া সামাজিক ব্যবস্থাপনার উপরে অবাধ যে প্রভুত্বের দাবী করে, প্রাচীন কোনও ডিমক্রাসী সেরূপ কোনও নীতিকে উন্নত মানবজীবনের একমাত্র ন্যায়সঙ্গত নীতি বলিয়া ধরিয়া নিয়া সেরূপ কোনও দাবী করে নাই, এবং সমগ্র এক একটি দেশ বা সমাজকেও ডিমক্রাটিক ষ্টেটে বা 'নেশনে' পরিণত করিতে চাহে নাই। যেখানে স্বাভাবিক অবস্থার প্রভাবে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আপনা হইতে যতটা গড়িয়া উঠিতে পারিত, তাই উঠিত। শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারেই ইহার কর্ম্মশক্তি পরিচালিত হইত। বিধিব্যবস্থাদি ধর্ম্মনীতি ও আচার-নীতি অনুসারে অথবা বিজ্ঞ নায়কদের নির্দ্দেশেই প্রায় স্থির হইত। এই সব প্রাচীন ডিমক্রাসী ছিল প্রধানতঃ adimittistrative একরূপ শাসনপদ্ধতি, legislative প্রভুত্বের আধার নহে। Legislative function বা ব্যবস্থাপনার অধিকার যাহা ছিল, তাহাও সাধারণতঃ শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে, social construction বা সমাজপদ্ধতি-গড়নের ব্যাপারে নহে। এই ক্ষেত্রে যদি ধর্ম্মের অধিকারকে লঙ্ঘন না করে, ইহারই অনুগত হইয়া চলে, অবস্থা বিশেষে ডিমক্রাসী বেশ চলিতে পারে, এবং অন্যবিধ শাসন অপেক্ষা লোকের পক্ষে, অধিকতর মঙ্গলের বই, অমঙ্গলের হেতুও তাহা হয় না। *

---

* পাশ্চাত্য অঞ্চলে ডিমক্রাসী সব কি ভাবে চলিতেছে, কি ভাবে সকল শক্তি এক একটি দলের হাতে গিয়া পড়িয়াছে, পূর্ব্বে ৭ম প্রবন্ধে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে নূতন আর একটি পরিণতি ইহার দেখা যাইতেছে। সকল পক্ষের মত লোককে বুঝান হইবে, লোকে সব কথা শুনিয়া—বুঝিয়া তবে ভোট দিবে, ইহাই ডিমক্রাসীর বড় একটি কথা। আগেও তাহা বড় কেহ দিতে পারিত না, তবু যাহা হউক এক রকম ছিল। এক দল অন্ত

কথা প্রসঙ্গে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। এখন যে কথা বলিতে ছিলাম।

প্রাচীন হিন্দু সমাজ, ডিমক্রাটিক কি অন্যবিধ বড় একটি কোনও বৃহৎ ষ্টেটের ছত্রছায়া তলে বৃহৎ কোনও রাষ্ট্রীয় সংহতি বা political nationality হয় নাই। ভারতের ন্যায় বহুবিধ অবস্থাপন্ন বহুবিধ জাতির অধ্যুষিত—প্রায় একটি মহাদেশের মত—অতি বৃহৎ একটি দেশে এক রাষ্ট্রজীবনে একটি ন্যাসনালিটী গড়িয়া ওঠা সম্ভবও নহে *। হইতে পারিত, বহু ষ্টেটের 'ফেডারেশনে' (federationএ) বা সমবায়ে বড় একটি ফেডার্যাল (federal) ষ্টেট্ বা রাষ্ট্রসমবায় এবং তাহার শক্তিতে ধৃত একরূপ ন্যাসনালিটী, কিন্তু তাহাও হয় নাই। কারণ, রাজশাসন কোথাও এদেশে সমাজধর্ম্মের এমন প্রধান একটি অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায় নাই, যাহাতে ষ্টেট্রূপ স্থায়ী একটা রাষ্ট্রচক্র গড়িয়া উঠিতে পারে, এবং তাহা তাহার অধীন ও আশ্রিত সমাজকে স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্রীয় নেশনে পরিণত করিতে পারে। দণ্ডনীতি যেখানে যেরূপ প্রয়োজন, যথাযোগ্য পদ্ধতি ধরিয়া আপন কর্ম্মের ভাগ সম্পাদন

দলকে কোনও সভায় এখন কথাই বড় বলিতে দেয় না। চেঁচাচেঁচি, বকাবকি, হাসাহাসি, শিয়ালকুকুর ডাকাডাকি, ঢিল ছোড়াছুড়ি, এ সব আছেই, সম্প্রতি আবার হাতাহাতি লাঠালাঠিও আরম্ভ হইয়াছে। কেবল ভোট যাচাইয়ের সভায় নয়, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভায়ও এইভাবে প্রতিপক্ষকে দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা হয়। ইহার পর সশস্ত্র সিপাহী লইয়া দলে দলে যে রীতিমত লড়াই হইবে না, তাই বা কে বলিতে পারে? পূর্ব্বে বড় বড় সর্দ্দাররা বা সাম্প্রদায়িক নায়করা যার যার সশস্ত্র দল নিয়া পরস্পর লড়াই করিতেন, যে যখন জয়ী হইতেন, শাসনের উপর প্রভুত্ব করিতেন। আধুনিক ডিমক্রাসীর গতিক যাহা দেখা যাইতেছে, শেষ এমনই একটা অবস্থায় গিয়া দাঁড়ানও বিচিত্র নহে।

* বৃটিশ গবর্মেণ্ট ভারত ব্যাপী কেন্দ্রীয় একটা শাসনপদ্ধতি বটে, কিন্তু ইহা ভারতবাসীর ডিমক্রাটিক ভোটে গড়ে নাই,—গড়িয়াছে বৃটিশ রাজশক্তির বাহুবলে। চলিতেছেও সেই বলে।

করিয়াছে, সমাজের উপরে ধর্ম্মস্থাপনাকে রক্ষাও যথাপ্রয়োজন করিয়াছে, কিন্তু তাহার উপরে গিয়া উঠে নাই, তাহার উপরে কোনও কর্ত্তৃত্বও কখনও করে নাই। রাজশক্তি শাসনরক্ষণই করিত, শাসন রক্ষণের জন্য প্রয়োজন মত নিয়মকানুনও করিয়া নিত। ষ্টেটের যে ব্যবস্থাপনার অধিকার বা legislative authorityর কথা কিছু পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি, সেরূপ কোনও অধিকার ভারতীয় হিন্দু রাজশক্তির ছিল না। দণ্ডনীতির অনেক মহিমার কথা প্রাচীন অনেক শাস্ত্রে পাওয়া যায়। দণ্ডনীতির সহায়তা ব্যতীত সমাজ চলে না, সময়ে সময়ে ইহার আশ্রয়ের উপরে ধর্ম্মকে নির্ভরও বেশী করিতে হয়। কিন্তু তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় না যে দণ্ডনীতিই সমাজের প্রধান আশ্রয় ছিল, এবং সকলে ইহা লইয়া নাড়াচাড়াও খুব করিত। সমাজ কি আকার ধরিয়া কি ধারায় যুগে যুগে চলিয়াছে, যে ধারায় এখনও চলিয়া আসিতেছে, দুই একটি নীতিসূত্র নহে, ইহাই এ সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সমগ্র ভারতে কেবল নহে, বিভিন্ন অঞ্চলেও, হিন্দুজীবনের সামাজিক সংহতির প্রধান বন্ধন সূত্র ছিল ধর্ম্ম। হিন্দুর বিদ্যায়, শাস্ত্রে, জীবনের লক্ষ্যে, জীবনযাত্রার সাধারণ নীতিতে, সামাজিক ব্যবহারের আচার নিয়মে, ব্লুণ্টস্‌লি সাহেবের ভাষায় এক কথায় হিন্দুর Kultur (culture) বা civilisationএ, ইহার প্রভাব রন্ধ্রে রন্ধ্রে গিয়া অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে,—জীবনের কর্ম্মের ধারাকে বিশিষ্ট এক প্রাণ দিয়া পরিচালিত করিয়াছে। এ অবস্থায় সমষ্টি জীবনের আকার যাহা হইতে পারে, তাহাই হইয়াছে, সে আকার ধর্ম্মাশ্রিত সমাজের আকার। তাহাও উন্নতির সমান একস্তরে অবস্থিত, সমভাবাপন্ন সমান এক জাতির, সমান আচারে ঘনসংহত এক সমাজ নহে। বহু স্তরের, বহুবিধ প্রকৃতিবিশিষ্ট বহু জাতির, বহুবিধ আচারশীল বহু সমাজ বা সম্প্রদায়ের, বিচিত্র এক সামাজিক সমবায় বা Social federation। প্রত্যেকটি group বা সম্প্রদায়

রাষ্ট্রীয় বা political নহে, পৃথক্ ও স্ব-স্থিত একটি সামাজিক বা social group। ইহাদের এই federation বা সমবায়ও রাষ্ট্রীয় বা political নহে, বৃহৎ ও অতি জটিল একটি social federation বা সামাজিক সমবায়। কি ভাবে, কিরূপ সব অবস্থার প্রভাবে ও ঘটনাপরম্পরায়, বহু স্তরে বিভক্ত বহুবিধ এই সব জাতির মধ্যে এইরূপ একটি সামাজিক সমবায় ভারতে ঘটিয়াছে, যে ধর্ম্ম এই বিভাগকে স্বীকার করিয়া নিয়া প্রত্যেকটি বিভাগকে তাহার স্বরূপে স্থির রাখিয়া যে যোগসূত্রে আবার সকলের মধ্যে এই সমবায়কে সম্ভব করিয়াছে, তাহার বিশিষ্ট লক্ষণ কি, সেই যোগসূত্রই বা কি, ক্রমে এই সব কথার আলোচনা করিতেছি। একটি কথা মাত্র আর এইখানে বলা যাইতে পারে ; Political বা social—রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক—যেরূপ প্রকৃতির হউক, জাতিগত বা প্রকৃতিগত বৈষম্য যেখানে এত অধিক, সেখানে একাকার এক ধর্ম্মচক্রের বা রাষ্ট্রচক্রের মধ্যে সকলকে বাঁধিয়া রাখিলে যার যার প্রকৃতিগত বৈশিষ্টের ধারায় শক্তির সহজ স্ফুর্ত্তিতে যথাযোগ্য পরিণতি লাভ করিতে তাহারা পারে না। আত্ম-বৈশিষ্ট হারাইয়া এই সব চক্রের দাস তাহারা হইয়া পড়ে। তাই এইরূপ অবস্থায় ষ্টেট হইলে স্থানীয় বা জাতিগত বৈশিষ্ট অনুসারে বিভিন্ন সব ক্ষুদ্রতর ষ্টেটের সমবায় যেমন বাঞ্ছনীয়, সমাজ হইলেও এইরূপ বৈশিষ্ট অনুসারে বিভিন্ন সব ক্ষুদ্রতর সমাজের সমবায়ই বাঞ্ছনীয়। * আধুনিক সব কেন্দ্রায়ত্ত বড় বড় রাষ্ট্রচক্র বা centratlized stateকে ভাঙ্গিয়া পৃথক্ পৃথক্ ষ্টেট গড়িয়া তাহাদের মধ্যে একটা রাষ্ট্রীয় সমবায় স্থাপনা সম্ভব কিনা, একথাও বহু রাষ্ট্রনায়ক এখন ভাবিতেছেন।

২। ধর্ম্ম ও চাতুর্ব্বর্ণ্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি, হিন্দুর সমষ্টিজীবনের ভিত্তি ও ধারক ষ্টেট্ নহে, ধর্ম্ম (Dharma)।

---

* ৩৩-৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাই ইহার আকার রাষ্ট্রীয় নেশনরূপে নয়, ধর্ম্মাশ্রিত সমাজরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই ধর্ম্মাশ্রিত সমাজরূপে ইহার প্রধান বৈশিষ্ট চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ।

এই গ্রন্থের প্রথম অংশে (২য়, ৩য়, এবং প্রধানতঃ ৫ম প্রবন্ধের শেষ ভাগে ও ৬ষ্ঠ প্রবন্ধের প্রথমে) চাতুর্ব্বর্ণ্যের তত্ত্বের কথা যথাসাধ্য বিবৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। 'চাতুর্ব্বর্ণ্য' এদেশের নাম। এদেশেরই গৃহীত বড় একটা নীতির রহস্য এই নামে ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু এদেশের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রমাণের মধ্যে গিয়া, সাধারণ ভাবে, মোটের উপর সার্ব্বভৌমিক যুক্তির ও তথ্যের প্রমাণে ইহাও বোধ হয় দেখাইতে পারিয়াছি, যে স্বাভাবিক গুণকর্ম্মবিভাগ-অনুসারে প্রধান চারিটি অঙ্গের ন্যায় মূল চারিটি শ্রেণী বিভাগ বা বর্ণবিভাগ উন্নত সব Social Organism বা সমাজশরীরে দেখা দেয়। *

* এই 'বর্ণ' কথাটার তাৎপর্য্য কি সকলেরই এই কথাটা মনে উঠিতে পারে। কিন্তু এই নামের ব্যুৎপত্তি যে কি ভাবে হইয়াছে, তাহার সর্ব্বসম্মত একটি মাত্র যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা কোথাও পাওয়া যায় না। জাতি বা race হিসাবে মানুষের মধ্যে দেহের বর্ণে বা রঙ্গে শ্বেত, পীত, রক্ত (রক্তাভ বা তাম্র) এবং কৃষ্ণ এইরূপ একটা যে ভেদ আছে, কেহ কেহ বলেন, তাহা হইতেই ইহার এই ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। ইঁহারা বলেন, ভারতে আর্য্য উপনিবেশের প্রথম যুগে শ্বেত বর্ণ বা গৌর বর্ণ আর্য্য জাতি এবং কৃষ্ণ বর্ণ অনার্য্য জাতি, মাত্র এই দুইটি বিভাগ ভারতবাসীদের মধ্যে ছিল, এবং অনার্য্যদেরই আর্য্যেরা শূদ্র বলিতেন। 'বর্ণ'ই এই ভেদের বড় একটা লক্ষণ ছিল, তাই সামাজিক এই শ্রেণী ভেদ 'বর্ণ' ভেদ বলিয়া অভিহিত হয়। ক্রমে আর্য্যদের মধ্যেও যখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনটি শ্রেণী বিভাগ হয়, তখন প্রচলিত এই 'বর্ণ' নামই এই বিভাগের নাম হইয়া দাঁড়ায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত সাধারণতঃ এই।

শ্বেত, রক্ত ও পীত ব্রাহ্মণাদি প্রথম বর্ণত্রয়ের 'বর্ণ'ই যথাক্রমে বাস্তবিক এই, এইরূপ একটি আভাসও বহু প্রসঙ্গে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, অতি পুরাকালে এইরূপ তিনটি 'বর্ণের' তিনটি জাতি হইতেই ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য,এই তিন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল, তাই ইহাদের এই নাম হইয়াছে। ইহাতে এই তিনটি

সামাজিক কর্ম্মবিভাগ ও শ্রেণীবিভাগ নৈসর্গিক নীতির [illegible]
রীতিতেই সর্ব্বত্র ঘটিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতের ঋষির দৃষ্টিতে [illegible]
সত্য যেমন স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইয়াছে, এবং [illegible]

সম্প্রদায় পৃথক্ তিনটি race বা জাতিই হইয়া পড়ে। কিন্তু দৈহিক প্রকৃতিতে কোনও লক্ষণই ইহার ধরা যায় না, এবং এইরূপ কোনও কথার আভাসও প্রাচীন কোনও সাহিত্যে কি লোকপ্রবাদে নাই।

'বর্ণ্যতে অনেন' অর্থাৎ এই ভাবে ইহাদের বৈশিষ্ট বর্ণনা করা হয়, তাই এই বর্ণ' নাম হইয়াছে, এইরূপ একটা ব্যুৎপত্তির কথাও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। প্রেরণার্থক 'বর্ণ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন এবং বেদবাক্য দ্বারা আচারাদিতে 'বর্ণিত' বা প্রেরিত তাই ইহার নাম বর্ণ, এইরূপ একটা ব্যাখ্যাও কোনও কোনও অভিধানে পাওয়া যায়। কিন্তু এই দুইটি বৈয়াকরণিক ব্যাখ্যা অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন (modern) যুগের কোনও কোনও পণ্ডিতের কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা বলিয়া মনে হয়।

ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যার দিক হইতেও একটা ব্যাখ্যা ইহার আছে। শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ এই যে চারিটি বর্ণই যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের বর্ণ, ইহার একটা রহস্যের তত্ত্বও এই ব্যাখ্যার মধ্যে পাওয়া যায়। গুণভেদে কর্ম্মভেদ এবং তাহা-হইতে এই শ্রেণী বা বর্ণের ভেদ হইয়াছে। সুতরাংএই ভেদের মূল কারণ হইল গুণ ভেদ। এখন এই গুণ কি ? সাংখ্যদর্শন বলেন, প্রকৃতিই এই বিশ্বপ্রপঞ্চের মূল কারণ এবং তিনি সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা। প্রাকৃত এই তিন মূল গুণের পার্থক্য হেতু জগদ বস্তুর যাবতীয় পার্থক্য বা বৈচিত্র ঘটিয়াছে। মানবস্বভাবে যে পার্থক্য, তাহাও এই গুণপার্থক্য-প্রসূত। ব্রহ্মণ্য ভাব সত্ত্বগুণ-প্রধান, ক্ষাত্রভাব রজোগুণ-প্রধান, বৈশ্য ভাব রজস্তম-প্রধান এবং শৌদ্র ভাব তমঃ-প্রধান। এই সব গুণের এক একটা বর্ণের কথাও ইঁহারা বলেন, যথা—সত্ত্ব গুণের বর্ণ শ্বেত, রজোগুণের রক্ত এবং তমোগুণের বর্ণ কৃষ্ণ। এই সব বর্ণ স্থূল-ভৌতিক রূপের মধ্যে স্থূল চক্ষে দেখা যায় না। তবে যে গুণ যে পদার্থে প্রধান, তদনুরূপ একটি সূক্ষ্ম আলোক-ছটা বা aura তাহা হইতে ফুটিয়া উঠে; সূক্ষ্ম দৃষ্টি (বা clairvoyant faculty) যাহাদের আছে, তাঁহারা তাহা দেখিতে পান। সত্ত্বগুণ-প্রধান ব্রাহ্মণের মধ্যে এইরূপ একটা শ্বেত ছটা, ক্ষত্রিয়ের মধ্যে রক্ত-ছটা, বৈশ্যের মধ্যে পীত ছটা (রজঃ ও তমোগুণে মিলন হেতু কি ?) এবং শূদ্রের

সূক্তে * ইহার মূর্ত্তি যে ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, এরূপ আর কোথাও হয় নাই। কেবল তাই নয়, এই সত্যে সমাজনীতির প্রতিষ্ঠা করিয়া, এই মূর্ত্তির আদর্শেই সমাজশরীরকে মূর্ত্ত করিয়া তোলার চেষ্টা হিন্দুসমাজে যেরূপ হইয়াছে, এরূপও কোথাও আর হয় নাই।

মধ্যে কৃষ্ণ ছটা এইরূপ দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায়। দৈহিক রূপে না হইলেও স্বভাবের গুণপ্রসূত এই সব সূক্ষ্মদৃশ্য ছটার বর্ণ হইতেই ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি চারি সম্প্রদায়ের 'বর্ণ' এই নাম হইয়াছে। সাধারণতঃ অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক একটা আজগবী গল্প বলিয়াই এই কথাগুলিকে মনে হইবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক একটা যুক্তির প্রমাণ যে এই তত্ত্বে একেবারেই নাই, তাহা বলা যায় না। তবে সে সব কথার মধ্যে যাওয়া সম্ভব হইবে না; প্রয়োজনও এমন নাই। একটি কথা মাত্র এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে। শ্বেতবর্ণ নির্ম্মল সাত্ত্বিক ভাবের, রক্তবর্ণ উগ্র রজোভাবের এবং কৃষ্ণবর্ণ (যেমন অন্ধকার) যে জড় তমোভাবের উদ্রেক করে, ইহা অনেকেই বলেন, এবং অনুভবও অনেকে হয়ত করিয়া থাকিবেন। ইহাও দেখা যায়, এই সব ভাবের ব্যঞ্জনা করিবার অভিপ্রায়ে এইরূপ সব বর্ণের ব্যবহারও পটাদিতে কি গৃহসজ্জায় অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

শ্রীযুত ব্রহ্মব্রত সামধ্যায়ী সরস্বতী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কৃত পুরুষ-সূক্তের একটি বিস্তৃত ও সুচিন্তিত ব্যাখ্যা আছে। হিতবাদী আফিস হইতে ১৩০৪ বঙ্গীয় সনে পুস্তিকাকারে ইহা প্রকাশিত হয়। ইনি বলেন, মানস নেত্রে ঋষি বিরাটের চিত্রে এই চারি বর্ণের অর্থাৎ তাহার তত্ত্বের, ভাবের বা অধিদেবতার এইরূপ চারিটি 'রঙ' ফলাইয়া ছিলেন, বা ফলান দেখিয়াছিলেন, তাই ইহাদের এই 'বর্ণ' নাম হইয়াছে। বিরাট্ পুরুষের অঙ্গ সংস্থানের তত্ত্বরহস্যেরও অতি চমৎকার একটা ব্যাখ্যা তিনি দিয়াছেন। পরিশিষ্টে এই ব্যাখ্যাটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তাঁহার এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে সকলে গ্রহণ না করুন, সত্যের অনেক আভাস ইহার মধ্যে পাওয়া যাইবে। যে সব কথা তিনি বলিয়াছেন, তাহা ভাবিবারও কথা বটে।

* ১৮৭ পৃষ্ঠা ও পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

অঙ্গের বিন্যাসে কেবল বহিঃস্বরূপেই নয়, বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে পরস্পরসাপেক্ষ কর্ম্মের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থায় এবং শক্তির ও অধিকারের সামঞ্জস্য-স্থাপনায়, ইহার জীবনধর্ম্মেও এই আদর্শকে সফল করিয়া তুলিতে প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মসংস্থাপক ঋষি ও আচার্য্যগণ অসাধারণ প্রতিভার ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

কি ভাবে ইহা করিবার চেষ্টা হয়, ক্রমে তাহাই এখন বুঝিবার চেষ্টা করিব।

ধর্ম্মস্থাপনা করিতে হইবে, সেই ধর্ম্মে লোকস্থিতি রক্ষার উপযোগী শিক্ষাদীক্ষাদির প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, তদনুবর্ত্তী কর্ম্মানুশীলনের পদ্ধতির নিরূপণ আর সংশয় স্থলে কোন্ অবস্থায় কোন্ কর্ম্মে ধর্ম্মের নীতি কি তাহাও নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

সকল আপদ হইতে এই ধর্ম্মকে এবং ধর্ম্মে স্থিত সমাজকে বাহুবলে রক্ষা করিতে হইবে ; যথাপ্রয়োজন দণ্ডনীতির প্রয়োগে শাসনও করিতে হইবে।

অশনবসনাদি প্রয়োজনীয় ভোগ্য ধনাদির উৎপাদনে সমাজকে পোষণ করিতে হইবে।

দৈহিক শ্রমশক্তির দ্বারা উপরোক্ত ত্রিবিধ কর্ম্মকে যথা প্রয়োজন সহায়তা করিতে হইবে।

সামাজিক কর্ম্ম যাহা, মোটের উপর তাহা এই চারিটি ভাগে পড়ে এবং চতুর্ব্বিধ কর্ম্মের উপযোগী চতুর্ব্বিধ শক্তিও সমাজে রহিয়াছে।

এই চতুর্ব্বিধ শক্তিই যথাক্রমে—ব্রহ্মণ্য অর্থাৎ উন্নত বুদ্ধি বিদ্যা ও জ্ঞানের শক্তি, (force of superior intellect, learning and wisdom), ক্ষাত্র অর্থাৎ শৌর্য্য বীর্য্যের শক্তি, (force of martial and ruling spirit), বৈশ্য অর্থাৎ ধনোৎপাদক ব্যবসায়িক শক্তি (force of wealth producing industrial capacity) এবং শৌদ্র অর্থাৎ দৈহিক শ্রমশক্তি (force of manual labour of the non-intellectual masses)। এই চারিটি শক্তির অনুরূপ কর্ম্মের

অধিকারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এইরূপ চারিটি যে প্রধান শ্রেণী বা স্তর সাধারণতঃ মানবসমাজের মধ্যে গড়িয়া উঠে, যথাক্রমে তাহারা সমাজের চালক ও শিক্ষক, শাসক ও রক্ষক, পোষক ও পালক এবং সেবক ও ধারক, হইয়া দাঁড়ায়। ইহা ব্যবসায়িক division of labourএর ন্যায় কৃত্রিম একটা কার্য্যপ্রণালীর নির্দ্ধারণ নহে, natural divisions of organic social functions —নৈসর্গিক ধর্ম্মে অভিব্যক্ত সামাজিক কর্ম্মবিভাগ। বিভাগ বটে, কিন্তু সকলের কর্ম্মই সকলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে সংস্পৃষ্ট,—সকলেই সকলকে সহায়তা করিতেছে, সকলেই সকলের উপরে নির্ভর করিতেছে, সকলেরই সমান প্রয়োজন যার যার স্থানে রহিয়াছে,—কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া, বাদ দিয়া, চলিতে পারে না।* কর্ম্মাধিকারে ব্রাহ্মণ জ্ঞানবলে, ক্ষত্রিয় বাহুবলে, বৈশ্য ধনবলে এবং সংখ্যায় অধিক হইলে শূদ্র শ্রমিক জনতার বলে বড়। নিজেদের এই বল কেবল নিজেদের স্বার্থপুষ্টির জন্য নয়,—সমাজের মঙ্গলে, যথাযোগ্য সামাজিক কর্ম্মের ভাগ সম্পাদনরূপ ধর্ম্মপালনের জন্য ; এবং এই ধর্ম্মপালনে সকলেই সকলের সহায় ও সহযোগী। কিন্তু স্বার্থের মোহে এই সত্যের তত্ত্ব না বুঝিয়া কি ভুলিয়া, এই বল আপন আপন স্বার্থ-বৃদ্ধি কল্পে একে অন্যের বিরুদ্ধে অথবা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংগ্রামে প্রয়োগ করিতে পারে †। তাই এমনভাবে সামাজিক ধর্ম্ম-স্থাপনা করিতে হইবে, যাহাতে চতুর্ব্বিধ কর্ম্মের অধিকারী চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে এমন একটা সামঞ্জস্য বা balance থাকে, যে কেহ কাহাকেও অতিক্রম করিয়া, কাহারও ন্যায্যঅধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিয়া না চলিতে পারে, এবং চলিবার মতি গতিও না হয়।

---

* ১৮৭-৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† ইউরোপের ইতিহাসেই ইহার বড় একটি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। মধ্য যুগে ইয়োরোপীয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষাত্র সম্প্রদায় পরস্পরের সহযোগে আপনাদের স্বার্থ পুষ্টি-কল্পে বৈশ্য ও শূদ্র সম্প্রদায়কে অত্যধিক চাপিয়া রাখিতে চান। আবার এই

এই কর্ম্মবিভাগ ও কর্ম্মাধিকারে বর্ণবিভাগের স্থায়ী একটা ভিত্তির উপরে যে ভাবে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহাতে আপনা হইতেই এইরূপ একটা সামঞ্জস্যের ভাব আসিতে পারে। কিন্তু কেবল তাহারই উপরে নির্ভর না করিয়া, ধর্ম্মস্থাপক শাস্ত্রকারগণ বিভিন্ন বর্ণের কর্ম্মের রীতি ও অধিকারের সীমা এমন স্পষ্ট ভাবে নির্দ্দেশ করেন, এবং সকলেই যাহাতে যার যার অধিকারে স্থিত থাকিয়া যার যার কর্ম্মের ভাগ সম্পাদন করিয়া যাইতে পারেন তাহারও এরূপ ব্যবস্থা করেন, যে এই সামঞ্জস্যই সামাজিক ধর্ম্মের প্রধান একটি লক্ষণ হইয়া দাঁড়ায়।

ধর্ম্মস্থাপক—ঋষিবর্গ

কিন্তু এই ধর্ম্মস্থাপক শাস্ত্রকার কাহারা, যাঁহারা সমাজের চালক ও শিক্ষক ব্রাহ্মণেরও অধিকারের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন ?

সহযোগের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংগ্রামও দেখা গিয়াছে। মোট সমাজের উপরে প্রভুত্বস্থাপনে উভয়ে উভয়ের সহায়তা করিয়াছেন, কিন্তু এই প্রভুত্বে আবার কে বেশী বড় হইবেন, তাহা লইয়া নিজেরাই ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ক্রমে বৈশ্যশক্তি প্রবল হইয়া উঠে, এবং ক্ষাত্র শক্তির সঙ্গে মিলিয়া সমাজের প্রভু হইয়া দাঁড়ায়। ব্রহ্মণ্য জ্ঞানবল এবং সঙ্গে সঙ্গে চার্চ্চরূপ ধর্ম্মস্থাপনার বলও বৈশ্যক্ষাত্র-সম্মিলিত শক্তির অনুগত হইয়া পড়ে, এবং এই বলে বলবত্তর ক্ষাত্রবৈশ্য-শক্তি শৌদ্র শ্রমিক জনতার বলকে একেবারে আপন স্বার্থ সাধনের যন্ত্রে পরিণত করে। বর্ত্তমান যুগে শৌদ্র এই শ্রমিক জনতার বল সমাজের উপরে কেবল আপনাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে নয়, সমগ্র সমাজকেই একাকার শৌদ্র এক শ্রমিক সমাজে পরিণত করিতে উদ্যত হইয়াছে।

এইরূপ যে হইয়াছে ও এখনও হইতেছে, তাহার কারণ যে ধর্ম্মস্থাপনায় এবং যথাযোগ্য শিক্ষার ও সাধনার ফলে ধর্ম্মানুগত যে বুদ্ধির উন্মেষে ও চরিত্রনীতির প্রভাবে চতুর্ব্বিধ এই বলের মধ্যে যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে, ইয়োরোপীয় সমাজনায়কবর্গ সেই সামঞ্জস্যের একটা রীতি কি ভাবেই সমাজের মধ্যে কখনও আনিতে পারেন নাই।

ইহারা ঋষি, ব্রাহ্মণই বটেন,—কিন্তু উচ্চতম ব্রহ্মণ্যের সিদ্ধিতে সাধারণ ব্রাহ্মণবর্ণ হইতে মনুষ্যত্বের অনেক উচ্চতর এক স্তরে উঠিয়া ব্রাহ্মণেরও ব্রাহ্মণ যাঁহারা হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণের মধ্যেই কি লক্ষণে এইরূপ স্তর ভেদ হইতে পারে, মনু তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণীনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥
ব্রাহ্মণেষু তু বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥

(মনুসংহিতা—১, ১৯৬—১৯৭)

অর্থাৎ, ভূতগণের মধ্যে প্রাণী শ্রেষ্ঠ, প্রাণীদের মধ্যে বুদ্ধিজীবী শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিজীবীর মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ, মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের মধ্যেও আবার যাঁহারা বিদ্বান্ তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, বিদ্বানের মধ্যে কৃতবুদ্ধি (অর্থাৎ এই বিদ্যাপ্রভাবে জ্ঞাত বিহিত কর্ম্মাদি অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য এই বুদ্ধি যাঁহাদের স্থির হইয়াছে তাঁহারা) শ্রেষ্ঠ, এবং কৃতবুদ্ধিদের মধ্যে আবার কর্ত্তারা (অর্থাৎ এই সব কর্ম্ম যাঁহারা করেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ)—এবং ইহাদের মধ্যেও আবার ব্রহ্মবেদী (অর্থাৎ এই বুদ্ধিতে ও কর্ম্মসিদ্ধিতে ব্রহ্মতত্ত্ব যাঁহারা জানিয়াছেন) তাঁহারা শ্রেষ্ঠ।

এই উচ্চতম ব্রহ্মণ্য-চরিত্রের ধর্ম্মলক্ষণ কি এবং কি ভাবে তাহা অধিগত করিতে হয়, তার সম্বন্ধে মনু আর একস্থলে বলিয়াছেন,

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্ব্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥

(মনু—৬, ৯২)

অর্থাৎ ধৃতি (সন্তোষ) ক্ষমা (শক্তি সত্ত্বেও অপকারীর প্রত্যপকার না করা), দম (বিষয়সংসর্গেও মনের অবিকার), অস্তেয় (অন্যায়পূর্ব্বক পরধন হরণ না করা), শৌচ (দেহের ও চিত্তের

শুদ্ধি), ইন্দ্রিয়নিগ্রহ (স্ব স্ব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাবর্ত্তন করা), ধী (প্রতিপক্ষ সংশয়াদি নিরাকরণ পূর্ব্বক সম্যক্ জ্ঞান লাভ), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান), সত্য ও অক্রোধ এই দশটি ধর্ম্ম লক্ষণ।

পরবর্ত্তী শ্লোকেই আবার তিনি বলিতেছেন—

দশলক্ষণানি ধর্ম্মস্য যে বিপ্রাঃ সমধীয়তে।
অধীত্য চানুবর্ত্তন্তে তে যান্তি পরমাং গতিং ॥

অর্থাৎ, ধর্ম্মের এই দশ লক্ষণ যে ব্রাহ্মণগণ সম্যক্ অধ্যয়ন করেন, এবং অধ্যয়ন করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই পরমা গতি প্রাপ্ত হন।

উন্নত মানবের চরিত্রধর্ম্মের উচ্চতম আদর্শই এই, এবং আশ্রম-চতুষ্টয়বাসী দ্বিজাতি সকলের পক্ষেই ইহা অনুষ্ঠেয় বলিয়া মনু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু সমাজের শীর্ষ স্থানীয় ব্রাহ্মণের পক্ষেই এই ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন বিশেষভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হয়। সম্পূর্ণভাবে এই ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিয়া মোক্ষরূপ পরমা গতি সকলেই যে সহজে লাভ করিতে পারিবেন, এরূপ কেহ মনে করিতে পারেন না। তবে এই আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, জীবনে যত বেশী ইহার অনুবর্ত্তন যিনি করিতে পারিবেন, চরিত্রগৌরবে মানবশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ নাম যে তত বেশী তাঁহার সার্থক হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য।

যাঁহারা এই পরমা গতি লাভ করিতে পারিয়াছেন, অথবা ইহার অতি সন্নিকট হইয়াছেন, তাঁহারাই ঋষি। মুক্ত বা মুমুক্ষু হইয়াও মানবের হিতার্থে মানবসমাজেই ইঁহারা বাস করেন এবং করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বপ্রকাশে ও ধর্ম্মস্থাপনায় মানবের শ্রেষ্ঠ হিত সাধন করেন।

প্রাচীন ভারতে এই ঋষিজীবনের আশ্রম ছিল তপোবনে; আদর্শও ছিল সাধারণ সংসারিক মানবের জীবনযাত্রার আদর্শ হইতে পৃথক্ ও উচ্চতর এক আদর্শ। ধনগত কি পদগত পার্থিব সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য অসার ধূলির ন্যায় বর্জ্জন করিয়া, তাহার সংস্রব হইতে দূরে, একান্ত শান্ত সরল ও নির্ম্মল ভাবে, জীবন ধারণের জন্য কেবল মাত্র বনসুলভ

বস্তুর উপরে নির্ভর করিয়া, উচ্চ বিদ্যালোচনায় ও ধর্ম্মসাধনায় এই তপোবনে কি ভাবে ইঁহারা জীবন যাপন করিতেন, এদেশবাসী সকলেই তাহা জানেন, এবং পূর্ব্বে ৫৭৩—৭৪ পৃষ্ঠায়ও তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। বৃহৎ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে রাজারা ইঁহাদের নিমন্ত্রণ করিতেন এবং গাভীসুবর্ণাদিও প্রচুর পরিমাণে দান করিতেন। এই দান তাঁহারা প্রতিগ্রহও করিতেন। কিন্তু সামান্য একটি হরিতকী অপেক্ষা বেশী কিছু আদর এই দানের কেহ করিয়াছেন, অথবা ইহার জন্য কোনও লীপ্সা কাহারও কিছু ছিল, এরূপ কোনও নিদর্শন কোনও ঋষির ব্যবহারে কোথাও পাওয়া যাইবে না। যারপরনাই তেজস্বী ইঁহারা ছিলেন। রাজারাই ইঁহাদের ভয় করিয়াছেন; কোনও রাজার সম্মুখে কোনও ভয়ে কি লোভে ঋষি কেহ নতশির হইয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত কোথাও দেখা যায় না।

এই ভাবে সকল স্বার্থের মোহহইতে, সকল কামনার পাশ হইতে, মুক্ত যাঁহারা থাকিতে পারেন, ধর্ম্মের সত্য কি, কিসে লোকস্থিতি সেই ধর্ম্মে রক্ষিত হইবে, নির্ম্মল জ্ঞানের আলোকে দর্শন করিয়া তাঁহারাই তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারেন, এবং প্রাচীন ভারতে তাহাই করিয়াছেন। ইঁহাদের এই সব নির্দ্দেশই শাস্ত্রবিধিরূপে সঙ্কলিত হইয়া লোকসমাজে প্রচারিত হইয়াছে।

এই শাস্ত্রের লক্ষণ সম্বন্ধেও মনু বলিয়াছেন, —

যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ঃ যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ॥
উৎপদ্যন্তে চ্যবন্তে চ যান্যতোঽন্যানি কানিচিৎ।
তান্যর্ব্বাক্কালিকতয়া নিষ্ফলান্যনৃতাণি ॥

(মনু—১২, ৯৫—৯৬।)

অর্থাৎ যে সকল স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র বেদবহির্ভূত, যে সকল শাস্ত্র বেদ-বিরুদ্ধ কুতর্কমূলক, পরলোক সম্বন্ধে সে সবই নিষ্ফল জানিবে।

যে সব শাস্ত্র বেদমূলক নহে, পরন্তু পুরুষকল্পিত, তাহারা উৎপন্ন হইতেছে ও বিনষ্ট হইতেছে। অর্ব্বাচীনতা বা আধুনিকতাহেতু তাহাদিগকে নিষ্ফল ও মিথ্যা জানিবে।

কেন ?

পিতৃদেব মনুষ্যাণাং বেদাশ্চক্ষু সনাতনম্।
অশক্যাঞ্চাপ্রেময়ঞ্চ বেদশাস্ত্রমিতিস্থিতিঃ ॥

(মনু—১২, ৯৪)

অর্থাৎ বেদই পিতৃগণ, দেবগণ ও মনুষ্যগণের সনাতন চক্ষু। ইহা অপৌরুষেয় ও অপ্রমেয়; ইহাই স্থির মীমাংসা।

এই ভাবে ঋষিদের উচ্চতম জ্ঞানহইতে এদেশের ধর্ম্মস্থাপনা হইয়াছিল, এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা বা Social legislation বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাই এই ধর্ম্মস্থাপনারই একটি অঙ্গ।

বলা বাহুল্য, এইরূপ যে কোনও সমাজে সামাজিক যাহা বিধি-ব্যবস্থা (বা Social laws যাহা কিছু) তাহা রাষ্ট্রীয় আইন নহে, মূলতঃ ও প্রধানতঃ এই সব শাস্ত্রীয় ধর্ম্মের বিধান।

এই ঋষিবর্গ চাতুর্ব্বণ্য সমাজের ধর্ম্মস্থাপক, সুতরাং তাহা হইতে পৃথক্ ও উচ্চতর একস্তরের মানব এবং তাঁহাদের জীবনযাত্রার আদর্শও ছিল পৃথক্ ও উচ্চতর এক আদর্শ।

ব্রাহ্মণ

সামাজিক ব্রাহ্মণবর্ণের যে কর্ম্মের ভাগ, তাহা সম্পাদন করিতেন ইঁহাদের প্রধান শিষ্য স্থানীয়—'বিদ্বান্,' 'কৃতবুদ্ধি' ও 'কর্ত্তা' বিশেষণে অভিহিত সাংসারিক ব্রাহ্মণ গৃহস্থগণ।

এখন ইঁহাদের এই কর্ম্ম ছিল কিরূপ ?

শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন, সামান্যতঃ অর্থাৎ সাধারণ ভাবে সব বিধানই ইহাতে মিলিবে। বিশিষ্টভাবে কোন্ অবস্থায় ধর্ম্ম কি, তার সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ যদি না থাকে, তবে

সে অবস্থায় কর্ত্তব্য কি হইবে, এই ভাবে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইবে।

"অনাম্নাতেষু ধর্ম্মেষু কথং স্যাদিতিচেদ্ভবেৎ।
যং শিষ্টা ব্রাহ্মণা ব্রূয়ুঃ স ধর্ম্ম স্যাদশঙ্কিতঃ॥"

(মনু—১২, ১০৮)

অর্থাৎ নাম করিয়া যে সব ধর্ম্মের উল্লেখ নাই, তৎসম্বন্ধে যখন কোনও জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইবে, তখন শিষ্ট ব্রাহ্মণেরা যাহা বলিবেন, তাহাই অশঙ্কিত ভাবে গ্রহণ করিবে।

কিন্তু এই শিষ্ট ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি ?

ধর্ম্মেণাধিগতো যৈস্তু বেদঃ সপরিবৃংহণঃ।
তে শিষ্টা ব্রাহ্মণা জ্ঞেয়াঃ শ্রুতি প্রত্যক্ষহেতবঃ॥

(মনু—১২, ১০৯)

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাদি ধর্ম্মযুক্ত হইয়া যাঁহারা সপরিবৃংহণ অর্থাৎ বেদাঙ্গ মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি সহ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, বেদের সাক্ষাৎ নিদর্শন স্বরূপ যাঁহারা, তাঁহাদিগকে শিষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে।

কিন্তু এইরূপ ব্রাহ্মণও যদি না মিলে ? তখন—

দশবরা বা পরিষদ্ যং ধর্ম্মং পরিকল্পয়েৎ।
ত্র্যবরা বাপি বৃত্তস্থা তং ধর্ম্মং ন বিচালয়েৎ॥
ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তর্কী নৈরুক্তো ধর্ম্মপাঠকঃ।
ত্রয়শ্চাশ্রমিণঃ পূর্ব্বে পরিষৎ স্যাদ্দশাবরা॥
ঋগবেদবিদ্ যজুর্ব্বিচ্চ সামবেদবিদেব চ।
ত্র্যবরা পরিষজ্জ্ঞেয়া ধর্ম্মসংশয় নির্ণয়ে॥

(মনু—১২, ১১০—১২)

দশবরা; অগত্যা ত্রিবরা পরিষৎ অর্থাৎ দশজন বা তিন জন বৃত্তিস্থ ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের দ্বারা গঠিত সভা হইতে যাহা নির্ণীত হইবে, তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবে, এবং তাহা হইতে বিচলিত হইবে না।

বেদত্রয়ের অধ্যেতা, অনুমানজ্ঞ, তার্কিক, পদার্থ-নিরুক্তিকুশল, মানবাদি ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠক, এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ—এইরূপ দশটি ব্রাহ্মণ লইয়া দশবরা পরিষৎ হইবে। আর ঋক্ সাম ও যজুঃ এই তিন বেদে বিদ্বান্ তিনটি ব্রাহ্মণ লইয়া ত্রিবরা পরিষৎ হইবে।

তার পর আবার বলিয়াছেন,—

একোঽপি বেদবিদ্ধর্ম্মং যং ব্যবসেদ্দ্বিজোত্তমঃ।
স বিজ্ঞেয়ঃ পরোধর্ম্মো নাজ্ঞানামুদিতোঽযুতৈঃ॥
অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।
সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষত্ত্বং ন বিদ্যতে॥

(মনু,—১২, ১১৩—১১৪)

অর্থাৎ, (অগত্যা) বেদবিৎ একজন দ্বিজোত্তমও যাহা ধর্ম্ম বলিয়া ব্যবস্থা দিবেন, তাহাই পরম ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। পরন্তু লক্ষ লক্ষ অজ্ঞানী লোক যাহা বলিবে তাহা ধর্ম্ম হইবে না। যাঁহারা ধর্ম্মব্রতশীল নহেন, বেদে যাঁহাদের জ্ঞান নাই, যাঁহারা জাতিমাত্রোপজীবী—এমন সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণের সভাতেও পরিষত্ত্ব অর্থাৎ ধর্ম্মব্যবস্থাপক পরিষদের গুণ নাই।

বলা বাহুল্য, শিষ্ট বা যোগ্য পরিষদ্‌ভুক্ত ব্রাহ্মণগণ যে সব তথ্যের বা dataর উপরে ব্যবস্থা নির্ণয় করিতেন, তাহার মধ্যে বেদাবিরুদ্ধ অথচ ধর্ম্মশাস্ত্রে অনাম্নাত আচার বা লোকাচারের বড় একটা স্থান ছিল; থাকিবারই কথা।

এখনকার সব ষ্টেটে যাহা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা (State legislation) তখনকার হিন্দু সমাজে তাহাই ছিল, ধর্ম্ম-সংস্থাপনা বা ধর্ম্মে সামাজিক ব্যবস্থাপনা। ইহার মূল কর্ত্তা শাস্ত্র ও সদাচারপরম্পরা, এবং তাহার কোনও অভাব পূরণ করিবার অথবা তাহার সম্বন্ধে সংশয় নিরাকরণ করিবার প্রয়োজন হইলে, তাহাই করিতেন, এই সব শিষ্ট ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণপরিষৎ। ইহাও আমরা অনুমান (infer) করিয়া নিতে পারি, যে অবস্থার পরিবর্ত্তনে এই সব বিধির কোনও পরিবর্ত্তন (অবশ্য বেদাবিরুদ্ধ

ভাবে) করিতে হইলে, অথবা নূতন কোনও অবস্থায় নূতন অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে প্রাচীন বিধিতে নূতন কোনও তত্ত্বরহস্য ধরিতে পারিলে, তদনুসারে তাহার তাৎপর্য্যব্যাখ্যা ও প্রয়োগের ব্যবস্থা যাহা কিছু করিতে হইত, সে সব-ই ইঁহারাই করিতেন, এবং তাহার অধিকারীও ইঁহারা।

এই যে দশবরা ও ত্রিবরা পরিষদের কথা মনু উল্লেখ করিয়াছেন, এই সব পরিষৎই ছিল, একরূপ ব্যবস্থাপক সভা, Legislative Council। অবশ্য স্থায়ী এইরূপ এক একটি পরিষৎ কোথাও যে থাকিত, তাহা বলা যায় না। সম্ভবতঃ যখনই প্রয়োজন হইত, এই এইরূপ সুবিজ্ঞ ও ধর্ম্মশীল লোকদের দ্বারা তাহা গঠিত হইত।

কিন্তু কি ভাবে কাহারা গঠন করিত? সম্ভবতঃ রাজন্যবর্গের ও অন্যান্য প্রধান সামাজিকবর্গের অনুরোধে স্থানীয় পণ্ডিতমণ্ডলী এই সব পরিষদের সদস্যদের নির্ব্বাচন করিতেন। হয়ত এইরূপ কর্ম্মনির্ব্বাহের যোগ্য বলিয়া প্রসিদ্ধি কাহারও কাহারও থাকিত; যখনই প্রয়োজন হইত, তাঁহারাই আহূত হইতেন এবং ব্যবস্থা নির্ণয় করিতেন।

রাষ্ট্রীয় কোনও সঙ্কটে বা সমস্যায় রাজারা মধ্যে মধ্যে পৌর ও জানপদ প্রধান প্রকৃতিবর্গকে (leading citizens and country peopleদের) আহ্বান করিতেন। সভায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র চারিবর্ণের প্রধানরাই উপস্থিত হইতেন, এবং তাহাদের উপদেশ ও অনুমোদন ক্রমে রাজারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য স্থির করিতেন *। কিন্তু এই সব স্থলে সাধারণ সমাজবিধির বা

* মহাভারতে এইরূপ একটা আখ্যান আছে। মহারাজ যযাতি যখন বয়োজ্যেষ্ঠ পুত্রদের বঞ্চিত করিয়া কনিষ্ঠ পুরুকে তাঁহার রাজপদে প্রতিষ্ঠা করিতে চান, তখন তিনি পৌরজানপদ চারিবর্ণের প্রধান প্রজাদের আহ্বান করেন। অবিধি বলিয়া ইঁহারা আপত্তি করেন, কিন্তু অনেক বুঝাইয়া যযাতি শেষে আপন প্রস্তাবে ইঁহাদের সম্মতি পান। রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবার সময়েও দশরথ এইরূপ এক পৌরজানপদসভা আহ্বান করেন এবং তাঁহাদের সম্মতি লইয়াই

ধর্ম্মবিধির কোনও পরিবর্ত্তন হইত না। ইহা ব্যতীত রাজাদের স্থায়ী যে সব অমাত্যসভা ছিল, সে গুলি ছিল শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে কতক রাজার মন্ত্রণাসভা, কতক বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারি-সভা (advisory or executive conncils)। শাসনসংক্রান্ত বিধিব্যবস্থা এই সব সভায় অনেক সময় স্থির হইত, কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থাপনার উপরে ইহাদের কোনও অধিকার কিছু ছিল না। বৈধ (constitutional) অধিকার কিছু ছিল না, তবে যথেচ্ছাচারী কোনও রাজা দুর্ব্বুদ্ধি অমাত্যের উপদেশে বা সহায়তায় অবৈধ বা unconstitutional কাজ কখনও কিছু করেন নাই, একথা কেহই বলিতে পারে না।

যাহা হউক, এই ভাবে যথাযোগ্য গুণে ব্রাহ্মণ বর্ণ সমাজধর্ম্মের নিয়ন্তৃত্বের পদে প্রতিষ্ঠিত হন, এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ভারও তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত হয়। কারণ মহৎ এই কর্ম্মের যোগ্য ইঁহারা ; আর সমাজ যে তাঁহাদের নিয়ন্তৃত্বে চলিবে, তাহা চলিতেও পারে তাঁহাদেরই ব্যবস্থিত ও তাঁহাদেরই হস্তে পরিচালিত যথাযোগ্য শিক্ষার প্রভাবে।

সমাজের চালক ও শিক্ষক—ক্ষমতায় ও পদগৌরবে ইহাদের সঙ্গে তুলনা আর কাহারও হইতে পারে না। কিন্তু এই ব্রাহ্মণের বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, যজন যাজন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা। যজন ও অধ্যয়ন নিজেদের কাজ। যাজনে ও অধ্যাপনায় সাধারণতঃ সমাজের সেবা তাঁহারা করিতেন। এবং এই দুই কর্ম্মে যদৃচ্ছাক্রমে লোকে (দক্ষিণা, প্রণামী বা উপহার স্বরূপ) যাহা তাঁহাদের দান করিত, তাহাই তাঁহাদের উপজীবিকার প্রধান সম্বল ছিল। অধ্যাপনা-কর্ম্মে শিষ্যকে তাঁহাদের গৃহে স্থান দিয়া অন্নদানও করিতে হইত।

আপন সঙ্কল্প স্থির করেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের পর সীতাকে পুনঃ গ্রহণ করিবেন কি না, তার জন্যও রামচন্দ্র পৌরজানপদবর্গের মতামতের উপরে নির্ভর করেন।

শিষ্যেরা তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিত, এবং কখনও ভিক্ষা করিয়াও অন্ন আহরণ করিয়া দিত। রাজা বা ধনী ভূস্বামীরাও কখনও কখনও নিষ্কর ভূমি বা বৃত্তি দানে ইঁহাদের পোষণ করিতেন। এইরূপ দান বা ভিক্ষার উপরে নির্ভর করিয়াই অতি দীনভাবে তাঁহারা জীবনযাপন করিতেন। ঐশ্বর্য্যভোগবিলাস-বর্জ্জিত অনাড়ম্বর এই দীনতাই ছিল, ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণজীবনের আদর্শ। শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে ভোগবিলাসবিমুখতা এবং সরল ও অনাড়ম্বর এই দীনতায় নির্ম্মল একটা সন্তোষ হইয়াছিল তাঁহাদের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ। রাজকার্য্যাদি ও ব্যবসায়বাণিজ্যাদি যে সব বৃত্তিতে প্রচুর ধনাগম হইতে পারে, সে সব ইঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় ছিল। এরূপ বৃত্তি কেহ গ্রহণ করিলে, সমাজনিয়ন্তৃত্বের উচ্চতম এই পদ ও তাহার মর্য্যাদা হইতে তিনি ভ্রষ্ট হইতেন।

ভারতীয় যাজক ও অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ স্বতন্ত্র সব গৃহস্থ ছিলেন, এবং সাধারণতঃ স্বতন্ত্রভাবেই যাজন ও অধ্যাপনা ব্রতপালন করিতেন। ব্যবস্থানির্ণয়ের উদ্দেশ্যে এবং পরস্পরের সহযোগিতায় উচ্চতর শাস্ত্রাদির অধ্যাপনার সুব্যবস্থার জন্য কখনও ইঁহারা মিলিত হইয়া পরিষৎ গঠন করিতেন। অনুষ্ঠান-বহুল বৃহৎ কোনও যজ্ঞ সম্পাদনেও অনেকে সম্মিলিত হইতেন। কিন্তু ইয়োরোপায় চার্চ্চের ন্যায় কোনও শক্তিচক্র রচনা করিয়া সমাজের উপরে কোনও রূপ সংঘায়ত্ত প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে ইঁহারা কখনও চাহেন নাই। সমাজ ধর্ম্মবুদ্ধিতে সাধারণতঃ ইঁহাদের আদেশ ও উপদেশ মানিয়া চলিত। দুষ্টের দমনে ধর্ম্মরক্ষার জন্য ক্ষত্রিয় রাজগণের উপরেই ইঁহারা নির্ভর করিতেন। কিন্তু ধর্ম্মবলের উপরে আর কোনও বলের অপেক্ষা নিজেরা করিতেন না; সেরূপ কোনও বলসঞ্চয়েরও প্রয়াস কখনও করেন নাই। চার্চ্চ বা ঐ রূপ কোনও চক্রে বা সংঘে প্রধান একজন নায়কের অধীনতায় পদ-পর্য্যায়ে বিভক্ত যেরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর যাজক দেখা যায়, সেরূপ কোন পদপর্য্যায়ের রীতিও হিন্দু যাজকদের মধ্যে ছিল না। পাণ্ডিত্যের

কি ধর্ম্মনিষ্ঠার খ্যাতি ব্যতীত ব্রাহ্মণ পরিষদে বা সভায় অন্য কোনও কারণে বিশিষ্ট কোনও মর্য্যাদা কেহ পাইতেন না। সকলেই সমান অধিকারে বিচার আলোচনা করিতেন। সিদ্ধান্ত যাহা হইত, সমবেত পণ্ডিতবর্গের অনুমত বলিয়াই তাহা গৃহীত ও প্রচারিত হইত। এখনও দেখিতে যাওয়া যায়, এইরূপ কোনও ব্যবস্থা যখন প্রচারিত হয়, ব্যবস্থাপত্রের নিম্নে 'ইতি বিদুষাং মতং' বলিয়া বহু পণ্ডিত তাহাতে স্বাক্ষর করেন। *

এইভাবে সমাজের কর্ত্তা হইয়াও সমাজের যদৃচ্ছা দান ও ভিক্ষার উপরে নির্ভর করিয়া অতি দীন ভাবেই ব্রাহ্মণ গৃহস্থগণকে জীবন যাপন করিতে হইত। সংঘগত আর্থিক কি রাষ্ট্রীয় কোনওরূপ কোনও বল-সঞ্চয়ে তাঁহাদের কোনও প্রভুত্বের কি অন্যরূপ স্বার্থের কোন প্রতিষ্ঠা তাঁহারা চাহিতেন না। জীবনের আদর্শই এরূপ ছিল না; ধর্ম্মনীতিও তাঁহার বিরোধী ছিল।

অধিকারের মহিমায় ও পদমর্য্যাদায় দান-ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণ ছিলেন, সমাজের প্রথমস্তর, শীর্ষ স্থানীয়। ব্রহ্মব্রত, ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্ম-পরায়ণ এই অর্থে 'ব্রহ্ম' শব্দ হইতে 'ব্রাহ্মণ' এই নামের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। পরমাত্মা, বেদ, বেদমন্ত্র, বেদজ্ঞান, যজ্ঞ, ব্রহ্মতেজঃ, তপস্যা—'ব্রহ্ম' বলিতে এই সকলই বুঝাইত।

ইঁহাদের নিম্নে ছিল ক্ষত্রিয়বর্ণ বা রাজন্যবর্গের স্থান। রাজা ছিলেন এক এক অঞ্চলে এই ক্ষত্রিয়সম্প্রদায়ের প্রধান বা প্রতিভূ-

* সংঘগঠনের রীতি সন্ন্যাসীদের মধ্যে ছিল, এখনও আছে। গৃহস্থ ব্রাহ্মণের মধ্যে ছিল না, এখনও নাই। সন্ন্যাসী, দেখিতে পাওয়া যায়, সকলেই প্রায় দৃঢ়সংবদ্ধ এক একটি সম্প্রদায়ভুক্ত। এক এক সম্প্রদায়ের অধিনায়কও এক একজন থাকেন। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ যুগের পর বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘের আদর্শে এই সব সন্ন্যাসিসংঘ গঠিত হয়।

স্বরূপ স্থানীয় সমাজের দণ্ডধর। এই দণ্ডবলে ‘ক্ষত’ বা উপদ্রব হইতে ত্রাণ বা রক্ষা করেন, তাই ইঁহাদের নাম হইয়াছে ক্ষত্রিয়। কিন্তু এই দণ্ড ইঁহাদের পরিচালিত করিতে হইত, ব্রাহ্মণনির্দ্দিষ্ট বিধিব্যবস্থার অনুসারে। রাজা বা তাঁহার প্রধান সহায় ক্ষত্রিয়বর্ণ সমাজের legislator বা ব্যবস্থাপক নহেন, উচ্চতর ব্রাহ্মণবর্ণের legislation বা বিধিব্যবস্থা অনুসারে রাজ্যের রক্ষক ও শাসনকর্ত্তা (executive বা administrative authority) মাত্র। ইহাতেও অমাত্যসভার মতানুসারে তাঁহাদের চলিতে হইত; এবং এই অমাত্য সভায় চারিবর্ণেরই প্রতিনিধি থাকিবে, সর্ব্বত্র না হউক, অনেক স্থলেই এইরূপ নিয়ম ছিল *। সময় বিশেষে রাষ্ট্রীয় সভায় আহূত পৌরজানপদ প্রধান প্রকৃতিবর্গের অনুমোদনও বহু গুরুকার্য্যে তাঁহাদের গ্রহণ করিতে হইত। বিচারালয়ের নাম ছিল, অধিকরণ বা ধর্ম্মাধিকরণ। সুপণ্ডিত এক একজন ব্রাহ্মণ ইহার অধ্যক্ষ বা প্রধান অধিকরণক ছিলেন। বিধিনির্দ্দেশ তাঁহারা যেরূপ করিতেন, বিবাদের নিষ্পত্তি সেই ভাবেই হইত।

দেশের ধনবলও তাঁহাদের হাতে ছিল না। ব্যবসায়বাণিজ্যাদি বৃত্তি ক্ষত্রিয় অধিকারের বহির্ভূত বৈশ্যবৃত্তি ছিল। রাজশক্তি ও ব্যবসায়-শক্তি ঘনিষ্ঠ স্বার্থের যোগে একই সম্প্রদায়ের অধিকৃত হইয়া কেবল তাহাদেরই রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসায়িক প্রভুত্বকে পুষ্ট করিতে পারিত না।

* শান্তি পর্ব্ব পঁচাশি অধ্যায়ে দেখা যায়, শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, চারিজন ব্রাহ্মণ, আটজন ক্ষত্রিয়, একুশজন বৈশ্য এবং তিনজন শূদ্র—ইঁহাদের লইয়া রাজার অমাত্য সভা গঠিত হইবে। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম তিন বর্ণের প্রতিনিধিদের সংখ্যা হইতে এইরূপ একটা ইঙ্গিতও পাওয়া যায়, যে উচ্চতর প্রত্যেক বর্ণ হইতে জনসংখ্যার অনুপাতেই এই অমাত্য সভায় প্রতিনিধি নেওয়া হইত। স্বভাবে শিক্ষায় ও বৃত্তিতে অপেক্ষাকৃত হীনতর বলিয়াই শূদ্র সম্বন্ধে এই অনুপাতের হার গ্রাহ্য হইত না।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়

মোটের উপর, সমাজের উপরে প্রভুশক্তির ধারক ছিলেন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, এই দুই বর্ণ। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কাজের ভাগ এবং তাহাতে একটা সামঞ্জস্য বা balance এইভাবে রক্ষিত হইত। ব্রাহ্মণ ব্যবস্থাপক বা legislative authorityর প্রতিভূ; কিন্তু তাহার executionএর ভার বা তদনুসারে শাসনকর্ত্তৃত্বের পরিচালনা বা administrationর authority ছিল ক্ষত্রিয়ের হাতে। রাষ্ট্রীয় পরিভাষায় ঠিক এই ভাবেই ইঁহাদের পরস্পরসাপেক্ষ এবং সাপেক্ষতায় নিয়মিত (mutually dependent and balanced) কর্ম্মের ভাগ বা functionকে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

ইয়োরোপে খৃষ্টীয় সমাজ শাসনে চার্চ্চ এবং এম্পায়ারের সহযোগিতার কথা পূর্ব্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি। * কিন্তু ইয়োরোপে ব্রহ্মণ্য ও ক্ষত্র শক্তির নেতৃত্ব যেমন বিশিষ্ট দুইটি শক্তিচক্রের অধিনায়ক দুইজন ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল, ভারতে তাহা কখনও হয় নাই। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গ এবং ক্ষত্রিয় রাজন্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গ অনেকটা স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ স্থানে স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে স্থানীয় জনসমাজ শাসন করিতেন। ইয়োরোপে চার্চ্চ ও এম্পায়ার—পোপ ও সম্রাট্—উভয় পক্ষেরই লক্ষ্য ছিল, শক্তিসংগ্রহে আত্মপ্রধান্যের প্রতিষ্ঠা। তাই এই সহযোগিতা শেষে ঘোর প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়, এবং চার্চ্চ তাঁহার প্রতিযোগী ধর্ম্মরাজ্য বা এম্পায়ারের শক্তিকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া আপনার সর্ব্বময় প্রভুত্ব স্থাপন করেন। কিন্তু ভারতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এরূপ একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৃষ্টান্ত বর্ণধর্ম্মে সমাজস্থাপনার পরে বড় পাওয়া যায় না। পরশুরামের সঙ্গে ক্ষত্রিয়সমাজের বিরোধের রহস্য যাহাই হউক, সে অতি পুরাকালের ঘটনা। যে কারণে যাহাই তখন ঘটিয়া থাক,

* ১৬৯—৭০ এবং ২১৫—১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সমাজের মঙ্গলে ক্ষত্রিয়ের প্রয়োজন আছে এবং এই অঙ্গের যথোচিত কর্ম্মের ভাগ সম্পন্ন না হইলে সমাজদেহ স্বাস্থ্যে ও মঙ্গলে থাকে না, তাই আবার ব্রাহ্মণরাই নূতন এক ক্ষত্রিয়সম্প্রদায় গঠন করেন। পরশুরাম স্বয়ং দক্ষিণদেশে অনার্য্য জাতির মধ্যেও একটি ক্ষত্রিয়-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন।

উপনিষদেও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে কিছু প্রতিযোগিতার আভাস পাওয়া যায়। সেও অতি পুরাকালের কথা। আর সে প্রতিযোগিতার ভাব যাহা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা ব্রহ্মবিদ্যার তত্ত্বানুশীলনে। ব্রাহ্মণরা দেখিলেন, তত্ত্ববিদ্যার অধিকারে বহু ক্ষত্রিয় রাজা তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মনে মনে ইহাতে কিছু ঈর্ষান্বিত হইলেও, অনেক ব্রাহ্মণ-সন্তান ক্ষত্রিয়রাজগণের নিকটে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যায় উপদেশ লাভ করিতে চাহেন। রাজারাও এই বিদ্যা ব্রাহ্মণকে দান করিতে কুণ্ঠিত কখনও হন নাই। অতি পুরাকালে এইরূপ ব্যতিক্রমের দুইটি চারিটি দৃষ্টান্ত যাহাই দেখা যাউক, মোটের উপর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দুই সম্প্রদায়ই সহযোগীরূপে পরস্পরের সহায় হইয়া ধর্ম্মানুগত বিধিতে সমাজের নিয়ন্ত্রণ এবং শাসনরক্ষণ করিয়াছেন। স্বার্থের বিরোধ কি শক্তির প্রতিযোগিতা ইহাদের মধ্যে বড় দেখা যায় নাই। বরং ধর্ম্মালোচনায় এবং অন্যান্য কর্ম্মে যখনই তাঁহারা মিলিত হইয়াছেন, পরস্পরেরপ্রতি সশ্রদ্ধ একটা সৌহার্দ্দের ভাবই দেখাইয়াছেন। ক্ষত্রিয়কে যে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় হীন চক্ষে দেখেন নাই, ক্ষাত্রমহিমাকে যে অবজ্ঞা করেন নাই, তার বড় একটা প্রমাণ এই, যে ক্ষাত্রকুলে জাত শ্রীকৃষ্ণকে ও রামচন্দ্রকে ভগবানের অবতার বলিয়া ব্রাহ্মণও স্বীকার করিয়াছেন এবং যথাযোগ্য ভক্তির পূজা তাঁহাদের দিয়াছেন।

বৈশ্য *

বৈশ্য ধনবলের প্রভু, কিন্তু সমাজে তাঁহাদের স্থান হইয়াছিল, তৃতীয় স্তরে। রাজার অমাত্যসভায় তাঁহাদের প্রতিনিধি গৃহীত হইতেন,—

* বৈশ্য এই নামের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে ২৫৩ পৃষ্ঠায় ৬ষ্ঠ প্রবন্ধের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

রাষ্ট্রীয় পৌরজানপদ সভা যখন হইত তাঁহারাও আহূত হইতেন। কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থাপনার অথবা শাসনের উপরে কোনওরূপ কর্ত্তৃত্ব তাঁহাদের স্বীকৃত হইত না। তাঁহারাও এরূপ কোনও কর্ত্তৃত্বের দাবী করিতেন না। পূর্ব্বে ১৮৫-৬পৃষ্ঠায় শাসক ও *শাসিত, নায়ক* ও *নিয়ন্ত্রিত* নামে প্রধান এই যে দুইটি ভাগের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, যে দুইটি ভাগই যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ও শূদ্র—দুইটি দুইটি শাখা ভাগে বিভক্ত হইয়া স্পষ্ট চারিটি শ্রেণীতে সাধারণতঃ পরিণত হয়,—বৈশ্য সেই শাসিত ভাগের প্রথম বা উচ্চতর স্তর। ধনবলের অধিকারী হইয়াও ইঁহারা শাসিত। সমাজের কর্ত্তা বা শাসকের স্থানে অধিরূঢ় হইয়া সমগ্র সমাজকে তাঁহাদের ব্যবসায়িক বা আর্থিক স্বার্থের বশীভূত করিতে কখনও পারে নাই।

শূদ্র

অল্পবুদ্ধি ও অশিক্ষিত প্রাকৃতজনগণ—non-intellecual and uncultured masses বলিয়া শূদ্রের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। দৈহিক শ্রমশক্তি ইহাদের আছে, কিন্তু বুদ্ধিতে ইহারা কতকটা বালকের ন্যায়, মানসিক কোনও উচ্চতর শক্তি ইহাদের মধ্যে বিকাশ লাভ এখনও করে নাই। ইহাদের এই দৈহিক শ্রমশক্তির প্রয়োজন সমাজের পক্ষে যথেষ্ট আছে, কিন্তু মানসিক শক্তির এই অপরিণত অবস্থা হেতু কোন্ কর্ম্মে কোথায় কি ভাবে ইহা প্রয়োগ করিতে হইবে, নিজেরা তাহা ভাল বুঝে না, কেবল নিজেদের বলে নিজেদের রক্ষাও করিতে পারে না। সুতরাং উচ্চতর বুদ্ধিশীল ব্যক্তিদের রক্ষণাবেক্ষণে ইহাদের থাকিতে হইবে, কাজকর্ম্মেও তাঁহাদের নির্দ্দেশ মত চলিতে হইবে। জনতার বলে স্বপ্রধান হইয়া সামাজিক উচ্চতর কোনও দায়িত্ব যদি ইহারা গ্রহণ করে, যাহার উপযোগী গুণ ইহাদের নাই অথবা বিকাশ লাভ করে নাই, তবে মোট সমাজের কেবল নয়, নিজেদেরও বহু অনিষ্ট তাহাতে হইতে পারে। সুরক্ষিত

অবস্থায় শক্তিমত কাজকর্ম্ম করিবে,করিয়া খাইয়া পরিয়া সুখে থাকিবে, এ অধিকার ইহাদের আছে, সকলেরই আছে। এই অধিকারে সুস্থিত থাকিয়া নিশ্চিন্তভাবে শ্রমবলে যথাযোগ্য কর্ম্মের ভাগ সম্পাদনে সমাজের সেবা তাহাদের করিতে হইবে। 'ক্ষুদ্র' * শব্দজ 'শূদ্র' এই নামে তাই সমাজের চতুর্থ বা নিম্নতম স্তরে ইহাদের স্থান হয়, আর উচ্চতর বর্ণত্রয়ের সেবা ইহাদের সামাজিক কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হয়।

সেবা? হাঁ, এক হিসাবে সকলেরই কর্ম্ম সেবা, সমাজের সেবা, service of society। সকলেই সমাজের সেবক বা servant। ব্রাহ্মণ জ্ঞানবলে, ক্ষত্রিয় বাহুবলে এবং বৈশ্য ধনবলে কেবল নিজ নিজ সম্প্রদায়িক স্বার্থের পোষক নহেন,—ধর্ম্মস্থাপনে, শাসনরক্ষণে এবং ধনোৎপাদনে সমাজেরই সেবক। আর শূদ্র শ্রমবলে এই তিন বর্ণের সেবার মধ্য দিয়া সমাজের সেবক। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উচ্চতর বর্ণত্রয়ের উপরে নির্ভর করিয়া দৈহিক-শ্রমে তাঁহাদের কর্ম্মের যে সহায়তা শূদ্রকে করিতে হইবে, সেই সহায়তাতেই সমাজের এই সেবাধর্ম্ম তাহাদের পালিত হইবে, এইরূপ বিবেচিত হয়।

গৃহে থাকিয়া ইঁহাদের পরিচর্য্যায় অর্থাৎ পরিচারকরূপে ইঁহাদের নিয়োগে শ্রমসাধ্য কর্ম্মাদি নির্ব্বাহে এই সহায়তার কার্য্য যত বেশী সুসম্পন্ন হইতে পারে, অন্যথা তাহা পারে না। তাই বিশেষভাবে সেবা নামে তাহাদের কর্ম্মকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কৃষাণ মুজুরদের কাজকেও এই পরিচর্য্যারই একটা প্রকার ভেদ বলিয়া ধরিয়া নেওয়া

---

* 'ক্ষুদ্র' (ক্ষুদ্র) এই নামের উচ্চারণ সহজেই কেবল 'শূদ্রে' পরিণত হইতে পারে এবং তাহাই হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ বলিয়া থাকেন, নিম্নতর অনার্য্য জাতীয় লোকেরাই শূদ্র স্তরে স্থান পাইয়াছিলেন। অনার্য্য জাতীয়েরা অনেকেই শূদ্র হইয়াছে, একথা সত্য। কিন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্যও তাহারা অনেক হইয়াছে (পরবর্ত্তী ৪র্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। আবার শূদ্র স্বভাবের লোক সর্ব্বত্রই আছে। আর্য্যজাতের মধ্যেও অবশ্য ছিল।

যাইতে পারে। কিন্তু কেবল এই পরিচর্য্যার কর্ম্মেই নিযুক্ত হইয়া সকল শূদ্র প্রতিপালিত হইতে পারিবে, ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। তাই বহু শূদ্র কৃষিকর্ম্ম ও নানাবিধ কারুকার্য্যাদি করিয়াও জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। শূদ্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে, অল্পবুদ্ধি এইরূপ প্রাকৃত জনগণ (uncultured and non-intellectual masses) সকল দেশেই এই সব কর্ম্মে জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

পরিচর্য্যাদি কর্ম্মে বেতনের হার যদি অনুপযুক্ত না হয়, শ্রমোৎপন্ন ধন যদি শক্তিশালী ব্যক্তিরা নানা অন্যায় দাবী করিয়া বলে ছলে কাড়িয়া না নেয়, স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে বৃত্তিতে তাহাদের বঞ্চিত না করে, বাক্‌-পারুষ্যে কি দণ্ডপারুষ্যে যখন তখন ইহাদের ব্যথিত কি উৎপীড়িত না করে, সদয় ব্যবহারে আপ্যায়িত হইয়া সুরক্ষিত অবস্থায় শান্তিতে যদি ইহারা থাকিতে পারে, যথোপযুক্ত শিক্ষালাভে ও ধর্ম্মাচরণে উন্নতিলাভ করিবার অবসর যদি পায়, তবে এই অবস্থায়, এই পদে বা statusএ সন্তুষ্টই তাহারা থাকে, এবং উচ্চতর সম্প্রদায়সমূহের সঙ্গে অধিকারের দাবী লইয়া বিরোধ কিছু করিতে যায় না।

স্বাভাবিক গুণ বা প্রকৃতির ভাব অনুসারে হিন্দুসমাজে শূদ্রের পদ বা status এবং পদোপযোগী কর্ম্মের ভাগ যে এইরূপ ছিল, ইহাই আপত্তির বড় একটা কথা নহে। আপত্তির কথা হইতে পারে, এই অবস্থায় যে সব সুখসুবিধার ভোগে ন্যায্য অধিকার তাহাদের আছে, তাহাতে বঞ্চিত হইলে। উচ্চতর বর্ণত্রয়ের শিক্ষার রীতি ও জীবন-নীতির আদর্শ যাহা ছিল, তাহাতে ন্যায্য এই সব অধিকার ভোগে শূদ্রের বঞ্চিত হইবার কথা নয়। তবে বাস্তব জীবনে এই আদর্শ সর্ব্বদা যে পালিত হইত, একথাও কেহই বলিতে পারেন না।

যাহাহউক, বাস্তব জীবনে শূদ্রের অবস্থা কিরূপ ছিল, ন্যায্য কি অধিকার কত দূর কি ভোগ করিত, কি করিত না, এ সব সম্বন্ধে 'শূদ্রের অধিকার' নামক পরবর্ত্তী ৮ম পরিচ্ছেদে যথাসাধ্য আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

বৈশ্য ও শূদ্র—শ্রমিক জনতার বল

বৈশ্য ও শূদ্র উভয় বর্ণকেই মোটের উপর এক শাসিত সম্প্রদায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। বৈশ্যের বল ধনবল এবং শূদ্রের বল শ্রমবল। কিন্তু ধনবল যেমন অল্পসংখ্যক লোকের হাতেও অতি বড় একটি বল হইতে পারে, শ্রমবল তাহা পারে না। বৃহৎ জনতাই ইহাকে বড় একটি বল করিয়া তুলিতে পারে, এবং তাই এই বলকে শ্রমিক জনতার বল (force of labour represented by the uncultured and non-intellectual masses of a people) বলিয়া পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু শূদ্র কি সত্যই জনতায় এত বড়? কেবল শূদ্র না হইতে পারে, কোথাও বোধ হয় না। শূদ্র বলিতে যাহাদের বুঝায়, সংখ্যায় তাহারা অতি অধিক হইলে কোনও দেশের পক্ষেই তাহা উন্নত অবস্থার লক্ষণ নহে।

কিন্তু কেবল শূদ্র জনতায় বড় না হইলেও, নিম্নতর স্তরের বৈশ্যের সঙ্গে একত্র করিয়া ধরিলে, শ্রমিক জনতার বল সর্ব্বত্রই অতিবড় একটা বল হইয়া দাঁড়ায়। কারণ এই বৈশ্যেরাও প্রধানতঃ শ্রমজীবী।

কৃষি, পশুপালন, কারুশিল্প ও বাণিজ্য, এই সব বৈশ্যের বৃত্তি। ইহার মধ্যে বাণিজ্যই ধনাগমের প্রধান উপায়। যেমন অন্যান্য দেশে দেখা যায়, ভারতেও বণিক্ বৈশ্যই শ্রেষ্ঠ ধনী ছিলেন, এবং শ্রেষ্ঠী নামেই ইঁহারা অভিহিত হইতেন। কৃষি ও পশুপালনে এবং উচ্চতর কারুশিল্পে অপেক্ষাকৃত একটু উন্নত অবস্থায় কেহ কেহ উঠিতে পারে, কিন্তু অধিকাংশকেই এই সব বৃত্তিতে নিজেদের ছোট ছোট ব্যবসায় নিজেদের শ্রমে চালাইতে হয়। বর্ণে বৈশ্য এবং বেদাধ্যয়ন ও যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ার অধিকারী হইলেও, ইহাদের মধ্যে অনেকেরই যে তাহার অবসর বড় ঘটিত না, এবং উচ্চতর শিক্ষা ও ক্রিয়াকর্ম্মাদির ফলে জীবনযাত্রার রীতিও যে শিষ্ট ও উন্নত হইয়া উঠিতে পারিত না, একথা বলাই বাহুল্য। এদিকে বহু শূদ্রও কৃষি,পশুপালন ও কারুশিল্পাদি বৃত্তি অবলম্বন করিত। সমান

শ্রমবৃত্তিক বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে অবস্থাগত এই সমতা হেতু সামাজিক আচারব্যবহার-গত কতকটা সমতাও অবশ্যম্ভাবী। বস্তুতঃ এই নিম্নতর স্তরে কোথায় বৈশ্য শেষ হইয়া শূদ্র আরম্ভ হইয়াছে, ইহা নির্ণয় করাও অনেক স্থলে যায় না। নিম্নতর বৈশ্য এবং উচ্চতর শূদ্র—ইহারা প্রায় এক সম্প্রদায়ের মতই হইয়া দাঁড়ায়। আবার উচ্চতর শূদ্রের স্তর হইতে নিম্নতর শূদ্রের স্তরগুলিও এমন ভাবে ক্রমে নামিয়া আসিয়াছে, যে স্পষ্ট কোনও সীমারেখায় ইহাদের ভাগ করিয়া নেওয়া সম্ভব হয় না।

এই ভাবে, কেহ কিছু বড় কেহ কিছু ছোট, কাহারও বৃত্তি এইরূপ কাহারও ঐরূপ, এই রকম যত শাখাবিভাগই দেখা যাউক, নিম্নতর স্তরের বৈশ্যে ও শূদ্রে গুণকর্ম্মে পার্থক্য বড় থাকে না; সকলেই প্রায় সমান এক শূদ্রশ্রেণীতে পরিণত হয়। এদেশের কর্ম্মকারাদি বহু কারুশিল্পী, গোপাদি বহু পশুপালক, মাহিষ্যাদি বহু কৃষিজীবীও মূলে হয়ত বৈশ্য ছিলেন, কিন্তু এখন শূদ্রে পরিণত হইয়াছেন। উপনয়ন সংস্কার ইঁহাদের হয় না। মৃতজাতক অশৌচ পালনে, বিবাহশ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে, শূদ্রোচিত বিধিব্যবস্থা মানিয়া চলেন।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় জনতায় কোথাও বেশী হয় না। উচ্চতর ধনী বৈশ্যের সংখ্যাও এমন অধিক কোথাও হইতে পারে না। শূদ্র নিজে সংখ্যায় অতি বড় না হইলেও, শূদ্রভাবাপন্ন বৈশ্যের সঙ্গে মিলিয়া জনতার বলে সর্ব্বত্রই অতি বড় হইয়া দাঁড়ায়। এই বলই শূদ্রবল, শ্রমিক জনতার বল, এই জনতাকেই গণ বা Demos বলা হয়। ইহারা যদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও উচ্চতর ধনী বৈশ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথক্ এক সম্প্রদায় হইয়া দাঁড়ায়, তবে ডিমক্রাসীর নিয়মে জন বলে ইহারাই সমাজের উপরে প্রভুত্ব করিতে পারে। কিন্তু গ্রহণ করিতে পারিলেও এই প্রভুত্বশক্তিকে ধারণ ও পরিচালন করিবার মত গুণ ইহাদের আছে, একথা কেহই জোর করিয়া বলিতে পারিবেন না।

সামঞ্জস্য

ত্রুটি বিচ্যুতি যখন যাহাই দেখা যাউক, বাস্তব জীবনে এই আদর্শ যথোচিত ভাবে সর্ব্বদা অনুসৃত হইতে পারুক কি নাই পারুক, মোটের উপর এই ভাবে এই আদর্শে বর্ণাধিকার সংস্থান হিন্দুসমাজে হইয়াছিল। প্রধান চারিটি সামাজিক কর্ম্মভাগ বা Social function কি, তাহা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। স্বাভাবিক গুণে যে যে কর্ম্মের উপযুক্ত, শিক্ষায় ও সাধনায় সেই গুণেরই উৎকর্যণে যোগ্যতর হইয়া সেই কর্ম্ম সে সম্পাদন করিবে, ইহাই সুব্যবস্থা। সমাজের জ্ঞানবল, বাহুবল, ধনবল ও শ্রমবল, এবং যথাযোগ্য গুণে এই চারিটি বলের প্রতিভূ স্বরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণ, যথাযোগ্য স্থানে থাকিয়া যথাযোগ্য কর্ম্মের ভাগ সম্পাদন করিতে পারে এবং ইহাদের মধ্যে পরস্পর নির্ভরশীল এমন একটা শক্তির সামঞ্জস্য থাকে, যাহাতে কেহই অপর কাহারও উপরে অন্যায় কোনও প্রভুত্ব করিতে না পারে, সমগ্র সমাজকেই আপন স্বার্থের ও শক্তির অধীন করিয়া না ফেলে, ইহাই এই বর্ণাধিকার সংস্থানের লক্ষ্য ছিল,এবং এই লক্ষ্য বহু পরিমাণে সিদ্ধও হইয়াছিল।

বহুপরিমাণে বলিলাম, সম্পূর্ণভাবে বলিলাম না, বলিতে পারি না। কারণ সহস্র শিক্ষা ও সাধনার ফলেও মানব তাহার স্বাভাবিক দুর্ব্বলতাকে অতিক্রম করিয়া, প্রবৃত্তিকে একেবারে নিবৃত্তির সংযমে শাসিত রাখিয়া কোনও কর্ম্মেই সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। ব্যক্তিবিশেষ কোথাও কেহ পারিতে পারে। বহুব্যক্তির সমবায়ে গঠিত কোনও সম্প্রদায় বড় পারে না। ভারতের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ও তাহা পারেন নাই। কিন্তু আদর্শভ্রষ্ট যতই তাঁহারা যখন হউন, আপনাদের বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাধারণ জনসমাজের স্বার্থকে একেবারে বলি তাঁহারা কখনও দেন নাই।

যাঁহাদের নেতৃত্বে ও শাসনাধীনতায় সাধারণ জনসমাজ নিশ্চিন্ত ভাবে নিজ নিজ কর্ম্মে ব্যবস্থিত থাকিয়া মোটের উপর সুখশান্তিতে

জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, অত্যধিক স্বার্থহানি কি দুঃসহ পীড়ন যদি নিয়ত না ঘটে, তবে সময় সময় তাহাদের ক্রটিবিচ্যুতিতে কখনও কিছু স্বার্থের ব্যাঘাত, কখনও কোনও পীড়ন তাহারা সহিতে পারে, এবং সহিয়াও থাকে। মোটের উপর যে উপকার ইঁহাদের শাসনের ও রক্ষণের গুণে পায়, তার তুলনায় যে ক্ষতি কি ব্যাঘাত কি দুঃখ তাহাদের ঘটে, তাহা এমন বেশী বলিয়া তাহারা মনে করে না।

প্রাচীন কাল হইতে মুসলমান রাজত্বের শেষভাগ পর্য্যন্ত বহু বিদেশী পরিব্রাজক এদেশে আসিয়াছেন এবং ভারতের অবস্থার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের সকলেরই বিবরণ হইতে ভারতের জনসাধারণের যে চিত্র আমরা পাই, তাহা অতি সুন্দর সচ্ছল স্বচ্ছন্দতার ও সুখশান্তির চিত্র।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইয়োরোপীয় জনসাধারণের জীবনের যে চিত্র পাওয়া যায়, ইহার তুলনায়, হায় সে কি!

সে যুগ গিয়াছে। অধুনা নূতন নীতির নূতন শক্তিতে নূতন যে যুগ ইয়োরোপে আসিয়াছে, যে যুগে ইয়োরোপে অশেষ সমৃদ্ধির কথা সর্ব্বত্র নিনাদিত হইতেছে, তার মধ্যেও জনসাধারণের দুঃখদারিদ্র্যের অবধি নাই। দুঃখ দারিদ্র্যের পেষণে উন্মত্ত হইয়া এই জনসাধারণ ইয়োরোপের সমাজ বিধান, রাষ্ট্র বিধান, সব চূর্ণ করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছে। ফরাসী বিপ্লব অপেক্ষাও এ বিপ্লব যদি ঘটে, অনেক বেশী ভয়ঙ্কর হইবে,—ইয়োরোপীয় সভ্যতাকেই একেবারে চূর্ণ করিয়া ফেলিবে।

প্রচুর অন্নস্থানীয়ে পুষ্ট ও পরিতুষ্ট, নিশ্চিন্ত সুখশান্তিতে নিজ নিজ কর্ম্মে নিবিষ্ট, ভারতীয় জনসাধারণের সেই চিত্রের সঙ্গে ইহার তুলনাই হয় না।

সমাজের পরিচালক ও শাসক যাঁহারা, তাঁহারা কেবলই নিজেদের স্বার্থান্বেষী হইয়া নিয়ত পীড়নে ও অর্থশোষণে পরিচালিত ও শাসিত জনগণকে পেষণ করিলে, ব্যাপক এইরূপ সুখশান্তির চিত্র কোথাও সম্ভব হয় না।

৩। বর্ণ ও জাতি

গুণানুরূপ কর্ম্মবিভাগে চারিটি বর্ণের সৃষ্টি বা অভিব্যক্তি হইয়াছে। ইহার মূল যে গুণ ভেদ, তাহা অলঙ্ঘনীয় সীমারেখায় ভাগ করা পৃথক্ চারিটি প্রকারের বা typeএর গুণ নহে, এবং চারিটি বর্ণও পৃথক্ এইরূপ চারিটি গুণের অধিকারী চিরকালের মত অলঙ্ঘনীয় সীমা-রেখায় ভাগ করা, যেন পৃথক চারিটি ছাঁচে ঢালা, পৃথক্ চারি প্রকারের (বা typeএর) caste বা জাতি নহে। মানুষ সবই মানুষ; সকলের মধ্যেই মানবপ্রকৃতির সকল গুণ রহিয়াছে। কোথাও কোনওটা বেশী, কোথাও কোনওটা কম, এই ভাবে যেরূপ গুণ যাহার স্বভাবের প্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কর্ম্মাধিকারও তদনুরূপ হইয়াছে। সমাজজীবনের ক্রমাভিব্যক্তির সঙ্গেই এই সব গুণবিভাগ ও কর্ম্মবিভাগ এবং গুণকর্ম্মবিভাগে সামাজিক শ্রেণী বিভাগ অভিব্যক্ত হইয়া উঠে। *

ভারতের বেদ পুরাণ ইতিহাস ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি হইতেও বহু বচন উদ্ধার করিয়া এই সত্যের প্রমাণ দেখান যায়। †

* এই বিভাগের এই সব তত্ত্ব ও প্রকৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পূর্ব্বে করা হইয়াছে। ১৪৩-৪৭ পৃষ্ঠা, ১৮৯—৯৫ পৃষ্ঠা ও ৬২৫-২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† কয়েকটি প্রামাণিক উক্তি নিম্নে উদ্ধার করা হইল।

"বর্ণাশ্রমব্যবস্থাশ্চ ন তদাঽসন্ ন সঙ্করঃ॥

(বায়ুপুরাণ)

তখন অর্থাৎ কৃত (অর্থাৎ সত্য) যুগে বর্ণবিভাগ ছিল না, আশ্রমবিভাগ ছিল না, সঙ্কর বর্ণও ছিল না।

ক্রমে এই বিভাগ কেমন করিয়া অভিব্যক্ত হইল, তাহার চমৎকার একটি আভাস মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ১৮৬ অধ্যায়ে নিম্নোদ্ধৃত বচন গুলিতে পাওয়া যায়।

নবিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রাহ্মণাঃ পূর্ব্বসৃষ্টাহি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতাঃ॥

পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, চতুর্ব্বিধ গুণকর্ম্মে মোটের উপর চারিটি শ্রেণী উন্নত সকল সমাজেই দেখা দেয়, এবং সাধারণতঃ পৈতৃক গুণের অধিকারী হইয়া পৈতৃক কর্ম্মেরই অনুবর্ত্তনে সন্তান-পরম্পরা চলে, এবং এই ভাবে এই শ্রেণী চতুষ্টয়ের ধারা সাধারণতঃ

কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তেদ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাধায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥

মূলে এই বিশ্বজগৎ ব্রহ্মপ্রসূত বা ব্রাহ্ম। মানবের মধ্যেও বর্ণবৈশিষ্ট কিছু আদিম যুগে ছিল না,—সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন, ক্রমে কর্ম্মপ্রভাবে বর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। রজোগুণ প্রভাবে ক্রমে কামভোগপ্রিয়, উগ্র, ক্রোধন, দুঃসাহস এবং এই ভাবে স্বধর্ম্মত্যাগী যাহারা হইল, সেই সব ব্রাহ্মণই রক্তাঙ্গ হইয়া ক্ষত্রতা লাভ করিল। আবার কৃষি গোপালন প্রভৃতি বৃত্তি যাহারা গ্রহণ করিল, পীতাঙ্গ হইয়া তাহারা বৈশ্যতা লাভ করিল। আর জীবহিংসক মিথ্যাভাষী লোভী এবং যে কোনও কর্ম্ম দ্বারাই জীবিকা অর্জ্জনে রত, এইরূপ যাহারা কৃষ্ণাঙ্গ ও শৌচভ্রষ্ট হইল, তাহারাই শূদ্রতা লাভ করিল।

মনুসংহিতায় একটি বচন আছে,—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্ দ্বিজ উচ্যতে।
শূদ্রেনহি সমস্তাবদ্ যাবদ্বেবেদে ন জায়তে॥

(মনু—২, ১৭২)

জন্মে সকলেই শূদ্র ; উপনয়ন সংস্কারে দ্বিজ হয়। যতদিন না এই সংস্কারের ফলে বেদে নূতন এক জন্ম হয়, ততদিন সকলেই সমান শূদ্র।

মূলে সকলেই ব্রাহ্মণ, অথবা সকলেই শূদ্র। ব্রহ্ম হইতেই সকল জীব প্রসূত হইয়াছে,এই সত্যের দিক দিয়া দেখিলে মূলে সকলকেই ব্রাহ্মণ বলিতে হয়। আবার সকল জীবই প্রথমে ঘনতম তমসাবরণে আবৃত থাকে, ক্রমে তাহা ভেদ করিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়, এইদিক দিয়া দেখিলে সকলকেই সমান শূদ্র বলিতে হইবে। তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অনেকে বলেন, জীবাত্মা আপনাকে তমোজালে

বংশানুক্রমিক হইয়া দাঁড়ায়। অলঙ্ঘ্য বাধা কিছু না থাকিলেও, এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীতে উন্নয়ন কি অবনয়ন সচরাচর বড় ঘটে না। *

গুণকর্ম্মবিভাগে স্বাভাবিক এই শ্রেণীবিভাগের রীতি স্পষ্টভাবেই সামাজিক কর্ম্মশৃঙ্খলার মূলনীতি বলিয়া হিন্দুসমাজে গৃহীত হয়। প্রত্যেকটি শ্রেণী বা বর্ণ স্বীয় বিশিষ্ট গুণে যত বেশী উৎকর্ষ লাভ করিবে এবং তদনুরূপ বিশিষ্ট এক একটি চরিত্রের আদর্শ ধরিয়া চলিতে পারিবে, তত বেশী উৎকৃষ্ট ভাবে যে তাহার কর্ম্মের ভাগ নির্ব্বাহিত হইবে, একথা বলাই বাহুল্য।

জড়াইয়া স্বীয় চৈতন্যকে একেবারে মায়াভিভূত করিয়া ফেলেন, এবং ক্রমে তাহার মধ্য হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া এই চৈতন্যকে আবার ফুটাইয়া তোলেন। মুক্তাবস্থা হইতে এই বন্ধনের দিকে এবং বন্ধনের অবস্থা হইতে মুক্তির দিকে এই যে দ্বিবিধ গতি,এই যে নামা ও উঠা, Involution ও Evolution এই দুই নামে কেহ কেহ এই তত্ত্বকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। একটিকে ক্রমাবৃত্তি আর একটিকে ক্রমাভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে। কি ভাবে দ্বিবিধ এই গতিতে জীবচক্র চলিতেছে, সে সব অতি জটিল কথা। মোটের উপরে এই দুইটি উক্তি হইতে এই এক কথাই আমরা পাই যে বিশুদ্ধ সত্ত্ব ভাবে কি তমোভাবে, যে ভাবেই হউক, সকল মানবই এক ছিল, এবং ক্রমে গুণবিকাশের তারতম্যে বিভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। আর একটি কথা। মহাভারতের ঐ বচনটি সমষ্টি ভাবে বর্ণ চতুষ্টয়ের উদ্ভবের তত্ত্বকে নির্দ্দেশ করিতেছে, এবং মনুর এই বচন ব্যষ্টি ভাবে দ্বিজ বর্ণত্রয়ের মানুষকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। জন্মে ইহরা প্রত্যেকেই শূদ্র বা শূদ্রবৎ। উপনয়ন সংস্কারের পর যখন বেদাধ্যয়নে প্রবিষ্ট হয়, তখনই দ্বিজত্ব লাভ করে। তার পূর্ব্বে সে বালক মাত্র ; সকলের সঙ্গেই সমজাতীয়। এই সংস্কারের অধিকারী যাহারা, তাহারা ইহার পরই দ্বিজত্ব লাভ করে ; নহিলে করে না।

* পূর্ব্বতন ইয়োরোপীয় সমাজে এদেশের চতুর্ব্বর্ণ্যের অনুরূপ চারিটি যে শ্রেণী বা স্তর ছিল, তাঁহাদের মধ্যে যাজক শ্রেণী ব্যতীত অপর তিনটি স্তরই সাধারণতঃ এইরূপ বংশানুক্রমিক হইয়া দাঁড়ায়। যাজকের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, তাই এই সম্প্রদায় বংশানুক্রমিক হইতে পারে নাই।

পুরুষপরম্পরাক্রমে একইবিধ শিক্ষা লাভ করিয়া, একইবিধ আচার-নিয়মে চলিতে পারিলে ইহা যেরূপ সহজ হয়, অন্যথা সেরূপ হইতে পারে না। পিতৃবংশের অনুরূপ গুণ সন্তানে দেখা দেয়, পিতা সন্তানকে নিজের কুলোচিত আদর্শেই মানুষ করিয়া তোলেন, কৌলিক আচার-নিয়ম পালনে সহজে সন্তান অভ্যস্ত হইয়া উঠে, মতিগতিও তদনুরূপ হয়, এবং কৌলিক ধর্ম্মের সঙ্গে কৌলিক পদমর্য্যাদাও সন্তান উত্তরাধিকার করে। এইভাবে চারিটি বর্ণ ক্রমে বংশানুক্রমিক হইয়া চারিটি জাতিতে পরিণত হইয়াছে। গুণবিভাগে কর্ম্মবিভাগ, গুণকর্ম্মবিভাগে বর্ণবিভাগ এবং ইহারই সুসিদ্ধির প্রয়োজনে তাহা হইতে জাতিবিভাগ, এই ভাবে পরপর এই বিভাগগুলি আপন ধর্ম্মেই অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। অনেকে যেরূপ বলিয়া থাকেন, বাস্তবিক ইহা অবনতির লক্ষণ নহে। নৈসর্গিক নিয়মেই উচ্চতর এক স্তরে অভিব্যক্তি এবং ইহাতেই এই বিভাগের ধর্ম্ম অধিকতর সিদ্ধ হয়। *

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যকৃতঃ।
উরূতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাংশূদ্রোঽজায়ত ॥"

পৃথক চারিটি জাতিরূপে চারিটি বর্ণের বিভাগ যে হিন্দুসমাজের সনাতন বিভাগ, ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্তের এই বচনটিকে তাহার প্রমাণ বলিয়া অনেকে উল্লেখ করিয়া থাকেন। অনেকে আবার বলেন, এইরূপ জাতিগত বর্ণবিভাগ প্রাচীন হিন্দু-সমাজে ছিল না, ছিল না যে বৈদিক মন্ত্রসংহিতার বহু উক্তি হইতেই তাহার প্রমাণ হয়। পরে যখন জাতিভেদ দেখা দেয়, তখন এই সূক্তটি রচিত হইয়াছে, এবং ইহার ভাষাও অনেকটা অর্ব্বাচীন অর্থাৎ পরবর্ত্তী যুগের। কিন্তু বৈদিক সকল মন্ত্রের সকল ঋষি যে একই সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং এক সময়ে সকল মন্ত্র তাঁহাদের মুখে ব্যক্ত হয়, তাহা কেহই বলেন না, বলিতে পারেনও না। বরং বহু শতাব্দিকাল ব্যাপিয়া এই সব মন্ত্র যে ক্রমে প্রকাশিত বা রচিত হইয়াছিল, এই কথাই অনেকে বলেন। হইতে পারে, এই সূক্তটি অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালের এবং ভাষায়ও তখন পরিবর্ত্তন কিছু হয়। কিন্তু যত পরেই হউক, মহর্ষি কৃষ্ণ-

এই জাতিবিভাগ এক দেশবাসী একই ধর্ম্মে এক সমাজভুক্ত একই মূল 'জাতি' বা রেসের (Raceএর) মধ্যে কর্ম্মবিভাগ অনুসারে বংশানুক্রমিক একটা সাম্প্রদায়িক পর্য্যায়ের বিভাগ। 'জন্ম' এই বিভাগের প্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়ানতেই 'জাতি'এই নাম দেওয়া হইল। নতুবা রেসীয় (racial) বলিতে মূল জাতিগত যে বিভাগ বুঝায়, ইহা যে তাহা নয়, একথা বলাই বাহুল্য। রেসীয় (racial) একরূপ বিভাগও হিন্দুসমাজের মধ্যে আছে, পরে তাহার কথা আলোচনা করিব। কিন্তু জন্মগত এই চাতুর্ব্বণ্য বিভাগ অথবা চাতুর্ব্বণ্য বিভাগের এই বংশানুক্রমিক ধারায় পরিণতি সেরূপ কোনও বিভাগ নহে।

এখন কথা হইতেছে জন্মের হিসাব একেবারেই বাদ দিয়া কেবল গুণের বিচারে এইরূপ কোনও কর্ম্মের বিভাগ সম্ভব কি না, এবং তাহাকেই মাত্র ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি বর্ণের নিদর্শন করা যাইতে পারে কি

দ্বৈপায়ন বেদব্যাস যখন মন্ত্রসংহিতার বিভাগ ও সঙ্কলন করেন,এই সূক্ত যে তাহার বহু পূর্ব্বের, এবিষয়ে কিছু আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। কারণ তখন ইহা প্রাচীন একটি বৈদিক মন্ত্ররূপেই বিদ্যমান ছিল। অন্যান্য গ্রন্থে পরবর্ত্তী যুগের রচনা যতই প্রক্ষিপ্ত হউক, বৈদিক মন্ত্র ও মন্ত্রসংহিতার বিশুদ্ধতা রক্ষা সম্বন্ধে প্রাচীন আচার্য্যগণ যারপরনাই অবহিত ছিলেন এবং পরম ধর্ম্ম বলিয়া তাহা মনে করিতেন। খুব কম করিয়াও যাঁহারা ধরেন, তাঁহারাও বলেন, মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন খৃষ্টপূর্ব্ব ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। যাহা হউক, এই সূক্তটি যখনই রচিত হউক,যে সত্য ইহার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সনাতন। এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, এই সত্যের দর্শন ঋষি পরে করিয়াছেন এবং এই সত্যের ধর্ম্ম সমাজবিন্যাসের আকারে ক্রমে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বেদের এই বিধি ধরিয়া বর্ণবিভাগ হয় নাই, আবার বর্ণবিভাগ হইবার পরে যে এইরূপ একটা শ্লোকে তাহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে অথবা তাহাকে ধর্ম্মবিহিত করা হইয়াছে, তাহাও নহে। এই বিশ্বজীবন একটা ক্রমাভিব্যক্তির ধারায় চলিতেছে। যাহা সত্য তাহাও ক্রমে অভিব্যক্ত হইয়াছে, এখনও হইতেছে, আরও হইবে।

না। সম্ভব যদি হইত, ভালই হইত। কিন্তু কি প্রকারে তাহা হইতে পারে? কেবল গুণেই ত হয় না, গুণানুরূপ শিক্ষা চাই, সাধনা চাই, অনুশীলনে কর্ম্মের অভ্যাস চাই,—এই শিক্ষার, সাধনার ও কর্ম্মানুশীলনের একটা ধারাও চাই। এই ধারার মধ্যে থাকিয়া এইরূপ শিক্ষা সাধনা ও কর্ম্মানুশীলনের অভ্যাসে গুণানুরূপ শক্তি ও চরিত্র গড়িয়া উঠিলেই যথাযোগ্য কর্ম্মের অধিকারী মানুষ হইতে পারে। এই কর্ম্মও কেবল তাহার ব্যক্তিগত জীবনের কর্ম্ম নহে, ব্যক্তিগত জীবনের মঙ্গলামঙ্গলই মাত্র ইহার উপরে নির্ভর করে না। গুরুদায়িত্ব পূর্ণ সামাজিক এক একটি কর্ম্মের ভাগ ইহা; সামাজিক মঙ্গলামঙ্গল ইহার উপরে নির্ভর করে; এবং ইহার জন্য ধর্ম্মের কাছেই প্রধানতঃ সকলে দায়ী, মানুষী কোনও শক্তির কাছে নহে।

কোথায় কাহার কিরূপ গুণ আছে, কি লক্ষণে কে তাহা বাছিয়া নিতে পারে? এইভাবে বাছিয়া নিয়া কে কাহাকে এইরূপ শিক্ষার ধারার মধ্যে টানিয়া আনিতে পারে? শিক্ষার ও সাধনার এক একটা ধারা হয়ত প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে। কিন্তু বৃহৎ এক একটি জনসংঘের মধ্যে কে কোন্ গুণে কিরূপ কর্ম্মের উপযোগী, তাহা বাছিয়া সেইরূপ শিক্ষা ও সাধনার পদ্ধতির মধ্যে তাহাকে রাখিয়া, সেই কর্ম্মের যোগ্য তাহাকে করিয়া তোলা ত এমন সহজ কথা নহে। আর হইতে পারে, বাছিয়া কেহ দিবে না; কে কিরূপ শিক্ষা লাভ করিয়া কোন বর্ণে স্থান গ্রহণ করিবে, নিজেরাই তাহা বাছিয়া নিবে। অবশ্য কোনও বালক ইহা নিতে পারে না। পারে তার পক্ষে তার অভিভাবক। কিন্তু স্বাভাবিক কি গুণের বিকাশে কিরূপ কর্ম্মের যোগ্যতা কে লাভ করিবে, বাল্যে তাহা সহজে ধরা যায় না। শিক্ষায় ও অনুশীলনেই ক্রমে মানুষের মধ্যে গুণের বৈশিষ্ট ফুটিয়া উঠে। যাহা হউক, ইহা বুঝা তখন যাক্ কি না যাক্, যথাযোগ্য গুণ থাক্ কি নাই থাক্, সকল অভিভাবকই চাহিবে, বালককে উচ্চতর

কর্ম্মের উপযোগী শিক্ষা দান করিতে। আধুনিক ইয়োরোপে কোনও বর্ণবিভাগ নাই, বর্ণানুযায়ী কর্ম্মবিভাগও নাই; সেরূপ কোনও শিক্ষার ব্যবস্থাও নাই। সকলেই যে কোনও প্রকার শিক্ষা লাভ করিয়া যে কোনও কর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে। এই রীতি অন্যান্য দেশেও গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ইহা হইল র‍্যাসনালিষ্ট সমাজের র‍্যাসনালিষ্ট নীতির অনুরূপ ব্যবস্থা, এবং ইহার ফলাফল সম্বন্ধে নূতন কিছু আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। *

বর্ণবিভাগ অনুসারে কর্ম্মবিভাগ যদি সমাজের নিয়ম হয়, তবে বংশানুক্রমিক ধারার মধ্যে এই বর্ণবিভাগ আসিয়া না পড়িলে, বিভিন্ন বর্ণের কর্ম্মোপযোগী শিক্ষার সুব্যবস্থাও হয় না, এবং প্রত্যেকটি কর্ম্মের ক্ষেত্রও সর্ব্বসাধারণের প্রতিযোগিতার ভূমি হইয়া দাঁড়ায়। ইহার ফলও যে কি হইতে পারে, দুর্ব্বল ও দরিদ্র যে অপেক্ষকৃত সবল ও ধনীর প্রতিযোগিতায় কিরূপ দুর্গতির অবস্থায় আসিয়া পড়ে, পূর্ব্বে র‍্যাসনালিজমের প্রসঙ্গে ইহার বহু আলোচনা হইয়াছে।

তারপর সকলের মূল হইতেছে যে গুণ, তাহা জন্মগত স্বভাবের গুণ। শিক্ষায় ইহা অর্জ্জিত হয় না। স্বভাবে থাকিলে শিক্ষার প্রভাবে বিকাশ লাভ করে, শক্তি তাহার বৃদ্ধি পায়। এবং সাধারণতঃ ইহাই বেশী দেখা যায়, যে বংশে যে জন্মে, স্বভাবের গুণ তাহার সাধারণতঃ তাহারই অনুরূপ হয়। †

---

* একটি কথা এখানে বলা আবশ্যক। শিক্ষা দুই রকমের হইতে পারে।—এক সাধারণ ভাবে বিদ্যার আলোচনা, যাহাতে মনঃশক্তির বিকাশ মানুষের হয়, আর একটি তাহার বিশিষ্ট বৃত্তির উপযোগী শিক্ষা। এস্থলে এই শেষোক্ত বিধ শিক্ষার কথাই বলা হইতেছে। প্রাচীন হিন্দুসমাজে সাধারণ ভাবে বেদাদি উচ্চতম বিদ্যার অনুশীলনে দ্বিজবর্ণত্রয় সকলেরই সমান অধিকার ছিল। কিন্তু বর্ণোচিত বিশেষ বিশেষ বিদ্যার অনুশীলন প্রত্যেক বর্ণ কুলোচিত নিয়মে করিত।

† কেবল দৈহিক রূপের নয়, মানসিক গুণের উপরেও যে বংশধারার বা heredityর বড় একটা প্রভাব আছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। পূর্ব্বে

তবে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ যে না হইত, তাহা নহে। যে কারণে ও যে ভাবে বিভিন্ন বর্ণ পৃথক্ এক একটি 'জাতিতে' পরিণত

ইয়োরোপে একটি দার্শনিক মত ছিল এই, যে মনে সব মানুষ সমান হইয়া জন্মে। স্বভাবতঃ সকলের মন যেন একখানি সাদা ফলকের মত, বিশিষ্ট কোনও গুণ কি সংস্কারের কোনও ছাপ তাহার উপরে থাকে না। যে অবস্থার মধ্যে যে জন্মে, যেরূপ শিক্ষা দীক্ষা তাহা হইতে পায়,তদনুসারে বিভিন্ন রকমের গুণের ছাপ ক্রমে তাহাতে পড়ে, এবং তাহার চরিত্র ও শক্তি সেই অনুসারে তাহা ধরিয়া গড়িয়া উঠে। বহু তথ্যের ও যুক্তির প্রমাণে ডারুইন (Darwin) প্রথমে দেখান,এই মত ভুল এবং মানুষে মানুষে গুণে ও শক্তিতে যে পার্থক্য, তাহা জন্মগত; জন্মের পর কেবল শিক্ষায় অর্জ্জিত নহে। এই যে সব গুণ ও শক্তি লইয়া মানুষ জন্মে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে ও জীবন সংগ্রামের কর্ম্মফলে কোথাও তাহা উপচীত হয়, কোথাও বা অপচীত হয়। উপচীত বা অপচীত এই সব গুণ ও শক্তি যার যার সন্তানে সংক্রামিত হয়। এবং এই ভাবে কোনও বংশ উন্নত হইয়া জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, কোনও বংশ হীন হইয়া ক্রমে বিলুপ্ত হয়। জীবজীবনের অভিব্যক্তি এই ভাবে এক একটি জীববংশ ধরিয়া চলিতে থাকে। মানুষের গুণ বা শক্তিকে তিনি এই ভাবে একেবারে তাহার বংশধারার বা heredityর সাপেক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মতে উন্নত গুণের অধিকারী মানব উন্নত বংশেই মাত্র জন্ম গ্রহণ করিতে পারে। সাধারণতঃ এইরূপ ঘটে বটে, কিন্তু ব্যতিক্রমও অনেক দেখা যায়। উন্নত বংশে হীন সন্তান এবং হীন বংশেও উন্নত সন্তান অনেক এই পৃথিবীতে জন্মিয়া থাকে। আবার এক এক বংশে অসাধারণ প্রতিভাবান্ 'অতিমানুষ' এক একজন জন্ম গ্রহণ করেন, যাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ কি অধঃপুরুষ কাহারও সেরূপ কোনও শক্তি দেখা যায় না। ইহার কোনও সদুত্তর ডারুইনের এই মতে পাওয়া যায় না। এই মাত্র তিনি বলেন, সন্তানের উৎপাদনকালে পিতা মাতার মানসিক অবস্থাগত সূক্ষ্ম কোনও কারণে এইরূপ হইয়া থাকে।

আধুনিক কালে জর্ম্মাণ Wiesman এবং ইংরেজ Bateman—প্রধানতঃ এই দুইজন পণ্ডিত বহু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষামূলক যুক্তির প্রমাণে দেখাইয়াছেন, পিতার দেহের গুণ সন্তানে বর্ত্তে; কিন্তু তাহার অর্জ্জিত কোনও গুণ (acquired qualities) সন্তানে সংক্রামিত হয় না। নূতন এই মতবাদ Neo-Darwinism

হয়, তাহা বিবাহের পক্ষে একটা অলঙ্ঘনীয় বাধা হইতে পারে না। পরস্পরের পক্বান্ন গ্রহণেও আপত্তির কোনও কথা থাকিতে পারে

নামে পরিচিত, এবং Bateman এই মতের প্রধান প্রবর্ত্তক। জন্মগত গুণবৈষম্যের মূল যে heredity বা বংশধারা, এই মত ইহার পর আর চলিতে পারে না। জন্মগত গুণবৈষম্য আছে, ইহা অবিসংবাদিত সত্য বা fact। কিন্তু বৈষম্য তবে কোথা হইতে আইসে? এদেশে কর্ম্মানুগত জন্মান্তরবাদে (Theory of Karma and Re-incarnationএ) ইহার একটি উত্তর পাওয়া যায়। জীব তাহার প্রাক্তন জন্মের কর্ম্মফল প্রসূত সংস্কার বা গুণ লইয়া জন্মে, কর্ম্মে আবার যাহা সঞ্চয় করে তাহা লইয়া যায়। তাহার ফলপ্রসূত সংস্কার বা গুণ লইয়া আবার জন্মগ্রহণ করে। জন্মের পর জন্মে এই ভাবে সে উন্নত হইতে থাকে। মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি এই মতে বংশগত নহে, জীবগত। প্রত্যেকটি জীবই জন্মের পর জন্মে, জীবনের পর জীবনে, নিজ কর্ম্মফলে অভিব্যক্তির ক্রমোন্নত স্তরে গিয়া উঠিতেছে। এই জীব যখন এক একবার জন্ম গ্রহণ করে, তাহার কর্ম্মফলের উপযোগী দেহ যেখানে পাইবে, ক্ষেত্র তাহার যেখানে মিলিবে, সাধারণতঃ সেইরূপ বংশের দিকেই সে আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ পিতার ঔরসে ও মাতার গর্ভে সে জন্মে, এবং সেইরূপ পরিবারের আশ্রয় লাভ করে। এক এক পরিবারের ও বংশের সন্তানসন্ততিগণের মধ্যে সমজাতীয় গুণ এই ভাবে এই কারণে দেখা যায়। ব্যতিক্রম যাহা দেখা যায়, তাহাও দুজ্ঞেয় কোনও কর্ম্মসূত্রের রহস্য হেতু।

পূর্ব্বেও দুই একস্থলে প্রসঙ্গক্রমে জন্মান্তর রহস্যের কথা অবতারণ করা হইয়াছে; (১৯১—৯৩ পৃষ্ঠা ও ৬২২—২৬পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। হিন্দুর ধর্ম্মজীবনের সঙ্গে কর্ম্ম ও জন্মান্তর বাদে শ্রদ্ধা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত। মূলে এক হইয়াও যে বৈষম্যকে হিন্দু তাহার সমষ্টি ও ব্যষ্টিজীবনের সকল কর্ম্মে সকল ধর্ম্মে স্বীকার করিয়া নিয়াছে, তাহার তত্ত্ব এই ভাবেই হিন্দু বুঝিয়াছে। এক একটি জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যেই হিন্দু তাহার জীবনকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে না, এক একটি জীবনের সুখ দুঃখকেই সে এমন বড় একটা কিছু বলিয়া মনে করে না। সুখ কি দুঃখ যাহাই ঘটুক, উন্নত কি হীনতর যেরূপই তাহার অবস্থা হউক, দৈবী বা মানুষী বাহিরের কোনও শক্তি হইতে তাহা আগত নহে; সব নিজেরই কর্ম্মপ্রসূত বলিয়া সে বিশ্বাস করে। তাই সুখে দৃপ্ত কি দুঃখে অবসন্ন বা বিদ্রোহী

না। তবে এরূপ বিবাহ বিশেষ বাঞ্ছনীয় বলিয়া কেহ মনে করিতেন না, এবং সদাসর্ব্বদাও ঘটিত না। শ্রেণীবিভাগ দূরের কথা, বংশানুক্রমিক একটা পদমর্য্যাদার রীতিও যেখানে আছে, সেখানেও এরূপ বিবাহ সচরাচর অনুমোদিত বড় হয় না। †

না হইয়া, সকল অবস্থাতে শান্ত সংযত ও সন্তুষ্ট সে থাকে। বিহিত ধর্ম্মপালনই জীবনের একমাত্র পথ বলিয়া সে জানে, এবং সেই পথের অনুবর্ত্তন করিতে শিক্ষা পায়। এই ভাবে জন্মের জন্মের জন্মে সে উন্নত হইবে, শেষে মোক্ষ লাভ করিবে, জীবজীবনে জীবধর্ম্মে ইহাই তাহার নিয়তি বলিয়া দৃঢ় একটা আস্থা তাহার আছে।

* আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রশ্চ গোপালো দাসনাপিতৌ।

এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ। [মনু—৪, ২৫৩]

অর্থাৎ, আর্দ্ধিক (অর্থাৎ অর্দ্ধাংশ উপস্বত্বের বিনিময়ে যে কাহারও কৃষিকর্ম্ম করে) পুরুষানুক্রমে বংশের মিত্র যে, বাড়ীতে যে গরু রাখে, যে দাস ও নাপিতের কাজ করে, এবং যে আত্মনিবেদন করিয়াছে, এই সব শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করা যায়।

নাশ্রাদ্ধস্য শূদ্রস্য পক্কানং বিদ্বানশ্রাদ্ধিনোদ্বিজঃ।

[মনু—৪,২২৩]

অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি পঞ্চযজ্ঞ বিহীন শূদ্রের পক্কান্ন গ্রহণ করিবেনা। ইহার অর্থ, শ্রাদ্ধাদি পঞ্চযজ্ঞপরায়ণ শূদ্রের পক্কান্ন গ্রহণ করা যাইতে পারে।

† ইয়োরোপীয় সমাজে ধনসম্পদের অধিকার এবং বংশের মর্য্যাদার হিসাবে সামাজিক পদের অনেক স্তর বা থাক্ আছে। উচ্চতর স্তরের কাহারও সঙ্গে নিম্নতর স্তরের কাহারও বৈবাহিক সম্বন্ধ বড় হয় না। সামাজিক রীতি অবজ্ঞা করিয়া এইরূপ সম্বন্ধ কেহ স্থাপন করিলে, আত্মীয় স্বজন সকলেই তাহাকে বর্জ্জন করে। পথে দেখা হইলেও মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়; কোনও সম্ভাষণ পর্য্যন্ত করে না। পূর্ব্বে অভিজাতবংশীয় কোনও পাত্র বা পাত্রী বুর্জ্জোয়স বংশীয় কোনও পাত্রী বা পাত্রের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধের কথা চিন্তাও করিতেন না। তবে বুর্জ্জোয়সরা যখন ধনসম্পদে অতি বড় হইয়া উঠিতে লাগিলেন, তখন হইতে দুই একটি করিয়া বিবাহ আরম্ভ হয়। অপেক্ষাকৃত কিছু শিথিল হইলেও এসব বাধা এখনও যথেষ্ট আছে।

উচ্চতর বর্ণের পুরুষের সঙ্গে নিম্নতম বর্ণের নারীর এবং নিম্নতর বর্ণের পুরুষের সঙ্গে উচ্চতর বর্ণের নারীর—এই দুই প্রকার বিবাহ অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। অনুলোম বিবাহে নিম্নতর বর্ণের কন্যাকে উচ্চতর বর্ণে তুলিয়া নেওয়া হয়, আর প্রতিলোম বিবাহে উচ্চতর বর্ণের কন্যাকে নিম্নতর বর্ণে নামাইয়া দেওয়া হয়। কুল-কন্যার এইরূপ অবনয়ন বাঞ্ছনীয় বলিয়া কেহ কোথাও মনে করিতে পারে না। তাই এইরূপ বিবাহ অতি নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হইত, এবং বেশী যাহাতে না হয় তার জন্য চেষ্টাও যথেষ্ট ছিল। শাস্ত্রীয় বিধিব্যবস্থা যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে অনুলোম বিবাহের সন্তান যে সবর্ণা পত্নীর গর্ভজাত সন্তানের সঙ্গে সমান মর্য্যাদায় পিতৃবংশে স্থান লাভ করিত, এরূপ মনে হয় না। তবে পিতৃ কুল ও মাতৃ কুলের মধ্যবর্ত্তী একটা স্থান ইহাদের হইত। কিন্তু প্রতিলোম বিবাহের সন্তানের স্থান হইত পিতৃবর্ণেরও নিম্নে। মাতা যত উচ্চবর্ণের এবং পিতা যত নিম্নবর্ণের, সন্তানের স্থান এইরূপ বিবাহে তত বেশী নিম্নে গিয়া পড়িত, যেমন শূদ্রের ব্রাহ্মণী স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান হইত, চণ্ডাল। *

---

* এই চণ্ডাল কে? শ্মশানের ডোম এবং বধ্যভূমির জল্লাদ—'চণ্ডাল' নামে ইহাদের কথা প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। ইহাদের এই সব বৃত্তিই চণ্ডালের বৃত্তি ছিল বলিয়া মনে হয়। উগ্রস্বভাব, বীভৎস আচার এবং এইরূপ হীনবৃত্তিই ছিল চণ্ডালের লক্ষণ। বাঙ্গলার জনবহুল নমঃশূদ্র জাতি সাধারণতঃ চাঁড়াল বা চণ্ডাল নামে পরিচিত। ইহারা কৃষিজীবী, স্বভাবে শান্ত, ব্যবহারে শিষ্ট। হীন ও বীভৎস আচারও কিছু ইহাদের মধ্যে দেখা যায় না। আর্য্য অধিকারের পূর্ব্বতন বাঙ্গলার প্রাচীন একটি জাতির বংশধর বলিয়া ইহাদের মনে হয়। শাস্ত্রোক্ত এবং প্রাচীন সাহিত্যে বর্ণিত চণ্ডালের লক্ষণ কিছুই ইহাদের মধ্যে দেখা যায় না। 'জল অনাচরণীয়' হইলেও বাঙ্গলার হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্য ইহারা নহে। চণ্ডালবৃত্তি একরূপ ছিল, এইরূপ বৃত্তিধারী চণ্ডাল কুলও ছিল। কিন্তু চণ্ডাল নামে এইরূপ বৃহৎ কোনও জাতির কথা কোথাও আছে বলিয়া জানি না। বাঙ্গলার এই নমঃশূদ্র জাতির এই চণ্ডাল আখ্যা কিসে তবে হইল?

যাহাহউক, জাতিরূপে পরিণত হইবার পর বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ এই ভাবে কতক পরিমাণে চলিলেও, বর্ণ হইতে বর্ণান্তরে উন্নয়ন কি অবনয়নের রীতি ক্রমে লোপ পাইয়া যাইবারই কথা। অবনয়ন যদিও কতক চলিতে পারে, উন্নয়ন অতি বিরল হইয়া পড়ে*। দৃষ্টান্তও প্রাচীন সমাজে অতি বিরল। বহু কঠোর সাধনার বলে

* লৌকিক ব্যবহারে বিরল হইলেও শাস্ত্রীয় মত ইহাকে সমর্থন যে করিত না, তাহা বলা যায় না। প্রমাণস্বরূপ কয়েকটি বচন নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥
(মহভারত, বনপর্ব্ব, ৩৩৩ অধ্যায়, ১০৮ শ্লোক)

অর্থাৎ জন্ম নহে, সংস্কার নহে, বিদ্যা নহে, বংশও নহে, ইহার কিছুই দ্বিজত্বের কারণ নহে, দ্বিজবৃত্তি অর্থাৎ দ্বিজোচিত চরিত্র ও কর্ম্মই দ্বিজত্বের কারণ।

স্বজাতিজানন্তরজাঃ ষট্‌সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রানাস্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥
তপোবীজপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ॥
(মনু—১০, ৪১—১৪২)

ব্রাহ্মণাদি দ্বিজত্রয়ের স্বজাতি পত্নীগর্ভজাত সন্তানত্রয়, অনুলোমক্রমে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়পত্নীর ও বৈশ্যপত্নীর গর্ভজাত সন্তানদ্বয় এবং ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা-গর্ভজাত সন্তান—এই ছয়জাতি দ্বিজধর্ম্মী। কিন্তু দ্বিজত্রয়ের প্রতিলোমজ সন্তান শূদ্রধর্ম্মী হইয়া থাকে। এই ষড়্‌বিধ জাতিরা যুগে যুগে তপস্যাপ্রভাবে ও বীজোৎকর্ষে মনুষ্যসমাজে যেমন জাত্যুৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে, তদ্‌বৈপরীত্যে তেমন জাত্যপকর্ষও তাহাদের ঘটে।

তারপর এই শূদ্রদের সম্বন্ধেও মনু অন্য একস্থলে আবার বলিয়াছেন,—

শুচিরুৎকৃষ্টশুশ্রূষুর্মৃদুবাগনহঙ্কৃতঃ।
ব্রাহ্মণ্যাদ্যাশ্রয়ো নিত্যমুৎকৃষ্টাং জাতিমশ্নুতে॥ (মনু—৯, ৩৩৫)

বাহ্যাভ্যন্তর শুচি, সেবাপরায়ণ, মিষ্টভাষী, নিরহঙ্কার ও ব্রাহ্মণাদির, নিত্য আশ্রিত শূদ্র উৎকৃষ্ট জাতি প্রাপ্ত হয়।

দুই একজন ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বর্ণে উন্নীত হইয়াছেন, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ন্যায় এইরূপ কাহিনীর দুই চারিটি দৃষ্টান্ত মাত্র আছে। উচ্চতর বর্ণের কেহ আচারভ্রষ্ট হইলে তাঁহাদের ব্রাত্য বলা হইত; কিন্তু ব্রাত্য মাত্রই শূদ্র বলিয়া গণ্য হইত।

আপদ্ধর্ম্ম।

বিভিন্ন বর্ণ এইরূপ জাতিতে পরিণত হইলে আর একটি সমস্যা উপস্থিত হয়। স্বাভাবিক গুণে ও উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষায় সন্তান পিতৃকুলের অনুরূপ হইয়া কুলোচিত কর্ম্মাদি সম্পাদনের যোগ্য হইবে, এরূপ প্রত্যাশা করা যায় বটে, সাধারণতঃ এইরূপ হইয়াও থাকে,—কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণোচিত শিক্ষা লাভ করিয়া ব্রাহ্মণোচিত চরিত্রের ও শক্তির অধিকারী হয় নাই, এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রাচীন কালেও ছিল। ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম অনেকে ইহারা গ্রহণ করিত না, নিযুক্তও হইত না। অথচ জাতিতে ইহারা ব্রাহ্মণই ছিল। বৃত্তি জাতিগত হইলে সকলে সেই বৃত্তির যোগ্য হয় না, আবার যোগ্য হইলেও সকলের পক্ষে জাতীয় বৃত্তি সুলভ হয়না। বৃত্তিতে যত লোক পালিত হইতে পারে, জাতির জনসংখ্যা তাহার অনেক বেশী বেশী হইলে ত কথাই নাই। অনেকস্থলে এইরূপ হইবারই সম্ভাবনা। যথাপ্রয়োজন ব্যবস্থাও এ সব স্থলে হইয়াছিল।

অনাপৎ কালে অর্থাৎ normal বা নিয়মিত অবস্থায়, বাধা কিছু না ঘটিলে, সকল বর্ণই যার যার বিহিত কর্ম্ম করিবেন,—কিন্তু আপৎকালে অর্থাৎ abnormal অবস্থায়, স্বকীয় বৃত্তিগ্রহণে বাধা কিছু ঘটিলে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের এবং বৈশ্য শূদ্রের বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারিবে, এইরূপ ব্যবস্থা হয়। এই সব ব্যবস্থাই 'আপদ্ধর্ম্ম' নামে পরিচিত। এইরূপ দৃষ্টান্তও বহু পাওয়া যায়। কিন্তু ক্ষাত্রবৃত্তিক ও বৈশ্যবৃত্তিক ব্রাহ্মণ, বৈশ্যবৃত্তিক ক্ষত্রিয় এবং শূদ্রবৃত্তিক বৈশ্য নিজ নিজ বর্ণোচিত বিশিষ্ট কোনও অধিকার

কি মর্য্যাদা ভোগ করিতে পাইতেন না। এইসব মর্য্যাদা ও অধিকারের মধ্যে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা ও অধিকারের গুরুত্বই প্রধান। যাজন অধ্যাপনা এবং বিধিব্যবস্থা নির্দ্দেশই ছিল ব্রাহ্মণের মুখ্য অধিকার, এবং ইহার জন্য দেবতার ন্যায় মর্য্যাদাও তাঁহারা সকলের কাছে পাইতেন। যজনে ও বেদাধ্যয়নে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরও অধিকার ছিল, কিন্তু যাজনে ও অধ্যাপনায় নহে * ; ব্যবস্থাপনায়ও নহে। কিন্তু যাজন ও অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া অন্যরূপ

* সাধারণতঃ বেদাধ্যাপনা সম্বন্ধেই এই বিধি ছিল, অন্য বিদ্যা সম্বন্ধে নহে।
যথা—শ্রদ্ধধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥
বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং বালাদপি সুভাষিতম্।
অমিত্রাদপি সদ্‌বৃত্তমমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্॥
স্ত্রিয়োরত্নান্যথো বিদ্যা ধর্ম্মঃ শৌচং সুভাষিতম।
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ॥
অব্রাহ্মণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে।
অনুব্রজ্যা চ শুশ্রূষা যাবদধ্যয়নং গুরোঃ॥
(মনু ২, ২৩৮—৪১)

অর্থাৎ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইতর লোকের নিকট হইতেও শ্রেয়স্করী বিদ্যা গ্রহণ করিবে। চাণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতিদের নিকট হইতেও পরম ধর্ম্ম লাভ করিবে। এবং স্ত্রীরত্ন দুষ্কুল হইতেও গ্রহণ করিবে।

বিষ হইতেও অমৃত উদ্ধার করিবে, বালকের নিকটও হিতবচন গ্রহণ করিবে, শত্রুরও সদনুষ্ঠান অনুকরণ করিবে, অপবিত্র স্থান হইতেও মূল্যবান্ কাঞ্চনাদি গ্রহণ করিবে।

স্ত্রী, রত্ন, বিদ্যা, ধর্ম্ম, শৌচ, হিতকথা এবং বিবিধ শিল্পবিদ্যা, সকলেই সকলের নিকট হইতে লাভ করিতে পারে।

ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী আপৎকালে অব্রাহ্মণের নিকটেও অধ্যয়ন করিতে পারেন এবং যাবৎকাল অধ্যয়ন করিবেন অনুগমনাদি দ্বারা গুরুর শুশ্রূষাও করিবেন।

শেষোক্ত এই শ্লোকে অধ্যয়ন বেদাধ্যয়ন বলিয়াই মনে হয়।

বৃত্তি যে সব ব্রাহ্মণ গ্রহণ করিতেন, এই মর্য্যাদা তাঁহারা পাইতেন না; ব্যবস্থাপনায়ও কোনও অধিকার তাঁহাদের থাকিত না। এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, যাজন ও অধ্যাপনা যাঁহারা করেন না, ব্রাহ্মণ-সন্তান হইলেও ব্রাহ্মণোচিত মর্য্যাদা তাঁহারা পান না,—বিধিব্যবস্থার জন্যও তাঁহাদের কাছে কেহ যায় না। বিধিব্যবস্থার 'পাতি' যখনই যাহা কিছু প্রচারিত হয়, সবই যাজক ও অধ্যাপক ব্রাহ্মণের নামে। সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে যাঁহারা বৃত হন, কি ব্রাহ্মণরূপে অর্চ্চিত হন, সকলেই তাঁহারা যাজক ও অধ্যাপক; এবং যাজক ও অধ্যাপকের সরল ও অনাড়ম্বর বেশেই তাঁহারা উপস্থিত হন। অনেক ধনী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতও আজকাল আছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সভায় ধুতি উড়ুনী ও চটীর উপরে 'বাবুয়ানা' আর কোনও সাজপোষাকে কেহ কখনও আসেন না।

৪। সঙ্কর বর্ণ—বর্ণান্তর জাতিবিভাগ

শাস্ত্রীয় সাক্ষ্য

গুণকর্ম্মবিভাগে মূল চারিটি বর্ণ হইতে চারিস্তরের প্রধান চারিটি জাতির কথা যে বলা হইল, তাহা ব্যতীত আরও বহু প্রকারে বিভক্ত বহুজাতি হিন্দু সমাজে দেখা যায়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুইটি বর্ণগত জাতির মধ্যে বহু সম্প্রদায় বিভাগ আছে; বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ বিরল; সকলের অন্নও সকলে এখন গ্রহণ করেন না। তবে এইসব সম্প্রদায় পৃথক্ পৃথক্ জাতি বলিয়া বিবেচিত হয় না। কিন্তু ইঁহাদের নিম্নে সাধারণতঃ বৈশ্য ও শূদ্র স্তরের মধ্যে অসংখ্য যে বিভাগ দেখা যায়, তাহা জাতিবিভাগই বটে। কেবল বৈশ্য ও কেবল শূদ্র নামে পরিচিত জাতিও কতক কতক ইহাদের মধ্যেও আছে। কিন্তু অধিকাংশই অন্য কোনও নামে পরিচিত। বিশেষ বিশেষ বৃত্তি হইতে, অধ্যুষিত বিশেষ বিশেষ ভূভাগ হইতে, অথবা অতি প্রাচীন কোনও 'রেস'-মূলক (racial) কুল

বা গোষ্ঠী হইতে এইসব জাতির নাম হইয়াছে। অনেকেরই সমান বৃত্তি কৃষি; বাকী সকলেরই অনুরূপ বিশেষ এক একটি বৃত্তি আছে;—এবং বিশিষ্ট এইসব বৃত্তিই এইসব জাতির বিশিষ্ট এক একটি লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অশৌচ পালন এবং অন্যান্য ধর্ম্ম্য ও সামাজিক ক্রিয়াদি কেহ বৈশ্যোচিত, কেহ বা শূদ্রোচিত বিধানে সম্পন্ন করিয়া থাকে। কচিৎ কেহ ব্রাহ্মণোচিত কি ক্ষত্রিয়োচিত আচারেও করে। এইসব অনুষ্ঠানাদি চারিটি বর্ণের অনুরূপ চারিপ্রকারের মাত্র বিহিত হইয়াছে,—সুতরাং ইহার কোনও না কোনও বিধান অনুসারেই সকলকে চলিতে হইবে। বর্ণবিভাগের নিয়মে মূলতঃ ইহারা কে কোন বর্ণের মধ্যে পড়ে, ইহা হইতেই তাহা বুঝা যায়।

এই বিভাগকে আমি 'বর্ণান্তর' অর্থাৎ চতুর্ব্বর্ণ ব্যতীত অন্যরূপ অথবা ইহাদের মধ্যবর্ত্তী 'জাতিবিভাগ' নামে এই পরিচ্ছেদের নামকরণে উল্লেখ করিয়াছি।

মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে চতুর্থ শ্লোকে আছে,—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণাদ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনবর্ণ দ্বিজ; চতুর্থ বর্ণ 'একজাতি' (অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কারে দ্বিতীয় জন্ম হয় নাই এমন) শূদ্র। ইহাব্যতীত পঞ্চম বর্ণ আর নাই।

তারপর অন্য যে সব জাতি সমাজের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহাদের সব সঙ্কর জাতি, অর্থাৎ মূলবর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহে উৎপন্ন মিশ্রজাতি বলিয়া সংহিতাকার উল্লেখ করিয়াছেন। কোন্ বর্ণের সঙ্গে কোন বর্ণের বিবাহে কোন্ কোন্ সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদের বৃত্তি কি, সমাজে স্থান কি, তাহারও অনেক বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

এইভাবে কতকগুলি জাতির নাম ও পরিচয় দিয়া, তারপর সংহিতাকার বলিতেছেন, এই সব জাতির পিতামাতার কথা বলা হইল। ইহাদের ব্যতীত প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশমান অন্য যে সব জাতি আছে, নিজ নিজ কর্ম্মেই তাহাদের পরিচয় হইবে।

যথা—সঙ্করে জাতয়স্ত্বেতা পিতৃমাতৃপ্রদর্শিতাঃ।
প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ॥
(মনু—১০, ৪০)

তারপর আর কয়েকটি শ্লোকে এইরূপ আছে,—

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা জবনাঃ শকাঃ।
পারদা পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতাঃ দরদাঃ খশাঃ॥
মুখাবাহূরূপাজ্জনাং যা লোকে জাতয়োঃ বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বেতে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥
(মনু—১০,৪৩—৪৫)

বর্ণাপেতমবিজ্ঞাতং নরং কলুষযোনিজম্।
আর্য্যরূপমিবানার্য্যং কর্ম্মভিঃ স্বৈঃ বিভাবয়েৎ॥
(মনু—১০,৫৭)

অর্থাৎ উপনয়নাদি ক্রিয়ালোপে এবং যজনাধ্যয়ন-প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্মের পথপ্রদর্শক ব্রাহ্মণের অভাবে নিম্নলিখিত দেশীয় ক্ষত্রিয়েরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে—যথা পৌণ্ড্রক, ওড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, জবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত এবং খশ। বিরাট্ পুরুষের মুখ বাহু উরু ও পদ হইতে প্রসূত (অর্থাৎ স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) যে সব জাতি (ক্রিয়াদি লোপে বা অন্য কারণে) বাহ্যজাতি বলিয়া পরিগণিত হয়, আর্য্যভাষী কি ম্লেচ্ছভাষী যাহাই হউক, তাহারা দস্যু বলিয়া পরিচিত।

চতুর্ব্বর্ণের বহির্ভূত, অবিজ্ঞাত, আর্য্যের ন্যায় প্রতীয়মান, কিন্তু অনার্য্য, কলুষযোনি (অর্থাৎ হীনকুলসম্ভূত) যে সব লোক আছে, কর্ম্ম দিয়াই তাহাদের জাতি নির্ণয় করিবে।

এখন দেখিতে হইবে, নূতন আর কি তথ্যের আভাস ঐ উক্তিগুলি হইতে আমরা পাই।

অবিদিত-কুল যে সব জাতিকে কর্ম্মের দ্বারা লক্ষিত করিতে হইবে, তাহারা সকলে সঙ্কর বা মিশ্র জাতি নাও হইতে পারে। উৎপত্তি নয়, কর্ম্মই এই সব জাতির প্রধান লক্ষণ বলিয়া সংহিতাকার উল্লেখ করিয়াছেন।—(৪০ ও ৫৭ শ্লোক।)

৪৪ শ্লোকে পৌণ্ড্রকাদি যে সব জাতির নাম আছে, স্পষ্টতঃ তাহাদের বিভিন্ন দেশীয় ক্ষত্রিয় বা শৌর্য্যবীর্য্যবান্ জাতি বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। কতক ইহারা প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলবাসী অনার্য্য জাতি, কতক বিদেশাগত জাতি। * আর্য্যভাষা

* পৌণ্ড্রক—প্রাচীন বাঙ্গলার অনার্য্যজাতি বিশেষ।

ওড্র—উড়িষ্যা দেশবাসী প্রাচীন অনার্য্যজাতি। ইহাদের নাম হইতেই দেশের নাম ওড্র বা উড়িষ্যা হইয়াছে।

দ্রাবিড়—দক্ষিণ ভারতের উন্নত অবস্থাপন্ন অনার্য্যজাতি।

জবন (বা যবন)—গ্রীক।

দরদ—কাশ্মীরের উত্তরদিকস্থ দেশবিশেষের (সম্ভবতঃ বর্ত্তমান দর্দ্দিস্থানের) অনার্য্যজাতি বিশেষ।

খশ—নেপালের পার্ব্বত্য জাতি বিশেষ। আধুনিক গুর্খারা অনেকে এই খশ জাতীয়।

কিরাত—দুর্দ্ধর্ষ বন্য জাতি বিশেষ।

পারদ ও পহ্লব—শকহূন প্রভৃতির ন্যায় মধ্যএসিয়ার পারস্য অঞ্চল হইতে আগত দুইটি জাতি।—ইংরেজিতে Parthians & Pahlavas নামে পরিচিত।

বৈদিক আচারবান্ আর্য্য ক্ষত্রিয় কখনও ইঁহারা ছিলেন না।—সুতরাং 'ব্রাত্য' ইঁহাদের বলা যায় না। স্পষ্টতঃ বহু এইরূপ "ব্রাত্য" ক্ষত্রিয় কেবল নহে, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য হইতে প্রসূত বহু জাতির কথাও মনুসংহিতা দশম অধ্যায়ে

কি ম্লেচ্ছভাষী যে সব বাহ্যজাতিকে দস্যু নামে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহাদের স্পষ্ট ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র না বলিয়া 'মুখবাহূরুপাদজ' এই বিশেষণে বিশিষ্ট করা হইয়াছে। ইহারা বাহ্য বা ভারতীয় আর্য্যসমাজের বহির্ভূত জাতি। কিন্তু ইহাদের মধ্যেও বিরাট্ পুরুষের চারিটি অঙ্গের অনুরূপ বা অঙ্গপ্রসূত চতুর্ব্বিধ স্বভাবের লোক ছিল। কেবল যথাবিহিত আচারনিয়মের অভাবে স্পষ্টতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র চারিটি বর্ণে তাহারা অভিব্যক্ত হয় নাই। (মানবসমাজে গুণকর্ম্মাদি বিভাগের সার্ব্বজনীন যে নৈসর্গিক রীতির কথা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি, তাহার একটা আভাসও ইহার মধ্যে পাওয়া যায়।)

মূল চারিটি বর্ণ হইতে চারিটি যে মূল জাতি হইয়াছিল, তাহা ব্যতীত বহু যে জাতি হিন্দুসমাজের মধ্যে দেখা দেয় এবং এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের উদ্ভব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি অনুমান (inference) আমরা এই সব উক্তির নির্দ্দেশ হইতে করিতে পারি।

(ক) কতক ইহারা মূল বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে অনুলোম বিবাহ হইতে উৎপন্ন, যাহারা পিতৃবর্ণেও অবিসংবাদিত স্থান পায় না, আবার একেবারে মাতৃবর্ণে নামিয়া যাওয়াও যাহাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয় হয় না।

আছে। বৃত্তি হইতে নহে, অধ্যুষিত দেশ হইতেই ইহাদের নাম হইয়াছে। সংহিতাকার একস্থলে বলিয়াছেন, ব্যভিচার, অবেদ্যাবেদন (এক বর্ণের মধ্যেও সগোত্রা ও সপিণ্ডা রূপ নিষিদ্ধ কন্যাকে বিবাহ), এবং স্বকর্ম্ম ত্যাগ ইত্যাদি কারণেও ব্রাহ্মণাদিবর্ণত্রয়ের মধ্যে বর্ণসঙ্কর ঘটিয়া থাকে।

ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥

(মনু—১০,২৪)

এই হিসাবে 'ব্রাত্য'কেও সঙ্কর বর্ণের অন্তর্ভুক্ত ধরা যায়। কিন্তু শক, যবন চীন, পারদ, পহ্লব, দ্রাবিড় প্রভৃতিকে ইহাদের পর্য্যায়েও ফেলা যায় না।

(খ) কতক বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রতিলোম বিবাহ হইতে উৎপন্ন। এইরূপ বিবাহের নিন্দনীয়তা হেতু কতকটা পতিতের ন্যায় নীচজাতীয় বলিয়া ইহারা গণ্য হইত।

(গ) কতক সংস্কার ত্যাগী ও আচার ভ্রষ্ট, অর্থাৎ ব্রাত্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। বিভিন্ন অঞ্চলে বাস এবং বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি গ্রহণ হেতু বহুবিধ জাতিতে ইহারা পরিণত হয়। কাহারও অধ্যুষিত দেশ হইতে, কাহারও বা গৃহীত বৃত্তি হইতে, বিশেষ বিশেষ নাম ইহাদের হইয়াছে।

(ঘ) কতক প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অনার্য্য জাতি। আর্য্য রাজ্য ও আর্য্যসভ্যতার বিস্তার যেমন হইয়াছে, এক একটি এইরূপ জাতি আর্য্যরাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাহারই বিশিষ্ট এক এক সম্প্রদায় প্রজা হইয়াছে, এবং ক্রমে আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্যসভ্যতার প্রভাবের মধ্যে আসিয়া বিশিষ্ট এক একটি হিন্দুজাতিতে পরিণত হইয়াছে। এরূপও হইতে পারে, অপেক্ষাকৃত উন্নত অনার্য্য কোনও কোনও স্বাধীন রাজা ও তাহার শাসিত জাতি আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্য আচারাদি গ্রহণ করিয়াছেন। গুণকর্ম্মানুসারে ক্রমে চতুর্ব্বর্ণের বিভাগও ইঁহাদের মধ্যে হইয়াছে। এইভাবে বিভিন্ন অঞ্চলবাসী পৃথক্ পৃথক্ শাখার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি কোনও কোনও জাতিরও উদ্ভব হইয়াছে।

(ঙ) কতক আর্য্য রাজ্য ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠার পর বিদেশাগত যোদ্ধৃজাতি সমূহের বংশধর। বহু এইরূপ জাতি পর পর ভারতে আসিয়াছে, রাজ্য প্রতিষ্ঠাও করিয়াছে। ক্রমে ভারতীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভারতীয় আচার নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া ভারতীয় এক একটি সম্প্রদায়ে বা মোট হিন্দু সমাজের পৃথক্ এক একটি জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

(চ) এক দেশবাসী, এক ধর্ম্মাবলম্বী ও এক সমাজভুক্ত বলিয়াই প্রাচীন মূল বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটিত। এক দেশবাসী,

সমধর্ম্মী এবং তুল্য গুণে সমবৃত্তিক আর্য্য ও অনার্য্যের মধ্যেও এইরূপ বৈবাহিক মিলন অবশ্য ঘটিত। সুতরাং কেবল বর্ণসঙ্কর নহে, একরূপ জাতিসঙ্করেরও উদ্ভব হইত। কোনও কোনও জাতি এই ভাবেও উৎপন্ন হয়।

(ছ) কতক বংশানুক্রমিক ধারায় বিভিন্ন প্রকার বৃত্তির অনুবর্ত্তন হেতু পৃথক্ এক একটি বৃত্তিগত জাতিতে পরিণত হইয়াছে। মিশ্র (বর্ণসঙ্কর), ব্রাত্য, অনার্য্য, আর্য্যানার্য্যমিশ্র (জাতি-সঙ্কর)—এইরূপ যে সব জাতির উদ্ভব হইয়াছে, বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম বা বৃত্তি তাহাদেরও অনেকের প্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়ায়। আবার, মূল বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের মধ্যেও বংশানুক্রমিক বৃত্তিবিভাগ হেতু পৃথক্ পৃথক্ বহু সম্প্রদায় হইতে পৃথক্ পৃথক্ জাতির আবির্ভাব হয়।

ঐতিহাসিক সাক্ষ্য

প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ যে সব ঐতিহাসিক তথ্যের উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার সঙ্গেও পূর্ব্বোক্ত অনুমান (inference) গুলির মিল পাওয়া যাইবে।

অতি প্রাচীনকালে (বিভিন্ন মতে খৃষ্টপূর্ব্ব তিনহাজার হইতে পাঁচ হাজার বৎসরের মধ্যে) আর্য্য নামে উন্নতস্বভাব এক মানব-জাতি ভারতে প্রবেশ করেন। পঞ্চশাখ সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী অঞ্চলে প্রথমে ইঁহারা বসতি ও রাজ্য স্থাপন করেন।

তারপর বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া ক্রমে উত্তরভারতের গঙ্গাযমুনার তীরবর্ত্তী প্রদেশে, সেখান হইতে পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রের পরপারে পার্ব্বত্য সীমান্ত পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে মহারাষ্ট্র ও দ্রাবিড় অঞ্চল ভরিয়া সিংহলদ্বীপ পর্য্যন্ত আর্য্যদের রাজ্য ও সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছে। এই বিস্তারে বহু অনার্য্য জাতির সঙ্গে তাহাদের অনেক সংঘর্ষও ঘটিয়াছে। অনার্য্যেরা কেহ বিনষ্ট হইয়াছে, কেহ পার্ব্বত্য বন্য অঞ্চলে আশ্রয় নিয়াছে, কেহ বা আর্য্য

রাজাদের অধীনতা স্বীকার করিয়া আর্য্য রাজ্যের মধ্যেই স্থান লাভ করিয়াছে; আর্য্য সভ্যতার প্রভাবের মধ্যেও আসিয়া পড়িয়াছে। কোথাও কেহ রাষ্ট্র সম্বন্ধে স্বতন্ত্র থাকিয়াও ধর্ম্মে চিন্তায় ও আচারে আর্য্যভাবাপন্ন হইয়াছে। অন্যদিকে আবার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শহেতু ধর্ম্মে চিন্তায় ও আচারে অনার্য্য প্রভাবও আর্য্যদের মধ্যে অনেক আসিয়াছে; শোণিত মিশ্রণও ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষ প্রায় মহাদেশের মতই অতি বিস্তীর্ণ একটি ভূভাগ; আবহাওয়ায় এবং প্রাকৃতিক অন্যান্য অবস্থায় অশেষ প্রকার বৈচিত্র ইহার বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায়। এই যে অনার্য্যদের কথা বলা হইল, একই প্রকৃতির একটি জাতি ইহারা ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চলে বহুবিধ স্তরের বহুবিধ প্রকৃতির অসংখ্য জাতি (races) বাস করিত। আর্য্য নয়, এই লক্ষণে মাত্র ইহাদের অনার্য্য বলা হয়,—নতুবা অন্যকোনও সমলক্ষণ ইহাদের মধ্যে বড় ছিল না। কোনও কোনও জাতির মধ্যে (যেমন দক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় জাতি) উন্নত সভ্যতারও বিকাশ হইয়াছিল। স্থাপত্যাদি বহু শিল্পবিদ্যায় আর্য্যদের অপেক্ষা ইঁহারা অনেক উন্নত বই হীনতর ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। *

* দাক্ষিণাত্যে বিখ্যাত সব প্রাচীন মন্দিরে আশ্চর্য্য যে স্থাপত্যশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়, সম্ভবতঃ তাহা দ্রাবিড় জাতিরই বিদ্যা। আর্য্যাবর্ত্তে কোথাও এইরূপ নিদর্শন বড় পাওয়া যায় না। অতি প্রাচীনকালে আর্য্য-অভিযানের পূর্ব্বে এই অঞ্চলে যে উন্নত জাতির বাস ছিল, রামায়ণে আরণ্য সুন্দরা ও কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ডেও ইহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। যমুনা পার হইয়া রামচন্দ্র দক্ষিণাভিমুখে গিয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন। এই দীর্ঘপথে স্থানে স্থানে রাক্ষস-উপদ্রুত মুনির আশ্রম ব্যতীত বড় কোনও রাজ্য কি নগরের কোনও উল্লেখও পাওয়া যায় না। দণ্ডকারণ্যের দক্ষিণে লঙ্কেশ্বর রাবণের শাসনাধীন জনস্থান নামক বৃহৎ এক অঞ্চল ছিল। অকাল বৈধব্যের পর যথাসুখে ইচ্ছামত বিচরণ করিবেন বলিয়া শূর্পণখাকে রাবণ এইখানে স্থাপিত করেন,—এবং

আবার অতি বর্ব্বর ও বন্য—একেবারে নিম্নতম ও আদিম স্তরেরও—বহুজাতি ছিল। এই দুই চরমের মধ্যবর্ত্তী আরও অনেক স্তরের—দেহের আকৃতিতে, মনের প্রকৃতিতে এবং আচারব্যবহারের নীতিতে কেহ অতি হীন, কেহ অপেক্ষাকৃত উন্নত—আরও যে বহু জাতি ছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। শতাব্দীর পর শতাব্দীতে, যুগের পর যুগে, বিভিন্ন অঞ্চলের বহু এমন জাতি আর্য্যধর্ম্মের ও আর্য্যসমাজের সংস্পর্শে আসিয়াছে, কর্ম্মসূত্রে নানারূপ সম্বন্ধও পরস্পরের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। অবস্থা অনুসারে আর্য্যসভ্যতার প্রভাবও যাহারা যতটা পারে গ্রহণ করিয়াছে। ইতিমধ্যে বর্ণবিভাগ ও বর্ণগত একটা জাতিবিভাগও আর্য্যদের মধ্যে স্পষ্টতঃ অভিব্যক্ত হইয়া উঠে;

বৃহৎ এক দল সুশিক্ষিত রাক্ষসসেনা তাঁহার রক্ষার্থে নিযুক্ত হয়। এই জনস্থান কেবল একটা বিজন বনভূমি ছিল না,—রাবণের শাসিত বৃহৎ একটি জনপদই ছিল। ইহার দক্ষিণে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য। অনার্য্য বলিয়া কবি ইহাকে বানরের দেশ নাম দিলেও, এই 'বানরেরা' যে সভ্যতায় অতি উন্নত একস্তরেরই একটি মানব-জাতি ছিলেন, রামায়ণের বর্ণনাই তাহার সাক্ষ্য। ইঁহারাই সেতু বাঁধিয়াছেন। ইঁহাদেরই নিপুণ সেনাপতিদের পরিচালিত সুশিক্ষিত ও সুব্যূঢ় সেনাদের সাহায্যে লঙ্কা জয় করিয়া রামচন্দ্র সীতার উদ্ধার করিয়াছেন।

তারপর লঙ্কার কথা। ইহা যে অতি সমৃদ্ধ ও উন্নত একটি রাজ্য ছিল, লঙ্কার রাক্ষস নামক জাতি যে বহু শক্তিতে ও বহু বিদ্যায় অতি উন্নত একজাতি ছিলেন, এবং দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ইঁহাদের ছিল, সব অতি স্পষ্ট ভাবেই রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে। রাবণমহিষী মন্দোদরী ময় নামক দানবের কন্যা। আর্য্যাবর্ত্তের রাজারা উত্তম কোনও সভাগৃহাদি নির্ম্মাণের প্রয়োজনে ময়দানব নামক কোনও শিল্পীকে ডাকিতেন। হইতে পারে, এই ময় নামে শিল্পবিদ্যায় অতি উন্নত কোনও অনার্য্য জাতি ছিল। মন্দোদরী তাহাদেরই কোনও রাজার বা প্রধান ব্যক্তির কন্যা।

বেদে ও পুরাণ ইতিহাসে দস্যু দৈত্য দানব রাক্ষস নামে বহু জাতির সঙ্গে আর্য্যদের যে সব যুদ্ধের বিবরণ আছে, তাহা হইতে মনে হয়, আর্য্যাবর্ত্তেও অনেক উন্নত ও শক্তিশালী অনার্য্য জাতির বাস ছিল।

অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ সঙ্করবর্ণও সম্ভবতঃ কতক কতক দেখা দেয়। প্রত্যেকটি সঙ্করবর্ণও বিশেষ এক একটি বৃত্তি অবলম্বন করে। আবার বহুবিধ পণ্যের বাণিজ্য, পশুপালন, কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন ও কারুকার্য্যাদি নানারূপ ব্যবসায়ের বংশানুক্রমিক ধারায় বৈশ্য ও শূদ্রেরাও বহু সম্প্রদায়ে বা শাখাজাতিতে বিভক্ত হইতে থাকে। *

অনার্য্য যে সব জাতি আর্য্যসমাজের সংস্পর্শে আসে, তাহারাও যে যেমন যোগ্য, অথবা যাহাদের মধ্যে যে বৃত্তি প্রধান উপজীবিকা ছিল, সেইরূপ এক একটা বৃত্তিতে স্থিত স্বতন্ত্র এক একটি সম্প্রদায় হইয়া দাঁড়ায়, এবং এইসব কর্ম্মের সূত্রে এক এক অঞ্চলবাসী আর্য্য ও অনার্য্য সকলের মধ্যে একটা সামাজিক সম্বন্ধও স্থাপিত হয়। সমাবস্থাপন্ন ও সমব্যবসায়িক যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে শোণিতমিশ্রণও ঘটিত। আবার আকৃতিতে, প্রকৃতিতে, আচারব্যবহারে ও ব্যবসায়িক কর্ম্মে অতি বিষম যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা যতদূর সম্ভব সামাজিক সম্বন্ধে এই বৈষম্য রক্ষা করিয়া চলিতেন।

উন্নত অনেক অনার্য্য জাতি নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে কেহ ক্ষাত্র বৃত্তি, কেহ বা যাজক বৃত্তিও গ্রহণ করিতেন। আর্য্য ক্ষত্রিয় ও আর্য্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কোথাও কোথাও ইঁহাদের বৈবাহিক ও সমসামাজিক মিলন ঘটিয়াছে, কোথাও ঘটে নাই। পৃথক্ পৃথক ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ শাখা জাতি ইঁহারা হইয়াছেন।

* রত্নবণিক, গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, সমুদ্রবণিক, মুদি, মোদক, স্বর্ণকার, কর্ম্মকার কুম্ভকার, তৈলিক, সূত্রধার, তন্তুবায়, সুধাকর (রাজমিস্ত্রী), ভাস্কর, স্থপতি, খনক, চিত্রকর, রজক, ক্ষৌরকার প্রভৃতি জাতির উদ্ভব এই ভাবেই হইয়াছে। ব্যবসায়িক কর্ম্মবিভাগের স্বাভাবিক একটা পরিণতিই ইহা। ব্যবসায়িক শৃঙ্খলা (Economic arrangement) প্রাচীন অনেক সমাজেই এই ভাবেই স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বতন ইয়োরোপের সব গিল্ড (guildও) এই ভাবে হয়।

এই ভাবে আর্য্য ও অনার্য্য বহু স্তরের বহুবিধ ধর্ম্মানুবর্ত্তী জাতি ও শাখা জাতি লইয়া বিচিত্র এক জনসমাজ ভারতে গড়িয়া উঠিতেছিল, উঠিয়াছিল বলা যাইতেও পারে।

ইহার উপর আবার বিভিন্নযুগে বিদেশ হইতে যবন শক হূন পারদ পহ্নব চীন প্রভৃতি বহুজাতি ভারতে আসেন এবং নানাস্থানে রাজ্য ও বসতি স্থাপন করেন। ইঁহারাও ভারতীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, ভারতীয় সভ্যতার প্রভাবে আসিয়া পড়েন; এবং ঐ একই নিয়মে নিজ নিজ অবস্থার অনুরূপ স্তরে ভারতীয় সমাজের মধ্যে স্থান ইঁহাদের হয়। প্রধান ব্যক্তিদের বংশধরগণ প্রায়ই বিশেষ বিশেষ ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় হন *। অনুচরগণ কেহ বৈশ্য, কেহ শূদ্র জাতির বিশেষ বিশেষ শাখা হন। ভারতীয় প্রাচীন ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রদের সঙ্গে মিশ্রণ কোথাও হয়, কোথাও হয় না। বিদেশাগত জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণের শাখাও কেহ কেহ যে না হন, তাহা বলা যায় না। †

* রাজপুত ক্ষত্রিয় জাতির অনেক গোষ্ঠীই (বিশেষতঃ অগ্নিকুল নামে যাহারা পরিচিত) এই সব বিদেশী যোদ্ধৃজাতির বংশধর বলিয়া ঐতিহাসিকরা মনে করেন। প্রাচীন ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে অনেক মিশ্রণ পরে ইঁহাদের হইয়াছে। কিন্তু খৃষ্টীয় ৮ম ও ৯ম শতাব্দী হইতে উত্তরপশ্চিম ভারতে রাজপুত নামে নবীন যে ক্ষাত্র-জাতির প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে, তাঁহারা অনেকেই যে মূলতঃ বিদেশী এই সব জাতি হইতে সম্ভূত, বহু প্রমাণে ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ ইহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

† শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ নামে বিশিষ্ট এক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ আছেন। শাম্বপুরাণে ২৬ অধ্যায়ে ইঁহাদের আবির্ভাব সম্বন্ধে এইরূপ একটি কাহিনী আছে। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব পিতার অভিশাপে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হন এবং সূর্য্যের উপাসনা করিয়া আরোগ্য লাভ করেন। শাকদ্বীপে (বর্ত্তমান কাশ্মীরের উত্তর দিকে কোনও দেশবিদেশে) 'মগ' নামক সুপণ্ডিত ও তেজস্বী এক সম্প্রদায় সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। পিতার আদেশে শাম্ব শাকদ্বীপে গিয়া ইঁহাদের অনেককে আনিয়া পঞ্চনদ প্রদেশে চন্দ্রভাগা নদীর তীরে মিত্রবন নামক প্রাচীন এক তীর্থে স্থাপিত করেন, এবং

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধদেব ও মহাবীর জিনের আবির্ভাব হয়। বৈদিক ধর্ম্ম ছিল জাতিগত কৌলিক পদ্ধতির ধর্ম্ম (Racial system of religion)। ভারতীয় আর্য্যদের মধ্যে ইহার আবির্ভাব হয় এবং কল্পোক্ত * বিধিব্যবস্থা অনুসারে ইঁহারাই কুলপরম্পরাক্রমে এই ধর্ম্ম মতে চলিতেন। কৌলিক নিয়মে কুলাচার্য্যের নিকটে উপনয়ন সংস্কারের পর দ্বিজজাতিত্রয় ইহার মন্ত্রশাস্ত্র ও তত্ত্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, এবং কল্পোক্ত বিধানে অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন করিতেন। বাহিরে ইহার প্রচার হইত না, শিষ্যসংগ্রহও হইত না। সর্ব্বত্র অবাধ প্রচার ও নূতন নূতন শিষ্য গ্রহণ—যাহাকে Proselytism বলা হয়, তাহার কোনও ভাবই ইহার মধ্যে ছিল না। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম ছিল, এইরূপ প্রচারমূলক ধর্ম্ম (Proselyting religion)। আচার্য্যগণ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র ধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেন এবং সকলকেই তাহাতে দীক্ষিত করিতেন। বিদেশী এই সব

আরোগ্যদাতা ভাস্করের পূজাহোমাদির ভার ইঁহাদের উপরে অর্পণ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। পঞ্চনদ হইতে ক্রমে এই শাকদ্বীপীয় মগ ব্রহ্মণগণ ভারতের নানা স্থানে বসতি বিস্তার করিয়াছেন। রাজপুত জাতির পুরোহিত ইঁহারাই ছিলেন ; মগধেও ইহাদের এক শাখা আসিয়া বাস করেন। বাঙ্গলার সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ এবং গ্রহবিপ্রগণের অনেকেই শাকদ্বীপীয় শ্রেণীভুক্ত। বিষ্ণু পুরাণেও একস্থলে মগ নামক এই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণদের উল্লেখ আছে। ইঁহাদের আদি নিবাস শাকদ্বীপের অবস্থান, 'মগ' এই নাম এবং সূর্য্যোপাসক বলিয়া খ্যাতি, এই সব হইতে এইরূপ মনে করা যাইতে পারে, যে ইঁহারাই প্রাচীন পার্শিক বা ইরাণী জাতির যাজক, ইতিহাসে ম্যাগি (Magus—বহুবচনে Magi) নামে যাঁহারা পরিচিত। পার্শিজাতি প্রধানতঃ সূর্য্যোপাসক ছিলেন এবং অগ্নিতে হোম ইহাদের প্রধান অনুষ্ঠান ছিল। পাণিনি, আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, চাণক্য প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন।

* বৈদিক ক্রিয়াদির নিয়ম এবং সামাজিক বিধিব্যবস্থাদি সূত্রাকারে গ্রন্থবিশেষে সংগৃহীত হয়। ইহাই কল্প-সূত্র নামে পরিচিত। প্রাচীন স্মৃতি ইহারই অঙ্গীয়। ষড়্‌বিধ বেদাঙ্গের মধ্যে কল্পসূত্র অন্যতম।

জাতির পক্ষে ভারতীয় ধর্ম্মগ্রহণে ভারতীয় সমাজে স্থানগ্রহণের সুযোগ এই দুই ধর্ম্মের প্রভাবেই ঘটে। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্য্যবংশীয় রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের আবির্ভাব হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মই ভারতের প্রধান ধর্ম্ম তখন হইয়া উঠে, এবং নানাদেশে তাহার প্রচারও হয়। এই সময় হইতে সাত আট শত বৎসর যাবৎ বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ভারতে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে, অত প্রবল না হইলেও, জৈন ধর্ম্মের পৃথক একটি ধারাও চলিতে থাকে। বিদেশী এই সব জাতি অধিকাংশই এই সময়ে ভারতে আসেন, এবং প্রথমে তাঁহারা বৌদ্ধ কি জৈন ধর্ম্মেই দীক্ষিত হন।

উত্তর পশ্চিম ভারতের শকরাজ কনিষ্ক অতি শক্তিশালী একজন বৌদ্ধ রাজা ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি ও প্রচারকল্পে বিশেষ সহায়তা ইনি করেন। এই সব নূতন জাতিব আগমনে এবং নূতন এই দুই ধর্ম্ম মতের আবির্ভাবে প্রাচান ধর্ম্মের ও প্রাচীন সমাজেব মধ্যে বড় একটা উলটপালট হইয়া যায়। এই উলটপালটকে স্বীকার করিয়া নিয়া, এই সব জাতিকে সমাজের মধ্যে যথাযোগ্যস্থানে গ্রহণ করিয়া, প্রাচীন বর্ণাশ্রমমূলক সমাজপদ্ধতি আবার নূতন হইয়া গড়িয়া উঠে।

প্রাচীন ধর্ম্মও নূতন এই সব অবস্থার সঙ্গে আপনাকে মানাইয়া নূতন এক আকারে ক্রমে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। তত্বাঙ্গে প্রাচীন সেই ধর্ম্মের সংজ্ঞাই ইহা স্থির ছিল,—কেবল নূতন নূতন ব্যাখা বিশ্লেষণে (interpretationএ) কালোপযোগী অবস্থার সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য স্থাপনা করা হয়। আর সাধনাঙ্গে ও অনুষ্ঠানাঙ্গে এই দুই ধর্ম্ম-হইতে এবং নবাগত এই সব জাতির প্রাচীন আচার হইতে বহু নূতন নূতন নিয়ম ও রীতিপদ্ধতি সংস্কৃত পবিভাষায় ও আকারে আপনাব অঙ্গভুক্ত কবিয়া নেওয়া হয়। নূতন অবস্থায় নূতন ধর্ম্মেব উপযোগী করিয়া প্রাচীন বহু পুরাণের, এমন কি রামায়ণ ও মহাভারতেরও, নূতন সংস্করণে বর্ত্তমান আকার এই সময়ে দেওয়া হয়। তন্ত্রের প্রচারও এই

সময়ে আরম্ভ হয়। বৌদ্ধ ও জৈন বিপ্লবের পর প্রাচীন ধর্ম্মের নূতন এই মূর্তির স্বরূপ এই সব পুরাণে ও তন্ত্রেই প্রধানতঃ প্রকাশিত হয়। নূতন অনেক স্মৃতিও এই সময়ে রচিত হয়। নূতন এই সমাজের নীতিপদ্ধতির বহু তথ্য তার মধ্যে পাওয়া যাইবে।

বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে ভারতীয় অনার্য্য জাতিসমূহের মধ্যে আর্য্য-সমাজের বিস্তার হইতেছিল। বহু অনার্য্য জাতি আসিয়া আর্য্য জাতির সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধে যুক্ত হইতেছিল। প্রাচীন আর্য্য সমাজের প্রকৃতিও এই সব অনার্য্য জাতির যোগে অনেকটা জটিল হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু এই গতির বেগ যখন থামিল, জটিল এই স্বরূপেই সমাজ স্থিত হইয়া দাঁড়াইল। ইহার পর বিদেশী বহু জাতি আবার যখন পর পর প্রবল কতকগুলি স্রোতের মত এই সমাজের উপরে আসিয়া পড়িল, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের দুইটি প্লাবন তখন ভারতীয় সমাজের স্থিতির দৃঢ়তাকে অনেকটা শিথিল ও দ্রব করিয়া ফেলিয়াছিল। বাহিরের এই স্রোতগুলি অল্প আয়াসেই তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল,—কঠিন কোনও সামাজিক সংঘর্ষ ঘটিল না। ভিতরের ও বাহিরের এই সব স্রোতের বেগ যখন মন্দীভূত হইয়া আসিল, প্রাচীন ধর্ম্ম আবার নূতন বলে নূতন হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং মন্দীভূত নূতন এই ধর্ম্মীয় ও জাতীয় স্রোত গুলিকে আপনার অঙ্গীভূত করিয়া নিল। জটিলতর সমাজ ক্রমে এই ধর্ম্মে আবার একটা স্থিতির দৃঢ়তা লাভ করিতে লাগিল।

তখন আবার মুশলমান অভিযান আরম্ভ হইল। রাজ্য ও বসতি স্থাপনই কেবল নহে, ভারতে ইস্‌লাম ধর্ম্মের ও ইস্‌লাম সমাজের প্রতিষ্ঠাও ইঁহাদের বড় একটি লক্ষ্য ছিল। কেবল দেশকে নয়, দেশের ধর্ম্মকে ও সমাজকেও জয় করিয়া নিবেন, এইরূপ অভিপ্রায় তাঁহাদের ছিল। পূর্ব্বতন সব জাতি যেমন ভারতে আসিয়া ভারতীয় ধর্ম্মকে মানিয়া নিয়া ভারতীয় সমাজের মধ্যেই স্থান গ্রহণ করিয়াছে, মুশলমানদের সম্বন্ধে সেরূপ সম্ভাবনা কিছুই ছিল না। বরং

ইঁহাদের দুরন্ত এই বিজিগীষার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষাই এখন কঠিন সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিল।

ব্রাহ্মণ্য-শক্তি ধর্ম্মের নিয়ামক, সমাজের ব্যবস্থাপক, পরন্তু শিক্ষকও বটেন। কিন্তু এই ধর্ম্মের স্থাপনা এবং ব্যবস্থামত সমাজের রক্ষণ ও শাসনাদির জন্য ক্ষাত্র রাজন্য শক্তির উপরেই প্রধানতঃ ব্রাহ্মণগণ নির্ভর করিয়াছেন। অন্ততঃ বৃহৎ কোনও আপৎ কালে ক্ষাত্র রাজন্য-শক্তির সহায়তা ব্যতীত গত্যন্তরই কিছু ছিল না। এখন অবস্থা একেবারে অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইল। দেশের রাজ-শক্তি ধর্ম্মরক্ষার ও সমাজরক্ষার সহায় না হইয়া তাহার প্রবল শত্রু হইয়া দাঁড়াইল *। স্থানে স্থানে প্রাচীন ভারতীয় রাজশক্তির অবশেষ যাহা ছিল, তাহার বল অতি প্রবল এই রাজশক্তির সম্মুখে অকিঞ্চিৎকর মাত্র। তখন স্বধর্ম্মানুগত যে সব আচার নিয়মে, যেরূপ কর্ম্মপদ্ধতিতে, যে জাতি স্থিত হইয়া আসিতেছিল, তাহাই ধরিয়া, নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে অতি শক্ত হইয়া দাঁড়ান ব্যতীত স্বধর্ম্মে আত্মবৈশিষ্ট রক্ষার আর কোন উপায়ই রহিল না। ধর্ম্মে ও সকল কর্ম্মে আচারনিয়মের বন্ধন অতি কঠোর হইয়া উঠিল। বিভিন্ন জাতির মধ্যে গণ্ডীর সীমারেখাও যত দূর সম্ভব দুর্লঙ্ঘ্য হইয়া দাঁড়াইল। মিশ্রণে বা অন্য কোন ভাবে নূতন নূতন জাতির উদ্ভবের অবসর অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িল। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বৈবাহিক আদানপ্রদান ও আহারব্যবহারের যোগ অতি বিরল হইতে লাগিল। জাতিতে জাতিতে এই সব ব্যাপারে কঠোর যে আচারনিয়মের বন্ধন আমরা এখন দেখি, মুশলমান আমলে আত্মরক্ষার জন্য তাহার প্রয়োজন হইয়াছিল। একক

* বৌদ্ধ বিপ্লবের যুগে বৌদ্ধ রাজগণ অনেকে বৈদিক ধর্ম্মের বিপক্ষতা করিতেন বটে, কিন্তু প্রাচীন সমাজস্থিতিকে মানিয়া চলিতেন। নূতন বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্বও প্রাচীন ধর্ম্মের তত্ত্বের এমন বিরোধী কিছু ছিল না। জীবননীতির আদর্শেও উভয় ধর্ম্মে একটা সমতার ভাব ছিল।

ব্রহ্মণ্য শক্তি নূতন নূতন স্মৃতির বিধানে এই ভাবে, কঠোর এইরূপ সব নিয়মে, দুর্ভেদ্য এক একটি গণ্ডীর মধ্যে তখন এই জাতিগুলিকে যদি বাঁধিয়া না ফেলিতেন, সমাজনায়কগণও যদি এই সব বিধানকে শক্ত করিয়া না ধরিতেন, সেই গণ্ডীর মধ্যে সমাজকে রাখিতে যত্নবান্ না হইতেন, প্রচণ্ড সেই মোস্‌লেম অভিযানের প্লাবনে হিন্দুর ধর্ম্ম, সমাজ ও সভ্যতা কোথায় ভাসিয়া যাইত।

নূতন এই সব স্মার্ত্ত ও লোকাচারের বন্ধন কোথাও কোথাও হয়ত অতি কঠিনই হইয়াছিল। বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবং তান্ত্রিক শৈব ও শাক্ত ধর্ম্ম ইহাকে কতক শিথিল করিতেও চাহিয়াছিল,—কিন্তু ভাঙ্গিতে পারে নাই। *

সুদীর্ঘ বহু সহস্র বৎসরে ক্রমে কি ভাবে অসংখ্য জাতির উদ্ভব ভারতীয় সমাজে হইয়াছে, এবং ক্রমে কি ভাবে যে বিভিন্ন এইসব জাতি দুর্লঙ্ঘ্য এক একটা গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, যথাসাধ্য তাহার একটা বিবরণ দিবার চেষ্টা করিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চাতুর্ব্বর্ণ্য এই বিভাগের মধ্যে লোপ পায় নাই, অথবা চাতুর্ব্বর্ণ্যই পৃথক্‌-রূপ একটা জটিলতর জাতিবিভাগে পরিণত হয় নাই। চাতুর্ব্বর্ণ্য রহিয়াছে, এবং তাহার মধ্যেই অন্যান্য কারণে জটিল এই জাতিবিভাগ দেখা দিয়াছে।

অসংখ্য এইসব জাতি চাতুর্ব্বর্ণ্যের কোনও না কোনও স্তরে অবস্থিত। ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি কেহ ব্রাহ্মণোচিত, কেহ ক্ষত্রিয়োচিত, কেহ বৈশ্যোচিত, কেহ বা শূদ্রোচিত, আচারে সম্পাদন করেন। জাতিগত বৃত্তিও মূলতঃ কাহারও ব্রাহ্মণোচিত, কাহারও ক্ষত্রিয়োচিত, কাহারও বৈশ্যোচিত, কাহারও শূদ্রোচিত।—আপদ্ধর্ম্মে বা অন্য কারণে বৃত্তিসঙ্কর বা বৃত্তিবিপর্য্যয় অনেক ঘটিয়াছে। কিন্তু জাতীয় বৃত্তি বলিতে যাহা বুঝায়, মূলতঃ তাহা মোটের উপর চতুর্ব্বর্ণেরই চারিটি প্রকৃতির বৃত্তি।

---

* পরবর্ত্তী অন্ত্যজ জাতি এবং শূদ্রের অধিকার শীর্ষক ৬ষ্ঠ ও ৮ম প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৫। জাতিবিভাগের বিভিন্ন দিক্ (aspect)।

চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে অসংখ্য এই যে জাতিবিভাগ (caste) দেখা দিয়াছে, প্রধানতঃ দুইটি দিক্ হইতে ইহার বিচার আমাদিগকে করিতে হইবে, একটি 'রেসীয়' (racial) অর্থাৎ শোণিতগত জাতি-বৈষম্যের দিক্, আর একটি ইকনমিক (Economic) অর্থাৎ ব্যবসায়িক বৃত্তি সম্বন্ধীয় কর্ম্মশৃঙ্খলার দিক্।

'রেসীয়' জাতিবিভাগ

দৈহিক্ ও মানসিক প্রকৃতিতে এবং আচার ব্যবহারের রীতিতে অতি বিষম, পরন্তু অভিব্যক্তির বহুবিধ স্তরে অবস্থিত বহুবিধ 'রেস্' (race) বা 'জাতি' যে এই পৃথিবীবাসী মানবের মধ্যে রহিয়াছে, সকলেই জানেন এবং পূর্ব্বেও ইহার আলোচনা করা হইয়াছে। বহু এইরূপ বিষম জাতি একদেশের অধিবাসী হইলে কঠিন একটা সামাজিক সমস্যাও উপস্থিত হয়। কর্ম্মসূত্রে বহুপ্রকার সম্বন্ধে পরস্পরের সঙ্গে আসিতে হয়, অথচ অতি বিষম সব জাতি সমান সামাজিক সম্বন্ধে মিলিয়া এক হইয়া সহজে যাইতে পারে না, যাওয়া বাঞ্ছনীয়ও নহে। শোণিতমিশ্রণ নানা ভাবে ঘটে; সঙ্কর জাতি বা 'রেস'ও উৎপন্ন হয়। কিন্তু উচ্চতর ও নিম্নতর, অথবা সমান স্তরেও অন্যভাবে অতি বিষম, যাহাদের মিশ্রণে ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে, আপন বলিয়া তাহাদের কাহারও মধ্যে ইহাদের স্থান বড় হয় না। পৃথক্ এক একটা জাতি হইয়া ইহারা দাঁড়ায়। অধুনা আফ্রিকায় ও আমেরিকায় আফ্রিক-ইয়োরোপীয়, আমেরিক-ইয়োরোপীয় বহু এইরূপ সঙ্কর জাতির উদ্ভব হইয়াছে। আদিম আফ্রিক কি আদিম আমেরিক সম্প্রদায়ে ইঁহারা মিলিয়া যাইতে চান না; সুবিধাও হয় না। শ্বেতাঙ্গ ইয়োরোপীয় সম্প্রদায়ও ইঁহাদের আপন সমাজে গ্রহণ করেন না। আবার ভারতীয়, চীনা, জাপ প্রভৃতি এসিয়া খণ্ডের নানা জাতীয় লোকেরা গিয়াও আফ্রিকায় ও আমেরিকায় বাস

করিতেছে। অনেকে ইঁহারা উন্নতজাতীয় এবং আপনাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিতে চান। শ্বেতাঙ্গেরাও ইঁহাদের সঙ্গে মিলিয়া এক হইয়া যাইতে চাহেন না। আদিম আফ্রিক, আদিম আমেরিক, ইউরো-আফ্রিক, ইউরো-আমেরিক ইহারা ত আছেই; তার উপরে আবার এইসব জাতির লোকেরা বহু সংখ্যায় যদি দেশের স্থায়ী অধিবাসী হইয়া পড়ে, ভবিষ্যতে অতি কঠিন রকম রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সব সমস্যা উপস্থিত হইতে পারে। শ্বেতাঙ্গ, শক্তিশালী ও আদর্শ সভ্যতার অধিকারী উচ্চতম স্তরের মানব বলিয়া ইয়োরোপীয়েরাও অতি গর্ব্বিত, এবং অপর কোনও জাতির সঙ্গে শোণিত সংস্রবে আপনাদের হীনতা পাছে কিছুতে হয়, এ বিষয়েও অতি সতর্ক। সাধারণ সামাজিক ব্যবহারেও অপর কোনও জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে ইহারা মিলিতে মিশিতে একেবারেই চান না। এই জাতীয় স্বাতন্ত্র্য—racial exclulsiveness—ইয়োরোপীয় চরিত্রের অতি প্রধান একটি বৈশিষ্ট। এদিকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মনীতি বলিতেছে, মানুষ সব সমান ও ভাই ভাই। এসিয়েরা না হউক, আদিম আফ্রিক ও আমেরিকরাও সব খৃষ্টান হইয়াছে। জাতীয় বৈশিষ্টকে বজায় রাখিতে হইলে ধর্ম্মনীতিকে মানা যায় না। আবার ধর্ম্ম-নীতিকে মানিতে হইলে জাতীয় বৈশিষ্টকে বজায় রাখিতে পারা যায় না। ওদিকে আবার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যতীত সমাজজীবনের অন্য কোনওরূপ ধারকশক্তি যে সম্ভব হইতে পারে, একথা মনেও ইঁহারা করেন না। ভাবেন, এক দেশের স্থায়ী অধিবাসী হইয়া প্রজার সমান অধিকার পাইলে সংখ্যাধিক্যে ইহারাই সমাজের কর্ত্তা হইবে,—ইউরোপীয়েরা তাঁহাদের জাতীয় প্রভুত্ব দূরে থাক, সামাজিক স্বাতন্ত্র্যও রক্ষা করিতে পারিবেন না। অথচ একেবারে ইহাদের এড়াইবার উপায় নাই। আদিম কি মিশ্র আফ্রিক আমেরিকরা ত আছেই,—এসিয়াবাসীরাও যাইতেছে। বহু কর্ম্মের সহায়তার জন্য ইহাদের প্রয়োজন হয়। ইহারাও যদি স্থায়ী অধিবাসী হইয়া বসে, আর 'অশ্বেত' জনবলকে বিশেষ পুষ্ট করিয়া

তোলে, ভবিষ্যতে বড় বিপদের কথা হইতে পারে। তাই ষ্টেট্ সব শ্বেতাঙ্গ-শাসিত থাকে, অশ্বেত জাতিরা শ্বেতাঙ্গের সমান রাষ্ট্রীয় কি সামাজিক অধিকার কিছু না ভোগ করিতে পায়, বরং শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্বের চাপেই নত হইয়া থাকে, এইরূপ সব ব্যবস্থা যে দিকে যত করা যাইতে পারে, তাহা তাঁহারা করিতেছেন। এদিকে অশ্বেত জাতিরাই বা নীরবে ইহা সহিবে কেন? কেবল কুলিমুজুরের কাজে শ্বেতাঙ্গদের সম্পদ ও শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দিয়া চিরকাল নিজেরা এমন ছোট হইয়া থাকিবে কেন? তাহারাও এখন সমান প্রজার অধিকার দাবী করিতেছে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গরা তাহা দিতে পারেন না, দিলে ষ্টেটে তাঁহাদের আর রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠা কিছু থাকে না,—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের জাতীয় (racial) বৈশিষ্টের মহিমা, সামাজিক (social) পদগৌরব সব ক্রমে লোপ পায়। হয় উপর হইতে ইহাদের চাপিয়া রাখিতে হইবে, নতুবা ইহাদের চাপে নীচে পড়িতে হইবে; ইহা ভিন্ন গত্যন্তর আর কিছু নাই। ইহাতে অতি কঠিন যে একটা সঙ্কটসমস্যা এই সব দেশে উপস্থিত হইয়াছে, সহজ কোনও সমাধানের পথ তাহার দেখা যাইতেছে না। ভয়ঙ্কর একটা বিরোধই শ্বেত ও অশ্বেত জাতিসমূহের মধ্যে প্রকট হইয়া উঠিতেছে।

আর্য্যজাতির সঙ্গে বহু স্তরের বহুবিধ অনার্য্য জাতির সমাবেশে এইরূপ একটা অবস্থা ভারতেও হইয়াছিল। কেবল বিষম নহেন, দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষে আর্য্যজাতি যে বিজিত অনার্য্য জাতিদের তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠ ও উন্নত এক স্তরের জাতি ছিলেন, সকলেই ইহা স্বীকার করেন। বৈদিক যে ধর্ম্ম ও সভ্যতা ইঁহাদের মধ্যে বিকাশ লাভ করে, তাহাও যে অতি শ্রেষ্ঠ এক ধর্ম্ম ও সভ্যতা, জগতে যে এই ধর্ম্ম ও এই সভ্যতা অতি বরেণ্য একস্থান অধিকার করিয়া আছে, ইহাও সত্য। আপনাদের এই শ্রেষ্ঠত্বের, সমুন্নত এই অবস্থার, গৌরব আর্য্যেরা অবশ্য অনুভব করিতেন। এক দেশের অধিবাসী ও পরস্পর প্রতিবেশী রূপে কর্ম্মসূত্রে

অপরিহার্য্য একটা যোগ স্থাপিত হইতেছিল বটে,—কিন্তু অনার্য্য জাতিদের সঙ্গে শোণিতমিশ্রণে ও ঘনিষ্ঠ সামাজিক সংসর্গে স্বাভাবিক একটা বিমুখতাও আর্য্যদের ছিল। আপনাদের গৌরব এইভাবে কিছু ক্ষুণ্ণ না হয়, অবনত নিজেরা না হইয়া পড়েন, এবিষয়েও তাঁহারা যথেষ্ট সতর্ক ও সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু এক দেশের অধিবাসী মানবগণকে সমষ্টিজীবনে ডিমক্রাটিক এক ষ্টেটের নিয়ন্তৃত্বে আসিতেই হইবে, এরূপ কোনও সামাজিক মতবাদ তাঁহাদের মধ্যে ছিল না। সামাজিক ধর্ম্মনীতি গুণকর্ম্মবিভাগে বর্ণবিভাগের রীতিকেই মানিয়া নিয়াছিল, এবং সমাজবিন্যাসও সেই রীতিতে হইতেছিল। বিভিন্ন বর্ণ বংশানুক্রমিক ধারায় এক একটি জাতিতেও পরিণত হইতেছিল; নিম্নতর বর্ণদ্বয়ের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার কর্ম্মবিভাগে আবার বহু শাখাজাতিরও সৃষ্টি হইতেছিল। অনার্য্য যাঁহারা আর্য্য রাজ্যের অধিবাসী হইতেন, তাঁহারাও এই পদ্ধতির নিয়মে তাঁহাদের গুণকর্ম্মানুসারে পৃথক্ এক একটি জাতিরূপে এই সমাজে স্থান গ্রহণ করিতেন। অধিকাংশের স্থানই যে এ অবস্থায় শূদ্রবর্ণের স্তরে হইবে, একথা বলাই বাহুল্য। তবে পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি, অপেক্ষাকৃত উন্নত যাঁহারা তাঁহারা বৈশ্যের ও ক্ষত্রিয়ের স্তরে কেবল নহে, ব্রাহ্মণের স্তরেও স্থান পাইয়াছেন। কিন্তু জাতীয় বৈষম্য হেতু সেই সেই বর্ণের মধ্যে বিশিষ্ট এক একটি সম্প্রদায় তাঁহাদের হইতে হইয়াছে। সকলে আর্য্য রাজাদের অধীন আর্য্য রাজ্যের অধিবাসীও হন নাই; আর্য্য ধর্ম্ম ও আর্য্য সভ্যতার প্রভাবেই এই পদ্ধতির মধ্যে আসিয়াছেন। প্রাকৃতিক অবস্থার বহু বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ ও বহু রাজ্যে বিভক্ত এত বড় বৃহৎ দেশে বহুবিধ জাতির (রেসের) সমাবেশ, যার যার জাতীয় বৈশিষ্ট বজায় রাখিয়াও পরস্পরের মধ্যে কর্ম্মের একটা যোগস্থাপনা, এই ভাবেই হইতে পারে। বৈষম্যের মধ্যেও বিরোধ না করিয়া মিত্রভাবে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা এই অবস্থায়ই সম্ভব। বিরোধ যাহা হইয়াছে, রাজায় রাজায়, রাজ্যে

রাজ্যে; অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে প্রজার বিদ্রোহও মধ্যে মধ্যে ঘটিয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন জাতির (বা casteএর) মধ্যে সামাজিক বিরোধ ভারতের ইতিহাসে কখনও তেমন কিছু ঘটে নাই।

বৃত্তিগত জাতিবিভাগ

তারপর ইকনমিক economic বা ব্যবসায়িক বৃত্তিগত কর্ম্মশৃঙ্খলার দিক্ হইতে এই জাতি বিভাগের বিচারের কথা। পূর্ব্বে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া নামক ৯ম প্রবন্ধে ব্যবসায়িক ব্যবহারে 'ষ্টেটাস' হইতে কণ্ট্রাক্টের দিকে আধুনিক ইয়োরোপীয় সমাজের পরিণতির কথা আলোচনা করা হইয়াছে। ব্যবসায়িক ব্যবহারে এই ষ্টেটাসের রীতি ভারতীয় জাতিবিভাগে এমন উচ্চ এক পরিণতি লাভ করিয়াছিল,যেমন নাকি পূর্ব্বতন ইয়োরোপের গিল্ডপদ্ধতিতে (guild systemএ) বা অন্য কোনও দেশের ব্যবসায়িক সম্প্রদায় বিভাগে করিতে পারে নাই। প্রত্যেক জাতি একটি একটি বৃত্তিতে স্থিত হইয়াছিল; বৃত্তির সংরক্ষণের এবং বৃত্তিতে 'জাতি ভাই' সকলের সংরক্ষণের দায়িত্ব সেই জাতীয় সমাজের উপরে ন্যস্ত হইয়াছিল। কেবল তাই নয়, সামাজিক এই সব দায়িত্বপালনে যার যার সমাজের রক্ষা একেবারে সেই সেই জাতির ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

স্বাধীন গৃহস্থজীবনের সুখস্বচ্ছন্দতায় বঞ্চিত ব্যারাকবাসী দাসবৎ মুজুরের দল,—কোনও বৃত্তি নাই, বৃত্তিতে স্থিত হইবার কোনও পথও নাই, এমন অবস্থাপন্ন অংসখ্য দুঃখী বেকারের দল,—তারপর বৃত্তিহীন গৃহহীন পাপপূর্ণ দুর্গতির পঙ্কে নিমজ্জিত সেই যে Social Residunm বা Slum-population—এরূপ কোনও সম্প্রদায় মারাত্মক ব্যাধির ন্যায় সমাজদেহে এ অবস্থায় দেখা দিতে পারে না। পূর্ব্বে ৮ম ও ৯ম প্রবন্ধে যে সব আলোচনা হইয়াছে, তার উপরে এ সম্বন্ধে আর কোনও আলোচনা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। আধুনিক ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজমের তুলনায় বৃত্তিগত এই জাতিবিভাগ সমাজের পক্ষে

যে অনেক বেশী সুখের ও মঙ্গলের অবস্থা, সকলেই ইহা উপলব্ধি করিবেন। জাতীয় বৃত্তিতে না চলিলে, বৃত্যন্তর গ্রহণও আপদ্ধর্ম্মে বিহিত হইয়াছিল। যেই যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করুক, জন্মগত ষ্টেটাস বা পদ-অনুসারে যেরূপ বৃত্তিই যাহার পক্ষে বিহিত হউক, উচ্চতর কোনও শক্তির অধিকার থাকিলে সেই ষ্টেটাসের উপরে উচ্চতর কোনও বৃত্তি গ্রহণে একেবারে বাধা কাহারও ছিল না। প্রাচীন ইতিহাসে ও সাহিত্যে বহু এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

তত্ত্বজ্ঞানে ঋষিতুল্য ও রাজর্ষি নামে পরিচিত বহু ক্ষত্রিয় রাজার ত কথাই নাই, শূদ্রকুলজাত হইয়াও ধনী বণিক, ভূস্বামী, রাজামাত্য ও রাজা পর্য্যন্ত হইয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্তও প্রাচীন ইতিহাসে ও কাব্য-সাহিত্যে অনেক আছে।

যোগ্যতার বলে যোগ্যের যোগ্য স্থান পাইতে অলঙ্ঘনীয় বাধা যদি না থাকে, তবে কণ্ট্রাক্ট অপেক্ষা এই ষ্টেটাসের রীতিতে বৃত্তি-বিভাগ ব্যবস্থিত হইলে, ব্যষ্টি কি সমষ্টি উভয় দিক হইতেই মানব অধিকতর মঙ্গলের ভাগী হয়।

জাতিবিভাগের মোট তিনটি দিক্

পূর্ব্ববর্ত্তী ২য়, ৩য় ও ৪র্থ এবং এই ৫ম পরিচ্ছেদে হিন্দুসমাজের মধ্যে জাতিবিভাগের যে তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হইল, তাহা হইতে মোটের উপর প্রধান তিনটি ভাব বা লক্ষণ (aspect) আমরা ইহার মধ্যে দেখিতে পাইব, যথা—(১) সামাজিক (social), জাতীয় (racial) এবং ব্যবসায়িক (economic)। প্রথম সামাজিক ভাবে বা লক্ষণে (in social aspect) চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্মে গুণানুসারে সামাজিক কর্ম্ম-বিভাগ হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে চতুর্ব্বিধ সামাজিক শক্তির মধ্যে একটা সামঞ্জস্যও স্থাপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় জাতীয় ভাবে বা লক্ষণে (in racial aspect) মিশিয়া একাকার হইয়া যাইতে পারে না, যাওয়া বাঞ্ছনীয় নহে, এমন বহু স্তরের বহু বিষম জাতি নিজ নিজ

বৈশিষ্ট বজায় রাখিয়াও কর্ম্মসূত্রে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা-মূলক সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপনা করিতে পারিয়াছে। তৃতীয় ব্যবসায়িক ভাবে (in economic aspect) এমন একটা পদ্ধতির স্থাপনা হইয়াছে যাহাতে বৃত্তিগত কোনও সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতা সমাজে প্রকাশ পায় নাই, এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও দুর্ব্বল—হীনতম ও দীনতম ব্যক্তি পর্য্যন্ত—সকলেই স্বাধীন গৃহস্থ রূপে কোনও না কোনও বৃত্তিতে জীবিকা আহরণের অবসর পাইত।

[ধর্ম্ম ও চাতুর্ব্বর্ণ্য শীর্ষক ২য় পরিচ্ছেদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য]

৬। অন্ত্যজ জাতি

ভারতের পাহাড় জঙ্গল অঞ্চলে অতি তামসপ্রকৃতির বহু এমন বন্য জাতি এখনও আছে, যাহারা আর্য্য সভ্যতার কোনওরূপ সংস্পর্শে কখনও আসিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অথবা আসিয়া থাকিলেও ইহার প্রভাব কিছুই গ্রহণ করিতে পারে নাই। বহু এইরূপ জাতি জগতের সর্ব্বত্রই আছে। কত উন্নত ও সভ্য জাতির অভ্যুদয় ও পতন দেশে দেশে হইয়াছে, কিন্তু ইহারা আদিম সেই তামস বর্ব্বরতার সীমা অতিক্রম করিয়া সভ্যতার কোনও স্তরে উঠিতে পারে নাই। পূর্ব্বে ৩য় প্রবন্ধে অভিব্যক্তির বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকৃতির (typeএর) জাতিসমূহ সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইহাদের কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। এমন কোনও সংস্কারের অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই, যাহাতে উন্নত কোনও ভাব, চিন্তা ও চরিত্রগুণ সহজে ইহাদের মধ্যে সহজে বিকাশ করিতে পারে। অভিব্যক্তির ধারায় পশুত্বের স্তর ছাড়িয়া কেবল যেন মানবত্বের স্তরে ইহারা উঠিয়াছে,—উন্নত মানবধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে, এরূপ কোনও প্রাক্তন সাধনার ফল ইহাদের স্বভাবে নাই। মূল কারণ যাহাই হউক, ব্যষ্টিভাবে কেবল এইরূপ মানব নহে, সমষ্টি ভাবে এইরূপ অনেক মানব-জাতিও যে এ পৃথিবীতে আছে, এই সত্যকে আমরা অস্বীকার করিতে

পারি না। এক একটি জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যেই মাত্র জীবের জীবনকে সীমাবদ্ধ বলিয়া যাঁহারা মনে করেন না, জন্মান্তরবাদ মানেন, এবং বিশ্বাস করেন, যে জন্মের পর জন্মে ক্রমে উন্নত হইতে উন্নততর স্তরে জীবের অভিব্যক্তি হয়,—তাঁহারা বলেন, সমষ্টিভাবে এইরূপ সব জাতি চিরকাল এ পৃথিবীতে আছে, চিরকালই হয়ত থাকিবে,—কিন্তু ব্যষ্টিভাবে এই সব জাতির অন্তর্ভুক্ত কোনও জীব চিরকাল এমন তামস স্তরে থাকিবে না,—জন্মের পরে জন্মে ক্রমে উন্নত হইতে উন্নততর স্তরে উঠিবে, জীবত্বের পূর্ণাভিব্যক্তি লাভ করিবে *। কোনও কর্ম্মসূত্রে যথাকালে নূতন কোনও শক্তির সঞ্চারে উন্নততর জীবের আবির্ভাবে এইরূপ কোনও জাতিই যে উচ্চতর কোনও স্তরে কখনও উঠিতে পারিবে না, একথাও ইঁহারা বলেন না। এইরূপ শুভযোগ যদি ঘটে, উন্নতি তখন হইবে,—নতুবা হইবে না; হইতে পারে না। সজীব ও স্ফুটনোন্মুখ বীজ যদি থাকে, ক্ষেত্র উর্ব্বর ও আবহাওয়া অনুকুল যদি হয়, তবেই তাহা অঙ্কুরিত হইয়া সুফল বৃক্ষে পরিণত হয়, নতুবা হয় না।

কারণ যাহাই হউক, ভাবী উন্নতির সম্ভাবনা যাহার যেরূপই থাক, এই সব কথা সকলে শ্রদ্ধায় সকলে গ্রহণ করুন কি নাই করুন, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্যষ্টিভাবে এইরূপ নিম্নস্তরের পৃথক্ পৃথক্ মানব কেবল নহে, সমষ্টিভাবেও এইরূপ জাতি বা race'ও যে এই পৃথিবীতে অনেক আছে, এই সত্যকে কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কেহ অপেক্ষাকৃত শান্ত নিরীহ ও ভীরু, কেহ বা অতি প্রচণ্ড ও ক্রুর, এইরূপ নানা প্রকৃতি ইহাদের মধ্যে দেখা যায়। আদিম ধরণের কৃষক ও পশুপালক কেহ কেহ ইহাদের মধ্যে আছে,—কিন্তু অনেকেই নানারূপ হীন ঘৃণ্য ও বীভৎস বৃত্তিতে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। আহারে, আবাসে, বেশভূষায় এবং সাধারণ আচারব্যবহারেও ইহারা

* ১৯১ ও ৬২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অতি হীন ও বন্য ভাবের মানুষ, শৌচ ও পরিমার্জ্জনার লেশ মাত্র কিছুতে নাই, তাহার জন্য কোনওরূপ ব্যাকুলতাও ইহাদের বড় দেখা যায় না।

বিশ্বস্ততা, সত্যপরায়ণতা, স্বজনপ্রীতি, আশ্রিতবাৎসল্য প্রভৃতি মানবস্বভাবের সহজ কোনও কোনও গুণ ইহাদের অনেকের মধ্যে দেখা যায় বটে,—কিন্তু মনঃশক্তিতে ও আচারে কোনও উৎকর্ষের কি পরিমার্জ্জনার লক্ষণ কোথাও বড় দেখা যাইবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতের পাহাড় জঙ্গল অঞ্চলে একেবারে আদিম ও প্রাকৃত অবস্থায় বহু এইরূপ অনার্য্য জাতি এখনও বর্ত্তমান আছে, যাহারা আর্য্য রাজশাসনের অধীনতা কখনও স্বীকার করে নাই, আর্য্য সমাজের সংস্পর্শেও বড় আইসে নাই। কেহ কেহ নিকটবর্ত্তী রাজাকে কর দিত, যুদ্ধে সৈন্য যোগাইত, মৃগয়াদি প্রমোদে আনুচর্য্য করিত। কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে একেবারে স্বতন্ত্র ভাবে থাকিত, এবং রাজারাও রাষ্ট্রীয় কি সামাজিক কোনও অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ ইহাদের সঙ্গে স্থাপিত করিতে চান নাই। এই ছিল এক রকম অবস্থা; সাধারণ আর্য্য সমাজের সঙ্গে ইহাদের সংস্রবই কিছু ছিল না বলিলে হয়।

কিন্তু অনেক এইরূপ নিম্নস্তরের অনার্য্য জাতি আর্য্য রাজ্যের মধ্যেই আর্য্য রাজগণের শাসনাধীন অবস্থায় আসিয়া পড়ে। একেবারে স্বাতন্ত্র্য এ অবস্থায় সম্ভব না হইলেও, সংস্রব ইহাদের সঙ্গে যত কম হয় সেই ভাবেই ইহাদের সংস্থান রাজ্যের মধ্যে হইয়াছিল। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমরা দেখিয়াছি, অপেক্ষাকৃত উন্নত বহু অনার্য্য জাতি আর্য্যসভ্যতা গ্রহণ করিয়া আর্য্য-সমাজের মধ্যে আসিয়া পড়ে, এবং গুণকর্ম্মানুসারে চতুর্ব্বর্ণ্যের মধ্যে যথাযোগ্য স্থানও ইহাদের হয়। অধিকাংশ শূদ্র স্তরের অন্তর্ভুক্ত হইলেও, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় স্তরে, এমন কি ব্রাহ্মণ স্তরেও, কাহারও কাহারও স্থান হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের স্থান হয় চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের বাহিরে, এবং বাসস্থানও হয়, চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের অধ্যুষিত গ্রামের বাহিরে পৃথক্ সব পল্লীতে।

কর্ম্মসূত্রে ও সামাজিক সম্বন্ধে চারিটি বর্ণের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ একটা যোগ আছে, এবং অতি ঘনিষ্ঠ সংস্রবেও সর্ব্বদা পরস্পরের সঙ্গে আসিতে হয়। দ্বিজবর্ণ ত্রয়ের ত কথাই নাই, শূদ্রকেও এমন একটা সদাচারের আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে,—আহারে, আবাসে, বেশভুষায় ও সাধারণ ব্যবহারে এমন একটা শিষ্ট পরিমার্জ্জনার ভাব আনিতে হইবে, যাহাতে এইরূপ যোগ ও সংস্রব সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ সদাচারের আদর্শ যাহারা গ্রহণ করিতে পারিবে না, তাহার অনুবর্ত্তনে একটা পরিমার্জ্জনার ভাব যাহাদের মধ্যে সহজে ফুটিয়া উঠিতে পারিবে না, তাহাদের সঙ্গে এরূপ যোগ ও সংস্রব সম্ভব হয় না। তাই চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের বাহিরের একস্তরে ইহাদের স্থান হয়। সামাজিক ভাবে চাতুর্ব্বর্ণ্যের বাহিরে বা অন্ত্যে ইহাদের স্থান, এবং বসতিও চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের অধ্যুষিত গ্রামের অন্ত্যে বা বাহিরে,—এবং এই ভাবেই অন্ত্য এই অবস্থায় ও স্থানেই কৌলিক এক একটি জাতি হইয়া ইহারা রহিয়াছিল। তাই অন্ত্যজ এই নাম ইহাদের হইয়াছে। *

* বিরাট্ পুরুষের অন্ত্য অঙ্গ পদ হইতে জাত, এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া কেহ কেহ বলেন, ইহা শূদ্রেরই একটি প্রতিশব্দ। অবশ্য সকলেই বিরাট্ পুরুষের অঙ্গীয় বা অঙ্গ প্রসূত এবং পদও দেহের একেবারে অন্ত্য অঙ্গ। সুতরাং ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-ত্রয়ের নিম্নে যত স্তরের মানব কোনও সমাজে থাকিতে পারে, সকলকেই এই হিসাবে অন্ত্যজ বলা যাইতে পারে। তবে অন্ত্যজ নামে যে সব জাতির কথা আছে, এখনও এই নামে যে সব জাতি দেখা যায়, এবং তাহাদের বৃত্তির ও আচারাদির যে পরিচয় পাওয়া যায়, এখনও যেরূপ আছে,—তাহাতে সাধারণ শূদ্রদের হইতে তাহারা যে পৃথক্, এবং বাহিরের এক স্তর, ইহা নিঃসন্দেহ। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের ত কথাই নাই, চতুর্থ ও নিম্নতম বর্ণ শূদ্র যাহারা, তাহারাও ইহাদের সংস্রব হইতে দূরে থাকে।

চণ্ডাল, শ্বপচ (কুক্কুরভোজী), পুক্কস, আহিণ্ডক (সাপুড়ে), নিষাদ, শবর, অন্ত্যাবশায়ী (ডোম বা মুদ্দফরাস),সোপাক (জল্লাদ), ধিগ্বণ (চর্ম্ম ব্যবসায়ী), কায়াবর

আকৃতি প্রকৃতি বুদ্ধি বিদ্যা ও আচার ব্যবহারে অতি উন্নত ও অতি নিম্ন এইরূপ দ্বিবিধ জাতি এক দেশের অধিবাসী হইলেও, ঘনিষ্ঠ সামাজিক সম্বন্ধে তাহারা মিলিতে পারে না। উচ্চতর জাতি সর্ব্ববিষয়ে বিষম ও নিম্নতর জাতির সংস্রব হইতে দূরে থাকিতেই চেষ্টা করেন। ইহাই স্বাভাবিক। আধুনিক ইয়োরোপে ও আফ্রিকায় ইয়োরোপীয়েরা কি ভাবে যে আদিম আফ্রিক ও আমেরিক জাতিসমূহের সংস্রব হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করেন, পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি। ভারতেও ঠিক এই অবস্থা হয়। আর্য্য ও উচ্চতর অনার্য্য জাতিদের লইয়া চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ হয়। প্রকৃতিতে ও আচারে অতি হীন যে সব নিম্নস্তরের অনার্য্য জাতি ভারতে ছিল, কেহই তাঁহারা ইহাদের নিকট সংস্রবে আসিতে চান না। অথচ এক দেশের ও এক রাজ্যের অধিবাসী ইহারা, এড়াইবার উপায় নাই। এ অবস্থায় যাহা হইতে পারে, তাহাই হইয়াছিল। চাতুর্ব্বর্ণ্য পদ্ধতির বাহিরের

(চর্ম্মচ্ছেদকারী) ইত্যাদি অনেক এইরূপ জাতির নাম মনুসংহিতায় আছে। সংহিতাকার ইহাদের কতককে শূদ্র পিতা হইতে প্রতিলোমজ সঙ্কর এবং কতককে আবার এই সব সঙ্কর হইতেও উৎপন্ন সঙ্কর জাতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ব্রাত্য ও অন্ত্যজ বলিয়া যে সব জাতির নাম আছে, তাহারা সকলেই যে সঙ্কর নহে, অনেকেই বিদেশাগত বা আদিম ভারতের অনার্য্যজাতি, মনুসংহিতার বহু বচনেই ইহার প্রমাণ হয়, এবং পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে ইহা আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। (৭৩৫ পৃষ্ঠা)

প্রতিলোমজ সন্তানের স্থান পিতৃবর্ণেরও নিম্নে হইত, মাতা যত উচ্চতর বর্ণের, সন্তানের স্থান আবার তত নিম্নে হইবে, এইরূপ বিধিই দেখিতে পাওয়া যায়। শূদ্র পিতা হইতে জাত এইরূপ প্রতিলোমজ সন্তান কেহ কেহ যে অতি অধম বলিয়া বিবেচিত হইবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের মধ্যে কোনও স্থান না পাইয়া ইহারা হয়ত বহিঃস্তরের অন্ত্যজ কোনও জাতির মধ্যে স্থান গ্রহণ করিত। কিরূপ প্রতিলোমজ সন্তান কোন্ জাতিতে যাইবে, তাহারও হয়ত একটা নিয়ম হইয়া যায়। এমনও হইতে পারে, যে ইহাদের সঙ্কর জন্মের লক্ষণ হইতেই কালে এই সব জাতিরও একটা সঙ্কর লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হয়।

এক স্তর রূপে দেশের মধ্যে স্থান ইহাদের হয়। যেমন বাহিরের, তেমন স্বতন্ত্র একস্তরও ইহারা বটে। চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ কিরূপ থাকিবে, এসম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা যাহাই থাক্ এবং যতই কঠোর বলিয়া অনেক সময়ে তাহা মনে হউক, আভ্যন্তরিক সামাজিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ইহারা ভোগ করিত। চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ ইহার কিছুতেই হস্তক্ষেপ কখনও করিতেন না। স্বচ্ছন্দে নিজ নিজ জাতীয় বৃত্তির অনুবর্ত্তন ইহারা করিত। প্রচুর ধনসম্পদ অনেকে অর্জ্জন করিত, ভূ-সম্পত্তিও ভোগ করিত। অবাধে নিজেদের ধর্ম্মানুষ্ঠান ও জাতীয় উৎসবাদি সম্পন্ন করিত। নিজ নিজ অধ্যুষিত অঞ্চলে জাতীয় এক একজন স্বাধীন রাজার শাসনেও অনেক ইহারা বাস করিত। রামায়ণের নিষাদরাজ গুহক ইহার একটি দৃষ্টান্ত। (রামায়ণে অরণ্য কাণ্ডে শবরীর আখ্যানে দেখা যায়, ইহাদের নারীও কেহ কেহ জ্ঞানে ও ধর্ম্মবুদ্ধিতে কত উন্নত হইতে পারিতেন।)

ইহার কোনও বিষয়ে কোনও রূপ বাধা যে তাহারা চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ হইতে পাইত, এরূপ মনে করিবার কারণ কিছু নাই। তবে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ-ভুক্ত জাতিরা সাধারণতঃ ইহাদের অবজ্ঞা করিতেন, ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। সংস্রববর্জ্জন সম্বন্ধীয় অনেক নিয়মও অতি কঠোর ছিল, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। মনুসংহিতার বহু বচনে ইহার আভাস পাওয়া যায়। তবে ইহা যে এ অবস্থায় অতি অস্বাভাবিক ও অসাধারণ একটা ত্রুটি কিছু, তাহাও কেহ বলিতে পারিবেন না।

যাহা হউক, উন্নত চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের এত সন্নিকটে থাকায়, বহুবিধ কর্ম্মে ক্রমে নিকটতর একটা যোগ তাহার সঙ্গে অন্ত্যজ জাতি-সমূহেরও হইতে থাকে। চাতুর্ব্বর্ণ্যের অনেক ধর্ম্মানুষ্ঠান ক্রমে ইহারা গ্রহণ করে এবং তাহার উন্নত আচারের প্রভাবও কিছু কিছু ইহাদের অনেকের মধ্যে গিয়া পড়ে। বৌদ্ধধর্ম্ম, তাহার পরে তান্ত্রিক শৈব ও শাক্ত ধর্ম্ম এবং বৈষ্ণব ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক সাধনায় জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলের সমান অধিকার যখন স্বীকার করেন,

এই সব ধর্ম্মের তত্ত্বকথা, শিক্ষার প্রভাব এবং সাধনার রীতিও ইহাদের মধ্যে কিছু কিছু বিস্তৃত হয়। একেবারে সমান স্তরে না উঠিতে পারিলেও, অপেক্ষাকৃত কিছু উন্নত ভাব যে তাহাতে ইহাদের মধ্যে দেখা দিবে, এবং চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধও যে ক্রমে নিকটতর হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে ইহাদের স্থান হয় না,—যাহারা শূদ্র তাহারাও সমান বলিয়া ইহাদের গ্রহণ করিতে চায় না,—অথচ একেবারে ভিন্নধর্ম্মী স্বতন্ত্র একটা সমাজ বলিয়াও ইহাদের আর মনে করা যায় না, ক্রমে এইরূপ একটা অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইল। তাই শেষে পঞ্চমবর্ণ এই নামে ইহাদের বর্ণভুক্ত করা হয়। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে * স্পষ্টতঃ এইরূপ নির্দ্দেশই পাওয়া যায়।

চত্বারঃ কথিতাবর্ণা আশ্রমা অপি সুব্রতে।
আচারাশ্চাপি বর্ণানামাশ্রমাণি পৃথক্ পৃথক্ ॥
কৃতাদৌ কলিকালে তু বর্ণাঃপঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্য এব চ ॥
এতেষাং সর্ব্ববর্ণানামাশ্রমৌ দ্বৌ মহেশ্বরি।
তেষামাচার-ধর্ম্মাংশ্চ শৃণুষ্বাদ্যে বদামিতে ॥

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র—৮ম উল্লাস, ৪-৬)

অর্থাৎ, কৃতাদি যুগে চতুর্ব্বর্ণ, চতুরাশ্রম এবং সেই সেই বর্ণ ও আশ্রমের আচার ভিন্ন ভিন্ন রূপে কথিত হইয়াছে †। কিন্তু কলিকালে

* মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বিশেষ প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া মনে হয় না। যে যুগেরই রচনা ইহা হউক, অন্ততঃ প্রাগ্‌বৃটিশ যুগে তন্ত্রমতের প্রভাবে ক্রমে যে পরিণতি প্রাচ্য ভারতীয় হিন্দুসমাজের হয়, তাহারই একটা চিত্র ইহার সামাজিক অনুশাসনাদিতে, যে প্রতিফলিত হইয়াছে, একথা বলা যাইতে পারে।

† এই পার্থক্য সত্ত্বেও শিক্ষার এবং ধর্ম্মসাধনাদিতে শূদ্রাদি সকল জাতির কি অধিকার ক্রমে স্বীকৃত ও বিহিত হয়, পরবর্ত্তী 'শূদ্রের অধিকার' নামক ৮ম পরিচ্ছেদে তাহা বিবৃত করা হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও সামান্য এই পঞ্চবর্ণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। আর এই সকল বর্ণেরই আশ্রমমাত্র দুইটি (গার্হস্থ্য ও ভিক্ষুক)। হে আদ্যে! হে মহেশ্বরি! তাহাদের আচার ধর্ম্ম বলিতেছি শ্রবণ কর।

এই সামান্য বর্ণই চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতি। ইহাদের লইয়া পাঁচটি বর্ণ কেবল নহে, বিবিধ আশ্রম ধর্ম্মেও এই পাঁচবর্ণের সমান অধিকার এই বচনে স্বীকৃত হইয়াছে।

বহু এইরূপ অন্ত্যজ জাতি এখনও সাধারণ হিন্দুসমাজের বহিঃস্তরে রহিয়াছে। উচ্চতর বর্ণের হিন্দুরা এখনও যথাসম্ভব ইঁহাদের সংস্রব হইতে দূরে থাকেন, এবং ইহাদের স্পর্শও অশুচিকর বলিয়া অনেকস্থলে মনে করেন। অস্পৃশ্য জাতি (untouchables) নামেও অনেকে ইহাদের কথা আজকাল বলিয়া থাকেন। দক্ষিণ ভারতে—বিশেষতঃ মান্দ্রাজ অঞ্চলে—ইহারা কেবল অস্পৃশ্য নহে, ব্রাহ্মণাদি উচ্চতর জাতির নিকটেও আসিতে পারে না। অনেক দেবমন্দিরে, এমন কি মন্দিরের নিকটবর্ত্তী পথেও, ইহাদের পদার্পণ করিবার অধিকার নাই। অনেক অঞ্চলে—বিশেষতঃ বাঙ্গলায়—দেখা যায়, সকলে ইহারা একেবারে অস্পৃশ্যও নহে। কেবল ইহাদের হাতের জল ও পক্কান্ন উচ্চতর জাতীয়েরা কেহ গ্রহণ করেন না, এবং পানীয় জল ও পক্কান্ন যে গৃহে থাকে সেই গৃহে ইহাদের প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। গ্রামের মধ্যেই অনেকের বসতি দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কৃষিকর্ম্ম, কেহ বিবিধ কারুশিল্প, কেহ বা পশুপালনে জীবিকানির্ব্বাহ করে। কেহ কৃষাণ, কেহ নাবিক ও বাহক, কেহ বা বাদ্যকরের কাজও করে। অনেক গৃহে বাহিরের কাজের জন্য পরিচারকও ইহারা নিযুক্ত হয়। বাসন মাজে, কাপড় চোপড় কাচে এবং ছেলেপিলেও রাখে। গঙ্গাতীরবর্ত্তী সব গ্রামে পাকের ও পানীয় জলও ইহারা তুলিয়া আনে। * তীর্থ স্থানে দেবমন্দিরাদিতে

---

* হিন্দু নামধারী যে কোনও জাতির লোকই হউক, তাহার স্পৃষ্ট গঙ্গাজল অশুচি হয় না, অন্ততঃ বাঙ্গলায় এই বিশ্বাস লোকের আছে।

অপর সকলের সঙ্গে অবাধ প্রবেশাধিকার ইহাদের আছে। কেহ কখনও জিজ্ঞাসাও করে না, তুমি কোন্ জাতি। শ্রীক্ষেত্রে আবার ইহাদের স্পৃষ্ট প্রসাদীয় অন্ন সকলে যে কেবল গ্রহণই করে তা নয়, গ্রহণ করিতে বাধ্য। অস্বীকার করা মহাপাপ বলিয়া গণ্য হয়।

উৎসবাদিতে সকলেই সমান ভাবে যোগ দেয়। পুরাণপাঠ, যাত্রা গান প্রভৃতি যখন হয়, সভায় সকলেই উপস্থিত থাকে, কেবল বসিবার স্থান পৃথক দেওয়া হয়।

এই সব ভাবে সর্ব্বদা এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সকলেরই সকলের সঙ্গে আসিতে হয়, যে ব্যবহারেও একটা আত্মীয়তার ভাব পরস্পরের মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়াছে। 'দাদা', 'খুড়া', 'জেঠা', 'ভাই', 'দিদি', 'পিসী', 'মাসী', 'মা', প্রভৃতি মমত্ব-সূচক আহ্বানেও সকলে সকলকে সর্ব্বদা ডাকে। অন্ততঃ বাঙ্গলার পল্লী অঞ্চলবাসী সকলেই এক বাক্যে ইহার সাক্ষ্য দিবেন।

এ অবস্থায় ছুঁৎমার্গের ব্যবধান একরূপ কিছু নাই বলিলেও চলে। বাঙ্গলা অঞ্চলে তাই 'অস্পৃশ্য জাতি' এই কথাটাও অতি কম শোনা যায়। ইহাদের হাতের জল ব্যবহার করা হয় না বলিয়া 'জল-অনাচরণীয়' এই নামটিই এ দেশে প্রচলিত। ইহারা অস্পৃশ্য একথা বড় কেহ বলেন না,—বলেন, ইহাদের জল চল নাই। শূদ্রাদি নিম্নতর জাতি সমূহের মধ্যে 'জল চল,' আর 'জল অচল' এই ভাবে একটা পার্থক্যের রেখা টানা হয়।

অধুনা depresed বা অধঃপতিত জাতি বলিয়াও ইহাদের উল্লেখ অনেকে করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাদের জাতিগত প্রকৃতি এবং সমাজের মধ্যে অবস্থান সম্বন্ধে যে সব আলোচনা করা হইল, তাহাতে একথা বলা চলে না যে অন্যায় প্রভুত্বের বলে চাপিয়া ইহাদের অতি নিম্ন এই স্তরে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে। চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ হইতে বাহির করিয়া ইহাদের দেওয়া হয় নাই, জাতীয় বৈষম্য আর জাতীয় প্রকৃতির অনুন্নত অবস্থা হেতু স্বভাবতঃই চাতুর্ব্বর্ণ্য

সমাজের বাহিরের একস্তরে স্বতন্ত্র স্থান ইহাদের হয়,—এবং পরে এই সমাজের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ অনেক স্থলেই নিকটতর হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমে আরও উন্নত ও আরও নিকট হইয়া একেবারে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের মধ্যেও যদি ইহারা আসিতে পারে, পঞ্চমবর্ণের উপরে উঠিয়া চতুর্থবর্ণে মিলিয়া যাইতে পারে, দেশের সনাতন ধর্ম্মে তাহার কোনও বাধা নাই। স্বভাবে নিম্ন ও আচারে হীন বলিয়াই বাহিরে ইহারা ছিল, এই নিম্নতা ও হীনতা যথাপ্রয়োজন দূর হইলেই ভিতরে আসিতে পারে। চতুর্ব্বর্ণ ই সমাজের সনাতন বিভাগ। পঞ্চমবর্ণ অবস্থা বিশেষে একটা ব্যতিরেক মাত্র। বর্ণের বাহিরে ইহারা যতদিন ছিল, সে ছিল এক রকম অবস্থা। কিন্তু বর্ণ এই নাম যখন দেওয়া হইয়াছে, তখন পঞ্চম বলিয়া দূরে পৃথক্ করিয়া আর তাহাদের রাখা চলে না। হয় অন্ততঃ চতুর্থবর্ণে ইহাদের তুলিয়া নিতে হইবে, নতুবা বর্ণের বাহিরে রাখিতে হইবে। তবে তার আগে চাই, যে কারণে এখনও ইহারা পঞ্চম, সেই কারণ দূর করা, সুশিক্ষার প্রভাবে আচারে ইহাদের উন্নত করিয়া তোলা। তা যদি তোলা যায়, চতুর্থবর্ণে আপনাহইতেই ইহারা উঠিবে। ইহাদের নিজেদেরও সে বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। নতুবা পঞ্চম ও বাহিরের স্তর হইতে চতুর্থ ও অন্তরের স্তরে উঠিতে পারিবে না। সহজে কেহ টানিয়াও ইহাদের তুলিতে পারিবেন না।

'জল অচল' জাতি সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা দরকার। কোনও কোনও জাতি আধুনিক হিন্দুসমাজে দেখা যায়, তাহারা 'জল অচল' বটে,—কিন্তু 'অন্ত্যজ' বলিতে যে যে রূপ হীন ও বাহিরের জাতি বুঝায়, সেরূপ কোন জাতি নহেন। বাঙ্গলার সুবর্ণবণিক, সাহা, সূত্রধর প্রভৃতি কোনও কোনও জাতিকে ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতিতে, উন্নত সংস্কারের অধিকারে, আচারব্যবহারের পরিমার্জ্জনায়, উচ্চতর ব্যবসায়াদি পরিচালনার যোগ্যতায়, চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্ভুক্ত বৈশ্য স্তরের অন্যান্য

জাতি অপেক্ষা কোনও অংশে ইঁহারা হীনতর নহেন। কিন্তু ইঁহারা 'জল অচল'। মনে হয়, সামাজিক কোনও অপরাধে ইঁহাদের পাতিত্য কখনও ঘটিয়াছিল, এবং সেই অবস্থা হইতে পুনরুদ্ধারের কোনও চেষ্টা আর হয় নাই। অন্ত্যজ জাতির যাজকতা করিবার জন্য, ব্রাহ্মণ কোনও কোনও সম্প্রদায়ও এইরূপ 'পতিত' দেখা যায়। যাঁহাদের যাজকতা করেন, তাহাদের জল অবশ্য ইঁহাদের ব্যবহার করিতে হয়, গৃহে ভোজনও করিতে হয়। এই কারণেই 'জল চল' জাতিসমূহের কাছে ইঁহারাও 'জল অচল' হইয়াছেন। 'পতিত' যদি বলিতে হয়, এই সব জাতিকেই বলা যাইতে পারে। অন্ত্যজ জাতীয়েরা পতিত কি অধঃপাতিত কিছুই নয়। স্বভাবে ও আচারে যথোচিত উন্নত হইয়া চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের মধ্যে এখনও উঠিতে পারে নাই, এই মাত্র ইহাদের সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে। আর বলা যাইতে পারে, উন্নত যাহারা হইয়াছে, এই স্থান যাহাদের পাওয়া উচিত, তাহারাও সহজে পাইতেছে না। ইহার জন্য দায়ী যে কেবল উচ্চতর বর্ণসমূহ, তাও নয়। যাহারা শূদ্র, তাহারাও ইহাদের 'জলচল' করিয়া নিতে চায় না। 'জল অচল' যাহারা, তাহারাও আবার পরস্পরের সঙ্গে 'জলচল' ভাবে মিলিতে চায় না।

৭। আশ্রম ধর্ম্ম—চতুরাশ্রম

[ব্যক্তিগত ধর্ম্মনীতির আদর্শস্থাপনা]

ধর্ম্মের আদর্শ যত উচ্চই হউক, সামাজিক বিধিব্যবস্থাদি যতই সমীচীন ও সুনীতিসঙ্গত হউক, ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ নিজেরা ধর্ম্ম-পরায়ণ না হইলে, সবই বৃথা। আদর্শ কেবল মুখের কথা, আর বিধি-ব্যবস্থা সব পুথির পুঁজি মাত্র হইয়া পড়ে। প্রাচীন ভাবতে তাই একদিকে সমাজস্থিতির জন্য যেমন চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রতিষ্ঠা হয়, অপর দিকে তেমন ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম্মপরায়ণ ও মোক্ষাভিমুখ চরিত্র-গঠনের জন্য, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্বর্গসিদ্ধির জন্য, চতুরাশ্রমের

প্রতিষ্ঠা হয়। সমাজ ধর্ম্মের সঙ্গে ব্যক্তিগত ধর্ম্ম যে কিরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত, অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, পূর্ব্বে 'র‍্যাসনালিজম্ ও ধর্ম্মনীতি' নামক ১১শ প্রবন্ধে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। ভারতে এই সমাজধর্ম্মের ভিত্তি ছিল চাতুর্ব্বর্ণ্য, আর ব্যক্তিগত ধর্ম্মের ভিত্তি ছিল চতুরাশ্রম। তাই সমগ্রতায় হিন্দুজীবনের ধর্ম্ম যাহা, তাহা সাধারণতঃ 'বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম' নামে পরিচিত।

মানুষ এই সংসারে জন্মিয়াছে, সংসারে বহু কর্ত্তব্য তাহার আছে, সব তাহাকে পালন করিতে হইবে। আবার বিষয়বাসনা আছে, তাহারও একটা চরিতার্থতা তাহার চাই। উদ্দাম বিষয়বাসনা প্রবৃত্তিমার্গে যথেচ্ছ ভোগের দিকে তাহাকে লইয়া যাইতে চায়, কিন্তু নিবৃত্তিমার্গে একটা নিয়মের মধ্যে ইহাকে সংযত রাখিতে না পারিলে, সংসারে তাহার কর্ত্তব্য সে পালন করিতে পারে না। কেবল তাই নয়। সংসারে সে জন্মিয়াছে কেবল বিষয়ভোগের জন্যও নহে, সাংসারিক কর্ত্তব্য-পালনের জন্যও নহে। এই সংসারচক্রে বদ্ধজীব সে, এই চক্রের আবর্ত্তনের মধ্য দিয়াই ক্রমে তাহকে মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। বদ্ধাবস্থা হইতে ক্রমে মুক্ত হইবে, ভাগবতী লীলায় ইহাই তাহার জীবনের মূল লক্ষ্য। আধ্যাত্মিক যে জ্ঞানের বল ও সাধনার বল এই লক্ষ্যের পথে তাহাকে অগ্রসর করিয়া নিতে পারে, সেই বলও তাহাকে এই সংসারের মধ্যেই সংগ্রহ করিতে হইবে।

এই ভাবে এই সংসারে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এবং তাহা হইতেই ক্রমে মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গের সিদ্ধিতেই জীবনে পূর্ণসিদ্ধি তাহার লাভ হয়, সর্ব্বতোভাবে জীবজীবন তাহার চরিতার্থ হয়। সর্ব্বাগ্রে যমনিয়মের *

---

* মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতে—

ব্রহ্মচর্য্যং দয়াক্ষান্তির্ধ্যানং সত্যমকল্কতা।
অহিংসাস্তেয়মাধুর্য্যে দমশ্চেতি যমাঃ স্মৃতা॥
স্নানং মৌনোপবাসেজ্যা স্বাধ্যায়োপস্থনিগ্রহাঃ।
নিয়মো গুরুশুশ্রূষা শৌচাক্রোধাপ্রমাদতাঃ॥

অনুশীলনে উন্নত চরিত্রগঠন, সংসারজীবনে যথাশক্তি সেই চরিত্রমহিমায় স্থিতি, ক্রমে প্রবৃত্তির পথ হইতে নিবৃত্তির পথে অন্তর্ম্মুখ মনের গতি এবং তাহা হইতে আত্মদর্শনে মোক্ষলাভ, এইরূপ একটা ধারায় জীবন পরিচালিত হইলেই চতুর্ব্বর্গে সিদ্ধিলাভ মানুষের ঘটিতে পারে। বাল্যাবধি একটা শিক্ষার, সাধনার ও ধর্ম্ম-শাসনের (spiritual disciplineএর) মধ্য দিয়া এইরূপ আদর্শের ধারায় জীবন যাহাতে পরিচালিত হইতে পারে, সেই ভাবেই চতুরা-শ্রমের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং ভৈক্ষ্য বা পরিব্রজ্যা চারিটি আশ্রম ছিল এই।

অথবা—অহিংসা সত্যবচনং ব্রহ্মচর্য্যমকল্কতা।
অস্তেয়মিতি পঞ্চৈতে যমাবৈ পরিকীর্ত্তিতা॥
অক্রোধো গুরুশুশ্রূষা শৌচমাহারলাঘবম্।
অপ্রমাদশ্চ সততং পঞ্চৈতে নিয়মাঃ স্মৃতাঃ॥

মনুসংহিতা, ৪র্থ অধ্যায় ২০৪ শ্লোকের (আচার্য্য কুল্লুক ভট্ট কৃত) টীকায় যম ও নিয়মের লক্ষণ স্বরূপ প্রাচীন শাস্ত্র হইতে এই বচন কয়েকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায়, অহিংসা, সত্যকথন, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য, ক্ষমা, মধুরতা, নির্ম্মলতা প্রভৃতি অন্তরের গুণসমূহ যমের লক্ষণ,—আর স্নান, উপবাস, যজ্ঞ, গুরুসেবা, বেদাধ্যয়ন, মৌন ব্রত প্রভৃতি বাহ্যিক অনুষ্ঠান নিয়মের মধ্যে। উভয়বিধ অভ্যাসই সাধুচরিত্রলাভের পক্ষে প্রয়োজন। একটি আর একটির সহায়ও বটে। কিন্তু যম অপেক্ষা নিয়ম অনেকটা সহজসাধ্য, এবং যমের অভ্যাস ত্যাগ করিয়া কেবল নিয়মানুবর্ত্তী হইলে আনুষ্ঠানিক কুশলতাই মানুষের চরিত্রের লক্ষণ হইয়া উঠে, চিত্ত উন্নত হয় না। ভণ্ড সাধু হইবারও আশঙ্কা থাকে।

মনু তাই উক্ত শ্লোকে বলিয়াছেন।—

যমং সেবেত সততং ন নিত্যং নিয়মান্ বুধঃ।
যমান্ পতত্যকুর্ব্বাণো নিয়মান্ কেবলং ভজন্॥

সর্ব্বদা যমেরই সেবা করিবে, কেবল নিয়ম লইয়া থাকিবে না। যমাচরণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল নিয়মাচরণ করিলে পতিত হইতে হয়।

বাল্যে—সাধারণতঃ অষ্টম হইতে দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে দ্বিজ-জাতীয় বালকের উপনয়ন সংস্কার হইবে। তদবধি অন্যূন চব্বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী ও গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ হইয়া সে গুরু গৃহে থাকিবে এবং বেদাধ্যয়ন ও নিজ নিজ বৃত্তির উপযোগী শিক্ষা লাভ করিবে *। কেবল ব্রহ্মচর্য্য, গুরুশুশ্রূষা এবং অধ্যয়নই নহে, যথাশক্তি যমনিয়মের অন্যান্য অঙ্গের অভ্যাসও শিষ্যদের করিতে হইত। এই তিনটিই শিষ্যত্বের প্রধান লক্ষণ ছিল। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে যম-নিয়মের নির্দ্দেশ অবহেলা করিয়া চলিলে প্রধান এই তিনটির সাধনাও তেমন সফল হয় না।

ইহাই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, জীবনের প্রথম আশ্রম বা সাধনার ক্ষেত্র।

চব্বিশ হইতে ত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যে এই আশ্রমের শিক্ষা ও সাধনা সম্পূর্ণ হইত। তখন গুরুর আদেশে ব্রহ্মচারীর ব্রত ত্যাগ করিয়া শিষ্যগৃহে ফিরিতেন এবং যথারীতি বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইতেন।

এই তাঁহার সাংসারিক জীবন আরম্ভ হইল, এবং ইহাই ছিল জীবনের দ্বিতীয় আশ্রম। দ্বিতীয় এই গার্হস্থ্য আশ্রমে যথাবিহিত কোনও

* অধীয়ীরংস্ত্রয়ো বর্ণা স্বকর্ম্মস্থাঃ দ্বিজাতয়ঃ।
প্রব্রুয়াদ্ ব্রাহ্মণস্তেষাং নেতরাবিতি নিশ্চয়ঃ॥
সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণো বিদ্যাদ্ বৃত্ত্যুপায়ান্ যথাবিধি।
প্রব্রুয়াদিতরেভ্যশ্চ স্বয়ঞ্চৈব তথা ভবেৎ॥

(মনু—১০, ১—২)

দ্বিজ বর্ণত্রয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—ইঁহারা সতত স্বধর্ম্মনিরত থাকিয়া বেদাধ্যয়ন করিবেন। কিন্তু বেদাধ্যাপনা কেবল ব্রাহ্মণেরই কর্ত্তব্য, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নহে।

যথাশাস্ত্র সর্ব্ববর্ণের জীবনোপায় অবগত হইয়া এবং স্বয়ং সর্ব্বদা শাস্ত্রসম্মত কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণকে ঐ উপায় সকল উপদেশ দিবেন।

(৭৩১ পৃষ্ঠা—পাদটীকা দ্রষ্টব্য)

বৃত্তি গ্রহণ করিয়া অর্থোপার্জ্জনে তিনি স্ত্রীপুত্রাদি কুটুম্বগণের ভরণ পোষণ করিবেন, তাহাদের লইয়া বিষয়সম্ভোগে তৃপ্ত হইবেন এবং সামাজিক অন্যান্য কর্ত্তব্য যাহা কিছু তাহাও পালন করিবেন।

পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত এবং সংসারের ভার গ্রহণের যোগ্য হইলেই গৃহস্থ তাহার উপরে সংসারের ভার দিয়া একা কিম্বা সপত্নীক বনে গমন করিবেন, এবং নিয়ত অধ্যয়নে এবং কঠোর ব্রতে ও তপস্যায় জীবন যাপন করিয়া আত্মজ্ঞান লাভে যত্নশীল হইবেন। এই অবস্থার নাম বানপ্রস্থ আশ্রম। *

এই বানপ্রস্থ আশ্রমে জীবনের তৃতীয় ভাগ যাপন করিয়া ব্রতে তপস্যায় স্বাধ্যায়ে ও আত্মচিন্তায় অধ্যাত্মজ্ঞানে সমধিক উন্নতিলাভ হইলে জীবনের চতুর্থ ভাগে বানপ্রস্থী সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। তখন সকল নিয়মের অতীত হইয়া ভিক্ষামাত্র সম্বল করতঃ পরিব্রাজক রূপে তিনি লোকসমাজে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারেন। ইহাই শেষ বা চতুর্থ আশ্রম—নাম ছিল, ভৈক্ষ্য, পরিব্রজ্যা বা সন্ন্যাস আশ্রম।

* অশক্ত পক্ষে নির্লিপ্ত ভাবে মধ্যস্থের ন্যায় গৃহে থাকিবার ব্যবস্থাও ছিল।
যথা—মহর্ষি পিতৃদেবাণাং গত্বানৃণ্যং যথাবিধি।
পুত্রে সর্ব্বং সমাসজ্য বসেন্মাধ্যস্থমাশ্রিতঃ॥

(মনু—৪,২৫৭)

এবং গৃহে থাকিয়াও—
একাকী চিন্তয়েন্নিত্যং বিবিক্তে হিতমাত্মনঃ।
একাকী চিন্তয়ানোহি পরং শ্রেয়োঽধিগচ্ছতি॥

(মনু—৪,২৫৮)

অর্থাৎ স্বাধ্যায় দ্বারা ঋষিঋণ, যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবঋণ এবং পুত্রোৎপাদনে পিতৃঋণ হইতে যথাবিধি মুক্ত হইয়া যোগ্যপুত্রের হস্তে সংসারের সকল ভার অর্পণ করতঃ আসক্তিবিহীন হইয়া নির্লিপ্ত ভাবে মধ্যস্থের ন্যায় গৃহে বাস করিবেন, এবং নির্জ্জন স্থানে একাকী থাকিয়া সর্ব্বদা আত্মহিত চিন্তা করিবেন। এইরূপ একাকী চিন্তা ধ্যান-পরায়ণ হইলেই পরমশ্রেয় লাভ হইয়া থাকে।

গার্হস্থ্য আশ্রমের মহিমা

এই চতুরাশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য আশ্রমই শ্রেষ্ঠ বলিয়া আচার্য্যগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংসারস্থিতি ও সমাজস্থিতি রক্ষাকল্পে মানব জীবনের যাহা কিছু দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আছে, এই আশ্রমেই তাহা পালিত হইতে পারে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম তাহার উপযোগী শিক্ষার আশ্রম মাত্র; বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস শেষ এই দুই আশ্রম নিজ নিজ আত্মার কল্যাণ সাধনের উপযোগী আশ্রম। মানবজীবন ধারণ করিয়া যে সব ঋণে মানুষ ঋণী হইয়াছে, তাহা পরিশোধ না করিয়া কেবল নিজ নিজ আত্মার কল্যাণই চাহিবে, তাহারই উপযোগী সাধনা-মাত্র করিবে, এ অধিকার কাহারও নাই। সেই আত্মার কল্যাণও এই সব ঋণপরিশোধের মধ্য দিয়া বহুপরিমাণে সাধিত হইতে পারে, হইয়াই থাকে। তারপর অন্যান্য আশ্রমী যাঁহারা, তাঁহাদের প্রতিপালনও গৃহস্থকে করিতে হয়। প্রত্যেক গৃহস্থের অবশ্য নিত্য-কর্ত্তব্য দানযজ্ঞাদিই ইঁহাদের প্রতিপালনের উপায়। তাই গৃহস্থাশ্রম কেবল শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়াই আচার্য্যগণ নির্দ্দেশ করেন নাই, এই আশ্রমে প্রবেশ না করিয়া, গৃহস্থরূপে সাংসারিক ও সামাজিক সব ধর্ম্ম পালন না করিয়া, একেবারে বানপ্রস্থ কি সন্ন্যাস অবলম্বন করাও সকলের পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ না হউক, সাধারণতঃ বাঞ্ছনীয় বলিয়া গণ্য হইত না।

গৃহস্থাশ্রমের আর একটি বিশিষ্টতা এই যে বর্ণানুরূপ কর্ম্ম-বিভাগের রীতি এই আশ্রমেই ছিল। ব্রহ্মচারী শিষ্যের জীবন সকলের পক্ষেই একরূপ সমান। নিজ নিজ বৃত্তির বিজ্ঞান শিখিতে হইত, তা ছাড়া যমনিয়মের সমান ব্রতে এক স্তরের সমান শিষ্যরূপেই সকলে জীবনযাপন করিতেন। বানপ্রস্থীর ও সন্ন্যাসীর মধ্যেও বর্ণগত কর্ম্মবিভাগ কিছু ছিল না। ব্রত তপস্যা অধ্যয়ন ও পরিব্রজ্যাদি সকলেই এক নিয়মে করিতেন। চাতুর্ব্বর্ণ্য ছিল

সাংসারিক ও সামাজিক জীবনের ধর্ম্ম এবং গার্হস্থ্য আশ্রমই ছিল এই জীবনের কর্ম্মভূমি। চাতুর্ব্বর্ণ্যের যাহা বিশেষত্ব তাহা এই ভূমিতে এই জীবনকে ধরিয়াই প্রকাশ পাইত। এই চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্মে সংসার ও সমাজকে রক্ষা করিয়া অন্য তিন আশ্রমকে গৃহস্থগণই রক্ষা করিতেন। *

গৃহস্থের ধর্ম্ম—পঞ্চযজ্ঞ

নিজ নিজ বর্ণোচিত বৃত্তির অনুবর্ত্তনে সংসার ভোগ এবং সামাজিক কর্ম্মের ভাগ সম্পাদন ব্যতীত, অধ্যয়ন দান ও যজ্ঞ দ্বিজবর্ণত্রয়ের প্রত্যেক গৃহস্থেরই অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। ইহার মধ্যে পঞ্চযজ্ঞরূপ গৃহস্থের একটি নিত্য কর্ম্মপদ্ধতি বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

---

* যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ॥
যস্মাৎ ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাৎ শ্রেষ্ঠাশ্রমোগৃহী॥

(মনু—৩,৭৭—৭৮)

অর্থাৎ যেমন প্রাণবায়ুকে আশ্রয় করিয়া সমুদয় প্রাণী জীবিত রহিয়াছে, সেইরূপ গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া অপরাপর আশ্রমবাসিগণ জীবনধারণ করেন। যেহেতু ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী ও ভিক্ষু তিন আশ্রমীই গৃহস্থকর্ত্তৃক প্রতিদিন জ্ঞান ও অন্নদানাদি দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছেন, একারণ গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ।

বলা বাহুল্য, জ্ঞানদাতা গুরুও গৃহস্থাশ্রমী, অধ্যাপনাই তাঁহার বৃত্তি। তপোবনবাসী ঋষিরাও গৃহস্থ, সাধারণ সামাজিক গৃহস্থদের হইতে উচ্চতর স্তরের একরূপ ব্রাহ্মণ গৃহস্থই তাঁহারা ছিলেন।

(৬:৯—৭০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ঋষিদের তপোবন বানপ্রস্থীদের আশ্রয় অনেক সময় হইত; ঋষিরাও কেহ কেহ বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী হইতেন কিন্তু বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী মাত্রই ঋষি ছিলেন না।

পঞ্চ যজ্ঞ এই—

ব্রহ্মযজ্ঞ—স্বাধ্যায় ও অধ্যাপনা।

পিতৃ যজ্ঞ—তর্পণ ও শ্রাদ্ধ।

দেবযজ্ঞ—যাগহোমাদি কর্ম্মে দেবশক্তির উপাসনা।

নৃ-যজ্ঞ—গৃহাগত অতিথির সেবা।

ভূতযজ্ঞ—অন্নাদি বলিদানে ইতর প্রাণীদের রক্ষা। *

ব্রহ্মযজ্ঞ

ব্রহ্ম পরমাত্মা, পরমেশ্বর,—ব্রহ্ম বেদমন্ত্র, বেদজ্ঞান, যাহাতে বা যাহার মধ্য দিয়া সেই পরমেশ্বরই জ্ঞানমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছে। এই জ্ঞানমূর্ত্তিকে দর্শন ও প্রচার করিয়াছেন, ঋষিবৃন্দ। তাঁহাদেরই বাণী তাই বেদমন্ত্র, তাঁহাদের জ্ঞানসমষ্টি বেদজ্ঞান। ইহারই সঙ্গে যোগস্থাপনা করিয়া আপন আপন অন্তরস্থিত তমসাবৃত সেই জ্ঞানমূর্ত্তিকে আমাদের ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, সেই আলোক অন্যকে বিতরণ করিয়া তাহাদিগকেও এই সাধনায় সহায়তা করিতে

* অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞশ্চ তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথি পূজনম্॥

(মনু—৩,৭০)

ঋষয়ো পিতরো দেবাভূতান্যাতিথয়স্তথা।
আশাসতে কুটুম্বিভ্যস্তেভ্যঃ কার্য্যং বিজানতা॥
স্বাধ্যায়েনার্চ্চয়েতর্ষীন্ হোমৈর্দ্দেবান্ যথাবিধি।
পিতৃন্ শ্রাদ্ধৈশ্চ নৃ-নন্নৈ ভূতানি বলিকর্ম্মণা॥

(মনু—৩,৮০—৮১)

যজ্ঞ বলিতে কেবল অগ্নিতে দেবোদ্দেশে আহুতি দেওয়াই বুঝায় না। এই হোমও যজ্ঞের একটি প্রকার বটে, কিন্তু ইহাই মাত্র যজ্ঞ নহে। জগতের মঙ্গল ও তাহার সঙ্গে আত্মার মঙ্গল কল্পে যাহা কিছু অনুষ্ঠান করা হয়, বিশেষতঃ উৎসর্গমূলক যাহা কিছু ক্রিয়া সম্পাদন করা হয়, তাহাই যজ্ঞ। ইংরেজিতে তাই Sacrifice নামে যজ্ঞের অনুবাদ করা হয়।

হইবে। তাই বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, জ্ঞানগ্রহণ ও জ্ঞানদান—উভয়ই ব্রহ্মযজ্ঞ নামে অভিহিত হইয়াছে। অপর নাম বেদযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ। জ্ঞান আমরা নিব, নিয়া তাই বাড়াইয়া আবার দিব, জ্ঞানধারা লোকপরম্পরাক্রমে এইভাবে মানুষের মধ্যে উচ্চতম মনুষ্যত্বকে ফুটাইয়া তুলিবে। ঋষিদের সাধনায় বেদে যে জ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সার্থকতাও তাহাই। ঋষিদের জ্ঞানসাধনাও ইহাতে সার্থক হয়; তাঁহাদের তৃপ্তি ইহাতেই হইতে পারে। যে ঋণে তাঁহাদের কাছে আমরা ঋণী, তাহার পরিশোধ এই ভাবে হয়। পরমেশ্বরের জ্ঞানমূর্ত্তির সঙ্গে যে সম্বন্ধ আমাদের রহিয়াছে, সেই সম্বন্ধের যোগও এই যজ্ঞেই জাগ্রত থাকে, আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ঋষিরা এই প্রত্যাশাই আমাদের নিকট করেন।

পিতৃযজ্ঞ

যাঁহাদের বংশধারায় আজ আমার এই মনুষ্যজন্ম ও জীবন আশ্রিত আছে, যাঁহাদের সাধনার ফল আজ আমার এই দেহে ও মনে আমি ভোগ করিতেছি, ইহলোক ছাড়িয়া গেলেও যাঁহারা আছেন এবং আমাদের অদৃশ্য হইয়াও যাঁহারা আমাদের সঙ্গে স্নেহের সম্বন্ধে যুক্ত রহিয়াছেন, আমাদের মঙ্গল কামনা করিতেছেন, তাঁহাদের তৃপ্তিবিধান আমাদের বড় একটি কর্ত্তব্য। হিন্দু আচার্য্যগণ বলিয়াছেন, এবং হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, তর্পণশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় তাঁহাদের তৃপ্তি হয়, তাঁহারা উপকৃত হন, এবং আমাদেরও উপকার করেন।

এই একটি যে বংশে আজ আমি জন্মিয়াছি, তাহার পূর্ব্বতন পুরুষদের সঙ্গেই যে কেবল আমার এই সম্বন্ধ তাহা নয়। কোটি কোটি বৎসর—একরূপ অনাদিকাল হইতেই বিচিত্র এই জীবধারা জগতে চলিয়া আসিতেছে। কোটি কোটি জন্মে কোটি কোটি কুলে আমি জন্মিয়াছি,—কত কোটি কোটি জীবের সঙ্গে কত সম্বন্ধে আমি আসিয়াছি। আজ আমি যাহা, তাহা তিল তিল করিয়া ইঁহাদের

হইতেই পাইয়াছি। সর্ব্বদাই ইহা আমাকে স্মরণ রাখিতে হইবে। এই স্মৃতিই আমার জীবনরহস্যের দিকে আমাকে আকৃষ্ট করিবে,—কে আমি, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, কি হইব, সর্ব্বদা এইসব চিন্তা আমার মনে তুলিবে। কেবলমাত্র এই পৃথিবীকে, ইহজীবনকে ও তার ভোগকে সর্ব্বস্ব করিয়া নিয়া আত্মবিস্মৃত আমি হইতে পারিব না।

পিতৃযজ্ঞের মধ্যে ইঁহাদের সকলেরই তর্পণের বিধি আছে।

হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, বিচিত্র এই জীবধারাকে প্রবর্ত্তন করিয়া ইহাকে রক্ষণ ও পোষণ করিতেছেন, এমন বহু চৈতন্যময় শক্তি অথবা শক্তির অভিমানী পুরুষ আছেন। 'পিতৃগণ' নামে শাস্ত্রকারবর্গ ইঁহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। দিব্য যে লোকে থাকিয়া ইঁহারা এই জগৎ ব্যাপারে নিজেদের কর্ম্মের ভাগ সম্পাদন করিতেছেন, তাহার নামও পিতৃলোক। ইঁহাদের তর্পণও পিতৃযজ্ঞের একটি অঙ্গ। কেবল ইঁহাদের বলিয়া কেন ? দেবগণ, ঋষিগণ—সমগ্র এই জগতে যত শক্তি, যত জীব রহিয়াছে, সকলের সঙ্গেই প্রত্যেকে আমরা অবিচ্ছিন্ন এক সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত।

ইহা স্মরণ করিয়া পিতৃযজ্ঞে সকলেরই তর্পণ আমাদের করিতে হইবে, এইরূপ বিধি রহিয়াছে।

নিত্য যে তর্পণক্রিয়া দ্বিজশূদ্র সকলেরই করণীয় বলিয়া শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তাহার পদ্ধতি দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, ইহা কত ব্যাপক, ইহার তত্ত্ব কত গভীর। পূর্ব্বে ১ম প্রবন্ধে, ৯২ পৃষ্ঠায় দুইটি বচন এসম্বন্ধে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, আর একটি বচন নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল,—

> "ওঁ আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
> তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃ-মাতামহাদয়ঃ ॥
> অতীত কুলকোটিনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।
> ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবন ত্রয়ম্ ॥"

দেবযজ্ঞ

অদৃশ্য যে সব নৈসর্গিক শক্তি—যাঁহারা চেতন ও পুরুষবিধ সত্ত্ব (intellegent personalities) বটেন—পরমেশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহা-হইতে আবির্ভূত হইয়া এই জগৎকে রক্ষা করিতেছেন, মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতেছেন, ইঁহাদেরই 'দেবতা' এই সংজ্ঞা ঋষিরা দিয়াছেন। হোমে ইঁহাদের তুষ্টি হয়, এবং ইহাদের বলবৃদ্ধি পায়। ইহার রহস্য কি তাহার আলোচনার মধ্যে যাইবার প্রয়োজন কিছু নাই। ঋষিরা এইরূপ বলিয়াছেন, এবং আস্তিক হিন্দু বিশ্বাসও ইহাতে করেন। ইঁহাদের এই পুষ্টি ও তুষ্টি বিধানার্থে যে হোম-অনুষ্ঠান, তাহাই দেবযজ্ঞ।

নৃ-যজ্ঞ

মানুষ সকলেই আমাদের অতি আপন জন। নিজ নিজ গৃহে সকলেই নিজ নিজ অশনবসন আহরণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। কিন্তু নানাকর্ম্মে সকলকেই গৃহ ছাড়িয়া দূরে যাইতে হয়। এই ভাবে যে কেহ আমার গৃহেতে আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাহাকেই অন্নপানীয় ও আশ্রয় দানে আমাকে পরিতুষ্ট করিতে হইবে। তাই অতিথি সেবা নৃ-যজ্ঞের—অর্থাৎ নরসেবার প্রধান অঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু ভরণীয় বা প্রতিপাল্য যে কোনও ব্যক্তিকে অশনবসনাদি দানে সেবা করাও নৃ-যজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত। মনুসংহিতা তৃতীয় অধ্যায়ে, ১১৫ ও ১১৬ শ্লোকে এই নৃ-যজ্ঞ-প্রসঙ্গেই তাই আছে,—

অদত্ত্বা তু য এতেভ্যঃ পূর্ব্বং ভুঙ্‌ক্তেঽবিচক্ষণঃ।
স ভুঞ্জানো ন জানাতি শ্বগৃধ্রৈর্জগ্ধিমাত্মনঃ॥
ভুক্তবৎস্বপি বিপ্রেষু স্বেষু ভৃত্যেষু চৈবহি।
ভুঞ্জীয়াতাং ততঃ পশ্চাদবশিষ্টন্তু দম্পতী॥

অর্থাৎ যে অবিচক্ষণ ইহাদিগকে (অর্থাৎ পরিবারভুক্ত নববধূ, বালকবালিকা, রোগী, গর্ভিণী এবং অতিথি প্রভৃতিকে) ভোজন না করাইয়া অগ্রে নিজে ভোজন করে, তাহারা জানে না যে মরণের পর তাহার দেহ কুকুর গৃধ্র শৃগালাদির ভক্ষ্য হয়।

ব্রাহ্মণগণকে, জ্ঞাতি ও দাসাদি ভরণীয়গণকে ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে, গৃহস্থদম্পতী তাহাই ভোজন করিবেন।

দয়ায় ভিক্ষা দিয়া, অন্নসত্রাদি খুলিয়া, নিরন্ন মানুষকে অন্নদান করা যায়। কিন্তু আপনগৃহে যত্ন করিয়া আপন জনের মত অন্নদানাদিরূপ সেবায় সেব্য ও সেবক উভয়েরই যেরূপ তৃপ্তি ও আনন্দ হয়, অন্য কোনও ভাবে তাহা হয় না। নৃ-যজ্ঞ নামের সার্থকতা ইহাতেই হইয়াছে।

ভূত-যজ্ঞ

সকলের উপরে জ্ঞানমূর্ত্তি পরমেশ্বর, তারপর পিতৃগণ ও দেবগণ, সমান জৈব স্তরে অপর সব মানুষ এবং নিম্নতর স্তরে ইতর প্রাণিগণ—সকলের সঙ্গেই আমার সম্বন্ধ রহিয়াছে। এসম্বন্ধের যোগ আমাকে মনে রাখিতে হইবে, সেবায় সকলকেই তৃপ্ত আমাকে করিতে হইবে, যাহা দেয় তাহা আমাকে দিতে হইবে। দেওয়াতেই জীবন আমার কৃতার্থ হইবে। তাই ব্রহ্মযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ দেবযজ্ঞ ও নৃ-যজ্ঞই কেবল নহে, নিম্নতর প্রাণীদের সেবার জন্য ভূতযজ্ঞের ব্যবস্থাও হইয়াছে। সে ব্যবস্থা এই, যে নানাবিধ ভক্ষ্য শুদ্ধভাবে ও যত্নে স্থানে স্থানে রাখিতে হইবে। ইহাই ভূত-বলি। অভিরুচি মত ইহারা আসিয়া তাহা গ্রহণ করিবে।

গৃহস্থের ধর্ম্ম—নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াপদ্ধতি

এই পঞ্চযজ্ঞ ব্যতীত আধ্যাত্মিক চেতনা লাভের জন্য নির্দ্দিষ্ট কোনও পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে ভগবদুপাসনাও

সকলকে করিতে হইত। পঞ্চযজ্ঞ ও দৈনিক আহ্নিক ক্রিয়া নিত্য-কর্ম্মের মধ্যে ছিল। তা ছাড়া, বিশেষ সময়ে নানারূপ শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞের ব্যবস্থা ছিল। ব্রাহ্মণ আত্মীয় কুটুম্ব ও দরিদ্রজনকে ভোজনে এই সময়ে তৃপ্ত ও তুষ্ট করিতে হইত। এই সবকে নৈমিত্তিক ক্রিয়া বলা হইত।

প্রাচীনকাল হইতে আধুনিককাল পর্য্যন্ত নিত্যকর্ম্মের সকল বিধিবব্যস্থাদিতেই সাধু গৃহস্থের দৈনিক জীবনযাত্রার এইরূপ একটি ধারা দেখিতে পাওয়া যায়।

গৃহস্থ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে (রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতে) জাগরিত হইবেন। উপাস্য দেবতা ও গুরুকে মনে মনে পূজা ও প্রণাম করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও ইহাদের অবিরোধী কামের—অর্থাৎ দিবসে কি কি ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে, ধর্ম্মের অবিরোধে কি অর্থ অর্জ্জন করিতে হইবে এবং উভয়ের অবিরোধে কি কি কাম্য সাধন করিতে হইবে,—এই সব চিন্তা করিবেন। তারপর 'প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ' বলিয়া পৃথিবীকে প্রণাম করতঃ শয্যা-ত্যাগ করিবেন। শৌচক্রিয়াদি সমাপনান্তে স্নান তর্পণ ও প্রাতঃসন্ধ্যা করিবেন। এই হইল প্রাতঃকৃত্য।

তারপর অগ্নিহোত্র ও দেবপূজাদি করিয়া বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিতে হইবে। তারপর পোষ্যবর্গের * নিমিত্ত অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিবেন।

এই হইল পূর্ব্বাহ্ণ কৃত্য। ইহা শেষ হইলে মধ্যাহ্ন স্নান এবং মাধ্যাহ্নিক সন্ধ্যা করিতে হইবে। তারপর দেবযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ নৃ-যজ্ঞ ও ভূত-যজ্ঞ ইত্যাদি সমাধা করিয়া গৃহস্থ নিজে আহার করিবেন।

মধ্যাহ্ন কৃত্য শেষ হইলে গৃহস্থ অপরাহ্নের প্রথম ভাগে পুরাণ ইতিহাস ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি পাঠ করিবেন। দেবমন্দির দর্শন এবং স্বজন গনের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া আসিবেন।

---

* গুরু, পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তানবর্গ, ভৃত্যাদি, দরিদ্র জ্ঞাতিকুটুম্ব, রুগ্ন বৃদ্ধ ও অনাথ ব্যক্তিবর্গ এবং গৃহাগত অতিথি, ইঁহারা সকলেই পোষ্য।

তখন সায়াহ্ন উপস্থিত হইবে,—স্নান করিয়া গৃহস্থ সায়ংসন্ধ্যা করিবেন। তারপর আহার করিয়া, পারিবারিক বিষয়কর্ম্মাদি যাহা থাকে, তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন। শেষে শয়ন করিবেন।

ইতি মধ্যে বিশেষ বিশেষ যে কোনও কর্ম্মের প্রয়োজন উপস্থিত হইবে, তখনই তাহা সমাধা করিবেন। এসব সম্বন্ধে বিশেষ কোনও নিয়ম থাকিতে পারে না।

সাধু ব্রাহ্মণ গৃহস্থই সাধারণতঃ এই নিয়মে দৈনন্দিন জীবনযাপন করিতেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য গৃহস্থের পক্ষে ঠিক এইভাবে চলা সম্ভব হইত না। তবে প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন কালের প্রধান প্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলি তাঁহারাও সম্পন্ন করিতেন। অধ্যয়নাদির সময়ে নিজ নিজ বিহিত বিষয়কর্ম্মই তাঁহাদের বেশী দেখিতে হইত।

গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আদর্শ ও আধুনিক জীবন

প্রাচীন চারিটি আশ্রম বিভাগ এখন আর নাই *। কিন্তু পঞ্চযজ্ঞ এবং প্রাতঃকাল হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত গৃহস্থ জীবনের অন্যান্য নিত্য ক্রিয়ার একটা ধারা আধুনিককাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে, যদিও ঠিক এইরূপ বিধিতে আর এইরূপ একটা বাঁধা নিয়মে এখন তাহা সকলে সম্পাদন করেন না।

ত্রিসন্ধ্যা স্নান ও সন্ধ্যা আহ্নিক বহু নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য-জাতীয় সাধু গৃহস্থেরা করিয়া থাকেন। প্রত্যহ প্রাতঃস্নানের সময় তর্পণও কেহ কেহ করেন। আশ্বিন মাসে পিতৃপক্ষে এই তর্পণ বহু লোকেই করিয়া থাকেন। অগ্নিহোত্রাদি হোমে দেবযজ্ঞ কচিৎ অনুষ্ঠিত হয়,—কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে শালগ্রাম শিলার, শিবলিঙ্গের, গৃহে প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীনারায়ণাদি বিগ্রহের ও তান্ত্রিক পঞ্চোপাসকদের †

* পরবর্ত্তী শূদ্রের অধিকার শীর্ষক প্রবন্ধের শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

† অন্ত্যজজাতি ভিন্ন ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের আনুষ্ঠানিক হিন্দু গৃহস্থ সকলেই প্রায় কুলপরম্পরাক্রমে নিম্নলিখিত পঞ্চদেবতার যে কোনও একটিকে প্রধান

ইষ্টদেবতার পূজাই প্রচলিত হইয়াছে; এবং বহু লোকেই তাহা করিয়া থাকেন।

অতিথিসৎকারে ও এবং উৎসবাদি উপলক্ষে দীনদরিদ্রকে অন্নবস্ত্র দান প্রভৃতি কর্ম্মে নৃ-যজ্ঞের রীতি এখনও বর্ত্তমান আছে।

বেদাধ্যয়ন এখন অতি কমই হইয়া থাকে। তবে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার সময়ে চারিবেদের প্রথম চারিটি শ্লোক আবৃত্তি করিবার নিয়ম আছে, এবং 'ব্রহ্মযজ্ঞ'ই ইহাকে বলা হয়। বেদাধ্যয়ন লুপ্তপ্রায় হইলেও, গীতা, চণ্ডী, ভাগবত পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ অনেকেই প্রত্যহ কিছু কিছু পাঠ করিয়া থাকেন, এবং ইহাকে আধুনিক একরূপ ব্রহ্মযজ্ঞই বলা যাইতে পারে। বঙ্গীয় সমাজে ক্বচিৎ দৃষ্ট হইলেও, পশুপক্ষীদের জন্য শস্যবিকীরণ, মৎস্যাদির জন্য নদ্যাদি জলাশয়ে খাদ্য নিক্ষেপ, পিপীলিকাদির গর্ত্তের নিকটে গুড়শর্করাদি মিষ্ট দ্রব্য রক্ষা এবং গবাদি পশুর জন্য পানীয় জলের কুণ্ডস্থাপনার রীতি অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুদের মধ্যে অনেক স্থলেই দেখা যায়। ইহাই ভূতবলি। বঙ্গদেশে গোগ্রাসদান ও শিবাবলির প্রথা এখনও দুই এক স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

একেবারে আধুনিক যুগে স্বধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধার অবসানের সঙ্গে ইংরেজিশিক্ষিত সমাজের মধ্যে এই সব রীতি লোপ পাইতেছে

উপাস্য দেবতা বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। যথাসময়ে কুলগুরুর নিকটে দীক্ষিত হইয়া এই উপাসনা সকলে আরম্ভ করেন, এবং এই দেবতাকে ইষ্টদেবতা বলা হয়। পরমেশ্বরের প্রধান পঞ্চ বিভূতি বা সাকার মূর্ত্তি ইঁহারা। ইঁহাদের নাম গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি। উপাসকগণের নামও যথাক্রমে গাণপত্য, সৌর, বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত। দীক্ষিত বা অদীক্ষিত সকলেই শিবপূজা এবং দ্বিজগণ ইহার উপরে শালগ্রামশিলার পূজা করিয়া থাকেন। অন্ত্যজ ভিন্ন অপরাপর গৃহী হিন্দুর প্রধান একটি সামান্য লক্ষণও এই যে সকলেই প্রায় কুলপরম্পরাক্রমে কোনও না কোনও ভাবে এই পঞ্চদেবতার মধ্যে একজনের উপাসক। কখন কেমন করিয়া এই পঞ্চদেবতার উপাসনা প্রচলিত হইয়াছে, তার সম্বন্ধে পরবর্ত্তী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

বটে, কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্তও বহু লোকে এই সব অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতেন। পল্লী অঞ্চলে এখনও এইরূপ নিত্যকৃত্য কিছু কিছু অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

ব্যষ্টিজীবনে ধর্ম্মনীতির আদর্শ প্রতিষ্ঠা

ব্যষ্টিজীবনে এদেশে ধর্ম্মনীতির আদর্শপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস কি ভাবে হইয়াছিল, এই আশ্রম ধর্ম্মের—বিশেষতঃ ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য আশ্রমের অনুশাসনপদ্ধতি হইতে তাহার পরিচয় আমরা পাই। পূর্ব্বে র‍্যাসনালিজম্ ও ধর্ম্মনীতি নামক ১১শ প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে যে সব আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা হইতে সহজেই আমরা বুঝিতে পারিব, ধর্ম্মপথে মানবজীবনকে পরিচালিত করিবার যত কিছু পন্থা হইতে পারে, তাহার মধ্যে এই আশ্রম-ধর্ম্মানুশাসনের স্থান কত উচ্চে, এবং সাধু জীবনযাপনের যে আদর্শ ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শও আর কিছু বড় হইতে পারে না। এই আদর্শ-পালনে রাজশাসনে কি সমাজশাসনে কাহাকেও বাধ্য করা হইত না,—বাল্যাবধি শিক্ষাদীক্ষার এবং সাধুজীবনের সাধারণ দৃষ্টান্তের প্রভাবে, আপনাহইতেই, যাহার পক্ষে যত দূর সম্ভব, এই আদর্শধারার পথে মানুষ চলিত, চলিয়া সুখী হইত,—সেই সুখই এই পথে তাহাকে স্থির রাখিত। সকল নিয়মের অনুশাসন হইতে মুক্ত হইত মানব, শেষ সেই ভৈক্ষ্য আশ্রমে, যখন জীবনব্যাপী সাধনার ফল এই মুক্তির যোগ্য তাহাকে করিয়া তুলিত, এই মুক্তিতে আপন আত্মার কি লোকসমাজের অকল্যাণকর কোনও পথে যাইবার কোনও সম্ভাবনাই তাহার পক্ষে আর থাকিত না, সত্যই যখন যে আপনাতে নিত্য মুক্তস্বভাববান্ সচ্চিদানন্দ স্বরূপকে উপলব্ধি করিত।

৮। শূদ্রের অধিকার

আশ্রম ধর্ম্ম দ্বিজবর্ণত্রয়ের জন্য ব্যবস্থিত হয়। বর্ণ-ধর্ম্মে সামাজিক ও সাংসারিক কর্ম্মের অধিকারে পার্থক্য যাহাই নিরূপিত

হউক, যে জ্ঞান অর্জ্জনে এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় মানবধর্ম্মে পরম সিদ্ধি মানুষ লাভ করিতে পারে, তাহাতে প্রথম তিন বর্ণের সকলেরই সমান অধিকার ছিল, সুতরাং বিষয়কর্ম্মে এই অধিকারভেদ ইঁহাদের কাহারও পক্ষে আপত্তির বা অসন্তোষের কারণ কখনও হয় নাই, হইবার কথাও নয়। কারণ বিষয়কর্ম্মে উচ্চপ্রতিষ্ঠা লাভ করা অপেক্ষা তাহার মোহপাশ হইতে মুক্তিকেই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ মঙ্গল ও পরমসিদ্ধির লক্ষ্য বলিয়া এদেশে সকলে মনে করিয়াছেন, এবং সেই মঙ্গল ও সেই সিদ্ধিলাভ যে জ্ঞানের ও ধর্ম্মের সাধনায় হইতে পারে, আশ্রম ধর্ম্ম সেই সাধনারই পথ নির্দ্দেশ করিয়াছে, এবং তাহাতে দ্বিজবর্ণত্রয় সকলকেই সমান অধিকার দিয়াছে।

কিন্তু এই আশ্রমধর্ম্ম পালনে উচ্চতর তিন বর্ণের সঙ্গে সমান অধিকার শূদ্রের পক্ষে বিহিত হয় নাই।

আশ্রম ধর্ম্ম আরম্ভ হইত উপনয়ন সংস্কারের পর বেদাধ্যয়নে। এই সংস্কারে এবং বেদাধ্যয়নে শূদ্রের অধিকার ছিল না। বেদাধ্যয়নে যাহার অধিকার নাই, গৃহস্থরূপে সন্ধ্যা উপাসনা ও অগ্নিহোত্রাদি অন্যান্য বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠানেও যে তাহার অধিকার থাকে না, ইহা বলাই বাহুল্য। এই সব ধর্ম্মানুষ্ঠানে গৃহস্থ জীবন যাহার অতিবাহিত না হইবে, বানপ্রস্থ ব্রত গ্রহণের যোগ্যও সে হইতে পারে না; ভিক্ষু জীবনের উচ্চতম স্তরেও সে উঠিতে পারে না।

তবে শূদ্র সকলেই গৃহস্থ ছিল এবং গার্হস্থ্য আশ্রমের ধর্ম্মও কিছু কিছু পালন করিত। এই আশ্রমে দ্বিজ বর্ণত্রয়ের চরিত্র-নীতির আদর্শ যাহা ছিল, ঘনিষ্ঠ সংসর্গে তাঁহাদের মধ্যে থাকায় শূদ্রের চরিত্রনীতিও মোটামুটি সেই আদর্শের অনুরূপ হইয়া উঠিবার কথা। ইঁহাদের পক্ষে যাহা সদাচার ছিল, সেই সদাচার শূদ্রও যতদুর সাধ্য পালন করিত; করিয়া ইঁহাদের ভাবাপন্নও হইত।

শুচিরুৎকৃষ্টশুশ্রূষুর্মৃদুবাগনহঙ্কৃতঃ।
ব্রাহ্মণাদ্যাশ্রয়োনিত্যমুৎকৃষ্টাং জাতিমশ্নুতে ॥
(মনু—৯,৩৩৫)

অর্থাৎ, ব্যাহ্যভ্যন্তর শুচি, উৎকৃষ্ট জাতির সেবক, মিষ্টভাষী, নিরহঙ্কার এবং ব্রাহ্মণাদির নিত্য আশ্রিত শূদ্র ক্রমে উৎকৃষ্ট জাতি-ভাবাপন্ন হয়।

মনুসংহিতায় আর একটি বচন দেখা যায়,—

আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রশ্চ গোপালো দাসনাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥
(মনু—৪,২৫৩)

অর্থাৎ আর্দ্ধিক (আধুনিক বরগাদারী নিয়মের ন্যায় বন্দোবস্তে অর্দ্ধেক উপস্বত্বের বিনিময়ে যাহারা কাহারও জমিতে কৃষিকর্ম্ম সম্পাদন করে), কুলমিত্র, গোপাল, দাস ও নাপিত এই সব শূদ্রের অন্ন ভোজন করা যায়। যে যাহার নিকট আত্মনিবেদন করিয়াছে, তাহার অন্নও ভোজন করা যায়।

সদাচারপরায়ণ না হইলে, শূদ্রের এই অন্ন গ্রহণ দ্বিজাতির পক্ষে অবশ্য সম্ভব হইত না। তবে এই অন্ন পকান্ন না হইতেও পারে। কিন্তু আর একটি বচনে এই দ্বিধাও কাটিয়া যায়।

যথা—নাদ্যাচ্ছূদ্রস্য পকান্নং বিদ্বানশ্রাদ্ধিনো দ্বিজঃ।
(মনু—৪,২২৩)

অর্থাৎ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ অশ্রাদ্ধী শূদ্রের পকান্ন গ্রহণ করিবেন না। তার অর্থ, শ্রাদ্ধী হইলে তাহার অন্ন গ্রহণ করা যাইতে পারে।

মনুসংহিতার প্রামাণিক টীকাকার আচার্য্য কুল্লুক ভট্ট শ্রাদ্ধাদি পঞ্চযজ্ঞবিহীন বলিয়া 'অশ্রাদ্ধী' এই বিশেষণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইহা হইতে আরও একটি ইঙ্গিত আমরা পাই এই যে গৃহস্থের নিত্যকর্ত্তব্য পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান এইযুগে অন্ততঃ শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল না।

কিন্তু বেদ্যাধ্যয়ন রূপ ব্রহ্মযজ্ঞ কি প্রকারে তাঁহারা অনুষ্ঠান করিতেন? উত্তরে বলা যাইতে পারে, বেদাধ্যয়নই নিষিদ্ধ ছিল, অধ্যয়ন মাত্রই নহে। মহাভারত ও পুরাণ পঞ্চমবেদ বলিয়া কথিত হইত, এবং এই সব গ্রন্থাধ্যয়নে শূদ্রের কেবল যে অধিকারই ছিল তাহা নয়, আচার্য্যগণ বলিয়াছেন, ইহাতেই তাহারা বেদপাঠের ফলভোগী হইবে। তর্পণ ও শ্রাদ্ধে পিতৃযজ্ঞ শূদ্রেরা বহুকাল যাবৎ করিতেছে, কেবল কতিপয় বৈদিক মন্ত্রের উচ্চারণ মাত্র তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। দেবযজ্ঞও সেই ভাবে সম্ভবতঃ তাহারা সম্পাদন করিত। নৃ-যজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ অতি সহজ অনুষ্ঠান। বৈদিক মন্ত্র ইহাতে কিছু লাগে না; সকলেই করিতে পারে।

শূদ্র স্বভাবের লক্ষণ কি এবং দৈহিক শ্রমসাধ্য কর্ম্মে উচ্চতর বর্ণত্রয়ের সেবা কেন যে প্রধানতঃ শূদ্রবর্ণের কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, পূর্ব্বে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। যে কারণে, স্বাভাবিক উচ্চতর যে সব শক্তির অভাবে, উচ্চতর সামাজিক কর্ম্মে তাহাদের অধিকার স্বীকৃত হয় না, উচ্চতম জ্ঞানবিদ্যার অনুশীলনে এবং তদনুরূপ ধর্ম্ম সাধনার অধিকারও ঠিক সেই কারণেই, উপযুক্ত সেই সব শক্তির অভাবহেতুই, স্বীকৃত না হইবার কথা। কর্ম্মক্ষেত্রে অধিকার ভেদের নীতি মানিলে, বিদ্যার ও সাধনার ক্ষেত্রেও সেই ভেদকে একেবারে অসঙ্গত বলা যায় না।

যে বিদ্যার অনুশীলন যে করিবে, তাহা গ্রহণ করিবার মত মনঃশক্তি তাহার থাকা চাই। গ্রহণ করিয়া সেই বিদ্যার জ্যোতিতে আধ্যাত্মিক চেতনা স্ফুরিত হইয়া উঠিলেই, তাহার অনুরূপ সাধন অনুষ্ঠানাদি সম্পাদনে অধিকারী সে হইতে পারে। আজকাল 'বেদ পড়া' 'যাগ-যজ্ঞ করা' যত সহজ ও যেমন তেমন একটা কাজ বলিয়া আমরা মনে করি, তখন সেরূপ কেহ মনে করিতেন না। যমনিয়মের অনুবর্ত্তী কঠোরব্রতী ব্রহ্মচারী ভাবে দীর্ঘকাল গুরুগৃহে থাকিয়া বিনীত ও গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ হইয়া শিষ্যকে বেদাধ্যয়ন করিতে হইত। ইহার

উচ্চতম সব তত্ত্বের সত্যকে ধারণা করিয়া নিতে চিত্তের যেরূপ নির্ম্মলতা ও মনঃশক্তির যেরূপ বিকাশ আবশ্যক, এইরূপ ব্রতপরায়ণ শিষ্যেই তাহা সম্ভব হয়।

মন্ত্র সমূহ ঠিক যে ভাষায় প্রাচীন ঋষিদের মুখে উচ্চারিত হইয়াছিল, সেই ভাষাতেই সংহিতাচতুষ্টয়ে যত্নে সঙ্কলিত হয়। কেবল ভাষায় শব্দে বা কথায় নহে, প্রত্যেকটি শব্দের উচ্চারণে, স্বরের মাত্রাগুলিতে পর্য্যন্ত, আদিম সেই বিশুদ্ধতা যাহাতে রক্ষিত হয়, সে বিষয়েও আচার্য্যগণ যারপরনাই অবহিত ছিলেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, এই সব মন্ত্রের শক্তি কেবল ভাব-গত নহে, শব্দ-গতও বটে, এবং শব্দের উচ্চারণ বিশুদ্ধ না হইলে মন্ত্রভাবে তাহা ব্যর্থ হয়। লৌকিক ভাষা যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হয়, শব্দের উচ্চারণপ্রণালীও সঙ্গে সঙ্গে অন্যরূপ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের মধ্যেও গুরুশিষ্যপরম্পরায় বৈদিকমন্ত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষিত হইত। সংস্কৃত ভাষা বলিয়া যে ভাষার সঙ্গে সাধারণতঃ আমরা এখন পরিচিত, রামায়ণ-মহাভারত পুরাণাদি গ্রন্থ যে ভাষায় রচিত হয়, বেদব্যাসের যুগেও তাহাই সাধারণ বিদ্যার ভাষা ছিল। বৈদিক মন্ত্রের ভাষা তাহা অপেক্ষা অনেক প্রাচীনতর এমন এক ভাষা এবং শব্দের উচ্চারণপ্রণালীও এত ভিন্ন রকমের ছিল, যে প্রচলিত এই সংস্কৃতে বড় পণ্ডিতও কেহ পৃথক্ ভাবে নিরুক্ত ছন্দ ইত্যাদি বেদাঙ্গ নামক শাস্ত্রাদি অধিগত না করিয়া এই মন্ত্রসংহিতা অধ্যয়ন করিতে পারিতেন না। সুতরাং ক্রমে যে বেদাধ্যয়ন অতি আয়াসসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল এবং সময়ও তাহাতে অনেক বেশী লাগিত, ইহা বলাই বাহুল্য।

এই সব মন্ত্রের প্রয়োগ হইত যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে। ইহার বিশেষ বিদ্যা বা যজ্ঞবিদ্যা বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড নামে পরিচিত, এবং 'ব্রাহ্মণ' নামক বৈদিক এক শ্রেণীর যে গ্রন্থ আছে, তাহাই এই যজ্ঞবিদ্যার শাস্ত্র, কর্ম্মকাণ্ডের আধার।

যজ্ঞের এই কর্ম্মপদ্ধতিও অতি জটিল ও সূক্ষ্মক্রিয়া-বহুল সব অনুষ্ঠান। মন্ত্রের যেমন শব্দগত একটা শক্তির রহস্যে বেদবিদ্‌-গণের বিশ্বাস ছিল, যজ্ঞেরও সেইরূপ ক্রিয়াগত একটা শক্তিরহস্য তাঁহারা মানিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন, বিশুদ্ধভাবে যথাবিহিত মন্ত্র-উচ্চারণ করিয়া অবিকৃত ভাবে বিহিত সব ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারিলে, এমন একটা দৈবী শক্তির সৃষ্টি তাহা হইতে হয়, যাহার বলে অসাধ্যসাধন করা যাইতে পারে। মন্ত্রবলে যজ্ঞক্রিয়া হইতে সৃষ্ট এই সব শক্তিই বাস্তব দেবতা, এমন একটা বিশ্বাসও ছিল। এইরূপ বিশ্বাসের কোনও দার্শনিক কি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি না, তাহার পরীক্ষা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন, তবে এই বিশ্বাস তাঁহাদের ছিল। সুতরাং যেমন মন্ত্রের বিশুদ্ধ আবৃত্তি, তেমনই এই সব ক্রিয়ার অবিকৃত অনুবৃত্তি, উভয়ই সমান ভাবে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা তাঁহারা করিতেন। কালক্রমে, তাই, যেমন বেদ অধ্যয়ন, তেমনই বৈদিক যজ্ঞবিদ্যার জ্ঞানলাভ ও অনুষ্ঠান সম্পাদন, উভয়ই এমন দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠে, যে দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর আয়াস ব্যতীত ইহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে কেহ পারিতেন না। তাহাও অতি মেধাবী শিষ্য ব্যতীত যার তার পক্ষে সম্ভব হইত না। যদৃচ্ছা ক্রমে পল্লবগ্রাহিতা মাত্র ইহাতে অনুমোদিত হইত না।

শূদ্রের পক্ষে বেদাধ্যয়ন ও বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান কেন যে নিষিদ্ধ হয়, ইহার পর তাহা আর বেশী করিয়া কাহাকেও বুঝাইতে বোধ হয় হইবে না। বহু নারী বৈদিকমন্ত্রের ঋষি ছিলেন। প্রাচীনকালে ব্রহ্মবিদ্যার তত্ত্বালোচনাও গার্গী মৈত্রেয়ী প্রভৃতি নারীরা করিতেন। কিন্তু যেমন শূদ্রের পক্ষে, ক্রমে তেমনই নারীর পক্ষেও বেদাধ্যায়ন নিষিদ্ধ হয়। কারণ পত্নী ও জননীরূপে যে বয়সে গৃহধর্ম্মে তাঁহাদের স্থিত হইতে হইত, তাহাতে এরূপ কঠোর আয়াসে এত দীর্ঘকাল এই সব বিদ্যার অনুশীলন তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইত না। *

* সাধারণ বিধি অবস্থানুসারে এইরূপ ছিল, তবে অসাধারণ প্রতিভা-শালিনী কোনও নারী যে উচ্চ এই বিদ্যার অনুশীলন কখনও করিতেন না, ইহা

বেদাধ্যয়ন ও বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান ক্রমে আরও দুরূহ হইয়া উঠে, এবং ব্রাহ্মণের মধ্যেও বিরল হইয়া পড়ে। সন্ধ্যা-উপাসনা, দশ সংস্কার, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া এবং ব্রতপূজাঙ্গীয় বিশেষ বিশেষ হোম, এইরূপ কোনও কোনও অনুষ্ঠান কোনও মতে সম্পাদন করিবার উপযোগী বিদ্যা যেটুকু যাজকের পক্ষে একান্ত আবশ্যক, তাহার উপরে বৈদিক বিদ্যার আলোচনা কচিৎ কোথাও হইত, সাধারণতঃ একরূপ লোপ পায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ইতিমধ্যে পুরাণের বহুলপ্রচার হয়। ভাগবত শক্তির লীলাবিভূতি-মূলক বহু আখ্যানে বৈদিক ব্রহ্মবিদ্যার সব তত্ত্ব অতি সহজ ভাবে ও ভাষায় এই সব পুরাণে বিবৃত হয়। পৌরাণিক ও তান্ত্রিক পূজাদির আকারে নূতন নূতন অনুষ্ঠান পদ্ধতি ও সাধনমার্গও প্রচলিত হইয়া উঠে। বেদ্যাধ্যয়ন ও বৈদিক অনুষ্ঠানাদি যথাসম্ভব ত্যাগ করিয়া, ক্রমে এই পুরাণাদির অধ্যয়নে ও পুরাণানুমত অনুষ্ঠানাদির সম্পাদনে এবং তন্ত্রানুমত সাধনপদ্ধতির অনুবর্ত্তনের দিকেই সকলে আকৃষ্ট হইতে থাকেন।

বলা যায় না। উত্তর রামচরিত নাটকে এইরূপ এক নারীর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইঁহার নাম আত্রেয়ী; বাল্মীকির তপোবনে ইনি বেদাধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু রামায়ণ রচনার পর আশ্রমবাসী সকলেই বেদাধ্যয়নাদি একরূপ ত্যাগ করিয়া অবিরত কেবল রামায়ণ গানেই মত্ত থাকিতেন। তাই বিরক্ত হইয়া ইনি বেদাধ্যয়নের সুযোগ লাভের আশায় দণ্ডকারণ্যে মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমাভিমুখে একাকিনী যাত্রা করেন। দণ্ডকারণ্যে কেবল পৌঁছিয়াছেন, এই অবস্থায় নাটকে তাঁহার প্রথম আবির্ভাব দেখা যায়। একাকিনী এক নারী কেবল বেদাধ্যয়নের আগ্রহেই বাল্মীকির তপোবন হইতে দণ্ডকারণ্য পর্য্যন্ত গিয়াছেন, এরূপ কল্পনাও যে দেশের কবি করিতে পারেন, সে দেশে এরূপ নারীও যে ছিলেন, একথা বলাই বাহুল্য। উন্নতচরিত্রবান্ শূদ্রও যে প্রাচীনকালে বেদাধ্যয়নে একেবারে বঞ্চিত ছিলেন না, সত্যকাম জাবালি তাহার বড় একটি দৃষ্টান্ত।

এক যাজন ক্রিয়া ব্যতীত ইহাতে দ্বিজে শূদ্রে অধিকার ভেদ এক রকম ছিল না বলিলেই হয়।

বেদাধ্যয়ন ও বৈদিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ। কিন্তু শূদ্র সমাজের বড় একটি অঙ্গ; একেবারে অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও ধর্ম্মানুশালনবিমুখ তাঁহারা থাকিবে, ইহা বাঞ্ছনীয় কখনও হইতে পারে না। তাই পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পঞ্চম বেদ নামে মহাভারত ও পুরাণাদি শাস্ত্র তাহাদের মধ্যে প্রচারিত হয়। সাধারণতঃ পাঠ, ব্যাখ্যা ও কথকতা প্রভৃতি উপায়ে ইহার সব কাহিনী ও তত্ত্ব সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইত। যথোপযুক্ত বিদ্যা অধিগত করিতে পারিলে অধ্যয়নেরও বাধা কাহারও ছিল না। তবে এখনকার মত পুস্তক অধ্যয়ন সে যুগে অত সহজ ছিল না। উচ্চতর সব বিদ্যার অধ্যয়নও মুখে মুখেই বেশী হইত।

বেদ নামে সুবৃহৎ যে শাস্ত্র এদেশে রহিয়াছে এবং তাহা যে বিদ্যার আধার, মোটামুটি তাহার তিনটি ভাগ আমরা ধরিয়া নিতে পারি,—মন্ত্রবিদ্যা, যজ্ঞবিদ্যা ও অধ্যাত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা *।

মন্ত্রবিদ্যার আধার ঋক্ সাম যজুঃ ও অথর্ব্ব এই সংহিতাচতুষ্টয়। যজ্ঞবিদ্যার আধার এই চতুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণ শাখা—কর্ম্মকাণ্ড নামে যাহা পরিচিত। এবং ব্রহ্মবিদ্যার আধার উপনিষৎ সমূহ—জ্ঞানকাণ্ড যাহাকে বলা হয়।

মন্ত্র বিদ্যা ও যজ্ঞ বিদ্যা অতি দুরূহ দুইটি বিশেষ বিদ্যা (কতকটা technical বিদ্যার মত), এবং ইহাও আমরা দেখিয়াছি, এই দুই বিদ্যা অধিকার করা ক্রমে কিরূপ কঠিন হইয়া উঠে। ব্রহ্মবিদ্যার সেরূপ বিশেষত্ব কিছু নাই। সাধারণ বিদ্যা বলিতে অধুনা আমরা যাহা বুঝি,

---

* অবশ্য মন্ত্র ও যজ্ঞ অর্থেও ব্রহ্ম শব্দটির প্রয়োগ আছে। কিন্তু পরমাত্মা এই অর্থে ইহার বিশেষ প্রয়োগই সমধিক প্রচলিত, এবং ব্রহ্মবিদ্যা এই পরামাত্মা-সম্বন্ধীয় বিদ্যা বলিয়াই এখানে বুঝিতে হইবে। এই অর্থে ব্রহ্মবিদ্যা কথাটি ব্যবহারও অনেকে করিয়া থাকেন।

ইহা অনেকটা সেই জাতীয় বিদ্যা। উচ্চতম সব তত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করা, তাহার সব সত্যকে দর্শন করা, যতই উচ্চতর ধী-শক্তির ও সাধনার সাপেক্ষ হউক, ইহার কিছু না কিছু ভাব সকলেই গ্রহণ করিতে পারে; সহজ কথায় বুঝাইলে বুদ্ধিতেও তত্ত্বের অনেক কথা বুঝিতে পারে। যাহার যেরূপ বা যতটা স্বাভাবিক অধিকার আছে, সেই ভাবে ততটা এই ব্রহ্মবিদ্যার তত্ত্ব তাহার কাছে উপস্থিত করাও যাইতে পারে। ঈশ্বরোপাসনা যে যে ভাবেই করুক, সকলকেই এই সব ভাব কিছু না কিছু গ্রহণ করিতে হইবে এবং তত্ত্বের কথাও কিছু না কিছু বুঝিতে হইবে। নতুবা উপাসনাই তাহার হয় না।

পঞ্চম বেদ নামে পরিচিত মহাভারতে ও পুরাণে এই ব্রহ্মবিদ্যার সকল তত্ত্বই নানা ভাবে বিবৃত করা হইয়াছে, এবং সহজ বা স্বাভাবিক গুণে যে যাহা গ্রহণ করিতে পারে, তাহা করিবার পক্ষেও কোনও বাধা নাই, কারণ অসীম এই জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার সকলের কাছেই সমান উন্মুক্ত। বৈদিক ব্রহ্মবিদ্যা বা জ্ঞানকাণ্ডের সারসংগ্রহ যে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, তাহাও এই মহাভারতেরই অন্তর্ভুক্ত *।

এই মহাভারত পাঠে ও গীতাতত্ত্ব শ্রবণে কি অধ্যয়নে শূদ্রের কোনও বাধা নাই।

ভাগবত পুরাণেও ভগবত্তত্ত্বের উচ্চতম ও গভীরতম সব সত্য মুক্ত ও বিশদ ভাবে বর্ণিত হইইাছে; কিছুই চাপিয়া ঢাকিয়া রাখা হয় নাই। ইহাও সকলের সমান অধিগম্য।

ইহার তুলনায় বেদের মন্ত্রবিদ্যা ও যজ্ঞবিদ্যা এমন কিছু নয়, যাহা না জানিলে মনুষ্যত্বের বিকাশে কাহারও কোনও বাধা কিছু হইতে পারে। দুরূহ বলিয়া এই দুই বিদ্যার যাঁহারা অধিকারী, তাঁহাদেরও একরূপ অধিকারবহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে।

---

* সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থোবৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥
(গীতা মাহাত্ম্যম্, ৫ম শ্লোক)

তবে এই দুই বিদ্যার সঙ্গে আধ্যাত্মিক সাধনার ও ভগবদুপাসনার অতি নিকট এক সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই সাধনার ও উপাসনার উচ্চতর কোনও কোনও পন্থা এই দুই বিদ্যার মধ্যেই রহিয়াছে। কিন্তু এই সব বিদ্যা যেমন দুরূহ হইয়া উঠে, ইহার সাধনপ্রণালী ও যজনাঙ্গীয় অনুষ্ঠানাদিও ক্রমে পরিত্যক্ত হইতে থাকে,—পৌরাণিক ও তান্ত্রিক নানা প্রকার পূজা ও সাধনপদ্ধতি তাহার স্থান অধিকার করিতে থাকে। কিছু পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, ব্রাহ্মণাদি দ্বিজবর্ণত্রয়ও এই সব সাধনার দিকেই ক্রমে অধিকতর আকৃষ্ট হইতে থাকেন। পূজা জপ ও নামকীর্ত্তন—নূতন এই সব সাধনার প্রধান অঙ্গ। এসব সাধনার মধ্যে যাজনাঙ্গ ক্রিয়া যাহা, চিরাচরিত রীতি অনুসারে তাহা সাধারণতঃ ব্রাহ্মণের অধিকারেই থাকে, কিন্তু যজনাঙ্গে অর্থাৎ আত্মপক্ষে নিজ নিজ ইষ্টদেবতাদির পূজায়, মন্ত্রজপে ও নামকীর্ত্তনে, সকলেরই সমান অধিকার স্বীকৃত হয়। ক্রমে কখন কি ভাবে এই সব বিদ্যা ও নূতন এই সব সাধনপন্থা সকলের সমান অধিগম্য হয়, নির্ণয় করা সহজ নয়। অনেকে বলেন, বৌদ্ধধর্ম্মই প্রথমে জ্ঞানার্জ্জনে ও আধ্যাত্মিক সাধনায় দ্বিজশূদ্র নির্ব্বিশেষে সকলের সমান অধিকার স্বীকার করেন; এবং বৌদ্ধযুগের পরে যখন হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান হয়, তখন হইতে এই সব বিদ্যা এই ভাবে সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইতে থাকে, এবং পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মতের সাধনপ্রণালীরও প্রবর্ত্তন হয়। তা হউক, যখনই হইয়া থাক, ক্রমে উচ্চতম বিদ্যার ও সাধনার অধিকার আশূদ্র ব্রাহ্মণ সকলেই পাইয়াছেন, এবং মানবত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার যাহা, মনুষ্যত্বের সিদ্ধিই যাহার উপরে নির্ভর করে, সেই সব বিষয়ে উচ্চ নীচ ভেদও হিন্দুসমাজের মধ্যে ক্রমে লোপ হইয়া যায়।

এদিকে পুরুষ পরম্পরা ক্রমে দ্বিজবর্ণত্রয়ের অতি নিকট সংসর্গে থাকিয়া তাঁহাদের সদাচারের অনুবর্ত্তনে আদিম শূদ্রবর্ণের মধ্যেও ক্রমে অনেকে অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়া উঠেন। বহু বৈশ্যও যে উপনয়ন সংস্কার ও বেদাধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া শূদ্রত্বের পর্য্যায়ে

পড়েন, পূর্ব্বে ২য় পরিচ্ছেদে তাহাও আমরা দেখিয়াছি। সংস্কার ত্যাগে ও ক্রিয়ালোপে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণও কেহ কেহ ব্রাত্য হইয়া শূদ্রত্ব লাভ করেন। ক্রিয়াবিহীন হইলেও মনঃশক্তিতে ইঁহারা উন্নত ছিলেন, সুতরাং ইহাদের এই অবনয়ন আদিম শূদ্রবর্ণকেও অনেক উন্নত করিয়া তোলে।

পৌরাণিক যুগ বলিতে প্রাগ্‌বৌদ্ধ কি পরবৌদ্ধ যে যুগই বুঝা যাউক, গণপতি সূর্য্য বিষ্ণু শিব ও দুর্গা বা শক্তি—ভগবদ্‌বিভূতির প্রধান পাঁচটি রূপ এই পঞ্চ দেবতার পূজা ভগবদুপাসনার প্রধান লক্ষণ এই সময়ে হইয়া দাঁড়ায়। ইহার কোনও না কোনও একটিকে ইষ্টদেবতা বলিয়া সকলে গ্রহণ করিতেন, এবং প্রধানতঃ তাহারই উপাসনায় একাগ্র হইয়া ভগবদ্‌যোগসিদ্ধি লাভ করিতে চেষ্টা করিতেন। এই পঞ্চদেবতা হইতে গাণপত্য, সৌর, বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত নামে পাঁচটি যে প্রধান উপাসক সম্প্রদায়ও হয়, ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদ তাহার মধ্যে কিছু ছিল না। যে বর্ণের যে জাতিই যাঁহারা হউন, কুলপরম্পরা ক্রমে উপাসক ভাবে ইহার কোনও না কোনও সম্প্রদায়-ভুক্ত সকলে ছিলেন। ইহাতেও এমন কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না যে যার যার কৌলিকপদ্ধতি ধরিয়াই চিরকাল সকলকে চলিতে হইবে। কাহারও ইচ্ছা হইলে কি ভাল লাগিলে কৌলিকপদ্ধতি ত্যাগ করিয়া অন্য কোনও পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করিতে পারিতেন। এই পঞ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণব ও শাক্ত এই তিনটি সম্প্রদায়ই প্রধান হইয়া উঠেন, এবং ভক্তি মার্গে ও জ্ঞান মার্গে নানারূপ আচারে নানা রকম উপাসনা প্রণালীও ইঁহাদের মধ্যে দেখা দেয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৈদিক মন্ত্রবিদ্যা ও যজ্ঞবিদ্যা ক্রমেই দুরধিগম্য ও অপ্রচলিত হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু নূতন এক মন্ত্রবিদ্যা ও সাধন-বিদ্যার আবির্ভাব এই সময়ে ঘটে, এবং সাধনাঙ্গীয় হিন্দুধর্ম্ম বলিতে এখন আমরা যাহা বুঝি, তাহার পদ্ধতি প্রধানতঃ নূতন এই বিদ্যার প্রভাবে এমন নূতন এক আকারে গড়িয়া উঠে, যাহা বৈদিক আকার

হইতে অনেকটা ভিন্ন রকমের এবং যাহার মধ্যে বৈদিকপদ্ধতি একরূপ আত্মসমর্পণ করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এই বিস্তার শাস্ত্রই সাধারণতঃ 'তন্ত্র' নামে পরিচিত। কেহ কেহ ইহাকে 'আগম' শাস্ত্রও বলিয়া থাকেন। আপ্ত বাক্য মাত্রই আগম এবং এই হিসাবে বেদকেও আগম বলা যাইতে পারে। কিন্তু ব্যবহারিক প্রয়োগে এই নাম তন্ত্রের সঙ্গেই যুক্ত হইয়াছে। তত্ত্বাঙ্গে তন্ত্র মোটের উপর বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনের মতই অনুবর্ত্তন করিয়া চলিয়াছেন। তান্ত্রিক শিবশক্তি তত্ত্বকে বৈদান্তিক ব্রহ্মমায়া তত্ত্বের এবং সাংখ্য মতের পুরুষপ্রকৃতি তত্ত্বের উচ্চতর এক পরিণতি বলা যাইতে পারে। ইহার বিশেষত্ব যাহা তাহা ইহার মন্ত্রবিদ্যায় ও সাধন বিদ্যায় দেখা যায়, এবং ইহাই তান্ত্রিকমার্গকে বৈদিক মার্গ হইতে বিশিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। বৈদিক মার্গ হইতে ভিন্নরূপ একটি সাধনমার্গ বহুদিন হইতেই প্রচলিত ছিল, ইহা যোগমার্গ নামে পরিচিত। পাতঞ্জল দর্শনে ইহার একটি পদ্ধতির বিবৃতি আছে, এবং তাহাই এই দর্শনের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। ইহা রাজযোগ নামে পরিচিত। লয়যোগ, হঠযোগ ও মন্ত্রযোগ নামে আরও কয়েক প্রকার যোগপদ্ধতির প্রবর্ত্তন হয়। তান্ত্রিক সাধনায় মন্ত্রবিদ্যার প্রয়োগে সাধারণতঃ এই সব যোগমার্গের অনুবর্ত্তন করা হয়। ইহার কোনও কোনও প্রকার হয়ত তন্ত্র হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে।

সাধনাঙ্গে এই পার্থক্যের মধ্যেও দৈনিক উপাসনার সাধারণ রীতি বৈদিক পদ্ধতির অনুকরণেই নির্ণীত হয়। বৈদিক ত্রি-সন্ধ্যার অনুকরণে তান্ত্রিক ত্রি-সন্ধ্যার ব্যবস্থা হয়। বৈদিক সবিতৃ-গায়ত্রীর অনুকরণে তান্ত্রিক মতে উপাস্য দেবগণের পৃথক্ পৃথক্ গায়ত্রীও প্রচলিত হয়। বৈদিক পূর্ব্বাহ্নকৃত্য অগ্নিহোত্রাদি দেবযজ্ঞের স্থলে তান্ত্রিক মতে ইষ্টদেবতার পূজা প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার লক্ষ্য এরূপ ছিলনা যে বৈদিক উপাসনা পদ্ধতিকে লোপ করিয়া তাহার উপরে তান্ত্রিক উপাসনা পদ্ধতিকে বসাইতে হইবে। বৈদিক

উপাসনায় দ্বিজবর্ণত্রয়ের পুরুষদের মাত্র অধিকার ছিল। স্ত্রী ও শূদ্রের ছিল না। ইঁহাদের এই অধিকারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করিয়া তান্ত্রিক আচার্য্যগণ দ্বিজ, শূদ্র স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সর্ব্ব-সাধারণের জন্য পৃথক্ এই পদ্ধতির ব্যবস্থা করেন। দ্বিজ বর্ণের জন্য পৃথক্ এই ব্যবস্থা মাত্র হয় যে তাঁহারা বৈদিক মতে সন্ধ্যাবন্দনাদি আগে করিয়া পরে তান্ত্রিক মতে আহ্নিক ক্রিয়াদি নির্ব্বাহ করিবেন। কিন্তু তান্ত্রিক প্রভাব এমনই প্রধান হইয়া উঠে, যে বিহিত বৈদিক ক্রিয়া যথাসম্ভব সংক্ষেপে নির্ব্বাহ করিয়া তান্ত্রিকপদ্ধতিতে ইষ্টদেবতার উপাসনার দিকেই অধিকতর আকৃষ্ট সকলে হইয়া উঠেন।

দ্বিবিধ এই পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলক অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। প্রসঙ্গতঃ সংক্ষেপে যে সব কথার অবতারণা করা হইল, তাহাই হয়ত অনেকের পক্ষে জটিল ও বিরক্তিকর বলিয়া মনে হইতে পারে। তবে মোটের উপর এই কথা বলা যাইতে পারে, যে বৈদিক মন্ত্রবিদ্যা যজ্ঞবিদ্যা ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি এবং তান্ত্রিক মন্ত্রবিদ্যা সাধনবিদ্যা ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি—এই উভয়ের তুলনা যদি কেহ করেন, তান্ত্রিক এই বিদ্যা ও পদ্ধতিকে বৈদিক বিদ্যা ও পদ্ধতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বই নিকৃষ্ট বলিয়া কেহ সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন না। বরং সাধনাঙ্গীয় হিন্দুধর্ম্মের উচ্চতর এক পরিণতি বলিয়াই মনে করিবেন, যাহার মধ্যে প্রাচীন বহু নীতির আশ্চর্য্য একটা সমন্বয় হইয়াছে; অথচ বৈদিক মন্ত্রবিদ্যা ও যজ্ঞবিদ্যা অপেক্ষা অনেক অল্পায়াসে ও অল্পসময়ে ইহা আয়ত্ত করা যায়। তান্ত্রিক আচার্য্যগণ তাই বোধ হয় পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, কলিতে আগমোক্ত সাধনাই শ্রেষ্ঠসাধনা এবং ইহাতেই মানব মোক্ষলাভ করিবে

উপনয়ন রূপ বৈদিক দীক্ষায় নারীর ও শূদ্রের অধিকার নাই। কিন্তু তান্ত্রিকদীক্ষায় সকলেরই সমান অধিকার। তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদির লক্ষ্য সাধনমার্গে নিম্ন হইতে ক্রমে উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিয়া শেষে ব্রাহ্মসারূপ্য লাভ করা।

দীক্ষার পর কোন স্তরের সাধনাই কাহারও পক্ষে নিষিদ্ধ নহে, স্বাভাবিক শক্তির অধিকারে যে যতদূর উঠিতে পারে, উঠিবে,—কোনও বাধা তাহাতে নাই।

প্রণবাদি সামান্য দুই একটা বৈদিক মন্ত্রের উচ্চারণ ব্যতীত তান্ত্রিক সন্ধ্যা-বন্দনাদি ক্রিয়ায়, পূজায়, জপে, আর কোনও বাধা কাহারও নাই। প্রাচীন বৈদিক ও স্মার্ত্ত আচার্য্যগণের অনুশাসনের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই যেন সামান্য এই বাধাটুকু তান্ত্রিক আচার্য্যগণ রাখিয়া দিয়াছেন। তান্ত্রিক সাধনার তত্ত্ব যাহা তাহাতে এই কয়েকটি মন্ত্র বাদ দিলে সাধন মার্গে উন্নতি ও সিদ্ধির পথে কিছুই বাধা হয় না। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে আবার তান্ত্রিক প্রণব 'হ্রীং' এই মন্ত্রকে বৈদিক প্রণব 'ওঁ' এই মন্ত্রের পরিবর্ত্তে সর্ব্বথা ব্যবহার করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে *।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনুষ্ঠানাদিতে যজনসম্বন্ধীয় কর্ম্মেই সকলের সমান অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাজনাঙ্গীয় কর্ম্মে নহে। ইহাতে ব্রাহ্মণের বিশিষ্ট অধিকার প্রাচীন নীতির অনুবর্ত্তিতায় তন্ত্রও স্বীকার করিয়াছেন।

ধর্ম্মানুষ্ঠান সাধারণতঃ তিন প্রকারের বলিয়া স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। যজনাঙ্গীয় দৈনিক উপাসনা নিত্য কর্ম্মের মধ্যে। বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ দেবতার যে বড় বড় বড় পূজা হয়, তাহা নৈমিত্তিক কর্ম্ম। আর কোনও কামনা করিয়া এইরূপ পূজা যাহা হয়, তাহা কাম্যকর্ম্ম। এই দুইটি যাজনাঙ্গীয় কর্ম্মের মধ্যে। পুরোহিতের দ্বারাই সাধারণতঃ ইহা নির্ব্বাহ করা হয়, এবং পুরোহিত সকলেই ব্রাহ্মণ। কিন্তু পুরোহিত দ্বারা ইহার যে কোনও অনুষ্ঠান নির্ব্বাহ করাইতে সকলেরই

---

* কলৌতু পবমেশানি তৈরেব মন্ত্রবর্জ্জিতৈঃ।
মায়াদ্যৈঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি কুর্য্যুঃ শঙ্করশাসনাৎ॥
(মহানির্ব্বাণতন্ত্র—৯—১০)

সমান অধিকার আছে। দেবতার মূর্ত্তিনির্ম্মাণ এই সব কর্ম্মেই করা হয়। তাই প্রতিমার পূজা সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেরই করণীয় বলিয়া একটা নিয়মের মত হইয়া গিয়াছে। যথাশাস্ত্র সুসম্পন্ন হইবে, এই ধারণায় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহাদির পূজার ভারও সাধারণতঃ ব্রাহ্মণের উপরে অর্পিত হয়। কিন্তু সকলেই মন্দিরে গিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বিগ্রহকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে পারেন। ইহাও একরূপ পূজা।

নিত্য ক্রিয়ায় দুইটি বিগ্রহের পূজার নিয়ম দেখা যায়। একটি শালগ্রাম শিলা, অপরটি শিবলিঙ্গ। কয়েকটি বৈদিক মন্ত্রের উচ্চারণে শালগ্রাম শিলাকে স্নান করাইয়া পূজা আরম্ভ করিতে হয়, তাই বোধ হয় দ্বিজ পুরুষ ব্যতীত ইহার পূজায় আর কাহারও অধিকার নাই। কিন্তু সে অভাব পূর্ণ হইয়াছে শিবপূজায়, যাহাতে 'আচণ্ডাল-মনুষ্যাণাং' সকলেরই সমান অধিকার কেবল যে আছে, তাহা নহে,—অবশ্য নিত্যকর্ত্তব্য বলিয়াও বিহিত হইয়াছে। কেহ বলিতে পারেন, শালগ্রাম স্বাভাবিক দেববিগ্রহ, ঠিক ঐভাবেই শিলাচক্র সহ পাওয়া যায় *; আর শিবলিঙ্গ কৃত্রিম বিগ্রহ, মাটিপাথরাদি বস্তুদ্বারা মানুষ গড়িয়া নেয়। কিন্তু বাণলিঙ্গের বেলায় একথা বলা চলে না। ইহাও শালগ্রামেরই ন্যায় স্বাভাবিক বিগ্রহ, এবং মাহাত্ম্যে, শালগ্রামে ও বাণলিঙ্গে যে কোনও পার্থক্য নাই, বিশেষজ্ঞ সকলেই ইহা জানেন। সাধারণ শিবলিঙ্গের ন্যায় এই বাণলিঙ্গও সকলে পূজা করিতে পারে।

তন্ত্রমতে সকল দেবতারই উপাসনার একটি পদ্ধতি আছে। কিন্তু ইহা প্রধানতঃ যোগমার্গের পদ্ধতি, এবং অপেক্ষাকৃত কঠিনও বটে।

---

* গণ্ডকীনদীর উৎপত্তি স্থলে স্বাভাবিক শালগ্রাম পাওয়া যায়। হিমাচল হইতে এই সব প্রস্তরখণ্ড ঠিক এই ভাবেই নিঃসৃত হয়। কৃত্রিম শালগ্রামও আছে। কিন্তু গণ্ডকীতে প্রাপ্ত স্বাভাবিক শালগ্রাম কতকগুলি বিশেষ লক্ষণে ধরা যায়। নর্ম্মদা নদীতে স্বাভাবিক বাণলিঙ্গ পাওয়া যায়, তাহারও কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে। তবে কৃত্রিম শালগ্রামের ন্যায় কৃত্রিম বাণলিঙ্গও অনেক আছে।

সাধারণতঃ শক্তি উপাসকগণই এই পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা করেন। এই সময়ে ভক্তিরসাত্মক বৈষ্ণবধর্ম্মের আর একটি ধারাও দেশে প্রবর্ত্তিত হয়। ভগবানে ভক্তি এবং এবং সর্ব্বজীবে প্রেম এই ধর্ম্মের মূল কথা। ভক্তিভাবে ভগবানের নাম করিবে, সকল জীবকে সমানভাবে প্রেমদান করিবে, দয়া করিবে,—ইহাই এই ধর্ম্মমতে শ্রেষ্ঠ সাধনা। ইহাতেই ভক্তের ভগবান্, প্রেমের ঠাকুর, তুষ্ট হইবেন,—ভক্তকে, প্রেমিককে, দেখা দিবেন। এই বিশ্বাস সাধকগণ করেন। শ্রীশ্রী৺চৈতন্য দেবের প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবমার্গে প্রেমভক্তি-মূলক এই ধর্ম্মের অতি উচ্চ এক প্রকাশ দেখা যায়।

তন্ত্র এবং বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্র—উভয়ই সমানভাবে সকলবর্ণের সমান অধিকার স্বীকার করিয়াছেন। বৈদিক ও স্মার্ত্তমতের খাতিরে ব্রাহ্মণশূদ্র ভেদে যেটুকু অধিকার ভেদ তন্ত্র স্বীকার করিয়াছেন, বৈষ্ণব ভক্তি শাস্ত্র তাহাও করেন নাই। তন্ত্র মত ও বৈষ্ণব মত উভয় মতই অতি উদার। কিন্তু বৈষ্ণব মত উদারতর। উদারতম ইহাকে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভক্তিমার্গে ভগবদুপাসনার যেরূপ সহজ পন্থা বৈষ্ণব ধর্ম্মে দেখান হইয়াছে, এরূপ আর কোথাও হয় নাই। গো-গোপ-সংঘবৃত, কলবেণুবাদনপর, গোপবেশ গোপাল শ্রীকৃষ্ণরূপে ভগবানের যে প্রেমমূর্ত্তি বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভক্তগুরুগণ দেখাইয়াছেন, তাহারও তুলনা কোথাও আর বড় পাওয়া যাইবে না। এক তুলনা মিলিতে পারে শৈবোপাসনার পদ্ধতিবিশেষে এবং শ্মশানচারী ভোলানাথ আশুতোষ শিবের মূর্ত্তিতে। অত পরিস্ফুট না হইলেও,ইহাকেও ভক্তিমার্গের একরূপ সহজধর্ম্ম বলা যাইতে পারে।

ভগবদুপাসনার এই সব ক্ষেত্রে কেবল ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদই যে দূর করা হইয়াছে, তাহা নয়,—অন্ত্যজ জাতিসমূহকেও ইহার বিশ্বজনীন-উদার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হইয়াছে।

'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।'

বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্রের সর্ব্বজনবিদিত একটি বচন ইহা।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, শিবপূজায়ও 'আচণ্ডাল মনুষ্যাণাং' সকলের সমান অধিকার আছে।

বৃক্ষাশ্রিত একটি ব্যাধের শিশিরসিক্ত গাত্রনিঃসৃত মাত্র একটি বিল্বপত্রের স্পর্শেই তুষ্ট ভোলানাথের নির্দ্দেশে শিবরাত্রির ব্রত প্রচলিত হইয়াছে। গল্পটি হাসিয়া সকলে উড়াইয়া দিতে পারেন। কিন্তু যে তত্ত্ব এই গল্পের মধ্যে রহিয়াছে, তাহা এমন উড়াইয়া দিবার বস্তু নহে। চৈত্রসন্ন্যাস নামে অতি কঠোর একটি শিবব্রত বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। জল চল কি জল অচল নির্ব্বিশেষে সাধারণতঃ নিম্ন-শ্রেণীর লোকেরাই এই ব্রত করিয়া থাকে।

কিছু পূর্ব্বে 'অন্ত্যজ জাতি' নামক ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের কয়েকটি বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে, ইহাদিগকে তান্ত্রিক আচার্য্যগণ পঞ্চম বর্ণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কোথাও কোথাও সামান্য বর্ণ বলিয়াও ইহাদের কথা আছে। তন্ত্রের প্রচার যে যুগে হয়, তখন ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থ এই দুই আশ্রমের ধর্ম্মাচরণ অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। তন্ত্র তাই এই সত্যকে স্বীকার করিয়া নিয়া স্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছেন, কলিতে দুইটি আশ্রম মাত্র আছে, গার্হস্থ্য ও ভিক্ষু বা সন্ন্যাস। তান্ত্রিক সন্ন্যাসীরা অবধূত নামে পরিচিত, তাই ইহার আর এক অবধূতাশ্রম। দ্বিবিধ এই আশ্রম ধর্ম্মে পাঁচ বর্ণ সকলেরই সমান অধিকার তন্ত্র স্বীকার করিয়াছেন। *

* কৃতাদৌ কলিকালে তু বর্ণাঃ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্য এব চ॥
এতেষাং সর্ব্ববর্ণানাং আশ্রমৌ দ্বৌ মহেশ্বরি।
তেষাং আচারধর্ম্মাংশ্চ শৃণুষ্বাদ্যে বদামিতে॥
(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র—৮,৫-৬)

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমোনাস্তি বানপ্রস্থোঽপি ন প্রিয়ে।
গার্হস্থ্যো ভিক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলিযুগে॥
(ঐ—৮,৮)

কখন সাধু গৃহস্থ সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেন, তার সম্বন্ধে ৮ম অধ্যায়ের ২২৩ শ্লোকে এই তন্ত্র বলিতেছেন :—

ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে বিরতে সর্ব্বকর্ম্মণি।
অধ্যাত্মবিদ্যানিপুণঃ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ ॥

অর্থাৎ, ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে এবং সমুদয় কাম্যকর্ম্ম রহিত হইলে, অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিতে পারেন।

সর্ব্ববর্ণই যখন চরিত্রগুণে এইরূপ উন্নত হইয়া সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিতে পারে, তখন ইহার উপযোগী জ্ঞানার্জ্জনের ও সাধনার অধিকারে শূদ্র কি পঞ্চম কেহই যে বঞ্চিত ছিল না, একথা বলাই বাহুল্য।

তারপর সন্ন্যাসীর দীক্ষা। স্বজন,বন্ধু এবং গ্রামবাসী অন্যান্য সকলকে ডাকিয়া তাঁহাদের অনুমতি নিয়া সন্ন্যাসাভিলাষী ব্যক্তি গৃহত্যাগ করিবেন, এবং অবধূত গুরুর নিকটে উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসে দীক্ষা প্রার্থনা করিবেন। গুরুর আদেশে ঋণত্রয় হইতে মুক্তি লাভের জন্য দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিবেন। তারপর ইঁহাদিগকে শেষ পূজা ও পিণ্ডদান করিবেন। করিয়া এই প্রার্থনা করিবেন,—

তৃপ্যধ্বং পিতরো দেবা দেবর্ষিমাতৃকাগণা।
গুণাতীত পদে যূয়মনৃণা কুরুতাচিরাৎ ॥
(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র—৮, ২৩৯)

বিপ্রাণামিতরেষাঞ্চ বর্ণাণাং প্রবলে কলৌ।
উভয়ত্রাশ্রমে দেবি সর্ব্বেষামধিকারিতা ॥
(ঐ—৮, ১২)

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্য এব চ।
কুলাবধূতসংস্কারে পঞ্চানামাধিকারিতা ॥
(ঐ—৮, ২২৪)

হে পিতৃগণ, দেবগণ, দেবর্ষিগণ, মাতৃগণ, আমি গুণাতীত পদে গমন করিতেছি, আপনারা আমাকে শীঘ্র ঋণ হইতে মুক্ত করুন।

বার বার এইরূপ প্রার্থনা করিয়া ইঁহাদের কৃপায় ঋণমুক্ত সাধক তখন আত্মশ্রাদ্ধ করিবেন।

পিতাহ্যাত্মৈব সর্ব্বেষাং তৎপিতাপ্রপিতামহাঃ।
আত্মান্যাত্মার্পণার্থায় কুর্য্যাদাত্মক্রিয়াং সুধীঃ॥

(ম, তন্ত্র—৮, ২৪১)

অর্থাৎ আত্মাই সকলের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ। অতএব সুধী পরমাত্মাতে আত্মসমর্পণ করিবার নিমিত্ত আপনার শ্রাদ্ধ করিবেন।

তারপর নির্দ্দিষ্ট কোনও কোনও পূজাহোমাদি অনুষ্ঠানের পর সমস্ত দৈহিক তত্ত্ব ও দৈহিক কর্ম্ম অগ্নিতে হোম করিয়া আপনাকে মৃতবৎ ও সর্ব্বকর্ম্মরহিত ভাবনা করিতে হইবে। করিয়া দ্বিজগণ যজ্ঞসূত্র ও শিখা এবং অন্যান্য বর্ণ শিক্ষা মাত্র কাটিয়া যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিবেন, অর্থাৎ সামাজিক ও গার্হস্থ্য আচারনিয়মের সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন। তখন গুরুকে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিবেন। শিষ্যকে তুলিয়া গুরু তাঁহার দক্ষিণ কর্ণে এই শ্লোক উচ্চারণ করিবেনঃ—

"তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞঃ হংসঃ সোঽহং বিভাবয়।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স্বভাবেন সুখংচর॥

(ম, তন্ত্র—৮. ২৬৪)

অর্থাৎ, হে মহাপ্রাজ্ঞ! সেই ব্রহ্ম তুমিই। তুমি হংসঃ ও সোঽহং (অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের একত্ব) ভাবনা কর। অহঙ্কার ও মমতারহিত হইয়া নিজের ইচ্ছামত শুদ্ধভাবে বিচরণ কর।

এই দীক্ষার পর সন্ন্যাসীর জীবন কিরূপ হইবে, এই ভাবে পরবর্ত্তী কতিপয় শ্লোকে তাহা বর্ণিত হইয়াছেঃ—

ততো নির্দ্বন্দ্বরূপোঽসৌ নিষ্কামঃ স্থিরমানসঃ।
বিহরেৎ স্বেচ্ছয়া শিষ্যঃ সাক্ষাদব্রহ্মোময়োভুবি।

আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং সদ্রূপেণ বিভাবয়ন্ ।
বিস্মরেন্নামরূপাণি ধ্যায়ন্নাত্মনমাত্মনি ॥
অনিকেতঃ ক্ষমাযুক্তো নিঃশঙ্কঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সন্ন্যাসী বিহরেৎ ক্ষিতৌ ॥
মুক্তো বিধিনিষেধেভ্যো নির্যোগক্ষেম আত্মবিৎ ।
সুখদুঃখসমোধীরো জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ ॥
স্থিরাত্মা প্রাপ্তদুঃখোঽপি সুখে প্রাপ্তেঽপি নিস্পৃহঃ ।
সদানন্দঃ শুচিঃ শান্তো নিরপেক্ষো নিরাকুলঃ ॥
নোদ্বেজকঃ স্যাৎ জীবাণাং সদা প্রাণিহিতে রতঃ ।
বিগতামর্ষভীর্দ্দান্তো নিঃসকল্পো নিরুদ্যমঃ ॥
শোকদ্বেষবিমুক্তঃ স্যাচ্ছত্রৌ মিত্রে সমো ভবেৎ ।
শীতবাতাতপসহঃ সমো মানাপমানয়োঃ ॥
যথা সত্যং উপাশ্রিত্য মৃষা বিশ্বং প্রতিষ্ঠতি ।
আত্মাশ্রিতস্তথা দেহো জানন্নেবং সুখী ভবেৎ ॥
ইন্দ্রিয়াণ্যেব কুর্ব্বন্তি স্বং স্বং কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ ।
আত্মা সাক্ষী বিনির্লিপ্তো জ্ঞাত্বৈব মোক্ষভাগ্ ভবেৎ ॥

*　　　*　　　*　　　*

সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিঃ স্যাৎ কীটে দেবে তথানরে ।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানীয়াৎ পরিব্রাট্ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥
বিপ্রান্নং শ্বপচান্নং বা যস্মাত্তস্মাৎ সমাগতং ।
দেশকালং তথা পাত্রমশ্নীয়াদবিচারয়ন্ ॥
অধ্যাত্মশাস্ত্রাধ্যয়নৈঃ সদা তত্ত্ববিচারণৈঃ ।
অবধূতো নয়েৎ কালং স্বেচ্ছাচারপরায়ণঃ ॥

[অনুবাদ—অনন্তর শিষ্য সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব-রহিত, কামনা রহিত, স্থিরচিত্ত ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হইয়া ভূতলে স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিবেন।

তিনি ব্রহ্মহইতে স্তম্ব অর্থাৎ তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত সমুদয় বিশ্বকে সৎস্বরূপ চিন্তা করিবেন। নামরূপ বিস্মৃত হইয়া আত্মাতে আত্মার

ধ্যান করতঃ, আবাস শূন্য, ক্ষমাশীল, নিশঙ্ক হৃদয়, সংসর্গশূন্য, মমতা-শূন্য, অহঙ্কার শূন্য ও সন্ন্যাসী হইয়া ভূমণ্ডলে বিচরণ করিবেন।

তিনি শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ হইতে মুক্ত হইবেন। তিনি লব্ধ বিষয়ের রক্ষা ও অলব্ধ বিষয় লাভ করিবার চেষ্টা করিবেন না। তিনি সুখে দুঃখে সমান, ধীর, জিতেন্দ্রিয় ও স্পৃহারহিত হইবেন। দুঃখ উপস্থিত হইলেও তাঁহার অন্তঃকরণ স্থির থাকিবে, সুখ উপস্থিত হইলেও তিনি তাহাতে স্পৃহা করিবেন না।

তিনি সর্ব্বদা আনন্দিত, শুচি, শান্ত, নিরপেক্ষ ও আকুলতাশূন্য হইবেন। তিনি কোনও জীবকে উদ্বিগ্ন করিবেন না; সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রাণীর হিতসাধনে রত থাকিবেন। সর্ব্বদা ক্রোধশূন্য, ভয়শূন্য, সংকল্পশূন্য ও উদ্যমশূন্য হইবেন।

তিনি শোকশূন্য, দ্বেষশূন্য, শত্রুমিত্রে সমদর্শী হইবেন। শীত বাত আতপ প্রভৃতির কষ্ট সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন। মান অপমান তুল্য জ্ঞান করিবেন।

জগৎ মিথ্যাস্বরূপ হইয়াও যেমন একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়. সেইরূপ আত্মাকে আশ্রয় করিয়া মিথ্যাভূত এই দেহ আত্মবৎ প্রতীত হইতেছে, এইরূপ জানিয়া সন্ন্যাসী সুখী হইবেন।

ইন্দ্রিয়গণই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্ব স্ব কর্ম্ম করিতেছে, আত্মা সাক্ষী ও নির্লিপ্ত, সন্ন্যাসী ইহা জানিয়া মোক্ষ ভাগী হন।

পরিব্রাজক সন্ন্যাসী দেবতা, মনুষ্য বা কীট—সর্ব্বত্র সমদর্শী হইবেন; সর্ব্ব কর্ম্মেই সমুদায় জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেন।

ব্রাহ্মণের অন্ন হউক কি চণ্ডালের অন্ন হউক, যে কোনও ব্যক্তির অন্ন যে কোনও স্থান হইতে আসুক, দেশ কাল পাত্র বিচার না করিয়া তাহা ভোজন করিবেন।

অবধূত ব্যক্তি অধ্যাত্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং তত্ত্ববিচারে জীবনযাপন করিবেন। এবং যেরূপ ইচ্ছা সেই ভাবে চলিবেন।]

সন্ন্যাসী বা মুক্ত মানবের ইহা অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ আর কিছু হইতে পারে না। এই আদর্শে উপনীত হইবার সমান অধিকার শূদ্র ও অন্ত্যজাদি পঞ্চমবর্ণ যদি অন্যান্য সকলের সঙ্গে পায়, বৈষয়িক কর্ম্মের ভাগ তাহার যাহাই থাকুক না, গার্হস্থ্য আশ্রমে সমাজে তাহার স্থান যাহাই বিহিত হউক, কিছু তাহাতে আসিয়া যায় না।

এত বড় আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যের সিংহদ্বার যাহাদের সম্মুখে মুক্ত রহিয়াছে, সামাজিক জীবনের শক্তিপ্রতিপত্তি তাহারা তুচ্ছ জ্ঞানই করিতে পারে। কিসেই বা তাহারা এদিকে প্রলোভিত হইবে? যাজক, অধ্যাপক বা সাধক যে সব ব্রাহ্মণগৃহস্থ সমাজের শীর্ষস্থানে ছিলেন, রাজা ভূস্বামী ও ধনী বণিক্‌গণও যাঁহাদের চরণে সর্ব্বদা লুণ্ঠিত হইতেন, এবং নির্দ্দেশপালন করিয়া কৃতার্থ হইতেন। গ্রাম্য কুটীরে যেরূপ দীন অশন বসনে সন্তুষ্ট চিত্তে ইঁহারা বাস করিতেন, অতি দীনদরিদ্র চণ্ডালের গৃহ কি অশনবসন তাহা অপেক্ষা দীনতর বড় ছিল না। পার্থিব ঐশ্বর্য্যের কি শক্তির কোনও দৃপ্ত আড়ম্বর কিছুই ইঁহাদের জীবনে বড় দেখা যাইত না। তারপর এইসব ভিক্ষু সন্ন্যাসী, ইঁহাদের ত কথাই নাই। যেখানে সেখানে যাহা জুটিত, তাহাই মাত্র খাইয়া পরিয়া লোক সমাজে ইঁহারা বিচরণ করিতেন; সর্ব্বত্র লোকের ভক্তির পূজা পাইতেন।

দরিদ্র জনগণের চিত্ত ইঁহাদের এই আদর্শের দিকেই আকৃষ্ট হইত; ধনীর সম্পদ কি শক্তির আড়ম্বর তাঁহাদের চিত্তে এ অবস্থায় লোভ কি ঈর্ষা বড় উদ্রিক্ত করিত না। পার্থিব সম্পদ কি শক্তির অধিকার লইয়া ধনী ও উচ্চতর সম্প্রদায়ের সঙ্গে জনগণের বড় কোনও বিরোধের দৃষ্টান্ত এ দেশের ইতিহাসে তাই অতি বিরল।

এই সব লইয়া সাম্প্রদায়িক বিরোধে সমাজে দারুণ অশান্তি উপস্থিত হয়, কর্ম্ম শৃঙ্খলাও ব্যহত হয়। জ্ঞানী বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক আচার্য্যগণ, তাই, জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মক্ষেত্র যে আধ্যাত্মিক সাধনক্ষেত্র—সেখানে যাহা কিছু ভেদ ছিল সব লোপ করিয়া, পঞ্চম পর্য্যন্ত সর্ব্ব

বর্ণের সমান অধিকারের বাণী এমন উদার ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সামাজিক ধর্ম্মে ও সামাজিক ব্যবহারে স্মার্ত্ত অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করিতে চাহেন নাই। তাহার বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করা দূরে থাক, বরং শাস্ত ভাবে বিহিত ধর্ম্ম-বিধান বলিয়া সে সব মানিয়া চলিতেই তাহাদের উপদেশ দিয়াছেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অনুশাসনে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে তন্ত্র মোটের উপর মন্বাদি ঋষিদের প্রবর্ত্তিত স্মৃতির বিধানই অনুসরণ করিয়াই ব্যবস্থা দিয়াছেন। *

* অধ্যাপনং যাজনঞ্চ বিপ্রাণাং ব্রতমুত্তমম্।
অশক্তৌ ক্ষত্রিয় বিশাং বৃত্তৈর্নির্ব্বাহমাচরেৎ ॥
রাজন্যানাঞ্চ সদ্‌বৃত্তং সংগ্রামো ভূমিশাসনম্।
অত্রাশক্তৌ বণিগ্‌বৃত্তং শূদ্রবৃত্তমথাশ্রয়েৎ ॥
বাণিজ্যাশক্ত বৈশ্যানাং শূদ্রবৃত্তমদূষণম।
শূদ্রানাং পরমেশানি সেবাবৃত্তির্বিধীয়তে ॥
সামান্যানাঞ্চ বর্ণানাং বিপ্রবৃত্ত্যন্যবৃত্তিষু।
অধিকারোঽস্তি দেবেশি দেহযাত্রাপ্রসিদ্ধয়ে ॥

(ম, তন্ত্র—৮,১১০-১১৩)

সর্ব্বে বর্ণাঃ স্ব স্ব বর্ণৈ ব্রাহ্মোদ্বাহং তথাশনম্।
কুর্ব্বীরন্ ভৈরবী চক্রাৎ তত্ত্বচক্রাদৃতে শিবে।"

(ম, তন্ত্র- ৮, ১৫১)

"সম্প্রাপ্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বেবর্ণাদ্বিজোত্তমাঃ।
নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বেবর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥"

(ঐ—৮,১৮০)

"চক্রাদ্বিনিঃসৃতাঃ সর্ব্বে স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোদিতম্।
লোকযাত্রা প্রসিদ্ধ্যর্থং কুর্য্যুঃ কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ ॥

(ঐ—৮,১৯৮)

কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে সমান অধিকার সকলের অনুমত হইলেও, যথাযোগ্য গুণ বা শক্তি না থাকিলে কার্য্যতঃ সেই অধিকার অনুসারে কেহ চলিতে পারে না। ইহার তারতম্য অনুসারে, যে যেরূপ জ্ঞান লাভের ও সাধনায় যোগ্য, সে সেইরূপই পথই অবলম্বন করে। এ দেশেও তাহাই হইয়াছে। কঠিন ও অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য, উচ্চতরের ও নিম্নস্তরের, অশেষরকম সাধনপ্রণালী দেখান হইয়াছে। স্বাভাবিক গুণে বা শক্তিতে যে যেরূপ অধিকারী, সেইরূপ পথই গ্রহণ করিয়াছে।

যে সব পন্থা বা প্রণালী সহজবোধ্য ও অল্প আয়াস সাধ্য, শূদ্রাদি নিম্নতর সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে সেই সব প্রণালীরই প্রচলন বেশী দেখা

টিপ্পনী :—শাক্ত উপাসনায় নানা রকম রহস্য-পদ্ধতি ছিল,—ভৈরবীচক্র ও তত্ত্ব চক্র তাহাদের দুইটি। বহু নারীপুরুষ একত্র হইয়া এই সব চক্রে সাধনা করিতেন। এই সময়ে আহারে জাতিবিচার কিছু করা হইত না। শৈব বিবাহ নামে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে একরূপ বিবাহের উল্লেখ আছে। তাহাতেও জাতিবিচার কিছু করা হইত না। স্বামী নাই (অর্থাৎ বিধবা কি কুমারী যে অবস্থারই হউন) এইরূপ যে কোনও নারীর সঙ্গে যে কোন পুরুষের এই শৈব মতে বিবাহ হইতে পারিত, এবং ভৈরবী চক্রেই মাত্র ইহার অনুষ্ঠান হইত।

বৈদিক ও স্মার্ত্ত বিধিতে যে বিবাহ হইত, তাহাকে এই তন্ত্র ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়াছেন। ইহাই সামাজিক ধর্ম্মে শ্রেষ্ঠ বিবাহ, এবং এই ব্রাহ্ম বিবাহ সকলকেই স্ব স্ব বর্ণের মধ্যে করিতে হইবে। ভৈরবী চক্রের বাহিরে আহারাদিও সকলে যার যার বর্ণের মধ্যে করিবেন, তন্ত্র ইহাও বলিয়াছেন। চক্রে শৈববিবাহ অনুমোদিত হইলেও, বিবাহিতা এই স্ত্রীর—শৈবী স্ত্রীর—স্থান গৃহে কখনও ব্রাহ্মী স্ত্রীর সমান হইত না। ব্রাহ্মী স্ত্রীই গৃহের কর্ত্রী হইতেন, শৈবী স্ত্রী তাঁহার অনুগতা হইয়া থাকিতেন। পৈতৃক সম্পদের উত্তরাধিকারীও হইত ব্রাহ্মী স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রগণ; শৈবী স্ত্রীর সন্তানেরা অশনবসনের ভাগী মাত্র হইত।

[মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ৮ম উল্লাস।]

যায়। উচ্চতর সংস্কার ও তদনুরূপে উচ্চতর শিক্ষা ব্যতীত যে সব প্রণালীর তত্ত্ব সহজে অধিগত হয় না, ক্রিয়াদিও নির্ব্বাহ করা সম্ভব হয় না, ব্রাহ্মণাদি উচ্চতর সম্প্রদায় সমূহ সাধারণতঃ সেই প্রণালী অনুসারেই সাধনা করেন।

তাই সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই, সংস্কৃত মন্ত্রাদি সম্বলিত জ্ঞান-যোগাত্মক তান্ত্রিক শাক্তধর্ম্মের সাধক—অন্ততঃ এই বঙ্গদেশে—উচ্চতর সপ্রদায়ের মধ্যে প্রায়শঃ দেখা যায়। আর নিম্নতর সম্প্রদায়সমূহ সকলেই প্রায় সহজ প্রাকৃত ভাষায় গাতকীর্ত্তনাদিসম্বলিত ভক্তি-যোগাত্মক গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের শিষ্য। উচ্চতর সম্প্রদায়ের মধ্যেও বৈষ্ণব অনেক আছেন, কিন্তু তাঁহারা অনেকেই ইহার উপরে আবার তান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সেই ভাবেও সাধনা করেন। বৈদিক মতে সন্ধ্যা উপাসনা উপরন্তু ভাবে কেবল দ্বিজ জাতিরাই করেন, এবং তাহার অধিকারীও মাত্র তাঁহারা।

অন্য দিকে অন্য ভাবে এই ক্ষেত্রে এত বড় অধিকার সকলে পাইয়াছিল, যে এই বিষয়ে কোনও দাবী দাওয়া লইয়া কোনও বিরোধে কেহ কখনও অগ্রসর হয় নাই। বৈদিক এই সব ক্রিয়াকে এমন গুরু একটা স্থানও তন্ত্র বড় দিতে চাহেন নাই। স্মার্ত্ত অনুশাসনের খাতিরে দ্বিজবর্ণের একটা পার্থক্য রাখিবার জন্যই এসম্বন্ধে একটা গৌণ ব্যবস্থা রাখিয়াছেন *।

ইয়ন্তু ব্রহ্মসাবিত্রী যথা ভবতি বৈদিকী।
তথৈব তান্ত্রিকী জ্ঞেয়া প্রশস্তোভয়কর্ম্মণি॥
ততোঽত্র কথিতং দেবি দ্বিজানাং প্রবলে কলৌ।
গায়ত্র্যামধিকারোঽস্তি নান্য মন্ত্রেষু কর্হিচিৎ॥
দ্বিজাতিনাং প্রভেদার্থং শূদ্রেভ্যঃ পরমেশ্বরি।
সন্ধ্যেয়ং বৈদিকী প্রোক্তাঃ প্রাগেবাহ্নিককর্ম্মণাম্॥

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র—৮— ৮৫, ৮৬ ও ৮৮)

৯। ব্রহ্মণ্য প্রভুত্ব

খুব করিয়াও যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের কথা ধরিয়া নিলেও হিন্দু-সভ্যতার বয়ঃক্রম পাঁচ হাজার বৎসরের কম হইবে না। এই সুদীর্ঘকাল সেই সভ্যতার বিশিষ্ট ধর্ম্মে হিন্দুসমাজ এদেশে বর্ত্তমান আছে এবং সমাজের শীর্ষ স্থানে থাকিয়া ব্রাহ্মণই ইহার উপরে প্রভুত্ব করিতেছেন। প্রাচীন সেই যুগ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বহু পরিবর্ত্তন ইহার মধ্যে হইয়াছে, কিন্তু ব্রাহ্মণের এই প্রাধান্য স্থির আছে। যুগে যুগে পারিপার্শ্বিক অবস্থার যত কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সমাজ-ধর্ম্ম তাহার সঙ্গে আপনাকে মানাইয়া নিয়াছে। বাহির হইতে যত কিছু নূতন নীতির প্রভাব আসিয়াছে, কি ভিতরে আবির্ভূত হইয়াছে, সবই সে ইহার বিশাল ও উদার সার্ব্বজনীন স্বভাবের মধ্যে মিলাইয়া নিতে পারিয়াছে। পারিয়াছে বলিয়াই সুদীর্ঘ এই জীবন সে লাভ করিয়াছে। কিন্তু বাহিরের কি ভিতরের কোনও প্রভাবই ব্রাহ্মণকে সমাজের উপরে তাঁহার এই প্রতিষ্ঠা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই।

এই ধর্ম্মের ও সমাজের উপরে ব্রহ্মণ্যশক্তির এই অটল অচল প্রভাব লক্ষ্য করিয়া ইয়োরোপীয় পণ্ডিত অনেকে Brahminical বা 'ব্রহ্মণ্য' এই বিশেষণযুক্ত নামেও ইহার পরিচয় দিয়াছেন। বস্তুতঃ (সিন্ধু-তীরবর্ত্তী) প্রাচীন ভারতীয় বলিয়া 'হিন্দু' এই নাম যদি ইহার হইতে পারে, ব্রাহ্মণের এই প্রাধান্য হেতু 'ব্রহ্মণ্য' এই নামও হইতে পারে। 'হিন্দু' নাম অপেক্ষা 'ব্রহ্মণ্য' এই নামের সার্থকতা বরং অনেক বেশী।

পূর্ব্বে তবু ক্ষত্রিয় রাজশক্তি ব্রাহ্মণের সহায় ছিল। কিন্তু মুশলমান আমল হইতে তাহা আর নাই। তখন প্রতিকূল ছিল; এখন রাজশক্তি উদাসীন হইয়াছে। কিন্তু সমাজ এই প্রাধান্য তখনও মানিয়াছে, এখনও মানিতেছে। পাশ্চাত্য র‍্যাসনালিষ্ট মতের এত বড়

যে প্রভাব ইংরেজিশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, তাঁহারাও এই প্রভাবকে উপেক্ষা কি অবজ্ঞা করিয়া চলিতে পারেন না। সামাজিক কি পারিবারিক যে কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠানেই ব্রাহ্মণের এই প্রাধান্যের নিকটে নতশির হইয়া তাঁহাদের চলিতে হয়। কেহ বলিতে পারেন, এ সব সামাজিক বন্ধন, সমাজশাসনের ভয়ে মানিয়া চলিতে হয়। কিন্তু এমন সব বন্ধনের সৃষ্টি যাঁহাদের প্রভাব হইতে ঘটিয়াছে, রাজদণ্ডের কোনও ভয় ব্যতীতও সমাজ যাহার অধীনতা স্বীকার করিয়া চলিতেছে, লঙ্ঘন করিতে কেহ চাহিলেও সহজে পারে না, তাঁহাদের সেই প্রভাবের মহিমাও বড় কম নহে। তারপর আপন আপন মনের অন্তরে সরল দৃষ্টিতে যদি ইঁহারা চাহিয়া দেখেন, দেখিতে পাইবেন, মনই ইঁহাদের ব্রাহ্মণের এই প্রাধান্য মানিয়া চলিতে চায়, অবজ্ঞা করিতে সঙ্কুচিত ও শঙ্কিত হয়; সমাজশাসনের ভয়ের কথা বাজে একটা সাফাই মাত্র। মুখের কথায় যতই ইঁহারা র‍্যাসনালিষ্ট মতের গর্ব্ব করুন, কাজে হিন্দু গৃহস্থ কেহই বড় সেই মতে চলিতে পারেন না। চিত্ত আপনা-হইতেই বিমুখ হইয়া আইসে। এমনই দৃঢ়মূল হইয়া এই প্রভাব তাঁহাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। ইহাই এই ব্রহ্মণ্য মহিমার আশ্চর্য্য এক রহস্য।

বাহিরের কোনও বল নাই। যে ধর্ম্মের উপরে সমাজ সংস্থিত সেই ধর্ম্মেরই আভ্যন্তরিক প্রভাব ব্যতীত এই মানার আর কোনও হেতু হইতে পারে না। এই যে ধর্ম্মের প্রভাবে সমাজ আপনাহইতেই ব্রাহ্মণের প্রাধান্য মানিয়া চলিয়াছে, আজও চলিতেছে, মন্বাদি ঋষিবর্গ প্রবর্ত্তিত সেই ধর্ম্মই আবার ব্রাহ্মণের জীবননীতির এমন আদর্শ স্থাপনা করিয়াছেন, যাহাতে ব্রাহ্মণ এই প্রাধান্যের যোগ্য হইয়া সমাজের উপরে তাঁহার এই নেতৃত্বের স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারেন। এই রহস্যের সূত্র খুঁজিলে ইহারই মধ্যে পাওয়া যাইবে।

ধর্ম্মগুরু, শিক্ষক, সুনীতির পথপ্রদর্শক, বিধিব্যবস্থাদির নিয়ামক এবং কর্ম্মাধিকারবিভাগে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্যের স্থাপক রূপে সমাজের উপরে নেতৃত্ব ব্রাহ্মণগণ করেন। উচ্চতম জ্ঞান-সাধনায় ও ধর্ম্মসাধনায় মনঃশক্তিতে ও ত্যাগবৈরাগ্যাত্মক সাধুচরিত্রের মহিমায় যত উন্নত তাঁহারা হইবেন, তত বেশী যে এই উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদের যোগ্য হইবেন, একথা বলাই বাহুল্য। উচ্চবিদ্যা ও জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত চরিত্রধর্ম্মের এইরূপ মহিমা ব্যতীত আর কোনও শক্তি কোনও সম্প্রদায়কে সমাজের উপরে এইরূপ প্রাধান্যের পদে চিরকাল স্থিত রাখিতে পারে না। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ঋষিগণ এই সত্যকে উপলব্ধি করিয়া সেই ভাবেই ব্রাহ্মণের শিক্ষার ও জীবনযাত্রার নীতিপদ্ধতির স্থাপনা করিয়াছিলেন। চতুরাশ্রমের সেই মহাব্রতের মধ্য দিয়া যাঁহারা জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন, জ্ঞানে ও ধর্ম্মসাধনায় মনপ্রাণ তাঁহাদের এমনই এক উচ্চস্তরে গিয়া উঠিবে যে বিষয়সম্ভোগ কি পার্থিব ধনসম্পদ-সঞ্চয়ের দিকে চিত্তাকর্ষণ সহজে হইতে পারে না। ইহার উপরে ব্রাহ্মণের, অর্থাৎ যজন যাজন অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বৃত্তিধারী প্রকৃত ব্রাহ্মণের, জীবনযাপনে অতি অনাড়ম্বর যে দীনতার আদর্শ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতেও বাসগৃহ, ভোজন কি বেশভূষার কোনও পারিপাট্যই তাঁহার পক্ষে শোভন বলিয়া বিবেচিত হইত না। একে ত জীবনের শিক্ষা ও সাধনাই এই সব আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের চিত্ত হইতে দূর করিয়া দিত, তার উপরে আবার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের রীতিও এ সব কিছু ভোগের অবসর দিত না। ভিক্ষার অন্নে এবং যাজন ক্রিয়াদির বিহিত দানদক্ষিণাপ্রণামী প্রভৃতির দ্বারা ব্রাহ্মণকে স্বীয় পরিবার এবং সমাগত শিষ্যবৃন্দকে প্রতিপালন করিতে হইত। পুণ্যাকাঙ্ক্ষী ধনীর দান কখনও যে অধিক হইত না, এ কথা বলি না। কিন্তু জীবনযাপনে যে দীনতার আদর্শ ব্রাহ্মণের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা হইতে

তাঁহারা ভ্রষ্ট বড় হইতেন না ; হইলে সমাজের শ্রদ্ধা তাঁহারা হারাইতেন। বংশপরম্পরাগত উচ্চ সংস্কারের অধিকারী হইয়া ইঁহারা জন্মগ্রহণ করিতেন। তারপর জীবনব্যাপী এইরূপ একটা শিক্ষায় ও সাধনায় এই সব সংস্কার যাহাতে উচ্চনীতিতে পরিণত হইয়া ইহাদের চরিত্রকে উচ্চতর স্তরে তুলিয়া নিতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা এইরূপ হইয়াছিল। সমাজ-নেতা ব্রাহ্মণ গড়িবার এরূপ রীতি আর কোথাও দেখা যাইবে না। এই চরিত্রবলেই ব্রাহ্মণ হিন্দু সমাজের উপরে নেতৃত্ব করিতেন। কোনও শক্তিচক্র (বা organisation) এর সহায়তা ইহাতে *প্রয়োজন হয় না।* ইঁহাদের পরিচালিত শিক্ষা দীক্ষার প্রভাব এবং সব তৎপ্রসূত সংস্কার *আপনাহইতেই সকল শ্রেণীর লোককে নিজ নিজ* বিহিত কর্ম্মে ও ধর্ম্মে স্থির রাখিত।

এই ভাবে ভারতীয় ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ে উচ্চতর জ্ঞানে এবং বিষয়-বিমুখ উন্নতচরিত্রধর্ম্মে আশ্চর্য্য এক আভিজাত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই আভিজাত্যের শক্তিই সমাজের উপরে প্রভুত্ব করিত। ইয়োরোপে ভূ-সম্পদগত একরূপ অভিজাত্য (Aristocracy) পূর্ব্বে সমাজের উপরে প্রভুত্ব করিয়াছে। অধুনা ব্যবসায়িক সম্পদগত একরূপ আভিজাত্য (যাহাকে Aristocracy না বলিয়া Plutocracy ও অনেকে বলিয়া থাকেন) সমাজের উপরে প্রভুত্ব করিতেছে। কিন্তু বিদ্যা জ্ঞান ও ধর্ম্মের এরূপ আশ্চর্য্য এক আভিজাত্য (an Aristocracy of learning, wisdom and spirituality) সে দেশে দেখা দেয় নাই, কোথাও আর দিয়াছে কিনা সন্দেহ।

ব্রহ্মণ্য আভিজাত্যের আদর্শ এইরূপ ছিল। কিন্তু এখন কথা হইতেছে, এই আদর্শে ব্রাহ্মণ কত দূর স্থিত থাকিতে পারিয়াছেন, এবং বাস্তবজীবনে সমাজের উপরেই বা ইহার প্রভুত্ব কি ভাবে তাঁহারা পরিচালিত করিয়াছেন।

চরিত্রের যতই উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা হউক, মানব তাহার স্বাভাবিক দোষদুর্ব্বলতা অতিক্রম করিয়া একেবারে সেই আদর্শে

সর্ব্বদা উপনীত হইতে পারে না। তবে উচ্চ একটা আদর্শ সর্ব্বদা সম্মুখে থাকিলে, পুরুষপরম্পরাগত সংস্কার তদভিমুখ হইলে এবং উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষায় সেই আদর্শ লাভের দিকে একটা যত্ন থাকিলে, তাহা একেবারে ব্যর্থ হয় না।

যাহাই হউক, এসব সত্ত্বেও একথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে, যে আদর্শানুরূপ চরিত্র গৌরবে ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা সংস্থি থাকিতে পারেন নাই। অনেক দোষত্রুটি তাঁহাদের মধ্যে দেখা দিয়াছে। অনেক সময়ে নানাদিকে অধোগতিও তাঁহাদের ঘটিয়াছে।

ব্রহ্মণ্যবৃত্তি-অবলম্বী ব্রাহ্মণদিগকে যে জীবিকার জন্য অপরের দানের উপরে নির্ভর করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, ইহাব ফলেও অনেক স্থলে একটা দান-লোলুপতা, ধনীর আনুগত্য প্রভৃতি দুর্ব্বলতা তাঁহাদের চরিত্রে আসিয়া পড়িয়াছে, তেজস্বিতা ও আত্মমর্য্যাদা বোধ তাঁহারা হারাইয়াছেন।

ভিক্ষা ও দান জীবিকার প্রধান অবলম্বন হইলে, এরূপ একটা হীনতা চরিত্রে আসিতে পারে, মধ্যে মধ্যে আসিয়াও পড়িত। তাই কঠোর শাস্ত্রশাসন হইয়াছিল, অযোগ্য ব্রাহ্মণকে দান করিবে না। বশিষ্ঠ সংহিতায় একস্থলে আছে, যাজন-যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনা করেন না, এরূপ ব্রাহ্মণ শূদ্রের তুল্য; শাস্ত্রবিহিত স্বধর্ম্মপালনে বিমুখ বেদবিদ্যা-বর্জ্জিত ব্রাহ্মণ যে গ্রামে লোকের দানে প্রতিপালিত হয়, সেই গ্রামকেও রাজা দণ্ডিত করিবেন। কারণ সেই গ্রাম চোরকে আদরে পালন করে। *

তবে এ সব শাস্ত্রশাসন সত্ত্বেও পুণ্যের আকাঙ্ক্ষায় অযোগ্য ব্রাহ্মণকেও লোকে দান দক্ষিণাপ্রণামী দিত। অযোগ্য ব্রাহ্মণও এই

* অশ্রোত্রিয়াননুবাক্যা অনগ্নয়ঃ শূদ্রধর্ম্মাণো ভবন্তি।

(বশিষ্ঠ সংহিতা—৩, ১)

অব্রতাহ্যনধীয়ানা যত্র ভৈক্ষচরা দ্বিজাঃ।
তং গ্রামং দণ্ডয়েদ্ রাজা চৌরভক্তপ্রদো হি সঃ॥ (ঐ—৩—৩)

বাঁতে পাণ্ডিত্যের ও ধর্ম্মের ধ্বজা ধরিয়া লোকসমাজে বিচরণ করিতেন। যোগ্যে অযোগ্যে প্রভেদ অনেক সময় ধরা যাইত না। এখনও যায় না।

হারীত সংহিতা হইতেও এইরূপ আর একটি বচন নিয়ে দেওয়া হইল। :—

যথা—স্মৃতিহীনায় বিপ্রায় শ্রুতিহীনে তথৈব চ।
দানং ভোজনমন্যচ্চ দত্তং কুল বিনাশনম্॥　　[১; ২৩-২৪]

প্রসঙ্গ ক্রমে এই স্থলে অত্রি সংহিতা হইতে কয়েকটি (৩৬৪—৭৪) শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও বৃত্তির ও কর্ম্মের লক্ষণে তাঁহাদিগকে কি ভাবে দেখিতে হইবে, সংহিতাকার এই শ্লোক গুলিতে তাহা অতি সুন্দর ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—

দেবমুনিদ্বিজোরাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশুম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালঃ বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ॥
সন্ধ্যাং স্নানং জপং হোমং দেবতা নিত্যপূজনম্.
অতিথিং বৈশ্বদেবঞ্চ দেব ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥
শাকে পত্রে ফলে মূলে বনবাসে সদারতঃ।
নিরতোঽহরহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্রো মুনিরুচ্যতে॥
বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজন্।
সাংখ্য যোগ-বিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে॥
অস্ত্রাহতাশ্চ ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্ব্বসম্মুখে।
আরম্ভে নির্জ্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে॥
কৃষিকর্ম্ম রতোযশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ।
বাণিজ্যব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে॥
লাক্ষা লবণ সম্মিশ্র কুসুম্ভ ক্ষীরসর্পিষাম্।
বিক্রেতা মধু মাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে॥
চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা।
মৎস্যমাংসে সদালুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে॥
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥

তবে আরও একটি কথা এখানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে ঃ ব্রাহ্মণ চরিত্রে যে সব ত্রুটির কথা বলা হইল, তাহা সাধারণ জনসমাজভুক্ত ব্রাহ্মণ গৃহস্থদের মধ্যেই দেখা গিয়াছে। কিন্তু ইঁহাদের

বাপী কূপতড়াগানামারামস্য সরঃসু চ।
নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে ॥
ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে ॥

[অনুবাদ—দেব, মুনি, দ্বিজ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ এবং চণ্ডাল এই দশবিধ (দশ লক্ষণাক্রান্ত) ব্রাহ্মণ শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট।

যিনি প্রতিদিন সন্ধ্যা, পূজা, জপ, হোম, দেবপূজা, অতিথিসেবা এবং বৈশ্বদেব করেন, তাঁহাকে 'দেব' ব্রাহ্মণ বলা হয়।

শাক পত্র ফলমূল ভোজী বনবাসী এবং নিত্য শ্রাদ্ধরত ব্রাহ্মণ মুনি নামে কথিত হন।

যিনি প্রত্যহ বেদান্তপাঠী, সর্ব্বসঙ্গত্যাগী, সাংখ্য ও যোগের তাৎপর্য্য বিচারশীল, তিনি 'দ্বিজ' ব্রাহ্মণ।

যিনি সমরস্থলে সর্ব্বসমক্ষে আরম্ভ সময়েই ধন্বিদিগকে অস্ত্র দ্বারা আহত ও পরাজিত করেন, তিনি 'ক্ষত্র' ব্রাহ্মণ।

কৃষিজীবী, গোপ্রতিপালক, বাণিজ্যব্যবসায়রত ব্রাহ্মণ 'বৈশ্য' সংজ্ঞক।

যে লাক্ষা, লবণ, কুসুম্ভ, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু বা মাংস বিক্রয় করে, সেই ব্রাহ্মণ 'শূদ্র'।

চোর, তস্কর (বলপূর্ব্বকপরধনাপহারী) সূচক (কু-পরামর্শদাতা) দংশক (কটুভাষী) এবং সর্ব্বদা মৎস্য মাংস লোভী ব্রাহ্মণ 'নিষাদ' নামে পরিচিত।

যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতত্ত্ব কিছুই জানে না, অথচ ব্রহ্মসূত্রের (যজ্ঞোপবীতের) গর্ব্ব করে, সেই ব্রাহ্মণ 'পশু' বলিয়া খ্যাত।

যে ব্রাহ্মণ নিঃশঙ্কভাবে কূপ, তড়াগ, সরোবর এবং আরাম (সাধারণ-ভোগ্য উপবন) রুদ্ধ করে, সে ম্লেচ্ছ পদবাচ্য।

ক্রিয়াহীন, মূর্খ, সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত, সকল প্রাণীর প্রতি নির্দ্দয় ব্রাহ্মণ 'চণ্ডাল' বলিয়া গণ্য হয়।—

অপেক্ষা উচ্চতর আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন যে প্রাচীনকালের তপোবনবাসী ঋষিবর্গ, ব্রহ্মণ্য তেজে কি মানবোচিত মর্য্যাদায় কোনও রূপ দীনতা কি হীনতা তাঁহাদের মধ্যে দেখা যায় নাই। ইহার একটি বড় হেতু এই হইতে পারে যে জীবিকার জন্য ইঁহারা ভিক্ষা কি দানের উপরে কখনও নির্ভর করিতেন না। বনসুলভ দ্রব্যাদি ব্যতীত আর কিছু বড় ইহাদের লাগিত না, এবং জীবিকা নির্ব্বাহের এসব উপাদান নিজেরাই সংগ্রহ করিয়া নিতেন। ভারতীয় বিদ্যার, ভারতীয় সাধনার ও ভারতীয় সভ্যতার নায়ক এবং ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ছিলেন প্রকৃত পক্ষে ইঁহারাই। সাধারণ জনসমাজভুক্ত ব্রাহ্মণগণ যত দূর সাধ্য ইঁহাদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিয়া চলিতেন। এই ধর্ম্মেরই নির্দ্দেশে তাঁহাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা পালনের চেষ্টা করিতেন। তবে মধ্যে মধ্যে অসাধারণ মনস্বী ও তেজস্বী ব্রাহ্মণের আবির্ভাব ইঁহাদের মধ্যেও হইয়াছে। বিধিব্যবস্থাদির বড় কোনও সংস্কার বা পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইলে তাঁহারাই করিয়াছেন।

অভিযোগ ও তাহার বিচার

ব্রহ্মণ্য প্রভুত্বের কঠোর শাসনের চাপে সাধারণ সমাজ মাথা তুলিতে পারে নাই, সকল স্বাধীনতা হারাইয়া ক্রমে একেবারে প্রাণহীন হইয়া পড়ে, এবং তাহাতেই হিন্দুজীবনের এইরূপ অধোগতি হইয়াছে, ইত্যাদি অনেকে অভিযোগ ইহার বিরুদ্ধে অনেকে আনিয়া থাকেন। হিন্দুজীবনের অধোগতি যে যথেষ্টই হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাহার কারণ ব্রহ্মণ্য প্রভুত্বের এই অপপ্রয়োগ বা অন্য কিছু তাহা ভাবিবার কথা বটে।

রাষ্ট্রীয় বা অন্যবিধ পার্থিব কোনও রূপ শক্তির গৌরব কি ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর ইঁহারা কামনা করিতেন না। যে সব উচ্চাকাঙ্ক্ষার ও ভোগ-লালসার পরিতৃপ্তির জন্য লোকে এসব চায়, সেরূপ কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা কি ভোগলালসা ব্যক্তিগত ভাবে কোনও কোনও ব্রাহ্মণ-সন্তানের

চিত্তে থাকিলেও সামাজিক ভাবে ব্রহ্মণ্য চরিত্রে ছিল না। মনঃশক্তিতে ও জ্ঞানের অধিকারে তাঁহারাই সমাজে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই শ্রেষ্ঠতার বল লইয়া আবার সমাজের উপরে সর্ব্বোচ্চ নেতৃত্বের পদেও তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত হন। ইহা সত্বেও রাষ্ট্রীয় শাসন বলের ও ব্যাবসায়িক ধনবলের সকল অধিকার ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপরে রাখিয়া, তাঁহাদেরই দানের উপরে মাত্র নির্ভর করিয়া, আপনাদের দীনতায় সন্তুষ্ট চিত্তে জীবনযাপন ইঁহারা করিতেন। বড় এই দুইটি সমাজিক বলের কোন একটিকে আপন সম্প্রদায়ের আয়ত্ত করিতে কোনও রূপ অভিপ্রায় কি প্রয়াস ব্রাহ্মণের মধ্যে কখনও দেখা যায় নাই। সমাজের উপরে যে প্রভুত্ব তাঁহাদের ছিল, তাঁহার জন্যও এই রূপ কোনও বলের অপেক্ষা তাঁহারা কিছু করিতেন না। তাই ইয়োরোপায় চার্চ্চের ন্যায় কোনওরূপ শক্তিচক্রের গঠন বা অন্য কোন-রূপ স্থায়ী কর্ম্মিসংঘ হিন্দু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা দেয় নাই। বাধ্য করিয়া লোকের উপরে নিজেদের প্রভুত্ব চাপাইয়া রাখিবেন, অথবা অপর সকলকে আপনাদের কোনও পার্থিব স্বার্থের অধীন করিবেন, এরূপ কোনও বলই তাঁহাদের হাতে ছিল না। ধর্ম্মবুদ্ধিতে আপনা হইতেই লোকে ধর্ম্মপথে চলে, সাধারণতঃ এইরূপ শিক্ষা দীক্ষার প্রবর্ত্তন ও আদর্শ স্থাপনা তাঁহারা করিয়াছেন। কোনওরূপ পার্থিব বলের সাহায্যে কোনও নিয়মে লোককে বাধ্য রাখিবার অথবা দণ্ড প্রয়োগে ধর্ম্মরক্ষার প্রয়োজন যখন হইয়াছে, রাজদণ্ডের উপরে তাঁহারা নির্ভর করিয়াছেন। ইয়োরোপের চার্চ্চও ধর্ম্মদ্রোহীর দণ্ড বিধানের জন্য রাজাদের উপরে নির্ভর করিতেন। কিন্তু চার্চ্চের যে সংঘশক্তির বলে এই দণ্ডপ্রয়োগে রাজারা বাধ্য হইতেন, সেরূপ কোনও সংঘশক্তি ভারতীয় ব্রাহ্মণের ছিল না। রাজারা ধর্ম্মবুদ্ধিতেই প্রয়োজন বুঝিয়া এই দণ্ড প্রয়োগ করিতেন। বিদ্যাবুদ্ধিতে ক্ষত্রিয় রাজগণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীনতর ছিলেন না। তাঁহাদের উপদেশে অন্যায় কোন নিয়মে যদি প্রজাকে তাঁহারা কখনও বাধ্য করিয়া

থাকেন, অথবা দণ্ডপ্রয়োগে সাধুকার্য্যে কাহারও স্বাধীন কোনও উদ্যমকে চাপিয়া দিয়া থাকেন, সে দোষ রাজার যত বেশী, উপদেষ্টা ব্রাহ্মণের তত নহে।

পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি, বিভিন্ন অঞ্চলে নানা জাতির ও নানা ব্যবসায়ের বহু বংশানুক্রমিক সম্প্রদায় এই হিন্দু সমাজের মধ্যে দেখা দেয়। সাধারণ ভাবে ধর্ম্ম কি, সুনীতির আদর্শ কি, ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি কি ভাবে সম্পন্ন হইবে, এই সবই ব্রাহ্মণগণ নির্দ্দেশ করিতেন। কিন্তু সামাজিক অন্যান্য আচারনিয়ম এই সব সম্প্রদায়ের মধ্যে কি ভাবে চলিবে, আপনাদের বৃত্তিগত কর্ম্মাদি কি ভাবে নির্ব্বাহ হইবে, তাহার রক্ষণপোষণাদি কি ব্যবস্থায় চলিবে, এসব বিষয়ে ব্রাহ্মণগণ হস্তক্ষেপ বড় কিছুতে করিতেন না। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সামাজিকবর্গ অবস্থানুসারে যখন যেরূপ প্রয়োজন নিজেরাই বুঝিয়া সব ব্যবস্থা করিয়াছেন। ব্যবসায়াদির কর্ম্মপরিচালনার জন্য এবং সাম্প্রদায়িক অন্যান্য স্বার্থরক্ষার জন্য প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু প্রকার সংঘ বা কর্ম্ম-চক্রও গঠিত হইত। ব্রাহ্মণের কোনও অপেক্ষা না করিয়া নিজেরাই সকলে তাহা নিজেদের ইচ্ছামত পরিচালনা করিতেন।

এই সব রীতির ধারা আজও পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। প্রত্যেকটি জাতি বা শাখাজাতি আপনাদের মধ্যে ছোট এক একটি সমাজের মত। 'সমাজ' এই নামও ইহারা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি সম্পাদনের সময় ব্রাহ্মণকে আহ্বান ইঁহারা করেন, তাঁহার সহায়তা গ্রহণ করেন, দানভোজনেও পরিতুষ্ট তাঁহাকে করেন। কিন্তু সামাজিক অন্যান্য সব ব্যাপারে আচারনিয়ম ও প্রতিষ্ঠানাদি কি ভাবে চলিবে, কখন তাহার কি পরিবর্ত্তন হইবে, এ সবের রক্ষাকল্পে কখন কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, কাহাকে কি সামজিক দণ্ড দিতে হইবে, সে সব সামাজিকবর্গ আপনাদের ইচ্ছামতই নির্দ্ধারণ করেন, ব্রাহ্মণের মতামতের অপেক্ষা কিছু করেন না। কোনও কর্ম্মে কি কোনও নিয়মের পরিবর্ত্তনে শাস্ত্রবিধির অনুমোদন যদি আবশ্যক হয়, তখনই

কেবল তাঁহারা ব্রাহ্মণপণ্ডিতের নিকটে পাঁতি চাহেন। অন্যথা সর্ব্বদা তাঁহারা স্বাধীন, এবং ব্রাহ্মণও কেহ এই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না।

সামাজিক জীবনে ব্রাহ্মণ্য প্রভুত্বের কঠোর চাপের কথা এ অবস্থায় আসিতেই পারে না। সমাজের আভ্যন্তরিক বাস্তব অবস্থা কি, যাঁহারা জানেন না, লক্ষ্য করিয়াও দেখেন নাই, তাঁহারাই এইরূপ অভিযোগ আনিয়া থাকেন। আর এই সব অভিযোগ সাধারণতঃ খৃষ্টীয় মিশনারী এবং অন্যান্য ইংরেজ সমালোচকগণের উক্তির প্রতিধ্বনি মাত্র। না বুঝিয়া না দেখিয়া, এই সব মন্তব্য তাঁহারা করিয়াছেন। আমরাও অনেকে না বুঝিয়া না দেখিয়া, তাঁহারা যেমন বলেন, তেমনই বলিয়া থাকি।

একটি অবস্থা বিশেষ ভাবে আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে সমাজের রাষ্ট্রীয় বল কি ধনবল ব্রাহ্মণগণ যেমন নিজেরা অধিকার করিতে চাহেন নাই, তেমন অন্য কোনও সম্প্রদায়ও করিতে পারে নাই, এবং সেরূপ মতি কি প্রয়াসও কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা দেয় নাই। ব্রাহ্মণ নিয়ন্ত্রিত সামাজিক ধর্ম্মনীতির বড় একটি মঙ্গলময় ফল ইহা। অন্য যাহা কিছু ত্রুটিই ব্রাহ্মণের মধ্যে দেখান হউক, শক্তিমান্ কোনও সম্প্রদায় অর্থশোষণে কি বৃত্তিলোপে জনসাধারণের দারুণ দুঃখ দারিদ্র্যের হেতু কখনও হইতে পারেন নাই; এবং সকল প্রকৃতির সকল শ্রেণীর লোকই যাহাতে বিশিষ্ট এক একটি বৃত্তিতে স্থিত থাকিতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা ইহাদের নেতৃত্বাধীন সমাজে ছিল। আধুনিক ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইয়োরোপে যেরূপ সব শ্রমিক-সমস্যা ও বেকারসমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, সেরূপ কোন সমস্যা ভারতীয় সমাজে পূর্ব্বে কখনও উপস্থিত হয় নাই। আর এই সব বিষয়ে সাম্প্রদায়িক কোনও প্রতিযোগিতার সংগ্রামও এই সমাজে দেখা দেয় নাই।

পার্থিব শক্তি ও সম্পদ ব্রাহ্মণগণ কামনা না করিলেও, সে সব দিকে তেমন কোনও চাপ তাঁহাদের হইতে জনসমাজের উপরে না

আসিলেও, স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ ভাবে জ্ঞানসাধনায় ও ধর্ম্মসাধনায় মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের অবকাশ লোকে বড় পায় নাই, এই সব দিকে ন্যায্য অধিকার ভোগে অনেকেই, বিশেষতঃ নিম্ন স্তরের সম্প্রদায় সমূহ, চিরকালই বঞ্চিত রহিয়াছে, এবং তাহার ফলে সজীব সুস্থ ও সবল একটা মনুষ্যত্বের ভাবই তাহাদের মধ্যে বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই; সমাজের শিক্ষক, চিন্তানায়ক ও ধর্ম্মনায়ক রূপে উচ্চ যে অধিকার তাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন, চিরকাল সেই অধিকারে স্থিত থাকিতে পারেন, তাই নানা কৌশলে মানুষের বুদ্ধিকে তাঁহারা চাপিয়া রাখিয়াছেন, চিন্তাকে ভুলপথে পরিচালিত করিয়াছেন; স্বাধীনতার সকল স্ফূর্ত্তিকে কঠোর শাস্ত্রশাসনে চাপিয়া রাখিয়াছেন; হিন্দুসমাজের অধোগতি এই কারণেই প্রধানতঃ হইয়াছে। ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে আর একটি বড় অভিযোগ এই।

এই অভিযোগের মূল্য যে কি, পূর্ব্ববর্ত্তী 'শূদ্রের অধিকার' শীর্ষক প্রবন্ধেই তাহার বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

তবে কখনও কখনও এরূপ চেষ্টা যে হয় নাই, তাহা বলা যায় না। কিন্তু যখনই হইয়াছে, বহু মানবের মনঃশক্তির ও আধ্যাত্মিক বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ইহাতে ব্যাহত হইয়াছে, অথবা ধর্ম্মসাধনা প্রাণহীন অনুষ্ঠানে মাত্র পরিণত হইয়াছে, তখনই বড় একটা বিদ্রোহ ইহার বিরুদ্ধে দেখা দিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থান ইহার সর্ব্বপ্রধান দৃষ্টান্ত। পরবর্ত্তী যুগে তান্ত্রিক শাক্ত ও শৈব ধর্ম্মের এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুত্থান যে হইয়াছে, তাহাও সময়ে সময়ে স্মার্ত্তশাসনের অত্যধিক কঠোর শাসনজনিত সামাজিক এইসব ব্যাধি দূর করিবার প্রয়াস। এবং বৌদ্ধ যুগের পরে এইরূপ প্রয়াস যাহা কিছু হইয়াছে, তাহার নায়কগণও ছিলেন, প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অবসর ব্রাহ্মণ শাসিত হিন্দু সমাজে অতি-কম, ইহা আর একটি বড় অভিযোগ।

সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টিভাবে মানব স্বাধীনতার অধিকার ন্যায়তঃ কোন্ ক্ষেত্রে কি ভাবে কতটা ভোগ করিতে পারে, সমষ্টিধর্ম্মের সঙ্গে ব্যষ্টি জীবনের স্বাধীনতার একটা সামঞ্জস্য কি ভাবে হইতে পারে, পূর্ব্বে বহু প্রসঙ্গে বহু আলোচনা তাহার হইয়াছে। সামাজিক ভাবে প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থ কোনও না কোনও সাম্প্রদায়িক সমাজভুক্ত এবং সেই সমাজের বিধিব্যবস্থা তাহাকে মানিয়া চলিতে হয়। এই সব সমাজের শাসনপদ্ধতি কিরূপ, সামাজিকবর্গের স্থান তাহার মধ্যে কি, পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সমষ্টি জীবনে হিন্দু কোনও ষ্টেটের প্রজা নহে, এইরূপ এক একটি সমাজের সামাজিক। সুতরাং প্রজাকে যেমন ষ্টেটের আইন মানিয়া চলিতে হয়, সামাজিককে তেমনই সামাজিক বিধিনিষেধ ও আচারনিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। কিন্তু সামাজিক ভাবে হিন্দু গৃহস্থকে যতই তাহা মানিয়া চলিতে হউক, মানবের সর্ব্বোচ্চ মঙ্গল যাহার উপরে নির্ভর করে, মনুষ্যত্বের উচ্চতম বিকাশ যাহাতে মানুষ লাভ করিতে পারে, আধ্যাত্মিক সেই ধর্ম্মসাধনার অধিকারে ব্যক্তিগত বিবেকের স্বাধীনতা—liberty of conscience বা freedom of choice যাহাকে বলা হয়—তাহা ব্রাহ্মণশাসিত এই হিন্দুসমাজে যত অধিক দেখা যাইবে, তত আর কোথাও যাইবে কি না সন্দেহ। ইয়োরোপে ত নয়ই। রোমক কি প্রটেষ্টাণ্ট কোনও চার্চ্চই এ স্বাধীনতা লোককে দিতে চান নাই। বহুকালব্যাপী বহুসংগ্রামের পর বর্ত্তমান যুগে ইয়োরোপে মানবের এই স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মবিধির উদারতার ফল ইহা নহে, তাহার বিরুদ্ধে সার্থক একটা বিদ্রোহের ফল। এই বিদ্রোহ অন্যরূপ কোনও ধর্ম্মমতের বিদ্রোহ নহে, ধর্ম্মের বিরুদ্ধে মানবের নাস্তিকী বুদ্ধির বিদ্রোহ। * ইঁহারা সকল বন্ধন হইতে মুক্ত যেরূপ স্বাধীনতার

---

* ৬ষ্ঠ প্রবন্ধ ইয়োরোপে র্যাসনালিজম, ২৪৭—২৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দাবী করেন, সেরূপ স্বাধীনতার অধিকার এদেশে স্বীকৃত হইয়াছিল, এক সন্ন্যাসীর জীবনে। †

পূর্ব্বেও বলিয়াছি, বহু ধর্ম্মমতের সমবায়ে বর্ত্তমান এই হিন্দুধর্ম্ম তাহার বিশিষ্ট আকার লাভ করিয়াছে। খৃষ্টান মুশলমান প্রভৃতি ধর্ম্মের ন্যায় ইহার নির্দ্দিষ্ট ও সঙ্কীর্ণ একটি বাঁধা creed নাই। সাধনা প্রণালীরও ধরা বাঁধা এক রকম একটা রীতি নাই। ইহা যে নাই, তাহাই বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের বিশিষ্টতা। বাঁধা কোনও creed বা মত এবং from বা অনুষ্ঠান পদ্ধতি নাই,—তাই সকল রকম মত ও পদ্ধতিকেই হিন্দুধর্ম্ম আপন করিয়া নিতে পারিয়াছে। বিশিষ্ট কোনও এক পথে সকলকে বাধ্য করিয়া চালাইবার প্রয়োজন তার হয় নাই। § বহু মত ও বহু প্রণালী ইহার মধ্য স্থানে পাইয়াছে। যে যাহার অধিকারী, সে তাহাই গ্রহণ করিয়াছে, ব্রাহ্মণের অনুশাসন এই স্বাভাবিক গতিকে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে আনিয়াছে মাত্র। মানুষের বুদ্ধিকে, তাহার ন্যায্য স্বাধীনতার অধিকারকে, চাপিয়া কখনও রাখিতে চাহে নাই।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় যে সব অধিকারের বৈষম্যের কথা অনেকে দেখাইয়া থাকেন, তার বিস্তৃত আলোচনা পূর্ব্বেই করিয়াছে। এ সব বৈষম্য পার্থিব শক্তির ভোগে অধিকারের বৈষম্য। আর্থিক সম্বন্ধে অতি অভাবে লোকে যদি নিয়ত পীড়িত না হয়, নিশ্চিন্ত মনে শক্তির যোগ্য কোনও বৃত্তি অনুসরণ করতঃ নিজের শ্রমজাত ধন নিজে ভোগ করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, আর আধ্যাত্মিক বৃত্তির যথাশক্তি অনুশীলনের সুযোগ সর্ব্বদা পায়, তার তৃপ্তিতে আনন্দে জীবন ধন্য মনে করিতে পারে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধে পার্থিব

† পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদ দুইটির শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

§ পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

শক্তির অধিকার ভোগে জনসাধারণ বড় লালায়িত হয় না। এই দুইটি বিষয়ে হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের শাসন মোটের উপর জনসমাজের পীড়াদায়ক যে হয় নাই, পূর্ব্ববর্ত্তী সব আলোচনা হইতেই সকলে তাহা বুঝিতে পারিবেন।

হিন্দুর পরা বিদ্যা ও আধ্যাত্মিক ধর্ম্মসাধনার লক্ষ্য ও গতিই এই যে পার্থিব বিষয়সম্ভোগের স্পৃহা হইতে মানবকে তত্ত্বজ্ঞানের দিকে লইয়া যায়, চিত্তকে বাহির হইতে অন্তর্ম্মুখ করে, কর্ম্মকে প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তির মার্গে পরিচালিত করে। এই বিদ্যা ও সাধনার একটা প্রভাব বহু যুগ যুগান্ত ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। লোক শিক্ষার যে প্রণালী এদেশে অনুসৃত হইয়াছে, তার ফলে সর্ব্বসাধারণের মধ্যেই অল্পাধিক পরিমাণে এই প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, সকলের প্রাণেই তাহার অনুপ্রেরণা অল্পবিস্তর প্রবেশ করিয়াছে। তাই পুরুষপরম্পরা-ক্রমে সকল সংস্কার এদেশের লোককে পার্থিব শক্তির আড়ম্বর অপেক্ষা আধ্যাত্মিক শান্তির দিকেই বেশী প্রেরিত করিয়াছে। জীবনযাত্রায় যে পথেই যে চলুক, স্বচ্ছন্দে যদি চলিতে পারে, এই শান্তির ব্যাঘাত না হইলে বিশেষ কোনও বিক্ষোভ জনসাধারণের কখনও হয় না। পার্থিব অধিকার লইয়া বড় কোনও জনবিক্ষোভ যে ভারতে দেখা দেয় নাই, ইহাও তাহার বড় একটি কারণ। সাধারণ জনসমাজের মধ্যে বড় কোনও সাড়া যাহা কিছু জাগিয়াছে, তাহা আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের ক্ষেত্রে, এবং এই সাড়া তখনই জাগিয়াছে যখন ব্রহ্মণ্য শাসনে তাহাদের উপরে কোনও চাপ আসিয়া পড়িয়াছে।

অধুনা যে বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার নিদান সূক্ষ্মদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ইহাই নির্দ্দেশ করেন, যে দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক ও আর্থিক অবস্থার গতিকে সর্ব্বত্র বিষম একটা বৃত্তিবিপর্য্যয় ও আকস্মিক মুল্য বৃদ্ধি ঘটায়, জনসাধারণের জীবনযাত্রার স্বচ্ছন্দতা অতিশয় ব্যাহত হইয়াছে। কোনও অবস্থায়ই দারিদ্র্য হেতু অত্যধিক অভাবের পীড়ন বহুকাল কেহ সহিতে পারে না। এই যে বিপর্য্যয়

ও মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে, ইহা সমাজের উপরে ভারতীয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শাসনের কুফলে নহে, বরং এই শাসনের বিপর্য্যয়েই ঘটিয়াছে।

এই যে বিপর্য্যয় এখন উপস্থিত হইয়াছে, হিন্দুর সামাজিক জীবনের প্রাচীন ধারা তাহাতে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। কি ভাবে, আবার তাহা পুনঃস্থাপিত হইতে পারে, ইহাই এখন বড় সমস্যার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন ঠিক যেমন ছিল, তেমনটি আর হইতে পারে না। কিন্তু যে ধর্ম্ম সেই প্রাচীনের মূলে ছিল, নূতন যাহা গড়িবে, সেই ধর্ম্মের ভিত্তির উপরেই তাহাকে গড়িয়া লইতে হইবে। ইহারও প্রাণ আসিতে পারে, হিন্দু জনগণের মধ্যে নব জাগ্রত সেই ধর্ম্মেরই চেতনা হইতে। এই চেতনা তাহার সকল জীবন্ত শক্তির প্রেরণা লইয়া হিন্দু জনগণের প্রাণে দারুণ অবসাদে ক্রমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে, হিন্দুর এই অধোগতি তাহাতেই হইয়াছে। কেন, কিসে, তাহা এমন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। এইরূপ অবসাদের যুগ সকল জাতির জীবনেই মধ্যে মধ্যে আইসে। যখন আইসে, সকল শক্তিতে সে জাতি দীন হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মণ এই অবসাদের সৃষ্টি করেন নাই; বরং ব্রাহ্মণের যে ব্রহ্মণ্য প্রভাব তাহাও এই অবসাদের মূর্চ্ছায় মূর্চ্ছিত হইয়া রহিয়াছে। আধুনিক এই ব্রাহ্মণজীবনের অবস্থা দেখিলে, কেহই এই ভরসা বড় করিতে পারেন না যে এই ব্রাহ্মণ আবার হিন্দুসমাজকে নূতন জীবনে নূতন এই যুগের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিবেন, অথবা গড়িয়া উঠিলেও হিন্দুসমাজকে তার ধর্ম্মে স্থির রাখিতে পারিবে। অথচ অতীতে যেমন ছিল, ভবিষ্যতেও তেমনই ব্রাহ্মণের ন্যায় কোনও সম্প্রদায়কে এই সমাজের নায়ক হইতে হইবে। এইরূপ নায়কত্বই অতীতের সেই আদর্শে নব্য এই যুগেও ইহাকে ইহার বিশিষ্ট ধর্ম্মে স্থির রাখিয়া মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতে পারে।

কিন্তু ধর্ম্মের এই চেতনা হিন্দুর প্রাণে কে আবার জাগাইবে ? এই মূর্চ্ছা কে দূর করিবে ? নূতনকে কে সৃষ্টি করিবে ? যিনি পারেন, হায়, কবে তিনি ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আবার এই ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হইবেন !

এই অবসাদ, গ্লানি, এই বিপর্য্যয়, দূর করিয়া ধর্ম্মের পুনঃসংস্থাপন সাধারণ মানুষের কাজ নয়।

১০। হিন্দু নাম ও সামান্য লক্ষণ

গুণকর্ম্ম বিভাগে মোটের উপর চারিটি বর্ণে বিভক্ত বহু রাজ্যবাসী বহু জাতির ও শাখাজাতির (castes and sub-castesএর) এই যে একটা সামাজিক যোগ ভারতে হইয়াছে, অধুনা আমরা ইহাকে হিন্দুসমাজ বলিয়া থাকি। কিন্তু ইহার এরূপ কোনও সমান নাম এদেশের প্রাচীন কোনও শাস্ত্রে কি সাহিত্যে কি লোক-প্রবাদে কোথাও পাওয়া যায় না। যে ধর্ম্ম প্রত্যেকটি বর্ণকে, বর্ণের মধ্যে এক এক অঞ্চলবাসী প্রত্যেকটি জাতি ও শাখাজাতিকে তাহার বিশিষ্ট সামাজিক স্বরূপে ধরিয়া রাখিয়া, সকলকে এই যে এক যোগ-সূত্রের বন্ধনে বাঁধিয়া অতি জটিল এক সমবায়ের আকার দিয়াছে, তাহারও এরূপ কোনও সমান নাম নাই,—যদিও অধুনা আমরা হিন্দু ধর্ম্ম এই নামে ইহার বিশিষ্টস্বরূপকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকি।

আর্য্য নাম আছে, অনার্য্য নাম আছে ;—ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি চারি বর্ণের নাম আছে, বহু সঙ্কর বর্ণেরও নাম আছে। কৌরব, পাঞ্চাল, কোশল, বিদেহ, বঙ্গ, পৌণ্ড্র, ওড্র, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, শক, হূন, পারদ, পহ্লব, যবন (কৌরবাঃ, পাঞ্চালাঃ, কোশলাঃ, বিদেহাঃ, বঙ্গাঃ, পৌণ্ড্রাঃ, ওড্রাঃ, দ্রাবিড়াঃ, মহারাষ্ট্রাঃ, শকাঃ, হূনাঃ, পারদাঃ, পহ্লবাঃ, যবনাঃ,) প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাদেশীয় বা কৌলিক জাতি বা সম্প্রদায়েরও অনেক নাম আছে। কিন্তু একজাতি (nation) বা দৃঢ়সংহত

এক সমাজ (a compact society or social organism) রূপে সমগ্র ভারতবাসীর বিশিষ্ট একটি কোনও নাম নাই, যেমন 'হিন্দু সমাজ' নাম আমরা এখন ব্যবহার করিয়া থাকি।

ধর্ম্ম নাম আছে, শুধুই ধর্ম্ম, যাহা 'সনাতন' ও 'শাশ্বত'—অনাদি কাল হইতে আছে, অনন্তকাল থাকিবে, সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই যাহা লোকস্থিতির ধারক। এই ধর্ম্ম হইতে প্রসূত বিশেষ বিশেষ নিয়ম-সংস্থানরূপে বর্ণধর্ম্ম, আশ্রম ধর্ম্ম, নাম আছে,—তাহারই মধ্যে আবার বিশেষ বিশেষ নিয়ম-সংস্থানরূপে, ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম, ক্ষাত্রধর্ম্ম, বৈশ্য ধর্ম্ম, শূদ্রধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্ম, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, বানপ্রস্থ ধর্ম্ম, ভিক্ষুধর্ম্ম, এই সব নামও আছে।—কিন্তু যেমন 'হিন্দুসমাজ' এই নাম নাই, তেমন এইরূপ কোনও সমাজ বিশেষের ধারকশক্তি রূপে 'হিন্দুধর্ম্ম' এই নাম কোথাও পাওয়া যায় না।

ভগবৎতত্ত্বে বিশ্বাস এবং ভগবদুপাসনামূলক অনুষ্ঠানপদ্ধতিকে বুঝাইতে 'রিলিজন' (religion) এই নামে ধর্ম্ম কথাটির বিশিষ্ট যে একটি দ্যোতনা আছে, সে ভাবেও বৌদ্ধ ধর্ম্ম, জৈন ধর্ম্ম, খৃষ্টান ধর্ম্ম, মুশলমান ধর্ম্ম প্রভৃতি নামের ন্যায় 'হিন্দু ধর্ম্ম' বলিয়া কোনও নাম এদেশে প্রাচীন সাহিত্যে কোথাও নাই। এই ভাবে মোট জীবননীতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার একটি বিষয়কে মাত্র বুঝাইতে ধর্ম্ম কথাটির প্রয়োগই এদেশের আচার্য্যগণ বড় করেন নাই। তবে ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে বহুবিধ মত এবং ভগবদুপাসনার বা আধ্যাত্মিক সাধনার বহুবিধ প্রণালী এদেশে আছে। ইহা বুঝাইতে 'মত' 'আচার' 'ভাব' 'মার্গ' ও 'পন্থা' এই সব নাম আছে,—যেমন, বেদাচার বা বেদমার্গ, তন্ত্রাচার বা তন্ত্রমার্গ, শাক্তাচার, শৈবমার্গ, বৈষ্ণবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, দিব্যভাব, বীরভাব, পশুভাব, কর্ম্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ ইত্যাদি। আবার বিভিন্ন মতাবলম্বী বা মার্গাবলম্বী সম্প্রদায়গুলিকে বুঝাইতেও অনেক নাম আছে, যেমন মীমাংসক, বৈদান্তিক, সাংখ্য, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য, সৌর

ইত্যাদি। কিন্তু সমগ্রতায় সকলকে বুঝাইতে 'হিন্দু' এই নাম নাই, এবং এই সকল মত বা মার্গকে বুঝাইতে সামান্যতঃ 'হিন্দুধর্ম্ম' এই নামও নাই।

হিন্দু নাম ত নাই-ই, এইরূপ কোনও নামই নাই। নাই, তাহার কারণ, এই যে সমাজ বা সামাজিক সমবায়, এই যে তাহার ধর্ম্ম, একটি সংজ্ঞার দ্বারা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, সকলের সম্বন্ধে এরূপ স্পষ্ট কোনও সামান্য লক্ষণ ইহার কিছুর মধ্যে নাই।

এই যে বহুস্তরের বহু জাতির সামাজিক একটা যোগ ভারতে হইয়াছে, ইহারা সকলেই বর্ণভেদে সামাজিক একটা স্তরভেদ এবং তাহাতে কর্ম্মে একটা অধিকার ভেদের নীতি মানে। শাস্ত্রীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানও বর্ণোচিত বিধানে সকলে সম্পাদন করে। ব্রহ্মণ বর্ণকে একটা প্রাধান্যও এই সবকর্ম্মে সকলে দিয়া থাকে, এবং ধর্ম্মনিরূপণে তাহাদের নেতৃত্বও সকলে স্বীকার করে। ভারতীয় জ্ঞান ও বিদ্যা প্রাচীন যে সাহিত্যে সঞ্চিত আছে, সেই জ্ঞান, সেই বিদ্যা, সেই সাহিত্য, সাহিত্যের সংস্কৃত সেই ভাষা, পঞ্চনদ হইতে কামরূপ এবং হিমাচল হইতে কুমারী পর্য্যন্ত সকলেরই সমান সম্পদ। চিন্তার ধারায়, চরিত্রের আদর্শে, জীবনধর্ম্মের সিদ্ধির লক্ষ্যে, এই জ্ঞান ও বিদ্যার প্রভাব—কেহ বেশী কেহ কম, সকলেই কিছু না কিছু গ্রহণ করিয়াছেন। সহস্র বৈষম্যের মধ্যেও, লোকাচার মোটের উপরে এই প্রভাবের বশে, ইহারই আদর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভগবৎতত্ত্ব যেরূপ বিশ্বাস লইয়া যে সব অনুষ্ঠানে ভগবদারাধনারূপ যে ধর্ম্মসাধনা সকলে করে, বেদ বা আগম তাহার মূল উৎস, পুরাণ ও তন্ত্র সেই উৎস হইতে নিঃসৃত ধারাসমূহের আধার। স্থানভেদে, অবস্থা ভেদে, উচ্চাবচ স্তরে জ্ঞানের অধিকার ভেদে, লোকাচারবৈচিত্রে যতই বিভিন্ন একটা ভাব তাহার মধ্যে দেখা যাউক, তত্ত্বতঃ সবই এক, একই উৎস হইতে নিঃসৃত বিভিন্ন ধারা, একই বৃক্ষের

বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা। স্তরভেদ যাহা দেখা যায়, তাহাও একই পর্ব্বতমালার বিভিন্ন স্তর, যে যেখানে পারিয়াছে আশ্রয় নিয়াছে, যে যখন পারিবে, উচ্চতর স্তরে উঠিবে। বহিঃপ্রকাশের বিষম বহুত্বের মধ্যে অন্তস্তত্ত্বে সমান এই একত্বের প্রমাণ এই সব শাস্ত্রে সকলেই পাইবেন।

যদি বিশ্লেষণ কেহ করেন, মূলে উপনীত হন, দেখিতে পাইবেন, সার্ব্বভৌমিক এমনই এক সত্যে সেই তত্ত্বের সকল রহস্যের ভিত্তি, যে, যে কোনও প্রকার ধর্ম্মমত তাহাহইতে অভিব্যক্ত হইতে পারে এবং যে কোন ধর্ম্মমতকে ইহার সঙ্গে মিলাইয়া নেওয়া যাইতে পারে, যদি সেই মত আপন গণ্ডীর মধ্যেই একমাত্র সত্য রহিয়াছে এই দাবীর অভিমানে অপর সকল মতের সঙ্গে বিরোধ না করে *। তাই বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন ধর্ম্মের বহু মত, বহু অনুষ্ঠান, হিন্দু নামে পরিচিত এই ধর্ম্মের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে †।

* খৃষ্টান ও মুশলমান এই দুইটি ধর্ম্ম এই জাতীয় ধর্ম্ম। খৃষ্টান ও মুশলমান উভয়েই দাবী করেন, তাঁহাদের নিজ নিজ ধর্ম্মই সকল মানবের পক্ষে একমাত্র সত্যধর্ম্ম এবং অপর সকল ধর্ম্মমতই ভ্রান্ত, পরন্ত পাপমূলকও বটে। সর্ব্বত্র ধর্ম্মের প্রচারে অপর ধর্ম্মাবলম্বীদের আপন ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে আনিতে খৃষ্টান ও মুশলমান উভয়েরই এত আগ্রহ তাই দেখা যায়।

† তন্ত্রে 'চীনাচার' নামে এক প্রকার সাধনাপদ্ধতি আছে। তান্ত্রিক আরও বহু অনুষ্ঠান মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে। সমগ্র তন্ত্রকেই কেহ কেহ মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্রের 'হিন্দু' রূপান্তর বলিয়া মনে করেন। শৈব ধর্ম্মের বহু আচার অনার্য্য জাতিদের ধর্ম্ম হইতে গৃহীত। চৈত্র মাসের নীলপূজার গাজন ইহার একটি দৃষ্টান্ত। 'সিন্নী' একটি মুসলমানী অনুষ্ঠান। সিন্নী দিয়া যে সত্যনারায়ণের সেবা করা হয়, মুসলমান কোনও 'পীরের' হিন্দুরূপান্তর তিনি। সত্যপীর এই নামও এখন বর্ত্তমান আছে। 'আসান পীর' নামে কোনও পীরের সিন্নী পল্লীবাসিনী হিন্দুনারীরা এখনও অনেক স্থলে দিয়া থাকেন। ধ্যানস্থ যে মূর্ত্তিতে মহাদেবের পূজা হিন্দুরা করিয়া থাকেন, অনেকে বলেন, তাহা ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তিরই রূপান্তর। দশমহাবিদ্যার

যাহাহউক, জ্ঞানে ও বিদ্যায়, চিন্তায় ও চরিত্রের আদর্শে, জীবননীতির মূল লক্ষ্যে, গৃহীত ধর্ম্মমতের ও আচরিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের মূল তত্ত্বের সত্যে এবং কর্ম্মে এই অধিকার ভেদের রীতিতে, এই যে একটা সমতার ভাব দেখান হইল, যাহাকেই কেহ কেহ cultural unity বলিয়া থাকেন, ইহাকেই বিচিত্র এই সমবায়ের সামান্য লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বহিরঙ্গের ও বহিরাচারের অশেষ বৈষম্যের মধ্যে এই সব সামান্য লক্ষণ এমনই ভাবে ডুবিয়া রহিয়াছে, যে সহজে কেহ তাহা ধরিতে পারেন না।

তবে এই সব বৈষম্যের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি সমান লক্ষণ আবার সকলের মধ্যেই দেখা যাইবে। গৃহী হিন্দু কেহ স্বতন্ত্র নহে, যে স্তরের যে জাতীয়ই হউক, সামাজিক সে ভাবে কোনও না কোনও সম্প্রদায়ের (communityর) অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বৃহত্তর এক একটি জাতির (casteএর)

তারাদেবী যে বৌদ্ধপূজিতা আদিবুদ্ধ-শক্তি তারা, পূজাপদ্ধতিতে স্পষ্ট তাহার আভাস রহিয়াছে। বিভীষণা মূর্ত্তি এবং আচারবিশেষে পূজারও অতিশয় একটা চণ্ড ভাব দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন, কালীও মূলে প্রচণ্ড কোনও অনার্য্যদের উপাসিতা দেবী ছিলেন। হইতে পারে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতিতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্বের সঙ্গে এমনই ভাবে ইহার তত্ত্বকে মিলান হইয়াছে, যে ইহার এই মূর্ত্তির কল্পনা যেখান হইতেই গৃহীত হউক, শক্তিরহস্যের ও প্রকৃতি রহস্যের সর্ব্বপ্রধান প্রকাশরূপে ইহার আরাধনা হিন্দু সাধকরা এখন করিয়া থাকেন, এবং আদ্যাশক্তির প্রধান মূর্ত্তিই ইনি হইয়াছেন। অন্যান্য অনেক দেবদেবী সম্বন্ধেও ইহা বলা যাইতে পারে, যে ধর্ম্ম কি যে জাতি হইতেই ইহাদের মূর্ত্তির কল্পনা কি পূজা উৎসবের কোনও কোনও অনুষ্ঠান গৃহীত হউক, হিন্দুর দেববিজ্ঞান ও পূজাবিজ্ঞানের মধ্যে এমন ভাবেই ইহাদের আনা হইয়াছে, পৌরাণিক সব কাহিনীর মধ্যেও ইহাদের লীলার কাহিনী এমন অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত হইয়াছে, যে বিজাতীয় কি বিধর্ম্মীয় বলিয়া কোনও মূর্ত্তিকে কি কোনও অনুষ্ঠানকে কেহ অনুভবই করিতে পারিবেন না। বহু মতের এই সমন্বয় যে সম্ভব হইয়াছে, মূল তত্ত্বের সার্ব্বভৌমিকতাই তাহার কারণ।

মধ্যে বহু এইরূপ শাখা জাতি বা সম্প্রদায় হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ আচারনিয়মে প্রত্যেকটি এইরূপ শাখা জাতি বা সম্প্রদায় ছোট এক একটি 'সমাজে'র মতও হইয়াছে। এইরূপ যে সম্প্রদায়ে বা 'সমাজে' যে জন্মগ্রহণ করে, গৃহস্থ রূপে সেই সাম্প্রদায়িক 'সমাজের'ই একজন সামাজিক হইয়া তাহাকে থাকিতে হয়। কখনও কখনও এক শাখা হইতে সেই জাতিরই অন্য শাখায় সে যাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ কোনও না কোনও সম্প্রদায়ের বাহিরে স্বতন্ত্র কোনও গৃহস্থ রূপে হিন্দুসমাজের মধ্যে তাহার কোনও স্থান নাই। এই সম্প্রদায়ের সামাজিক আচারনিয়ম তাহাকে মানিয়া চলিতে হইবে,—নতুবা অপর সামাজিকবর্গ সকলে তাহাকে বর্জ্জন করে, সম্প্রদায়-হইতে বহিষ্কৃত সে হয়, তাহার 'জাতি যায়'।

যথাবিহিত অথবা সামাজিকবর্গের অনুমোদিত কোনও না কোনও রূপ প্রায়শ্চিত্তের বা দণ্ডগ্রহণের পর আবার সে স্বীয় সম্প্রদায়ে গৃহীত হইতে বা 'জাতিতে উঠিতে' পারে। কিন্তু বহিষ্কৃত বা জাতিচ্যুত এইরূপ গৃহস্থ অন্য কোনও সম্প্রদায়েই স্থান পায় না, একেবারে একক তাহাকে হইতে হয়। বিষয়কর্ম্মে অপরের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ স্থাপনা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ সে হয়ত কোনও মতে করিতে পারে। কিন্তু হিন্দু-সামাজিক ভাবে কোনও সম্বন্ধ কাহারও সঙ্গে তাহার থাকে না। সামাজিক কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠান সে করিতে পারে না,—হিন্দুসমাজের মধ্যে হিন্দু আচারে কোথাও পুত্রকন্যার বিবাহ দেওয়াও তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। এইরূপ বহিষ্কার বা জাতিচ্যুতি দণ্ডকে হিন্দু গৃহস্থ মাত্রই বড় ভয় করেন। *

* অধুনা ইংরেজিশিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক আচারনিয়ম মানিবার প্রবৃত্তি কমিয়া গিয়াছে, এবং সামাজিকরাও তাহা মানাইতে বড় কাহাকেও পারেন না, বিশেষ যদি বড় বড় নগরে সাধারণ সামাজিক-বর্গের সংস্রব হইতে দূরে তাঁহারা বাস করেন। কিন্তু ইঁহাদিগকেও বিবাহে এবং পিতৃমাতৃ বিয়োগে অশৌচপালনে ও শ্রাদ্ধে অন্ততঃ স্বকীয় সম্প্রদায়ের নিয়মানুসারে

কালের গতিকে অবস্থায় পরিবর্ত্তনে এই সব আচারনিয়মের পরিবর্ত্তনও হইতেছে। কিন্তু যখন যেরূপ আচারনিয়ম সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাগে সামাজিকবর্গের অনুমোদিত হয়, তখন তাঁহাই মানিয়া সকলকে চলিতে হয়। এযাবৎ শান্ত ও সন্তুষ্ট ভাবেই আচারনিয়মের অনুবর্ত্তিতা সকলে করিয়া আসিয়াছেন। অধুনা ইয়োরোপীয় সভ্যতার, বিশেষতঃ তাহার র‍্যাসনালিষ্ট মতের প্রভাবে ইহার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের ভাব ইংরেজিশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা দিয়াছে। আচার নিয়মের এই সামাজিক প্রভাবকে অতি অসঙ্গত কঠোর একটা শাসন ও ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতার অধিকারের উপরে বড় কঠোর একটা চাপ বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু একটি কথা আমাদের এখানে বুঝিয়া দেখিতে হইবে। সমষ্টিজীবনে হিন্দু গৃহস্থ কোনও হিন্দু ষ্টেটের প্রজা নহে, কোনও না কোনও সাম্প্রদায়িক সমাজের সামাজিক। ষ্টেটের প্রজাকে ষ্টেটের পাশকরা আইন মানিয়া চলিতে হয়, ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতার অধিকার যতই তাহাতে ক্ষুণ্ণ হউক। নহিলে ষ্টেট্ থাকে না, ষ্টেটে ধৃত সমষ্টিজীবনও থাকে না। ঠিক তেমনই, যে আচারধর্ম্মে সমাজ ধৃত আছে, সামাজিককে তাহা মানিয়া চলিতে হইবে, নতুবা ইহার লোপে সমাজও লোপ পায়। আধুনিক গণতান্ত্রিক ষ্টেটের আইন প্রজার প্রতিনিধিবর্গের ভোটে পাশ হয়। সুতরাং সাক্ষাৎ ভাবে না হইলেও, পরোক্ষ ভাবে অন্ততঃ প্রজার সম্মতিতে তাহা পাশ হয় এইরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু সামাজিক এই আচার ধর্ম্ম? তাহাও কি সামাজিক বর্গেরই সহজ অনুমোদনের উপরে অতি অধিক পরিমাণে নির্ভর করে না? শাস্ত্রীয় ধর্ম্মবিধির যে প্রভাব ইহার মধ্যে আছে, তাহাও সামাজিকবর্গ বংশপরম্পরাক্রমে ধর্ম্মবুদ্ধিতেই মানিয়া আসিতেছেন। যতটা সহজে

চলিতে হয়। ব্যতিক্রম হইলে জাতিচ্যুত তাঁহারা হন। হিন্দু নামে পরিচিত সকলেই অন্ততঃ এই সব নিয়ম মানিয়া চলেন।

এই ধর্ম্মবুদ্ধিতে লোকে ইহা মানিয়া আসিতেছে, ততটাই তাহার প্রভাব সামাজিক আচারনিয়মের মধ্যে রহিয়াছে, তার বেশী নয়। হিন্দুর সমষ্টিজীবনের মূর্ত্তি ষ্টেট নহে, সমাজ,—ইহার সংহতির বন্ধন আইন নহে, ধর্ম্ম ; এই সত্যটি যদি আমরা মনে রাখি, তাহা হইলে আচার নিয়মের এই শাসনকে অতি কঠোর কি অসঙ্গত বলিয়া আমাদের মনে হইবে না। ষ্টেটের প্রভুত্বের সম্মুখে ব্যক্তিত্বের অধিকারকে যেরূপ সঙ্কুচিত করিয়া আমরা রাখি বা রাখিতে আমাদের হয়, সামাজিক প্রভুত্বের কাছেও তাহা করিতাম,—বুঝিতাম, করিতে আমাদের হইবে *। ষ্টেট্ যদি তাহার প্রভুত্বের অপপ্রয়োগ করে, তাহার প্রতিকার যেমন প্রজার উদ্যমে হয়, সামাজিক প্রভুত্বের অপপ্রয়োগের প্রতিকারও তেমনই সামাজিকগণের উদ্যমে হইতে পারে, হইয়াও থাকে।

---

* "Political liberty means not mere absence of restraint, but freedom from unwise restraint, and implies the positive side of subjection to good laws, which those who submit to them recognise as in some way made by themselves, whether directly, or through representatives, or by trusted rulers. Liberty in its positive sense may, therefore, mean the sovereignty of law, as distinct from sovereignty of individuals, and if liberty comes to mean the absence of all laws, we regard that as corruption or degradation of liberty, and call it more properly licence. Such merely negative liberty would practically mean the tyranny of the strongest."

Principles of State Interference by Professor D, G, Ritchie, Essay III, p. 85

এই উক্তিতে যাহা ষ্টেট্, তাহাই এদেশে সমাজ। যাহা political liberty, তাহাই সামাজিক স্বাধীনতা, যাহা আইন বা law, তাহাই শাস্ত্রবিধি বা আচারনিয়ম।

(১১শ প্রবন্ধ, ন্যাসনালিজম ও ধর্ম্মনীতি, ৬৭০—৭১পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

পূর্ব্বে বড় কোনও উৎপাতের কি স্বেচ্ছাচারের প্রভাবে সমাজ-বিপন্ন হইয়া পড়িলে, রাজশক্তি ধর্ম্মস্থাপনার সহায়তা করিতেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মুশলমান শাসনের পর হইতে এ সহায়তা সমাজ বড় পায় না,—রাজশক্তি বরং ইহার প্রতিকুল হইয়া দাঁড়ায়। সামাজিকবর্গকেই আচারনিয়মের কঠোর শাসনে সমাজকে রক্ষা করিতে হইতেছে। ইহা ব্যতীত উপায়ান্তর আর কিছু নাই। *

আর একটি কথাও আমাদের এখানে মনে রাখিতে হইবে। যতদিন কেহ গৃহস্থ, ততদিনই সে সামাজিক এবং সামাজিক রূপে সমাজের বিধিনিষেধ তাহাকে মানিয়া চলিতে হয়। এ সবের সকল বন্ধন হইতে সে মুক্ত হয় সন্ন্যাস আশ্রমে। সন্ন্যাসী গৃহস্থও নহে, সামাজিকও নহে।

প্রত্যেকটি জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যেই এইরূপ রীতি রহিয়াছে, এই ভাবেই ইহাকে একটা সামান্য লক্ষণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে মিলনের হেতু হইতে পারে, তাহার বন্ধনকে দৃঢ় করিতে পারে, এ জাতীয় কোনও সমান গুণের লক্ষণ ইহা নহে, বরং তাহার পক্ষে কতকটা প্রতিকুলই ইহা হইয়াছে।

এমন একটি সুবৃহৎ দেশের অধিবাসীদের মধ্যে,—স্থানীয় প্রকৃতিতে, জাতীয় প্রকৃতিতে, দৈহিক আকৃতিতে, স্বভাবের গুণে ও মনঃশক্তির বিকাশে, এত বৈষম্য যেখানে,—সামান্য কোনও ধর্ম্ম সেখানে এমন কিছুই হইতে পারে না, যাহাতে সমান এক ভূমিতে সকলকে দৃঢ় সংহত এক সমাজে মিলাইয়া নেওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোনও রূপ ধর্ম্মচক্রের কি রাষ্ট্রচক্রের বন্ধনে জোর করিয়া এইরূপ মিলাইতে যাওয়া অস্বাভাবিক একটা প্রয়াস এবং ইহাতে সু-ফল অপেক্ষা কু-ফলই বেশী হয়।

---

* সামাজিক জীবনে সমাজের এই শাসন মানিয়া অন্য কোন্ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে কি স্বাধীনতা হিন্দু গৃহস্থ ভোগ করে, তার সম্বন্ধে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ, ৮১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এইরূপ প্রয়াসও এদেশে হয় নাই, বরং স্বাভাবিক বৈষম্যকে স্বীকার করিয়া নিয়া তদনুসারেই অধিকারবিভাগ ও কর্ম্মবিভাগ হইয়াছে, এবং মূল যে সব যোগসূত্রে পরস্পরের সঙ্গে সকলে যুক্ত, তাহার অবিরোধী ভাবে প্রত্যেকটি জাতি, প্রত্যেকটি সম্প্রদায় আপন আপন বিশিষ্টতায় সামাজিক পরিণতি যাহাতে লাভ করিতে পারে, তাহার অবসরও সকলকে দেওয়া হইয়াছে।

এই মহাদেশ ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীরই একটি সংক্ষিপ্ত সার। ভারতের ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক একটা ধর্ম্মসমন্বয়, পরস্পর অবিরোধী ভাবে সকল মতই যাহার মধ্যে স্থান পাইতে পারে ও পাইয়াছে। ভারতীয় এই সমাজেও যেন সমগ্র মানবজাতি তাহার অশেষ বৈচিত্র লইয়া আশ্চর্য্য এক যোগসূত্রে মিলিত হইয়াছে। একটি বিশিষ্ট নামে এই ধর্ম্মকে ও সমাজের প্রকৃতিকে লক্ষিত করা সম্ভব হয় না।

হিন্দু নামের নিদান

'হিন্দু' এই নাম তবে কোথা হইতে আসিল? কখন কিভাবে প্রচলিত হইল?

প্রাত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতরা বলেন, বর্ত্তমান কাশ্মীর ও আফগানিস্থানের উত্তরপশ্চিমে প্রাচীন পারস্য বা ইরাণ অঞ্চল, একেবারে আদিম না হইলেও, আর্য্যজাতির বড় এক অধিষ্ঠানভূমি ছিল। এই স্থান হইতে এই আর্য্য জাতির এক শাখা ভারতে প্রবেশ করিয়া প্রথমে সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী প্রদেশে বসতি স্থাপন করেন। ইঁহাদের প্রতিপক্ষ আর এক শাখা এই ইরাণ অঞ্চলেই রহিয়া যান এবং আধুনিক পারসিক জাতি তাঁহাদের বংশধর। এক অঞ্চল নিবাসী একই জাতির দুইটি সম্প্রদায় ইঁহারা ছিলেন। ধর্ম্মমতে অনেক সমতা ছিল, এবং ভাষাও ছিল একই মূলভাষার সামান্য প্রকার ভেদ মাত্র, যেমন একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায়। প্রাচীন ইরাণী বা পার্শি ভাষা সেই জাতির প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র জেন্দ আবেস্তায় এবং প্রাচীন

ভারতীয় ভাষা বৈদিক মন্ত্র সংহিতায় সুরক্ষিত আছে। এই দুই ভাষা একই ভাষার প্রাদেশিক প্রকার ভেদ মাত্র। আধুনিক পশ্চিম ও পূর্ব্ব বাঙ্গালার প্রাকৃত কথার ভাষায় যে পার্থক্য আছে, তাহা অপেক্ষা বেশী কিছু পার্থক্য এই দুই ভাষার মধ্যে পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য ভাষায় 'স' ও 'ক' স্থলে ইরাণী ভাষায় 'হ' উচ্চারণ সাধারণ একটা নিয়ম। ভারতের 'সিন্ধু' ইরাণী ভাষায় 'হিন্ধু' বা 'হিন্দু'; এবং সিন্ধুতীরবাসী এই জাতিকেও ইরাণীরা 'হিন্দু' বলিতেন। তাঁহাদের হইতে ক্রমে মধ্য ও পশ্চিম এসিয়ায় সর্ব্বত্রই এই ভারতবাসীরা হিন্দু নামে পরিচিত হন। ইরাণী ভাষায় দেশের দেশের নাম 'স্তান' বা 'স্থান' (যেমন আফগানি-স্থান, বেলুচিস্থান, পার্শিস্থান, কুর্দ্দিস্থান, তুর্কীস্থান, ইত্যাদি)। ভারতের নামও হয় হিন্দুস্তান বা হিন্দুস্থান। 'হিন্দু' এই নামই ক্রমে আরও পরিবর্ত্তিত হইয়া পরে হিন্দ্ ও ইন্দ্ হয়। গ্রীকরা পরিবর্ত্তিত এই সহজতর নাম গ্রহণ করেন, এবং সিন্ধুকে তাঁহারা 'ইন্দুস্' (Indus) বলিতেন এবং এই দেশও তাঁহাদের ভাষা হইতে ইয়োরোপে ইন্দিয়া বা ইণ্ডিয়া নামে পরিচিত হইয়াছে। যবন (গ্রীক), শক, হূন, পারদ, পহ্লব প্রভৃতি যে সব জাতি ভারতের অধিবাসী হন, তাহাদের নিজেদের ভাষার কি সাহিত্যের কোনও নিদর্শন বড় কিছু নাই। ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যই তাঁহাদের ভাষা ও সাহিত্য হয়। সামাজিক ভাবেও ইঁহাদের পার্থক্য কিছু থাকে না। সুতরাং ইঁহাদের আমলে হিন্দু নামও দেশে প্রচারিত হয় না। পরবর্ত্তী যুগে পাঠান তুর্কী মোগল প্রভৃতি নানা জাতীয় মুশলমান এদেশে আসেন। ধর্ম্মে ও সামাজিক জীবনে ইঁহারা পৃথক্ এক সম্প্রদায় ছিলেন, পৃথক্ এক ভাষা এবং সাহিত্যও ইঁহাদের ছিল। পূর্ব্বতন ভারতবাসীকে ইঁহারা হিন্দু এবং দেশকেও হিন্দুস্থান বলিতেন। পার্শী ভাষা ও পার্শী সাহিত্যই ভারতীয় মুশলমানদের প্রধান ভাষা ও সাহিত্য ছিল। জনসাধারণের মধ্যে প্রাকৃত যে ভাষা ছিল, তাহাও অনেক স্থলে পার্শি ভাষার প্রভাবে রূপান্তরিত হয়। ইহাই

উর্দ্দু ভাষা, এবং পার্শি ভাষার প্রভাব যেখানে কম গিয়া পড়ে, সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বেশী থাকে, তাহা 'হিন্দী' বা হিন্দুদের ভাষা নামে পরিচিত হয়। ক্রমে এই সব কারণে হিন্দু নাম সর্ব্বত্র সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত হইয়া উঠে। কথার ভাষার প্রচলিত হয় বটে, কিন্তু এই সময়ে সংস্কৃত গ্রন্থাদি যাহা রচিত ও প্রচারিত হয়, তাহার মধ্যে এই নাম কোথাও পাওয়া যায় না। অতি আধুনিক একখানি তন্ত্রে মাত্র এই হিন্দুনাম আছে, এবং গ্রন্থকার ইহার একটি ব্যুৎপত্তি দিবারও চেষ্টা করিয়াছেন, যথা—

হীনঞ্চ দূষয়ত্যেব হিন্দুরিত্যুচ্যতে প্রিয়ে।

কিন্তু ইহারই পরবর্ত্তী উক্তিগুলি এইরূপ—

পূর্ব্বাম্নায়ে নবশতং ষড়শীতিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ফিরিঙ্গি ভাষয়া মন্ত্রাস্তেষাং সংসাধনাৎ কলৌ।
অধিপা মণ্ডালাঞ্চ সংগ্রামেষ্বপরাজিতাঃ॥
ইংরেজা নবষট্ পঞ্চ লণ্ড্রজাশ্চাপি ভাবিনঃ॥ *

এই তন্ত্র—অন্ততঃ তন্ত্রের এই অংশ যে একেবারে আধুনিক এই ইংরেজ আমলে রচিত, এ সম্বন্ধে বেশী কিছু আর বলা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন।

তখনকার ভারতীয় পণ্ডিতবর্গের উচ্চাঙ্গ বিদ্যালোচনার ভাষা ছিল সংস্কৃত, আর রাজকীয় প্রধান ভাষা ছিল পার্শী। রাজকর্ম্মে যাঁহারা উচ্চপদ কামনা করিতেন, তাঁহারা এই ভাষায় ও সাহিত্যে উচ্চবিদ্যা অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেন। কিন্তু ভারতীয় বিবিধ জ্ঞানের তত্ত্বালোচনা সংস্কৃতেই হইত। তাহার মধ্যে হিন্দু নাম ত নাই-ই, ভারতীয় প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বী ও প্রাচীন সমাজপন্থীদের, অথবা তাহাদের ধর্ম্মকে কি সমাজকে, বুঝাইতে এরূপ কোনও একটি নামও নাই। নাই তার কারণ,

* এই তন্ত্রখানির নাম ঠিক জানিতে পারি নাই। প্রকৃতিবাদ অভিধান হইতে এই বচনটি উদ্ধৃত হইল। শুনিয়াছি যোগিনী ও মেরু তন্ত্রের কোনও একখানির মধ্যে এই বচনটি আছে।

মুশলমানের এত বড় একটা প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম্ম ও সমাজের সম্মুখেও একটি নামে প্রকাশ করা যাইতে পারে, প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে ধর্ম্ম-মতে কি সমাজজীবনে এমন একটা সমতার যোগ, কি সংঘাতের একতা, দেশের চিন্তানায়কগণ লক্ষ্য করেন নাই। এ যোগ, এ একতা, ছিল না; এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখেও গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। ধর্ম্মের ও সমাজজীবনের প্রকৃতিই ছিল অন্যরূপ। পূর্ব্বেই তাহার যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে; নূতন করিয়া কাহাকেও তাহা আর বুঝাইতে হইবে না।

প্রাদেশিক প্রাকৃত ভাষাগুলিও এই সময়ে সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত হইয়া উঠে, এবং বহু গ্রন্থও রচিত হয়। প্রাচীন পুরাণাদি বহু গ্রন্থ এই সব ভাষায় প্রচারিত হয়, এবং নূতন ভাবের যে সব ধর্ম্ম-মতের আবির্ভাব হয়, তাহার প্রচারকল্পেও নূতন বহু গ্রন্থ রচিত হয়। এই সাহিত্যের মধ্যে অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কোনও কোনও গ্রন্থে হিন্দু নাম কোথাও কোথাও যে না পাওয়া যায়, তাহা নয়। কিন্তু এখনকার মত ধর্ম্মমতের কি সামাজিক জীবনের একতায় প্রাচীন-পন্থী সমগ্র ভারবাসীকে বুঝাইতে হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুসমাজ, হিন্দুজাতি এইরূপ কোনও নাম তাহার মধ্যেও বড় ব্যবহৃত হয় নাই। কেবল মুশলমানরাই ইঁহাদের হিন্দু বলিতেন; আর ইঁহারাও সাধারণ ভাবে এই নামে আপনাদের পরিচয় দিতেন, বিশেষতঃ যখন মুশলমানদের হইতে আপনাদের পার্থক্যটা বুঝাইবার প্রয়োজন হইত।

আধুনিক এই ইংরেজ আমলে পাশ্চাত্য শিক্ষা, ভাব ও চিন্তার প্রভাবে নূতন যে সব সাহিত্য এদেশে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যেই হিন্দু এই নাম এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্ম হিন্দুসমাজ হিন্দুজাতি এই সব নাম তাহাদের নূতন এই অর্থে আমরা দেখিতে পাই।

আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্য পাশ্চাত্যজাতি সমূহের রাষ্ট্রীয় একতার (National unityর) এবং তৎপ্রসূত রাষ্ট্রীয়শক্তির মহিমার কথায় পরিপূর্ণ। এই রাষ্ট্রীয় একতার মূলে আবার জাতীয় (Racial), সামাজিক

(social) এবং ধর্ম্মীয় (religious) একটা সমতাও রহিয়াছে। এক একটি সমাজ (society) বলিতে ইয়োরোপীয়েরা সাধারণতঃ অনেকটা সমজাতীয়, সম-স্বভাব, সমান আচারশীল এবং সমধর্ম্মীয় লোকের একটা সংহতি বোঝেন। এক একটি ধর্ম্ম বা religion সম্বন্ধেও সাধারণতঃ তাহাদের ধারণা এইরূপ, যে sectarian বা সাম্প্রদায়িক শাখাভেদ তাহার মধ্যে যাহাই থাক্, তত্ত্বাঙ্গে ও অনুষ্ঠানাঙ্গে (in creed and ritual) মোটের উপর একটা সমতা বা ঐক্য তাহার মধ্যে থাকিবে, যেমন খৃষ্টান ও মুশলমান ধর্ম্মে আছে।

দেশের নব্য সাহিত্য যাঁহারা গড়িয়া তুলিয়াছেন, পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে স্বভাবতঃই পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাবে তাহারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন এবং বহু বিষয়ে তাহাদের চিন্তার ধারা পাশ্চাত্য মতেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছে। এইরূপ সব নামে পাশ্চাত্য সাহিত্যে যাহা বুঝায়, অনেকটা সেইরূপ ভাবেই হিন্দু, হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুসমাজ, এই নামগুলি আধুনিক সাহিত্যে ইঁহারা ব্যবহার করিয়াছেন। ইংরেজ লেখকগণই তাঁহাদের সব গ্রন্থে এইরূপ অর্থে এই নামগুলি প্রথমে ব্যবহার করেন। এবং তাহাহইতেই সেই অর্থে আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যে তাহা গৃহীত হইয়াছে। এই সব নাম প্রাচীন সাহিত্যে এদেশে ছিল কিনা, দেশের প্রাচীন ধর্ম্ম এবং সমষ্টিজীবনের প্রকৃতি যাহা ছিল তাহাতে এইরূপ কোন অর্থে ইহাদের প্রয়োগ হইতে পারে কিনা, এইরূপ একটা ভাবেই এই সব তত্ত্ব দেশের প্রাচীন চিন্তানায়কগণ কখনও ভাবিয়াছেন কিনা—যাহারা এই সব নাম প্রথমে ব্যবহার করেন, এই সব কথা তাঁহাদের মনেও কখনও বোধ হয় উঠে নাই। যে ভাবে তখন তাঁহারা ভাবুক হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহারই সহজ প্রেরণার বশে এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানেরই অনুসরণে এই সব নাম এইরূপ অর্থে তাঁহারা ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

যাহা হউক, নামগুলি এখন আমাদের ভাষায় ও সাহিত্যে এমন একটা স্থান অধিকার করিয়াছে, যে সর্ব্বদাই আমাদের তাহা ব্যবহার

করিতে হয়, না করিয়া পারি না। নামের সঙ্গে নামের এই সব দ্যোতনাও আমাদের ধারণায় দৃঢ়মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই হিন্দুধর্ম্ম হিন্দুসমাজ হিন্দুজাতি প্রভৃতি বলিতে এমন একটা সমতা ও ঐক্য আমরা প্রত্যাশা করি, যাহা বাস্তবিক ইহার কিছুরই প্রকৃতিতে নাই, এবং নাই দেখিয়া বড় বিস্মিতও হই। ভাবিয়া পাই না, কেন এমন হইল। একধর্ম্ম, একসমাজ, একজাতি—অথচ এমন পরিস্ফুট কোনও সামান্য লক্ষণ কিছু খুঁজিয়া পাই না, যাহার দ্বারা ইহার কোনও একটিরও পরিষ্কার একটি সংজ্ঞা আমরা দিতে পারি। কেবলই মনে হয়, একধর্ম্ম, একসমাজ, একজাতি—কেন তবে এত ভেদ ইহার মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছে? কেন হিন্দু নামধারী ভারতবাসী সকলে কি ধর্ম্মমতে কি সমাজজীবনে সমান হইয়া দৃঢ় একটা সংহতিতে মিলিয়া যাইতে পারিতেছে না, যাহাতে শক্তিশালী একটা 'নেশন' বা রাষ্ট্রীয় সংঘ তাহারা হইয়া উঠিতে পারে। যে বৈষম্যের ও ভেদের জন্য পারিতেছে না, সেই সব বৈষম্য ও ভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া প্রাচীন আচার্য্য ও সমাজনায়কগণকে অনেক ধিক্কারও আমরা দিই। সহজে একথা আমাদের মনে হয় না, কোনও ঐক্য কি সাম্যের মধ্যে এই বৈষম্য ও ভেদ কেহ সৃষ্টি করে নাই। আর বৈষম্য যতই থাক, 'ভেদ' বলিতে পরস্পরের মধ্যে কোনও বিরোধের ভাব যদি কিছু বুঝায়, সেরূপ কোনও ভেদও ইহার কিছুর মধ্যে নাই। যাহা আছে, তাহা স্বাভাবিক বৈষম্য, স্বাভাবিক ভেদ বা বিভাগ। সমান একটা কিছুকে ভাঙ্গিয়া কেহ বহু বিষম ও বিভিন্ন বস্তু সৃষ্টি করেন নাই। বহু বিষম ও বিভিন্ন বস্তু এক দেশে কর্ম্মসূত্রের যোগে, চিন্তার ও জীবন নীতির একই বিধ আদর্শে, পরস্পরের সঙ্গে যতটা মিলিতে পারে, তাহাই মিলিয়াছে ও মিলিতেছে। এই ধর্ম্মের ও সমাজের প্রকৃতির তত্ত্ব, আলোচনার অভাবে, ভাল আমরা জানি না ও বুঝি না; তাই এই সব কথা আমাদের মনেই বড় হয় না। জানিলে ও বুঝিলে এরূপ বিস্মিত আমরা হইতাম না; যাহা ইহার স্বভাবে নাই তাহা

দেখিতেও চাহিতাম না; প্রাচীন আচার্য্য এবং সমাজনায়কগণকেও এত ধিক্কার দিতাম না। নূতন এই যুগে এইরূপ কোনও সংহতির সত্তাই যদি প্রয়োজন হইয়া থাকে, আর সেই সংহতি যদি সম্ভব হয়, কিসে তাহা হইতে পারে, তাহাই ভাবিতাম।

১২। নবযুগের রাষ্ট্রীয় সমস্যা

বর্ত্তমান এই যুগে ইয়োরোপীয় ন্যাসনালিজমের একটা ভাব এদেশে আসিয়াছে, নূতন একটা রাষ্ট্রীয় চেতনাও তাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে। সংহত একটা রাষ্ট্রীয় জীবন (united national life) কিসে দেশে গড়িয়া উঠিতে পারে, দেশের চিন্তানায়কগণ সেই দিকেই সকলের বুদ্ধিকে ও চিত্তবৃত্তিকে পরিচালিত করিতে চাহিতেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় সমধিক অগ্রসর হিন্দুর মধ্যেই এই চেতনা বেশী জাগিয়াছে, এবং হিন্দুর চিন্তাই এই দিকে বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। ইহার জন্য কর্ম্মপ্রচেষ্টাও যাহা কিছু হিন্দুর মধ্যেই বেশী দেখা যাইতেছে। স্বধর্ম্মে স্থিতি ও সিদ্ধিলাভের জন্য এইরূপ কোনও রাষ্ট্রীয় সংহতির—national unityর—প্রয়োজন এদেশে পূর্ব্বে কখনও হয় নাই, এরূপ কোনও ভাবের প্রেরণাও দেখা দেয় নাই। তাহা সত্ত্বেও প্রাগ্-মস্লেম যুগে যত জাতি ভারতে আসিয়াছে, সকলকেই ভারতবাসী আপন ধর্ম্মের ও সমাজের মধ্যে মিলাইয়া নিতে পারিয়াছে। মুশলমান মিলিতে চাহে নাই, বরং ভারতবাসীকেই তাহার সমাজের মধ্যে টানিয়া নিতে চাহিয়াছে। কিছু পরিমাণে পারিলেও, বেশী পারে নাই। মুশলমানের রাষ্ট্রীয় প্রাধান্যের মধ্যেও আপনার ধর্ম্মজীবন ও সমাজজীবনের বৈশিস্ট ভারতবাসী রক্ষা করিয়া চলিতে পারিয়াছে। হিন্দুদের মধ্যে ত ছিলই না, ভারতীয় মুশলমান শাসকসম্প্রদায়ের মধ্যেও আধুনিক নেশনের ন্যায় সমান রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মে মিলিত কোনও রূপ ন্যাশনালিটী গড়িয়া উঠে নাই। হিন্দু-মুশলমানে ন্যাশনাল কোনও বিরোধ (national conflict) ঘটে

নাই, বিরোধ যাহা ছিল তাহা ধর্ম্মে ও সমাজে। আধুনিক সব 'ন্যাশনালিটী' এবং ন্যাশনাল স্বার্থ লইয়া নেশনে নেশনে প্রতিযোগিতা ও বিরোধ—উভয়েই নব্য ইয়োরোপীয় সভ্যতার সৃষ্টি। আর এই ন্যাশনাল স্বার্থও হইয়াছে প্রধানতঃ প্রত্যেকটি নেশনের ব্যবসায়িক স্বার্থ।

ভারতের বর্ত্তমান এই বৃটিশ শাসন ভারতীয় জনগণের উপরে বৃটিশ নেশনের শাসন,—লক্ষ্য প্রাচ্য জগতে বৃটিশ নেশনের রাষ্ট্রীয় ও ব্যাবসায়িক শক্তির প্রতিষ্ঠা। মুশলমান শাসন ছিল, বিভিন্ন অঞ্চলে মুশলমান রাজগণের শাসন, এরূপ কোনও জাতির বা নেশনের শাসন নহে। পৃথিবী ভরিয়াই অধুনা এইরূপ সব ন্যাশনালিটীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, এবং ন্যাশনাল শক্তিতে অপেক্ষাকৃত প্রবল যাহারা, দুর্ব্বলতর নেশনসমূহকে জয় করিয়া তাহাদিগকে আপন আপন রাষ্ট্রীয় ও ব্যাবসায়িক স্বার্থের অধীন করিয়া রাখিতে চাহিতেছে। বিদেশী কোনও রাজার প্রভুত্ব অপেক্ষা বিদেশী কোনও ন্যাশনালিটীর প্রভুত্ব অনেক বেশী কঠোর হয়। বিদেশী হইলেও এই রাজাকে প্রজার উপরে যতটা নির্ভর করিতে হয়, প্রভু কোনও জাতিকে শাসিত জাতির উপরে ততটা নির্ভর করিতে হয় না। রাজাকে এই কারণে ইহাদের যতটা সন্তুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া রাখিতে হয়, শাসক কোনও জাতির পক্ষে তাহা হয় না। আবার জাতির সঙ্গে জাতির যুদ্ধ যেমন মারাত্মক হয়, রাজার সঙ্গে রাজ্য লইয়া রাজার যুদ্ধ তত মারাত্মক কখনও হয় না। বিদেশী রাজার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা এবং শাসন হইতে মুক্তি কোনও দেশের জনগণের পক্ষে যত সহজ হয়, দৃঢ়সংহত ও শক্তিশালী কোনও জাতির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা অথবা সেই জাতির শাসন হইতে মুক্তি তত সহজ হয় না,—সেই দেশের জনগণ ন্যাশনাল সংহতিতে ও সংহতির শক্তিতে, বেশী না হউক, অন্ততঃ সমান বলবান্ যদি না হইতে পারে। এই সব কারণে বর্ত্তমান ভারতেও আত্মরক্ষাদির প্রয়োজনে হয়ত ন্যাশনাল সংহতির ও শক্তির প্রয়োজন একটা হইয়াছে। বর্ত্তমান ভারতের, সর্ব্বপ্রধান না হইলেও, অতি প্রধান একটা সমস্যাই

নূতন এই ন্যাশনালিটীর বা রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মে জাতীয় সংহতির সমস্যা। সমস্যা আরও কঠিন, আরও জটিল হইয়াছে, কারণ ভারতবাসী কেবল হিন্দুই নহেন, মুশলমান ও অন্যান্য অনেক সম্প্রদায়ও আছেন। ইঁহাদের মধ্যে মুশলমানই প্রধান। লোক গণনায় মুশলমানের সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা অনেক কম, কিন্তু সামাজিক সংহতির বল ইঁহাদের অনেক বড়, এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে হিন্দুর বড় একটি প্রতিদ্বন্দী সম্প্রদায়ই ইঁহারা হইয়া উঠিতেছেন।

যাহা হউক, আমাদের এই আলোচনা প্রসঙ্গে যদি একথা ভাবিতে হয়, হিন্দুমুশলমানের যোগে একটা রাষ্ট্রীয় ন্যাশনালিটী কি ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে, তাহা ছাড়িয়া আগেই ভাবিতে হইবে, হিন্দু-সমাজ অথবা হিন্দুসমাজ নামে পরিচিত বহু জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সমান রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মে একটা সংহতি কি উপায়ে সম্ভব হইতে পারে। কেবল এইটুকু দেখিতে হইবে, ইহার জন্য আপনার এই বিশিষ্ট ধর্ম্ম তাহার ব্যাহত না নয়। কারণ তাহাই যদি হইল, তাহার এই অস্তিত্বেরই কোনও সার্থকতা কিছু থাকে না।

অনেকেই একথা বলিয়া থাকেন, কেবল ইয়োরোপের অনুকরণ করিলেই আমাদের চলিবে না, ইয়োরোপের আদর্শে আমাদের জাতীয় জীবনও গড়িয়া উঠিতে পারে না; আমাদের নিজস্ব একটা সভ্যতা আছে, জীবনের বিশিষ্ট একটা স্বকীয় আদর্শ আছে, এবং তাহারই ধারায় আমাদের জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে, ইত্যাদি।

কিন্তু এই সভ্যতার নীতি কি? এই আদর্শই বা কি? তাহার ধারায় নূতন এই জাতীয় জীবনই বা কি ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে? এই সব কথা যে আমরা খুব তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করি, এমন মনে হয় না। এসব একরকম মুখের কথাই রহিয়াছে, কার্য্যতঃ আমরা ইয়োরোপীয় নীতিরই অনুসরণ করিতেছি।

যেমন আধুনিক ডিমক্রাসী। ইহা একেবারেই ইয়োরোপায় একটা বস্তু, এবং নব্য ইয়োরোপীয় সভ্যতাই ইহাকে তাহার আধুনিক এই স্বরূপে অভিব্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে। রাষ্ট্রীয় কি অন্য যত রকম

ইয়োরোপীয় সংঘ, সবই প্রায় ডিমক্রাটিক প্রতিষ্ঠানের আকার ধারণ করিয়াছে, এবং ইহার ভোটই সকল কর্ম্মের নিয়ামক হইয়া উঠিয়াছে।

আমরাও আমাদের মধ্যে নব্য যত কিছু প্রতিষ্ঠান এই ডিমক্রাটিক আদর্শেই গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছি। নূতন ভারতীয় ন্যাশনালিটীর কল্পনাও এই ডিমক্রাটিক্ আদর্শে ব্যতীত অন্য আদর্শে আমরা বড় করিতে পারি না। কিন্তু ইহা আমাদের জাতীয় ধর্ম্মের আদর্শ নহে, বরং তাহার প্রতিকুল। গুণকর্ম্ম বিভাগে ঋষিকুলপ্রবর্ত্তিত চাতুর্ব্বর্ণ্যের ধর্ম্ম আর আধুনিক ডিমক্রাসীর নীতি পরস্পর বিরোধী, উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যস্থাপনা সম্ভব নহে। যে সব আচারনিয়ম দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহা ধরিয়া এখনও হিন্দুসম্প্রদায় সমূহের ধর্ম্মানুমত সামাজিক জীবন পরিচালিত হইতেছে, তাহাও কিছু আধুনিক ডিমক্রাটিক ভোটের আমলে আনা যায় না। আনিতে চাহিলে তাহার বিশিষ্ট প্রকৃতিই বজায় থাকে না।*

* অবস্থা বিশেষে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে ভোটেরও অপরিহার্য্য প্রয়োজন একটা আছে। নানাবিধ কার্য্যের জন্য মানুষের মধ্যে নানা রকম মণ্ডলী বা সমিতি দেখা যায়। সকল কর্ম্মে সর্ব্বদা সকলের এক মত হয় না। এরূপ স্থলে সদস্যগণের ভোট নিয়াই একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। বেশী লোকের ভোট যে মতকে সমর্থন করে, কাজও সেই অনুসারে করিতে হয়। প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ সঙ্ঘে এইরূপ ভোট নিয়া অনেক সময়ে কাজ হইত। নানা রঙ্গের শলাকা থাকিত, কোন বিষয়ে মত বৈষম্য উপস্থিত হইলে বিভিন্ন মতের নিদর্শন স্বরূপ বিভিন্ন রঙ্গের শলাকা সদস্যগণ কোনও আধারে ফেলিয়া দিতেন। যে মতের শলাকা সংখ্যা গণনায় বেশী হইত, কাজ সেই মতেই হইত। বৌদ্ধ 'বিনয়' শাস্ত্রে এই সব শলাকা পাতে অধিকাংশের মত নির্দ্ধারণ কি ভাবে করিতে হইবে, তাহার বিবরণ আছে। বৌদ্ধ সংঘে যখন এই নিয়ম ছিল, তখন দেশেরই একটা সাধারণ নিয়ম এই ছিল, ইহা আমরা ধরিয়া নিতে পারি। এ হইল এক রকমের কথা। অবস্থা বিশেষে বিশেষ বিশেষ কর্ম্মে এইরূপ কোনও না কোনও প্রণালীতে সভা সমিতিতে ভোট না নিলে চলে না। কিন্তু বড় এক একটা দেশ কাহাদের দ্বারা শাসিত হইবে, আইন কানুন সব কি হইবে, এই সব বিষয়

এই ভাবে প্রাচীন ধর্ম্ম ও আচারনিয়মের দিকে না চাহিয়া, একেবারে সব উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিয়া যদি ডিমক্রাটিক আদর্শে আমরা আমাদের কল্পিত জাতীয় সংহতি এবং অন্যান্য সব প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতেই পারি, ভারতীয় ধর্ম্মের, ভারতীয় সামাজিক জীবনের স্বকীয় বৈশিষ্ট কিছু থাকিবে না, প্রাচীন সভ্যতার ধারা হইতে ভারতীয় জীবন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে; ভারত অথবা ভারতের এক একটি প্রদেশ ইয়োরোপীয় এক একটি ডিমক্রাটিক ষ্টেটের ন্যায় ষ্টেটে মাত্র পরিণত হইবে, সমাজ একেবারে তাহারই উপরে নির্ভরশীল হইবে। যত কিছু সঙ্কট ইয়োরোপে দেখা দিয়াছে, ভারতেও দেখা দিবে।

কিন্তু নব্য এই যুগে ডিমক্রাসীর ভাবে ভরপুর মানবের মধ্যে আর কি ধর্ম্মে কিরূপ রাষ্ট্রীয় জীবন বা ন্যাশনাল সংহতির কল্পনা করা যাইতে পারে? শক্ত কথা। এরূপ কোনও কল্পনার চিত্র অঙ্কিত করিবার সাহস আমার নাই। তবে দেশের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া, নিজেদের স্বধর্ম্মের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া, হিন্দু সমাজের মধ্যে যদি একটা ন্যাশনাল সংহতি গড়িয়া তুলিতে হয়, যে পথেই তাহা গড়িয়া তুলিতে আমরা চাই, কয়েকটি কথা আগে আমাদের ভাবিতে হইবে।

আধুনিক ইয়োরোপীয় ডিমক্রাসীর নীতি ইহার ভিত্তি হইতে পারে না। পারে ধর্ম্ম, এদেশের প্রাচীন ধর্ম্ম—ঋষিগণ ও আচার্য্যগণ যাহাকে সনাতন বলিয়াছেন। নব্য এই যুগে নূতন যে সব অবস্থার প্রভাব দেশের ও সমাজের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার সঙ্গে মানাইয়া,

---

একেবারে জনসাধারণের ভোটের আমলে আনিয়া ফেলা সম্পূর্ণ আলাদা রকমের কথা। বৌদ্ধদের কথাই ধরা যাউক। ধর্ম্মের নীতি কি হইবে, বৌদ্ধ সমাজ কি বিধি ব্যবস্থায় চলিবে, এসব কিছু বৌদ্ধ জন সাধারণের ভোটে, অথবা তাহাদের ভোটে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোটে, স্থির হইত না। তার জন্য দেশ ভরিয়া একটা নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব বা ভোট যাচাইএর আন্দোলনও উপস্থিত হইত না।

তাহার উপযোগী করিয়া, প্রাচীন সেই ধর্ম্মের সংস্কার অনেক করিয়া নিতে হইবে, পূর্ব্বেও যুগে যুগে যেমন হইয়াছে। তবু যে ধর্ম্ম হিন্দুসমাজকে তাহার আশ্চর্য্য এক বিশিষ্ট স্বরূপে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া রাখিয়াছে, সেই ধর্ম্মের সত্যেই স্থির রাখিয়া রাষ্ট্রীয় সংহতি ইহার মধ্যে আনিতে হইবে। চাতুর্ব্বর্ণ্যের ধর্ম্মে কর্ম্মাধিকারের বিভাগ ও সামঞ্জস্য স্থাপনা এই ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ। এই চাতুর্ব্বর্ণ্যকে যদি ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িতে হয়, তাহাও করিতে হইবে,—তবু নূতন এই রাষ্ট্রীয় জীবনের কর্ম্মপদ্ধতিকে ইহারই মূল নিয়মে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

অধিকার লইয়া পরস্পরের সঙ্গে কেবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকমত যাহাতে জ্ঞানী ও ধর্ম্মপরায়ণ প্রবীণ আচার্য্য ও সমাজপতিগণের সমীচীন নিয়ন্তৃত্বে ধর্ম্মানুগত হইয়া চলে, যে যাহার যোগ্য সেইরূপ কর্ম্মসাধনে সকলেই সকলের সহায় ও সহযোগী হইয়া উঠে, তাহা করিতে হইবে।—এই ভাবে গঠিত ও পরিচালিত লোকমত এই সংহতির ধারক ও পোষক হইবে, প্রতিযোগী সব দলবদ্ধ জনবলের ভোট নহে।

সামাজিক ধর্ম্মনীতি ও বিধিব্যবস্থাদি এই রাষ্ট্রীয় সংহতির অধিকারে আসিবেনা, স্বতন্ত্রভাবে শাস্ত্র ও আচারের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিবে। রাষ্ট্রীয় শক্তি ইহার এই ধারাতেই ইহাকে রক্ষা করিবে; কোনও নীতির বিকারে কি অপপ্রয়োগে রাষ্ট্রীয় কি সামাজিক ক্ষতির কারণ না হইলে ইহার মধ্যে হস্তক্ষেপ করিবে না। এক কথায় আধুনিক ডিমক্র্যাটিক ষ্টেট্ যে সামাজিক ব্যবস্থাপনার অধিকার দাবী করে, সেরূপ কোনও অধিকার এই রাষ্ট্রসংহতির থাকিবে না।

কিরূপ শিক্ষা দীক্ষার ও কর্ম্মপদ্ধতির প্রবর্ত্তনে ইহা হইতে পারে, তাহার নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে। তবে আপন ধর্ম্ম ও সেই ধর্ম্মে এদেশের সভ্যতার ধারা কি সব নীতির পথে কি প্রকৃতিতে ও কি আকারে আমাদের সামাজিক জীবনকে গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার স্থিতিতে ব্যষ্টি

ও সমষ্টিভাবে আমরা কি মঙ্গলের ভাগী হইয়াছি ও হইতে পারি, এই সব আমাদের আগে বুঝিতে হইবে। স্বধর্ম্মে যে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা আমরা হারাইয়াছি,আবার তাহা ফিরিয়া পাইতে হইবে ; জীবননীতিকে তাহারই অনুবর্ত্তী করিয়া তুলিতে হইবে। হিন্দু নামধারী সকল শ্রেণীর মধ্যেই যদি তাহা হয়,ভাবী রাষ্ট্রীয় সংহতি আপন ধর্ম্মের আদর্শে আপনিই গড়িয়া উঠিবে ; জীর্ণ ও অচল পুরাতন যাহা তাহার পথে দাঁড়াইতে পারে, জাগ্রত ধর্ম্মই তাহা দূর করিবে। কিন্তু এই ধর্ম্মকে জাগাইবে কে ? পরধর্ম্মের এই ভয়াবহ অভিভাব হইতে স্বধর্ম্মকে উদ্ধার করিয়া তাহার ছত্রছায়াতলে কে ভারতবাসী হিন্দুকে আবার সুস্থিত করিবে ?

আবার সেই কথাই বলিতে হয়। সাধারণ মানুষের কাজ ইহা নহে। যিনি পারেন, কবে তিনি আসিবেন জানিনা। তবে ইতিমধ্যে তাঁহার পথের জঞ্জাল, যতটা আমরা পারি, মুক্ত করিয়া ফেলিতে হইবে। তাঁহার অবতরণ সহজ হয়, তেমন অবস্থায় সৃষ্টি আমাদের করিতে হইবে। তাহাও করিতে হইবে স্বধর্ম্মের প্রতি নিজেরা শ্রদ্ধায় চাহিয়া, অপরকে শ্রদ্ধান্বিত করিয়া। কিন্তু তাহা আমরা করিব কি ? করিতে পারিব কি ?

সম্পূর্ণ

পরিশিষ্ট।

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূরাজন্যকৃতঃ।

ঊরূযদস্য তদ্‌বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥

[ঋগ্‌বেদীয় পুরুষসূক্ত, দ্বাদশ মন্ত্র]

শ্রীব্রহ্মব্রত সামধ্যায়ী সরস্বতী ভট্টাচার্য্য মহাশয় কৃত অনুবাদ ও ভাবার্থ ভাষ্য।

"ইঁহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল। বাহুযুগল রাজন্যকে করিলেন। ইহার ঊরুযুগল বৈশ্য হইল। পাদযুগল হইতে শূদ্র হইল॥"

ভাবার্থ ভাষ্য। ব্রাহ্মণকে দেবগণ বিরাটের মুখ মনে করিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ, মুখের অধিষ্ঠাতৃদেবতা হইলেন। ক্ষত্রিয়কে বিরাটের বাহুযুগল মনে করিলেন, সুতরাং ক্ষত্রিয় বাহুযুগলের অধিষ্ঠাতৃদেবতা হইল। বৈশ্যকে বিরাটের ঊরুযুগল মনে করিলেন, সুতরাং বৈশ্য ঊরুযুগলের অধিষ্ঠাতৃদেবতা হইল। শূদ্রকে বিরাটের পাদযুগল মনে করিলেন, সুতরাং শূদ্র, পাদযুগলের অধিষ্ঠাতৃদেবতা হইল। দেবগণ সিদ্ধসংকল্প, এই জন্য তাঁহাদের মনে করা অমোঘ, একথা ইতিপূর্ব্বে নিরূপিত হইয়াছে স্মরণ কর। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি শব্দ এখানে ধর্ম্মপর (অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব বা ব্রহ্মণ্যদেব, ক্ষত্রিয়ত্ব বা নরদেব, বৈশ্যত্ব বা অর্য্যদেব, শূদ্রত্ব বা দাসদেব), ধর্ম্মিপর নহে। ধর্ম্মিপর হইলে, ব্রাহ্মণাদি জাতি বলিয়া প্রতীতি হইবে। কিন্তু সেটা অসম্ভব, যেহেতু জাতি জন্মের সহিত থাকে। ব্রাহ্মণাদি সেরূপ নহে, সংস্কারবিশেষে (উপনয়ন ও বেদারম্ভ) দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জন্য মনুসংহিতাতে ব্রাহ্মণাদিকে 'বর্ণ' সংজ্ঞা দিয়াছেন যথা—"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণাঃ দ্বিজাতয়ঃ। চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রোনাস্তি তু পঞ্চমঃ॥ অর্থ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনটি দ্বিজাতি অর্থাৎ দুইবার জন্মে; একবার প্রকৃত জন্ম, দ্বিতীয় গৌণ জন্ম, যাহার নাম সংস্কার (উপনয়ন ও বেদস্বীকার) এবং শূদ্র একজাতি অর্থাৎ একবারমাত্র জন্মে, অর্থাৎ শূদ্রের উপনয়ন ও বেদাধ্যয়নরূপ সংস্কার নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি ঐ তিনকে বর্ণ বলিব, শূদ্রকে বর্ণ বলিব না? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—শূদ্রও "চতুর্থ" (চতুর্থ বর্ণ), অর্থাৎ সংস্কার না থাকিলেও বা সংস্কারজনিত গৌণ জন্ম না হইলেও, দ্বিজ-সেবানিবন্ধন ইহাদিগতে শূদ্রত্ব বা দাসদেবতার অধিষ্ঠান হইয়া থাকে, সুতরাং শূদ্রও বর্ণ।

তবে অবশ্য পঞ্চম বর্ণ বলিয়া আর কেহ নাই॥ এই ত গেল মনুবচনের অর্থ। ইহার ভাবার্থ বলি—দেখ, মনুতে 'বর্ণ' একটি শব্দ ব্যবহার হইয়াছে, ইহার অর্থ এইরূপ "বর্ণনং বর্ণঃ" অর্থাৎ বর্ণন করাকে বর্ণ কহে। বর্ণন করা ও 'রংফলান' একই কথা। অর্থাৎ দেবগণ মানসযাগে নির্গুণপুরুষরূপ ভিত্তিতে বিরাট্ পুরুষরূপী চিত্রদর্শন করিয়া, তাহাতে ব্রাহ্মণাদি 'চারিটি বর্ণ' অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ রং ফলাইয়াছিলেন। এই জন্য ইহাদিগকে মনু বর্ণ বলিয়া ব্যবহার করিয়াছেলেন। ফলতঃ যাহা জন্মের সঙ্গে হয় না, যাহা সংস্কারবিশেষ দ্বারা ব্যবহৃত এবং সংস্কারনাশে নষ্ট হয়, তাহা জাতি হইতে পারে না। দেখ, ঐ মনুতেই আছে—"যোঽনধীত্য দ্বিজোবেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং। স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥" অর্থ—যে দ্বিজ নিজের ব্রাহ্মণত্ববিধায়ক বেদপাঠ অগ্রে না করিয়া অন্য কিছু অধ্যয়ন করে, সে অতিশীঘ্র ইহ-জন্মেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।" এখন বলুন, একজাতি কি কখনও অপরজাতি (কর্ম্মজন্য) হইতে পারে? কৈ, ব্যাঘ্রকে কর্ম্মদ্বারা গো করুন দেখি? মনুষ্যকে কর্ম্মদ্বারা গো করিয়া বিচালি খাওয়ান দেখি? এই জন্যই সৃষ্টিপ্রকরণে দেব, তির্য্যক্ ও নর এই সকল জাতির নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণাদির নাম কুত্রাপি নাই। তবে অবশ্য বর্ণধর্ম্ম এবং আশ্রমাদি ধর্ম্ম বেদ হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে, কে না স্বীকার করিবে? এখানে ব্রাহ্মণাদির নাম দেখিয়া কেহ পাছে সন্দেহ করেন বলিয়া এত ব্যাখ্যা করিতে হইতেছে। এখানকার ব্রাহ্মণাদি বর্ণ অর্থাৎ মুখবাহুপ্রভৃতির অধিষ্ঠাতৃদেবতাবিশেষ বুঝিবে। উপক্রম ও উপসংহার দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হয়। উপক্রমে দেখ—দেবগণকর্ত্তৃক মানসযাগে বিরাট্ পুরুষকে পশুকল্পনা এবং তাঁহার অবয়ব সকলের বর্ণনার কথা আছে কি না? এবং এই মন্ত্রের পরে দেখ, চন্দ্রসূর্য্যাদি অধিষ্ঠাতৃদেবতা সকলের সৃষ্টি নিরূপিত হইয়াছে কি না? তবেই দেখ, এই "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ" মন্ত্রটিও অধিষ্ঠাতৃদেবতাপর, জাতিপর নহে, ইহা স্থির হইল। তবে অবশ্য এই চারিটি অধিষ্ঠাতৃদেবতার 'বর্ণ' নাম দাও, দিতে পার, যেহেতু এই চারিটি দেবতার দ্বারা দেবগণ বিরাট্ পুরুষরূপী চিত্রের রং ফলাইয়াছেন; এবং মনুও সেই জন্য এই চারিটিকে বর্ণ বলিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। বিরাট্-পুরুষের রং ফলাইতে এই চারিটি ছাড়া, অন্য পঞ্চম বস্তু লাগে নাই বলিয়াই মনু "নাস্তি তু পঞ্চমঃ", পঞ্চমবর্ণ নাই এই কথা স্পষ্ট বলিয়াছেন। যদি বল, পরমন্ত্রে (১৩শ মন্ত্রে) চন্দ্রসূর্য্যাদি অনেক অধিষ্ঠাতৃদেবতার সৃষ্টি নিরূপিত

হইয়াছে, তবে কেবল ব্রাহ্মণাদি চারিটি হইবে কেন ? উত্তর—পরমন্ত্রে বিরাটের লিঙ্গ-শরীর বলিবেন। এমন্ত্রে বিরাটের স্থূল-শরীর চিত্রিত হইয়াছে। অর্থাৎ বিরাট দ্বিবিধ ; হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট। লিঙ্গ-শরীরাভিমানী বিরাট্ পুরুষকে হিরণ্যগর্ভ, এবং স্থূলশরীরাভিমানী বিরাট্ পুরুকে বিরাট্ কহে। পরমন্ত্রে হিরণ্যগর্ভ চিত্রিত হইয়াছেন। এমন্ত্রে চারিটিমাত্র বর্ণদ্বারা বিরাট্ মূর্ত্তি চিত্রিত হইলেন। অতঃপর আর একটি সন্দেহ,—আমাদের চিরসংস্কারানুরূপ ব্রাহ্মণাদি তবে জাতি হইল না, একমাত্র মনুষ্য জাতি, কর্ম্মবিশেষ দ্বারা ব্রাহ্মণাদি অধিষ্ঠাতৃদেবতার অধিষ্ঠানে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ হয় ; অর্থাৎ দেবপূজক যেমন পূজারি, রন্ধনব্যবসায়ী যেমন রাঁধুনি, মন্ত্রণাকার্য্যে নিযুক্ত যেমন মন্ত্রী, হত্যাকার্য্যে নিযুক্ত যেমন জহ্লাদ, খানসামাগিরি কার্য্যে নিযুক্ত যেমন খানসামা, তন্তুবয়নব্যবসায়ী যেমন তন্তুবায়, তোষামুদি কার্য্যে নিযুক্ত যেমন স্তাবক বা তোষামুদে এবং গণনাকার্য্যে ব্যসনশীল যেমন গণক উপাধি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ বেদাপাঠাদির দ্বারা ব্রহ্মআরাধনাকার্য্যে নিযুক্ত ব্রাহ্মণ, বাহুবলে রাজ্যশাসনাদি কার্য্যে নিযুক্ত ক্ষত্রিয় ; উরুর বলে দেশবিদেশ হইতে পণ্যদ্রব্য সকলের ক্রয়বিক্রয় ও উরুবলেই কৃষিকার্য্য ব্যসনশীল বৈশ্য এবং এই ত্রিবিধ বর্ণের সেবার দ্বারা জগতের সাহায্য করে যে, সে শূদ্র বলিয়া সংজ্ঞা ও ব্যবহার প্রাপ্ত হয় মাত্র। বাস্তবিক দেখিতে গেলে, পূজারি, রাঁধুনি বা মন্ত্রী ইত্যাদি জাতি নহে, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদিও জাতি নহে। ইহাই যদি স্থির হইল, তবে ব্রাহ্মণ সেবাকার্য্য করিয়া শূদ্র হউক, এবং শূদ্র বেদপাঠ করিয়া ব্রাহ্মণ হউক ? কৈ তাহা হয় (ক) ? এবং মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রেই বা কেন "ব্রাহ্মণ কখনই শূদ্র হইতে পারে না, এবং শূদ্রও কখনও ব্রাহ্মণ হইতে পারে না," বলিয়াছেন ? যথা—অনার্য্যমার্য্যকর্ম্মাণমার্য্যং চানার্য্যকর্ম্মিণং। সম্প্রধার্য্যাব্রবীদ্ধাতা ন সমৌ নাসমাবিতি॥ (মনুঃ ৯।৭৩) অর্থ—"ব্রহ্মা বিচার করিয়া বলিয়াছেন যে শূদ্র দ্বিজাতির কর্ম্ম করিলে সে দ্বিজাতি হয় না, এবং দ্বিজাতি একজাতির (শূদ্রের) কর্ম্ম করিলে শূদ্র হয় না, যেহেতু শূদ্র ও ব্রাহ্মণ ইহারা পরস্পরের বিপরীত কর্ম্ম করিয়া পরস্পর সমান হইতে পারে না, পক্ষে ইহারা যে পরস্পর অসমান অর্থাৎ জাত্যন্তর, তাহাও নহে।" অতএব এখন মহান্ সন্দেহ উপস্থিত (খ) ? উত্তর—অগ্রে (ক) চিহ্নিত প্রথম প্রশ্নের উত্তর করা যাউক।—এরূপ প্রশ্নই "কাঁটালের আমসত্ব"তুল্য। যে কাঁটাল (কণ্টকী ফল) সে কাঁটালই, আম কখনও হয় না। হইলে আমসত্ব

হওয়া আশ্চর্য্য নহে বটে, কিন্তু হয় কৈ? তদ্রূপ যে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ উপনয়ন-সংস্কার ও তদনন্তর জাত ব্রহ্মচর্য্যযুক্ত, বেদালোচনাদি হইতে অধিষ্ঠাতৃদেব ব্রহ্মণ্যদেবের অধিষ্ঠান যাহার শরীরে হইয়াছে, সে কি কখনও শূদ্র হইতে পারে? শূদ্রবর্ণ অর্থাৎ অধিষ্ঠাতৃদেবতা 'দাসদেব' তাহাতে কখনও অধিষ্ঠিত হইতে পারে না। ইহা একেবারে অসম্ভব। এইরূপ যে শূদ্র, সে কখনও ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। সুতরাং এরূপ প্রশ্নই অসম্ভব। তবে অবশ্য যে মনুষ্য ব্রহ্মণ্যদেবকে লাভ করে নাই, অর্থাৎ মূলে ব্রাহ্মণই নহে, সে ব্যক্তি শূদ্র-কর্ম্ম করিয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে বটে। তা ত হইয়াও থাকে। "যোঽনধীত্য দ্বিজোবেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।" (মনু ২ অ• শ্লো• ১৬৮) এই মনুবচন ত ঐ কথাই বলিয়াছেন। যদি বল—ব্যবহার হয় না কেন? তদুত্তরে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে—মধুচক্রের মধু ফুরাইয়া গেলেও লোকে 'মধুচাক' বলিয়া ব্যবহার করিতে বিরত হয় না, গোপালের মার গোপাল মরিয়া গেলেও "গোপালের মা" বলিয়া লোকে সম্বোধন করিতে ক্ষান্ত হয় না; রাজার রাজ্য গেলেও 'রাজা' বলিতে লোকে নিরস্ত হয় না; এইরূপ মানবের ব্রহ্মণ্যদেব ফুরাইয়া গেলেও (এক পুরুষে হয় এরূপ নহে, কাহারও বা পিতার আছে, কিন্তু পুত্রের আদৌ ব্রহ্মণ্যদেব হয় নাই, এস্থলে বলিতে হইলে, দ্বিতীয় পুরুষে ফুরাইয়া গিয়াছে, পৌত্রে হইলে তৃতীয় পুরুষে, প্রপৌত্রে হইলে চতুর্থ পুরুষে ইত্যাদিরূপে বুঝিতে হইবে।) তাহাকে অর্থাৎ সে নিজে হউক বা তাহার দ্বিতীয় তৃতীয়াদিক্রমে নিম্নতম পুরুষই বা হউক, ব্রাহ্মণ বলিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে। এরূপ ব্যবহারমাত্রে ব্রাহ্মণগণকে 'ব্রাহ্মণব্রুব' কহে। 'আমি ব্রাহ্মণ' বলিয়া অভিমানটুকু রাখে, এইজন্য শাস্ত্রে ইহারা 'ব্রাহ্মণব্রুব' পদবাচ্য। মনুসংহিতায় এবিষয়ে উত্তমরূপে উপদেশ রহিয়াছে। অতএব এতক্ষণে এই স্থির হইল জানিবে. "কর্ম্মদ্বারা আর এখন কেহ নূতন করিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণ হইতে পারে না।" তবে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি—ব্রহ্মা দেবগণের মানসযাগে পরিতৃপ্ত হইয়া, তাঁহাদের সঙ্কল্প নিজ সঙ্কল্পানুগত হইলে, যখন দেবজাতি, তির্য্যক্‌জাতি ও মনুষ্যজাতির সৃষ্টি করেন, তখন তাহাকে মনুষ্যজাতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিশেষ করিতে হইয়াছিল। বিশেষ এই—যাগকর্ত্তা দেবগণ মনুষ্যগণকে কর্ম্মবিশেষদ্বারা চতুর্দ্ধা কল্পনা করিয়া তাঁহার অঙ্গবিশেষের বর্ণ (বর্ণ=রং—এই রং আধ্যাত্মিক) করিয়া চিন্তা করেন; এই কারণে ব্রহ্মা, মনুষ্য-সৃষ্টি, বর্ণধর্ম্মের সঙ্গেই করিলেন। পুরাণের মতে কেবল বর্ণ-ধর্ম্মের সহিত নহে, কিন্তু

(বর্ণটা উপলক্ষণমাত্র,) বর্ণ-ধর্ম্ম ও আশ্রম-ধর্ম্ম এই উভয়ের সহিত বুঝিতে হইবে। যেহেতু আশ্রম চারিটি না হইলে, বর্ণ-ধর্ম্ম থাকিবে কোথায়? সুতরাং "বর্ণ-ধর্ম্ম ও আশ্রম-ধর্ম্মের সহিত মনুষ্য-সৃষ্টি হইয়াছে" ইহাই স্থির। অতএব সৃষ্টির আদিতে যিনি যেরূপ বর্ণ হইবার উপযুক্ত (সত্ত্বাদিগুণতারতম্যে) তিনি সেইরূপ বর্ণ হইয়াছিলেন। এইজন্য মহাভারতে বলিয়াছেন, "অগ্রে মানবগণ-মধ্যে কোন বর্ণই ছিল না, পরে কর্ম্মবিশেষদ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ হইল।" সেই অবধি সেই মূলবংশের সম্মান চলিয়া আসিতেছে, এবং সূত্রকার (গৃহ্যসূত্র-প্রভৃতি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ব্যবস্থাপকগ্রন্থপ্রণেতা গোভিল, আপস্তম্ব, আশ্বলায়ন-প্রভৃতি মহর্ষিগণ) ও মন্বাদি স্মৃতিসংহিতাকার মহর্ষিগণ ব্যবস্থা করিলেন, "মূল-পুরুষ যে বর্ণ, তাহার বংশীয়গণও সেই বর্ণ হইবে।" অর্থাৎ যে মূলপুরুষ ব্রাহ্মণ-বর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার বংশপরম্পরা সকলেই ব্রাহ্মণ হউক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-বর্ণ হইবার জন্য যেরূপ উপনয়নাদি সংস্কার, ব্রহ্মচর্য্য ও বেদপাঠাদি বেদবিহিত আছে, সে সকলে অধিকার হউক। এইরূপ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণসকলের সম্বন্ধেও ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মণ্যবেদবিহীন ব্রাহ্মণগণ, ব্রাহ্মণবংশ্য হইলেও প্রকৃত ব্রাহ্মণ নহেন, তাঁহারা কেবল "জাতিব্রাহ্মণ" মাত্র। "ব্রাহ্মণের বংশ্য" (বংশে জাত) ও "জাতিব্রাহ্মণ" শব্দ সমানার্থক বুঝিবে। তবে যাঁহারা ব্রাহ্মণের বংশে জাতমাত্রকে 'ব্রাহ্মণজাতি' বলিয়া ব্যবহার করেন, করুন, সে তাঁহাদের ইচ্ছা। ব্রহ্মা কিন্তু ব্রাহ্মণাদিনামক জাতি সকলের সৃষ্টি করেন নাই, ইহা স্থির।

এক্ষণে (খ) চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতেছে,—মনুসংহিতাতে আছে—"ব্রাহ্মণ কখন শূদ্র হয় না, শূদ্রও কখন ব্রাহ্মণ হয় না," ইত্যাদি। ইহা ত ঠিকই বলিয়াছেন। (ক) চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তর আর একবার দেখ, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে। তবে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখা উচিত—মনুর এ শ্লোকটি একজন্মপর বুঝিবে অর্থাৎ একজন্মে একবর্ণের ঔরসে জন্মপরিগ্রহ করিলে, তাহাকে ধর্ম্মশাস্ত্র ও যুক্তিবিধানানুসারে সেই বর্ণের সংস্কারে সংস্কৃত হইতে হইবে। অতএব কাজে কাজেই যখন তাহাকে সেই বর্ণই হইতে হইল, তখন তিনি আর ভাবী দ্বিতীয়তৃতীয়াদি জন্ম ব্যতীত এজন্মে কখনও অন্যবর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারেন না; ইহা যুক্তিযুক্ত (*)। মনু এই জন্য স্পষ্ট

(*) সত্য বটে, বিশ্বামিত্র ছিলেন রাজর্ষি, কিন্তু পরে উৎকট তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করেন, এ ঘটনা এক জন্মেই? উত্তর,—উৎকট তপস্যা, সকল যুক্তিকেই পরাস্ত করিয়া থাকে।

বলিয়াছেন যথা—মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ের ৬৪ এবং ৬৫ শ্লোক দেখুন। অতঃপর ইহা স্থির হইল. ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ব্রাহ্মণাদি জাতি নহে। জাতি বলিয়া ব্যবহার যে লোকে ও শাস্ত্রেও আছে, সে কেবল গৌণব্যবহার মাত্র। এবং ইহাও যুক্তি ও শাস্ত্র দ্বারা স্থির হইল যে, সৃষ্টির আদিতে মনুষ্যজাতি কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এখন আর কেহ নিজের বংশের পরম্পরা-প্রাপ্ত-বর্ণ-ধর্ম্মকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক উৎকট তপস্যা ভিন্ন, মাত্র কর্ম্মবিশেষের অনুষ্ঠানদ্বারা অন্যবর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। আমি যে মীমাংসা করিলাম, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদিবর্ণ-ধর্ম্মশূন্য তদ্বংশীয়গণের যে ব্রাহ্মণাদি ব্যবহার (কি লোকে কি শাস্ত্রে) তাহা জাতিনিবন্ধন নহে, কিন্তু গৌণব্যবহার মাত্র। এ কথার তাৎপর্য্য কি? গৌণ কাহাকে কহে?—বলি—কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্য লইয়া অপর বস্তুতে অপর বস্তুত্বের আরোপের নাম গৌণ; যেমন পরাক্রমশীলতারূপ সাদৃশ্য লইয়া কোন বালককে "সিংহোমানবকঃ;" অর্থাৎ "এছেলে সিংহ" এরূপ ব্যবহার হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মণ্যবেদহীন অব্রাহ্মণকে এবং নৃবেদত্ববিহীন ক্ষত্রিয়াপসদকে, তত্তদ্বংশে জন্ম হইয়াছে এইমাত্র সাদৃশ্য লইয়া, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ব্যবহার হয়। এবিষয়ে মহর্ষি পতঞ্জলি পাণিনীয় ব্যাকরণের ৫ম অধ্যায়ের প্রথম পাদের ১১৮ সূত্রের (তেন তুল্যং ক্রিয়াচেদ্ বতিঃ) মহাভাষ্যে বিশেষ বিচার করিয়াছেন। এস্থলে পাঠকগণের পরিতৃপ্তির জন্য উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যা করিয়া দিতে হইতেছে যথা—

সর্ব্বে এতে শব্দাঃ গুণসমুদায়েষু বর্ত্তন্তে, ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যঃ শূদ্র ইতি আতশ্চ গুণসমুদায়ে। এবং হ্যাহ—"তপঃ শ্রুতঞ্চ যোনিশ্চ এতদ্ ব্রাহ্মণকারণম্। তপশ্রুতাভ্যাং যোহীনো জাতিব্রাহ্মণ এব সঃ" অর্থ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র এই শব্দগুলি কতিপয় গুণসমষ্টির বাচক। এই কথা বলিয়াছেন (*)—তপঃ (১) অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যব্রত, শ্রুত (২) বেদাধ্যয়ন, এবং যোনি (৩) বলিতে বীজ ও ক্ষেত্র, অর্থাৎ পিতা ও মাতার ব্রহ্মকুলে জন্ম—এই গুণ সমুদায় ব্রাহ্মণবর্ণতাকে প্রাপ্ত করায়। যে মানবে এই তিনটি গুণের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য ও

ফলতঃ উৎকট ভক্তিতে যেমন আজিও দ্বিতীয় প্রহ্লাদ জন্মে নাই; তদ্রূপ উৎকট তপস্যাতেও আজি পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বামিত্র কেহ জন্মে নাই, ইহা স্থির। পক্ষান্তরে এই বিশ্বামিত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারাই ব্রাহ্মণাদি যে 'জাতি' নহে, কিন্তু 'বর্ণ' মাত্র, একথা সম্পূর্ণ প্রমাণীকৃত সুতরাং নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছে।

(*) মহর্ষি পতঞ্জলি বলিলেন—"এই কথা বলিয়াছেন"। অতএব তাঁহার ন্যায় মহর্ষি যখন নাম করিলেন না, তখন বুঝিতে হইবে, এ বাক্য তাঁহার অবগত শ্রুতিবাক্য।

বেদাধ্যয়ন এই দুইটি নাই, কেবল পিতা ও মাতা ব্রহ্মকুলোদ্ভব, এই গুণটি আছে, সে জাতিব্রাহ্মণমাত্র—অর্থাৎ তিনটি একত্র যখন হয় নাই, তখন সে ব্রাহ্মণ নহে, তবে ব্রাহ্মণ বলিয়া যে ব্যবহার হয়, তাহা কেবল ব্রহ্মকুলে জন্ম হওয়া নিবন্ধন গৌণ—অর্থাৎ রাজ্য ও বিক্রমাদিবিহীন ক্ষত্রিয়ের 'রাজা' ব্যবহার যেমন গৌণ—বৈরাগ্য ও জিতেন্দ্রিয়ত্বাদি গুণহীন, ডোরকৌপীনপরিধায়ী তিলককৃতলিমাত্রধারী, পাষণ্ডধর্ম্মিগণের যেমন 'বৈষ্ণব' বলিয়া ব্যবহার গৌণ, তদ্রূপ। ব্রাহ্মণবিষয়ে যেরূপ বলা হইল, এইরূপ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এ তিনও বর্ণ—বেদবিহিত স্ব স্ব কর্ম্মজন্য ঐ সকল বর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; মাত্র সেই সেই বংশে জন্ম হইলে এবং কর্ম্ম না থাকিলে, ক্ষত্রিয়াদি ব্যবহার হয় বটে, কিন্তু সে গৌণ। ফলতঃ এই গৌণব্যবহারনিবন্ধনই ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি সকল বর্ণ হইয়াও জাতিস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক জাতি একমাত্র 'মনুষ্য' ইহাই স্থির।

অতঃপর এই দ্বাদশ মন্ত্রের ভাবার্থ বিস্তার করিতেছি, পাঠকগণ অবহিত হউন। মহর্ষিবর পতঞ্জলির মীমাংসিত ব্রাহ্মণপদার্থ ব্রহ্মণ্যদেব। ব্রহ্মচর্য্য-বেদপাঠাদির দ্বারা শরীরমধ্যে এক প্রকার তেজোবিশেষ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। এই তেজোবিশেষকে ব্রহ্মবর্চ্চস্ কহে। ব্রহ্মবর্চ্চস্ ও ব্রহ্মণ্যদেব একই কথা। "ব্রহ্মণ্যদেব বিধাতার মুখ স্বরূপ হইল বা মুখ হইতে প্রাদুর্ভূত হইল (সায়নমতে)" "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ" এই অংশটুকুর এইরূপ অর্থ হইল। আকাশপদার্থের আকাশত্ব যেমন অখণ্ড উপাধি অর্থাৎ আকাশত্ব বলিলেও আকাশ, এবং আকাশ বলিলেও আকাশত্ব বুদ্ধিবিষয় হয়—অবিনাভাবরূপে প্রতীত হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণত্বও ব্রাহ্মণ। অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব-(ব্রহ্মণ্যদেব বা ব্রহ্মবর্চ্চস্) পদার্থও আকাশত্ব-পদার্থের ন্যায় অখণ্ডোপাধি। এখানে স্বরূপ-সম্বন্ধে যে থাকে, তাহাকে অখণ্ডোপাধি কহে। স্বরূপ সম্বন্ধ বস্তুর স্বরূপকে কহে। তবেই দেখ, আকাশত্ব ও আকাশ, পরমার্থতঃ একই হইল; সেইরূপ ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রাহ্মণ একই হইবে। সুতরাং এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণাদিশব্দদ্বারা ব্রহ্মণ্য-দেবাদিরূপ অর্থই যুক্তিযুক্ত। ব্রহ্মণদেব ও ভূ-দেব একই কথা। পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মনিচয় দ্বারা শরীরে ইনি আগমন পূর্ব্বক মুখে আসিয়া বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা অগ্নির সহিত সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ স্বরূপ (বা মুখ হইতে উৎপন্নই বল) হওয়াতেই এইরূপ ভাবার্থ প্রকাশ পাইল। দেখ,—জীবগণের সমুদায় স্থূলশরীরের যে সমষ্টি, তিনিই ভ-

বিরাট্,—সুতরাং সমুদায়ে যে ব্যাপার হইবে, তাহা তাঁহার ব্যষ্টিতে অর্থাৎ প্রত্যেকেও হইবে। এই যুক্তিমূলক এইরূপ ভাবার্থ হইল। ব্রাহ্মণের মুখে ব্রহ্মণ্যদেব অগ্নিরূপী হইয়া অবস্থান করেন বলিয়াই "ব্রাহ্মণের মুখে অগ্নি জ্বলে"—এরূপ একটা প্রবাদও আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন এ প্রবাদবাক্যের মর্ম্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এইরূপ "বাহুযুগল, রাজন্যকে করিলেন" এই বেদাংশের মর্ম্মওবুঝিতে হইবে, যথা—বল ও প্রতাপবিশেষস্বরূপ বা শক্তিবিশেষস্বরূপ ক্ষত্রিয়ত্ব বুঝিবে। এই ক্ষত্রিয়ত্ব বা 'নৃদেবত্ব' বিধাতার বাহুযুগল-স্বরূপ বা (সায়নমতে) বাহুযুগল হইতে উৎপন্ন। সুতরাং নৃদেবত্ব বাহুযুগলের অধিষ্ঠাতৃদেবতা হইয়া বাহুযুগলের উৎপত্তিসহজাত অধিষ্ঠাতৃদেবতা ইন্দ্রের সহিত সাযুজ্য লাভ করিয়া বাহুযুগলে যাইয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। এইজন্য প্রকৃত ক্ষত্রিয় যিনি, তিনি ইন্দ্রতুল্য বলবিক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। এইরূপে "ইঁহার উরুযুগল বৈশ্য হইল" এই অংশটুকুরও মর্ম্ম বুঝিতে হইবে, যথা—কৃষিবাণিজ্যপ্রভৃতি-ব্যবসায় বিশেষ-জননী শক্তিবিশেষকে বৈশ্যত্ব বা বৈশ্য বা অর্য্যদেব বা গুপ্তদেব কহে। যাহারা বেদোদিত পবিত্র কর্ম্মবিশেষ দ্বারা নিজ উরুযুগলকে (দেশদেশান্তরগমন দ্বারা) পবিত্র করে, এই বৈশ্যদেব তাহাদের সেই পবিত্র উরুযুগলে আসিয়া অবস্থান করেন। ইনিই বিধাতার উরুযুগলস্থানীয় বা তাহা হইতে উৎপন্ন। এইজন্য মুখ ও বাহুর দেবতা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায়, ইনিও উরুযুগলের অধিষ্ঠাতৃদেব হইলেন, এবং তত্রত্য সহজাত অধিষ্ঠাতৃদেব কুবেরের সহিত সাযুজ্য লাভ করেন। —সুতরাং প্রকৃত বৈশ্যগণ কুবের তুল্য ধনধান্যসমৃদ্ধিশালী হইয়া থাকেন। এইরূপে "পাদযুগল হইতে শূদ্র হইল" এই বেদাংশটুকুরও ভাবার্থ এইরূপ, যথা—দয়া-দাক্ষিণ্য-বিনয়-নম্রতা, সেবা ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতি পরোপকার কার্য্য-জননী শক্তিকে শূদ্রত্ব বা শূদ্রদেব বা দাসদেব কহে।

যাঁহারা বেদোদিত শূদ্রধর্ম্মপরায়ণ হন, তাঁহাদের পাদযুগলে এই শূদ্রদেব বা দাসদেব প্রবিষ্ট হইয়া পাদের সহজাত অধিষ্ঠাতৃদেব শ্রীবিষ্ণুর সহিত সাযুজ্য লাভ করে (*); এই সকল শূদ্রবর্ণই স্বভাবতঃ বৈষ্ণব। সেইজন্যই দেখ প্রকৃত শূদ্র ব্রাহ্মণ-ভক্ত হইয়া থাকেন। * * *

(*) আদি বিষ্ণু ত্রিপাদ, নির্গুণ। উহার সগুণ মূর্ত্তি যে একপাদ্ আদিপুরুষ বা ব্রহ্মা তাঁহার পূর্ণমূর্ত্তি সকল দেবতা ও সকল শরীরের সমষ্টিস্বরূপ। এই বিষ্ণুপ্রভৃতি অধিষ্ঠাতৃদেবতা বা শক্তিসকল তাঁহারই খণ্ডশক্তি জানিবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম এ প্রণীত

অন্যান্য গ্রন্থ

উপন্যাস ও গল্প।

গ্রন্থের নাম	প্রাপ্তিস্থান	মূল্য
ঋণ পরিশোধ	ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স	২৲
ছোট বড়	সাহিত্য প্রচার সমিতি—২৭ ষ্ট্রাণ্ড রোড	২৲
পল্লীর প্রাণ	গুরুদাস লাইব্রারী	২॥০
আলোকে ও আঁধারে	ব্যানার্জি দাস এণ্ড কো	২৲
চুক্তির দাবী	কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট	১৸০
রঞ্জি	সারস্বত লাইব্রেরী—কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট	১॥০
বাসন্তী	কমলিনী লাইব্রেরী—কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট	১৲
মুক্তি		১৲
শিবরাত্রি		১৲
দেশের ছেলে	বসুমতী আফিস	১৲
কার কে		১৲
প্রীতি	বরেন্দ্র লাইব্রেরী, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট	১৲
সুখের ঘর		॥০
কো[illegible]থে	গুরুদাস লাইব্রেরী	॥০
লে[illegible]ার		॥০
দেবতার মেয়ে		॥০
ফুলী	ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স	॥০
দাদার ঘরে	ব্যানার্জ্জি দাস এণ্ড কোং, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট	॥০
বাঙ্গলার মেয়ে	চক্রবর্ত্তীচাটার্জ্জি এণ্ড কোং কালেজ স্কোয়ার	॥-

গ্রন্থের নাম	প্রাপ্তিস্থান	মূল্য
কুড়ান ফুল	ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স, ৬৫ কলেজ ষ্ট্রীট	॥০
পল্লব		১॥০
লহর	সাহিত্য-প্রচার সমিতি, ২৪ ষ্ট্রাণ্ড রোড	১।০
মিলনের পথে	বসুমতী অফিস	।০
হারজিত		।০
মিলন		।০
রত্ন বিনিময়		।০

স্ত্রী পাঠ্য ও বালপাঠ্য পুস্তকাবলী।

ভারত নারী	ভট্টাচার্য এণ্ড সন্স, ৬৫ কলেজ ষ্ট্রীট	২৲
রাজপুত কাহিনী	সাহিত্য প্রচার সমিতি, ২৪ ষ্ট্রাণ্ড রোড	১॥০
রামায়ণেরকথা		৸০
পুরাণ কথা		৸০
সংস্কৃত নাটকের গল্প—		২৲

প্রকাশক ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স, ৬৫ কলেজ ষ্ট্রীট [শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে।]